১৯৭১

ও অনেক অজানা কথা

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

১৯৭১
ও অনেক অজানা কথা

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা

www.pathagar.com

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা
প্রকাশ করেছেন
পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা
এ/১২, প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫
ফোন ঃ ০১৭১৫-৬৮০০২৩, ০১৯৩৭১৬৪৪৩৯

প্রচ্ছদ শিল্পী
ধ্রুব এষ

1971-O Onek Ojana Kootha
Writen by : Abu Mohammad Khan (Bablu)
Published : October 2008, Second Edition April 2010

মুদ্রণ – বর্ণ সৃজন প্রেস
৩৫ ফকিরাপুল, কোমরগলি, ঢাকা
ফোন ঃ ০১৭১৭৬৮৮৬০৪

মূল্য – ৫০০.০০ (পাঁচশত টাকা) বাংলাদেশে, ৪০০ রুপি ভারতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও অস্ট্রেলিয়ায় ১০ মার্কিন ডলার

প্রকাশকাল– অক্টোবর ২০০৮ প্রথম মুদ্রণ, এপ্রিল ২০১০ দ্বিতীয় মুদ্রণ, মুদ্রণসংখ্যা ২০০০

ISBN : 984-300-002626-4

পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থার প্রথম বই
এম, এন, রায় স্মারকগ্রন্থ
প্রকাশকাল – ১৯৮৭

---

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এমদাদুল হক তালুকদার

আমার নানা, প্রায় ৭৫ বছর বয়সে ১৯৭৩ সনে মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি একজন সুপণ্ডিত ও বিস্ময়কর প্রতিভাবান মানুষ ছিলেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের সমগ্র রচনাবলীর অনেকটাই তাঁর মুখস্থ ছিল।

জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত

স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন নেতা, সুলেখক, সাবেক অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশের একজন বিরল কৃতি সন্তান, যিনি নিজের সুখ-শান্তি, আনন্দ অন্যকে দান করে দিয়ে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট, অভাবের বোঝা নিজের মাথায় তুলে নিয়ে মানব সেবা করাকে জীবন ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

জনাব নাসির আহমদ চৌধুরী

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ
একজন সজ্জন মানুষ, আমাকে যিনি ভালোবাসেন, জীবন সংগ্রামে বিজয়ী হতে এবং আমার লেখা প্রকাশ করার জন্য সাহায্য করে থাকেন।

শ্রীযুক্ত সুখময় দত্ত

১৯৯০ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঢাকা শাখার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন।
একজন বিদ্যান, গুণী ও মহৎ প্রাণের মানুষ।
১৯৯১ সনে আমাকে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ঢাকা শাখা থেকে ৫ লাখ টাকার ঋণ দিয়ে কালিয়াকৈর উপজেলার চান্দুরাতে ৯০ শতক জায়গা কেনার জন্য সাহায্য করেন। আজ সে জায়গার ৬০ লাখ টাকার উপরে বিনিয়োগ করে ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে তার আয় থেকে আমার সংসার চলে, মান সম্মান নিয়ে ভালোভাবে সুখে শান্তিতে বেঁচে আছি।

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইটি উক্ত চারজন মহৎ প্রাণ মানুষের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাসহ উৎসর্গ করলাম।

বিনয়াবনত চিত্তে
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

অক্টোবর ২০০৮।

www.pathagar.com

আবু মোহাম্মদ খানের (বাবলু) পরিচিতি ঃ-

১৯৭১ সনের জুন জুলাই মাসে ভারতের হিমালয়ের পাদ দেশ মূর্তি পাহাড়ের মুজিব ক্যাম্প থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট থেকে উচ্চতর সামরিক বা যুদ্ধ বিদ্যায় ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা (এফ.এফ)। ১৯৭১ সনের আগষ্ট মাস থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬নং সেক্টরের দেওয়ানগঞ্জ / হেমকুমারী (নীলফামারী জেলা সীমান্ত) সাব সেক্টরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার হিসাবে প্রায় প্রতিদিন, দিনে-রাতে সমানে পাক-সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ। ১৯৭১ সনের ১৭ই ডিসেম্বর থেকে ২৪শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সাব সেক্টর কমান্ডার ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর ছাতুয়াল সিংহের এবং ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সনের ১১ই জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাব সেক্টর কমান্ডার ফ্লাইট লেঃ ইকবাল রশীদ সাহেবের প্রধান সহকারী হিসেবে নীলফামারী মুক্তিযোদ্ধা কাম্পের দায়িত্ব পালন। নীলফামারী মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে (দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী সাব সেক্টরের) ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট থেকে ট্রেনিংপ্রাপ্ত প্রায় ৮শত মুক্তিযোদ্ধা ছিল। এই আটশত মুক্তিযোদ্ধাদের সবার মুক্তিযোদ্ধার নাম্বার ছিল, প্রত্যেকের একটি করে অস্ত্র ছিল, প্রত্যেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট থেকে নিয়মিত রেশন ও মাসে ৫০ টাকা ভাতা পেতো।

বর্তমানে ঃ সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, ব্যবসায়ী।

প্রিয় নেশা ও শখ ঃ বই পড়া, প্রতিদিন নিয়মিত গল্‌ফ খেলা, ঘোড়ায় চড়া, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনা, বিপদ গ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা এবং পড়ালেখা জানা সৎ মানুষের সাথে কথা বলা।

এবং

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে জন্ম। জন্ম তারিখ ঃ নানার ডায়েরী ও পঞ্জিকাতে লেখা ১৪/০১/১৯৫৪ ইং, স্কুলের খাতায় বা এস.এস.সি সার্টিফিকেট এ ১২/০২/১৯৫৬ ইং। পিতার নাম ঃ আব্দুল মন্নাফ খান, আবু মোহাম্মদ খান বাবলু'র দাদার নাম- আব্দুল খান, তিনি ১৯৩৭ ইং সনে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি একজন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী বীরপুরুষ ও পীর দরবেশ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। অনেক জমির মালিক ছিলেন। মৃত্যুর ৩০/৩৫ বৎসর আগে তামাইয়ের বর্তমান কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ যেখানে, সেখানে আব্দুল খান যে নামাজ ও জুম্মাঘর নির্মাণ করেছিলেন নিচে পাকা, উপরে ও চারদিকে টিনের ঘর, তা তৈরি করতে আজকের টাকার কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। সে টিনের সেমিপাকা নামাজ/জুম্মাঘর ভেঙ্গে আজ সেখানে তামাই গ্রামবাসী কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ তৈরি করেছেন আব্দুল খানের বাড়ী বা জায়গাতে, এ মসজিদে প্রতি শুক্রবারে প্রায় দুই হাজার লোক জুম্মার নামাজ আদায় করেন।

আব্দুল খানের বাবার নাম বৈরাম খান। তিনি একজন বীর পুরুষ ছিলেন। তিনি একটি বিরাট বাঘের সাথে একা যুদ্ধ করে বাঘটিকে হত্যা করেছিলেন একটি পিতলের

www.pathagar.com

বদনা দ্বারা বাঘের মাথায় আঘাত করে। ইংরেজী গত শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁর মৃত্যু হয়েছে (অনুমান)।

১৯৬৫ সনে তামাই বাজার (কালিবাড়ী) প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ৫ম শ্রেণী পাশ। তামাই হাই স্কুল থেকে এস.এস.সি পাশ। তামাই হাইস্কুলে পড়ার সময় সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসাবে আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ১৯৬৯ সনের ঐতিহাসিক ছাত্র গণআন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে অংশ গ্রহণ। ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের তামাই ফুটবল খেলার মাঠে যে বিরাট ছাত্র জনসভা হয়েছিল পাকিস্তানী স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে সেই ঐতিহাসিক বিশাল সভায় সভাপতিত্ব করেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৭২ সনে সিরাজগঞ্জ জেলার, বেলকুচি উপজেলার তামাই গার্লস হাইস্কুলের প্রধান প্রতিষ্ঠাতাদের একজন। তামাই গার্লস হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্বোধনী সভা হয়, ঐ সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা এম.এন.এ. জনাব আব্দুল মোমেন তালুকদার এবং ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৭৪ সনে ঢাকা কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ। ১৯৭২-৭৩ সনে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক (আওয়ামী লীগ সমর্থিত)। ১৯৭৩ সনের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ঢাকা নগর ছাত্র লীগের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন। ১৯৭৭-৭৮ সনে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির (জালাল/জাহাঙ্গীর) সদস্য। ছাত্র জীবনে ঢাকা কলেজের সাউথ হোষ্টেলের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে আবাসিক ছাত্র।

১৯৭৫ সনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে ঘাতকদের দ্বারা মর্মান্তিকভাবে নিহত হবার পরে বাংলাদেশে সমস্ত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতা কর্মীরা যখন শোকে দিশেহারা হয়ে চরম হতাশায় ভূগছিলেন তখন ১৯৭৬ সনে নূতনভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ গঠন করার জন্য ঢাকাতে যে অল্প কয়েকজন ব্যক্তি সর্ব প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন, - তাঁদের মধ্যে আবু মোহাম্মদ খান বাবলু অন্যতম একজন। আওয়ামীলীগ নেতা - মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমেদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আব্দুল মালেক উকিল, আব্দুল মোমিন, আব্দুল মান্নান, ময়েজ উদ্দিন আহমেদ, মতিউর রহমান, ফনি ভূষণ মজুমদার, সাজেদা চৌধুরী, খালেদ মোহাম্মদ আলী, রাজি উদ্দিন আহমেদ রাজু, অধ্যাপক আলী আশরাফ নতুনভাবে আওয়ামী লীগ গঠন করেন। ওনাদের সর্বক্ষণের সাথী ছিলেন আবু মোহাম্মদ খান বাবলু। ছাত্রলীগ নেতা মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিনকে সাথে নিয়ে ছাত্রলীগ গঠন করেন। এ জন্যে আবু মোহাম্মদ খান বাবলুর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান নেতা তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সাথে রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত পরিচয় বিরাট ভূমিকা পালন করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান থেকে বিএ (অনার্স) সহ এম.এ ডিগ্রী লাভ। সহযোগী বা সাবসিডিয়ারী সাবজেক্ট ঃ দর্শন শাস্ত্র ও সাধারণ ইতিহাস। এর আগে দুবছর ইংরেজী বিভাগে অনার্সের ছাত্র ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৭৭-৭৯ এই তিন বছর সাপ্তাহিক অগ্নিবীনা পত্রিকায় সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৮০ সনে তদানীন্তন কৃষিমন্ত্রী এবং ঐ সময়ের বাংলাদেশের একজন প্রধান রাজনেতিক ব্যক্তি বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অবঃ) নূরুল ইসলাম শিশু কে দিয়ে তামাই কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। তামাই কৃষি ব্যাংক সমগ্র সিরাজগঞ্জ জেলার মধ্যে দ্বিতীয় কৃষি ব্যাংকের শাখা। এই কৃষি ব্যাংক বর্তমানে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক। তামাইয়ের এইকৃষি ব্যাংক দ্বারা অত্র এলাকার কৃষক সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ আর্থিকভাবে সীমাহীন উপকৃত হচ্ছেন। বহু গরীব কৃষকের জমি রক্ষা করে চলছে এই কৃষি ব্যাংক।

১৯৮২ সন থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব পালন। সাপ্তাহিক পরিবর্তন উন্নত গুনগত মানের পত্রিকা হিসেবে দেশের সুধী মহলে প্রশংসিত ছিল।

১৯৮৩ সনে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৯৪ সন পর্যন্ত ১২ বছর আবু মোহাম্মদ খান বাবলু বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির কর্মকর্তা ছিলেন।

১৯৮৭ সনে পৃথিবীর বিখ্যাত অমর দার্শনিক, লেখক ও বিপ্লবী এম.এন.রায় স্মারক গ্রন্থের প্রকাশক। এম.এন.রায় জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির বাসন্তী গুহ ঠাকুর তার সাথে যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন।

দৈনিক ইত্তেফাক, সংবাদ সহ বেশ কয়েকটি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৮৭-৮৮ সনে কক্সবাজার জেলার ঈদগাঁও এ মৌলভী ফরিদ আহম্মেদ ও রশীদ আহমেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার পিছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। মরহুম রশীদ আহমেদকে দিয়ে তার বড় ভাই মরহুম ফরিদ আহমদের নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করার জন্য আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) জনাব রশিদ আহমেদকে সর্বপ্রথম প্রস্তাব প্রদান, অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেন। উক্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক কাজ আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) করেন। মরহুম রশিদ আহমেদের একক অর্থে এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জনাব রশীদ আহমেদ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

ঢাকার বিজয় স্মরনীতে ১৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় নভোথিয়েটার বা প্লানেটোরিয়াম নির্মাণ করেছেন। এই প্লানেটোরিয়াম বা নভোথিয়েটার বাস্তবায়ণ করার জন্য আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) বিরাট ভূমিকা রেখেছেন। ১৯৯৮-৯৯ ও ২০০০ সালে এই তিন বছর এই প্রজেক্ট যাতে বাস্তবায়িত হয় ও জাপানের গোটো অপটিক্যাল কোম্পানী লিঃ যাতে কাজ পায় তার জন্য আবু মোহাম্মদ খান কাজ করেছেন। এই প্রজেক্টের ঐ সময়ের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব জনাব মারুফ মোর্শেদ সাহেব অনেকবার স্বীকার করেছেন - "বাবলু সাহেব ছাড়া এই প্রজেক্ট বাস্তবায়িত হতো না।" এছাড়াও ঢাকার নভোথিয়েটার বা প্লানেটোরিয়াম প্রকল্প স্থাপনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান ব্যক্তি জাপানের গোটো অপটিক্যাল মেনুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ এর পরিচালক মিঃ এন.আর.কাবরা। মিঃ কাবরা অনেকবার বলেছেন এবং এখন প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে বলেন- "Without Mr. Bablu it was simply impossible to implement this Planetorium Project in Dhaka. Many Many thanks to Mr. Bablu, we are ever gratful shall never forget him for his contribution and labour for making this Planetorium Project."

এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রী সভার সদস্য, আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য, অনেকবারের যিনি এম.পি, তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ট বন্ধু নেত্রকোনার জমিদার শ্রদ্ধেয় ও ত্যাগী রাজনৈতিক নেতা মরহুম আব্দুল মোমিন সাহেব ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক ছাত্র লীগ নেতা জনাব রবিউল আলম ওবায়দুল মোহাম্মদ মোক্তাদির চৌধুরী সাহেব নিঃস্বার্থভাবে আবু মোহাম্মদ খান বাবলু কে সহযোগিতা করেছেন। ঢাকার বিজয় স্মরণীতে এই প্লানেটোরিয়াম বা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নভোথিয়েটার বাস্তবায়নের কাজ করার জন্য প্রতি মাসে ২৫০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) করে বছরে তিন লাখ, ৩ বছরে নয় লাখ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছেন আবু মোহাম্মদ খান বাবলু জাপানের গোটো কোম্পানীর প্রতিনিধির কাজ থেকে ১৯৯৮ সন থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)'র নানার নাম, এমদাদুল হক তালুকদার, (গ্রাম ঃ তামাই, ১৯৭৩ সনে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন)। তিনি খুবই ধার্মিক ও জ্ঞানী লোক ছিলেন। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর লেখা অনেক কবিতা ও গদ্যের বই তার কণ্ঠস্থ ছিল। এমদাদুল হক তালুকদারের সাথে (তাঁর সময়ে) বাংলার প্রায় সমস্ত নাম করা আলেমদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ও ভাল সম্পর্ক ছিল। আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) এর নানা এমদাদুল হকের দ্বারা তাঁর শিক্ষায় প্রভাবিত। এছাড়াও আবু মোহাম্মদ খান বাবলুর সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আবুল হাশিম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আতাউর রহমান খান, তাজউদ্দিন আহমদ, মিসেস ফজিলাতুন্নেসা মুজিব ও শেখ কামাল এর সাথে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসবার সুযোগ হয়। এঁরা সবাই তাকে খুব স্নেহ করতেন। এঁদের সাথে এক টেবিলে বসে অনেকবার খাবার খাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে।

আবু মোহাম্মদ খান বাবলু মানবতাবাদী, ন্যায় ও সত্য দর্শনে বিশ্বাসী অসাম্প্রদায়িক চেতনাবোধে সমৃদ্ধ একজন সৎ ও দয়ালু মানুষ হিসাবে নিজেকে মনে করেন, তিনি বয়স্কদের শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন, সমবয়স্কদের ভালোবাসেন ছোটদের স্নেহ করেন। যারা এই চেতনায় বিশ্বাসী তাঁরা আবু মোহাম্মদ খানকে ভালোবাসেন ও সম্মান করেন।

www.pathagar.com

Freedom Fighter Abu Mohammad Khan (Bablu)

To Whom It May Concern

It gives me a great pleasure and honour to certify that mr. Abu Mohammad Khan Bablu, S/O Abdul Monnaf Khan, Vill & P.O. Tamai, P.S. Belkuchi, Dist : Sirajgonj, was a Freedom fighter in the Bangladesh Liberation war, 1971. His number in record was T/181, Sector No. 6, His full particulars as a freedom fighter will be found in the records contained in vol 5 in bangladesh muktijuddha welfare trust, ministry of defence, government of the peoples republic of bangladesh.

He was trained at murti training centre, under the indian army, and on successful completion of training was posted under sector no 6, sub-sector dewanganj-hemkumary, which was responsible to liberate the then Nilphamari sub-division from the occupation of pakistan army.

Mr. A. M. Khan Bablu was entrusted with many important responsibilities and operational actions, which he performed successfully with extreme dexterity and courage.

He played a very responsible role all throughout the war, as a result he was highly respected and praised by his colleagues and officers of both the Indian & Bangladesh army under whose command he was during 1971. He was one of trust worthy commander & helping hand in the camp of Nilphamari.

He is a vary honest, dedicated, loyal, and sincere person.

I wish this braveson of the soil all success in his life.

Flight Lieutenant (RTD), Iqbal Rashid 14.12.1987
Sub-Sector Commander, Sector No.6, Bangladesh Liberation war
Consultant, sales & Marketing
Bangladesh muktijuddha welfare trust
Government of the peoples republic of bangladesh

www.pathagar.com

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা নাম প্রসঙ্গে দুটি কথা

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইয়ের প্রায় দশ ফর্মা বা ১৬০ পৃষ্ঠার মতো লেখার পাণ্ডুলিপি যা পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, তা হারিয়ে গিয়েছিল। প্রায় ৫/৬ বছর পরে পত্রিকার কাটিং লেখাগুলো বাসার পুরানা কাগজপত্রের মধ্যে থেকে উদ্ধার হয় ২০০৮ সনের আগষ্ট মাসে। পত্রিকায় প্রকাশিত হারানো লেখাগুলো পেয়ে খুব খুশি হই, সিদ্ধান্ত নেই, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে একটি বই বের করবো। হঠাৎ করেই মাথায় আসে বইয়ের নাম দেব কালের যাত্রার ধ্বনি।

বইয়ের লেখা কম্পোজ প্রায় শেষ, হঠাৎ করেই ৬/৯/২০০৮ তারিখ শনিবার সকালে বাথরুমে গোসল করার সময় মাথায় আসে 'ওস্তাদ ছাড়া গান গায়, যায়গায় যায়গায় মার খায়।" আমি বই বের করছি এটা নিয়ে ওস্তাদ প্রফেসর আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যারের সাথে কথা বলা উচিৎ, তাঁর মতামত দোয়া আর্শিবাদ নেওয়া উচিৎ। বাথরুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে সকাল ৯টার সময় সেন্ট্রাল রোডে আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যারের বাসায় গেলাম। আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যার ঢাকা কলেজের প্রফেসর, আমি ঢাকা কলেজের ছাত্র, যদিও তার সরাসরি ক্লাস করার সুযোগ হয় নাই, তবুও আমি ১৯৭২ সন থেকে তার একজন ঘণিষ্ঠ শিষ্য বা চেলা। তাঁকে আমি বলি আমাদের সময়ের হেনরি লুইচ ডিরাজিও। সাইদ স্যারের বাসা আমার বাসা হাতিরপুল বাজার ও বাটা সিগনালের কাছে প্রিন্স টাওয়ার থেকে সোজা যাওয়া গেলে দূরত্ব একশত গজের কম, একটু ঘুরে যেতে হয় তাই ৫০০ গজের মত, আব্দুল্লাহ আবু সাইদের বাসায় গেলাম, সৌভাগ্যবশতঃ পেলাম, কেননা উনি এখন প্রচণ্ড একজন ব্যস্ত মানুষ। আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। আগমনের হেতু জানালাম– বললাম প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে একটি বই বের করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এজন্য ওস্তাদের দোয়া আর্শিবাদ নিতে এসেছি। তিনি আমার বইয়ের জন্য আমার জন্য শুভ কামনা করলেন, বই বের করার জন্য সম্মতি দিলেন। বই এর নাম দিয়েছি কালের যাত্রার ধ্বনি শুনে বললেন এ নামে আবুল কাসেম ফজলুল হকের একটি বই আছে।

একথা শোনার আগে আমার মনে সংশয় ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষের কবিতা উপন্যাসের শেষের কবিতার একটি লাইন 'কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও– তারি রথ নিত্যই উধাও, জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয় স্পন্দন-চক্র পিষ্টে আধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।"

সেখান থেকে কালের যাত্রা ধ্বনি নাম নিলে কেমন হয়। অনেকেই এ নিয়ে নানা কথা বলবেন, এখন আবার দেখছি অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল হকের মতো একজন পণ্ডিত ও জ্ঞানী মানুষ আমার আগেই এ নাম নিয়ে বই বের করেছেন। আমার মন কিছুটা খারাপ হয়। আমার মন খারাপ দেখে ওস্তাদ আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যার বলেন এ নিয়ে তোমার মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই এ বাক্য বা শব্দটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, তিনি সবার গুরু। তাঁর লেখার শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে বইয়ের নাম দেবার

www.pathagar.com

বাংলাভাষার সমস্ত কবিও লেখকদের অধিকার আছে। আমার, তোমার আবুল কাসেম ফজলুল হকসহ সবার, কাজেই তুমি তোমার বইয়ের নাম কালের যাত্রা ধ্বনিই রাখো। সাইদ স্যারের কথায় আমি যুক্তি খুঁজে পাই, তাই আমার বইয়ের নাম কালের যাত্রা ধ্বনি রাখার সিদ্ধান্ত নেই।

আমার প্রকাশিতব্য বইয়ের নাম কালের যাত্রা ধ্বানী একথা শুনে সুসাহিত্যিক শিক্ষাবিদ সরদার আব্দুস সাত্তার সাহেব এবং মোরশেদ শফিউল হাসান সাহেব প্রচণ্ড আপত্তি তোলেন, আবুল কাসেম ফজলুল হক সাহেবের এ নামের বইয়ের জন্য। মোরশেদ সফিউল হাসান ও সরদার আব্দুস সাত্তার সাহেব অনেক উচুস্তরের পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক। শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আলী আহসান সাহেব এবং লেখক হুমায়ুন আহমদ তাদের রচনাবলীর ভূমিকা লিখিয়েছেন সরদার আব্দুস সাত্তার সাহেবকে দিয়ে, যা ভাবতে আমার ভয় লাগে, আবার এই আব্দুস সাত্তার সাহেব আমাকে ভালোবাসেন, দাওয়াত করে বাসায় নিয়ে আদর সম্মান করে খাওয়ান, এমন লোকদের কথার সম্মান না করলে জীবনে ধংশ অনিবার্য। কাজেই সিদ্ধান্ত নেই বইয়ের নাম কালের যাত্রা ধ্বনী না দিয়ে অন্য নাম দিবো। বেশ কয়েদিন বইয়ের নাম জটিলতায় ভূগতে থাকি এর মধ্যে ২৯/৯/২০০৮ তারিখে বাংলাবাজার মওলা ব্রাদার্স থেকে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এর ৪ খণ্ড রচনাবলী কিনে বাসায় রিক্সাযোগে ফেরার পথে হঠাৎ করে মাথায় আসে বইয়ের নাম দিবো ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা। পরের দিন সকালে স্ত্রী বিছানায় আধো ঘুমে, তাকে বইয়ের এ নামের কথা বলার সাথে সাথে চিৎকার করে উঠে সুন্দর নাম, সবচেয়ে ভালো নাম। এভাবেই ঠিক করলাম বইয়ের নাম ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩০/৯/২০০৮।
প্রিন্স টাওয়ার, ১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

কৈফিয়ত ও ঘোষণা

নিজের সামান্য ভুলের জন্য বিরাট খেসারত দিতে হলো। ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইটি উন্নতগুনমানের ছাপা ও নির্ভুল বানানে বের করার জন্য খুব চেষ্টা করেছি অনেক হাজার টাকা অতিরিক্ত খরচ করে নষ্ট করেছি। কিন্তু ছাপার গুণগত মান ভালো হয় নাই, অনেক বানান ও প্রুফ ভুলসহ ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বের হলো। দুঃখ বেদনায় খুব কাতর হয়ে পড়েছি এ জন্য।

যারা বই কম্পোজের কাজ করে তাদের কম্পোজ করতে না দিয়ে আমার বাসার কাছে জবওয়ার্ক করে এমন এক কম্পিউটারে কম্পোজ করার কাজ দিয়ে বিরাট খেসারত দিতো হলো। এই কম্পিউটারে কাজ করতে দিয়ে এখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চেষ্টা করে আরও নূতন নূতন কঠিন জটিলতার মধ্যে পরে যাই। অর্জ্জুন-শুভদ্রার ১৪ বছর বয়েসের বালক পুত্র অভিমান্যু যেকোন কঠিন প্রতিরোধ ভেদ করে সামনে প্রবেশ করে বিপদে পরে যেতো, কিন্তু সামনে থেকে বেরিয়ে আসতে পারতো না। পিছনে আসতে যুধিষ্ঠির, ভীম অর্জুনের সাহায্যের প্রয়োজন হতো। আমি শুভদ্রা অর্জুনের পুত্র বালক অভিমান্যুর মত ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা নির্ভুল ও উন্নত মানের বই বের করার জন্য যতই চেষ্টা করে সামনে গিয়েছি, ততই বেশি জটিল বেরাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থার মালিকের কাছে গিয়েছি একজন ভালো প্রুফ রিডারের জন্য, তিনি আমাকে বাংলাদেশের সবচেয়ে দামী প্রুফ রিডার দিয়েছেন, ৩০টি নিজের বইয়ের লেখক প্রকাশকসহ অনেক বইয়ের প্রকাশক যাযাবর মিন্টু, যার নির্ভুল ও সুন্দর প্রকাশক হিসাবে নাম আছে, তার কাছে প্রেসের নাম চেয়েছি সে আমাকে সাইদিয়া প্রিন্টিংয়ের নাম দিয়েছে। ফলাফল ১৯৭১ ও অজানা কথা এভাবে বের হলো। ছাপার মান খারাপ হয় নাই তবে ভালো বলা যাবে না।

সিদ্ধান্ত নিয়েছি এর প্রতিশোধ নিবো পশ্চিম বঙ্গের কলকাতার ১৫নং কলেজ স্ট্রীটে অবস্থিত মানবেন্দ্র নাথ রায়ের প্রতিষ্ঠিত, শিবনারায়ন রায় যার কিছুদিন আগেও কর্ণধার ছিলেন, রেনেসাঁস পাবলিশার্সের বর্তমানের পরিচালক আমার বন্ধু কানাই লাল পাল এর সাহায্যে ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা দ্বিতীয় মুদ্রণ বের করবো কলকাতার সবচেয়ে ভালো কোন এক প্রেস থেকে ছেপে। কলকাতা থেকে ১০০০ বই ছেপে সরকারী নিয়ম অনুযায়ী ট্যাক্স প্রদান করে বই বাংলাদেশে নিয়ে আসবো। আমি জানি মহান আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন– আমি এ জীবনে যা চেয়েছি আল্লাহ তার প্রায় সব পূরণ করেছেন। খুব অল্পদিনের মধ্যে আমার এ সাধ আল্লাহ পূরণ করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩০/১০/২০০৮

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধ ও কয়েকটি প্রবন্ধ

পৃষ্ঠা নং

১। মুক্তিবাহিনী থেকে বাড়ী ফেরা ৩৮

২। দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভূতঃ রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি? ৪৮

৩। ফখরুদ্দিনের কাছে খোলা চিঠি "শেখ হাসিনারে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখ নিও না সত্য ও ন্যায় ধর্মকে কারো না বিমুখ তব প্রসাদ হতে"। ৪৯

৪। শেখ হাসিনা ও সাইখুল হাদিস আজিজুল হক চুক্তি বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে। ৫৬

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কথা ৬৪

৬। বইয়ের নাম মহাভারত, প্লেটোর রিপাবলিক এবং আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। ৭৪

৭। স্প্রিং ১৯৭১ ডক্টর ফারুক আজিজ খানের বই স্বাধীনতার যুদ্ধের এক শক্তিশালী দলিল। ৮০

৮। ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তাজউদ্দিনের অবদান। ৮৪

৯। ১৯৯২, ২৬শে মার্চ গণআদালত কাছে থেকে দেখা। ৮৮

১০। চলমান জীবনের চালচিত্র ৯২

১১। ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার আলবদরদের থেকেও বেশি ঘৃণিত। ৯৭

১২। মুজিব নগর সরকারের তিনস্তম্ভ সৈয়দ নজরুল, এম মনসুর আলী, এ,এইচ, এম কামারুজ্জামান। ১০৩

১৩। স্মৃতির পাতায় জেল হত্যাকান্ড ১১০

১৪। স্মৃতির পাতায় জেল হত্যাকান্ড-দুই ১১৬

১৫। ১৯৯৫ সন আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কয়েকটি কথা ১২২

১৬। চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র। ১২৫

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেইসব বিরল ও অসাধারণ মানুষদের কথা ঃ

		পৃষ্ঠা নং
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাকে যেমন দেখেছি	১৩৭
২।	স্মৃতির পাতায় মওলানা ভাসানী	১৪৯
৩।	তাজউদ্দিন আহমদের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলী	১৫৭
৪।	একজন সাত্বিক নেতা আব্দুল মোমিন	১৬২
৫।	সব মানুষের প্রিয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী	১৬৫
৬।	মহান নেতা সামসুল হক	১৭০
৭।	ইসমাইল মোহাম্মদ উদয়ন চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি	১৭৪
৮।	মানবতাবাদী মানুষ রশীদ আহমদ আর নেই	১৭৭
৯।	রিচার্ড নিকসন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব	১৮৯
১০।	আমার ভাই, আমার বন্ধু সংসদ সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টো	১৮৫
১১।	কবি আবুল হাসান	১৮৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিঠি-পত্র

		পৃষ্ঠা নং
১।	অন্নদা শঙ্কর রায়কে লেখা চিঠি	২১১
২।	তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গে অন্নদা শঙ্কর রায়ের সাথে পত্রালাপ	২২০
৩।	শিব নারায়ণ রায় ও গীতা রায়ের চিঠি	২২৬
৪।	ভবানী সেন গুপ্ত/চানক্য সেনের চিঠি	২৩৭
৫।	অধ্যক্ষ আবুল হামিদের চিঠি	২৪২
৬।	কুনাল চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি	২৪৬
৭।	পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি	২৪৭
৮।	দিলীপ মৈত্রের চিঠি	২৫৫
৯।	জীবন চন্দ্র চক্রবর্তীর চিঠি	২৬১
	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে লেখা চিঠি	২৬৮
১১।	সিদ্দিকুর রহমানের সিএসপি এর চিঠি	২৭২
১২।	সন্তোষ কুমার দেব মিশ্রের চিঠি	২৭৪

www.pathagar.com

১৩। ভারতীয় হাইকমিশনার কে লেখা চিঠি ২৭৮
১৪। কুমুদিনীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের এম,ডিকে লেখা চিঠি ২৮০
১৫। নজরুল, কামাল, পুনু, ঝন্টু ২৮২
১৬। সরদার আব্দুস সাত্তারের চিঠি ২৮৬
১৭। নাটোরের ডি,সি সদরুদ্দীনকে লেখা চিঠি ২৮৭
১৮। দেবী প্রসাদ মিশ্রের চিঠি ২৮৮
১৯। শিপ্রা আদিত্যের চিঠি ২৯০
২০। চন্দনা খানের চিঠি ২৯৩
২১। সিমিন হোসেন রিমিকে লেখা চিঠি ২৯৪
২২। শারমিন আহমদ রিপিকে লেখা চিঠি ২৯৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভিমত, প্রতিবাদ ও দাবী

পৃষ্ঠা নং

১। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধনী ও সংযোজনীর প্রয়োজন প্রসঙ্গে ২৯৯
২। বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সৈয়দ সামসুল হকের কথা :- দুটি প্রতিবাদ ৩০১
৩। প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা ৩০৪
৪। তাজউদ্দিন আহমেদ, দৈনিক সংবাদ একটি ভিন্নমত ৩০৬
৫। প্রসঙ্গে রেসকোর্স ময়দান ঃ ৩১০
৬। বি.টি.ভি'তে প্রচারিত বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ৩১৩
৭। হাবিবুল আওয়ালকে আইন সচিব নিয়োগ সরকারের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত ৩১৩
৮। রবিউল আলম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর উপর কয়েকজন দুস্কৃতিকারী পুলিশের এ বর্বর আচরণের বিচার চাই ৩১৫
৯। রমনা পার্ক, সারোওয়ার্দী ময়দান, স্বাধীনতার স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ এবং এ বিষয়ে দু'একটি কথা। ৩১৮
১০। কামারখন্দ থানার প্রিয়-ভাই ও বোনেরা ৩২০
১১। বিষয় : আর্মি গলফ ক্লাবে (নিকুঞ্জ) মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেনাবাহিনীর সদস্য বা সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ফিতে মেম্বারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদন। ৩২২

www.pathagar.com

১২। বিষয় রমনা (সারোওয়ার্দী) ময়দানে একজন গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সহকারী প্রকৌশলীকে পোস্টিং দেবার জন্য আবেদন। ৩২৪
১৩। ১৯৯৫ সনে বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট ৩২৬
১৪। ভারত সরকার ও ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে আবেদন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান এবং বার্মার নাগরিকদের মধ্যে অবাধ চলাফেরা ও পণ্যদ্রব্য বিক্রির সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার ৩২৮
১৫। বাংলাদেশের কোন মহিলা বা নারীকে ৩টি সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার না করার আইন করার জন্য আবেদন ৩৩৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংল্যান্ডের রাজা-রাণী, ভারতের সম্রাট, গর্ভনর জেনারেলগনের নাম, ভ্রমণ ২০০৮ ও অন্যান্য রচনা

১। শামসুজ্জামান ৩৩৯
২। এক হাজার বছরের গ্রেট বৃটেনের রাজা ও রানীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। ৩৪২
৩। ভারত বর্ষের ১৩৯৮ সন থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত শাসক বা সম্রাটদের নামের ধারাবাহিক তালিকা। ৩৪৪
৪। ১৭৫৭ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ভারত বর্ষের গর্ভণর জেনারেলদের ধারাবাহিক নামের তালিকা ৩৪৬
৫। আমার একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় মানুষ : মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সাবেক সি.এস.পি. ৩৫২
৬। কাজী আনিসুর রহমান ও শফিউল ইসলাম কামাল ৩৫৫
৭। পুস্তক সমালোচনা : সময়ের মুখোমুখি, হাসান শফি ৩৫৮
৮। অভিমানের বদলে, মোরশেদ শফিউল হাসান ৩৬০
৯। ভ্রমণ ঃ জুলাই-২০০৮ বগুড়া, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর এবং বরিশাল ৩৭৪
১০। জেলার নাম সিরাজগঞ্জ ৩৭৮
১১। মানুষ এক বয়সে যা করে গর্ব করে পরবর্তী বয়সে গর্ব করা ঐ কাজের জন্য অনুশোচনা করে ৩৭৮
১২। সলিমুল্লাহ খান ৩৮১

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

২০১০ সনে দ্বিতীয় মুদ্রণে সংযোজিত নতুন লেখা

১. আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন : আব্দুস সোবাহান গোলাপকে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাইভেট সেক্রেটারি বা অন্য কোন পদে নিয়োগ না করার জন্য আবেদন ৩৯৩

২. ২০১৪ সনে সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিজয়ের জন্য যা করা একান্ত প্রয়োজন ৩৯৬

৩. প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন ৪০০

৪. শেখ হাসিনার প্রতি আবেদন রমনা (রেস-কোর্স) ময়দান ধ্বংস না করার জন্য আবেদন ৪০১

৫. সিদ্ধার্থ শংকর রায় ৪০৫

৬. জেনারেল লছমন সিং ৪০৬

৭. জেনারেল বি. জোগিন্দার সিং ৪০৭

৮. জেনারেল পি. এন. কাতপালিয়া ৪০৮

৯. দেবী প্রসাদ মিশ্র ৪০৯

১০. সুশীল কুমার রায় ৪১০

১১. কুনাল চট্টপাধ্যায় ৪১৩

১২. ১৯৭১ এবং অজানা বাবলু কোষ : সাদাত উল্লাহ খান ৪১৫

১৩. জামিলুর রেজা চৌধুরী ৪১৮

১৪. ১৯৭৪ সনে গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে মেজর ডালিমের যা ঘটেছিল ৪১৯

১৫. জনাব খালেদ শাসম, সাবেক সিএসপি ৪২৪

www.pathagar.com

১৬. ভারত ভ্রমণ ০৭.০২.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০০৯ কলকাতা
দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কলকাতা,
নবদ্বীপ, কলকাতা, ঢাকা ৪২৫
১৭. ১৯৭৭ সন : প্রসঙ্গ আবুল ফজল উইল ডুরান্ড ও আহমদ ছফা ৪৫৪
১৮. ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পরে আওয়ামী লীগের
জন্মকথা : ১৯৮১ পর্যন্ত। ৪৫৬
১৯. দ্বিতীয় মুদ্রণে চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র
প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা ৪৬২
২০. এ. কে. খন্দকারের প্রতি আবেদন : মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে
ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের লিস্ট করা বন্ধ করুন ৪৬৮
২১. অর্থ মন্ত্রী সাইফুর রহমান ৪৭১
২২. কোথায় গেল বাংলার সেই আষাঢ়, শ্রাবণ,
ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাস? ৪৭৬
২৩. গণতন্ত্রের দুই মারাত্মক ব্যাধি : ২১ বছর বয়সের নীচে
এবং ক্ষুধায় কাতর গরীব মানুষের ভোটার লিস্টে নাম ৪৭৮
২৪. সে আমার আদরের ছোট বোন খাদিজা খানম তৌফা ৪৮০
২৫. ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা : প্রফেসর আনিসুজ্জামান ৪৮৫
২৬. ২০১৫ সনে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি ৪৯২
২৭. বাংলাদেশের বিবেকবান মুসলিম ভাই-বোনদের
প্রতি সবিনয় আবেদন : দয়া করে গোমাংস খাওয়া
থেকে বিরত থাকুন ৪৯৪
২৮. কবি নির্মলেন্দু গুণের পৃথিবী জোড়া গান,
কবিতার বই এবং ত্রিশালের আকাশ। ৪৯৮
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে-বাইরে এবং শরৎচন্দ্র চট্টপধ্যায়ের
পথের দাবী উপন্যাসে এম.এন.রায়। ৫০১

www.pathagar.com

৩০. রমনাকালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী ৫০৯
৩১. আধুনিক শক্তিশালী ভারত ও বাংলা গড়ার চার বিদেশী কন্যা : মার্গারেট নোবল, সিলভিয়াও, এলেন এবং এ্যানি বেসান্তের কথা ৫১৮
৩২. জামায়াতে ইসলাম এবং তাবলীগ জামায়াতের আমীরদের থেকে দূরে থাকুন– ৫২২
৩৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র রাজনীতি কমানোর উপায় ৫২৬
৩৪. যশোবন্ত সিংহ, জিন্নাহ ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা ১৯১৬ সনের হিন্দু-মুসলিম লখনৌ প্যাক্ট প্রেক্ষিত ২০১০, পাপমোচনের জন্য বাংলাদেশে হিন্দুদের ১৫ ভারতে মুসলমানদের ৩০ ভাগ সমস্ত চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণ করার দাবী। ৫২৮
৩৫. সরদার আবদুস সাত্তার, মহানগর দায়রা জজ বশিরউল্লাহ এবং মইনুস সুলতান ৫৩৪
৩৬. ১৯৭১ সনে আওয়ামীলীগের এমএনএ ও এম পি এ'রা নন, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং আজকের কিছু অপ্রিয় সত্য কথা ৫৪৩
৩৭. আওয়ামীলীগে ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক আট নেতা ও আজকের অপ্রিয় সত্য কথা ৫৪৯
৩৮. প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ সেপারেশন অব পাওয়ার: বাংলাদেশে সভ্য, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের জন্য যা জরুরী প্রয়োজন ৫৫৩
৩৯. তাজউদ্দিন আহমদ, ১৯৭৪ সনের আওয়ামীলীগের কাউন্সিল : প্রেক্ষিত ২০১০ এবং ২০১৪ সনের সংসদ নির্বাচন ৫৫৮
৪০. আল্লাহর শত্রু সীমান্ত রক্ষী ধ্বংস হোক নিপাত যাক ৫৬২
৪১. আবুল হাশিম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধ ও দালাল আইন ৫৬৬
৪২. যে কারণে মন্দিরে যেতাম। ৫৭১
৪৩. যে কারণে নামাজ পড়ি। ৫৭২
৪৪. দ্বিতীয় মুদ্রণে আমার শেষ কথা ৫৭৩

www.pathagar.com

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা আমার দুঃখ

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বই বের হবার সময়ে যাদের কথা মনের পাতায় বেদনার সাথে ভেসে উঠছে তারা হলেন– ইসমাইল মোহাম্মদ উদয়ন চৌধুরী, শওকত ওসমান, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, কবি শামসুর রাহমান, আহমদ ছফা, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর মোশফেকুস সালেহীন, ডিপুটি গভর্ণর কাজী বদরুল আলম, সৈয়দ আলী কবীর। পশ্চিম বাংলার অন্নদা শঙ্কর রায়, শিব নারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ, পূর্ণেন্দু পত্রী, অশোক রুদ্র, এনারা আর এ জগতে নাই, পরলোকে চলে গিয়েছেন। এঁনাদের সবার সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো, আমি তাদের স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম।

দুই মলাটের মাঝে ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা নামে আমার লেখা নিয়ে বই বের হয়েছে এটা দেখে উল্লেখিত ব্যক্তিরা খুবই খুশি হতেন এবং আমাকে উৎসাহ উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত করতেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি আজ তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি, তাঁদেরকে আমি প্রণাম, ভক্তি, প্রণতি ও ছালাম জানাই।

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বই বের হলো অথচ তাঁরা এবই পড়লেন না, এটা আমার জন্য বিরাট দুঃখও বেদনার বিষয়।

আবু মোহাম্ম খান (বাবলু), ৩০/৯/২০০৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) জন্ম- ১৯৫৪ সনের ১৪ই জানুয়ারি, জন্মস্থান, তামাই, থানা-বেলকুচি, জেলা-সিরাজগঞ্জ। (এসএসসি সার্টিফিকেটে ১২-০২-১৯৫৬ জন্ম)

www.pathagar.com

১৯৯৬ইং সনের ৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লির রাজঘাটে মহাত্ম গান্ধীর সমাধির সামনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহুরলাল নেহেরুর সমাধির সামনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ০৫-০৯-১৯৯৬ইং তারিখে।

www.pathagar.com

আগ্রা ফোর্টে যমুনা নদীর ধারে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ০৮-০৯-১৯৯৬ইং তারিখে। দুরে তাজমহল দেখা যাচ্ছে।

দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে হিমাচল প্রদেশের ৪ জন মেয়ের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। হিমাচল প্রদেশ থেকে ৪জন মেয়ে দিল্লীতে বেড়াতে এসেছিল, তারা এসে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কে বলে আমাদের সাথে কোন পুরুষ মানুষ নেই, দেখতে বেমানান, তাই আপনি আমাদের সাথে যোগদান করেন। ভুলে মেয়েগুলোর ঠিকানা নেয়া হয় নাই, যা বিরাট ভুল, যার জন্য ওরা কোন দিন ওদের সাথে এ ছবি দেখতে পাবে না।

www.pathagar.com

১৯৯৮ইং সনে ঢাকায় ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরালের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা জেলার সমস্ত ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান বা জেনারেল কমান্ডিং অফিসার ছিলেন মেজর জেনারেল লছমন সিং। গত ১৩-০২-২০০৯ তারিখ শুক্রবার, ৬ নং সেক্টরের (রংপুর, দিনাজপুর) দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী সাব সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)'র ক্যামেরায় দিল্লির সোমবিহারে জেনারেল লছমন সিংহের বাসায় তোলা ছবিতে জেনারেল লছমন সিং ও মিসেস রাজমান সিং। উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সনের পরে কাশ্মীর, হায়দারাবাদ ও গোয়া ভারতের অধীনে নেবার জন্য যে সেনা অভিযান হয়- সে সেনা অভিযানের ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন নেতা ছিলেন জেনারেল লছমন সিং।

www.pathagar.com

দিল্লির ইন্ডিয়া গেটের সামনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ০৯-০৫-১৯৯৬ইং তারিখে।

www.pathagar.com

গত ৪ঠা মার্চ ২০০৮, রোজ মঙ্গলবার ১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, প্রিন্স টাওয়ারের ফ্ল্যাট নং এ/১২ (১৩ তলায়) আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) তার বাসায় এক মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। উক্ত মধ্যাহ্ন ভোজের পর সাবেক মন্ত্রী আওয়ামীলীগ নেতা আবুল মাল আব্দুল মুহিত, আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, আওয়ামীলীগ নেতা রবিউল আলম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরী, মমতাজ হোসেন, ড. আব্দুর রাজ্জাক চেয়ারে বসে রয়েছেন। পিছনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ও মিসেস নুরনাহার খান বাবলু।

৩০-০৮-২০০৮ইং তারিখে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) এর বাসভবনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা ও মধ্যাহ্ন ভোজের অনুষ্ঠান শেষে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন জনৈক আওয়ামী লীগ নেতা। পাশে রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা মমতাজ হোসেন।

www.pathagar.com

গত ৩০-০৮-২০০৮ইং তারিখে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) তার বাসভাবন ১৩৫/এ এ্যালিফ্যান্ট রোড, প্রিন্স টাওয়ার ফ্ল্যাট নং-এ/১২তে সদ্য কারামুক্ত সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব, বর্তমানে আওয়ামী লীগ নেতা রবিউল আলম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীর সম্মানে এক সংবর্ধনা ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রায় ৭০ জন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কবি সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন। ছবিতে রবিউল আলম ওবায়দুল মুক্তাদির চৌধুরীর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিচ্ছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারন সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম। পাশে রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা মমতাজ হোসেন।

১৯৯৪ইং সনে ঢাকার সুন্দরবন হোটেলে একটি সম্মেলনে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর ছেলে ভারতের সাবেক জ্বালানীমন্ত্রী সুনীল শাস্ত্রী, ভারতের সাবেক এমপি তারেক আনোয়ার, আবু মোহাম্মদ খান বাবলু, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মামুন ও তার এক মেয়ে এবং অন্যান্যারা।

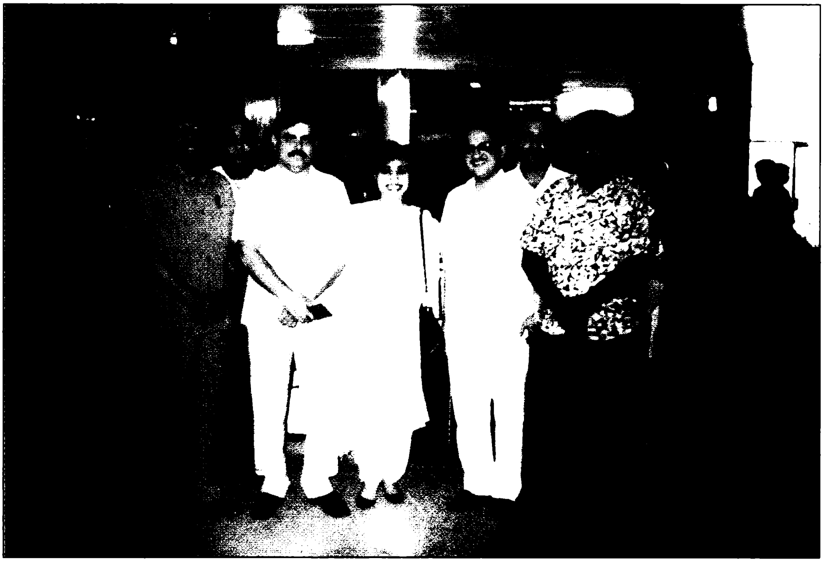

www.pathagar.com

২০০৫ইং সনের মার্চ মাসে ঢাকা ক্লাব আয়োজিত রমনা গলফ কোর্সে অনুষ্ঠিত স্বাধীনতা দিবস গলফ টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতায় র
গীতিয়ার সাফিয়া চৌধুরী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হয়েছিলেন ২০০৭ইং সনে, পাশে রয়েছেন ঢাকা ক্লাবের কার্যকারী প
সাবেক সভাপতি এডভোকেট হাফিজ উল্লাহ।

www.pathagar.com

পুরস্কার গ্রহণ করেছেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ঐ সময়ে ঢাকা ক্লাবের সভাপতি গীতিয়ারা সাফিয়া চৌধুরীর হাত থেকে।
মি. লুৎফ রুমি খান, এনামুল হক এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের

www.pathagar.com

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার তামাই হাইস্কুলের যে সব ছাত্র ছাত্রী ১৯৬৬ সন থেকে ২০০০ সন পর্যন্ত এস.এস.সি পরীক্ষায় পাশ করেছে (১৬০০ জনের মত) তাদের এবং বেলকুচি ও কামারখন্দ থানার আরো ১০০০ হাজার গণ্যমান্য লোকদের সম্মানে ২০০০ সনের ১০ই জানুয়ারি তামাই হাইস্কুল প্রাঙ্গণে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) এক প্রীতি সমাবেশ ও মধ্যাহ্ন ভোজেরজ আয়োজন করেন। ঐ অনুষ্ঠানে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) বক্তৃতা করছেন। ১০ই জানুয়ারি ২০০০ সনের তামাই হাইস্কুলের ঐ মধ্যাহ্ন ভোজে ১৪ মন মাংশ, ১৬ মন চাউল রান্না করা হয়। সাথে ছিল ১৪ মণ দই।

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার তামাই হাইস্কুলের ২০০০ সনের ১০ই জানুয়ারি আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন, তামাই হাইস্কুলের সাবেক ছাত্র পাবনা এডোওয়ার্ড কলেজের অংক বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। মঞ্চে মাঝখানে বসে আছেন এম.পি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস।

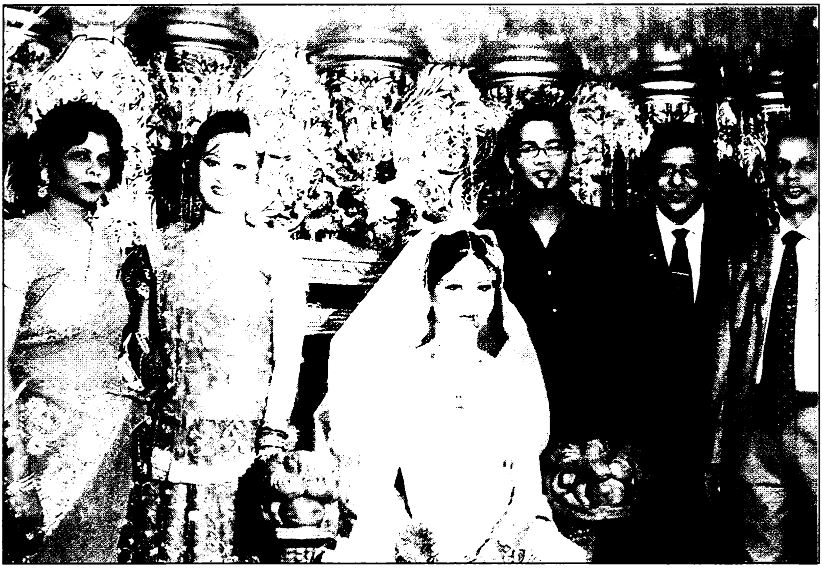

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)-র বন্ধু শামসুদ্দোহা বিল্টুর বোন শিরিন আপার মেয়ে ইমির বিয়ের অনুষ্ঠানে শামসুদ্দোহা বিল্টু, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), উল্লাস, বসে আছে ইমি, উল্লাসের স্ত্রী সম্পা, শিরিন আপা।

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলার তামাই হাইস্কুলের ২০০০ সনের ১০ই জানুয়ারি আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন তামাই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক আবুল হোসেন মিয়া।

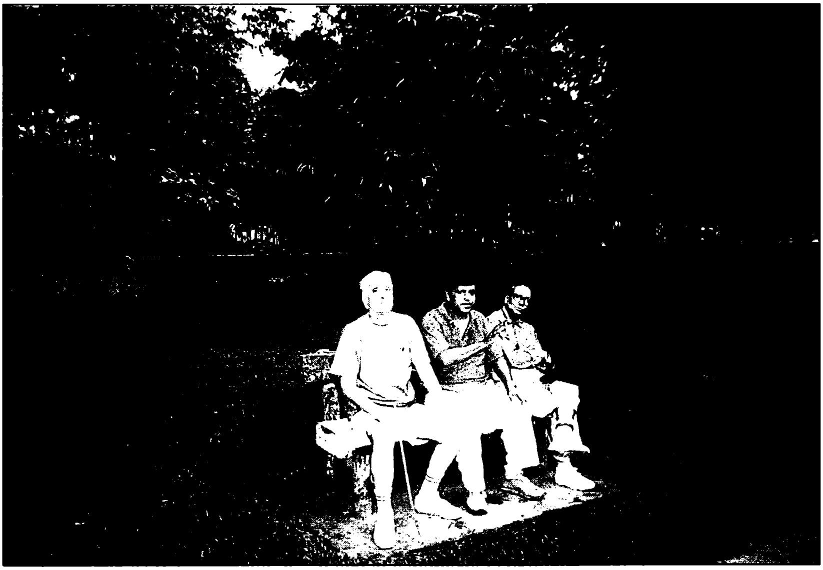

২০০১ইং সনে রমনা পার্ক মর্নিং ওয়াক করার পর বসে রয়েছেন জনাব আবুল মাসুদ সাইদ ১৯৩৭ ইং সনে মেট্রিক, সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব জনাব সালাউদ্দিন আহম্মেদ ১৯৪২ইং সনে মেট্রিক, (সালাউদ্দিন সাহেবের বড় ভাই সাবেক সচিব বোরহান উদ্দিন আহমেদ, লেখিকা খালেদা সালাউদ্দিন, সালাউদ্দিন সাহেবের স্ত্রী), আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ১৯৭০ইং সনে এস.এস.সি। ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ইং সনে ঢাকা কলেজ জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ ও আওয়ামীলীগ নেতা জিল্লুর রহমান এবং লাহোর সিএসসি একাডেমীতে সাবেক রাষ্ট্রপতি সাহাবউদ্দিন আহমেদ, সাবেক সচিব মুজিবল হক, সাবেক সচিব ও মন্ত্রী, মাহবুব জামান, কেরামত আলী, আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সাইদুজ্জামান, এমকে আনোয়ার সহ অনেকেই জনাব আবুল মাসুদ সাইদ সাহেবের ছাত্র।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)-র বন্ধু শামসুদ্দোহা বিল্টুর বোন শিরিন আপার মেয়ে ইমির বৌ-ভাত অনুষ্ঠানে মিসেস লুৎফাদ্দোহা, ড. নুরউদ্দিন, শিরিন আপার ছেলে উল্লাস, উল্লাসের স্ত্রী সম্পা, বিল্টুর বড় ভাইয়ের স্ত্রী হোসনে আরা হেনা, বসে রয়েছে শিরিন আপা, আসিফ ও ইমি।

www.pathagar.com

১৭.০২.২০০৯, মঙ্গলবার, আগ্রার তাজমহলের সামনের বেঞ্চে বসে লেখক সস্ত্রীক।

www.pathagar.com

গলফ্ খেলোয়ার আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), গলফ্ খেলছেন।

www.pathagar.com

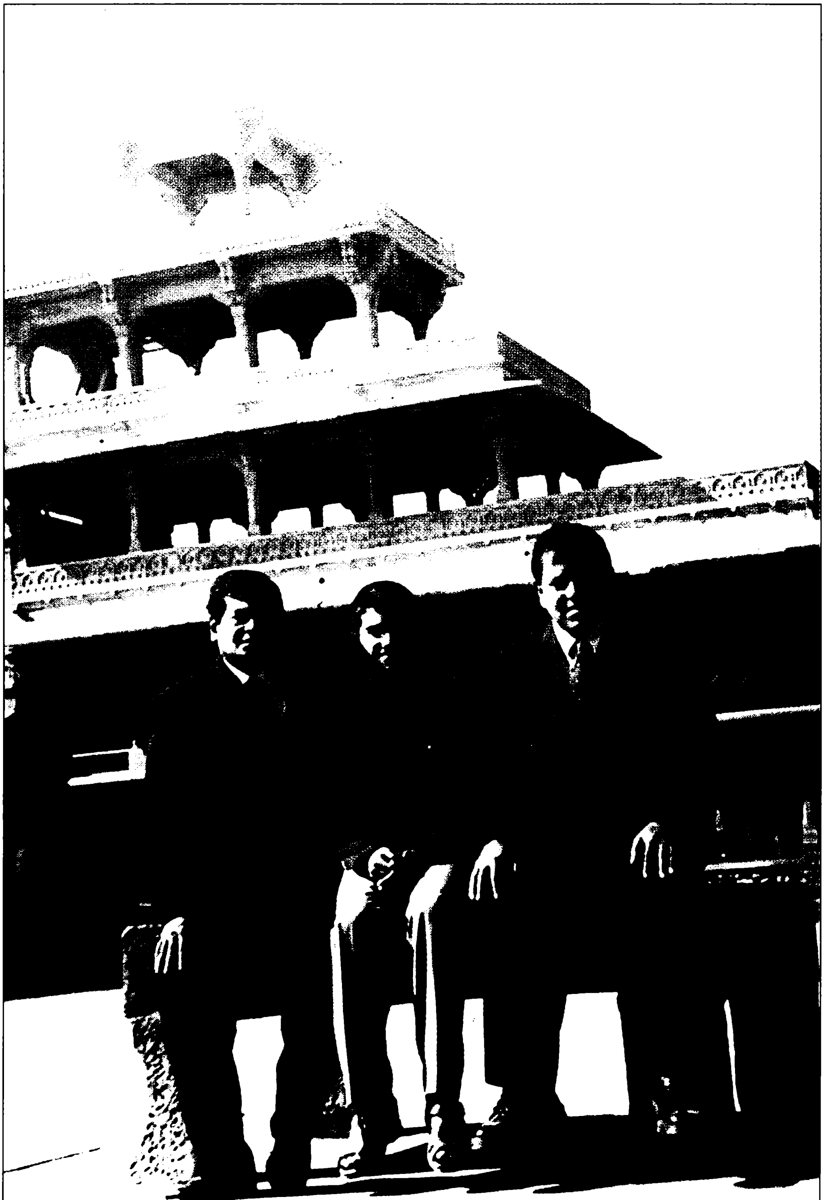

৩/১২/২০০৩ইং তারিখে আগ্রার ১২ মাইল দূরে ফতেপুর সিক্রিতে বসে রয়েছেন- আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), বন্ধু নজরুল ইসলাম ও তার ছেলে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের ভারতের পুর্বাঞ্চলের (পশ্চিম বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা) বি,এস, এফ, এর আই,জি ছিলেন মিঃ গোলক মুজদার। ১৯৭১ সনের ৩০ মার্চ সন্ধ্যায় তাজউদ্দিন আহমেদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে খবর পেয়ে কলকাতা থেকে এসে কুষ্টিয়া সীমান্তে গ্রহণ করে কলকাতায় নিয়ে যান, ঐদিন রাতেই ১৯৭১ সনের বি,এস,এফ এর ডাইরেক্টার জেনারেল ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধীর ভাই খুসরো রুস্তমজীর সাথে তাজউদ্দিন আহমেদকে পরিচয় করে দেন।
খুশরো রুস্তমজী তাজউদ্দিন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে দিল্লী নিয়ে যান এবং ৪ঠা এপ্রিল রাতে তাজউদ্দিন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী ম্যাডাম ইন্ধীরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ এর ব্যবস্থা করে দেন, ৯০ মিনিট ম্যাডাম ইন্ধীরা গান্ধী ধৈর্য ধরে পূর্ব বাংলার ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনার বিবরণ তাজউদ্দিন আহমেদের কাছ থেকে অবহিত হন। প্রধানমন্ত্রী ম্যাডাম ইন্ধীরা গান্ধী, তাজউদ্দিন আহমেদ ও খুসরো রুস্তমজী, এ তিন জনের ৪ঠা এপ্রিল ম্যাডাম ইন্ধীরা গান্ধীর বাস ভবনের লাইব্রেরী কক্ষের অনুষ্ঠিত বৈঠকেই তাজউদ্দিন আহমেদকে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের সিদ্ধান্তে সম্মতি প্রদান করা হয়। ছবিতে ১৯৭১ সনের বি,এস,এফ এর সেই আই,জি,গোলক মুজমদার সাহেবের সাথে কথা বলছেন মুক্তিযোদ্ধা আবু মোহাম্মদ খান (বাবুল), ০৮.০২.২০০৯ তারিখ রোববার কলকাতার সল্টলেকের গোলক মুজমদার সাহেবের বাসায় তোলা ছবি। গোলক মুজমদার সাহেব একজন সত্যনিষ্ঠ, সাধু সজ্জন মানুষ হিসেবে পরিচিত, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদান অসীম।

আবু মোহাম্মদ খান বাবলুর এ/১২ (১৩ তলা) প্রিন্স টাওয়ারের বাস ভবনে রবিউল আলম ওবায়াদুল মোক্তাদীর চৌধুরীর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শেখ কামালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সাথী, আওয়ামী লীগ নেতা, সাবেক হাই কমিশনার মমতাজ হোসেন, রবিউল আলম চৌধুরী, আওয়ামী লীগ কর্মী হেলাল, বাংলাদেশের দুই প্রধান কবি, কবি আসাদ চৌধুরী ও কবি রফিক আজাদ। আবু মোহাম্মদ খান বাবলুর বেড রুমের তোলা ছবির পিছনে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতি

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধ ও কয়েকটি প্রবন্ধ

		পৃষ্ঠা নং
১।	মুক্তিবাহিনী থেকে বাড়ী ফেরা	৩৮
২।	দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভূতঃ রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি?	৪৮
৩।	ফখরুদ্দিনের কাছে খোলা চিঠি "শেখ হাসিনারে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখ নিও না সত্য ও ন্যায় ধর্মকে কারো না বিমুখ তব প্রসাদ হতে"।	৪৯
৪।	শেখ হাসিনা ও সাইখুল হাদিস আজিজুল হক চুক্তি বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে।	৫৬
৫।	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কথা	৬৪
৬।	বইয়ের নাম মহাভারত, প্লেটোর রিপাবলিক এবং আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ।	৭৪
৭।	স্প্রিং ১৯৭১ ডক্টর ফারুক আজিজ খানের বই স্বাধীনতার যুদ্ধের এক শক্তিশালী দলিল।	৮০
৮।	৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণে তাজউদ্দিনের অবদান।	৮৪
৯।	১৯৯২, ২৬শে মার্চ গণআদালত কাছে থেকে দেখা।	৮৮
১০।	চলমান জীবনের চালচিত্র	৯২
১১।	ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার আলবদরদের থেকেও বেশি ঘৃণিত।	৯৭
১২।	মুজিব নগর সরকারের তিনস্তম্ভ সৈয়দ নজরুল, এম মনসুর আলী, এ,এইচ, এম কামারুজ্জামান।	১০৩
১৩।	স্মৃতির পাতায় জেল হত্যাকান্ড	১১০
১৪।	স্মৃতির পাতায় জেল হত্যাকান্ড-দুই	১১৬
১৫।	১৯৯৫ সন আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কয়েকটি কথা	১২২
১৬।	চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র।	১২৫

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনী থেকে বাড়ি ফেরা

১৯৭১ সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে আমি মুক্তিবাহিনীতে ছিলাম ৬নং সেক্টরের দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী সাব-সেক্টরের অধীনে। দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী ভারত সীমান্তের বিএসএফ-এর ক্যাম্প বাংলাদেশের নীলফামারী জেলার সীমান্ত চিলাহাটির সংলগ্ন। প্রথমে সাব-সেক্টর দেওয়ানগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্পে থাকে, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই ক্যাম্পের সুনির্দিষ্ট টার্গেট পেয়ে যায় তাদের মর্টার বা কামানের, ফলে এই ক্যাম্পের ওপর যখন কয়েকদিন একনাগাড়ে কামান বা ছয় ইঞ্চি মর্টারের গোলা পড়া অব্যাহত থাকে তখন দেওয়ানগঞ্জ বিএসএফ ক্যাম্প থেকে সাব-সেক্টর প্রধান কার্যালয় হেমকুমারী বিএসএফ ক্যাম্পে সরিয়ে নেয়া হয়। এই সাব-সেক্টরে আমি কয়েকজন সাব-সেক্টর কমান্ডার পেয়েছি- প্রথমে টেনিং থেকে এসেই মাত্রকয়েক দিনের জন্য পাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন চক্রবর্তীকে, এরপরে তিন মাস সময়ের মত পাই ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর চাড্ডা (শিখ)কে, এপরে পাই মেজর ছাতুয়াল সিংকে, যুদ্ধের পরে পাই ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশীদকে। ইকবাল রশীদ সাহেব সম্ভবত নভেম্বর মাসে এই সাব-সেক্টরে যোগদান করেন এবং তিনটি কোম্পানির কমান্ডার হিসেবে প্রচন্ড সাহস ও বীরত্বের সাথে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর আমরা তখনকার রংপুর জেলার নীলফামারী মহকুমার কিশোরগঞ্জ থানা দখল করে আরও সামনে প্রধান সড়কে পাক বাহিনীর সাথে সাড়াদিন যুদ্ধ করে চলছি। মেজর ছাতুয়াল সিং-এর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বা তিনিও আমাদের সাথে পজিশন নিয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে লিপ্ত- সাথে ইকবাল রশীদসহ কয়েকশত মুক্তিবাহি-নী। ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল পর্যন্তও যুদ্ধ হয়, সন্ধ্যার একটু আগে পাক বাহিনীর সাথে গোলাগুলি বন্ধহয়ে যায়, কিছুক্ষণ পরেই আমাদের প্রতি মেজর ছাতুয়াল সিং নির্দেশ প্রদান করলেন পজিশন ছেড়ে দিয়ে পিছে গিয়ে কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে ক্লোজ বা জমায়েত হতে, সে অনুযায়ী কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে সব মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ক্লোজ বা জমায়েত হলে নির্দেশ প্রদান করলেন সবার হাতিয়ার জমা করতে এক জায়গায় বা একঘরে। সবার হাতিয়ার জমা হলে মেজর ছাতুয়াল সিং সমবেত মুক্তিযোদ্ধাদের সেই মহান সংবাদটি ঘোষণা করেন বাংলাদেশ আজাদ হয়ে গিয়েছে, পাকিস্তানী সেনাবাহিনী পরাজয় মেনে নিয়ে আজ বিকেলে মিত্র বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সাথে সাথে সমবেত মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা খুশি ও আনন্দে ফেটে পড়ে বিজয় মিছিল বের করে। এতবড় আনন্দের সংবাদে কয়েকশত মুক্তিবাহিনী উপস্থিত, কিন্তু এক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করা হয়নি, ঘোষণা দেবার পরে আমাকে মুক্তিবাহিনীর উদ্দেশ্যে কিছু বলবার জন্য মেজর ছাতুয়াল সিং আহ্বান জানান। আমার পর সেখানে উপস্থিত আমাদের ছাত্রলীগের নেতা তাজুল ভাইকে বক্তৃতা দেবার সুযোগ দিতে বলি এবং তাজুল ভাই বেশ জ্বালাময়ী আবেগদীপ্ত বক্তৃতা দেন, (রংপুর ও দিনাজপুর জেলা নিয়ে গঠিত ৬নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার খাদেমুল বাশার সাহেবের সাথে তাজুল ইসলাম স্টুডেন্ট লিয়াজো অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন মুক্তিযুদ্ধের সময়। তাজুল ইসলাম ১৯৭৩

www.pathagar.com

সালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছিলেন। এদিকে আমাদের এলাকা থেকে পাকবাহিনী সরে গেছে, সন্ধ্যায় আমরা আনন্দ মিছিল করছি, কিন্তু কিশোরগঞ্জের ৩/৪ মাইল পূর্বে তিস্তানদীর পূর্বপাড়ে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। কামান, মর্টার এলএমজি, রাইফেল ইত্যাদি অস্ত্রের দু'পক্ষ সমানে গুলি চালাচ্ছে ও প্রচন্ড শব্দ হচ্ছে। সেখানকার পাক সেনা অধিনায়ক হয় আত্মসমর্পণের খবর পায়নি,না হয় সে গো ধরেছে আত্মসমর্পণ করবে না। যতদূর মনে হয় ১৭ বা ১৮ তারিখ পর্যন্ত সেখানে যুদ্ধ হয়।

এরমধ্যেই আমরা কিশোরগঞ্জ হাইস্কুলে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে- ওদিকে পাহরা রাখতে হয়, যদি পূর্বদিক থেকে এবং চিলাহাটি থেকে পাক বাহিনী এসে আমাদের ঘুমন্ত অবস্থায় আক্রমণ করে সেজন্য। চিলাহাটি সীমান্তের কাছে হলেও পাক বাহিনীর অবস্থান সেখান থেকে সরানো যায়নি প্রচন্ড আক্রমণ করেও, কেননা পাক বাহিনী খুবই শক্তিশালী ব্যাংকার করেছিল, যার জন্য চিলাহাটিকে বাইপাস করে আমরা ডোমার থানা বাদ দিয়ে ডিমলা, জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ থানা হয়ে রংপুর শহরের দিকে এগুতে থাকি। সাথে সাথে ভারতীয় বাহিনী চিলাহাটির পাক সেনাবাহিনীর প্রতি প্রচন্ড কামান-মর্টারের গোলা ছোড়া অব্যাহত রাখে। সৈয়দপুর শহরের ওপর চলতে থাকে ভারতীয় বিমানবাহিনীর একের পর এক বোমা হামলা। ১৬ই ডিসেম্বরের আগে কয়েকদিন ধরে ভারতীয় বিমান বাহিনীর সৈয়দপুরের ওপর বোমা ফেলা অনর্গল শব্দ পাই এবং প্রথমে দেখতে পাই আগুনের শিখা তার পরে দেখতে পাই শুধু কালো ধোয়া আর ধোয়া, সৈয়দপুরের ক্যান্টনমেন্টের পাকসেনাদের এবং সৈয়দপুরের বিহারী বা অবাঙালিদের অবস্থা কি হয়েছিল তা ভাবতে এখনও আমার গা শিউরে উঠে।

১৬ই ডিসেম্বর পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও আমাদের ওপর সাথে সাথে দায়িত্ব পড়ে মুজিব নগর সরকারের নির্দেশে, বিনা বিচারে কোন লোকের যাতে শাস্তি না হয় তার ব্যবস্থা নিতে, আইন-শৃংখলা বজায় রাখতে, কোন ধরনের লুটপাট যাতে না হয় তা দেখতে এবং প্রতিরোধ করতে। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হতে হবে, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতি নিতে হবে, সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হবে, পৃথিবীর কাছে দেখাতে হবে বাংলাদেশ সরকার আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, কোন মানবতাবিরোধী আইন-শৃংখলা বিরোধী কাজের সাথে বাংলাদেশ সরকার এবং মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা জড়িত নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে যদি পাকিস্তানীরা হত্যা করে তবে তার প্রতিশোধ নিতে হবে, মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে যেতে হতে পারে তখন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আর এ দায়িত্ব পালন করতে হবে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের। কাজেই বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও আমাদের বাড়ি যাওয়া যাবেনা নীলফামারীর নর্থঘানায় চলে আসি, কুষ্ঠরোগের হাসপাতাল এলাকা, এখানেই মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প হয়, এখানেই আমি ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত থাকি)। নীলফামারী শহর দখল মুক্ত করার জন্য কোন যুদ্ধের প্রয়োজন হয়নি পাক সেনাবাহিনী সেখান থেকে আপনা আপনি সৈয়দপুর বা রংপুরে চলে যায়।

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যেদিন ফিরে এলেন, সেদিন নীলফামারী মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থেকে আমার গ্রামের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার তামাইয়ের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

চলে আসি। নীলফামারী থেকে সৈয়দপুর হয়ে রংপুর শহর পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীর একটি জীপে লিফট পাই। আমাদের এলাকায় জামতৈল-এর প্রিন্সিপাল (৭১ সালের আরও বেশ কয়েক বছর আগে অবসরপ্রাপ্ত) জহুরুল হক সাহেবের বড় ছেলে জ্যোতি ভাইয়ের বড় ভাই তরিকুল ইসলাম নীলফামারী মহকুমার মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন। তার মা-বাবা অন্যসব ভাইবোনদের সাথে আমার আগেই পরিচয় ছিল, কিন্তু ওনার সাথে পরিচয় ছিল না, এখানে এসে এসডিও সাহেবের বাসায় মিটিং-এ ইকবাল রশীদ সাহেবের সাথে মুক্তিবাহিনীর এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রথম সদস্য বা প্রতিনিধি হিসেবে আমাকে দেখে এবং আমি তার পরিবারের সব সদস্যদের চিনি, তার গ্রামের পাশে আমাদের গ্রাম একথা শুনে তিনি খুব খুশি এবং আনন্দিত হয়ে উঠেন, ফলে নীলফামারী মহকুমার তিনি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হয়ে যান, স্বয়ং এসডিও সাহেব তাকে কিছুটা তোয়াজ করে চলতে থাকেন, তাকে দিয়ে মুক্তিবাহিনীর সাহায্য সহযোগিতায় এসডিও সাহেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সুন্দরভাবে কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। তরিকুল ইসলাম এবং এসডিও সাহেব খুব ভালো লোক ছিলেন বলেই আমার মনে হয়েছে, আমাদের মুক্তিবাহিনীর ছেলেরাও খুবই ভালো ভূমিকা পালন করেছে, ফলে নীলফামারী মহকুমায় এক দুইটি বিক্ষিপ্ত দুর্ঘটনা (তাও এসব মুজিব বাহিনী কর্তৃক) ছাড়া তেমন কোন বড় ধরনের অন্যায় কাজ ১৯৭২ কালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত হয়েছে বলে আমার জানা নেই) ফলে নীলফামারী ক্যাম্পের মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আমার ভলোবাসা এবং সম্মান অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং দিন যতই যাচ্ছে ততই তাদের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা বেড়েই চলেছে। কোন ছেলে মুক্তিবাহিনীর পরিচয় দিয়ে কোন ধরনের খারাপ কাজ, কোন ধরনের মর্যাদা বিরোধী কাজ করেনি, ভেবে এখনও গর্বে আমার বুক ফুলে উঠে। আমি নীলফামারী মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পে ছিলাম, এই ক্যাম্পের নেতা পর্যায়ের একজন ছিলাম । ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের জীপ এবং কনভয়ের বহরটি যখন মহকুমা মেডিক্যাল অফিসার তরিকুল ইসলাম সাহেবের বাসার সামনে তখন আমি অফিসার লেঃ কর্নেল সাহেবকে অনুরোধ করি আমার পাশের গ্রামের পরিচিত লোক, এখান থেকে চলে যাচ্ছি একটু বলে যাই; তিনি রাজি হলেন এবং ড্রাইভারকে জীপ থামাতে বললেন, সাথে সাথে পিছনের আরও ১৫/২০টির মত জীপ এবং কনভয় থেমে অপেক্ষা করতে লাগলো। এদিকে আমি চলে যাচ্ছি শুনে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা খুব আবেগবিহ্বল হয়ে পড়লেন। বললেন-সেকি তুমি চলে যাচ্ছো? তোমার জন্য আমরা গর্ববোধ করতাম আর সাহস পেতাম, বুক ফুলিয়ে চলতাম আর তুমি চলে যাচ্ছো? অশ্যই কিছু খেয়ে যেতে হবে। আমি বললাম বাইরে আমার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর ১ জন লেঃ কর্নেল, তিন জন মেজরসহ বেশ কয়েকজন অফিসার এবং অনেক ভারতীয় সেনা অপেক্ষা করছে, তারা আমাকে রংপুর পর্যন্ত লিফট দিচ্ছেন, আমার জন্য তারা বেশিক্ষণ অপেক্ষা করবেন না। আপনার সাথে তো এখানকার মুক্তিবাহিনীর এবং নীলফামারী প্রধান ইকবাল রশীদ সাহেবের পরিচয় হয়েছে, তারা তো জানে আপনি আমার গ্রামের লোক, আমার ভাই বা আত্মীয়। কোন অসুবিধা বা কাজের প্রয়োজন পড়লে ইকবাল স্যার কে বললে সব ঠিক করে দিবেন, তিনি খুব ভালো মানুষ। কিন্তু তারা কিছুতেই কিছু না খেয়ে ছাড়বেন না, অগত্যা বসতে হলো। অল্প সময়ের

www.pathagar.com

মধ্যেই ভাবী সেমাই চা বিস্কুট তৈরি করে দিলেন, তবুও বেশ কয়েক মিনিট সময় কেটে গেল, বাইরে থেকে জীপের হর্ন মাঝে মধ্যেই বেজে উঠছিল, দুই একবার বাইরে এসে এক দুই মিনিট সময় নিয়ে আবার ভিতরে যাই- যাহোক মিনিট ১৫/২০ এর মত নষ্ট হলো, সেমাই -চা দ্রুত খেয়ে জীপে উঠে পড়লাম। আজও প্রায় ঘটনাটি মনে পড়ে, আমার মত একজন ১৭ বছরের বয়সের ছেলের জন্য ১৫/২০ টির মত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার জোয়ান ভর্তি জীপ-কনভয় প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষা করতে থাকে, আজ পর্যন্তও ঐসব অফিসার ও জোয়ানদের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে মাঝে মধ্যেই স্মৃতিপটে ভেসে উঠে।

ঐদিন রাতে রংপুরে আমাদের গ্রামের আবুল কাসেম ভাইয়ের কাপড়ের দোকনে রাত্রি যাপন করি। সকালে রংপুর থেকে বাসে রওনা দেই বগুড়ার উদ্দেশ্যে। বগুড়া থেকে উল্লাপাড়া, উল্লাপাড়া থেকে ট্রেনে জামতৈল রেল ষ্টেশনে থেকে তিন মাইল দুরে তামাই আমাদের বাড়ি। রংপুর থেকে বগুড়া পর্যন্ত আসতে অনেক সেতু পার হলাম। ঐসব ছোট বড় সকল সেতু পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দিয়েছে, পেছনে হটার সময় যাতে ভারতীয় এবং মুক্তিবাহিনী পার হয়ে তাদের আক্রমণ করতে না পারে। কিন্তু দেখলাম এবং শুনলাম এইসব ভাঙ্গা সেতু চারপাঁচ ঘন্টার মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোরের সদস্যরা পুনঃস্থাপন করেছে। রেল লাইন, লোহার টাওয়ার, লোহার পোল ইত্যাদি দিয়ে ঐসব ভাঙা সেতুর জায়গায় বিকল্প সেতু নির্মাণ করেছে এবং এইসব বিকল্প সেতু দিয়েই সামনের দিকে ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনী এগিয়ে গিয়েছে। ফলে রংপুর থেকে বগুড়া, বগুড়া থেকে উল্লাপাড়া পর্যন্ত সড়ক যোগাযোগ অতি সহজেই স্থাপন করা হয়। রংপুর থেকে বগুড়া, বগুড়া থেকে চান্দাইকোনা পর্যন্ত বাসে এলাম। চান্দাইকোনা থেকে উল্লাপাড়া পর্যন্ত কোন বাস পাই না; সেদিন আর কোন বাস চলবে না। অগত্যা আর কি করা উল্লাপাড়ার উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে ব্যাগ এবং বিছানাপত্র মাথায় নিয়ে রওনা দিলাম। প্রায় ২০ মাইলের মত পথ। মাইল দুই তিন হাঁটার পর মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং ক্যাম্পে (ভারতের নেপাল ও তিব্বত সীমান্তের কাছে সুউচ্চ হিমালয়ের পাদদেশে পাহাড়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মূর্তি ক্যাম্প ছিল আমাদের ট্রেনিং সেন্টার) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের অফিসারগণকেও আমরা এখানে পাই ট্রেনিংরত অবস্থায়। শেখ কামাল ভাইও এই অফিসারদের সাথে, ট্রেনিং নেন, তার সাথে আগে অল্প পরিচয় ছিল, এখানে তার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং সুসম্পর্ক হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের অফিসারদের মধ্যে যাদের সাথে ট্রেনিংরত অবস্থায় পরিচয় হয় তাদের একজন দেখি উল্লাপাড়ার দিক থেকে জীপ চালিয়ে চান্দাইকোনার দিকে যাচ্ছেন। আমাকে বোঝা মাথায় হেঁটে যেতে দেখে তিনি জীপ থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন আমি এখানে কিভাবে এবং কোথায় যাচ্ছি, বললাম বাড়ি যাচ্ছি। উল্লাপাড়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে সেখান থেকে ট্রেনে জামতৈল যেতে হবে, সেখান থেকে তিন মাইল দূরে আমার বাড়ি। উল্লাপাড়া পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবার কথা চিন্তা করে তিনি দয়ার্ত হয়ে আমাকে জীপ ঘুরিয়ে প্রায় ২০ মাইলের বেশি রাস্তা তার জীপে লিফট দিলেন। সে সময়ে পেট্রোলের ভীষণ অভাব, রাস্তাঘাট ভাঙা। সেই অবস্থায় তিনি আমাকে উল্টা পথে লিফট দিলেন। গাড়িতে উঠে দেখলাম ভদ্রলোকের মন বেশ খারাপ (ভদ্রলোক না বলে তরুণ

www.pathagar.com

যুবক বলা ভালো, কেননা তখন তার বয়স ২০/২১ বছর, লম্বা ফর্সা দারুণ সুন্দর দেখতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন) কি যেন তার একটা পারিবারিক সমস্যা হয়েছিল। এরপরেও তিনি আমাকে এত লম্বা রাস্তা উল্টা পথে লিফ্‌ট দিয়েছিলেন। তার কথা বা তার মুখটা মনে পড়লেই কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠে। এরপর আর ঐ অফিসার ভদ্রলোকের সাথে দেখা হয়নি। তাকে একবার দেখবার জন্য ভীষণভাবে প্রাণটা ছটফট করে। নিশ্চয় এখন তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার কর্ণেল পর্যায়ের চাকরি করেন। নাকি কোন দুর্ঘটনায় চাকরি থেকে সরে গিয়েছেন বা মৃত্যুবরণ করেছেন? জানি না, আমি একবার তাকে দেখতে চাই, কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই। আমার বিশ্বাস তিনি ভালো আছেন এবং সেনাবাহিনীতে সুনামের সাথে চাকরি করছেন। তার সাথে আমার আবার অবশ্যই দেখা হবে।

উল্লাপাড়া এসে শুনি ট্রেন আসবে কিনা তার ঠিক নেই। অতএব ঘন্টাখানেক উল্লাপাড়া প্লাটফরমে অপেক্ষা করে আবার রেল লাইন ধরে পায়ে হাঁটা শুরু করলাম জামতৈল হয়ে তামাইয়ের উদ্দেশ্যে। পায়ে হেঁটে উল্লাপাড়া সলপ এর মাঝখানে করতোয়া নদীর ওপরে ঘাইটনার ব্রিজের ওপর দিয়ে যখন হাঁটছি তখন পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়েছে। একজন লোক রেডিও নিয়ে হাঁটছে। তার রেডিওতে শুনলাম নতুন মন্ত্রী পরিষদ হচ্ছে, মন্ত্রীরা শপথ নিচ্ছে, বঙ্গবন্ধু প্রেসিডেন্ট পদ হতে পদত্যাগ করেছেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। আবু সাঈদ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট, তাজউদ্দিন সাহেব আর প্রধানমন্ত্রী নেই। মনে বিরাট হোঁচট লাগলো। সেকি প্রেসিডেন্ট তো বড় পোস্ট, প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে মানসম্মান বেশি, তবুও বঙ্গবন্ধু কেন প্রেসিডেন্ট না থেকে প্রধানন্ত্রী হচ্ছেন? মনটা আসলেই খুব খারাপ হয়েছিল। কিন্তু বেশক্ষণ মন খারাপ থাকতে পারলো না, ব্রিজ পার হবার কিছু পরেই পেছনের দিকে ট্রেন আসবার শব্দ শুনলাম। অতএব সামনে দৌড়াতে হবে, দৌড় আর দৌড়। স্টেশনে ট্রেন আসবার আগেই পৌঁছতে হবে। যাক ট্রেন আসবার আগেই স্টেশনে কোনক্রমে পৌঁছলাম। সাথে সাথে ট্রেন এলো, উঠে পড়লাম। তিন-চার মিনিটের মধ্যে জামতৈল রেল স্টেশনে এসে নেমে পড়লাম। আহ্ আবার আমার প্রিয় জামতৈলে ফিরে এলাম। এই জামতৈল দিয়েই আট মাস আগে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে ট্রেনে চরে উল্লাপাড়া নেমে বগুড়া, রংপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারীর ডোমার, মির্জাগঞ্জ, ঠাকুরগঞ্জ হয়ে ভারতে গিয়ে হলদিবাড়ি থেকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করি। আবার সেই জামতৈলে ফিরে এলাম। জামতৈল আমাদের রেল স্টেশন, এখানে বহু ঘটনা, বহু স্মৃতির সাথে আমি জড়িত। জামতৈল নেমে দেখি আমার ছোট ভাই শওকত আমার বাই-সাইকেল নিয়ে অপেক্ষা করছে, সে তখন ক্লাস সিক্স-এর ছাত্র, কয়েকদিন ধরে রেল স্টেশনে সে সাইকেল নিয়ে আসছে আর অপেক্ষা করছে, আবার ফিরে গেছে আমার জন্য, আমি ফিরে আসবো বলে। সাইকেলে উঠে প্রায় ১০/১৫ মিনিটের মধ্যে জামতৈল থেকে তামাই চলে এলাম বাড়িতে প্রায় আটমাস পরে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সীমান্ত অঞ্চলে দিনে-রাতে সমানে যুদ্ধ করেছি পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। দু'মাস কঠোর পরিশ্রমের সামরিক এবং গেরিলা ট্রেনিং নিয়েছি, ১৫ দিন অস্ত্র ছাড়া শারীরিক ট্রেনিং নিয়েছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের কাছ থেকে। বাড়িতে এসে দেখি মা মাগরেবের নামাজ পড়ছেন। নীলফামারী

www.pathagar.com

মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের প্রধান ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট ইকবাল রশীদ, এয়ার ফোর্সের লোক হয়েও অংশগ্রহণ করেন সামনাসামনি যুদ্ধে। একজন অসাধারণ সৎ এবং ভালো মানুষ হিসেবে তাকে পেয়েছিলাম নীলফামারীর ক্যাম্পে। নীলফামারী মুক্তি বাহিনীর ক্যাম্প পরিচালনার জন্য তিনি আমাকে তার উপ বা সহকারী প্রধান হিসেবে নিয়োজিত করেন। তার কোয়ার্টারের তার পাশের রুমেই আমি থাকতাম। ভারত সরকার বা ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রদত্ত টাকা ও রেশন এসব আমার তত্ত্বাবধানেই খরচ হতো। যেদিন চলে এলাম সেদিন ইকবাল স্যারকে সব বুঝিয়ে দিয়ে এলাম; তিনি আমাকে ভারতীয় টাকার একশ' টাকা দিলেন। ঐ টাকা নীলফামারী বাজার থেকে আমার এক ৫/৬ বছরের ছোট বোনের জন্য বিশ টাকা দিয়ে একটি সেট (ছোট মেয়েদের পোশাক) কিনে ক্যাম্পে এসে দেখি ভারতীয় সেনাবাহিনীর দু'জন ক্যাপ্টেন বারান্দায় বসে রয়েছেন। আমি ক্যাম্প ত্যাগ করে বাড়ি যাচ্ছি, কি কিনলাম দেখতে চাইলেন। আমি দেখালাম ছোট মেয়েদের জন্য একটি পোশাক। এটা দেখে একজন অপরজনের দিকে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকলেন। কিছুক্ষণ দু'জন নিরব হয়ে গেলেন। এরপরেই স্বাভাবিক হয়ে হিন্দি এবং ইংরেজিতে বললেন "বাবলু তুমি খুব ভালো ছেলে, তুমি কয়েকদিন বাড়িতে থেকে অবশ্যই আবার ফিরে আসবে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যোগদান করবে, তোমাদের মত ভালো ছেলেরা যদি আজাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে না থাকে তাহলে খুব ক্ষতি হবে, অবশ্যই তুমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে আবার ফিরে আসবে।" আমি বললাম আমি ছাত্র, কলেজে যেতে হবে, লেখাপড়া শিখতে হবে। আর সেনাবাহিনীতে যোগদান করে কি হবে, আর তো কারোও সাথে যুদ্ধ করতে হবে না। এছাড়া আমি ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত, ভবিষ্যতে বড় হয়ে রাজনীতি করতে চাই ইত্যাদি। যাক পরে তারা ঐ ক্রয়কৃত পোশাকের দাম বিশ টাকা দিতে চান দু'জনে এক সাথে, আমি প্রচন্ড আপত্তি করি। কিন্তু তারা বেশ মন খারাপ করে অর্ডার এবং ধমকের সাথে যখন বললেন তখন যে ক্যাপ্টেন সাহেব আমাদের ক্যাম্পে থাকতেন লেঃ নরেন্দ্র সিংহ তার কাছ থেকে বিশ টাকা নেই, সৈয়দপুর থেকে যিনি বেড়াতে এসেছিলেন তার কাছ থেকে টাকা নেইনি। পরে ঐ একশ' ভারতীয় টাকা সম্বল নিয়েই ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকা চলে আসি। ঐ দু'জন ক্যাপ্টেনের কথাও প্রায়ই মনে পড়ে। দেওয়ানগঞ্জ, হেমকুমারী, নীলফামারী সাব-সেক্টর সদর দপ্তর বা ক্যাম্পের কথা বলতে গেলে একজন লোকের কথা উল্লেখ না করলে তার প্রতি অবিচার করা হবে। তারনাম লুৎফর রহমান, সম্ভবত ভদ্রলোকের বাড়ি লালমনির হাটে- এই সাব-সেক্টরের সদর দপ্তরের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রাণপুরুষ, ফর্সা-লম্বা মানুষ। মুক্তি বাহিনীর সদস্যদের থেকে বয়সে বেশ কয়েক বছর বড় ছিলেন, হাসিখুশি আনন্দপ্রিয় মানুষ, সব ছেলেদের মাতিয়ে রেখে, ভালোবেসে উৎসাহ উদ্দীপনা দিয়ে কঠোর দায়িত্ব পালন করিয়েছেন। জানি না সেই লুৎফর রহমান সাহেব কোথায় আছেন, তার কথাও খুব মনে পড়ে।

বৃহস্পতিবার, ২২শে ডিসেম্বর ১৯৯৪ সনে দৈনিক সংবাদে সাময়িকীতে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভূত : রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি ?

গত ২৫ শে ফেব্রুয়ারি (১৯৯২) বুধবার ঢাকার দামী একটি হোটেলে মুসলিম লীগের ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, এই সম্মেলনে বক্তাদের প্রদত্ত বক্তৃতা ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখের ঢাকার বেশ কয়েকটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ হয়েছে। সব কাগজের প্রকাশিত রিপোর্ট মোটামুটি একই ধরণের। ঐ সম্মেলনের প্রকাশিত রিপোর্ট দৈনিক ইত্তেফাক অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিস্তারিতভাবে ছেপেছে। ২৬ শে ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাক সবার আগে আমার সামনে পড়ে এবং মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তাদের বক্তৃতা ইত্তেফাকের মাধ্যমে পড়ি। বক্তাদের বক্তৃতা পড়ে ব্যথায় বুকটা ভেঙ্গে পড়ে এবং ক্ষোভে দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি। সাথে সাথে অনেক কথা অনেক ঘটনা অনেক স্মৃতি মনের পাতায় এলোমেলোভাবে একের পর এক ভেসে উঠতে থাকে।

গত ২০/১/৯২ তারিখে পরম শ্রদ্ধেয় কবি-লেখক ও সুসাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায়কে আমি একটি পত্র লিখি তিনি অনুগ্রহ করে আমার পত্রের জবাবে ৬/২/৯২ তারিখে একটি পত্র পাঠান, যা ২৩/২/৯২ তারিখে আমার হাতে আসে। মুসলিম লীগের সম্মেলনের বক্তাদের বক্তৃতা পড়ে শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায়ের লিখিত চিঠির কথা হৃদয়ে বারেবারে আঘাত করতে থাকে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ কোথায় যাচ্ছি, আমাদের ভবিষ্যৎ কি? রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ আসলেই কি খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে? পাঠক/পাঠিকাদের সুবিধার জন্য চিঠিটির প্রায় সবটুকু এখানে তুলে দিচ্ছি–

কল্যাণীয়েসু–

বাবলু তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এতদিন তুমি চিঠি লেখ নি কেন তা নিয়ে চিন্তিত ছিলুম। গণতন্ত্র তোমরা অনেক সংগ্রামের পর ফিরে পেয়েছো। কিন্তু গণতন্ত্র লালনের অভিজ্ঞতা একদিনে বা এক বছরে বা এক পুরুষে হয় না। Eternal vigilance is the price of liberty" এর মানে গণতন্ত্রকে বজায় রাখার জন্য সর্বক্ষণ সজাগ থাকতে হবে। এ কাজটা কেবল রাজনীতিবিদদের নয়, তোমার আমার মতো লেখকদেরও। বাংলাদেশের সাংবাদিকগণ যদি সজাগ থাকেন তবে নিয়মিত নির্বাচন হবে। নির্বাচিত জন প্রতিনিধিরা সংবিধান মেনে কাজ করবেন, সরকারি আমলারা আইন ও শৃংখলা রক্ষা করবেন, তবে মানুষ মাত্রেই ভুলচুক হয়, ভুলচুক ইংল্যান্ডে হচ্ছে, ফ্রান্সে হচ্ছে, ভারতেও হচ্ছে বাংলাদেশও হচ্ছে, তোমার ভোট অধিকার যেনো কেউ কেড়ে না নেয়। তোমরা ভোট দিয়ে তোমাদের সংসদ গঠন ও বদল করতে পারবে।

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি চিফ জাস্টিস শাহাবুদ্দিন সাহেবের উপর আমার অশেষ শ্রদ্ধা। একজন মানুষের মতো মানুষ বটে। তিনি যা করে গেলেন তা চিরকাল মনে রাখবার

www.pathagar.com

মতো। যেদেশে এমন নিরপেক্ষ ন্যায় পরায়ণ নির্ভীক নির্দোষ সদাশয় ব্যক্তি ঐ পদে অধিষ্ঠিত সেদেশের উন্নতি হবেই। বেগম খালেদা জিয়াও মনে মনে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র স্বীকার করায় আমি তারও প্রশংসা করি। এর জন্য তিনি তার প্রতিপক্ষ শেখ হাসিনার মূল দাবিও মেনে নিলেন। একটা মস্তবড় বিরোধ কত সহজেই মিটে গেল। অধিকাংশ লোক যাকে চায় তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন। এরশাদ সাহেবকে চাইলে তিনিও প্রধানমন্ত্রী হবেন। শেখ হাসিনাকে চাইলে তিনিও প্রধানমন্ত্রী হবেন। তোমাকে অধিকাংশের রায় মেনে নিতে হবে।

একটি জাতির একাধিক পরিচয়। সে ধর্মে মুসলমান, জন্মসূত্রে বাঙ্গালি, কর্মসূত্রে চাষি, মতবাদে কমিউনিস্ট হতে পারে। কিন্তু এমনি (খালি চোখে) আমরা কেবল মুসলমানদেরকেই দেখতে পাই।

(বাংলাদেশের লোক ধর্মভীরু) তাই ধর্মের নামে ভোট চাইলে সেই দলই জয়ী হয়, যার প্রধান পরিচয় ধর্মীয় পরিচয়। গত ১৯৪৬ সালে মুসলিমলীগ ধর্মের ধুয়ো ধরে জিতে গেল। পরিণামটা ঘটলো ১৯৭০-৭১ সালে যখন ন্যায়ের পরিচয়কে মুখ্য পরিচয় করে আওয়ামী লীগ জিতলো ও পরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত করলো। দুঃখের বিষয় আওয়ামী লীগ ন্যায়ের ভিত্তিতে অটল থাকতে পারলো না। বাংলাদেশ গিয়ে দেখলুম জয় বাংলা বলে ধ্বনি দিয়ে সাড়া পান নি শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং। জেনারেল জিয়াউর রহমান তো সোজাসুজি ধর্মকে ফিরিয়ে আনলেন। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ভারতেও দেখা যাচ্ছে হিন্দু ধর্মের জয়ধ্বনি ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি চারটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। তবে এখানে বাবরি মসজিদ ভাঙতে বা হটাতে পারে নি। ভারত সংসদ তা হতে দেবেন না। আমরাও সজাগ রয়েছি। তুমি মালিকান্দা গিয়েছিলে জেনে বিশেষ আনন্দিত হয়েছি। তুমি শুনে দুঃখিত হবে যে গত ৯ই জানুয়ারি আমার অপারেশন হয়। এখনো আমি বাড়ির বাইরে চলাফেরা করতে পারি নে। আগেতো খুব জোরে জোরে হাঁটতুম, সে জোর কি আর ফিরে পাব? এখন মনের জোরই ভরসা। শতবর্ষ পরমায়ুরলগ্ন আমার নেই। যতদিন আমার আছে ততদিন আমার বাঁচার ইচ্ছা। স্নেহ জেনো,

ইতি : **অন্নদা শঙ্কর রায়**

এই হলো ৮৯ বছর বয়স্ক একজন বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান লেখকের চিঠি। এই চিঠির দু'টি বক্তব্য আলোচ্য বিষয়ে খুবই প্রণিধানযোগ্য, তার একটি হলো ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ ধর্মের ধুয়ো ধরে জিতে গেল। পরিণামটা ঘটলো ১৯৭০-৭১ সনে। দ্বিতীয়টি হলো ভারতেও হিন্দুধর্মের জয়ধ্বনি ধরে ভারতীয় জনতা পার্টি চারটি রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। তার মানে ১৯৯১ সনের ২৭ ফেব্রুয়ারি যে ধর্মের জিকির তুলে সাম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রদান করে, মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ক্ষমতালোভী চক্র যেভাবে ভোটে জয়লাভ করেছে তার পরিণাম ভোগ করতে ২৪ বৎসর অপেক্ষা করতে হবে? আমার এক বন্ধু আনোয়ার কামালের বক্তব্য ২৪ বৎসর লাগবে না– খুব বেশি হলে দশ বছর। ফলাফলটা কি দ্বিজাতি তত্ত্ব "হিন্দু মুসলমান দুই জাতি, দুই জাতি কোনও দিন একসাথে থাকতে পারে না।" মুসলিম লীগের নেতাদের বক্তব্য ঃ তা হলে আমরা সেই

www.pathagar.com

১৯৪৭ সনে আবার ফিরে যাচ্ছি– হিন্দুর জন্য হিন্দুস্থান মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। আর বাংলাদেশ তো সাবেক পাকিস্তানেরই অংশ। কাজেই বাংলাদেশ মুসলমানের জন্য হিন্দুর জন্য নয়। মুসলমানের একক কর্তৃত্ব মেনে যদি কেউ থাকো ভালো, না থাকলে হিন্দুর স্থান হিন্দুস্থানে যাও। কেননা হিন্দু মুসলিম দুইজাতি একসাথে সহ অবস্থান চলবে না। তখন ভারতের জন্যও তাই, হিন্দুর জন্য হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানে কেউ যদি থাকতে চাও রামকে অবতার এবং জাতীয় নেতা মেনে থাকতে হবে। আদভানী তথা ভারতীয় জনতা পার্টির এ ঘোষণা বাস্তবে বাস্তবায়িত করতে সুবিধা হবে। হিন্দুস্থানে কোনো অহিন্দু রাখা হবে না। হিন্দুস্থানের অহিন্দু ১৪ কোটি মুসলমান কোথায় যাবে? কেন ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশ? এদেশ তো মুসলমানের জন্য অমুসলিম বা দেড় দু'কোটি হিন্দু বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে গেলেই তো ভারত থেকে অহিন্দু বা মুসলমান বিতাড়ন করতে ভারতের সাম্প্রদায়িক শক্তির পথ সোজা হবে। আমরা ২ কোটি হিন্দু রপ্তানী করবো এবং ভারত থেকে ১৪ কোটি মুসলমান আমদানী করবো। আর ৫৫১২৬ বর্গ মাইল জায়গাতে তো আমরা বারো কোটি আছিই। তাহলে ৫৫১২৬ বর্গ মাইল যায়গায় ১০+১৪ কোটি মোট ২৪ কোটি মানুষ, আর দশ বৎসরে আরও কমপক্ষে ১২ কোটি মুসলিম জন্ম নিবে, মোটামোটি যদি দ্বি-জাতি তত্ত্ব মেনে নেওয়া হয় তবে ২০০২ সালের আগেই এ ভূখণ্ডের জনসংখ্যা হবে ৪০ কোটির মতো; বেশ ভালোই হবে, এর মধ্যে অবাঙালি উর্দুভাষীর সংখ্যা হবে প্রায় সমান সমান। রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হবে, না বাংলা হবে তা এখনই মুসলিম লীগ নেতা ও দ্বি-জাতি তত্ত্বের কর্মী সমর্থকদের কাছ থেকে ঠিক করে নেওয়া উচিত। ১২ কোটি মানুষের পদভার এই ছোট দেশটি সইতে পারছে না-অনাহার অর্ধাহার সহ শত সমস্যায় জর্জরিত। কথা উঠতে পারে আমরা ভারত থেকে আরও জমি নেবো। বেশ ভালো কথা তবে জেনে রাখা ভালো "বল যার ভূমি তার", "শক্তি যার মাটি তার", কাজেই যার বল যার শক্তি তারই মাটি হবে এটা অতি সাধারণ সত্যি কথা।

যেভাবে সাম্প্রদায়িকতা ও নির্লজ্জভাবে পাকিস্তান প্রীতি, যেভাবে পাকিস্তানের ক্রিকেট টিমকে এদেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষ সমর্থন করে তা দেখে আঁৎকে উঠি-হায় একি দেখি, একি শুনি। ১৯৭১ সনে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে অস্ত্রহাতে যুদ্ধ করেছি- আজ মনে হয় ভুল হয়েছে। এদেশের ব্যাপক মানুষ স্বাধীনতার যোগ্য নয়। অবাঙালী বিহারিদের লাথি এবং চাপট খাওয়ার যোগ্য। ১৯৭১ সনে যে রক্তপাত যে তাণ্ডব যে দাউ দাউ আগুনের শিখায় জ্বলে বাংলাদেশ জন্ম নিলো-সেই স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে বক্তারা বলতে সাহস পায় দ্বি-জাতি তত্ত্ব মিথ্যা নয় সত্য, হিন্দু মুসলমান একসাথে থাকতে পারে না। আর এসব কথা বলতে পারছে ১৯৯১ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারির ভোটের ফলাফলের জন্য। ঐ ফলাফলে যাদের আজ রাজ ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের উস্কানী উৎসাহ বা নীরবতার ফলে বাংলাদেশে কোথায় যাবে তা নিয়ে ভাবতে হবে। কিন্তু কে ভাববে? যারা সমাজের প্রাণ-ছাত্র-শিক্ষক-সাংবাদিক যুবশক্তি বুদ্ধিজীবী শ্রেণী? এরাও তো আজ বিশুদ্ধ নয়-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত-অসৎ পথে অর্থ উপার্জনে রত (সম্মানজনক ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সংখ্যায় মনে হয় খুবই অল্প)। তাহলে এদেশের ভবিষ্যৎ কি? আজ শ্রদ্ধেয় ডক্টর মরহুম এনামুল হক সাহেবের একটি বক্তৃতার

www.pathagar.com

কথা খুবই মনে পড়ছে। ১৯৭৫ সনের ১২ অথবা ১৩ই আগস্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন "বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এ নিয়ে উল্লাসিত হবার তেমন কোনো কারণ নেই, কেননা ইতিহাস পড়লে দেখা যায় বাংলাদেশ এরকম স্বাধীন অতীতে অনেকবার হয়েছে, অনেকবার আবার পরাধীন হয়েছে। কাজেই আর যাতে পরাধীন না হয় তার জন্য চেষ্টা করতে হবে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।" এনামুল হক সাহেবের এ বক্তৃতার কয়েকদিন পর ১৫ই আগস্ট নেমে আসে। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে বিষয়টির উল্লেখ করছি যে এনামুল হক সাহেব অনেক বড় পণ্ডিত ছিলেন তা আমরা অনেকেই জানি। তিনি ছাত্র হিসেবেও বিরল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তা মনে হয় আমরা অনেকে জানি না। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত একটি বই গত বছর পড়েছিলাম যার নাম "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ৫০ বৎসর" ঐ বইতে ৫০ বছরে যারা বাংলা বিভাগে ছাত্র ছিলেন এবং পাশ করেছেন তাদের নাম ঠিকানা রয়েছে– তাতে দেখলাম ঐ ৫০ বছরে মুসলমানদের মধ্যে থেকে একজনই ১ম শ্রেণীতে এবং ২য় শ্রেণীর শীর্ষে রয়েছেন তিনি ড. এনামুল হক। সেই ১৯৩০ সনের গোড়ারদিকে আর কোনও মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর নাম লিস্টের প্রথম দিকে নেই। ২৬শে ফেব্রুয়ারির ইত্তেফাকে মুসলিম লীগ নেতাদের বক্তৃতা পড়ে এনামুল হক সাহেবের ১৯৭৫ সনের বক্তৃতার কথা বারবার মনে পড়ছে। জানি না জননী জন্মভূমি আমার প্রিয় বাংলাদেশের কপালে ঈশ্বর কি লিখেছেন। লক্ষণ শুভ মনে হয় না। আমরা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দেই, কোরান শরীফকে আমাদের অবশ্য পালনীয় গ্রন্থ বলে অহরহ বলি, কিন্তু আসলে আমরা তা আমল করি না। কেননা কোরআন শরীফে স্পষ্টভাবে বলা রয়েছে "তোমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না কেননা তোমাদের পূর্বে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে অনেক জাতি ধবংস হয়ে গিয়েছে।" তবুও আমরা ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করি। ধর্ম ভালো জিনিস খারাপ নয়- ইসলামসহ সব ধর্মের মূলস্তম্ভ হচ্ছে– ১। স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে তার নিকট আত্মসমর্পন করা, ২। কোনো মানুষের কোনো ধরণের বা সূচাগ্র পরিমাণ ক্ষতি না করা ৩। জবান বা চুক্তিমতো কাজ করা ৪। সহজ-সরল পাক পবিত্র জীবন যাপন করা, ৫। সত্যবাদী হওয়া, কোনও ক্রমেই মিথ্যা কথা না বলা।

কাজেই ধর্মের এসব মূল বিষয় মেনে চললে কারও ক্ষতি নাই বরং মানুষ এবং মানব সমাজের উপকার হয়। কিন্তু ধর্মের নামে হানাহানি মারামারি, ভেদাভেদ সৃষ্টি করা কত বড় যে পাপের কাজ তা আমরা সহজে বুঝতে চাই না। পাপ বাপকে ছাড়ে না পাপের শাস্তি অনিবার্য।

দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ বিশেষ করে তরুণ ছাত্র সমাজের কাছে আবেদন– ধর্মের নামে রাজনীতির অঙ্গনে দ্বি-জাতি তত্ত্বের নামে যে সর্বনাশা আলামত দেখা দিচ্ছে তাকে নির্মমভাবে প্রতিহত করা দরকার নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। ১৯৭১ সনের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধকে সম্মান ও ভক্তি করতে হবে, দ্বিধাহীনভাবে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে হবে– তাজউদ্দিন, শেখ মুজিব, সৈয়দ নজরুল, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামানকে। শ্রদ্ধাভক্তি করতে হবে স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের। ঘৃণা করতে হবে যারা মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে তাদের, যারা দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা বলে তাদের। ইতিহাস বলে এক হাজার বছর হিন্দু মুসলমান এদেশে এবং ভারতবর্ষে একসাথে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান করেছে কোনও গোলমাল কোনও অশান্তি হানাহানি হয় নি ১৯০৫ সন পর্যন্ত। মুসলিমরা এদেশে আসবার সময় থেকে শুধুমাত্র ফারুক শিয়ার যখন সম্রাট ছিলেন তখন একবার মাত্র গুজরাটে ও কাশ্মীরে গরু জবাই ও হোলি খেলা নিয়ে হিন্দু মুসলিম সামান্য কলহ হয়েছিল। এছাড়া মুসলিম আগমন থেকে ১৯০৫ সন পর্যন্ত ভারতে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে কোনো সামান্যতম সংঘাত হয় নাই। দ্রষ্টব্য : কাজী আব্দুল ওয়াদুদের শান্তি নিকেতনে ১৯৩৫ সনের ২৬ মার্চ নিজাম বক্তৃতামালায় প্রদত্ত মুসলমানের পরিচয় ১৯০২ সনে ভারতে যখন অনুশীলন, যুগান্তর স্বদেশী আন্দোলন গড়ে উঠে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তখনই সুচতুর ইংরেজরা উস্কানী দিয়ে হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ সৃষ্টি করে সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ রোপণ করে। যার ফলাফল আমরা হাড়েহাড়ে টের পেয়েছি। বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলিম, বাংলার খ্রিস্টান, বাংলার বৌদ্ধ আমরা সবাই বাঙালী এটাই ছিল ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূলমন্ত্র। জয় বাংলা ছিল আমাদের প্রধান বাহন। এ মন্ত্র ও এ বাহন থেকে দূরে এসে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হবে বলে আমার বিশ্বাস। আর দ্বি-জাতি তত্ত্ব সত্য হলে ৫৫, ১২৫ বর্গ মাইল যায়গায় অল্পদিনের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ কোটি লোকের বসতি গড়ে তোলার জন্য মনমানসিকতা নিয়ে তৈরি থাকতে হবে। ২৭/২/১৯৯২ লিখিত

১১/৩/১৯৯২, বুধবার দৈনিক বাংলার বাণীতে প্রকাশিত

www.pathagar.com

জনাব ফখরুদ্দিন আহমদের কাছে বিনীত আবেদন :- "শেখ হাসিনারে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখ নিও না, সত্য ও ন্যায়ধর্মকে করো না বিমুখ তব প্রাসাদ হতে"

বাংলাদেশের গত ৩৬ বছরের ইতিহাসে ১১ই জানুয়ারি ২০০৭ একটি অন্যতম গৌরবময় দিন। এই দিনে এ দেশের স্বৈরাচারী লুটেরা অপশক্তির প্রতিভূদের পরাজয় ঘটে, প্রতিষ্ঠিত হয় জনাব ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে এই সরকারের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষকলীগ, মহিলা আওয়ামী লীগের হাজারো লক্ষ নেতাকর্মী চরম ত্যাগ ও কষ্ট করে আন্দোলন করেছে। এই আন্দোলনে অনেক আওয়ামী লীগ সমর্থক নেতাকর্মী নির্মমভাবে নিহত ও আহত হয়েছে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণও এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে খালেদা জিয়া তথা বিনএপির তাবেদার ইয়াজুদ্দিন সরকারের পতন কামনা করেছেন। অবশেষে আন্দোলনকারীদের বিজয় হয়েছে, দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জয় হয়েছে। শেখ হাসিনার আন্দোলনের জন্য দেশের এবং বিদেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের বা শক্তির সহযোগিতায় চোর, ডাকাত, লুটেরা, বিএনপি তথা খালেদা জিয়ার সাঙ্গপাঙ্গদের পতন হয়।

বর্তমান সরকার কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে দৈনিক সংগ্রামের ২২শে জুন শুক্রবারের সংখ্যায় জামাতে ইসলামীর নেতা গোলাম আযম সাহেব লিখেছেন- "শেখ হাসিনা যদি ২০০৭ সনের ২২শে জানুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য নির্বাচন বর্জন না করতেন, তাহলে বর্তমান সংকট সৃষ্টি হতো না। তিনি নির্বাচন বর্জন করায় বিদেশী কূটনীতিকগণ এমনকি স্বয়ং জাতিসংঘ ঐ নির্বাচন বাতিল করতে বাধ্য করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে নির্বাচন হবে কি হবে না তা শেখ হাসিনার মর্জির উপর নির্ভর করে। আমেরিকা, ইউরোপ ও এমন কি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল পর্যন্ত শেখ হাসিনার পক্ষে রয়েছেন।" যদিও জনাব গোলাম আজম সাহেব অভিমান ও যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করে উপরে বর্ণিত বক্তব্য প্রকাশ করেছেন তাহলেও, গোলাম আযম সাহেবের এ বক্তব্য পুরোপুরি সত্য।

শেখ হাসিনার আন্দোলনের জন্য আমেরিকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতিসংঘের মাননীয় সেক্রেটারি জেনারেলের সহযোগিতায় ইয়াজুদ্দিনের নেতৃত্বে দানব এবং ষড়যন্ত্রকারী শক্তির পতন ঘটান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে। এর জন্য তারা দেশের মানুষের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন। মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সম্মান জানিয়ে বর্তমান সরকার বেশ কিছু ভালো কাজ করেছেন। যেমন বেশ কয়েকজন রাজনীতির নামে লুটেরা ডাকাতকে গ্রেফতার করেছেন, নির্বাচন কমিশন থেকে আজিজ ও তার দালালদের সরিয়ে দল নিরপেক্ষ ভালো লোকদের নিয়ে নির্বাচন

www.pathagar.com

কমিশন করেছেন। বেশকিছু সরকারি খাস জায়গা জমি উদ্ধার করা হয়েছে। চাঁদাবাজী, মাস্তানী, টেন্ডারবাজী প্রায় বন্ধ হয়েছে। বেশ কিছু রাজনৈতিক ডাকাতদের গ্রেফতার করা হয়েছে, যা খুবই প্রশংসনীয় ব্যাপার।

কিন্তু এসব কিছু ভালোভাবে চললেও মনে হয় বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক আকাশের ঈশান কোণে এক কালো হিংস্র মেঘের থাবা বিস্তার করে চলছে, যার পরিণতি খুবই অশুভ ও অন্যায় বলে মনে হচ্ছে। আর এই অশুভ হিংস্র ষড়যন্ত্রকারী অন্যায়কারী অপশক্তি হচ্ছে তারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে লেগেছে যারা। বর্তমান সরকারের দু'একজন উপদেষ্টা, দু'একজন সচিব, দু'একজন সামরিক বাহিনীর অফিসার অতি লোভের বশবর্তী হয়ে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা দিয়ে এবং আওয়ামী লীগের পুরানো দাগী অপরাধী চক্রের মাধ্যমে সংস্কারের কথা বলে।

ষড়যন্ত্রকারী এসব প্রশাসনের কর্তাদের জানা উচিত ন্যায়, সত্য ও ধর্মের বিজয় দুনিয়ায় কোনোদিন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারে নাই। অন্যায়কারী, মিথ্যাবাদী, অত্যাচারী, জুলুমবাজ শক্তিকে আল্লাহ এবং দুনিয়ার কোনো ভালো মানুষ সমর্থন করে না, এদের পতন এবং ধ্বংস অনিবার্য। তবে এরা সাময়িকভাবে মানুষের বেশ কিছু ক্ষতি করে যায়। শেখ হাসিনার আন্দোলনের ফসল বর্তমানের ফখরুদ্দিন সাহেবের সরকার। সেই শেখ হাসিনার বিরুদ্ধেই ফখরুদ্দিন সাহেবের প্রশাসনের কেউ কেউ ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলা দিয়ে চলেছেন তাকে জেলে নেবার জন্য এবং আওয়ামী লীগের চিহ্নিত অপরাধী চক্রকে উস্কানি দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব থেকে শেখ হাসি-নাকে অপসারণের জন্য।

কিন্তু ঐ ষড়যন্ত্রকারীদের স্মরণ করা উচিত আমাদের ইসলাম ধর্মে মিথ্যামামলা করাকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখা হয়। পবিত্র কোরানে মিথ্যা মামলা করা ও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াকে খুবই কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। মিথ্যা মামলা করা ধর্মের চোখে এবং দেশের আইনের চোখে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। শেখ হাসিনার নামে আজ ২২/০৬/০৭ ইং তারিখ পর্যন্ত ফখরুদ্দিন সাহেবের সরকার যে কয়টি মামলা দায়ের করেছে তার প্রথমটি হলো– পল্টনে খুনের অপরাধে। দ্বিতীয়টি তাজুল ইসলাম ফারুক নামে এক বিতর্কিত এবং অনেকের চোখে ক্রিমিনাল বলে চিহ্নিত একজন ব্যবসায়ীর দায়ের করা ৩ কোটি টাকার চাঁদাবাজীর মামলা। তৃতীয়ত দুইটি চাঁদাবাজীর মামলা একটি ব্যবসায়ী নূর আলীর অপরটি আজম জাহাঙ্গীর চৌধুরী দায়ের করা। মেজর জেনারেল (অব.) আব্দুল মতিন এসব মামলার প্রথম বয়ান দেখেই মনে হয় বুঝতে পেরেছেন শেখ হাসিনার নামে এসব মামলা কি। তাই মনে হয় তিনি বলেছেন, দুর্নীতি দমন টাস্কফোর্স শেখ হাসিনার নামে দায়ের এসব মামলা তদন্ত করবে না।

এবারে দেখা যাক, শেখ হাসিনার নামে যে মামলাগুলো হয়েছে সেগুলো মিথ্যা ও গাজাখুরি কিনা। প্রথম মামলাটি খুনের মামলা-মিরপুর অথবা মোহাম্মদপুরে বসবাসকারী জামাতে ইসলামীর একজন কর্মী ২৮শে অক্টোবর পল্টনে নিহত হয়েছে, এর জন্য শেখ হাসিনা কিভাবে এই খুনের মামলার আসামী হয়? জামাতে ইসলামীর যে লোকটি ঐদিন পল্টনে নিহত হয়েছে তার পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করি, আমি

www.pathagar.com

কোনও মানুষেরই অপ বা অস্বাভাবিক মৃত্যু চাই না। কিন্তু আমি না চাইলেও কি হবে, অনেক মানুষ আন্দোলন সংগ্রাম করার জন্য মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। জামাতে ইসলামীর ঐ কর্মীও ২৮শে অক্টোবর যুদ্ধ করার জন্য পুলিশের ১৪৪ ধারা অমান্য করে নিজের ঘর এবং পরিবারের সদস্যদের রেখে অন্যায়কারী খালেদা, নিজামী, তারেক জিয়া, ফালু, হারেস চৌধুরীদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য অংশগ্রহণ করেছে। সে অন্যায়কারীদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে ন্যায় পক্ষের শক্তির কাছে পরাজয় বরণ করে মৃত্যুবরণ করেছে। এর জন্য কোনও মামলা হয় কিনা জানি না। খবরের কাগজের মাধ্যমে যা পড়েছি তাতে দেখেছি ঐদিন পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা ঐখানে সমাবেশ না করার জন্য বারবার নিষেধ করেছে। ন্যায় পক্ষের এবং অন্যায় পক্ষের সবাইকে, এমনকি লাঠিচার্জ ও টিয়ারগ্যাস পর্যন্ত ব্যবহার করেও যোদ্ধাদের ঐ জায়গা হতে সরাতে পারে নাই। এরপরেও ঐ জায়গাতে কেউ যদি যুদ্ধ করে মারা যায় তবে এর জন্য কেন মামলা হবে তা সহজে বোধগম্য নয়। আবার সেই মামলায় শেখ হাসিনাকে আসামী? যারা এই মামলায় শেখ হাসিনাকে আসামী করার জন্য নির্দেশ দিয়েছে তাদের বিচার হওয়া প্রয়োজন বলে অনেক বিবেকবান মানুষ মনে করে।

দ্বিতীয় মামলা হচ্ছে তাজুলের ৩ কোটি টাকার মামলা। পত্রিকায় পড়লাম ৩ কোটি টাকার ৫০০ টাকার নোটের ওজন হয় ৭০ কেজি, ৭০ কেজি ওজন বহন করার ক্ষমতা তাজুলের নেই, শেখ হাসিনা বা কোনও মানুষেরই নেই, কাজেই এটাও ডাহা মিথ্যা মামলা। চোর, ডাকাত, রাজাকার ছাড়া এ ৩ কোটি টাকার মামলার কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

তৃতীয়ত দুইটি মামলা নূর আলী ও আজম জাহাঙ্গীরের। মামলার বাদী নূর আলী ও আজম জাহাঙ্গীর যে মামলা দায়ের করেছে পত্রিকায় যে F.I.R বা First information report তাতে বাদী নূর আলী এবং আজম জাহাঙ্গীর চৌধুরী কোথাও শেখ হাসিনার নাম উল্লেখ করে বলে নাই যে, শেখ হাসিনা আমাদের টেলিফোন করে বা অফিসে ডেকে নিয়ে শেখ সেলিম ও শেখ হেলালকে টাকা দিতে বলেছে বা তারা শেখ হাসিনাকে কোনও অর্থ প্রদান করেছে। অথচ আজব ব্যাপার এই মামলায় তেজগাঁও ও গুলশান থানায় শেখ হাসিনাকে আসামী করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার, যুদ্ধ বিমান মিগ-২৯ কেনার দালালী করে কোটি কোটি টাকার কমিশন কামাই করে ঠিকমতো ইনকাম ট্যাক্স না দিয়ে গুরুতর রাষ্ট্রের আইন অমান্য করে অপরাধ করেছে নূর আলী ও আজম চৌধুরী। আর মামলার আসামী হয় শেখ হাসিনা। খুবই দুঃখজনক ও হৃদয় বিদারক ঘটনা।

"যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই।" এটা পবিত্র কোরান শরীফের কথা। কোরানের কথা অমান্য করা কোনও মুসলমানের উচিত নয়। বাংলাদেশের জন্য মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করে বিরাট অপচয় করা হয়েছে। আর এই মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করার জন্য প্রথম উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৯২ সন থেকে, খালেদা জিয়ার বিএনপি সরকার মিগ-২৯ কেনার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দর-দাম পাকা করে যায়। চুক্তি করার আগেই বিএনপির পতন হয়। ১৯৯৬ সনে শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে বিএনপি সরকার যে দাম

www.pathagar.com

পাকা করে গিয়েছিল তার চেয়ে কয়েক মিলিয়ন ডলার কম দামে চুক্তি করেন বলে তিনি (শেখ হাসিনা) অনেকবার জাতীয় সংসদসহ অনেক জায়গায় বলেছেন। এর বিরুদ্ধে কেউ কোনও প্রতিবাদ করেছেন বলে আমার চোখে পড়ে নাই। যাই হোক, বাংলাদেশে মিগ-২৯ ক্রয় করে গুরুতর অপরাধ করা হয়েছে। এর জন্য যারা মিগ-২৯ কেনার প্রথম উদ্যোগ নিয়েছে তাদের বিচার করা উচিত। জনাব ফখরুদ্দিন সাহেবের কাছে আমার অনুরোধ-যারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তাদের বলুন, মিগ-২৯ কেনার জন্য ১৯৯২ সনে যারা উদ্যোগ নেয়, প্রস্তাব দেয় তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য। ঐসময়ের যেসব বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর, সেনাবাহিনীর এবং রাজনৈতিক নেতা ও আমলা জড়িত তাদের সবার বিচার হওয়ার দরকার মিগ-২৯ কেনার উদ্যোগ নেবার জন্য।

যারা অকৃতজ্ঞ যারা উপকারীর উপকার স্বীকার করে না তাদের আল্লাহ, ঈশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, ভগবান খুবই খারাপভাবে দেখেন, সাধারণ মানুষও এদের ঘৃণা করেন। প্রায় ৫০ জন আওয়ামী লীগ কর্মীর রক্তের বিনিময়ে অগণিত আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ত্যাগের বিনিময়ে আজ যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকারের মধ্যে লুক্কায়িত ২/৪ জন ষড়যন্ত্রকারী শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অন্যায় আচরণ করে চলেছে, যা খুবই অন্যায়। ন্যায়নীতি বোধ অনুযায়ী বর্তমান সরকারের উচিত শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা, তাদের উপকার করা। যারা শেখ হাসিনার প্রতি অবিচার ও মিথ্যা মামলা এবং আওয়ামী লীগের দাগী অপরাধীদের লেলিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনার ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন তারা কোনোক্রমেই সফল হবে না। শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগ হবে না, আওয়ামী লীগ ছাড়া বাংলাদেশের কোনও সাধারণ নির্বাচন হবে না। যে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করবে না সে নির্বাচনে শতকরা ১৫% এর বেশি ভোট প্রয়োগ হবে না। অতীতে জিয়াউর রহমান সাহেব, জেনারেল এরশাদ, মিসেস খালেদা জিয়া সবাই রাষ্ট্রীয় কোষাগারের কোটি কোটি টাকা খরচ করে চেষ্টা করেছে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে নির্বাচন করার জন্য, কিন্তু তারা সফল হয় নাই, বরং রাজনৈতিক টাউট হিসেবে দেশের এবং বিদেশের মানুষের কাছে পরিচিত হয়েছেন। আর বর্তমানে তো ফখরুদ্দিন আহমদ সাহেব সরকার প্রধান, মীর্জা আজিজুল ইসলাম অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে। এদের দুজন কোনোক্রমেই রাষ্ট্রীয় ফান্ডের কোটি কোটি টাকা নোংরামী করার জন্য খরচ করবেন এটা মনে হয় বাংলাদেশের কেউ বিশ্বাস করবে না। কাজেই নির্বাচন করতে হলে অবশ্যই শেখ হাসিনার নেতৃত্ব এবং আওয়ামী লীগের দরকার।

একথা সত্য শেখ হাসিনার আশেপাশে বেশকিছু চামচা বা বাজে লোক বসার সুযোগ পেয়েছে, তারা অবৈধ কাজ করেছে। নানা অন্যায় কাজ করে অনেক অর্থ উপার্জন করেছে বলে শোনা যায়। তবে এরসাথে সাথে শেখ হাসিনা দু'একজন ভালো লোককেও আশ্রয় দিয়েছেন। শেখ হাসিনা পাঁচ বছর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, এই পাঁচ বছরে কোনও মন্ত্রী, কোনও সচিব কেউ কোনোদিন বলেন নাই শেখ হাসিনা তাদের সাথে সামান্যতম খারাপ ব্যবহার করেছেন। কোনও মন্ত্রী বা সচিবকে অবৈধ সুযোগ সুবিধা

www.pathagar.com

দেওয়ার জন্য তদবির করেছেন। আজ পর্যন্ত কোনও ব্যক্তি কোনও অভিযোগ করে নাই প্রধান মন্ত্রী থাকা কালে শেখ হাসিনা ভয় দেখিয়ে কোনও অর্থ বা কোনও সুযোগ সুবিধা চেয়েছেন। তার আশেপাশে যেসব খারাপ লোকেরা ছিল তাদের প্ররোচনায় শেখ হাসি-না সরকারি গণভবনে বসবাস করার বরাদ্দ নেয়ার জন্য একটি চেষ্টা করেছিলেন যা একটি বেঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এটা না করলে শেখ হাসিনা খুব ভালো করতেন।

প্রসঙ্গত আওয়ামী লীগের সময়ে যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো অনুমোদন দেয়া হয়েছে তা নিয়ে বাজারে অনেকে বলে বেড়ায় যে, প্রতিটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ হাসিনাকে ২ কোটি করে টাকা দিয়েছে। এটা মনে হয় একটি ডাহা মিথ্যা গুজব, তার একটি প্রমাণ আমার আছে। সেটি হচ্ছে যমুনা ব্যাংকের অনুমোদন প্রসংগে। যমুনা ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান জনাব মোশাররফ হোসেন, দ্বিতীয় চেয়ারম্যান জনাব আতিক সাহেব এরা বাংলাদেশের খুবই বড় ও সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশের ৫ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে এরা আসবেন বলে অনেকে মনে করে। এরা অতি সজ্জন ব্যক্তি। যতদূর জানি এরা কোনও রাজনৈতিক দলের সামান্যতম সমর্থক নন। যাইহোক এবারে এ দুজন পবিত্র হজব্রত পালন করে এলে মহাখালীতে ওনাদের নিজস্ব ২০ তলা ভবনের ২০ তলায় সৌজন্য সাক্ষাত করতে যাই। সেখানে গিয়ে পবিত্র মক্কা শরীফের জমজমের পানি, খেজুর, তেঁতুল খাই এবং এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করি মোশাররফ ভাই যমুনা ব্যাংকের অনুমোদনের জন্য কাকে কত টাকা বকশিস দিয়েছেন? জবাবে মোশাররফ সাহেব বলেন, "কাউকে এক টাকা বকশিস দেই নাই, উল্টো বরং শেখ হাসিনা তার নিজের টাকা থেকে আমাদের ৫০০ বা ১০০০ টাকার মতো চা নাস্তা খাইয়েছেন এবং ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছেন।" আমি জবাবে বলি, এটা কিভাবে সম্ভব হলো। উত্তরে মোশাররফ সাহেব বলেন, "যমুনা ব্যাংকের এখন (২০০৭ সন) যিনি চেয়ারম্যান খায়ের সাহেব; তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে গোপালগঞ্জের এমপি ছিলেন। তিনি শেখ হাসিনাকে বলেছেন, মা একটি ব্যাংক করতে চাই, তুমি কি বল।" জবাবে নাকি শেখ হাসিনা খায়ের সাহেবকে বলেছেন, "আপনি আমার চাচা, আমি আপনার মেয়ের মতো, আপনি একটি ব্যাংক করবেন এর চেয়ে ভালো কথা আর কি হতে পারে; আমি সাহায্য করব।" এরপরে খায়ের সাহেব আমাদের কয়েকজন উদ্যোক্তা পরিচালকদের শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে নিয়ে যান, শেখ হাসিনা আমাদের আদর আপ্যায়ন করে চা নাস্তা খাওয়ান এবং ব্যাংকের অনুমোদন পাওয়ার জন্য সাহায্য করেন।"

বাংলাদেশের অনেক দুঃখজনক ঘটনার একটি হচ্ছে যারা অসৎ অন্ন খায়, হালাল খায় না, অসৎ ব্যবসায়ীর বেতনভুক্ত কর্মচারী তারা আজ শেখ হাসিনাকে সৎ হবার পরামর্শ দেন। নিজে যে একজন অসৎ, দুর্নীতিবাজ মালিকের বেতনভুক্ত কর্মচারী সেটা খেয়াল থাকে না। গত ১১/০৬/০৭ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় মতিউর রহমান শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন তিনি নাকি ২ কোটি টাকা করে ঘুষ নিয়ে ব্যাংকের অনুমোদন দিয়েছেন। ব্যাংক অনুমোদন প্রসঙ্গে মোশাররফ সাহেব ও আতিক সাহেবদের কথা আমি ১০০% বিশ্বাস করি। ওনারা খুবই কম কথা বলেন এবং সজ্জন ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। ওনারা কোনও অবান্তর বা মিথ্যা বলেন বলে মনে হয় কেউ জানেন

www.pathagar.com

না। এখন লতিফুর রহমানের বেতনভুক্ত কর্মচারী সম্পাদক মতিউর রহমানের অভিজ্ঞতা কি তা তিনি ভালো জানেন। অবশ্য পত্রিকায় সংবাদ ও লেখা ছেপে ভুল স্বীকার করা ও মাফ চাওয়ার সম্পাদক হিসেবে মতিউর রহমান চ্যাম্পিয়ন অথবা রানার্স আপ হবেন বলে অনেকেই মনে করেন।

জনাব ফখরুদ্দিন সাহেবের কাছে বিনীত আবেদন আপনি একজন সৎ ও বিজ্ঞবান মানুষ হিসেবে পরিচিত। দেশের ও বিদেশের অনেক মানুষ অনেক বড় আশা নিয়ে আপনাকে বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছে ভাল কাজের জন্য। অন্যায় কাজ না করার জন্য। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মঙ্গলের জন্য দয়া করে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কোনও মামলা যাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা নিন। যারা শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করছে তাদের গণতন্ত্র ও দেশের স্বার্থে আপনার প্রশাসন থেকে বিতাড়িত করুন। ১১ই জানুয়ারি থেকে আজ ২২/০৬/২০০৭ তারিখ পর্যন্ত আপনার মুখ থেকে একটি বাজে কথা বের হয় নাই। আপনি একজন সৎ ও ভদ্রলোক, কিন্তু আপনার প্রশাসনে যে সব অসৎ ও কুচিন্তার মানুষ রয়েছে দয়া করে তাদের বিতাড়িত করুন। শেখ হাসিনার জন্য আওয়ামী লীগের জন্য আপনি প্রধান উপদেষ্টা হয়েছেন, এটা মনে রেখে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করুন। আপনার প্রশাসন শেখ হাসিনার প্রতি নিরপেক্ষ আচরণ করছে না।

মহাভারত এবং রামায়ণ দুটি অতীব মূল্যবান গ্রন্থ। পৃথিবীর অনেক লোক বিশ্বাস করে, "যাহা নাই মহাভারতে তাহা নাই ভূ ভারতে।" "মহাভারতের কথা অমৃত সমান, কাশীরাম দাশ কহে শুনে পূণ্যবান।" সেই মহাভারতের একটি চরিত্রের নাম ধৃতরাষ্ট্র। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, তার ১০০টি সন্তান দুর্যোধন, দুঃশাসন- এরা অন্যায়কারী, অন্যায় করে, কিন্তু এদের বাবা রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র স্নেহে পাগল, ছেলেদের অন্যায়ে প্রতিবাদ করে না বরং নীরব থেকে সমর্থন দেয়, যার জন্য কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারত বা যদু বংশ ধ্বংস হয়, ইতিহাসে ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞানী ও সৎ হওয়া সত্ত্বেও একজন খারাপ শাসক হিসেবে পরিচিত হয়ে রয়েছেন।

রামায়ণে রয়েছে, রাজা দশরথ কুজী বা মন্থরা চাকরানীর কথামতো তার কৈকেয়ী স্ত্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দশরথের প্রথম স্ত্রী কৌশল্যার প্রথম পুত্র ভগবান রামচন্দ্রকে রাজ্য না দিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী কৈকেয়ী পুত্র ভরতকে রাজ্য দিয়ে রামকে বনবাসে প্রেরণ করেন। রাম-সীতা-লক্ষণ বনবাসে যাবার সময় রাজা দশরথ বিলাপ করে বলেন- "যতদিন পৃথিবীতে সূর্য এবং চন্দ্র থাকবে ততদিন চাকরানীর পরামর্শ মতো কৈকেয়ী স্ত্রীর কথায় বড় পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্য না দিয়ে বনবাসে দেবার জন্য পৃথিবীর মানুষ আমাকে ধিক্কার দিবে। হে আগামী দিনের রাজা ও পুরুষ মানুষেরা, তোমরা কোনোদিন যে লোক চাকর-বাকরদের কথা মতো কোনও কথা বলে তার কথা শুনিও না। রাজা দশরথের দুঃখ থেকে তোমরা শিক্ষা নাও।" ঋষি লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর একটি লেখায় চাকর-বাকরদের সম্পর্কে লিখেছেন, এরা শুধু মানুষের সাথে মানুষের মিথ্যা কথা বলে ঝগড়া বিবাদ বাধাতে ব্যস্ত থাকে এবং খুব ভালোভাবে এ কাজে সফল হয়। কাজেই দয়াকরে আপনার প্রশাসনের খারাপ চাকরদের থেকে দেশ ও আপনার

www.pathagar.com

মঙ্গলের জন্য সদা সতর্ক থাকা জরুরি প্রয়োজন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাহিনী কাব্য গ্রন্থের গান্ধারীর আবেদন নামক মহান কবিতায় মাতা গান্ধারীর মুখ দিয়ে বলিয়েছেন- "তুমি রাজা, রাজাধিরাজ, বিধাতার বাম হস্ত, ধর্ম রক্ষা কাজ তোমা পরে সমর্পিত," আজ তব রাজ পদতলে সমস্ত নারীর হয়ে নয়নের জলে বিচার প্রার্থনা করি- নিষ্পাপেরে দুঃখ দিয়ে নিজে পূর্ণ সুখ লইও না, ন্যায় ধর্ম করো না বিমুখ তব প্রাসাদ হতে।"

মাতা গান্ধারীর মতো আমিও আজ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার কাছে বলতে চাই- আপনি আজ বাংলাদেশের রাজ অধিরাজ, বিধাতার বাম হস্ত, ধর্ম রক্ষা কাজ আজ আপনার পরে সমর্পিত। আজ আপনার পদতলে ১৯৭১ সনের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে ৫৭ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের হয়ে নয়নের জলে ন্যায় বিচার পার্থনা করে বলতে চাই- শেখ হাসিনারে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখ নিও না, সত্য ও ন্যায়ধর্মকে করো না বিমুখ তব প্রাসাদ হতে।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা করা তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা মহাপাপ। শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্নেহময়ী কন্যা। বঙ্গবন্ধু জীবনের যৌবনের ১১ বছর বাংলার মানুষের কথা বলে জেল খেটেছেন। ১৯৭১ সনে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শেখ মুজিবের নাম ছিল যুদ্ধের প্রধান প্রেরণার উৎস। শেখ মুজিব শেখ হাসিনার পিতা, তিনি বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। এ দেশের গরিব দুঃখী সমস্ত মানুষের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা। কোনোদিন কোনও গরিব দুঃখী মানুষ শেখ হাসিনার কাছে ভিক্ষা চেয়ে বিমুখ হয় নাই। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা দিলে যে পাপ হবে সে মহাপাপের বোঝা কেউ বহন করতে পারবে না।

তারিখ : ২২/০৬/২০০৭ ইং, সময় রাত নটা থেকে ২ টা।

গত ২২/৬/২০০৭ ইং তারিখে উপরের লেখাটি লেখা হয়েছে। তখন আমি এই লেখায় ফখরুদ্দিন আহমদকে একজন ভালো লোক বলে উল্লেখ করেছি।

কিন্তু একবছর পর ২২/৬/২০০৮ তারিখে আমি আর ফখরুদ্দিন আহমদকে ভালো লোক মনে করি না। এখন ফখরুদ্দিন সাহেবকে আমি অকৃতজ্ঞ রাষ্ট্রীয় টাকার অপচয় ও লুটপাটকারীদের একজন হাতের পুতুল মনে করি। এক বছর আগে তাকে ভালো লোক হিসেবে বনর্ণা করে লেখার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

লেখক

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা ও শাইখুল হাদিস আজিজুল হক চুক্তি বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক,সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অনেক শক্তিশালী করবে :

"কোনও দেশের কোনও রাজনৈতিক দল চেষ্টা করলে ১৪টার বেশি দেশের সরকারের পতন ঘটাতে পারবে, ১০টির বেশি দেশও দখল করতে পারবে, কিন্তু কোনও রাজনৈতিক দল যদি সে দেশের মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির বিরুদ্ধে কথা বলে তবে সে রাজনৈতিক দলের সফলতা তো আসবেই না, বরং সে দলই নিঃশেষ হয়ে যাবে।"

এ্যাডলফ হিটলার

মেইন ক্যাম্প।

১৯৬৯ সনের আগে এই বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কোন গরিব মানুষ চেয়ারে বসলে তার শাস্তি হতো, গরিবের বাড়িতে চেয়ার থাকার প্রশ্নই আসে না, যদি স্বচ্ছল বা যার বাড়িতে চেয়ার আছে বা স্কুলের চেয়ারে কোনও গরিব মানুষ বসলে তাকে সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী শাস্তিপেতে হতো।

যারা জাকাত ফেতরা বা সরকারি রিলিফ খেতো তাদের ছেলেমেয়েদের সাথে যারা জাকাত ফেতরা বা রিলিফ খেতো না তাদের সাথে মেলামেশা করা বা খেলাধূলা করা নিষেধ ছিল। যদি কোনও ছেলেমেয়ে এ নিষেধ অমান্য করে কারও সাথে চলাফেরা করতো তবে তার অভিভাবক প্রচুর শাস্তিদিতো। আমি নিজে আমার বড় ভাই (জেঠাতো) মরহুম নুরুল হক খানের হাতে কয়েকবার ভীষণভাবে বাঁশের কাঁচা কঞ্চি দ্বারা ছোট বেলায় মার খেয়েছি গরিব মানুষের ছেলেদের সাথে কথা বলার জন্য। যদিও আমরা বা নুরু ভাই খুব ধনী মানুষ ছিলাম না।

আগে কোনও খাবার অনুষ্ঠানে গরিব স্বচ্ছল লোকেরা এক বৈঠকে খাবার খেত না, গরিবদের জন্য আলাদা দূরে ব্যবস্থা করা হতো। এখনও এ ব্যবস্থাই বাংলাদেশে অনেক স্থানে বিরাজমান আছে বলেই আমার বিশ্বাস। কেননা গত ২০০৪ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার থানার বাবুরহাট অঞ্চলের একজনের মায়ের চল্লিশা খাবারের জন্য গিয়াছিলাম, ৫/৬ হাজার লোকের খাবারের ব্যবস্থা সেখানে, দেখেছি গরিবদের জন্য দূরে আলাদা খাবার ব্যবস্থা। ধনী লোকদের জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা। ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনেও যারা এক টাকা চার আনা বা পাঁচ শিকা চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান করে নাই তারা ভোটার হতে পারে নাই, তাদের ভোট দেওয়া নিষেধ ছিল। ১৯৩৭ ও ১৯৪৬ সনের সাধারণ নির্বাচনেও তাই বিধান ছিল, যে পাঁচ শিকা চৌকিদারি ট্যাক্স দিতে পারবে না, সে এবং তার পরিবার ভোটার হতে পারবে না। ১৯৭০ সনে পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান দাবী করে গরিব মানুষের যারা চৌকিদারী ট্যাক্স দেয় না তাদের ভোটার হওয়ার জন্য সুযোগ করে দিয়েছেন। অথচ নিয়তির বিধান এই গরিবদের বহুলোক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এর দলকে ভোট দেয় না এবং তাঁকে গালাগালিও করে। ১৮ বছর ভোটারের বয়স এটাও বঙ্গবন্ধুর দাবীর মুখে পাকিস্তানে ১৯৭০ সনে

www.pathagar.com

প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে ভোটারের বয়স ছিল কমপক্ষে ২১ বছর। ভারতে ১৮ বছরের ভোটার হবার বিধান করেন প্রয়াত রাজিব গান্ধী ১৯৮৫ সনে, আর প্রথম ১৮ বছরের ভোটাররাই ভোট দিবার সুযোগ পেয়েই হিন্দু জাতীয়তাবাদে অনুরাগী হয়ে রাজিব গান্ধীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে কংগ্রেস তথা রাজিব গান্ধীকে পরাজিত করেন। মৃত্যুর সময়ে রাজিব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না, বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। আমি এখনও মনে করি ১৮ বছর বয়সের কাউকে ভোটার করা উচিৎ নয়, এবং যারা গরিব, খাজনা ট্যাক্স দেবার যাদের সঙ্গতি নেই, যারা জাকাত ও রিলিফ খায় এবং ভিক্ষা করে, তাদের ভোটার করা উচিৎ নয়। কিন্তু আমি না চাইলে কি হবে আমার চেয়ে বেশি মানুষ মনে হয় এটা সমর্থন করেন, কাজেই এটাই বহাল হয়েছে। উপরে গরিবদের বিষয়ে যা উল্লেখ করেছি তা ১৯৬০ সন থেকে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা, তার আগের যা তা আমার পড়া ও শোনার অভিজ্ঞতা।

আমার উপরের বর্ণনা থেকে সহজেই ধারণা পাওয়া যাবে আরও আগে বা অতীতে ধনী গরিবের ভেদাভেদ খুবই বেশি ছিল, কম হবার প্রশ্নই আসে না। ১৯০৪ সনে বাংলাদেশ বা ভারতে স্বাভাবিকভাবেই গরিব মানুষদের মানমর্যাদা খুব খারাপ ছিল। এই ভারতের প্রথম নির্বাচিত ১৯৫০ সনে রাষ্ট্রপতি কংগ্রেস নেতা রাজেন্দ্র প্রসাদ এর সাথে বাংলার মুসলমান সমাজের গর্ব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদার সাথে প্রথম পরিচয় হয় কলকাতায় ১৯০২ সনে ।

ভারতের রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধীর পরে যে চারজন নেতার সীমাহীন প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তারা হলেন (১) পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু (২) সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেল (৩) রাজেন্দ্র প্রসাদ (৪) মওলানা আবুল কালাম আজাদ। এই চারজনের মধ্যে তিনজন পণ্ডিত নেহেরু, সরদার প্যাটেল, আবুল কালাম আজাদ খুবই ধনী মানুষের সন্তান। খুবই বললে ওনাদের বাবার সহায় সম্পত্তির কথা ঠিকভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়, পাঠক ধরে নেন আজকের বাংলাদেশী টাকায় ওনাদের কমপক্ষে ১০০০ কোটি টাকার ওপরে সহায় সম্পত্তি ছিল। মওলানা আবুল কালামের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিন ১৮৭০ দশকের শেষে ঐ সময়ের মক্কা শরীফের সবচেয়ে বড় ধনী শেখ মোহাম্মদ জাহেদ বতরির মেয়েকে বিবাহ করেন। মওলানা আবুল কালাম আজাদের পিতা মওলানা খায়রুদ্দিনের পূর্বপুরুষ সম্রাট শাহজাহানের মন্ত্রী সভার একজন প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন। পাঠক এ থেকেই অনুমান করতে পারেন মওলানা আবুল কালাম আজাদ কি ধরণের ধনী মানুষের সন্তান। আর মওলানা আবুল কালাম আজাদের বাবার ধন সম্পত্তির তুলনায় মনে হয় পণ্ডিত নেহেরু এবং সরদার প্যাটেলের পিতার অনেক বেশি ছিল। কিন্তু রাজেন্দ্র প্রসাদ ছিলেন একজন খুবই দরিদ্র মানুষের সন্তান, খুব কষ্ট করে মানুষের সাহায্য সহযোগিতা নিয়ে লেখাপড়া করেছেন, ১৯০২ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাস বিভাগ হতে অনার্সসহ ২য় শ্রেণীতে ১ম স্থান অধিকার করে এম, এ, পাশ করেন। এরপর তিনি বি.এল. ডিগ্রি নেন, বি,এল ডিগ্রি নেবার পর স্যার সামসুল হুদার সাথে পরিচিত হন। রাজেন্দ্র প্রসাদ, তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন "ঐ সময়ের ১৯০৪ সনে কলকাতা শহরের ১নং নামকরা এ্যাডভোকেট ছিলেন স্যার শামসুল হুদা। যেহেতু আমি নিজেকে একজন ভালো ছাত্র মনে করতাম সেইজন্য ভয়ে ভয়ে

www.pathagar.com

একদিন শামসুল হুদা সাহেবের বাড়িতে গিয়ে তার কাছে আমার সমস্ত বৃত্তান্ত খুলে বলি, যে আমি খুব গরিব মানুষের ছেলে, খুব দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বহু মাইল পথ পায়ে হেঁটে অনাহার অর্ধাহারে থেকে মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতায় এ পর্যন্ত এসেছি। এখন আমি ল', ডিগ্রি নিয়েছি আমি আপনার সাহায্য চাই।" স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা সাথে সাথে রাজী হয়ে যান তার আইন পেশায় রাজেন্দ্র প্রসাদকে জুনিয়র হিসেবে গ্রহণ করেন, এরপরে তাকে তাঁর নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেন, পরে রাজেন্দ্র প্রসাদকে ধর্মপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। নবাব স্যার শামসুল হুদার কলকাতা শহরের বিশাল বাড়ি রাজেন্দ্র প্রসাদকে দান করেন, রাজেন্দ্র প্রসাদ পরে সে বাড়ি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজকে দান করেছেন, যা এখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবাস। স্যার রাজেন্দ্র প্রসাদ আত্মজীবনীতে লিখেছেন "আমার এক বাবা জন্ম দিয়েছেন কিন্তু আইনজীবী হিসেবে কংগ্রেসের নেতা হিসেবে, ভারতের রাষ্ট্রপতি হবার স্থান আমার অন্য বাবা নবাব স্যার শামসুল হুদার একক অবদান। তিনি আমাকে তিল তিল করে গড়ে তুলেছেন– তাঁর জীবন আদর্শে।" এখানে প্রসঙ্গত বলে রাখি নবাব শামসুল হুদা সাহেবও কিন্তু একজন পাকা মুসলিম ছিলেন, মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস বা আচার আচরণের সাথে কোনও হেরফের করেন নাই। নবাব শামসুল হুদা সাহেব তাকে ধর্মপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই রাজেন্দ্র প্রসাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বিত্তবানদের ঘরে প্রবেশ করার একসাথে চেয়ারে বসার। স্যার শামসুল হুদার সন্তান বলেই নেহেরু, সরদার প্যাটেল, মওলানা আবুল কালাম আজাদের সাথে একসাথে চলাফেরা করা সমানতালে কথা বলা, সম্ভব হয়েছে, স্যার শামসুল হুদার সন্তান না হলে রাজেন্দ্র প্রসাদের পক্ষে ঐ সময়ে কোনও ক্রমেই নেহেরু, প্যাটেল মওলানা আজাদ, বা তাদের সমমানের লোকদের সাথে চলাফেরা করা সম্ভব ছিল না। রাজেন্দ্র প্রসাদ একবার স্যার শামসুল হুদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– "বাবা এখন আপনি জীবিত আছেন আপনি সবখানে আপনার ছেলে বলে আমাকে পরিচয় করে দেন, সবাই আমাকে আদর সম্মান করেন। কিন্তু যখন আপনি জীবিত থাকবেন না তখন আমার কি হবে?" জবাবে স্যার সামসুল হুদা রাজেন্দ্র প্রসাদকে বলেছিলেন "যতদিন তুমি একজন সাচ্চা ধার্মিক থাকবে যতদিন তুমি একজন খাঁটি হিন্দু থাকবে, যতদিন তুমি মহাভারত রামায়ণের শিক্ষাকে আকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমার নেতৃত্ব তোমার মানসম্মান কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। কাজেই ধর্মকে সবসময় শক্ত করে ধরে থাকবে।"

রাজেন্দ্র প্রসাদ তার বাবা, তার গুরু স্যার শামসুল হুদার কথা আমৃত্যু মেনে চলেছেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ যখন ভারতের প্রেসিডেন্ট তিনি যখন মন্দিরে গিয়ে পূজা করেছেন, মন্দিরের সেবা করেছেন, সোমনাথ মন্দির 'নতুনভাবে তৈরীর কাজে সাহায্য করেছেন, প্রকাশ্যে হিন্দু ধর্মের আচরণ করেছেন তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু প্রথমে প্রেসিডেন্টকে মৌখিক, গোপনে লিখিত, পরে প্রকাশ্যে লিখিতভাবে রাজেন্দ্র প্রসাদকে নিষেধ করেছেন "ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র এ রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কোনও একটি বিশেষ ধর্ম পালন করতে পারেন না, যদি তা করেন অন্য ধর্মের নাগরিকগণ কষ্ট পাবেন।" কিন্তু রাজেন্দ্র প্রসাদ পণ্ডিত নেহেরুর বক্তব্যকে মেনে না নিয়ে পাল্টা জবাব দিয়ে বলেছেন– "একজন ধার্মিক কোনও সময়েই

www.pathagar.com

অন্যধর্মের মানুষকে, অন্যধর্মকে হেয় চোখে দেখতে পারে না, যে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধাকরে সে অন্যের ধর্মকেও শ্রদ্ধা করে। যে নিজের ধর্মকে শ্রদ্ধা সম্মান করে না সে অন্যের ধর্মকেও শ্রদ্ধা সম্মান করে না। আমি ভারতের প্রেসিডেন্ট আমি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু, নিষ্ঠার সাথে আমি হিন্দুর আচরণ পালন করবো সাথে সাথে ভারতের মুসলমান শিখ, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, জৈনসহ অন্য যে ধর্মের লোকেরা রয়েছেন তারাও যাতে নিষ্ঠার সাথে তাদের ধর্ম পালন করতে পারেন তার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। ধর্মের পথ থেকে আমাকে কোনও ক্রমেই সরানো যাবে না।" মওলানা আবুল কালাম আজাদ বলিষ্ঠভাবে রাজেন্দ্র প্রসাদকে সমর্থন করেছেন, নেহেরুর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করে বক্তব্য দিয়েছেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ ও মওলানা আবুল কালাম আজাদদের বক্তব্যই দেশের মানুষ মেনে নিয়েছেন, যে যার ধর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন, কেউ কাউকে আঘাত বা আক্রমণ করবে না, এটাই ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতি। এটাই প্রভু শ্রীচৈতন্য, গুরুনানক, লালন ফকির, রামমোহন রায়, ঠাকুর রামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অমর্ত্য সেনদের শিক্ষা- মুসলমানদের পীর দরবেশরা সেই শিক্ষাই দিয়েছেন- শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান, শান্তিপূর্ণভাবে যে যার ধর্ম পালন কর, কেউ কাউকে বিরক্ত করো না, কেউ কাউকে খারাপ চোখে দেখো না, সবার স্রষ্টা এক, সবাই এক প্রভুর প্রশংসা করে ও সাহায্য চায়- কেউ ডাকে আল্লাহ নামে, কেউ ডাকে ভগবান নামে, কেউ ডাকে গড্ বলে, যার যা ভালো লাগে সে সেই নামে ডাকে। জগতের সব মানুষই এক স্রষ্টার সৃষ্টি। যারা নিজেদের ধর্ম মানে না তারাই অন্য ধর্মকে আক্রমণ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খোঁজ নিলে দেখা যাবে যারা পূজা করে না, নামাজ পড়ে না, গুন্ডা বদমায়েশ লোক এরাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা করেছে। সাথে প্রশাসনের কিছু লোক ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ অফিসার এদের উস্কানী দিয়েছে।

আমার এ লেখার হেড লাইন দিয়েছি "শেখ হাসিনা শাইখুল হাদিস আজিজুল হকের চুক্তি বাংলাদেশে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করবে"। আর এ লেখার ভূমিকা দেবার জন্য উল্লেখিত বক্তব্যগুলো তুলে ধরেছি। রাজেন্দ্র প্রসাদ একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক হবার জন্য ভারতের মতো বিশাল দেশের প্রেসিডেন্ট হতে পেরেছেন। ধর্ম থেকে দূরে থাকলে বা ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে যারা ধর্মহীনতার কথা বলেন তাদের পথে থাকলে সেটা কোনও দিন সম্ভব হতো না। পণ্ডিত নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি একজন ধনী মানুষের সন্তান শিক্ষিত পণ্ডিত বলে। আর নেহেরুর শিক্ষা তাঁর একমাত্র মেয়ে ইন্দিরা গান্ধীই মেনে চলেন নাই- ইন্দিরা গান্ধী নিয়মিত মন্দিরে যেতেন, দেওবন্দ মাদ্রাসায় এক বিশাল ইসলামিক মাহফিলে হাজার হাজার আলেম বা মওলানাদের উদ্দেশ্যে পর্দা মাথায় ইসলাম ধর্মের প্রধান শিক্ষা কি তা নিয়ে বক্তৃতা করতে দেখেছি তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বানানো সিনেমার পর্দায়। ইন্দিরা গান্ধী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো মাঝেমাঝে সব ধর্মই মনে হয় ব্যক্তিগতভাবে পালন করতেন। তবে তিনি রাষ্ট্রীয় আচরণে ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্র দর্শন হবে মুসলিম মনিষীদের শিক্ষায়, খাজাবাবা মইনুদ্দিন চিশতীর, খাজাবাবা নিজামুদ্দিন (রা:), শাহজালালদের শিষ্যদের কথা মতো, বাংলাদেশ চলবে শ্রীচৈতন্যদেব লালন শাহ, রামমোহন রায়, রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ,

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেনদের কথামতো, বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য "ইউনিটি এ্যামং ডাইভারসিটি" এই তত্ত্বের ভিত্তিতে। নাস্তিক অধার্মিকদের কথা মতো বাংলাদেশ চলতে পারে না। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাজসিংহ উপন্যাসের শেষে পাদটিকায় বলেছেন– "ধর্মহীন মানুষ হিংস্র পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট।" ধর্মহীন এই পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ নাস্তিকদের কথা মত বাংলাদেশ সরকার এবং আওয়ামী লীগ পরিচালিত না হলেও এদের বিশাল প্রভাবের জন্য গত ৩০ বছরে বাংলাদেশ থেকে শতকরা দশ ভাগ হিন্দু বিতাড়িত হয়ে ভারতে গিয়েছে। ১৯৭২ সনে বাংলাদেশে হিন্দু ছিল শতকরা ২০ ভাগ মুসলিম ৮০ ভাগ। ১৯৪৭ সনে ৩০ ভাগ, আজ ২০০৭ মনে হিন্দু শতকরা দশ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে। এই দশভাগ হিন্দুকে যদি আমরা সমঅধিকার দিয়ে রাখতে চাই তবে আল্লামা শাইখুল হাদিস আজিজুল হক ও তাঁর মতো অনুসারীদের সাহায্য সহযোগিতাই রাখা সম্ভব। তাঁরাই এদেশের মূল শক্তি, শুক্রবারে মসজিদের নামাজ, ঈদের নামাজ, শবে বরাতের রাতে মসজিদে নামাজ পড়তে গেলে বোঝা যায়, অনুভব করা যায়, শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ও শেখ হাসিনার চুক্তির মর্ম কি। যারা শুক্রবারের নামাজ, ঈদের নামাজ, শবে বরাতের নামাজ এবং উৎসবের সাথে জড়িত নয় তাদের পক্ষে শেখ হাসিনা আল্লামা আজিজুল হকের চুক্তির মর্মবাণী উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে গোমাংস ভক্ষণকারী হিন্দু, যারা মা দূর্গা ও কালীর পূজা করে না, যারা হিন্দু বা সনাতন ধর্মের কোন ছোটখাটো আচার অনুষ্ঠান করে না, মন্দিরে যায় না, তারাও আজিজুল হক শেখ হাসিনার চুক্তির মর্মবাণী উপলব্ধি করতে পারবে না।

পাঠকরা এখানে আমাকে ভুল বুঝবেন না, আমি ইসলাম মানেই আল্লামা আজিজুল হকের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছি না। যেহেতু তিনি ইসলামি চিন্তাবিদ বা মতাদর্শের পক্ষ থেকে শেখ হাসিনার সাথে চুক্তি করেছেন এবং উনার নামেই এত আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে সেজন্যই তাঁর নামে এভাবে বর্ণনা করছি।

শেখ হাসিনা ১৯৮১ থেকে বাংলাদেশে এদেশ যে ২টি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেন, তার একটি হলো সমাজতন্ত্র এবং বাকশাল থেকে সরে আসা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে আল্লামা আজিজুল হকের সাথে রাজনৈতিক সমঝোতা। আমি মনে করি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সেরা সিদ্ধান্ত এই চুক্তি। এই চুক্তির মর্মবাণীর শেকড় অনেক গভীরে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এক নূতনমাত্রা পেয়েছে। আজিজুল হক সাহেব এই চুক্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন 'আমাদের দেশে যেসব অমুসলিম রয়েছেন– তাদের জানমাল রক্ষা করা, মন্দির গির্জা রক্ষা করা মুসলমান হিসেবে আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।' মওলানা আজিজুল হক সাহেবরাই এদেশে সামাজিক ও ধর্মীয় চিন্তা ভাবনার ধারক-বাহক ও পরিচালক। উনাদের পক্ষেই সম্ভব এদেশে হিন্দুদের মন্দির রক্ষা করা তাদের জানমালের নিরাপত্তার হেফাজত করা। ঠিক তেমনিভাবে ভারতেও যারা পূজা করেন, হিন্দু ধর্মের নিষ্ঠাবান সেবক তাদের পক্ষেই সম্ভব ভারতের ২০ কোটি মুসলমানের জানমাল এবং মসজিদ মাদ্রাসা রক্ষা করা। বাংলাদেশ ও ভারতের অধার্মিক নাস্তিকদের পক্ষে হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদ রক্ষা করা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

নিলর্জ্জ ব্যক্তিত্বহীন স্তাবক, সুবিধাবাদী দালাল তাবেদারদের কথায় শেখ হাসিনাকে বিভ্রান্ত না হয়ে শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের সাথে করা চুক্তিকে আমি জোরালোভাবে আকরে ধরার জন্য অনুরোধ করবো। এই চুক্তির ফলে চোর, ডাকাত, লুটেরা সাম্প্রদায়িক শক্তি আওয়ামী লীগকে ইসলাম বিরোধী বলে ভারতের দালাল বলে অভিহিত করে ভোটে পরাজিত করে ক্ষমতায় যেত, সেটা আর পারবে না।

এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ধার্মিক হিন্দুদের মধ্যে এক নবপ্রেরণার সৃষ্টি হবে এই বলে যে, বাংলাদেশের মূলধারার মুসলমান সমাজ আমাদের নিরাপত্তা দেবার আমাদের মন্দির রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আর ধার্মিক লোকদের প্রতিশ্রুতি এক বিরাট ব্যাপার। নাস্তিক ও কমিউনিস্টদের প্রতিশ্রুতি হচ্ছে ধোকা বা রণকৌশল, আর ধার্মিক লোকদের প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা রক্ষা করার জন্য জীবন দেওয়া ছাড়া আর সব ত্যাগ করতে হবে। কাজেই বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ, খ্রিস্টানদের জন্য হাসিনা আজিজুল হক চুক্তির এক নবজীবনের শক্তিশালী প্রেরণার উৎস।

ভারতের সৌভাগ্য সেখানে ধর্মনিরপেক্ষ মানে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ ও মওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবদের মতো ধার্মিক ও ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ নেতা ছিলেন। যার জন্য অতি সামান্য মুসলমান ১৯৪৭ সনের পরে দেশ ত্যাগ করে পাকিস্তানে এসেছে– যদি নেহেরুর মতো একচেটিয়া ধর্মনিরপেক্ষ লোক বা নেতার প্রভাব থাকতো তবে আরও কয়েক কোটি মুসলমান ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে চলে আসতো। বাংলাদেশ থেকে গত ৩০ বছরে শতকরা ৫০ ভাগ হিন্দু কমেছে; এটা বিরাট উৎকণ্ঠার বিষয়, সামান্য শুভবুদ্ধির মানুষ এটা মেনে নিতে পারে না। এটা খারাপ বা অশুভ লক্ষণ। আমার বিশ্বাস শেখ হাসিনা আজিজুল হক চুক্তির মাধ্যমে আজিজুল হক সাহেবের প্রতিশ্রুতির ফলে হিন্দু ভায়েরা নূতন সাহস ও শক্তি পাবেন, যার জন্য দেশ ত্যাগের চিন্তাভাবনা বাদ দিবেন। তবে এর জন্য আমাদের দেশের যে দশ ভাগ হিন্দু আছে তাদের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে, এদের যুক্তিসঙ্গত ভাবে সব সময় মূল্যায়ন করতে হবে। এর জন্য শেখ হাসিনাকে সাইখুল হাদিসের সাথে চুক্তির পাশাপাশি একজন ধার্মিক নিষ্ঠাবান হিন্দু যিনি নিয়মিত পূজা করেন, ধুতি পাঞ্জাবি পরেন, এমন একজন হিন্দুকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামে স্থান দিতে হবে। শেখ হাসিনার সাথে বড় বড় জনসভায় তিনি বক্তৃতা করার সুযোগ পাবেন। প্রতি বছর– পুলিশের সাবইন্সপেক্টর, পুলিশের, সামরিক বাহিনী ও বিডিআর জোয়ানদের জন্য ১০ ভাগ হিন্দুদের জন্য সংরক্ষিত বা কোটা রাখতে হবে। এরমধ্যে ৫ ভাগ উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের জন্য ৫ ভাগ নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্য। বি,সি,এস পরীক্ষায়ও অনুরূপভাবে কোটা রাখা দরকার। হিন্দু ধর্ম কল্যাণ ট্রাস্টের ফান্ড ১০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ২০০ কোটি টাকা করা দরকার।

তবেই এদেশ থেকে হিন্দুর দেশ ত্যাগ বন্ধ হবে। বাংলাদেশে শেখ হাসিনা শাইখুল হাদিস আজিজুল হকের চুক্তির সুফল পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের সত্যিকারের মানুষের জীবনের নৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হবে, সাথে সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক, ধার্মিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হবে, তবেই পৃথিবীর বুকে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ হিসেবে মাথা উচ্চ করে দাঁড়াতে পারবে।

www.pathagar.com

হিন্দুদের জন্য শতকরা দশ ভাগ চাকরির কোটা সংরক্ষণ করা এবং হিন্দুদের মন্দির বা দেবালয়ের জায়গাগুলো উদ্ধার এবং রক্ষা করে শক্তিশালী সীমানা দেওয়াল করে দেওয়া দরকার। বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ থেকে যে আবাসিক প্লট দেওয়া হয় সেখানেও হিন্দুদের জন্য শতকরা দশ ভাগ কোটা রাখা দরকার। পূর্বাচলে ১৬ হাজার প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে– দশ ভাগ হারে হিন্দুদের ১৬০০ প্লট পাওয়া উচিৎ। মনে হয় একশত জনও পায় নাই। উত্তরায় ৩য় পর্যায় ৮০০০ হাজার প্লট দেওয়া হয়েছে একশত জন হিন্দুর নাম নাই। এদিকেও রাষ্ট্রের নজর দেওয়া উচিৎ। মোট কথা হিন্দুদের জন্য ১০ ভাগ চাকরির কোটা, রাজউকের প্লট বরাদ্দের ১০ ভাগ কোটা, হিন্দুদের মন্দিরগুলোর পাকা সীমানা দেওয়াল দিয়ে দেওয়া, এই বিষয়ে বাস্তবে রূপ দিলে বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের দেশ ত্যাগের আর কোনও কারণ থাকবে না।

আর এটা একমাত্র করা সম্ভব শাইখুল হাদিস আজিজুল হক সাহেব এবং তাঁর দলও সমর্থকদের সমর্থনে। উপরোল্লিখিত হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য কাজগুলো করার সাথে সাথে মওলানা আল্লামা শাইখুল হাদিস আজিজুল হক সাহেবের কওমী মাদ্রাসার দাবীগুলো বাস্তবায়ণ করার জন্য আমি দাবী জানাই। মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী সাহেবের শ্লোগান স্মরণ করে বলতে চাই "কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হবে না, তা হবে না। আসলেই এ শ্লোগানের মধ্যে মানব ধর্মের মূল বাণী উচ্চারিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের, বেসরকারি হাইস্কুল কলেজ শিক্ষকদের, প্রাইমারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকারি তহবিল থেকে দিচ্ছেন। তারা মোটামুটি দুঃখ কষ্টে অন্তত তিন বেলা খাবার পাচ্ছে– তাদের সামনে তাদের পার্শ্বে কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকরা না খেয়ে থাকবেন তারা ভিক্ষা করে সংসার চালাবেন তা হবে না, এটা ন্যায় বিচার না, কেউ খাবে কেউ খাবে না তা হতে পারে না। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকরাও এই দেশের মাটি ও মানুষের সন্তান, তাঁরা সমাজে বিরাট অবদান রেখে আসছে, এরা জামাতে ইসলামের মতো জনগণের বিরুদ্ধে কোনও রাজনীতি করে নাই। গ্রাম বাংলায় সাধারণ মানুষকে ধর্ম শিক্ষা দিয়ে আসছেন, এরা না খেয়ে থাকবেন এটা মেনে নেয়া যায় না। শাইখুল হাদিস আজিজুল হক সাহেবের চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই কওমী মাদ্রাসার লিস্ট করে, শিক্ষকদের লিস্ট করে তাদের বেতন স্কেল ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে কওমী শিক্ষকদের বেতন দেওয়া উচিৎ। প্রথমেই হয়তো শত ভাগ বেতন দেওয়া সম্ভব হবে না, প্রথমে ৫০ ভাগ বেতন দেওয়া যেতে পারে, ৫ বছর পরে ৭৫ ভাগ, দশ বছর পরে ১০০ ভাগ বেতন কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকদের দেওয়া হোক শেখ হাসিনার সাথে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী।

অধার্মিক নাস্তিক কমিনিস্টদের দ্বারা বাংলাদেশের একজন হিন্দুরও উপকার করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কল্যাণের জন্য শাইখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক ও শেখ হাসিনার চুক্তি ১৯২৩ সনে দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও শেরে বাংলা ফজলুল হকের বেঙ্গলপ্যাক্ট চুক্তির মতোই একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯২৩ সনের বেঙ্গলপ্যাক্ট চুক্তি দ্বারা মুসলমানেরা যেভাবে উপকৃত হয়েছেন আল্লামা আজিজুল হক সাহেবের সাথে শেখ হাসিনার চুক্তি দ্বারা বাংলাদেশের বর্তমানের দুইকোটি হিন্দু তাঁর চেয়ে বেশি উপকৃত হবেন, যদি উপরে বর্ণিত আমার সুপারিশগুলো

www.pathagar.com

বাস্তবে রূপ পায়। হিন্দুদের সাথে সাথে অনেক গরিব মুসলমান যারা সংখ্যায় ১৩২১৫০ কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক যারা অনাহারে অর্ধাহারে রয়েছেন তারা শাইখুল হাদিস মওলানা আজিজুল হক ও শেখ হাসিনার জন্য চাকরি পাবেন। প্রাইমারি শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করে তাজউদ্দিন সাহেব অমর রয়েছেন, আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের সরকারি খাত থেকে বেতন নেবার ব্যবস্থা করে এরশাদ সাহেব-মওলানা মান্নান যেমন শ্রদ্ধার আসনে রয়েছেন তেমনি কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকদের অনাহার অর্ধাহার থেকে মুক্ত করে মওলানা আজিজুল হক ও শেখ হাসিনা অমর হয়ে থাকবেন বলেই আমার মনে হয়।

অধার্মিক কমিউনিস্ট নাস্তিক এদের কথায় একজন হিন্দুর উপকার করা সম্ভব নয়, মওলানা আজিজুল হক ও শেখ হাসিনার চুক্তি বাস্তবায়নের মধ্যে প্রায় ১৩২১৫০ হাজার কওমী মাদ্রাসার অনাহারী মানুষ (শিক্ষক) খাদ্য পাবেন, দুই কোটি হিন্দু বাংলাদেশে বসবাস করার জন্য নূতন প্রাণের শক্তি পাবেন।

১৬.৭.২০০৭ সকাল ৭টা থেকে ১০টা
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

বিঃ দ্রঃ গত ১৯শে আগস্ট ২০০৮ সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার সদর দপ্তরের কাছে চালা কওমী মাদ্রাসার অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য গিয়েছিলাম, সেখানে কয়েকজন কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকদের সাথে ঘণ্টাখানেক কথা বলে জানলাম কওমী মাদ্রাসায় ফারসি, আরবি, উর্দু, ইংরেজি, বাংলা ও অংক শিক্ষা দেওয়া হয়। ফারসি, আরবি ও উর্দুর মতো প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষা বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাক তা কোনও সামান্য সুস্থ মানুষ চাইবেন না। এ ভাষাগুলো কওমী মাদ্রাসার মাধ্যমে এদেশে এখনও চর্চা চলছে তা দেখে খুব খুশি ও অনুপ্রাণিত হলাম।

কওমী মাদ্রাসার বিরুদ্ধে কথা বলার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না, আমরা না জেনে না শুনে অনেক সময় অনেক কথা বলে থাকি। কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা নিজের চোখে দেখে তারপরে এ সম্পর্কে মন্তব্য করার জন্য অনুরোধ জানাই।

এরপরেও যদি কওমী মাদ্রাসার পাঠ্য সূচি বা সিলেবাস আরও সময় উপযোগী বা বাস্তবসম্মত করার প্রয়োজন পড়ে তবে তাও করা যেতে পারে। তবে তার আগে বর্তমান কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকদের প্রাথমিক/মাধ্যমিক শিক্ষকদের সমান বেতনস্কেল দিয়ে তাদের চাকরি সরকারিকরণ করতে হবে ১,৩২,১৫০ জন কওমী মাদ্রাসার শিক্ষকদের দুঃখ কষ্ট দূর করতে হবে।

৩০.৮.২০০৮

কওমী মাদ্রাসার শিক্ষক সংখ্যা ১৩২১৫০ জন তথ্যটি নেয়া হয়েছে দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার ১১.০৪.২০০৯ তারিখ থেকে, মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের সূত্র অনুযায়ী।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কথা

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে। এই স্বাধীনতা যুদ্ধে লক্ষ-লক্ষ বাঙালির রক্তে বাংলার মাটি, বাংলার নদী-নালা, খাল-বিল লাল হয়েছে। দুই কোটি মানুষের ঘরবাড়ি পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এ দেশীয় সহযোগী রাজাকার-আলবদররা পুড়ে ছারখার করে দিয়েছে। এক কোটি নারী পুরুষ শিশু সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টে সাড়ে নয় মাস মুক্ত আকাশের নিচে জীবন ধারণ করেছে। দুই লাখ বাঙালি মুসলিম নারী পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। কোটি কোটি মানুষ পাক সেনা ও রাজাকারদের জন্যে প্রাণের ও ইজ্জতের ভয়ে নয় মাস ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছেন।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর, সারা বাংলাদেশ দাউ দাউ করে জ্বলেছে, অগণিত মানুষের রক্ত ঝরেছে, মর্টার-রাইফেলের গুলির আওয়াজে প্রকম্পিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর সচেতন মানুষের কাছে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি হত্যা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৭১ সালে যে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে তার নেতৃত্ব দিয়েছেন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলের জন প্রতিনিধিরা, তাদের সমর্থনেই মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, আর সেই সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, উপ ও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ, অর্থমন্ত্রী জনাব এম মনসুর আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ, সাহায্য পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার পশ্চিম বাংলার সীমান্তের কাছে বৈদ্যনাথ তলায় বিরাট আমবাগানে এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে প্রথম স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার হিসেবে দেশ-বিদেশের কয়েকশত সাংবাদিক ও জনসাধারণের সামনে শপথ গ্রহণ করেন। বৈদ্যনাথতলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মুজিবনগর। এখানেই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ দেশ-বিদেশের জনগণ ও সরকারের উদ্দেশ্যে প্রথম ভাষণ দেন। নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে অধ্যাপক ইউসুফ আলী স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৭ই এপ্রিল সেই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ যে ভাষণ বা বিবৃতি প্রদান করেন তা বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক অনন্য মহান এবং হৃদয়স্পর্শী দলিল। এই ভাষণে বাংলাদেশ সৃষ্টির পটভূমি সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের উচিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাজউদ্দিন আহমদের ঐ ভাষণ পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ১৭ই এপ্রিলের তাজউদ্দিনের সেই ভাষণ যারা পড়েছেন এবং পড়বেন তারা আমার এ বক্তব্যের সাথে অবশ্যই একমত হবেন।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল রাত ১০টায় আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে মুজিবনগরে সরকার প্রতিষ্ঠার ধারা বিবরণী এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দিনের বক্তৃতা সম্প্রচার করা হয়। যাদের বয়স ৩০/৩৫ বছরের বেশি তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ১৭ই এপ্রিল আকাশবাণীর কলকাতা বেতার কেন্দ্র বিকাল থেকেই ১০/১৫ মিনিট পর পর ঘোষণা করে, কলকাতা বেতারে রাত দশটায় একটি বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে, শ্রোতারা যেন অবশ্যই রাত ১০টার অনুষ্ঠান শোনেন। অবশেষে রাত দশটা বাজলে সেই বিশেষ অনুষ্ঠান কলকাতা বেতার থেকে প্রচার শুরু হয়– 'শোন একটি মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রণি। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেইকো শেষ। আহা! বাংলাদেশ–' গৌরী প্রসন্ন মজুমদারের এই গানটি সর্বপ্রথম বাজানোর মধ্য দিয়ে। এই গানের পরেই দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ভেসে আসে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও মুজিবনগর সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেবার কথা এবং মুজিবনগরের ১৭ই এপ্রিলের অনুষ্ঠানের ধারা বর্ণনা। এ ঘোষণা বা এ অনুষ্ঠান শোনার ফলে বাঙালির প্রাণে জেগে উঠে প্রাণের স্পন্দন, হৃদয়ে লাগে ঢেউয়ের দোলা, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, পাকিস্তান নামক বর্বর রাষ্ট্রের মৃত্যু হয়েছে, এ কথা জানতে পেরে। কাজেই ১৭ই এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশের দিন পঞ্জিকার পাতায় একটি মহান ও গৌরবোজ্জ্বল দিন, এ দিনকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ না করলে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজেকে পরিচয় দেয়া অসম্মানজনক কাজ হবে।

এখন আসা যাক কিভাবে এই মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো, কিভাবে স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো সে বিষয়ে। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের শান্তিকামী জনসাধারণের উপর আধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পাইকারী হারে গণহত্যা শুরু করে– হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করে। সাধারণ মানুষের ঘরবাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়- পিলখানার ইপিআর ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে আক্রমণ করে বাঙালি ইপিআর ও পুলিশদের হত্যা করা শুরু করে, বাঙালি ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যরাও মরার আগে বীরের মতো পাল্টা গুলি চালিয়ে পাক-সেনাবাহিনীর জবাব দেন। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের প্রধান ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। ফলে ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বীর বাঙালিরা।

পাকিস্তানি সেনাদের এই আক্রমণ ছিল দেশবাসীর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এমনভাবে হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে গুলি করে মারতে পারে, এমনভাবে মানুষের বাড়িঘর আগুন দিয়ে পুড়ে ছারখার করতে পারে তা ছিল কল্পনার বাইরে। ২৫শে মার্চ রাত ১১টা থেকে ঢাকায় কার্ফিউ জারি করে। ২৭শে মার্চ কার্ফিউ শিথিল করে। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আক্রমণের অল্প কিছুক্ষণ আগে রাত দশটার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে তাজউদ্দিন আহমদ, রাত ১১টার দিকে ড. কামাল হোসেন ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর বাসা হয়ে চলে আসেন তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায়, সেখান

www.pathagar.com

থেকে বের হয়ে তারা (তাজউদ্দিন, আমিরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন) সাত মসজিদ রোড দিয়ে লালমাটিয়ার দিকে যেতে থাকেন। এখানে ড. কামাল হোসেন তাজউদ্দিনকে বলেন একটি ফোন করে আসছি, আপনারা একটু অপেক্ষা করেন, এই বলে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে যান। কিন্তু তারা গোলাগুলির সম্মুখীন হন। তখন লালমাটিয়ার একটি বাড়িতে আশ্রয় নেবার কথা ভাবেন। সেই সময়ে লালমাটিয়া মোহাম্মদপুর অবাঙালি প্রধান এলাকা ছিল। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে বলেছিলেন "ভীষণ সংকটে পড়ে যাই, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম-তার পরিচিত একজনের বাসা খুঁজছিলেন। এমন সময় আমি বলি এই বাড়িটি বাঙালির বাড়ি হতে পারে, কেননা কালো পতাকা উড়ানো রয়েছে, তখন সে বাড়িতে ঢুকে পড়ি এবং দেখি তোমাদের পাবনা জেলার গফুর ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি, গফুর সাহেব রেলওয়ের তখন চিফ ইঞ্জিনিয়ার । সেখানে আশ্রয় নিই এবং তাড়াতাড়ি বাড়ির কালো পতাকা নামিয়ে ফেলতে বলি।' এই লেখাটি লিখবার সময় গফুর সাহেবের সাথে টেলিফোনে কথা বলে জানলাম রাত ১১-৪০ মিনিটে তাজউদ্দিন-আমিরুল ইসলাম তার বাসায় পৌঁছেন এবং আমার স্মৃতিশক্তি যে আমার সাথে প্রতারণা করে নি তার জন্য ভালো লাগছে যে, ১৯৭৪ সালে তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে শুনেছিলাম সে রাতে ঐ বাসায় চাল, ডাল, আলু ছিল কিন্তু সামান্য পরিমাণ লবণও ছিল না। লবণ ছাড়া আলু ভর্তা দিয়ে ভাত রান্না করে তাজউদ্দিন সাহেবেরা খেয়েছিলেন। কেননা ঐ বাসায় অন্য কোনও লোক ছিল না সে সময়, তাজউদ্দিন আমিরুল ইসলাম এবং গফুর সাহেব শুধু এই তিনজন। এ কথাও গফুর সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করলে তিনি সঠিক বলে ফোনে আমাকে জানালেন। সেখানে ২৫শে মার্চ রাত ২৬শে মার্চ দিন-রাত থেকে ২৭শে মার্চ কার্ফিউ তুলে নিলে সে বাড়ি ত্যাগ করে চলে যাই রায়ের বাজার ঝিগাতলা দিয়ে নদী পার হয়ে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ও আমি (তাজউদ্দিন) পায়ে হেঁটে দোহার আশরাফ আলী চৌধুরীর (মধু মিয়া) বাড়িতে। মধু মিয়া তখন আওয়ামী লীগের এমএনএ ছিলেন। সেখানে গোসল করে খেয়ে জয়পাড়া হাই স্কুলের দপ্তরিকে নিয়ে ফরিদপুর হয়ে কুষ্টিয়ার পথে সীমান্ত অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে রওনা দেই। কিছুদূর গিয়ে দপ্তরিকে বিদায় দেই। ঢাকা থেকেই পায়ে হেঁটে হাজার হাজার মানুষ প্রাণের ভয়ে চলে যাচ্ছে তাদের সাথে মিশে যাই। এই পায়ে হেঁটে চলার সময় বোঝা মাথায়, সন্তান কোলে, পথযাত্রী মানুষের বুক ফাটা কান্না ও আহাজারি শুনতে পাই। এসব লোকের মধ্যে অনেকের বাবা, মা, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে মারা গিয়েছে- তারা কাঁদছে আর বলছে- হে আল্লাহ, তুমি কোথায়, তুমি বিচার করো, এই পাকিস্তান যেনো ধ্বংস হয়, জানোয়ার পাকিস্তানি সেনাদের যেনো মৃত্যু হয়, তোমার ধর্ম যদি সত্য হয়, তোমার কোরআন যদি সত্য হয়, নবী-রসূল যদি সত্য হয় তবে যেনো পাকিস্তান ধ্বংস হয়। শয়তান পাকসেনাদের যেনো মৃত্যু হয় ইত্যাদি আহাজারি। তখন আমি (তাজউদ্দিন) ও আমিরুল ইসলাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, এটাই সঠিক সময় পাক-সামরিক জান্তাকে শায়েস্তা করার, যদি আমরা সরকার গঠন করি, যদি স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠন করি, তাহলে জনসাধারণ মেনে নেবে এবং সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকার করবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্যে। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে বলেছিলেন, 'যদি আমি এবং আমিরুল ইসলাম পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের কাফেলার সাথে না যেতাম তবে আমাদের মাথায় স্বাধীন

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা সেই সময় তাৎক্ষণিকভাবে আসতো কি না সন্দেহ। হাজার হাজার সাধারণ মানুষের কান্না এবং আহাজারি শুনে আমরা সিদ্ধান্ত নেই স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করবো। বাঙালি হত্যার প্রতিশোধ নেবো।" পায়ে হেঁটে এবং কিছুটা পথ রিকশাযোগে তাজউদ্দিন সাহেব ৩০ মার্চ ভারত সীমান্তের কাছে পৌঁছেন।

এরপর শোনা যাক ১৯৭১ সালের পশ্চিম বাংলার সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী বা বিএসএফ-এর আইজি গোলক মজুমদারের মুখ থেকে। আমার এবং তাঁর সাথে কথপোকথন বা সাক্ষাৎকার। ১৯৮৯ সালের ২৮শে মে গোলক মজুমদারের কলকাতার সল্টলেকের বাসায় আমি তাঁর সাথে দেখা করি, তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁর অবদানের জন্যে। কেননা আমরা যারা মুক্তিবাহিনীতে ছিলাম পরবর্তীকালে ছাত্র লীগ, আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বই-পুস্তক পড়েছি। সর্বোপরি তাজউদ্দিন আহমদ, আবদুল মান্নান, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম প্রমুখের সাথে পরিচিত হয়েছি, কথা বলেছি, তারা জানি বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ১৯৭১ সালে বিএসএফ-এর ডাইরেক্টর জেনারেল খুসরো রোস্তমজী, পশ্চিম বাংলার আইজি গোলক মজুমদার, ডিআইজি শরদিন্দু চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর লে. জেনারেল সরকার কি বিশাল অবদান রেখেছেন এবং কি কষ্ট করেছেন! সর্বোপরি ইন্দিরা গান্ধীসহ ভারতের কোটি কোটি জনতার অবদান তো রয়েছেই। কাজেই গোলক মজুমদারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সুযোগ পেয়ে তার মুখ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের অনেক কথা শুনে নিজে ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি বলে মনে করি।

১৯৮৯ সালের ২৮শে মে গোলক মজুমদারের সাথে সকাল নয়টার দিকে দেখা করতে যাই- বাংলা ভাষার প্রখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক গৌর কিশোর ঘোষ তাঁর সাথে টেলিফোনে কথা বলে আমার পরিচয় দিয়ে আমাকে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন। এখন তাঁর বয়স ৭৪ বছর, '৮৯ সালে ছিল ৭০ বছর। সল্টলেকে তাঁর সাথে কথা বলি ঐ কথার সংক্ষিপ্ত বিষয় এখানে পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে তুলে ধরছি: আমি বলি-স্যার, কেমন করে কি হয়ে গেল, আমরা কি চাইলাম, আর কি পেলাম। জবাবে তিনি বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কিছু অপ্রিয় মন্তব্য করে বলেন, তাঁর জন্যেই সব এলোমেলো এবং শেষ হয়ে গেল। কথাগুলো যদি সত্যও হয় তবুও মেনে নিতে খুব কষ্টকর। কেননা বঙ্গবন্ধুর নাম মুখে নিয়েই আমার যা কিছু পরিচিতি হয়েছে, যত দোষই থাক বঙ্গবন্ধু আমার পিতৃতুল্য। জবাবে আমি বলি- স্যার মনে হয় আমরা সবাই অপরের দোষটাই বেশি চোখে দেখি- নিজেদের দোষটা দেখি না। ১৯৭১ সালে আপনারা বা ভারতের সরকার, জনগণ অনেক ত্যাগ, অনেক কষ্ট করেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে, কিন্তু '৭১ সালে মুক্তিবাহিনীর সাথে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করেছেন। আর স্বাধীন বাংলাদেশে এই মুজিব বাহিনী থেকেই জাসদ, গণবাহিনী, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লাল বাহিনী ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে- তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল্যবোধ ও ভারতবিরোধী রাজনীতি করেছে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতাযুদ্ধের নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করে জনগণকে বিভ্রান্ত করে বাংলাদেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছে। কাজেই শেখ সাহেবের দোষ শুধু নয়, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার জন্যে ভারত সরকারের বেশ কিছু অবদান রয়েছে। জবাবে তিনি বলেন, (গোলক মজুমদার সাহেব) 'শুনুন ১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ দুপুরে একটি ফোন পেলাম কুষ্টিয়ার সীমান্ত থেকে তৌফিক এলাহি ও মাহবুব (এসপি) নামে দুই ভদ্রলোক বিএসএফ ক্যাম্পে এসেছে খবর নিয়ে যে তাজউদ্দিন আহমদ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম নামে আওয়ামী লীগের দুই নেতা ভারতে আসতে চান। তারা আসবে কি না, তখন আমি বেশ চিন্তায় পড়ে যাই, কি করা যায়। ঐ দিনই আবার দিল্লী থেকে ৩০ জন ভারত সরকারের ঊর্ধতন অফিসার পূর্ববাংলার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে রাতে কলকাতায় আসবেন, তার মধ্যে বিএসএফ-এর ডিজি রোস্তমজীও রয়েছেন। তখন সবাই প্লেনে... হোম সেক্রেটারি, ডিফেন্স সেক্রেটারি, কেবিনেট সেক্রেটারি সবাই। হোম মিনিস্টার দিল্লীর বাইরে। বাধ্য হয়ে ভয়ে ভয়ে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে ফোন করে বলি, ম্যাডাম আওয়ামী লীগের দুইজন নেতা তাজউদ্দিন ও আমিরুল ইসলাম ভারত আসবার জন্যে সীমান্তের ওপারে অপেক্ষা করছেন, তারা অনুমতি চাচ্ছেন- কি করবো? তখন মিসেস গান্ধী আমাকে (গোলক মজুমদার) বলেন, তুমি এক্ষণি কলকাতা থেকে চলে গিয়ে নিজে তাদের সীমান্তের ওপার থেকে সম্মানের সাথে নিয়ে আসবে এবং যত দ্রুত পারো দিল্লীতে তাদের নিয়ে এসো। মিসেস গান্ধীর সাথে ফোনে কথা বলেই ওয়ারলেসে সংবাদ পাঠাই তাদেরকে সীমান্তের ওপারেই অপেক্ষা করতে বলো, আমি নিজে আসছি। সাথে সাথে কলকাতা থেকে গাড়ি নিয়ে কুষ্টিয়ার সীমান্তের কাছে চলে যাই। গিয়ে ওপারে দেখি তাজউদ্দিন এবং আমিরুল ইসলাম একটি গাছের নিচে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে শুয়ে রয়েছেন খালি মাটির উপরে। গায়ের জামা দিয়ে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে তাজউদ্দিন আমাকে বলেছেন "সীমান্তে অনেকক্ষণ কষ্ট করে গাছতলায় মাটিতে বসেছিলাম, তওফিক ইলাহি ও মাহবুব (এসপি) বারবার আমাকে বলেন যে, চলেন যাই স্যার, কত মানুষ ভারতে যাচ্ছে কিছু হবে না। এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে তওফিক ও মাহবুবকে জোরে ধমক দিই "তোমাদের বেশি কষ্ট হলে তোমরা চলে যাও কিন্তু খবর না দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবো না।"

তাদের কাছে গিয়ে পরিচয় দিয়ে নিয়ে আসি, বিএসএফ-এর জোয়ানরা দল বেঁধে সেলুট করে তাঁদের গ্রহণ করেন। বিএসএফ ক্যাম্পে তাঁদের খাবার ব্যবস্থা করি এবং জোয়ানদের একটি শার্ট আমিরুল ইসলামকে দেই-তাজউদ্দিনের স্বাস্থ্যতো একটু মোটা ধরণের ছিল তার শার্ট পাওয়া কষ্টকর হয়, একজন হাওয়ালদার মেজরের একটি পাঞ্জাবি তাঁকে দেয়া হয়। তাঁদের আমার গাড়িতে করে নিয়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যার দিকে রওনা হই। সোজা দমদম বিমান বন্দরে চলে আসি। কেন না রাত এগারটায় দিল্লীর ঐ বিশেষ বিমান আসবার কথা- যে বিমানে ভারত সরকারের ৩০ জন কর্মকর্তা দিল্লী থেকে আসছেন এবং ঐ বিমানে আমাদের বিএসএফ-এর রোস্তমজীও রয়েছেন- তাকেও আমার রিসিভ করতে হবে।

www.pathagar.com

বিমান দমদমে এলে রোস্তমজীকে রিসিভ করি এবং তাঁকে বলি, স্যার, তাজউদ্দিন এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে আমরা পেয়েছি, ঐ আমার গাড়িতে তাঁরা অপেক্ষা করছেন। এ কথা শুনে তিনি ভীষণ খুশি হন এবং দৌঁড়ে গিয়ে জোয়ানরা যেভাবে অফিসারদের সেলুট করে- সেইভাবে তাজউদ্দিনকে সেলুট করে পরিচিত হন এবং একটু অপেক্ষা করতে বলেন। ঐ প্লেনে তখনকার ভারতের গোয়েন্দা বাহিনী 'র'-এর প্রধান রামাকান্ত কাও এসেছিলেন, তাঁর চোখে ঘটনাটা ধরা পড়ে এবং রোস্তমজীকে জিজ্ঞাসা করেন- ঐ গাড়িতে কে-যাকে তুমি দৌঁড়ে গিয়ে জোয়ানদের মতো সেলুট করলে? তখন তিনি সরল বিশ্বাসে বলে ফেলেন তাজউদ্দিন ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম রয়েছে, তাদের আমরা পেয়েছি। তখন 'র' প্রধান রামাকান্ত কাও বলেন- ওনারা রাজনীতিবিদ, ওনাদের আমরা নিয়ে যাবো। তোমাদের (বিএসএফ) ওনাদের সাথে কোনও কাজ নেই।" রোস্তমজী রাজি হন না, তিনি বলেন, "ওনারা আমাদের লোকের সাথে এসেছেন, আমাদের সাথেই থাকবেন, আমরা দিল্লীতে নিয়ে যাব।" দু'জনের সাথে তর্ক বেধে যায়, দু'জন একই র‍্যাংঙ্কের অফিসার। তখন রোস্তমজী বলেন- ঠিক আছে যদি তাজউদ্দিন তোমাদের সাথে যেতে চান তবে আমাদের আপত্তি নেই। তখন আমি (গোলক মজুমদার) রোস্তমজীকে, 'র' প্রধান রামাকান্ত কাও তাজউদ্দিনের কাছে নিয়ে কাওকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে রোস্তমজী বলেন- "উনি আপনাদের নিয়ে যেতে চান, আমরা চাই আপনারা আমাদের সাথে থাকুন।" তাজউদ্দিন সাথে সাথে জবাব দেন "কোনও গোয়েন্দা বাহিনীর লোকের সাথে কথা বলার আমার সামান্যতম প্রয়োজন এবং ইচ্ছা নেই। আমি রাজনীতিবিদ- রাজনীতির নেতার সাথে প্রথমে কথা বলবো এবং আপনাদের সাথে থাকবো। (বিএসএফ)।" তাজউদ্দিনের এ কথা শুনে 'র' প্রধান রামাকান্ত কাও বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে যান এবং কাজটা ভালো হলো না বলে মন্তব্য করে চলে যান। আমরা তাজউদ্দিন, আমিরুল ইসলামকে নিয়ে প্রথমে কলকাতার বিএসএফ- এর রেস্ট হাউস যাই, সেখান থেকে গোপনে আবার আসাম হাউস নামে অপর একটি রেস্ট হাউসে চলে যাই, কেননা ভয় হয়, যদি 'র' কোনও ক্ষতি করে ইত্যাদি ভেবে। সেখান থেকে রাতেই বিএসএফ-এর লোকজন, বহু কষ্ট করে কলকাতা শহর থেকে দর্জি সংগ্রহ করে তাজউদ্দিন, আমিরুল ইসলামের গায়ের মাপ নিয়ে জামা-কাপড় বানানোর ব্যবস্থা করে ঐ রাতেই।

পরদিন বিমানযোগে আমি (গোলক মজুমদার) তাজউদ্দিন, আমিরুল ইসলামকে নিয়ে দিল্লী রওনা হই। গোলক মজুমদার বলেন- "দেখুন আজ থেকে ১৯/২০ বছর আগে '৭১-সালে এত ভালো প্লেনতো ছিল না, কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে ৮/১০ ঘণ্টা সময় লাগতো। দিল্লী যেতে বিহারে প্লেন ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে পড়ে, বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে কোন ক্রমে আমরা রক্ষা পাই, বিহারের একটি জায়গায় প্লেন ফোর্সল্যান্ড করে অপেক্ষা করতে থাকে। রাতে আমরা দিল্লীতে পৌঁছতে পারি নি। পরদিন সকালে দিল্লী পৌঁছি, পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রীর লোকজনের সাথে তাঁদের যোগাযোগ করে নির্দিষ্ট রেস্ট হাউসে পৌঁছে দিয়ে আমার দিল্লীর আত্মীয়ের বাসায় এসে দেখি আমার সব আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে এবং কান্নাকাটি করছে, কেননা ১৫/২০ মিনিট পর পর মিসেস গান্ধীর

www.pathagar.com

বাসা এবং অফিস থেকে সারা রাত ফোন করছে আমি বাসায় এসেছি কি না- বাসার লোকজনের ধারণা হয়েছে বিমান দুর্ঘটনায় আমরা মারা গিয়েছি। যাক এর মধ্যে 'র' মিসেস গান্ধীকে বলেছে যে-বিএসএফ তাজউদ্দিন ও আমিরুল ইসলাম নামের যে দু'জনকে এনেছে তারা আসলে তাজউদ্দিন, আমিরুল ইসলাম নয় নকল লোক। আবার সংকট, এটাকে ঠিক করা হলো- প্রফেসর ইউসুফ আলী, এডভোকেট সিরাজুল হক ও এম আর সিদ্দিকীকে দিয়ে তাদের এনে আইডেনটিফাই করে নিশ্চিত হয়ে ৪ঠা এপ্রিল মিসেস গান্ধীর সাথে সাক্ষাতকারের ব্যবস্থা করা হয়।"

গোলক মজুমদার আরো বলেন, 'র-এর এই দু'টি ব্যর্থতায় মিসেস গান্ধী বেশ বিরক্ত হন এবং তিরস্কার করেন। প্রথমতো 'র' তাজউদ্দিনকে সংগ্রহ করতে না পারায়, দ্বিতীয়ত: মিসেস গান্ধীকে মিথ্যা কথা বলায় যে আসল তাজউদ্দিন নয়। এতে 'র' প্রধান রামাকান্ত কাও আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং এই ছোট ঘটনা থেকে সে তাজউদ্দিনের প্রতি বিরক্ত হয় পরে বাংলাদেশের ছাত্র-যুবনেতাদের নিয়ে ডিপি ধরকে ধরে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করেন, এই সৃষ্টির পেছনে তার তাজউদ্দিন বিদ্বেষ কাজ করেছিল ধরে নেয়া যায় । ডিপি ধর বেশ সরল-সোজা মানুষ ছিলেন। তিনি মিসেস গান্ধীর ক্লাসমেট ছিলেন, তাকে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে "বুদ্ধিমান লোক সকল ডিম এক ঝুঁড়িতে রাখে না" এই তত্ত্ব দিয়ে মুজিব বাহিনীর সৃষ্টি করেন তাজউদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু পরে যখন মিসেস গান্ধী সব জানতে পারেন তখন তিনি মুজিব বাহিনী বন্ধ করে দেবার জন্যে হুকুম দেন। অক্টোবর-নভেম্বর থেকে মুজিব বাহিনীকে ভারত সরকার কোনো সাহায্য করে নি। আপনি বলছেন, মুজিব বাহিনীর জন্যে বাংলাদেশের বর্তমান এই অবস্থা। দেশ স্বাধীন হবার পরে আপনারা বা আপনাদের সরকার কি করেছেন? কেন তাদের আশ্রয় দিয়েছেন, কেন মুজিব বাহিনীর নেতাদের দমন করা হয় নি? আসলে মুজিব বাহিনী অনেকটা দোষে দোষী হলেও মুজিবুর রহমানই প্রধান ব্যক্তি যার জন্যে সব এলোমেলো হয়েছে।"

এবারে গোলক মজুমদার থেকে আবার তাজউদ্দিন সাহেবের কথায় ফেরা যাক। তাজউদ্দিন সাহেব তো ঢাকা থেকে পায়ে হেঁটে যাবার সময়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করার কথা চিন্তা করেন। এখন এই সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক এবং প্রায়োগিক অবস্থায় নিয়ে যেতে অবশ্যই ভারত সরকার বা মিসেস গান্ধীর সাহায্য দরকার। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে বলেছেন- মিসেস গান্ধীর সাথে দেখা করার সময়ে আমাকে বসতে না বলে প্রথমেই খুব উৎকণ্ঠার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করেন (ইংরেজিতে) "শেখ মুজিব কোথায়?" এ প্রশ্নের জবাবে তাজউদ্দিন সাহেব যা উত্তর দিয়েছিলেন, ঐ সময়ে তা কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। তাজউদ্দিন সাহেবের মতো প্রতিভাবান মানুষেরাই এমন জবাব দিতে পারেন। তাজউদ্দিন সাহেব জবাব দিয়েছিলেন, 'তিনি আমাদের সাথেই আছেন।' সাথে না কি মিসেস গান্ধী একজন সাধারণ মহিলার মতো মুখ বাঁকা করে মৃদু হেসে উঠেন। তাজউদ্দিন সাহেবের মুখ থেকে শোনা-এরপর তাঁকে (তাজউদ্দিনকে) বসতে বলে মিসেস গান্ধী খুব গম্ভীর হয়ে যান এবং প্রায় ২/৩ মিনিট কোনও কথা বলেন না- গালে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে চিন্তা করতে থাকেন। এরপর তাজউদ্দিন সাহেবকে কয়েকবার ইংরেজিতে বলেন- "ভালোভাবে চিন্তা করে দেখ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তুমি কতটুকু কনফিডেন্ট, আবার ভাবো, বারে বারে ভেবে দেখো ইত্যাদি।"

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন সাহেব তখন না কি প্রায় ৯০ মিনিট বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি জাতি সম্পর্কে মিসেস গান্ধীকে কথা বলে কনভিন্স করেন যে, বঙ্গবন্ধু যেখানেই থাক আমাদের সাথেই থাকবেন। তখন মিসেস গান্ধী তাজউদ্দিন সাহেব কি করতে চান তা জানতে চান, এবং তার স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্ল্যান অনুমোদন করে সামনে এগিয়ে যাবার সম্মতি প্রদান করেন। সেখানে আর একজন উপস্থিত ছিলেন বি,এস,এফরে ডাইরেক্টর জেনারেল খুসরো রুস্তমজী। তাজউদ্দিন সাহেব প্রায় ৯০ মিনিট পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার সময় থেকে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনাবলির সঠিক চিত্র ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীর সামনে তুলে ধরেন এবং ২৫ মার্চ রাতের বর্বর হত্যাকাণ্ডের সমস্ত ঘটনার বর্ণনা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য ম্যাডাম গান্ধীর সাহায্য চান।

তাজউদ্দিন সাহেব স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠার জন্যে মিসেস গান্ধীর সাহায্য-সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন। এবারে তাজউদ্দিন সাহেবের সামনে নেমে এল সবচেয়ে বড় বাধা। শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা ১৯৭১ সালের ৮ এবং ৯ এপ্রিল আগরতলায় সমবেত হন। তাজউদ্দিন এই বৈঠক ডেকেছিলেন ভারতের বিএসএফ-এর মাধ্যমে সংবাদ দিয়ে, এবং বিএসএফ-এর সাহায্যে। তাজউদ্দিনের ডাকা আওয়ামী লীগ নেতাদের আগরতলার এই বৈঠকে তাজউদ্দিন আমিরুল ইসলামের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা আওয়ামী লীগ, ছাত্র লীগ ও যুব নেতাদের বলতেই প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করেন, কয়েকজন প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামেন। অন্যদিকে চারজন যুব নেতার (সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহম্মেদ) নেতৃত্বে বিপ্লবী কাউন্সিল করার জন্যে প্রবল চাপ, প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হন তাজউদ্দিন সাহেব। কেন তিনি প্রধানমন্ত্রী হবেন, কেন তিনি একা ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করলেন ইত্যাদি প্রশ্ন। তখন যে লোকটি এই সংকট থেকে তাজউদ্দিন আহমদকে রক্ষা ও সাহায্য করেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার প্রতিষ্ঠা করতে, কয়েকজন বন্ধু ও সহকর্মী নিয়ে, তিনি আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল মান্নান। জনাব মান্নান তখন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক। জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ নজরুলকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হবার জন্যে এবং তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নেবার জন্যে রাজি করেন। যখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী পদ পাবার প্রতিযোগিতা থেকে সরে এসে তাজউদ্দিনকে সমর্থন করেন তখন পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করার পেছনে জনাব আবদুল মান্নানের অবদান অস্বীকার করা হলে অন্যায় করা হবে। আগরতলায় ৯ই এপ্রিল আবদুল মান্নান তাঁর সাথী-বন্ধুদের নিয়ে যে ভূমিকা পালন করেছেন ইতিহাসে তা উল্লেখ করে না রাখলে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের ইতিহাস কোনোদিন সঠিক ভিত্তি পাবে না। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস লিখতে উৎসাহী তাদের উচিত মান্নান সাহেবের ঐ ভূমিকাটিকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মূল্যায়ন করা। মান্নান সাহেবের মধ্যস্থতা করার জন্যেই তাজউদ্দিনের প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল থাকা সম্ভব হয়েছিল। আর তাজউদ্দিন সাহেব প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন বলেই সঠিক এবং সুন্দরভাবে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পন্ন হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন সাহেবের মতো প্রজ্ঞাবান, ত্যাগী, নিষ্ঠাবান, সাত্ত্বিক ব্যক্তি যদি স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে প্রধানমন্ত্রী না হতেন তবে স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিণতি কি হতো তা বলা মুশকিল। আর সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বহাল রাখার জন্যে আবদুল মান্নান তাঁর সাথী-বন্ধুদের নিয়ে ঐদিন যে অবদান রেখেছেন স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মের পেছনে এর ভূমিকা বিশাল। ৯ই এপ্রিল আগরতলায় তাজউদ্দিনের তৈরি মন্ত্রী পরিষদকে আওয়ামী লীগের সব সিনিয়র নেতাই মেনে নেন। কিন্তু চার যুব নেতা (সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ) মেনে নেয় নি। তাদের দাবি-তাদের চারজনের নেতৃত্বে বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করতে হবে, তাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ হবে। খন্দকার মোস্তাক প্রতিবাদ জানিয়ে মক্কায় হজ্বে যাবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে সম্মত হন। এই চার যুব নেতা মুজিব বাহিনী সৃষ্টি করে ও খন্দকার মোস্তাক সমগ্র স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাজউদ্দিনের মন্ত্রী সভার বিরোধিতা করেছেন। মান্নান সাহেব যদি সেদিন সৈয়দ নজরুলকে উপ-রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী পদে বহাল রাখার জন্যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন না করতেন তবে সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে কেন্দ্র করে আফগানিস্তান, কম্বোডিয়ার মতো কয়েকটি সরকার গঠন হতো, ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধ সফল না হয়ে ব্যর্থ হয়ে যেতো। ১০ই এপ্রিল আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের সকাল ৮-১০ মিনিটের খবরে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের কথা প্রচার করা হয়।

১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শপথ গ্রহণ করেন, স্বাধীনতার ঘোষণা পত্রের সনদ পাঠ করা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। মুজিবনগরের এই অনুষ্ঠান আয়োজন করার জন্যে তাজউদ্দিন আহমদ, আবদুল মান্নান ও আমিরুল ইসলামকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ১৭ই এপ্রিলের মুজিবনগরের আম্রকাননের এই অনুষ্ঠানে ভারত সরকার সেদিন একশত গাড়ি (টেক্সি) সরবরাহ করেছিল কলকাতার গড়ের মাঠে, সেখান থেকে খুব ভোরে ঐ গাড়ি ভরে কয়েকশত সাংবাদিক ও নির্বাচিত এমএনএ ও এমপিএ, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং ভারত সরকারের কয়েকজন অফিসার কুষ্টিয়ার বৈদ্যনাথতলা বা মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন আব্দুল মান্নান ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে। জনাব মাহবুবউদ্দিন আহমদ (এসপি) ও তৌফিক এলাহি চৌধুরী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন এবং জনাব মাহবুব ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুলকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। মুজিবনগরে সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মঞ্চে যারা উপবিষ্ট ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন- সর্ব জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান, আবদুল মান্নান, প্রধান সেনাপতি কর্ণেল এম এ জি ওসমানী।

১৭ই এপ্রিলের মুজিবনগরের মঞ্চে চেয়ারে বসার সম্মান লাভ করেছিলেন সাতজন নেতা। তাদের মধ্যে পাঁচজন পরলোক গমন করেছেন, একজন বিশ্বাসঘাতকতা ও বন্ধু হত্যার অভিযোগ নিয়ে একাকিত্বের জীবন-যাপন করছেন, একমাত্র আবদুল মান্নানই '৭১-এর আলোর শিখা নিয়ে আজও মূল রাজনীতিতে অবদান রেখে আলোকিত করে

www.pathagar.com

চলেছেন। এ ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম স্থপতি ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কোনও শিবিরে যোগ না দিয়ে একজন স্বাধীনচেতা রাজনীতিবিদ হিসেবে কাজ করে চলেছেন। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও সরকার গঠনের এই হচ্ছে মোটামুটি নেপথ্য কথা। যে সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অবদান আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। ১০/৪/১৯৯২ তারিখে লেখা।

[সূত্রঃ- লেখকের তাজউদ্দিন আহমদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুল মান্নান-এর সাথে বিভিন্ন সময়ে কথোপকথন, গোলক মজুমদারের সাথে সাক্ষাৎকার এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামএর লেখা ও কাজী শাহেদ আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত "মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি" এবং মইদুল হাসানের "মূলধারা-৭১" গ্রন্থ দু'টির সহায়তায় এই লেখাটি লেখা হয়েছে।]

দৈনিক আজকের কাগজে ৬/৫/১৯৯২ ও ৯/৫/১৯৯২ দুই দিনে প্রকাশিত

বিঃ দ্রঃ- লেখাটি আজকের কাগজে প্রকাশিত হবার ২/১ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সভা হয়, সেখানে সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী আওয়ামী লীগের নেতা জনাব আব্দুস সামাদ আজাদ সাহেব আওয়ামী লীগের নেতা বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নানকে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এই বলে যে– "মান্নান পরিবর্তন সম্পাদক বাবলু মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটি লেখা আজকের কাগজে লিখেছে তা কি তুমি পড়েছো?" জবাবে মান্নান সাহেব বলেছিলেন-হ্যাঁ বাবলুর ঐ লেখা পড়েছি। ওকি ওখানে কোনও অসত্য বা মিথ্যা কথা লিখেছে? তখন নাকি সামাদ সাহেব মাথা নিচু করে বিষন্ন কণ্ঠে বলেছিলেন– "না তা লেখে নাই, এমনি জিজ্ঞাসা করলাম।"

www.pathagar.com

বইয়ের নাম মহাভারত, প্লেটোর রিপাবলিক এবং আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

বর্তমান মানব সভ্যতার ইতিহাসে যেসব বই দলমত, ধর্মবর্ণ, নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে অতি শ্রদ্ধেয় আমার মনে হয় তার মধ্যে যে তিনটি বই প্রথম পাঁচটি বইয়ের মধ্যে অবশ্যই স্থান করে নিবে তা হচ্ছে– মহাভারত, বেনজামিন জয়েটের লেখা প্লেটোর রিপাবলিক, এবং মহাত্মা গান্ধীর লেখা My exprement with truth বা আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। উল্লেখিত এই তিনটি বই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার মত যে বিশাল বিদ্যাবুদ্ধি বা সাহসের প্রয়োজন তার শত ভাগের এক ভাগও আমার যে নেই সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। তবে এই বই তিনটি পড়তে গিয়ে মহাভারতের লেখক কথক ব্যাশদেবের প্রতি, প্লেটোর রিপাবলিকের কথক মহাপণ্ডিত মহান দার্শনিক বর্তমান সভ্যতার সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক সক্রেটিস এবং আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগের লেখক মহাত্মা গান্ধীর এই ৩ জনের প্রতি আমার শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে যায়, ভক্তিতে তাদের প্রতি আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ি। কি দারুণ বই তারা লিখে গিয়েছেন– পশ্চিমী বা ইউরোপীয় রাজনীতি বা দর্শনের ভিত্তি হচ্ছে সক্রেটিস, প্লেটো এবং এ্যারিস্টোটল, এই তিনজনের প্রধানতম ব্যক্তিহচ্ছেন সক্রেটিস। সক্রেটিসের শিষ্য হচ্ছেন প্লেটো এবং প্লেটোর শিষ্য হচ্ছেন এ্যারিস্টোটল। সক্রেটিস যা তার শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছেন প্লেটো তা লিখে পৃথিবীর মানুষের কাছে হাজির করেছেন। প্লেটোর রিপাবলিক নামক বইটি অনেকদিন যাবত আমার অতিপ্রিয়, ছাত্র জীবনে আমার পাঠ্য তালিকায় ছিল, সেই ১৯৭৪ সন থেকে বেনজামিন জয়েটের লেখা সরদার ফজলুল করীমের অনুবাদিত বইটির সাথে পরিচিত হবার পর থেকে একটি নিবিঢ় সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে সে থেকে আজ পর্যন্ত প্রায়ই বইটি পড়ি। বইটির পড়তে গিয়ে চিন্তায় আচ্ছন্ন হতে হয়, আমাকে থমকে দাঁড় করিয়ে দেয়, মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, ন্যায়, আত্মা, পাপ, ঘৃণা, নারী-পুরুষ, প্রেম-ভালোবাসা, মানুষের কর্তব্যবোধ, কি করা উচিত, কি করা উচিত নয়, এসব নিয়ে গভীরভাবে ভাবিয়ে তোলে।, ১৯৭৪ সন থেকে বইটির সাথে পরিচিত হবার পর থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত প্রতি রাতে শয্যা গ্রহণ করে বালিশ মাথা দিয়ে কয়েক পৃষ্ঠা পড়ে তা নিয়ে ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। এখনও প্লেটোর রিপাবলিক মাঝে মধ্যেই পড়ি। মোট কথা ইউরোপীয় সভ্যতার বিকাশের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে সক্রেটিসের চিন্তাধারা বা চিন্তাচেতনা, আর সক্রেটিসের চিন্তাচেতনা বা ভাবনার সমষ্টি হচ্ছে প্লেটোর রিপাবলিক নামক বই। রাষ্ট্র কি, সমাজ কি, নাগরিক কারা, কারা নাগরিক নয়, রাষ্ট্রের প্রতি শাসকের কর্তব্য কি, রাষ্ট্রে নাগরিকদের কর্তব্য কি মানুষের ধর্ম কি, মানুষের কি করা উচিৎ কি করা উচিৎ নয়, এসব সুন্দরভাবে বিধৃত রয়েছে প্লেটোর রিপাবলিক বইতে।

www.pathagar.com

প্লেটোর রিপাবলিক বইতে প্লেটো তার গুরু সক্রেটিসের আদর্শ রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য আদর্শ শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। প্লেটো লিখেছেন যে– ৫ বছর বয়স থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত সবাইকে একই ধরনের শিক্ষা দেওয়া হবে শারীরিক শক্তির বিকাশ, ভাষা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, ইত্যাদি।

১৮ বছর শেষ হলে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে ২২ বছর পর্যন্ত সেনা বাহিনীতে অবশ্যই যোগ দিতে হবে এবং দেশের জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। ২২ বছর পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও ১৮ বছরের শিক্ষা জীবনের শিক্ষায় যারা ভাল ফল বা পারদর্শী হবে তাদের উচ্চ শিক্ষায় সুযোগ করে দিতে হবে। বাকী যারা থাকলো তাদের রাষ্ট্রে বিভিন্ন উৎপাদনের এবং সেবামূলক কাজে লাগাতে হবে। তাদের উচ্চশিক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া যাবেনা।

যারা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাবে তাদের দশ বছর উচ্চ বা উন্নত শিক্ষার সুযোগ দিয়ে উন্নত শিক্ষা দিয়ে ৪০ বছরের বেশি বয়স হলে তাদের মধ্য থেকে যারা শ্রেষ্ঠ হবে তাদেরকে রাষ্ট্রীয় শাসক হিসেবে কাজে বসাতে হবে। বাকীদের তাদের হুকুম তামিল করার জন্য প্রশাসনে বসবে। শাসকদের অবশ্যই দয়ালু, ন্যায়নিষ্ঠ, এবং মানুষের সেবায় নিবেদিত প্রাণ হতে হবে। প্লেটো বলেছেন– মানুষ ক্রাইম বা পাপ এবং দুনীর্তি করে তার মূলে রয়েছে তার ব্যক্তিগত স্ত্রী-সন্তান কন্যাদের কথা চিন্তা করে তাদের খাদ্য যোগাবার জন্য, তাদের সুখ শান্তি, সম্পত্তি দেবার জন্য মানুষ অন্যায় বা অবৈধ কাজে নিয়োজিত হয়। কাজেই কোন মানুষের ব্যক্তিগত স্ত্রী সন্তান কন্যা থাকতে পারবে না আদর্শ বা সুখী রাষ্ট্রে। যে রাষ্ট্রে মানুষের ব্যক্তিগত স্ত্রী-সন্তান কন্যা থাকবে সেখান থেকে অন্যায় অবৈধ কাজ নির্মূল করা খুব কঠিণ কাজ।

তাই সক্রেটিস সুপারিশ করেছেন– রাষ্ট্র সব লোকের থাকার, খাবার, চিকিৎসা ও পোষাকের ব্যবস্থা করবেন। মানুষের যৌন সুখের জন্য এবং রাষ্ট্রে লোক সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বছরের বসন্ত ঋতু চলার সময়ে বহু ক্যাম্প বা শিবির স্থাপত হবে- সেখানে যার যাকে ভালো লাগে তার সাথে যৌন মিলন করবে এবং একজনকে যদি একাধিক ব্যক্তি পছন্দ করে তবে লটারীর মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান হবে। কোনক্রমেই ব্যক্তিগত বিবাহ প্রথা রাখা যাবে না। প্লেটো বা সক্রেটিসের এ চিন্তাকে প্লেটোর প্রিয় শিষ্য এরিষ্টটল থেকে শুরু করে অনেকে এটাকে গাজাখুরি চিন্তাভবনা বলেছেন।

কিন্তু একথার মধ্যে সারকথা বা যুক্তি আছে। ঢাকা শহরে সেন্টগ্রেগরী হাইস্কুল, নটরডেম কলেজ, হলিক্রস হাসপাতাল কলেজ, সেন্ট জোসেফ স্কুল যাদের কর্তৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে– তারা কিন্তু সন্ন্যাসী, বিবাহ করেন নাই। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান অনেক উচ্চ, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন আর্থিক অনিয়মের কথা কোনদিন শোনা যায় না। অবিবাহিত সন্ন্যাসীরা পরিচালনা করেন বলেই এই সাফল্য।

সারা পৃথিবীতে সেবামূলক সবচেয়ে নামীদামী হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অবিবাহিত সন্ন্যাসীরাই পরিচালনার করে চলছেন– প্রায় দুই হাজার বছর থেকে, প্লেটোর রিপাবলিক বইয়ের শিক্ষা নিয়েই তারা এসব মহৎ কর্ম করছেন, কাজেই প্লেটোর বিবাহ

www.pathagar.com

সংক্রান্ত মতবাদকে কাল্পনিক ও গাজাখুরি বলে আখ্যা দেওয়া কতটুকু যুক্তিসংগত তা ভেবে দেখা দরকার।

১৯৮০ সনের পরিচয় হয় মহাত্মা গান্ধীর লেখা আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ নামক বইটির সাথে। এটিও একটি অসাধারণ শক্তিশালী বই। এই বই পড়েও প্রায় আত্‌কে উঠি। আমার আত্মা আমার হৃদয়, আমার অনুভূতিতে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ বইটি মহাত্মা গান্ধীর আত্মজীবনীমূলক বই, আবার পূর্ণ আত্মজবনীও নয়, তার বিশাল কর্মময় জীবনের (১৮৬৯ জন্ম ঃ ১৯৪৮ মৃত্যু) ১৯২৬ সন পর্যন্ত আত্মকথা বা আত্মজীবনের ছোট বড় উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রাঞ্জল বর্ণনা এ বইতে তিনি লিখেছেন।

সব ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তার জীবন ও ধর্ম বিশ্বাস কি মানুষের কর্তব্য বা কর্ম কি হওয়া উচিৎ এসব ব্যক্ত করেছেন তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়ে। মহাত্মা গান্ধী-এ বইতে বারবার উল্লেখ করেছেন– ঈশ্বর বা পৃথিবী, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী, গ্রহ-নক্ষত্রসহ সবকিছুর স্রষ্টা যিনি তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর, আল্লাহ, গড্‌-ভগবান, যার অবস্থান হচ্ছে সত্যের মাঝে বা সাথে। যেখানে সত্য সেখানেই তিনি অবস্থান করেন যে ব্যক্তি সত্যের সাথে বসবাস করেন মিথ্যাকে পরিহার করে চলেন বিপদের সময় ভগবান ও কৃষ্ণ এসে সর্বশক্তি নিয়ে দাঁড়ান। সত্য কথা এবং সৎকর্মের মাঝে যে ব্যক্তি নিজেকে সমর্পন করবে তার কোন বিপদ নেই। আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ নামক বইতে বারেবারে তিনি তার বর্ণনা করেছেন।

আত্মকথা বা সত্যের প্রয়োগ বইতে মহাত্মা গান্ধী লিখেছেন– ইসলাম ধর্মের পবিত্র কোরআনসহ অন্যান্য প্রধান বইয়ের, খৃষ্টান ধর্মের বাইবেলসহ অন্যান্য সব প্রধান বইয়ের, হিন্দুধর্মের রামায়ন, মহাভারত, গীতা, বেদ উপনিষদসহ প্রধান প্রধান বইতে, বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিপিটকসহ প্রধান প্রধান বইতে ইহুদি ধর্মের যাবতীয় প্রধান প্রধান বইতে- জৈন-শিখ ধর্মের প্রধান প্রধান বইতে মাত্র ৪টি বিষয় বা চারটি কাজ মানুষকে অবশ্যই করতে বলা হয়েছে– তা হচ্ছে (১) সদাসত্য কথা বলা, কোনক্রমেই বিন্দু পরিমাণ মিথ্যা কথা না বলা (২) কোনক্রমেই কোন মানুষ বা প্রাণীর বিন্দু পরিমাণ প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ক্ষতি না করা। (৩) জবান লিখিত বা মৌখিক প্রতিশ্রুতি যেভাবেই হোক না কেন তা মান্য করা, কোনক্রমেই আশ্বাস বা চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না– আশ্বাস বা চুক্তি ভঙ্গ করা গুরুতর বা ভয়াবহ পাপ। আশ্বাস বা চুক্তি ভঙ্গ করলে মানুষের মনে দুঃখ দেওয়া হয়, বা মানুষ দুঃখ পায়, একজন মানুষের মনে কষ্ট বা দুঃখ দিলে মসজিদ-মন্দির বা উপাসনালয় ভাঙলে যে পাপ হয় তার চেয়ে বেশ পাপ হয়, প্রতিশ্রুতি বা চুক্তিভঙ্গ করলে তা লিখিত বা মৌখিক যাই হোক না কেন। কাজেই জবান বা চুক্তি মেনে চলতে হবে, মৃত্যুকে বরণ করতে হবে, কিন্তু কোনক্রমেই কথার বা চুক্তির বরখেলাপ করা যাবে না। (৪) সহজ সরল পাক-পবিত্র সুস্থ জীবনযাপন করতে হবে। এই চারটিই হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর মতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্মের সার বা মূল কথা। যারা এই চারটি মেনে চলবে তারাই খাঁটি হিন্দু, খাঁটি মুসলিম, খাঁটি খৃষ্টান, খাঁটি বৌদ্ধ, খাঁটি ইহুদি, শিখ, জৈন, কাজেই তিনি এই

www.pathagar.com

চারটিকেই তার জীবন চলার প্রধান ভিত্তি বা পথ হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন। এই চারটি বিষয় মহাত্মা নিজে মানতেন সবাইকে মেনে চলতে, জীবনাদর্শ হিসেবে বেছে নিতে বলেছেন। কাজেই তার ভক্তরা নাকি এটাকেই গান্ধীবাদ হিসেবে সখ করে নাম দিয়েছেন, সে থেকে এটাই নাকি গান্ধীবাদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। গান্ধী বলেছেন কোন মানুষ যদি সত্যের পথে থাকে কোন সময় বিপদে পড়ে তবে তাকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ, ঈশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, ভগবান, গড্ একসাথে এসে তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আসেন। এটাই মহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর লেখা My experiment with truth বা আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ বইয়ের মূলকথা।

অপর বইটির নাম মহাভারত। মানুষ কথায় বলে- যা নাই মহাভারতে তা নেই ভূভারতে। আসলেই কথাটা সত্য, মহাভারতে যার বর্ণনা বা উল্লেখ নেই পৃথিবীর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। বিস্ময়কর বই- মানব সমাজের জন্য এ বইয়ের তুলনা নেই। মহা মূল্যবান উপদেশ, কত মূল্যবান ঘটনার বর্ণনা করে মানুষকে তা থেকে শিক্ষা নেবার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে, কত নীতি ও আদর্শের কথা এই মহাভারতে যে রয়েছে তা ভাবতে গিয়ে শুধু বিস্ময় এবং বিস্ময়ের মধ্যে পড়তে হয়। মানুষের কর্তব্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা নেবার এ এক মহাজীবন সুধা। এ মহা সুধা সেবন না করলে মানব জন্ম বৃথা। যারা মহাভারত বইটি পড়েছেন তারাই শুধু জানেন বা বুঝতে পারেন তারা জীবনে কি মহামূল্যবান একটি বই পড়েছেন এবং যারা পড়েন নাই তাদের সম্পর্কে কি করুণা হয়। মহাভারত নামক বই সম্পর্ক মন্তব্য করার মত বিদ্যা- বুদ্ধি আমার নেই, শুধু মনের আবেগের দু'চারটা কথাই এখানে লিখলাম।

মহাভারতের চরিত্র বিদুর যিনি ন্যায়নিষ্ঠ, ধার্মিক ও গরিব। সঞ্জয় যিনি পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে এবং কে-কি বলছেন এক যায়গায় থেকে তিনি সব দেখেন সব শোনেন এবং তা অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধরাজা, অসাধারণ জ্ঞানী, প্রজ্ঞাবান, কিন্তু পুত্রস্নেহে অন্ধ ১০০ ছেলে দুর্জধন, দুঃশাসন তারা অন্যায় করে কিন্তু রাজা ধৃতরাষ্ট্র তার প্রতিবাদ করে না, বরং খুব যুক্তি তর্ক দিয়ে তা সমর্থন করেন যার জন্য মহাযুদ্ধ হয় ধৃত রাষ্ট্র তথা যাদব বংশের ধ্বংস হয়। কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে সমস্ত (২/৪ জন ছাড়া) বীর এবং ব্রাহ্মণদের মৃত্যু হয়- বেঁচে থাকে শুধু বৈশ্য ও নমসুদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা। বৈশ্য বা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা শাসন ক্ষমতায় বসে (মৌশল পর্ব) ৩৬ বছর ক্ষমতায় থাকে, অন্যায় অশান্তিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, নিজেরা নিজেরা মারামারি করে তাতে সবার মৃত্যু হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের শাসন চলছে, এটা মৌশল পর্বের আলামত।

মহাভারতের শিক্ষা রাষ্ট্র বা দেশ পরিচালনার জন্য এক সম্প্রদায়ের লোক শুধু জ্ঞান অর্জন করবে এবং তারা শাসক বা ক্ষত্রীয়দের বুদ্ধি দেবে- তাদের বুদ্ধিমত শাসনকার্য পরিচালিত করবে ক্ষত্রীয় সম্প্রদায় এরা সৈনিক হবে, যুদ্ধ করবে, প্রশাসন চালাবে। যারা প্রশাসন চালাবে সৈনিক হবে তারা কোন বুদ্ধি বা আইন করতে পারবে না। আবার যারা বুদ্ধি দেবে তারা প্রশাসনের ধারে কাছে আসবে না। বৈশ্য বা ব্যবসায়ী শ্রেণী কোন

www.pathagar.com

ক্রমেই রাষ্ট্র বা সমাজ পরিচালনার কাজে বুদ্ধি দিতে সৈনিক হতে এবং শাসন কাজ পরিচালনার আশেপাশে আসতে পারবে না। নমসুদ্র শ্রেণী কায়িক শ্রমের কাজ করবে যে কাজের সাথে বুদ্ধির তেমন প্রয়োজন নেই, শুধু শারীরিক পরিশ্রম এগুলো কম বুদ্ধির লোকেরা বা নমশুদ্র শ্রেণীর লোকেরা করবে। ডিভিশন অব লেবার বা ক্লাসিফিকেশন অব লেবার, যার যে কাজ সে সেই কাজে নিষ্ঠার সাথে করবে। প্লেটো বা ইউরোপিয়ান রাষ্ট্র চিন্তারও মূলভিত্তি বা কথাও এটাই। ভারতীয় চিন্তাবিদেরা বলেন সক্রেটিস প্লেটো-মহাভারত নামক বই থেকে শিক্ষা নিয়েই তাদের দর্শন বর্ণনা করেছেন। তবে সে যাই হোক মহাভারতের এবং ইউরোপের রাষ্ট্র দর্শনের মৌলিক গুরু সক্রেটিস প্লেটোর রাস্ট্র ও সমাজ পরিচালনা সম্পর্কে বক্তব্য এক।

মহাভারতের চরিত্রদের নাম ভীষ্ম আচার্য, কৃপা আচার্য, দ্রোনা আচার্য, পুরোহিত ধৌম্য, রাজা পান্ডু, তার ৫ ছেলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জন, নুকুল সহদেব, তাদের মাতা কুন্তি অসাধারণ রূপবতী, যতই বয়স হোক সব সময় ১৮ বছরের রূপসী যৌবনবতী মেয়েদের মতই কুন্তির রূপ যৌবন থাকে। ৫ ভাই যুধিষ্ঠিরদের এক বৌ নাম দ্রোপদী যুধিষ্ঠির ন্যায় ও সত্যের সেবক, ভীম বলবান, একলাথিতে অনেক হাতি মারে, বিরাট বট গাছ ভেঙ্গে ফেলে, এতবড় বীর আবার দেখা যায় সামান্য একটি হনুমানের লেজ মাটি থেকে উচু করতে পারেনা ভগবানের কৃপায়। অর্জুন নায়ক– একদিকে সৈনিক অন্যদিকে প্রেমিক তার দশ নাম।

রাজাধৃত রাষ্ট্র জন্ম অন্ধ, তাঁর স্ত্রী গান্ধারী অসাধারণ সুন্দরী ও গুণী মহিলা, স্বামী অন্ধ সেই জন্য সে নিজের চোখ সব সময় কাপড় দিয়ে বেধে রাখে। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নুকুল, মহাদেব, দ্রোপদীকে যখন ১৪ বছরের জন্য বনবাস ও এক বছরের জন্য অজ্ঞাত বাসে পাঠান হয় হস্তিনাপুর থেকে তা নিয়ে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গান্ধারীর আবেদন নামক যে কবিতাটি লিখেছেন আমার মনে হয় তা পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানের।

মহাভারতে সবশেষে একটি নীতিকথার উল্লেখ রয়েছে– যুধিষ্ঠির যখন স্বশরীরে স্বর্গে যাবে। তখন তার কুকুরটিও রথে উঠতে নেয়– তখন স্বর্গ থেকে আগত রথের চালকেরা বলে "স্বর্গে কুকুর নেওয়া যাবে না, তুমি একা এসো, তখন যুধিষ্ঠির রথে না উঠে বলেন "ঐ স্বর্গে আমি যাব না– এই কুকুর আমাকে ভালো বাসে, একে ছেড়ে আমি স্বর্গে যাবো না– যে ব্যক্তি কোন লোক সাহায্যের জন্য আসলে তার সাধ্য থাকাসত্বেও নিষেধ করে এবং যে লোক কোন প্রাণী বা মানুষ তাকে ভালোবাসে আর সে যদি তার প্রাণে আঘাত দেয় তবে ব্রাক্ষণ হত্যার সমান পাপ কাজ করা হবে।" মহাভারতের অনেক উপদেশ শিক্ষার একটি শিক্ষার কথা এখানে উল্লেখ করলাম।

আগেই বলেছি মহাভারতের মত বইয়ের বিষয়ে আমার মত মানুষের কিছু বলা খুব একটা সমিচীন কাজ নয়। তাই আর বেশি কিছু না লিখে ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এর লেখা উদ্ধৃতি করে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বলেছেন তাই স্মৃতির পাতা থেকে তুলে দিচ্ছি। ড্রয়িংরুমের বইয়ের আলমারীতে বিদ্যাসাগর রচনাবলী রয়েছে, মহাভারত

www.pathagar.com

নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা রচনাবলীতে পড়েছি তা থেকে হুবহু তুলে দিলে ভালো হত, কিন্তু আমি অনেকটা অলস মানুষ, এটুকু কষ্ট করতে ইচ্ছে করছেনা, স্মৃতি থেকে তুলে দিচ্ছি এখানে– বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখেছেন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার লেখায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন "মহাভারত এমন একটি বই যা মানুষকে মানুষ হতে শিক্ষা দেয়, রাজার প্রজার প্রতি কর্তব্য কি প্রজার রাজার প্রতি কর্তব্য কি, স্বামীর স্ত্রী প্রতি কর্তব্য, স্ত্রীর স্বামীর প্রতি কর্তব্য, ভাই-বোনের প্রতি বোনের ভাইয়ের প্রতি, শিক্ষক বা গুরুদের ছাত্রের-প্রতি, ছাত্রের গুরুর প্রতি কর্তব্য কি, সৈনিকের কর্তব্য, ব্যবসায়ীর কর্তব্য, ব্রাহ্মণের কর্তব্য উৎপাদনকারী শ্রেণীর মানুষের কার কি কর্তব্য তার বিষদ বর্ণনা মহাভারত নামক বইতে উল্লেখ করা রয়েছে।"

"আমি বিশ্বাস করি "মহাভারতের কথা অমৃত সমান-কাশীরাম দাস কহে শুনে পূণ্যবান।" মহাভারত বইয়ের শিক্ষা মানব সমাজের এক মহাপূণ্যবান শিক্ষা। এ বইকে আমি ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান ও সমীহ করি। বিশাল আকারের বই মহাভারতের একমাত্র শিক্ষা, ন্যায়, সত্য ও ভালোবাসার মাধ্যমে সব জয় করা যায়, মিথ্যা ও শক্তি প্রয়োগ করে কিছুই পাওয়া যায় না, যাও পাওয়া যায় তা ভোগ করা যায় না, মিথ্যা ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধ্বংস এবং পরাজয়, সত্য ও ন্যায়ের পথে থাকলে দুনিয়ার সব সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ- মহাভারত নিয়ে আলোচনাটি আজ ২৬/৮/২০০৮ তারিখে লিখলাম সকালে ঘুম থেকে উঠে। আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ এবং প্লেটোর রিপাবলিক নিয়ে লেখা হয়েছিল-১৯৯৪ সনে।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনে তাজউদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি ডক্টর ফারুক আজিজ খানের লেখা 'স্প্রিং ১৯৭১' : স্বাধীনতা যুদ্ধের এক শক্তিশালী দলিল

'স্প্রিং ১৯৭১' নামে ইংরেজি ভাষায় ফারুক আজিজ খান একটি বই লিখেছেন, যা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে, প্রকাশক লেখক স্বয়ং।

'স্প্রিং ১৯৭১' বইতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি এবং লেখক যেভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখেছেন ও প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছেন তার ধারাবাহিক বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এ বইয়ের লেখক ১৯৫৩-১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কার্কুল পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমিতে শিক্ষক হিসেবে ছিলেন। ফলে এই ৩ বছর যারা পাকিস্তানের কার্কুল মিলেটারি একাডেমিতে ট্রেনিং নিয়েছেন তারা সবাই ডক্টর ফারুক আজিজ খানের সরাসরি ছাত্র-এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ, মেজর জেনারেল আ. মান্নান সিদ্দিকী, মেজর জেনারেল আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ অনেকে। এরপরে তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে পাকিস্তানের প্রেসিডন্টের বিজ্ঞান বিষয়ক দপ্তরে সহকারি বিজ্ঞান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। সেখান থেকে ১৯৬৮ সালে 'স্প্রিং ১৯৭১' বইয়ের লেখক ফারুক আজিজ খান চট্টগ্রামের কাপ্তাইতে সুইডিস-পাকিস্তান ইন্সটিউট অব টেকনোলজির ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সেখানে থাকেন, সেখান থেকে তিনি পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বর্বর আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে জীবন বাঁচাবার জন্য আটদিন আটরাত্রি লম্বা গহীন জঙ্গল ও উঁচু নিচু পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামে ২২শে এপ্রিল প্রবেশ করেন, সেখানে তিনি কয়েক দিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের সাথে থেকে কলকাতায় পৌঁছেন এবং ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখ পর্যন্ত ঐ পদে থাকেন। সেখান থেকে আবার কাপ্তাইয়ে আগের পদে ফিরে যান। শেষে ফারুক আজিজ খান বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রের ডাইরেক্টর জেনারেল হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৭ সালে।

'স্প্রিং ১৯৭১' বইতে লেখক তার অভিজ্ঞতার কথা নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করেছেন ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত। লেখক এমনই নিরপেক্ষ যে, তিনি তার নিজের দুর্বলতাও এই বইতে স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন লেখক শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন ভারতে না গিয়ে নিজের কর্মস্থান কাপ্তাইয়ে অবস্থান করতে, কিন্তু যখন দেখলেন যে না তার জীবন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে নিরাপদ নয়। তাঁর কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও, তাঁর মতো আরও অনেক বিনাদোষী নিরীহ ভালো মানুষ পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গুলি খেয়ে মরছেন, আর একমুহূর্ত দেরি করলে তাঁর মৃত্যু

www.pathagar.com

হবে। তখনই লেখক ফারুক আজিজ খান তাঁর ত্রিশ বছর বয়সের স্ত্রী, মাত্র দুই বছর বয়সের শিশু কন্যা ও ছয় মাস বয়সের ছেলেকে ফেলে রেখে একা একা নিজের জীবন বাঁচাবার জন্য দৌঁড়ে অজানা পথের দিকে চলে যান। এ থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় একই লেখকের সৎ এবং আন্তরিক মনমানসিকতার।

আমি নিজেও একজন এফ, এফ বা মুক্তিযোদ্ধা, ছাত্রলীগের একজন সাবেক কর্মী, কিছুটা পড়ালেখা করার অভ্যেস আছে, কাজেই মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত যেকোনও বই বা পত্রিকা সামনে পেলে নাড়াচাড়া করে দেখি বা পড়ার চেষ্টা করি। সে অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এ পর্যন্ত আমার জানামতে মুক্তিযুদ্ধের ওপর যত বই ছাপা হয়েছে তার মধ্যে প্রথম ২-১টি উৎকৃষ্ট বইয়ের মধ্যে ফারুক আজিজ খানের বই অবশ্যই স্থান পাবে। কয়েকটি বিশেষ বিষয়ের জন্য ফারুক আজিজ খানের এ বই অবশ্যই স্থান পাবে। যেসব বিষয়ের জন্য ফারুক আজিজ খানের এ বই ১ম জায়গায় স্থান পাবে তা হলো-প্রথমত, ১৯৭১ সালে আমাদের বাঙালিদের হাতে যে অনেক নিরীহ নিরপরাধী অবাঙালি নিহত হয়েছে, এটা একটা বিরাট অন্যায় হয়েছে। এই অন্যায়ের কথা এতদিন পর্যন্তও কেউ স্বীকার করেন নি বা লেখেন নি। ফারুক আজিজ খান সে কাজটি করে একটি ভালো কাজ করেছেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ এবং তাদের জীবনদান আমরা মুক্তিযুদ্ধের সৈনিকেরা তেমন একটা স্বীকার করি না বা লিখি না। ফারুক আজিজ খান এ বইতে ভারতীয় সেনাদের কর্মতৎপরতার কথা উল্লেখ করেছেন-অনেকের নাম লিখেছেন যাদের সাথে তার পরিচয় হয়েছে বা কথা হয়েছে।

তৃতীয়ত, এ বইটি পড়ে মনে হয়েছ এটা একটা সত্যিকারের একজন উচ্চশিক্ষিত রুচিশীল মার্জিত মানুষের লেখা বই। যার সত্যি সত্যিই বই লেখার মতো জ্ঞান ও দক্ষতা আছে এবং লেখক নিজেকে অত্যন্ত বিনয়ী হিসেবে উপস্থাপন করে নৈর্ব্যক্তিকভাবে তার বক্তব্য লিখে গিয়েছেন।

চতুর্থত, ফারুক আজিজ খান তাজউদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে যে অভিজ্ঞতা পেয়েছেন সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

১৯৪৭ সন থেকে ১৯৭২ সনের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রবাহমান বা ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রচুর বই বের হয়েছে, কিন্তু 'স্প্রিং ১৯৭১' এমন একটি একক বই, এর মধ্যে যত তথ্য আছে আর কোন ও একটি মাত্র বইতে পাকিস্তানি রাজনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের জানা অজানা এত তথ্য আছে কিনা সন্দেহ। আমাদের সৌভাগ্য যে, ফারুক আজিজ খানের মতো এমন একজন সজ্জন ও শিক্ষিত ব্যক্তি তাজউদ্দিন আহমদ-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রাইভেট সেক্রেটারি হয়েছিলেন। তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবকে ঐ বইতে ফারুক আজিজ খান অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমীহের সাথে বারে বারে স্মরণ করেছেন। তাজউদ্দিন সাহেবের বিদ্যা, বুদ্ধি, ত্যাগ, ধৈর্য ও দূরদৃষ্টির কথা 'স্প্রিং ১৯৭১'-এর লেখক অনেকবার অনেক জায়গায় উল্লেখ করে কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। ভাগ্যিস তিনি ড. খান সারওয়ার মুর্শিদ সাহেবের মতো দাবি করেন নি যে, '৭১ সালে তাজউদ্দিনের সব বক্তৃতা আমি ইংরেজিতে লিখে দিয়েছি

www.pathagar.com

(দ্রষ্টব্য মুক্তিযুদ্ধের দলিল ১৫ খণ্ড পৃষ্ঠা ৪৩২)। তাজউদ্দিনের কথা ফারুক আজিজ উল্লেখ করেছেন বহু ঘটনায় যা ঘটেছে সেভাবেই কোন ও অতিরঞ্জন না করে। কাজেই তাজউদ্দিন সাহেব সম্পর্কে একটা ধারণা এ বইয়ের পাঠকরা পাবেন, তাজউদ্দিন কত উচ্চমানের একজন রাজনৈতিক নেতা ও মানুষ ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, পাকিস্তানি রাজনীতির ইতিহাস বা ঘটনাবলী এ দু'টি বিষয়ের প্রতি যাদের সামান্য আগ্রহ আছে তাদের ফারুক আজিজ খানের 'স্প্রিং ১৯৭১' বইটি পড়া অতি জরুরি। কেউ যদি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতার যুদ্ধ এবং পাকিস্তানি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতে চান তবে তিনি যদি 'স্প্রিং ১৯৭১' পড়েন তাহলে তার জানার পরিধি আরও বিস্তৃত হবে। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান এবং ইতিহাস বিভাগের পাঠ্য বা রেফারেন্স বই হিসেবে এ বই ব্যবহার করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকগণ উভয়েই উপকৃত হবেন, এ কথা রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের একজন সাবেক ছাত্র হিসেবে খুব দৃঢ়চিত্তে বলতে পারি। আগেই উল্লেখ করেছি যে, এ বইয়ের লেখক একজন প্রাজ্ঞ বা উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, যার বই লেখার মতো যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা আছে- কাজেই বইটি সুলিখিত, ফলে বইটি পড়তে নিয়ে শেষ না করে সহজে ওঠা যায় না। লেখকের ঘটনার বর্ণনা দেবার প্রকাশভঙ্গি অসাধারণ সুন্দর ও শক্তিশালী। অনেক জায়গায় বহু হিউমার, আয়রনি, ইমেজারি বা উপমা রয়েছে এ বইতে, যাকে এক কথায় বলা যায় সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী

'স্প্রিং ১৯৭১' আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের এক অসামান্য শক্তিশালী দলিল হিসেবে যুগ যুগ ধরে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের ঘরে এবং লাইব্রেরিতে স্থান লাভ করে থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের ওপর এমন একটি মূল্যবান বই ইংরেজিতে লিখে ফারুক আজিজ খান অবশ্যই ধন্যবাদ পাবার মতো বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন, কেননা পাকিস্তানের জনসাধারণসহ বিদেশীদের পড়া খুবই প্রয়োজন। তবে তার চেয়ে আরও বেশি প্রয়োজন আমাদের দেশের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের পড়া যার জন্য 'স্প্রিং ১৯৭১' বইটি বাংলায় অনুবাদ হয়ে প্রকাশ হওয়া দরকার।

'স্প্রিং ১৯৭১' বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠায় আকর্ষণীয় বক্তব্য ও ঘটনার বর্ণনা রয়েছে, যার জন্য উদ্ধৃতি করতে হলে কোনটা থেকে কোনটা দেয়া উচিত সেটা ঠিক করা বেশ কষ্টকর। তাই কোনও বিশেষ উদ্ধৃতি দেয়া থেকে নিবৃত্ত থাকতে হলো। কাজেই 'স্প্রিং ১৯৭১' বই পাঠ করে যে সব তথ্য জানতে পারা যায় তার কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করতে চাই-

১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের ঘটে যাওয়া সমস্ত প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলী, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমি, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও রাজনীতিবিদদের বাঙালিদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের কথা, বাঙালিদের এ ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের কথা, আওয়ামী লীগের ছয় দফার কথা, '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের প্রসঙ্গ, ১৯৭০ সালের নির্বাচন , নির্বাচনের রায়কে বানচাল করে দেবার ভূট্টোর ও পাকিস্তানি সামরিক চক্রের

www.pathagar.com

ষড়যন্ত্র, পূর্ববাংলার মানুষের এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাঙালিদের অসহযোগ ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য, পাকিস্তানিদের বর্বর গণহত্যার বর্ণনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ২৫শে মার্চ রাতে গ্রেফতার, জিয়াউর রহমানের চট্টগ্রাম বেতারে স্বাধীনতার কথা প্রচার, সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন, মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে বিদ্রোহী গ্রুপের জন্ম, ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর পৃষ্ঠপোষকতায় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মুজিব বাহিনী নামে পাল্টা বাহিনীর অভ্যুদয়ের কথা, আওয়ামী লীগের খন্দকার মোস্তাক, জহিরুল কাইয়ুম, বরিশালের নুরুল ইসলাম মঞ্জুসহ অনেক আওয়ামী লীগ নেতার তাজউদ্দিনের বিরোধিতা, অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নান মোমিন, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, শামসুল হক, ময়েজ উদ্দিন আহমদ, ফকির সাহাবুদ্দিন আহমদ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, রাফিয়া আক্তার ডলিসহ অনেকের তাজউদ্দিনের প্রতি বলিষ্ঠ সমর্থন দান, জেনারেল ওসমানী মুজিবনগর সরকারের কোন ও এ্যাসেট বা সম্পদ না হয়ে বিরাট বারডেন বা বোঝায় পরিণত, সেজন্য ওসমানীকে সেনাবাহিনী প্রধান পদ থেকে সরিয়ে সেনাবাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাবাহিনী প্রধান করার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের উদ্যোগ, আর এ উদ্যোগ সফল হলে সে জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণরত সবচেয়ে সিনিয়র হিসেবে জিয়াউর রহমান নিয়োগ পেতেন, আর একথা জানতে পেরে খালেদ মোশাররফ কলকাতায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারি ফারুক আজিজ খানের সাথে দেখা করে বলেন প্রধানমন্ত্রী যদি ওসমানীকে সেনাবাহিনীর প্রধান থেকে সরিয়ে অন্য কাউকে নিয়োগ দেন তবে তা আমরা মেনে নেব না এবং এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব, ফলে তাজউদ্দিনের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। খন্দকার মোস্তাক, জহিরুল কাইয়ুম, মাহবুবুল আলম চাষির আমেরিকার সাথে গোপনে যোগাযোগ করে পাকিস্তানিদের সাথে আপস করার চেষ্টা, মেজর ডালিম মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে কলকাতায় প্রেম করে মেয়ের বাবার অমতে বিয়ে করার কথা, খালেদ মোশাররফ যুদ্ধে গুলি খায় তার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিনের অনুরোধে বিশেষ বিমান সংগ্রহ করে ডাক্তার নিয়ে এসে চিকিৎসা করান, যুদ্ধে এস,পি মাহবুব গুলি খেয়ে আহত হয়ে ব্যারাকপুর হাসপাতালে থাকেন, তাকে লেখক অক্টোবর মাসে দেখতে গিয়ে দেখতে পান সেখানে প্রচুর ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য যুদ্ধ করে আহত হয়ে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের বা পশ্চিম বাংলার মুসলমান এবং চীনপন্থী মাওবাদী কমিউনিস্টদের সক্রিয় বিরোধিতা, ১৯৭১ সালেই মুক্তিযুদ্ধের নেতা প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বহুবার বলেছেন- বাংলাদেশ স্বাধীন হবে কিন্তু বাংলাদেশ বসবাস করার উপযোগী হবে না ইত্যাদি বহু বিষয় 'স্প্রিং ১৯৭১' বইয়ে উল্লেখ রয়েছে। এমন সুন্দর একটি বই লেখার জন্য ফারুক আজিজ খানকে অভিনন্দন জানাই।

দৈনিক সংবাদ, ২৫শে কার্তিক, মঙ্গলবার ১৪০০ বাংলা (১৯৯৪ সাল ইংরেজি)তে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের নেপথ্য কথা ও তাজউদ্দিনের ভূমিকা

বাঙালির ইতিহাসে, স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মের পেছনে ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চে ঢাকার তদানীন্তন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রদত্ত ভাষণ একটি ঐতিহাসিক গৌরবময় দলিল। বঙ্গবন্ধুর এ ভাষণের জন্য ইতিহাসে তিনি অনন্তকাল ধরে অমর হয়ে থাকবেন। এ ভাষণ শুনে এখনও বাঙালীর প্রাণে শিহরণ জাগে, এ ভাষণ শুনে পথ চলা মানুষের চলার গতি স্তব্ধ হয়ে যায়, ক্ষণিকের জন্য হলেও দাঁড়িয়ে পড়ে। দিন যতই যাবে ততই মার্চের ভাষণ বাঙালির কাছে আরও বেশি অবিস্মরনীয়-বরণীয় হয়ে থাকবে। ৭ই মার্চের ভাষণে রয়েছে তেজস্বীয়তাময় দীপ্তি, উচ্চতর বুদ্ধি, আবেগ ও স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার যাবতীয় উপকরণ। মাত্র বিশ মিনিটের একটি ভাষণ, অথচ এর মধ্যেই নির্হিত হয়েছিল পরাধীন একটি জাতির যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সমস্ত আয়োজন। একদিকে এই ভাষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি স্বাধীনতাও ঘোষণা করা হয় নাই, যা করা হয়েছে ১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিকভাবে, আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় নাই ৭ই মার্চের ভাষণে তাও বলা যাবে না। খুবই উন্নতমানের বুদ্ধির সমন্বয় ঘটিয়ে এই ভাষণটি দেওয়া হয়েছে। আর এ ভাষণে যে আবেগ ও উত্তেজনা রয়েছে তা একমাত্র বঙ্গবন্ধুর পক্ষেই সম্ভব হয়েছে, এমন সহজ সরল গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের ভাষায় ভাষণ প্রদান করার। এ ভাষণে একটি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

এমন একটি অতুলনীয় ভাষণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কিভাবে দিলেন তা নিয়ে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সনের বাংলাদেশে অনেকের মনেই অনেক জিজ্ঞাসা ছিল, যার ফলে অনেক মিথ্যা ভিত্তিহীন কথা যে যার মতো পারে তা প্রচার করেছে। এমন অতুলনীয় ভাষণটি সারা দেশবাসী ও বিশ্বের কাছে পৌঁছার আগে এর পেছনে একটি ঘটনা আছে যা আমার জানা মতে এখনও দেশবাসীর নিকট অজানা রয়েছে। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণের নেপথ্য ঘটনাটি হচ্ছে এই যে, আমি ১৯৭৪ সনে একদিন তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করি, 'বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ-এর ভাষণটির ঘটনাটা কি? অত্যন্ত চমৎকার ভাষণ এবং এ ভাষণ নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলে। আসলে কি? জবাবে তাজউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন, "১৯৭১ সালের ৬ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট-ইয়াহিয়া খান রেডিও ও টেলিভিশনের মাধ্যমে জাতির উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন, ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগ এবং তার নেতৃবৃন্দকে এককভাবে পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় গোলমাল এবং দেশের অখণ্ডতা ধ্বংস করার জন্য গালাগালি করে হুশিয়ার করেন। ৭ মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ডাকা হয়েছে আগে থেকেই। তাজউদ্দিন আহমদ বলেন ৬ই মার্চ সন্ধ্যায় ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর আমরা

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর ৩২নং বাসায় আলোচনায় বসি আওয়ামী লীগের হাইকমান্ড। রাত দশটা পর্যন্ত হাইকমান্ডের মিটিং চলে, সেখানে ইয়াহিয়া খানের ভাষণের জবাব এবং বিদ্যমান অবস্থায় আওয়ামী লীগের অবস্থা তুলে ধরার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং চারজন বক্তা বক্তৃতা করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আমাদের হাই কমান্ডের মিটিং শেষ হয় রাত দশটার দিকে এবং সবাই চলে যায়, আমিও (তাজউদ্দিন সাহেব) বাসায় ফিরে আসবার জন্য উদ্যোগ নেই, এমন সময় বঙ্গবন্ধুর নিকট একটি টেলিফোন আসে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর নিকট থেকে; ফরমান আলী মুজিব ভাইকে টেলিফোনে বলেন– "প্রেসিডেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি চিঠি আপনার জন্য পাঠিয়েছেন ওয়ারলেস ম্যাসেজের মাধ্যমে এক্ষুণিই আপনাকে চিঠিটি পৌঁছে দিতে হবে। আমি আপনার বাসায় আসছি আপনি প্রস্তুত হন।" তখন বঙ্গবন্ধু আমাকে (তাজউদ্দিনকে) বসতে বলেন– তখন আমি বলি- আমি যাই প্রেসিডেন্টের চিঠি রেখে দিয়ে ওনার সাথে কথা বলে আপনি ফরমান আলীকে বিদায় দিয়ে দিয়েন, এই কথা বলে আমি উঠতে চাই। বঙ্গবন্ধু তখন আমার পাঞ্জাবি ধরে জোরে টান মারেন "আরে তাজউদ্দিন তুমি বস তোমার থাকা খুব দরকার।" আমার পাঞ্জাবি ধরে বঙ্গবন্ধু এত জোরে টান মারেন যে আমার পাঞ্জাবি বেশ খানিকটা ছিড়ে যায়। তখন বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করলাম। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে রাও ফরমান আলী বঙ্গবন্ধুর বাসায় আসে, এসে তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার পত্রটি বঙ্গবন্ধুর নিকট দিলে তা আমরা পড়ি। ফরমান আলীও বেশ হাসিখুশি মনে কথা বলেন এবং অনেক সময় কাটিয়ে যান। প্রায় রাত ১টার দিকে ফরমান আলী চলে যান।

ফরমান আলী চলে যাবার পরে বঙ্গবন্ধু বলেন– "তাজউদ্দিন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ চিঠি পাওয়ার পরে তো পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে গেল, এখন কি করা যায়। প্রেসিডেন্ট তো খুব ভালো চিঠি লিখেছেন।" ঐ চিঠিতে খুব মিষ্টিমিষ্টি কথা লেখা ছিল। আপনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আমার এবং আপনার সবারই ভূলত্রুটি হয়েছে এগুলোকে ক্ষমা সুন্দর মন নিয়ে দেখতে হবে, পাকিস্তানের খেদমতে আপনাকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে কাজ করতে হবে কয়েকদিনের মধ্যে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তখন আমি (তাজউদ্দিন) বঙ্গবন্ধুকে বলি "মুজিব ভাই আমাদের সবার জন্য খুব কঠিন দুর্দিন আসছে, আমার এ চিঠি পড়ে ও ফরমান আলীর মিষ্টিমিষ্টি কথার মধ্যে মনে হচ্ছে একটি বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে। আমাদের আঘাত হানবার জন্য তারা ফাঁদ হিসেবে এই চিঠি প্রেসিডেন্ট দিয়েছেন, যাতে আমরা কোনও প্রস্তুতি নিতে না পারি এবং তারা প্রস্তুতি নিতে পারে। কেন না মাত্র তিন ঘণ্টা আগে রেডিও টিভির মাধ্যমে ভাষণ দিয়ে দেশ বিদেশের সব মানুষকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জানালেন যে, আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিব খারাপ; তারা পাকিস্তানের ধ্বংস চায়। আর ঐ ভাষণের তিন ঘণ্টা পরেই এত সুন্দর চিঠি লিখলো ? কেন চিঠির কথাগুলোতো প্রেসিডেন্ট রেডিও, টিভির ভাষণে বলল না? আর রেডিও টিভির ভাষণের কথাগুলোতো এই চিঠির মধ্যে লিখতে পারতো, তাহলে না ওদের আন্তরিকতার প্রমাণ পাওয়া যেতো।"

www.pathagar.com

তখন বঙ্গবন্ধু বলেন– "তাহলে এখন কি করা যায় তাড়াতাড়ি ঠিক করো। অনেক রাত হয়েছে সকালেই আবার মানুষের ভীড় শুরু হয়ে যাবে, কোনও কিছু আলাপের কোনও সময় সুযোগ থাকবে না।"

তখন আমি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের মূলকথাগুলো তাকে নোট করে পয়েন্ট পয়েন্টভাবে লিখে দেই। আর ভাষণের ভাষাটি সম্পূর্ণভাবে বঙ্গবন্ধুর নিজের, এর মধ্যে অন্যকারও কোনও কর্তৃত্ব নেই, এছাড়া এ ভাষণ সম্পর্কে যে যা বলে বা তোমরা যা শোন তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।" এবং বঙ্গবন্ধুকে বলে দেই আপনি এই চিঠি নিয়ে কাল কারও সাথে কোনও আলাপ আলোচনা করবেন না। কাল ছাত্রনেতারা বাসায় এলে যদি তাদের সাথে দেখা হয় শুধু বলবেন আমার প্রতি তোমরা বিশ্বাস রাখো তোমাদের মনের কথাই বলা হবে। তখনই ঠিক হয় যে ৭ই মার্চের মিটিং এ চারজন নয় শুধুমাত্র আপনি একা বক্তৃতা করবেন এবং এর বাইরে কোনও কথা বলবেন না। এইভাবে ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে নিয়ে ফরমান আলীর চলে যাওয়ার পর, কথা বলে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পয়েন্টসগুলো লিখে দিয়ে রাত পৌঁনে তিনটায় বাসায় আসি।

ঐদিন তাজউদ্দিন সাহেব আরও বলেছিলেন– "বাসায় এসে তোমার ভাবীকে আর ডাকলাম না, সে বেচারী তো মনে হয় অনেক রাত ভরে আমার জন্য জেগে থেকে ঘুমিয়েছে, ঘুম ভেঙ্গে দেওয়া ঠিক হবে না। ডাইনিং টেবিলে বসে সবেমাত্র ভাত খেতে বসে একমুঠি ভাত মুখে দিয়েছি অমনি টেলিফোন বাজার শব্দ। উঠে গিয়ে টেলিফোন ধরলাম– খুলনা থেকে টেলিফোনের ট্রাংকলের অপারেটরের কণ্ঠস্বর অমুকে কথা বলবেন একটু ধরেন, আমি খুলনার টেলিফোন অপারেটরকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি ভাই খুলনায় কি কোনও মারাত্মক গোলমাল হয়েছে, এই রাত তিনটায় ফোন", সে বলে না স্যার আজ বা কাল খুলনায় তেমন কোনও খারাপ কিছু ঘটে নাই। তখন টেলিফোনে যিনি চাচ্ছিলেন তিনি বলেন– তাজউদ্দিন ভাই কাল বিকাল থেকে এ পর্যন্ত চারবার পাঁচবার ট্রাংকল করে আপনাকে টেলিফোনে খুঁজছি কিন্তু পাই না, এখন পেলাম, তাকে বলি এত ব্যস্ততার সাথে কেন খুঁজছেন সেটা বলেন– তিনি তখন বলেন– "ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উঠায় কেন?" বললাম আর কি? তখন তিনি বলেন "না আর কিছু না, এটাই জানার জন্য।"

তখন তাকে ধমক দেই, সাহেব রাত তিনটার সময় খুলনা থেকে এইটা জানার জন্য টেলিফোন করেছেন! ছাত্ররা স্বাধীন বাংলার পতাকা উঠায় আপনার কি? তখন তিনি বলেন আমাদের আওয়ামী লীগ থেকে তো স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলবার বা পাকিস্তানি পতাকা পোড়াবার কোনও নির্দেশ তো দেওয়া হয় নাই।"

আমি (তাজউদ্দিন) তখন বলি, আমাদের আওয়ামী লীগ থেকে তো এমন কোনও নির্দেশও দেওয়া হয় নাই যে যদি কেউ পাকিস্তানি পতাকা পোড়ায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উঠায় তবে তাকে বাধা দিও, এমন কোনও নির্দেশ পেয়েছেন কি? জবাবে তিনি বলেন– না। বললাম ঠিক আছে গিয়ে ঘুমান, এবং বঙ্গবন্ধুর কালকের বক্তৃতা শুনে যা করার করেন। এরপরে ভাত খেয়ে ঘুমাতে যাই। এই হচ্ছে ৭ই মার্চের

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের নেপথ্য কথা। যে ভাষণটি আমরা শুনি তার পেছনে তাজউদ্দিন আহমদের এক বিরাট অবদান এবং ভূমিকা রয়েছে।

খুলনার ভদ্রলোকের নামটি ইচ্ছা করেই উল্লেখ করা হলো না। তিনি জীবিত আছেন, মানুষ হিসেবেও ভালো বলে জানি, স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রেখেছেন, এখন পর্যন্ত নীতি আদর্শে অটল আছেন।

দৈনিক আজকের কাগজে ২০/৩/১৯৯২ সনে প্রকাশিত

www.pathagar.com

২৬ শে মার্চের গণআদালত কাছে থেকে দেখা

২৬ মার্চ ঢাকায় গোলাম আযমের গণআদালতে বিচার করা নিয়ে দেশব্যাপী বেশ গণজাগরণের যে ঢেউ সৃষ্টি হয়েছে তাতে কয়েকদিন আগে পর্যন্তও আমি খুব একটা উৎসাহিত ছিলাম না। কারণ, ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিতে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যাদেরকে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করার জন্যে রাজাকার আলবদরদের চেয়ে কম দায়ী বলে মনে করি না।

কিন্তু কয়েকদিন আগে একজন বেশ উর্ধতন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে (অতিরিক্ত আই,জি,পি) এ বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে আমি উৎসাহিত হয়ে পড়ি গণআদালতের বিচারের প্রতি। তিনি বলেন– এসব লোক বাতাসে উড়ে যাবে, গণআদালতে গোলাম আযমের বিচার একটি নাগরিক সচেতনতার এবং সভ্যতার বলিষ্ঠ বহিঃপ্রকাশ। দেশের আইন যদি তার নিজস্ব গতিতে চলতো, যদি আইন প্রয়োগ হতো-তবে মিসেস জাহানারা ইমামদের গণআদালত গঠন করার কোনো দরকার পড়তো না। যেহেতু আইনকে স্তব্ধ করে রাখা হয়েছে সেজন্যেই এই গণআদালত গঠন করার প্রয়োজন হয়েছে। আমার যদি ২৬ মার্চ কোনও সরকারি দায়িত্ব না থাকে তবে সিভিল পোষাকে গণআদালতের জনতার একজন হিসেবে আমার একাত্মতা প্রকাশ করার জন্যে আমিও যাবো। আর আপনি একজন মুক্তিযুদ্ধের সৈনিক, মুক্তিবাহিনীর সদস্য, আপনি যাবেন না সে কি কথা।"

ভদ্রলোককে অনেকদিন থেকে চিনি-ভীষণ ধর্মপরায়ণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ নিয়মিত পড়েন, এবং সৎ মানুষ হিসেবে পরিচিত। তার এধরণের বক্তব্য শুনে গণআদালতের প্রতি আমিও উৎসাহিত হয়ে উঠি। এ পুলিশ অফিসারের নাম জনাব নসরুল্লাহ খান।

২৬ মার্চ শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে যায়, খুব ভোরে এলিফ্যান্ট রোডে এসে সংবাদপত্র দেখে দুই কপি কিনে সোহরাওর্য়াদি উদ্যানে রওনা হই। টিএসসির সামনের গেটে যখন পৌঁছি তখন আমার ঘড়িতে সাতটা। টিএসসির সামনে গেটে গিয়ে দেখি এক লরি পুলিশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। দুইজন সাদা পোষাকের পুলিশ অফিসার রয়েছেন। তাদের একজনের হাতে ওয়াকিটকি। ওয়াকিটকিতে শুনতে পাই-কন্ট্রোল রুমে কমলাপুর থেকে বলছে, স্যার, চট্টগ্রাম থেকে চার পাঁচশত লোক এসেছে গণআদালতে যোগদান করার জন্যে, কি করবো? কন্ট্রোল রুম থেকে জবাব কি দিলো তা আর শুনতে পেলাম না।

পুলিশ অফিসার যার হাতে ওয়াকিটকি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই গণআদালত বসাতে কি আপনারা বাধা দিবেন? তিনি উত্তরে বলেন, এমন কোনো কথা শুনি নাই। শুনে আশ্বস্ত হলাম। তখন তাকে বললাম, আদালত তো পার্কের পূর্ব পার্শ্বে বসবে, ওদিকে যাই এখানে থেকে লাভ কি, এক সাথে কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে।

তিনজন পার্কের মধ্যে প্রবেশ করতেই দেখা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের দুই প্রফেসর জনাব আফসার উদ্দিন এবং রঙ্গলাল সেনের সাথে। তারা নিয়মিত পার্কে মর্নিং ওয়ার্ক করেন। আফসার উদ্দিন সাহেব জিজ্ঞাসা করেন "বাবলু

www.pathagar.com

গণআদালতে কার লাভ আওয়ামী লীগের না বিএনপির? আমি বলি আওয়ামী লীগ বিএনপি বড় কথা নয়– এটাকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে এক বিরাট জোয়ার এসেছে এটাই বড় লাভ। একথা শুনে প্রফেসর রঙ্গলাল সেন বলে উঠেন ঠিক, ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন। আমরা পূর্ব প্রান্তের দিকে হাঁটা শুরু করি। পার্কের পূর্ব প্রান্তে পৌঁছে দেখি ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশনের সামনে বেশ কিছু মেট্রোপলিটান পুলিশ এবং পার্কের ভেতরে গেটের কাছে বেঞ্চে কয়েকজন সাদা পোষাকের পুলিশ রয়েছে। একটি বেঞ্চে ঢাকার নাজিরা বাজার থেকে আগত চার পাঁচজন তরুণ ছেলে বসে রয়েছে। তখন সকাল সাতটা দশ মিনিট। ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের সামনে কোনো মঞ্চ নেই,কোনো উদ্যোক্তা নেই। অন্য দশদিন যেমন আজ ২৬ শে মার্চেও তেমন, ব্যতিক্রম শুধু কিছু পুলিশ। দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল, একি! এত আলোচনা এতে উত্তেজনা! এতো তোলপাড়, অথচ কোনো উদ্যোক্তা নেই, কোনো মাইক নেই, কোনো মঞ্চ নেই। রাস্তার পূর্বপারে দেখি কিছু রশি টানানো, মনে হলো ঐ খানেই মনে হয় বিচার মঞ্চ হবে। কাছে গিয়ে দেখি ফুটপাত,মেরামত ও পরিস্কার করা হয়েছে সেজন্যে রশি, বিচার মঞ্চের জন্য নয়।

এমনি অবস্থায় দুই চার জন করে লোকজন আসতে থাকে। ৮টার সময় ১৫/২০ জন মাত্র মানুষ। মিসেস বেবী মওদুদ এবং ময়মনসিংহ মহিলা পরিষদের সভানেত্রী মিসেস সুফিয়া করিম আসেন এবং পার্কের বেঞ্চে বসেন। মঞ্চ, মাইক না দেখে সবাই হতাশ। আটটার দিকে পুলিশের ডিএসপি বলেন, কোনো সমাবেশ হতে দেয়া হবে না সবাই চলে যান। ধীরে ধীরে উত্তেজনা বাড়তে থাকে মানুষও বাড়তে থাকে– নয়টার মধ্যে দুই– তিনশত লোক হয়। এই দুই–তিনশত লোককে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব পার্শ্বের গেট দিয়ে সবাইকে উদ্যানের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেয় পুলিশ এবং ইন্সটিটিউটের সামনে থেকে সব লোক সরিয়ে দেয়। সাড়ে আটটার দিকে আরো দুই ট্রাক মেট্রোপলিটান পুলিশ এসে অবস্থান নেয় ইন্সটিটিউটের সামনে। এর আগে আটটার সময় ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বাতেন নামে আগত একজন ছাত্র আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে বলে– “ভাই আমি গত দুই দিন যাবত ঘুমাতে পারি নাই উত্তেজনায়, গণআদালতে আসবো বলে গতকাল এসেছি-আর আজ এখানে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।” আমি বলি একটু ধৈর্য ধর দেখো কি হয়।

এর মধ্যে ইন্সটিটিউটের সামনে বসে থাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের একজন তরুণ কন্সটেবল দলের পাশে বসে থেকে চত্বর থেকে হলুদ এবং লাল গাঁদা ফুল ছিড়ে বিরাট অক্ষরে সুন্দর ভাবে লেখে ‘স্বাগতম” শব্দটি। এটি দেখে সাব ইন্সপেক্টর তেড়ে এসে তাকে লাথি মারতে যায় “এই বেটা এটা তুই কি লিখেছিস”। আমি বাধা দিয়ে বলি আরে ভাই দেখেনতো কি সুন্দর ভাবেই শব্দটি লিখেছে, একজন প্রতিভাবান ছেলে ভাগ্যের দোষে আজ কন্সটেবলের চাকরি করছে– ওর প্রশংসা করা উচিত।

তখন সাব ইন্সপেক্টর সাহেব থেমে যান। কিন্তু ভেজাল বাধান ঢাকার একটি অখ্যাত পত্রিকার সাংবাদিক পরিচয়ে এক ব্যক্তি, সে কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে এটি কি গণআদালতকে স্বাগতম জানিয়ে

www.pathagar.com

লেখা হয়েছে।" আমি বলি ভাই আপনি সাংবাদিক যা হয় দেখেন- কথা বলেন কেন? সে বেশ উত্তেজিত হয়ে যায় ফলে ফুল দিয়ে লেখা স্বাগতম শব্দটি মুছে ফেলা হয়। আমি মনে মনে শুধু পাভেল রহমানকে খুঁজতে থাকি। এর দুই মিনিট পরেই পাভেল এসে হাজির হয়, যার জন্যে সুন্দর একটি ছবি থেকে পত্রিকার পাঠকরা বঞ্চিত হলেন।

মাটিতে বসে থাকা পুলিশরা আমার কাছ থেকে দুইটি পত্রিকা চেয়ে নেয় একটি আজকের কাগজ, একটি লাল সবুজ। আজকের কাগজের ২৬ মার্চের সাপলিমেন্টের প্রকাশিত 'তাজউদ্দিন : ২৫ মার্চ রাত থেকে ১৭ এপ্রিল '৭১" লেখাটি দেখলাম পাঁচজন পুলিশের কন্সটেবল এক সাথে ভীড় করে পড়ছে। এটাও চোখে পড়লো– এটা দেখে মনে হলো তাজউদ্দিনের নাম সাধারণ মানুষের কত গভীরে।

যাক দেখতে দেখতে সময় গড়ায়, সাড়ে আটটা নয়টার দিকে কিছু কিছু মানুষের ভীড় বাড়তে থাকে। হঠাৎ করে একজন লম্বা দাঁড়িওয়ালা লোক একাই পুলিশের সামনে শ্লোগান দিয়ে উঠে– "আমরা সবাই ভাই ভাই, গোলাম আযমের ফাঁসি চাই"। এ সময় পুলিশের একজন ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক বেশ রসিক– গালাগালি শুরু করে দেয় মাইকযোগে। "রাজাকারকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়েছে, এখন এখানে ব্যাটারা কেন এসেছো– যাও, এখানে কি আজ আমার বিয়ে হবে যে দেখতে এসেছো।" পার্কের ভেতর অল্প লোক হলেও জবাব দেয়– পাবলিকের জায়গায় পাবলিক এসেছে, তাতে ব্যাটা তোমাদের কি, ১৪৪ ধারা জারি করা হয় নাই, হলে কাগজ দেখতে চাই। পুলিশ বলে সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনারা আমাদের হাতের ডান দিকে থাকেন, এখন মজা দেখতে পারবেন, আপনাদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। এক পর্যায়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পূর্ব পার্শ্বের গেট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তরুণ আগতরা তখন লোহার প্রাচীর ডিঙিয়ে পার্কের ভেতরে প্রবেশ করতে থাকে। পুলিশ ইন্সপেক্টর বলে– "দেখো এটা সোহরাওর্য়াদী উদ্যান, পবিত্র জায়গা, এখান থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে। পার্কের প্রাচীর ডিঙিয়ে এটাকে অপমান করো না।" শুনে হাসি পায়– প্রাচীর ডিঙালে পার্কের অবমাননা!

আস্তে আস্তে মানুষ বাড়তে থাকে, কিন্তু খুব বেশি না, এক দুই হাজার তখন প্রায় সাড়ে নয়টা। এমন সময় বেশ কিছু তরুণ আওয়ামী লীগ এবং যুবলীগ নেতা প্রবেশ করেন।

কিছুক্ষণ পরেই পূর্ব প্রান্তের গেট পুলিশ খুলে দিতে বাধ্য হয়। আওয়ামী লীগের পতাকা এবং জাতীয় পতাকা হাতে একটি ছোট খাটো মিছিল সবার আগে প্রবেশ করে শ্লোগান দিতে দিতে। এর কিছুক্ষণ পরেই পশ্চিম পার্শ্ব থেকে ছাত্র লীগের বিরাট এক জঙ্গী মিছিল (প্রায় দুই হাজার ছাত্রের) প্রবেশ করে শ্লোগান দিতে দিতে।

দেখতে দেখতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষে ভরে যায়। তার পর শুধু মানুষ, মানুষ, মানুষ আর মানুষ। সরকারি চাকুরে, ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, উকিল, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার প্রচুর সংখ্যক মহিলা।

www.pathagar.com

প্রথমেই যেসব নেতা বা উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিকে পার্কে দেখা গিয়েছে– তারা হলেন ড. কামাল হোসেন, আই, ভি রহমান, আ. রাজ্জাক, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, শাহারা খাতুন, শেখ আবদুল আজিজ, অধ্যাপক আবু সাঈদ, ড. মাযহারুল ইসলাম, এস, পি মাহবুব, মুকুল বোস। এর পরে আর হিসেব বা মনে রাখা যায় নাই, শুধু মানুষ আর মানুষ। এর মধ্যে কখন যে পুলিশ স্থান ত্যাগ করে চলে গিয়েছে তার টেরও পাওয়া যায় নাই। এরপরে আর সাংবাদিকতার চোখ নিয়ে ২৬ মার্চের গণআদালতের দৃশ্য দেখবার ইচ্ছা চলে যায়– জনতার একজন হয়ে জনতার সাথে মিশে যাই।

দৈনিক আজকের কাগজে ২৭/৩/১৯৯২ সনে প্রকাশিত

www.pathagar.com

চলমান জীবনের চালচিত্র

দশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসার পর থেকে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা চালিয়ে আসছি। দশ বছর পত্রিকার মালিক-সম্পাদক হিসেবে জীবন ধারণ এবং সংসার চালিয়ে ধার দেনায়, জর্জরিত হয়ে জীবন যুদ্ধে যখন হাবুডুবু খাচ্ছি, সেই সময়ে গত বছর জুন মাসে আমার একজন শুভাকাঙ্খী, যিনি একজন সজ্জন এবং জ্ঞানী ব্যক্তি, আমার জীবনে এক মুক্তিদাতা অবতার হিসেবে এসে আমাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেন। একদিন তাঁর অফিসকক্ষে বসে আড্ডা মারছি এবং তাঁর প্রজ্ঞাবান কথা শুনছি, এমন সময় হঠাৎ করে তিনি আমাকে বললেন, "আপনাকে একটি প্রশ্ন করবো, এ জবাবের উপর আপনার ভাগ্য নির্ভর করবে, ত্রিশ সেকেন্ড সময় ঘড়ি ধরে রইলাম, এই ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে পাঁচটি মেয়ের নাম বলতে হবে এবং নামগুলো অবশ্যই আধুনিক ও আকর্ষণীয় হতে হবে।" আমি ত্রিশ সেকেন্ডে একটি মাত্র সুন্দর নাম বলতে সক্ষম হই, তাও তিনি বাতিল করে দেন এই বলে যে সে তো আপনার আত্মীয়া। মোটকথা, ত্রিশ সেকেন্ডে পাঁচটি মেয়ের সুন্দর বা শ্রুতিমধুর নাম বলতে পারি না। এই পাঁচটি মেয়ের নাম ত্রিশ সেকেন্ডে না বলতে পারায় পরীক্ষায় পাস করলাম না ফেল করলাম তা এখনও বুঝতে পারি নি। কেননা তখন প্রশ্নকারী বললেন, "আপনি একটা অপদার্থ, আপনাকে দিয়ে কিছুই হবে না, এ জন্যেই সাঁইত্রিশ বছরেও একটি বিয়ে বা একটি প্রেম করতে পারলেন না।" আবার সাথে সাথে তিনি বললেন, "ঠিক আছে, আপনি যদি মা সীতার মতো বনবাসে কয়েক বছর থাকতে রাজি থাকেন ঢাকা শহর ছেড়ে, তা হলে কিছু করা যেতে পারে।" আমি সাথে সাথে সম্মতি দেই, "আমি রাজি।" তখন তিনি আমাকে একটি হাউস ডেইরি বা ছোট গো-খামার করার বুদ্ধি দেন এবং সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

গত বছর জুন মাসে উল্লেখিত ঘটনার পর ঐ সজ্জন ভদ্রলোকের বুদ্ধি ও চেষ্টায় ঢাকা থেকে ৪০ কিলোমিটার দূরে চন্দ্রায় একটি ছোট ডেয়ারি ফার্ম গড়ে তুলেছি, যার বাস্তব কাজ শুরু হয়েছে এ বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝ থেকে। আমার ফার্মের নাম 'তপোবন ফার্মিং কমপ্লেক্স'। নামটি আমার দেয়া, বহু খোঁজাখুঁজির পরে ভাওয়াল গড়ে চন্দ্রাতে যে জায়গাটি পেয়েছি তার সাথে নামের মিল পেয়ে গেলাম শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায়ের পথ প্রবাসে বইটি পড়ে। আমার ফার্মের নাম তপোবন দেই গত বছর আগস্ট মাসে আর পথে প্রবাসে বইটি পড়ে শেষ করি গত ২/২/৯২ ও ৩/২/৯২ তারিখে। দুইদিন দুই রাতে।

পথে প্রবাসে বইতে শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায় লিখেছেন– "ইংল্যান্ড থেকে থুরিঙ্গিয়া বনরাজিমালা অঞ্চলটি বিরল বসতি নয়, গ্রামে গ্রামে কারখানার চিমনী কর্মব্যস্ততার প্রমাণ দিচ্ছে। তবু অঞ্চলটির হাতে অফুরন্ত ছুটি। এতে যেন আকাশের অংশ আছে আকাশের ব্যাপ্তি। প্রাচীন তপোবন সম্বন্ধে আমার যে ধারণা আছে তার সাথে থুরিঙ্গিয়ায় এই মাটির আকাশটিকে বেশ মানায়। বনের দ্বারা আকাশ ঢাকা পড়বে না, যদি পড়ে

www.pathagar.com

তো তপোবনে ও রাজনগরীতে প্রভেদ কোথায়? মানবাত্মার সহজ যুক্তিটিকে রাত্রি দিন উপলব্ধি করবার জন্যই তপোবন। তপোবনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ দশদিক ব্যাপী স্পেস।” আমার এ লেখার জন্য এ পর্যন্ত উদ্ধৃতি দিলেই চলে, কিন্তু পাঠক পাঠিকাদের কিছু ভালো লেখার সাথে পরিচয় করে দেবার লোভে উদ্ধৃতিটি আরও একটু বেশি করে দেই। এতে মনে হয় আমার বলার বিষয়ে খুব একটা অপ্রাসঙ্গিকও হবে না, “থুরিঙ্গিয়ার হাওয়া সমুদ্র বক্ষের হাওয়ার মতো মুক্ত এবং মুক্তির স্বাদে স্বাদু। ইচ্ছা করে সমস্তটা এক নিঃশ্বাসে শোষণ করি। শহরে থেকে বাতাস আমরা আধপেটা খাই, আমাদের ক্ষুধা মেটে না। লন্ডনের মতো শহরে নাক বুঁজেই থাকতে হয়, অভ্যাসের দোষে পার্কের বাতাসও গ্রহণ করতে প্রবৃত্তি হয় না। স্বয়ং পঞ্চম জর্জেরও সাধ্য নাই যে লন্ডনের জলহাওয়া বৃষ্টি কুয়াশার অতীত হন। অথচ থুরিঙ্গিয়ার চাষিরাও তার তুলনায় ভাগ্যবান।

গ্যেয়টের যুগে থুরিঙ্গিয়া আরো বন্য আরো বিজন ছিল, সন্দেহ নেই। তার কর্মস্থল ভাইমার এতো ছোট যে প্রায় পল্লী বিশেষ, তখনকার দিনে নিশ্চয়ই ছিল অরণ্য-পল্লী। গ্যেয়টের দরবারী মনকে অরণ্য সর্বদাই ডাক দিত, তার বাগান-বাড়িটি অরণ্যেরই অন্তর্গত একটি কুটির। দরবার থেকে ছুটি নিয়ে সেইখানে তিনি প্রস্থান করতেন। সংসারের প্রাত্যহিক তুচ্ছতার অসংখ্য বন্ধন স্বীকার করেও যে তিনি মুক্ত পুরুষ ছিলেন, অন্তত বুভুক্ষ পুরুষ ছিলেন, তার কারণ তিনি কেবল নাগরিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আরণ্যক। গ্যেয়টের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের যে সমন্বয়, অন্তত যে সমন্বয় প্রয়াস দেখি সে এমনি করেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি এ্যারিস্ট্রোক্র্যাট তো ছিলেনই অধিকন্তু প্রকৃতির খুব কাছাকাছি ছিলেন, অন্তত থাকবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর অসংখ্য সুপাত্রীর কারুকে বিবাহ না করে এ্যারিস্ট্রোক্র্যাট গ্যেয়েটে বিবাহ করলেন কিনা এক চাষিনীকে, তাও বহুকাল এক সঙ্গে বাস করবার পরে। এর অর্থ কি এই নয় যে তিনি চীনে মাটির পুতুলের কাছে যা পেতেন তার অনেক বেশি পেয়েছিলেন মাটির মেয়ের কাছে? প্রকৃতির হাতে গড়া প্রাণময়ী নারীর কাছেই মানোময় পুরুষের পরিপক্কতা। আমার ধারণা গ্যেয়টের ভিতরটায় দুবেলা কুরুক্ষেত্রে চলত, সত্য অসত্য অষ্টপ্রহর সংগ্রাম। তবুও আমার বিশ্বাস তাঁর মধ্যে একটি সহজ সর্বজ্ঞতাও ছিল। তিনি ছিলেন অন্তরে ঘটতে থাকা দ্বন্দ্বের অতীত (এ্যবাভ দ্যা ব্যাটল)। মহামানবের মতো, মহামানবের এই কবিও ছিলেন স্রষ্টাও না বিদ্রোহীও না, নিছক দ্রষ্টা, বিশ্ব উপদ্রষ্টা। গ্যেয়টের যতগুলি প্রতিকৃতি আমি দেখেছি সেগুলিতে তাঁর চক্ষু আমাকে আকৃষ্ট করেছে তাঁর সকল কিছুর চেয়ে। তাঁর দৃঢ় নিবন্ধ ওষ্ঠযুগল তাঁর চক্ষুরই বাহন। তাঁর চক্ষুরই সংকল্প তাঁর ওষ্ঠে ব্যক্ত হয়েছে।”

থুরিঙ্গিয়ার যে বর্ণনা উপরে রয়েছে তার সাথে হুবহু যে মিল রয়েছে আমাদের বাংলাদেশের ভাওয়াল গড়ের বনাঞ্চলের, বিশেষ করে কালিয়াকৈরের চন্দ্রা অঞ্চলের। প্রকৃতি যে কত সুন্দর, মধ্যম ধরণের বনাঞ্চল যে কিভাবে হৃদয়ে ঢেউ জাগায় তা বলার বাইরে। ভাওয়াল গড়ের বনাঞ্চল, এর নিঃস্বর্গ শোভা আমাকে মাতাল করে তুলেছে। ভাওয়ালের গড়, লক্ষ লক্ষ গজারি, জীবনানন্দ দাশের কবিতার হাজার হাজার কাঁঠাল গাছ, শত শত তালগাছ, অনেক অনেক খেজুর গাছ, বাঁশ ঝাড়, আকাশ ছোয়া শত শত দেবদারু গাছ, লাল, হলুদ, কমলা রংয়ের শিমুল তমাল অশোক ফুলের গাছসহ আরও

www.pathagar.com

কত ধরণের নাম জানা ও অজানা বৃক্ষরাজি যে লাল মাটির এই ভাওয়ালে রয়েছে তা দেখে চিত্ত হরণ হয়, প্রাণ মন তন্ময় হয়ে যায় আর কল্পনার রথে চড়ে ঘুরে বেড়াই। মনে হয় এটি যেন বাংলাদেশের এক নৈবেদ্যের ডালি অথবা প্রতিমা রাখার বেদী। ঈশ্বর এই নৈবেদ্যের ডালি সৃষ্টি করেছেন এক বিশেষ উপহার-বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর জন্মগ্রহণের জন্য। এই নৈবেদ্যের ডালি, বা প্রতিমার বেদী হিসেবে এই ভাওয়াল গড় ঈশ্বর নিজ হাতে অতি নিপুণভাবে শিল্পীর যত্ন নিয়ে তৈরি করেছেন। জানি না ভাওয়ালের কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামটি কেমন। যিনি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন– তিনি চিরতরে চলে গিয়েছেন। মনে বিশ্বাস আছে ভাওয়াল গড়ে দরদরিয়া গ্রাম দেখার সুযোগ একদিন হবেই হবে। সে আশায় অধীর অপেক্ষায় বসে আছি। সেদিন নৈবেদ্যের ডালির বা প্রতিমার বেদীর কেন্দ্রবিন্দু বাংলাদেশের ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের নায়কের জন্মস্থান স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাবো। ভাওয়াল গড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে মনমাতানো ভাবনায় আবেগে আপ্লুত হয়ে এমনি অনেক ভাবনা ভাবি। যাক সে কথা, এই ভাওয়ালের চন্দ্রায় আজকাল আমি প্রায় প্রতিদিন আসি আমার ফার্মের কাজে। এখানেই এখন আমার জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার রণ ও মনোভূমি। এই চন্দ্রাতে ঢাকা থেকে যাতায়াত করতে কোনও কোনও দিন বাসের মধ্যে, বাস স্ট্যান্ডে, আমার নির্মাণাধীন ফার্মে যে সব দৃশ্য চোখে পড়ে এবং যেসব অভিজ্ঞতা হয় তার খণ্ড চিত্র নিয়ে এই এলোমেলো প্রতিবেদন তুলে ধরার প্রয়াস।

গত ২৬/২/৯২ বুধবার আমার হাউস ডেয়ারি বা ফার্মের কাজ চলছে, খোলামেলা প্রান্তর; অল্প দূরেই অপরূপ সুন্দর বনভূমি। প্রচণ্ড রোদ– একটু দূরে একটি ছোট আমগাছ, সেখানে দুইটি চেয়ারে বসে দৈনিক পড়ছি আমি ও আমার একবন্ধু আনোয়ার কামাল। হঠাৎ এক অন্ধ বৃদ্ধ একটি বাচ্চা ছেলেকে ধরে আমাদের কাছে এসে তার দুঃখ ও অভাবের কথা বলা শুরু করলো, তার কথা শুনে আমি বলি তা আপনার জন্যে আমি কি করবো। কথাটা একটু রুক্ষ সুরেই বলে ফেলি। শুনে বৃদ্ধ বলে, "বাবারে, আমি একজন অন্ধ, আমার বয়স একশত বারোর মতো– আপনারা যদি এই ভাষায় কথা বলেন তাহলে আমি কোথায় যাবো।" বৃদ্ধের করুণভাবে বলা এ কথা শুনে প্রাণে ভীষণ আঘাত পাই এবং দুর্বল হয়ে পড়ি। সাথে সাথে সিদ্ধান্ত নেই পকেটে হাত দিব, যা বের হয় দিয়ে দেবো। কিন্তু কার ভাগ্য মন্দ বুঝতে পারি না। মাত্র দুই টাকার একটি নোট হাত দিয়ে বের হয়, তাই তাকে দিলাম। দুই টাকা পেয়েই লোকটি যে খুশি হলো তা বলার বাইরে। এবার বৃদ্ধের সাথে কথা জুড়ে দেই। আমি জিজ্ঞাসা করি, মিয়া সাহেব অন্ধ কবে হলেন? সে বলল আজ প্রায় ৬০ বছর। জিজ্ঞাসা করি, আপনার বাবা কি করতেন- বলেন গৃহস্তগিরি, চাষ আবাদের– অন্যের জমি চাষ আবাদ করে খেত, হিন্দুদের জমিতে। আমি বলি হিন্দুরাতো খুব খারাপ মানুষ ছিল, মুসলমানদের উপর অত্যাচার করতো। বৃদ্ধ জবাব দেয়, "একদম বাজে কথা– মিথ্যা কথা– হিন্দুদের ধৈর্য ছিল, দয়ামায়া ছিল। ওরা দুর্বল ছিল, নিজের জমিতে নিজেরা চাষ করতো না- অন্যকে দিয়ে চাষ-আবাদ করাতো, ওদের মান সম্মানের ভয় ছিল। আর মুসলমানরা তো নিজেরাই নিজের জমি চাষ করে, অন্যকে চাষ করার সুযোগ দেয় না।– আরে, নিজের জমি নিজে চাষ করলে গরিব কোথায় যায়? কারো কোনও মান সম্মানের ভয় নাই, আর

www.pathagar.com

যে মানুষের মান সম্মানের ভয় নাই তার সাথে জানোয়ারের কোনও পার্থক্য আছে নাকি?" বৃদ্ধ কিন্তু মুসলিম। বৃদ্ধের এ কথা শুনে আমি থ হয়ে যাই। অনেক ছবি অনেক কথা মনের পাতায় ভেসে উঠতে থাকে। "যে মানুষের মান সম্মানের ভয় নাই তার সাথে আজ আমরা কয়জনে মান সম্মানের তোয়াক্কা করে চলি। পিতা ছেলেমেয়ের কাছে, স্বামী স্ত্রীর কাছে, স্ত্রী স্বামীর কাছে, শিক্ষক ছাত্রের কাছে, ছাত্র শিক্ষকের কাছে কয়জন নিজের মান সম্মান বজায় রেখে চলছে? সম্মানিত ব্যক্তির সংখ্যা আজ দুর্লভ। ছাত্র-শিক্ষক, সাংবাদিক, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী সবার আজ একটাই মানদণ্ডের ভিত্তি, কার অর্থ বেশি। এই অর্থ ন্যায় পথের না অন্যায় পথের তার আজ আর কারও দেখবার বিষয় না। স্বামী বিবেকানন্দের একটি কথা মনে পড়ছে, "যে সমাজে বৈশ্যদের দাপট সেখানে প্রাচুর্য্য দেখা যাবে, কিন্তু ন্যায় বিচার ও শান্তি বিতাড়িত হবে। আর যে সমাজে ব্রাহ্মণদের (ব্রাহ্মণ মানে যে দয়ালু, সত্যনিষ্ঠ, জ্ঞানী, পরোপকারী ইত্যাদি) দাপট বেশি থাকবে সেখানে প্রাচুর্য্য থাকবে না, কিন্তু ন্যায় বিচার ও শান্তি থাকবে।" আমাদের সমাজ আজ বৈশ্য বা ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। তাদের দাপট প্রবল। আজ মানুষ প্রাচুর্য্যের জন্য আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিচ্ছে অহরহ, ফলে মানুষের হৃদয় থেকে ভালোবাসা দয়ামায়া প্রেম প্রীতি সুখ শান্তি উধাও। মানুষ আজ অহরহ মিথ্যা কথা বলে। সরকারি কর্মকর্তা মন্ত্রী সাহেবরা তাদের পিএ, পিএস'দের কাছে নিত্য মিথ্যাবাদী হচ্ছে– কেউ ফোন করলে বলে দেবার হুকুম থাকে উপস্থিত থাকলেও নেই বলার। খালি কক্ষে একা থাকলেও কেউ স্লিপ দিলে বলে দেন মিটিং-এ আছেন। বাসায় ফোন করলে কাজের চাকরকে বলবে, বলে দাও বাসায় নেই। এসব মিথ্যা বলে অহরহ যাকে দিয়ে বলাচ্ছে তার কাছে সে যে মান সম্মান বিসর্জন দিচ্ছে এবং ছোট হচ্ছে তার প্রতি খেয়াল নেই। প্রতিনিয়ত আজ নিজের আত্মার সাথে মিথ্যা কথা বলা মানুষ নিজের সাথেই প্রতারণা করছে। সম্মানজনক ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। ভালো মানুষ হৃদয়বান মানুষের সংখ্যা বিরল, একেবারেই নেই তা ঠিক না।

তপোবনে বসে একশত' বার বছর বয়স্ক একজন অন্ধ ভিক্ষুকের মুখে এ কথা শুনে উল্লেখিত এলোমেলো ভাবনাগুলো মাথায় নিয়ে আনমনে তাকিয়ে রইলাম পার্শ্বের জংগলের দিকে, গজারির বনের দিকে। বসন্তকালের দুপুরের বন দেখি আর দেখি, চোখ জুড়ায়ে যায়, ভাবনা আরও গভীর হয়, কল্পনার রথে চড়ে ভাবনা শাখা প্রশাখা বিস্তার করে নানা জালের সৃষ্টি করে। এখন বসন্তকাল। গাছ থেকে পুরাতন পাতা ঝরে পড়ছে, নতুন পাতা গজাচ্ছে। পুরাতন পাতা ঝরে যাওয়া ও নতুন পাতা গজানো দেখে হঠাৎ একজনের কথা হৃদয়পটে ভেসে ওঠে। অমনি নিজের অজান্তেই মনে মনে গেয়ে চলি– "বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলারে/দেখোনি কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলারে, যে ঢেউ উঠে তারই সুরে বাজে কি গান সাগর জুড়ে/যে ঢেউ পড়ে তাহারও সুর জাগছে সারা বেলারে/বসন্তে আজ দেখলে তোরা ঝরা ফুলের খেলারে/আমার প্রভুর পায়ের তলে– শুধুই কিরে মানিক জ্বলে। চরণে তার লুটিয়ে কাঁদে লক্ষ মাটির ঢেলারে/আমার গুরুর আসন কাছে সুবোধ ছেলে ক'জন আছে। অবোধ জনে গাল দিয়েছে তাই আমি তার চেলারে। উৎসবরাজ দেখেন চেয়ে ঝরা ফুলের খেলারে।"

www.pathagar.com

কাছের ও দূরের গজারি বনের পাতা ঝরা দেখে হৃদয়পটে যে প্রিয়জনের মুখ ভেসে ওঠে তার ফলশ্রুতিতে আনমনে গুণগুনিয়ে ঐ গান শেষ হতেই আবার মনে মনে গাই আবৃত্তি করি "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই, চিরদিন কেন পাই না। কেন মেঘ আসে হৃদয় আকাশে, তোমারে দেখিতে দেয় না।... ক্ষণিক আলোকে আঁখির পলকে তোমায় যবে পাই দেখিতে ওহে হারাই হারাই সদা হয় ভয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।... কী করিলে বলো পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে ওহে এত প্রেম আমি কোথা পাব হে, তোমারে হৃদয়ে রাখিতে।" ছোট্ট একটি আমগাছ তলায় খোলা প্রান্তরে বসন্তের মৃদু উষ্ণতায় চেয়ারে বসে উল্লেখিত গান দু'টি মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে হঠাৎ করে বসন্তের পাগল করা বাতাস বয়ে যায়, অমনি পাগল বাতাসে মন পাগল হয়ে গেয়ে ওঠে– "ওগো দক্ষিণ হাওয়া, ও পথিক হাওয়া, দোদুল দোলায় দাও দুলিয়ে। নতুন পাতার পুলক ছাওয়া পরশখানি দাও বুলিয়ে। আমি পথের ধারের ব্যাকুল বেণু, হঠাৎ তোমার সাড়া পেনু গো। আহা এসো আমার শাখায় শাখায় প্রাণের গানের ঢেউ তুলিয়ে। ওগো দক্ষিণ হাওয়া, ও পথিক হাওয়া পথের ধারে আমার বাসা। জানি তোমার আসা যাওয়া শুনি তোমার পায়ের ভাষা। আমায় তোমার ছোওয়া লাগলে পরে, একটুতেই কাঁপন ধরে গো– আহা, কানে কানে একটি কথায় সকল কথা দেয় ভুলিয়ে।"

পাগল করা বসন্তের বাতাসে মাতাল হয়ে "ওগো দক্ষিণ হাওয়া" গাইতে গাইতে প্রান্তর থেকে চোখ যায় গাছের পাতায়। এবার আর ঝরা পাতা চোখে পড়ে না– চোখে পড়ে শুধু নূতন পাতা, আর নূতন পাতা দেখেই সাগর সেন এসে আমার ভিতরে হাজির হন, অমনি মনে মনে গাই বা আবৃত্তি করি, "আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা– এসো হে আমার বসন্ত এসো। দিব হৃদয় দোলায় দোলা এসো হে এসো হে, আমার বসন্তে এসো। নব শ্যামল শোভন রথে, এসো বকুল বিছানো পথে, এসো বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়াল ফুলের রেণু। এসো হে এসো হে এসো হে, আমার বসন্ত এসো। এসো পাগল হাওয়ার দেশে। তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ায়ে দিয়ো। এসো হে এসো হে আমার বসন্ত এসো।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের ভূত আমার মন থেকে নেমে যেতেই আবার বৃদ্ধের কথা মনে হয়। "একদম বাজে কথা, মিথ্য কথা হিন্দুদের ধৈর্য ছিল, দয়ামায়া ছিল, ওরা ভদ্রলোক ছিল, নিজের জমিতে নিজেরা চাষ করতো না– অন্যকে দিয়ে চাষ আবাদ করাতো। আরে নিজের জমিতে নিজে চাষ করলে গরিব কোথায় যায়? ওদের মান সম্মানের ভয় ছিল। যে মানুষের মান সম্মানের ভয় নাই তার সাথে জানোয়ারের কোনও পার্থক্য নাই।"

সাপ্তাহিক প্রত্যয়ন পত্রিকায় ২৬/৩/১৯৯২ সংখ্যায় প্রকাশিত

বিঃ দ্রঃ- ১৯৯২ সনের চন্দ্রার সাথে ২০০৮ সনের কালিয়াকৈরের চন্দ্রার কোনও মিল নেই, এখন এটি একটি শিল্প অঞ্চল।

www.pathagar.com

ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার আলবদরের চেয়েও বেশি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট
আসল মুক্তিযোদ্ধা কারা?

কোথা থেকে কিভাবে এই লেখাটি শুরু করবো তা অনেকদিন হলো ঠিক করতে পারছি না। অথচ বিষয়টি নিয়ে লেখার ধারণাবোধ করছি বেশ কয়েক বছর হলো। বিষয়টি আমার কাছে খুবই গুরুতর। ১৯৭১ সনে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধা ছিল কারা বা কাদের মুক্তিযোদ্ধা বলা হতো, তা আজ দেশবাসী বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম, তাঁদের কাছে অস্পষ্ট। আবার আমরা যারা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিবাহিনীতে ছিলাম তাঁদের কাছে বিষয়টি অতি পরিষ্কার, ১৯৭১ সনে মুক্তিযোদ্ধা কারা ছিল। দিন যতই যাচ্ছে বিষয়টিকে নিয়ে ততই জটপাকানো হচ্ছে, বিষয়টিকে আরও জটিল ঘোলাটে করা হচ্ছে।

মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিসেনা কারা তা আমার কাছে পরিষ্কার হলেও অনেকদিন যাবৎ বিশেষ করে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পর থেকে দেশের কিছু রাজনীতিবিদ কিছু লেখক, কিছু বুদ্ধিজীবী এদের লেখা পড়ে কেমন যেন হোঁচট খাই। নিজে মুক্তিবাহিনীতে ছিলাম ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে যোগদানের জন্য নাম লিখিয়ে সীমান্ত অঞ্চলে ১৫ দিনের প্রাথমিক শারীরিক মানসিক ট্রেনিং নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা উচ্চতর অস্ত্র এবং গেরিলা ট্রেনিং নিলাম দুইমাস। যুদ্ধ করলাম পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস। অথচ আমি আজ কারা মুক্তিযোদ্ধা কারা মুক্তিবাহিনী তা নিয়ে হোঁচট খাই- খেই হারিয়ে ফেলি, এ কেমন কথা! মাত্র সেদিনের কথা স্মৃতির পাতায় সব ঝলমল করে জ্বলছে- অথচ আমরা হাজার হাজার (৬০হাজার) মুক্তিযোদ্ধা জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমাদের সামনে ঘটনার এমন জঘন্য বিকৃতি, এমন মিথ্যাচার, ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচয় দিয়ে বাগাড়ম্বর করা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা। আর যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা তাঁদের কোনও খোঁজ নেই, তাঁদের পরিচয় তাঁদের ত্যাগকে বিলুপ্ত করে দেবার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ চেষ্টা চলছে। ভূমিকা বা দুঃখের কথা আর লম্বা করতে চাই না- সরাসরি বলতে চাই ১৯৭১ সনে মুক্তিযোদ্ধা কারা ছিল। ১৯৭১ সনে পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিরস্ত্র মানুষ হত্যা শুরু করে, এদের হত্যার তালিকায় ছিল বাঙালির স্বার্থে যারা কথা বলতো সেই সব রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, ছাত্র-জনতা। নারী ধর্ষণ অগ্নিসংযোগ ছিল নিত্য ঘটনা। বর্তমানের বাংলাদেশ সেদিনের পূর্ব পাকিস্তানকে এই অবস্থান থেকে মুক্ত করার জন্য যারা মানসিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অংশগ্রহণ করে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে তারাই মুক্তিযোদ্ধা। এখন প্রশ্ন আসে কতজন লোক এই প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ১৯৭১ সনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? তাদের বয়স কত ছিল? তারা কোন পেশার সাথে যুক্ত ছিল? সর্বোপরি যারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের সেদিন কি করতে হয়েছিল, কি করলে তাদের

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিবাহিনী বলা হতো? আমার জানামতে ভারত সরকারের প্রকাশিত তথ্য এবং বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন প্রকাশিত তথ্য মতে– ১৯৭১ সনে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি। এর মধ্যে প্রায় এক কোটি লোক পাক বাহিনীর অত্যাচারে জীবন বাঁচাবার জন্য সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের দুই কোটি মানুষের ঘরবাড়ি পাকবাহিনী আগুন দিয় পুড়িয়ে দেয়। যে সাড়ে ছয় কোটি মানুষ দেশের মধ্যে বাস করেছেন তারাও সর্বক্ষণ মৃত্যুচিন্তা মাথায় নিয়েই বসবাস করেছেন। যে এক কোটি লোক সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিলেন তার মধ্যে প্রায় ৮০ লাখের বেশি ছিল হিন্দু বা অন্যধর্মের– এসব অতিবাস্তব সত্য কথা। যারা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়ে শরণার্থী শিবিরে ছিলেন, যে মানবেতর ভাবে জীবনযাপন করেছেন তা যারা দেখেন নাই তাদের বিশ্বাস করানো যাবে না আমি নিজে যে দৃশ্য দেখেছি সেকথা মনে হলে এখনও গা শিউরে উঠে। তবুও ভারত সরকার ভারতের জনগণ এই প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছেন, খাদ্য দিয়েছেন, চিকিৎসা দিয়েছেন বা যতটুকু সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করেছেন।

যাই হোক সেই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বাঙালি পাক সেনাবাহিনীর সংখ্যা কত ছিল, মনে হয় খুব বেশি হলে দুই হাজারের বেশি নয়। ই,পি,আর এ বাঙালি সংখ্যা কত ছিল তাও মনে হয় হাজার তিনেক, বাঙালি পুলিশের সংখ্যা কত ৫ হাজারের বেশি নয়। তাহলে মোট দশ হাজার, ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চে বাঙালি সেনাবাহিনী, ই,পি,আর, পুলিশ ছিল। এর মধ্যে পাকবাহিনী যুদ্ধ বা আক্রমণ করলে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কতজন ঝাঁপিয়ে পড়ে? আর কতজন পরবর্তী পর্যায়ে পাকসেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করে? মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত বই পত্র-পত্রিকা পড়ে আমার ধারণা এই দশ হাজারের মধ্যে ৫ হাজার স্বাধীনতার পক্ষে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে, বাকি পাঁচ হাজারের কিছু পালিয়ে বেড়ায় জীবন বাঁচাবার জন্য, কিছু পাকবাহিনীর সাথে সক্রিয় ভাবে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করে। এ থেকে ধরে নিতে পারি পাঁচ হাজারের মতো বাঙালি, সেনাবাহিনী ও পুলিশ, ই,পি,আর স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেয়।

এবারে আসা যাক ১৯৭১ সনে পাকবাহিনীর সংখ্যা কত ছিল? হিসেব পরিষ্কার ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা সদস্য ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর মিত্র-ও মুক্তিবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করে। এবারে আসা যাক মুক্তিবাহিনী কতজন ছিল? ভারত সরকারের রেকর্ড অনুযায়ী মুক্তিযোদ্ধাদের পরিমাণ ছিল ৬০ হাজার। ৬০ হাজার ট্রেনিং শেষ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। দশ হাজার উচ্চতর ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেনিংরত অবস্থায় ছিল। এরমধ্য হতে আবার দশ হাজারের মতো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কমান্ড অমান্য করে বা ছুটি নিয়ে পোস্টেড স্থান থেকে বাড়ি বা নিজস্ব স্থানে চলে যায়, যা যুদ্ধ আইনে মারাত্মক অপরাধ পৃথিবীর যেকোনো যুদ্ধে যারা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কমান্ড অমান্য করে যেসব সেনাসদস্য চলে যায় বা যাবার চেষ্টা করে তাদের খুব সামান্য ফর্মালিটি অনুযায়ী বিচার করে শাস্তিপ্রদান করা হয়। এটা পৃথিবীর সব দেশের সব যুদ্ধের একটি প্রতিষ্ঠিত অতি সাধারণ নিয়ম।

www.pathagar.com

আমাদের মুক্তি বা স্বাধীনতা যুদ্ধেও বেশ কিছু সংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র নিয়ে কমান্ড অমান্য করে নিজের এলাকায় চলে এসেছেন, কেউ ভিতরে অপারেশন করবে এমন স্কিম দিয়ে ভিতরে এসে আর ফিরে যায় নি, তবে এদের সংখ্যা শতকরা ১০ জনের বেশি নয়। দুনিয়ার সব যুদ্ধেই এটা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা যুদ্ধেও এটা হয়েছে তবে পার্থক্য এই যে এইসব কমান্ড থেকে পলাতক যোদ্ধা বা সেনাদের অন্যসব দেশে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয় বা হয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশে এদের কোনও শাস্তি দেওয়া সম্ভব হয় নাই। এরাই বাংলাদেশের সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধাদের সুনাম ধ্বংস করার মূলে সিংহভাগ দায়ী। এরা নিজের এলাকায় বা দেশের অভ্যন্তরে অস্ত্র নিয়ে এসেছে এসে এরা যত না পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার চেয়ে বেশি করেছে সামাজিক দরবার, গণভোজ বা সাধারণ মানুষের বাড়িতে থেকেছে তাদের খাবার খেয়েছে পয়সা না দিয়ে, হাতে অস্ত্র অথচ বালিশে মাথা রেখে শয্যা গ্রহণ করেছে যা যুদ্ধরত বা অস্ত্রধারী একজন সৈনিকের জন্য মারাত্মক অপরাধ। যাই হোক সব দেশে সব যুদ্ধেই এসব হয়।তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এটা বেশি হয়েছে। কিন্তু এরা কোনও শাস্তি পায় নাই। যারা এসব করেছে এদের কমান্ড সেক্টর-সাবসেক্টরে লালকালি দিয়ে এদের নাম চিহ্নিত করা হয়েছিল। এদের শাস্তি দেবার জন্য, কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে আর কিছুই হয় নাই। সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়, এলোমেলো হতো না যদি না ভারতীয় সেনাবাহিনী আরও বেশ কিছুদিন বাংলাদেশে থাকতে পারতেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার সাথে সাথে আমরা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে বিদায় দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাই এবং সফল হই। আর এর ফল যা স্বাভাবিক ভাবে হওয়া দরকার তাই হয়েছে- চারিদিকে বিশৃংখলা এবং হত্যাযজ্ঞ। যাক সে অন্য প্রসঙ্গ। এখন দেখা যাচ্ছে যারা সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধা নয় তারা আসল এবং খাঁটি যোদ্ধা হিসেবে বাজার সরগরম করে রেখেছে এবং এদের যারা আশ্রয় দিয়েছে এবং খাবার দিয়েছেন তার ও নিজেদের মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিচ্ছেন।

কিন্তু আমি আমার ট্রেনিং এবং যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তারাই আসল মুক্তিযোদ্ধা যারা ট্রেনিং নিয়েছে ট্রেনিং-এ শারীরিক, মানসিক বা আদর্শগত, অস্ত্রবিদ্যা, টেকনিক্যাল বা কলাকৌশলগত এই চারটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এরপরে ধর্মগ্রন্থকে সামনে রেখে বুকে হাত দিয়ে শপথ করানো হয়েছে। শপথ বাক্য অমান্য করলে গুলি করে মেরে ফেলা হবে বলে স্পষ্ট ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে ট্রেনিং সেন্টারে, শপথ বাক্যে কি ছিল? শপথে ছিল- “এই মুহূর্ত হতে আমি গণপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ ও স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছি, জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু থাকা অবস্থায় স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধ করবো আমি কোনও অবস্থাতেই আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের গোপনীয়তা প্রকাশ করবো না, আমি কঠোরভাবে যুদ্ধের নিয়ম শৃংখলা বজায় রাখবো, আমার কমান্ডারের যেকোনও নির্দেশ আদেশ বিনা প্রশ্নে, বিনা বাক্যে মেনে চলবো। কোনও ধরণের ভোগবিলাসী জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিবো না, মুক্তিবাহিনীর পরিচয় দিয়ে কোনও ধরণের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিব না। কোনও নিরস্ত্র মানুষের গায়ে অস্ত্র প্রয়োগ করবো না”। মাথার উপরে ঈশ্বর, সামনে

www.pathagar.com

ধর্মগ্রন্থ এবং বুকে হাত দিয়ে এই ধরণের শপথের পরেই একজন মুক্তিযোদ্ধাকে ভারতীয় সেনাবাহিনী অস্ত্র দিয়ে সাবসেক্টরগুলোতে পোস্টিং দিয়েছে। এই সাবসেক্টরগুলো ছিল সীমান্ত অঞ্চলে বি,এস,এফ, ঘাটিগুলোকে কেন্দ্র করে। সাবসেক্টরে কয়েকটি কোম্পানি ছিল। একজন কোম্পানিতে একজন কোম্পানি কমান্ডার। একজন সাবসেক্টর কমান্ডার ছিল অনেক যায়গায় একজন ভারতীয় মেজর এবং বাংলাদেশী বা সাবেক পাক-আর্মির অফিসার সাবসেক্টর কমাণ্ডার ছিলেন। বাংলাদেশী অফিসার সংখ্যায় কম ছিলেন কাজেই ভারতীয় সাবসেক্টর কমান্ডার সবখানেই ছিল।

ট্রেনিংপ্রাপ্ত শপথ নেওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের মাসে ভারতীয় টাকায় ৫০ টাকা বেতন, ৬০ টাকা রেশন, এবং ভিতরে গেরিলা অপারেশন করার জন্য প্রতিজন মুক্তিযোদ্ধাকে প্রতিদিনের জন্য ১০ টাকা অতিরিক্ত খরচ দেওয়া হতো। ৫ জনের বা দশজনের একটি গেরিলা গ্রুপ বর্ডার থেকে বিশ বা চল্লিশ মাইল ভিতরে গিয়ে একটি অপারেশন করবে এর জন্য সব মিলিয়ে হয়তো ১০দিন সময় থাকবে, এর জন্য প্রতিজনকে ১০০ টাকা করে দেওয়া হতো, তাদের থাকা খাওয়া খরচের জন্য। সব সময় নির্দেশ ছিল হোটেল বা দালাল থেকে সাবধানতা বজায় রেখে দাম দিয়ে কিনে খাবার যদি তা সম্ভব না হয়, যদি কোনও লোকের বাড়িতে খাবার খেতে হয় তবে দুই টাকা খাবারের দাম হলে কমপক্ষ চার টাকা দিয়ে দেবার জন্য। বিনা পয়সায় অস্ত্রহাতে সিভিলয়ানের বাড়িতে ভাত খেলে সৈনিকের চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়। হাতে বা কাছে অস্ত্র নিয়ে নরম বালিশে মাথা রেখে ঘুমালে চিন্তা চেতনায় মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে কাজেই ট্রেনিং সেন্টারে বারে বারে ভারতীয় সেনা অফিসাররা বা ওস্তাদরা নিষেধ করেছেন খবরদার, অস্ত্র হাতে কেউ বালিশে মাথা রেখে ঘুমাতে বা আরাম করতে পারবে না।

উল্লেখিত ৬০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাদের বয়স ছিল সাধারণত : ১৬ থেকে ২২ বছর, এর উপরে শতকরা এক দুইজন, তবে ১৬ থেকে ২২ এদের সংখ্যা ছিল সিংহভাগ। দিনে সামনা-সামনি যুদ্ধ রাতে পাক আর্মির ওপরে অতর্কিত আক্রমণ। একজন মুক্তিযোদ্ধাকে যে নির্দেশ এবং কমান্ড মেনে যুদ্ধ করতে হয়েছে ঝড়-বৃষ্টি-বন্যাকে উপেক্ষা করে কোনও কোনও রাত ৪০ মাইল হাঁটতে হয়েছে, রাত সাতটায় রাস্তা দিয়ে ৫ ঘণ্টা ঘণ্টায় চার মাইল বেগে হেঁটে বারটা একটার সময় ক্যাম্পের আশেপাশে অবস্থান নিয়ে আক্রমণ করে আবার ৫ ঘণ্টা পায়ে হেঁটে ফিরে আসা, এখন ভাবতেই ভয় লাগে। অথচ তখন এটাই ছিল প্রতিদিন ও রাতের স্বাভাবিক ঘটনা, না ছিল ঘুমাবার বালিশ, ট্রেঞ্চ অথবা বাংকারের মধ্যে বসে ঘুম পাড়া। মাসে ৫০ টাকা বেতন দেওয়া হলেও আমার জানামতে ৯০ ভাগের বেশি মুক্তিযোদ্ধা ঐ মাসিক বেতন তোলে নাই, অন্তত আমাদের সাবসেক্টর দেওয়ানগঞ্জ হেমকুমারী নীলফামারী জেলার সীমান্তে। কেননা টাকা রাখা বা খরচ করার কোনও উপায় ছিল না, সবাই চেয়েছে যুদ্ধ শেষ হলে নিবে। ৬০ টাকা মাসিক রেশনের বদলে আমরা টাকা না নিয়ে রেশন নিতাম, কেননা এতে সুযোগ ভালো ছিল, চাল, ডাল, প্যাকেট মাছ, সবজি, ডালডা, আটা, চিনি, লাকড়ি, চা, গুড়ো দুধ, ফল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যেতো, টাকার চেয়ে এসব নেওয়া সুবিধাজনক

www.pathagar.com

ছিল। কোনও মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য কোনও সিভিলিয়নের বাড়িতে ভাত খাবে এটা আমরা স্বপ্নেও দেখতে পেতাম না। কিন্তু আজ শুনি আমরা মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছি খাবার দিয়েছি আমরাও মুক্তিযোদ্ধা। এসব কথা শুনে আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে অস্ত্র বা যুদ্ধ বিদ্যা ট্রেনিং নিয়েছি যুদ্ধ করেছি তাদের খুবই খারাপ লাগে। আর হ্যাঁ অস্ত্র গোলাবারুদ, রেশন, মাসে ৫০ টাকা বেতন ভাতা, রাস্তা খরচ সব দিয়েছে ভারত সরকার বা ভারতীয় সেনাবাহিনী। এসব দিতো, বিনিময়ে কাজ কি হচ্ছে তার জবাবদিহিও নিতো বা দিতে হতো, যারা সন্তোষজনক জবাবদিহী দিতে পারতো না তারা শাস্তি পেত। যাক এটা একটা বিরাট বিষয় এত অল্প পরিসরে বিস্তারিত লেখা সম্ভব নয়। পরে সময় সুযোগ হলে বিস্তারিতভাবে লেখা যাবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের আগে আমরা জানতাম মুক্তিযোদ্ধা ৫৭,০০০/- হাজার, মুজিব বাহিনী ৩০০০ হাজার, কদের সিদ্দিকীর বাহিনী ১০০০ হাজারমোট ৬১,০০০ হাজার। এর মধ্যে আবার ৫৭,০০০ মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগের মূল নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামান, আবদুল মান্নান, আবদুল মোমেন, ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলাম জে. ওসমানী শেখ কামালসহ ১৯৭০ সনের আওয়ামী লীগের নির্বাচিত ১৬৭ জন এমএনএ ও ৩০০ জন এমপি এ (৫/১০ জন ছাড়া) সবাই ৩০০০ মুজিব বাহিনী কে মুক্তি বাহিনী হিসাবে স্বীকার করতেন না। তাঁরা এই ৩০০০ হাজার মুজিব বাহিনীকে স্বাধীনতার বিরুদ্ধ বা শত্রু বলে মনে করতেন। যাক তবু ধরে নিলাম ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের আগে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল ৩০০০, বিতর্কিত মুজিব বাহিনী সহ ৬১,০০০।

জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায়র এলে তাঁকে কেন্দ্র করে কিছু সুবিধাবাদী দালাল বলা শুরু করে, শুধু আওয়ামী লীগের লোকেরা ও ভারতীয় সেনারাই যুদ্ধ করে নাই, আমরাও যুদ্ধ করেছি। জিয়াউর রহমানকে সামনে রেখে এই বক্তব্য দিয়ে ২০,০০০ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার জন্ম হয়। সংখ্যা হলো, ৬১,০০০ আসল +২০,০০০ ভুয়া মোট ৮১,০০০।

১৯৮২ সনে এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় এলে তাঁকে সামনে নিয়ে কিছু দালাল ও সুবিধাবাদী দাবী করে আমরাও মুক্তিযোদ্ধা, আমাদের নাম লিস্টে বাদ পড়েছে এরশাদ সাহেবকে সামনে রেখে আরও ৪০,০০০ ভুয়া মুক্তি যোদ্ধার জন্ম হয়।

তাহলে ৬১,০০০ আসল+ জিয়াউর রহমানের ২০,০০০ ভুয়া+ এরশাদের ভুয়া ৪০ মোট ১,২১,০০০ ভুয়া মুক্তি যোদ্ধার তালিকা হয়।

১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি আহাদ চৌধুরী ও তার সমর্থকরা দাবি তোলে আসল মুক্তি যোদ্ধার চেয়ে নকল মুক্তি যোদ্ধার সংখ্যা বেশি। নতুন ভাবে তালিকা প্রস্তুত হওয়া দরকার। তাঁরা পুনরায় নতুনভাবে তালিকা তৈরী করার কাজ শুরু করেন।

আহাদ চৌধুরীরা মুক্তিযোদ্ধার নূতন ভাবে লিষ্ট করে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা দাঁড় করান ২ লাখ।

www.pathagar.com

৮০ হাজার ভুয়া মুক্তি যোদ্ধার জন্ম দেয়, ১৯৯৬ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত আহাদ চৌধুরী ও তার সমর্থকরা। অভিযোগে জানা যায় প্রতি জনের কাছ থেকে ১০, ১৫, ২০, ২৫ হাজার করে টাকা নিয়ে ১৯৯৬ সন থেকে ২০০১ সন পর্যন্ত ৮০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার তালিকা করেছে।

আজ ২ লাখ মুক্তিযোদ্ধার নাম সরকারি তালিকায় লেখা হয়েছে। এই ২ লাখ মুক্তিযোদ্ধার মধ্যে ১ লাখ ৪০ হাজার ভুয়া। জিয়াউর রহমান ২০ হাজার, এরশাদ ৪০ হাজার, আহাদ চৌধুরী ও তার সহযোগীরা ৮০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দিয়েছে।

আবার মজা ও খুব বেদনার বিষয় এই যে, এই ১ লাখ ৪০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা এরা দিনে রাতে শেখ হাসিনা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধি, ভারত, ভারতের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কথা বলে বাজার গরম করে রাখে। এই ১ লাখ ৪০ হাজার তালিকাভুক্ত ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা বলে "শেখ মুজিব, ইন্দিরা গান্ধী ভারত সেনারা কি করেছে, আমরা বাংলাদেশ স্বাধীন করেছি। শেখ হাসিনা পাকিস্তানিদের খাবার খেয়েছে, শেখ মুজিব পাকিস্তানে বন্দি, ইন্দিরাগান্ধী বিদেশ থেকে শরণার্থীদের নামে টাকা এনে টাকা চুরি করেছে, ভারতীয় সেনারা মুক্তি বাহিনীর পিছন থেকে গুলি করে মুক্তিযোদ্ধা হত্যা করেছে।"

কিন্তু ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ৫৭,০০০ জিনুইন মুক্তিবাহিনীর সদস্য যত অভাব অনটন দুঃখ কষ্টেই থাকুক, তারা কোনদিন কোন সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের সেনাবাহিনী, শেখ হাসিনা, ভারতবর্ষ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে একটি কথা বলে না বলবে না। ১ লাখ ৪০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নামক দৃস্কৃতিকারীরা আবার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে। এই ১ লাখ ৪০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে কিছু লিখতে আমার ঘৃণা হয়। এরা রাজাকার আলবদরের চাইতেও বেশী ঘৃণিত, নিকৃষ্ট ও পাপী।

তবে ন্যায় ও সত্যের বিজয় চিরদিন। মহাত্মা গান্ধীর ভাষায় বলতে চাই যেখানে ন্যায় ও সত্য আছে সেখানে আল্লাহ, ঈশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, ভগবান, গড, সবাই এক সাথে এসে ন্যায় ও সত্যের পক্ষে দাঁড়ান, ন্যায় ও সত্যের বিজয় হবেই হবে।

আল্লাহ, ঈশ্বর, রাম, কৃষ্ণ, ভগবান, এদের শক্তির কাছে অন্যায় ও মিথ্যার তাবেদার জিয়াউর রহমান, এরশাদ, আহাদ চৌধুরীরা একদিন এক ফুতে উড়ে যাবে, জিয়া-এরশাদ, আহাদ চৌধুরীদের ভুয়া লিস্টের ১ লাখ ৪০ হাজার ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা নামক দুস্কৃতিকারিদের নাম। আমি দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি ন্যায় ও সত্যের বিজয় চিরদিন হয়ে আসছে হবেই হবে।

১৯৯৪ এবং সেপ্টেম্বর ২০০৮ সনে লিখিত

www.pathagar.com

মুজিবনগর সরকারের তিন স্তম্ভ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম, মুনসুর আলী, এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান

গত ৬ ও ৯ই মে আজকের কাগজে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কথা নামে আমার যে লেখা ছাপা হয়েছে তা লিখিত হয়েছিল গত ১০-৪-৯২ তারিখে। লেখাটি ১৭ই এপ্রিল তারিখে একই সংখ্যায় ছাপা হবে এমন ভরসা নিয়ে। যার জন্য ঐ লেখার আকারকে পরিমিত রাখতে হয়েছিল। কিন্তু এর পরেও লেখাটি বড় হয়ে যায় ফলে দুই সংখ্যায় ছাপতে হয়েছে।

ঐ লেখার পরিমাপ ছোট রাখতে গিয়ে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ তিন ব্যক্তিত্ব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী ও আবু হেনা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান সাহেবদের সম্পর্কে কোনও আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। যার জন্য নিজের বিবেকের কাছে বেশ খারাপ লাগছে, কেননা সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এরা চারজনই আমাকে চিনতেন। এদের সবার সাথেই আমার রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল খুবই বেশি। এরা সবাই আমাকে ভীষণ স্নেহ করতেন, প্রয়োজনে ধমক দিতেন। গাড়িতে পাশে বসিয়ে বহু জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন, অফিস-বাসায় অনেক সুখ-দুঃখের কথা প্রাণ খুলে বলেছেন। আমিই ১৯৭৫ সালের ৫ই নভেম্বর তাজউদ্দিন আহম্মদ এবং মনসুর আলীর লাশ বনানীর কবরস্থানে নিয়ে যাই, নিজ হাতে কবরে নামাই। আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক এটর্নি জেনারেল ফকির সাহাব উদ্দিনসহ সাথে আরও বেশ কয়েকজন ছিলেন। তখন তাজউদ্দিন ও মনসুর আলীর বাসা কাছাকাছি ছিল। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খালেদ মোশাররফের কার্ফিউর মধ্যে পালিয়ে পালিয়ে জেল গেটে যাই পায়ে হেঁটে এদের লাশ আনার জন্য, যাক সে অন্য কথা, এ বিষয়ে পরে লেখা যাবে। কাজেই মুজিবনগর সরকার প্রসঙ্গে কিছু লিখতে গিয়ে সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান সম্পর্কে কিছু না লিখলে অন্যায় করা হবে আমার পক্ষ থেকে।

আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে এ পর্যন্ত যত বই-পুস্তক বের হয়েছে এদেশে ব্যক্তিগত উদ্যোগে তার মধ্যে আমার মতে, মূলধারা '৭১ এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের লেখা "মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি" বই দুইটি খুবই মূল্যবান এবং তথ্যবহুল। এই লেখাটি লিখবার সময় মূলধারা- '৭১ পড়ার তাগিদ অনুভব করলাম। তাতে দেখলাম- মুজিবনগর সরকার ছিল "রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার" যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বা স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান তৈরি না হওয়া পর্যন্ত। "শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা, রাষ্ট্রপতি অথবা

www.pathagar.com

তার অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। এই আদেশটি ১৯৭১ সনের ২৬ শে মার্চ থেকে কার্যকারিতা লাভ করবে।"

কাজেই দেখা যাচ্ছে মুজিবনগর সরকারের মূল ক্ষমতা ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের হাতে। তাজউদ্দিন সাহেব প্রধানমন্ত্রী, মনসুর আলী সাহেব অর্থ মন্ত্রী, কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র সাহায্য পুনর্বাসন মন্ত্রী হিসেবে যে দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তার মূলে অবশ্যই সৈয়দ নজরুলের ভূমিকা রয়েছে, তিনি যদি তাদের কাজে বাধার সৃষ্টি করতেন তবে তাঁদের পক্ষে ভালোভাবে দায়িত্ব পালন করা খুবই কষ্টকর হতো। কেননা আমরা জানি খন্দকার মোশতাক, মুজিব বাহিনী ও তাদের সমর্থক অল্প কিছু গণপ্রতিনিধির জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। এর মধ্যে যদি আবার সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানের মধ্যে একতা ও সম্প্রীতি না থাকতো তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় স্বাধীনতা যুদ্ধ ক্ষতিগ্রস্ত হতো। মুজিবনগর সরকারের দুইজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা জনাব আব্দুল মান্নান এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম জীবিত এবং সক্রিয় রাজনীতিতে রয়েছেন। জনাব আব্দুল মান্নানের সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলামের এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাথে তাজউদ্দিন আহমদের খুবই ঘনিষ্ঠ সুসম্পর্ক ছিল। এরা দুই জনেই দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন যে, মুজিবনগরে তাজউদ্দিন, নজরুল ইসলাম,মনসুর আলী, কামরুজ্জামানের মধ্যে কোনও ধরণের বিরোধ ছিল না। মান্নান সাহেব মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীর পদমর্যাদায় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের রাজনৈতিক সহকারি ছিলেন। এজন্য এদের বক্তব্য যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে। মুজিবনগর সরকারের ঊর্ধ্বতন অপর একজন কর্মকর্তা স্বরাষ্ট্র সচিব, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আই, জি, পি, পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সচিব জনাব আব্দুল খালেক যিনি একজন সৎ ও দেশপ্রেমিক মানুষ হিসেবে পরিচিত। তাঁকে আমি কয়েকদিন আগে (১০-৫-৯২ তারিখে সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাবে) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেন যে, মুজিবনগরে সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানের মধ্যে কোনও ধরণের বিরোধ ছিল না। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এই চারজনের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল বলে তিনি জানান। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে মুজিবনগরে এই চারজনের মধ্যে বিরোধ আবিষ্কার করছে, তিনি তাদের ধান্দাবাজ, অসৎ ও স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু বলে মন্তব্য করেন। মুজিবনগর সরকারের অপর একজন কর্মকর্তা মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর সৈয়দ আব্দুস সামাদ (সাবেক সিএসপি) যিনি বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব বর্তমানে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর এশিয়ান এন্ড প্যাসিফিক ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ''কোঅর্ডিনেটর" হিসেবে কাজ করছেন। সম্প্রতি অফিসিয়াল কাজে ঢাকা আসেন, গত ১২-৫-৯২ তারিখে সন্ধ্যায় হোটেল শেরাটনের ৬২৭ নং কক্ষে সামাদ সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেখানে আমি সামাদ সাহেবকে মুজিবনগর সরকারের সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানের মধ্যে কোনও বিরোধ ছিল কিনা জিজ্ঞেস করলে তিনি এদের মধ্যে

www.pathagar.com

কোনও ধরণের বিরোধের কথা অস্বীকার করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এদের চার জনের সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল বলে তিনি জানান। এই সময়ে এখানে বাংলাদেশ সরকারের আরও কজন সচিব (সাবেক সিএসপি) উপস্থিত ছিলেন। কাজেই নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান চারজনের যৌথ নেতৃত্বেই শেখ মুজিবের নামে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে, এরা সবাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্ব স্ব মহিমায় মুজিবনগর সরকারের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বা নক্ষত্র ছিলেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন, তখন খারাপ ছাত্ররা রাজনীতি করতে সাহস পেত না, ভোটে দাঁড়ান অসম্ভব ছিল। পাকিস্তানের সেন্ট্রাল সার্ভিস বা পাবলিক সার্ভিস কমিশনে পরীক্ষা দিয়ে' টেক্সেশন সার্ভিসে চাকরি করেছেন' - '৫০ সনের প্রথম দিকে উপ-কর কমিশনার হিসেবে। কমিশনারের কক্ষে তিনি দেখা করতে গেলে কমিশনার বসতে বলেন নি, সেজন্যই তিনি রাগ করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি এ্যাডভোকেট হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন ফুলটাইম রাজনীতি করার জন্য। খুবই অভিজাত এবং বিত্তবান পরিবারের মানুষ সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিলে মুজিবনগরে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন তা অসাধারণ। আমার ধারণা ছিল এটি লিখিত বক্তৃতা, আওয়ামী লীগ নেতা মান্নান সাহেবকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "এটি লিখিত বক্তৃতা নয় তিনি স্পনটেনিয়াস" বক্তৃতা দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হয়, আমি বলি এ ধরণের একটি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ প্রাঞ্জল আবেগদীপ্ত বক্তৃতা কিভাবে না লিখে দেয়া সম্ভব? মান্নান সাহেব বলেন, ১৭ই এপ্রিল তার নাম আমি ঘোষণা করি। তারপর মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে পাঁচ শতাধিক বিদেশী সাংবাদিক ও উপস্থিত জনতার সামনে সিংহের মতো গর্জন করে ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে ঐ বক্তৃতা প্রদান করেন। উপস্থিত সব লোক সৈয়দ নজরুলের বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন। তাজউদ্দিন সাহেব বক্তৃতা শেষে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেলেন। একথা শুনে আমার বিশ্বাস হয় আসলেই মান্নান সাহেবের কথা সত্য হবে, কেননা ১৯৭৩ সনে ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকা নগর ছাত্রলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রমনা গ্রিনের বটতলায়। খুবই জাঁকজমকের সাথে এই সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক নিযুক্ত হয়েছিল নগর ছাত্র লীগের অন্যতম নেতা শফিকুর রহমান। এখন মাদ্রাসা বোর্ডের সহকারি রেজিস্টার। আমি এবং ইডেন কলেজের ছাত্রলীগ নেত্রী ফজিলাতুননেসা এই সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন ও বক্তৃতা করি। এছাড়া এই কমিটির সবই সদস্য ছিল, শেখ কামাল ১ নম্বর সদস্য ছিলেন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন নগর ছাত্রলীগের তখনকার সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্তমান তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক মমতাজ হোসেন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাত্রলীগের এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন, তিনি সেদিন যে ভাষণ দেন তার কথা আমার মনে পড়ে যায়, তিনি বাংলাদেশে মার্কসবাদ এবং পুঁজিবাদ দুটোই অচল বলে মন্তব্য করে বাস্তবধর্মী প্রয়োগবাদী অর্থনীতির সপক্ষে জোরালো বক্তব্য

www.pathagar.com

রাখেন, বক্তৃতায় বহু তাত্ত্বিক অর্থনীতিবিদের নাম উল্লেখ করেন। ঐ ভাষণটিও খুবই উন্নতমানের ছিল তা মনে পড়ে। কাজেই নজরুল ইসলাম যে একজন পড়ালেখা জানা পণ্ডিত, রাজনীতিবিদ ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখন আমি এটা জানতে পেরে তাঁর আরও ভক্ত বা অনুরাগী হয়ে পড়েছি যে তিনিই ছিলেন আইনত মুজিবনগর সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস বা মালিক, অথচ তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, আবদুল মান্নান, ওসমানী কারও কাজে কখনো অযথা হস্তক্ষেপ করেন নি। ব্রিটেনের রাজা রাণীর মতো একেবারে সাচ্চা রাজধর্ম পালন করেছেন। কত বড় উচ্চ মাপের একজন মানুষ হলে এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও অযথা কোনও ক্ষমতা না দেখিয়ে নীরবে-নিভৃতে একজন সম্মানিত রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

মনসুর আলী সাহেব খুবই কৃতী ছাত্র ছিলেন, প্রাইমারি স্কুল থেকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিতে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত সর্বস্তরে স্কলারশিপ নিয়ে পড়ালেখা করেছেন। জীবনে কোনও পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণী পান নি। একথা তো যারা তাঁর মন্ত্রী হিসেবে জীবন বৃত্তান্ত পড়েছেন তারা সবাই জানেন। পাবনা শহরে ৫০ ও ৬০-এর দশকে সবচেয়ে ভালো দুই-তিন জন উকিলের একজন ছিলেন তিনি। যদি কেউ এক নম্বরও বলেন তাহলেও মনে হয় ভুল বলা হবে না। ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে বিজয়ী হলে মনসুর আলী পূর্ব বাংলার সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। সদা হাসি-খুশি, সহজ-সরল আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে হিমালয় তুল্য উচ্চ ও কঠোর মানুষ ছিলেন তিনি। ভীষণভাবে মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। মানুষের প্রতি ছিল তার অসীম দরদ। অবৈধ অস্ত্র, সন্ত্রাস, মাস্তানি দমন করার জন্য তিনি যেভাবে পুলিশকে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তা আমরা যারা তার সামনে বসে থেকে দেখেছি তা আমরাই কেবল বিশ্বাস করতে পারি বা জানি। তিনি মানবতাবাদী ও আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ ছিলেন, সবসময় হাসি-খুশি চোখ-মুখ। বাংলাদেশ হতে ইংরেজি ভাষা উৎখাতের তিনি ছিলেন ভীষণ বিরোধী। কোনও ধরণের ষড়যন্ত্র-ক্লিক করাতে বিশ্বাস করতেন না। যা ভালো মনে করতেন বলে দিতেন এমনভাবে কেউ তাতে মনে কষ্ট পেতেন না, এমন কি স্বয়ং বঙ্গবন্ধুকেও মিষ্টি ভাষায় কড়া কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়তেন না। একজন সাচ্চা দেশ প্রেমিক জাতীয়তাবাদী জাতভদ্রলোক মানুষ ছিলেন এম. মনসুর আলী। আমাদের সিরাজগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে ভালোবাসতেন। মনসুর আলী সাহেবের শ্বশুর ছিলেন ব্রিটিশ আমলে জেলা জজ, এ থেকেই তাঁর পরিবার ও তাঁর সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যাবে।

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাশেরে প্রধান সব খবরের কাগজে .... শেখ ফজলুল হক মনি সাহেব একটি লেখা লেখেন-"দেশবাসীকে এরা কোথায় নিয়ে যেতে চান নামে।" এই লেখায় শেখ ফজলুল হক মনি সাহেব যারা বাংলাদেশে ইংরেজী ভাষা রাখতে চান ও ইংরেজী ভাষার চর্চা করেন তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন এবং তাদের সতর্ক করে দেন।

www.pathagar.com

শেখ ফজলুল হক মনি সাহেবের এই লেখাটি পড়ে বাংলাদেশের তখনকার স্বরাষ্ট্র ও যোগাযোগ মন্ত্রী, মুজিব নগর সরকারের মন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ঘনিষ্ট বন্ধু ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী সাহেব ভীষণ ক্ষিপ্ত হন। তিনি শেখ মনি সাহেবের লেখার সাথে দ্বিমত পোশন করেন এবং বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষা ও ইংরেজী ভাষা বিলুপ্ত হলে এদেশ টিকতে পারেনা বলে মুনসুর আলী সাহেব মন্তব্য করেন। মুনসুর আলী সাহেব শেখ ফজলুল হক মনির এ লেখার বিরুদ্ধে আমাকে একটি লেখা লিখতে বলেন। আমি তা অস্বীকার করি এই বলে যে শেখ মনির বিরুদ্ধে আমি লেখা লিখলে আমাকে গুলি করে মেরে ফেলবে।

তখন মনসুর আলী সাহেব তার হেয়ার রোডের বাসার নিচ তলায় অফিস ঘরের দরজা বন্ধ করে আমাকে কাগজ কলম দিয়ে লিখতে বলেন এই বলে যে "আমি যা বলি তাই তুই লেখ।" আমি তার ডিকটেশনে বাংলাদেশে ইংরেজী ভাষার প্রয়োজনীয়তা নামে একটি লেখা লিখি। লেখাটি তার টাইপ মেশিনে টাইপ করতে চাইলে তিনি তা না করে আমাকে ২০ টাকা দেন টাইপ করার জন্য। আমি পরের দিন ৪/৫ টাকা দিয়ে লেখাটি টাইপ করিয়ে মহাসুখে ২/৩ জন বন্ধু নিয়ে পেট ভড়ে বিরানী খেয়ে মুনসুর সাহেবের কথা মত ইত্তেফাকে যাই "আলোচনা প্রসঙ্গে" পাতায় দেবার জন্য। আমার লেখাটি সাথে সাথে প্রশান্ত দা (প্রশান্ত ঘোষাল) পড়ে ফেলেন এবং আমাকে লেখাটি ফিরিয়ে দিয়ে বলেন- "ভাই আপনি এই লেখা নিয়ে এক মুহূর্ত ইত্তেফাক অফিসে থাকতে পারবেন না, যান, তাড়াতাড়ি চলে যান" আমি মন খারাপ করে আবার বিকালে মুনসুর আলী সাহেবের বাসায় এসে তাকে টাইপ করা লেখা দেখাই এবং ইত্তেফাকের প্রশান্ত ঘোষালের কথা বলি।

ক্যাপ্টেন মুনসুর সাহেব তখন ইত্তেফাকের ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সাহেবকে ফোন করে বলেন "হিরু আমাদের বাবলু ইংরেজী ভাষা নিয়ে একটি লেখা লিখেছে দেখোতো লেখাটি ইত্তেফাকে ছাপা যায় নাকি।"

আমি লেখাটি নিয়ে সাথে সাথে ৯০ নং কাকরাইলে মইনুল হোসেন সাহেবের বাসায় যাই। মইনুল হোসেন সাহেব লেখাটি পড়েন, পড়ে লেখাটির উপরে Print it tomorrow লিখে পিয়ন দিয়ে লেখাটি ইত্তেফাকে পাঠিয়ে দেন। দেখি পবের দিন ইত্তেফাকে আলোচনা প্রসঙ্গো বিভাগে বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা লেখাটি আমার নামে ছাপা হয়েছে। ১৯৭৫ সনের জানুয়ারী মাসে দেশে জরুরী আইন এবং একদল বাকশাল করার তোরজোর শুরু হয়েছে সেই সময়ে দৈনিক ইত্তেফাকে শেখ ফজলুল হক মনির বিরুদ্ধে লেখা এক ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু ক্যাপ্টেন মুনসুর সাহেবের জন্য এটা সম্ভব হয়েছিল।

আসলে আমার নামে লেখাটি যদিও ছাপা হয় কিন্তু এটা ছিল মুনসুর সাহেবের বক্তব্য। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের ১ম বর্ষের অনার্সের ছাত্র। ইংরেজী বিভাগের সমস্ত শিক্ষক ও ছাত্রের কাছে ঐ সময়ে ঐ লেখার জন্য আমি খুবই সম্মানের পাত্র হয়েছিলাম। এর ২/১ দিন পরে মনি সাহেব মুনসুর আলী সাহেবের বাসায়

www.pathagar.com

তার রুমে আসেন, আমাকে দেখে ক্ষিপ্ত চোখে তাকান এবং তার গোফ হাত দিয়ে টানা শুরু করেন।"

আমি মুনসুর সাহেবকে চোখের ইশারায় শেখ মনিকে দেখিয়ে দেই। মুনসুর সাহেব মনি সাহেবকে বেশ কড়া ভাষায় বলেন- "মনি ইত্তেফাকে তোমার লেখার বিরুদ্ধে বাবলু যে লেখা লিখছে তার জন্য যেন ওকে কিছু বলোনা, আমি বলেছিলাম তাই ও ঐ লেখা লিখেছে।"

জবাব শেখ মনি সাহেব কোন কথা না বলে নীচ দিক তাকিয়ে থাকেন।

এই ছিলেন ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী।

আবু হেনা মোহাম্মদ কামরুজ্জামান মুজিবনগর মন্ত্রী সভার অপর এক সদস্য আমাদের প্রিয় হেনা ভাই। ইনিও হাসি-খুশি মিষ্টি স্বভাবের মানুষ। নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন তিনি। ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ এবং ১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত পাকিস্তানের ন্যাশনাল এ্যাসেম্বিলির সদস্য বা এমএনএ ছিলেন। তাঁর বাবা আ. হামিদ সাহেবও ১৯৩৭, ১৯৪৬, ১৯৫৪ সনের বাংলার আইন পরিষদের সদস্য ছিলেন। খুবই সংস্কৃতিমনা মানুষ ছিলেন কামরুজ্জামান। কামরুজ্জামান হেনা ভাই যখন ইংরেজিতে বক্তৃতা করতেন মনে হতো তিনি অক্সফোর্ড থেকে এসেছেন। যখন উর্দুতে বক্তৃতা করতেন মনে হতো লক্ষ্মৌর মানুষ, বাংলায় যখন বক্তৃতা করতেন মনে হতো শান্তি নিকেতনের অধ্যাপক। একথার সত্যতা যারা আওয়ামী লীগের বিরোধী রাজনীতি করতেন তারাও স্বীকার করেছেন। চালচলনে আভিজাত্যের ছাপ রাখতেন। একদিকে ছিলেন আধুনিক, অন্যদিকে ছিলেন আবার রক্ষণশীল, জমিদারদের ভালো গুণগুলোকে তিনি ধারণ করতেন। সপ্তাহে একদিন তার বাড়িতে রাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর হতো ১৫/২০ জন নির্বাচিত শ্রোতাদের নিয়ে। তিনি কবিতা প্রেমিক ছিলেন। বেশ কিছু কবিতা লিখেছিলেন। আমাকে বই বের করার জন্য পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন। আমি নওরোজ কিতাবিস্তানের কাদির খানকে দিই বই প্রকাশ করার জন্য, আবার কি মনে করে তিনি জোর করেই তা ফেরৎ নেন, পরের কথা বলেন। সে পর চির পর হয়ে গেল কয়েক দিনের মধ্যেই। বাঙালি সিএসপি অফিসার এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যারা চাকরি করতেন তাদের অনেকের সাথেই তার সম্পর্ক ছিল খুবই চমৎকার। তিনি বলতেন, "এরা তথ্য দিতেন তার ভিত্তিতে পাকিস্তান ন্যাশনাল এ্যাসেম্বিলিতে পূর্ব পাকিস্তান বা বাঙালির দাবী-দাওয়ার স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতাম।" কামরুজ্জামান সাহেব উচ্চ শিক্ষিত এমএ,বিএল অতি সজ্জন মানুষ ছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশে '৭২-৭৩ সালে সিএসপি অফিসারদের সম্মানের সাথে চাকরিতে বহাল রাখার জন্য কামরুজ্জামান সাহেব এককভাবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, তাঁর বাসভবনে একটি ছবি দেখেছি সত্যজিৎ রায় এবং হেনা ভাই দুজনেই লুঙ্গি পরা সেন্ডো গেঞ্জি গায়ে একজন অপরজনের গলা ধরে রয়েছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কামরুজ্জামান কোন পর্যায়ের লোক ছিলেন। কাজেই মুজিবনগর সরকারের সৈয়দ নজরুল, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এই চারজন সবাই ছিলেন একেক জন

www.pathagar.com

উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বা নক্ষত্র। এঁদের ত্যাগে, এদের পরিশ্রমে, এদের মেধায়, এদের বুদ্ধিতে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সফলভাবে পরিচালিত হয়েছে।

মুজিবনগর সরকারের অধীনেই জিয়াউর রহমান সাহেব, মীর শওকত আলী সাহেব, লে. কর্ণেল কাজী নুরুউজ্জামান সাহেবরা মাসিক ৪০০ টাকা বেতন ও রেশন নিয়ে সেক্টর কমান্ডার হিসেবে চাকুরি করে যুদ্ধ করেছেন। জিয়াউর রহমানের নাম জেনারেল শওকত আলী, কাজী নুরুজ্জামানের নামের সাথে উল্লেখ করার জন্য আমার কিছুটা খারাপ লাগছে এই কারণে যে জিয়াউর রহমান নিজে কোনও দিন স্বাধীনতা ঘোষণা এবং মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব ও মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে কোনও বিরূপ মন্তব্য রেখেছেন বলে আমি জানি না। তাঁর সাথেও আমার খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। প্রেসিডেন্ট হবার পরেও তাঁকে বরং আমি মুজিবনগর সরকারের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল থাকতেই দেখেছি। কিন্তু জিয়া সাহেবের অতি ভক্তদের লাফালাফির জন্য এখানে তাঁর নামটি উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেয়া উচিত। যে কোনও একজনকে নিয়ে বেশি লাফালাফি করলে সামগ্রিকভাবে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, শত্রুরা লাভবান হবে। যারা স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রু ব্যক্তিগত ও চাকুরি জীবনে যারা অসৎ, অবৈধ পথে যারা প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়েছে তারাই মুজিবনগর সরকারের মধ্যে ভেদাভেদ এবং অনৈক্য আবিষ্কার করে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের একজন একজন করে পৃথক হিসেবে দেখিয়ে শেষ করার জন্য সূক্ষ্মভাবে চেষ্টা করবে। একথাটি স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক ও সমর্থকদের ভালোভাবে উপলব্ধি করা দরকার। তা না করলে সমূহ বিপদ হবে।

আজকের কাগজ ১৮/৬/১৯৯২

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সনের নভেম্বর মাসে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের ছাত্র এবং সূর্যসেন হলের ৫৫০ নং কক্ষে থাকি। ভোর রাতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যুদ্ধ বিমান ও হেলিকাপ্টার ওড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং রুমে আমি সহ আরও পাঁচজন সবাই ভয়ে আঁতকে উঠি। ৫৫০ নং সূর্যসেন হলে ঐ দিন আমার সাথে আরও যারা ছিল তারা হলো পুনু, ঝন্টু ল'য়ের ছাত্র, বর্তমানে কানাডা প্রবাসী, নজরুল/কামাল দুই বছর যাবত আমেরিকায়, নজরুল বৈদেশিক কর্মসংস্থান অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক এবং আমি। এদের মধ্যে নজরুল, কামাল ও আমি ১৯৭২ সন থেকে ঢাকা কলেজ সাউথ হোস্টেলের পাশাপাশি রুমে থেকেছি। সূর্যসেন হলের ৫৫০ রুম ছাড়াও সমস্ত সূর্যসেন হলের ছাত্রদের মধ্যে খুবই ভয় ও আতংক দেখা দেয়। কেননা ৫০/৬০/৭০, দশকের সেনাবাহিনীর ক্যু করা মানেই হাজার হাজার লোকের গুলি ও বেয়নেটের আঘাতে মৃত্যু। ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, চিলি ইত্যাদি দেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ।

সকালে খুব ভোরে ৫৫০ সূর্যসেন হলে চলে আসে আকিক চৌধুরী বর্তমানে একটি রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের ডি,জি,এম। আকিক চৌধুরী উৎকণ্ঠার সাথে আমাকে বলে "আমাদের গ্রামের একজন লোক ট্রাফিক পুলিশের চাকুরি করে, গতরাতে সে লালবাগ থানায় শুয়ে ছিল। আমার বাসায় গিয়ে বললো গতরাতে জেলখানায় অনেক গুলির শব্দ শোনা গেছে, অনেক লোক মারা গেছে। লালবাগ থানা জেল খানার পশ্চিমে অনেকটা জেলের দেওয়ালে মধ্যে আমার খুব ভয় হচ্ছে তাজউদ্দিন সাহেবের জন্য, চলো জেলে গিয়ে খোঁজ খবর নেই"। আমি আকিক চৌধুরীর কথা হেসে উড়িয়ে দেই এই বলে যে, আরে তাজউদ্দিন সাহেবকে কে মারবে? এমন সাহস কার? তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে ইন্দিরা গান্ধী, ব্রেজনেভ, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এর অসাধারণ ভালো সম্পর্ক, তাকে কেউ মারতে সাহস পাবে না। জবাবে আকিক চৌধুরী বলে 'তুমি যাই বলো আমার কেন জানি খুব খারাপ লাগছে'। আকিক চৌধুরী তখন ধানমণ্ডির শংকর এলাকার এক বাসায় থাকতো।

সকালেই জানা গেল ১৫ ই আগস্টের বিরুদ্ধে পাল্টা ক্যু হয়েছে। এ সংবাদ ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা খুশী হলো। কিন্তু জাসদ ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধী নেতা-কর্মীরা ও সাধারণ ছাত্ররা ভয় পেয়ে গেল। যাই হোক সকালে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কর্মীরা সেদিন মিছিল নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফুল দিতে যায়। অপরদিকে গুজব সৈয়দ নজরুল প্রেসিডেন্ট ও তাজউদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। আমি ছাত্র লীগ কারলেও এ গুজব আমার বিশ্বাস হয় না। কারণ সৈয়দ নজরুলকে প্রেসিডেন্ট করে তাজউদ্দিন সাহেব কোনও সরকার গড়তে রাজী হবেন না। দ্বিতীয়ত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, তাজউদ্দিন সাহেব জেল থেকে বঙ্গভবনে এলে অবশ্যই আমাকে খবর দিয়ে নিয়ে যাবে। যা হোক আমি ৩রা নভেম্বরের প্রতি কোন ধরনের সমর্থন দেই নাই এবং এর সমর্থকদের থেকে দূরে সরে থেকেছি। অনেকের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে চত্বরে

www.pathagar.com

জোরালো তর্ক করেছি এই বলে যে, না অসম্ভব এর সাথে তাজউদ্দিনের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না, তাজউদ্দিন সাহেবের কোনও সম্পর্ক থাকলে আমি অবশ্যই জানতাম।

৪ঠা নভেম্বর সকাল দশটার দিকে দেখলাম ছাত্র ইউনিয়নের নেতা মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, নূহ আলম লেনিন, ছাত্রলীগ নেতা ইসমত কাদির গামা হরে কৃষ্ণ দেবনাথসহ অনেক নেতা-কর্মী আমাদের সূর্যসেন হলের গেস্ট রুমে ফুলের মালা নিয়ে তৈয়ার হয়ে বসে রয়েছেন তাঁরা বঙ্গভবনে যাবেন তাজউদ্দিন, সৈয়দ নজরুলকে মালা দিতে, সবাই আমাকে তাদের সাথে যোগদান করতে বললেন, কিন্তু আমি যোগ দিলাম না।

রেডিও বন্ধ থাকে, খবরের কাগজেও তেমন কোনও স্পষ্ট সংবাদ ছাপা হয় না, ঢাকা শহরের তথা দেশের মানুষ এক ঘোরের মধ্যে পড়ে যায় ৩রা ৪ঠা নভেম্বর। ৩রা নভেম্বর বিকালে আমি এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আমার বন্ধু গোলাম হোসেন, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিনের বাসায় দেখা করি ১৯নং রোডের ভিতরে তাজউদ্দিন সাহেবের ছোট ভাই মফিজ সাহেবের বাসায়। আমি গোলাম হোসেন এবং সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন বেশ কিছুক্ষণ কথা বললাম। বেগম তাজউদ্দিন যেসব কথা সেদিন বলেছিলেন আজ ২৭/২৮ বছর পরেও আমার তা স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু তিনি সেদিন যা বলেছেন তা লেখার চেয়ে না লেখাই ভালো মনে করে তা লেখা থেকে বিরত রইলাম। ৩রা নভেম্বর সন্ধ্যায় বেগম তাজউদ্দিনের সাথে কথা বলে ধানমণ্ডি থেকে রিক্সাযোগে সেন্ট্রাল রোডে তখনকার কৃষক লীগ নেতা আজকের আওয়ামী লীগ নেতা রহমত আলী সাহেবের বাসায় এলাম। আমাদের জিজ্ঞাসার জবাবে রহমত আলী সাহেব 'দেশে কিছুই হয় নাই খন্দকার মোস্তাক প্রেসিডেন্ট আছেন, সবকিছু ঠিক আছে'। তার কথায় আমি প্রতিবাদ করি। তখন তিনি বঙ্গভবনে আমাদের সামনেই টলিফোন করেন এবং তাঁর বক্তব্যের সত্যতার প্রমাণ দেন। তবুও আমি অবিশ্বাস করি এবং গোলাম হোসেনকে বলি চলেন ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের বাসায় যাই সেখানে সঠিক সংবাদ পাওয়া যাবে। রহমত আলীর বাসা থেকে ৯০ নং কাকরাইলে ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেনের বাসায় যাই। 'মইনুল হোসেন সাহেবও রহমত আলী সাহেবের মতো একই কথা বললেন' দেশে কিছুই হয় নাই মোস্তাক সাহেব এখনও প্রেসিডেন্ট রয়েছেন। সেনাবাহিনীর কিছু সদস্যের পদ নিয়ে সামান্য গোলমাল হয়েছিল তা ঠিক হয়ে যাবে'। বেগম তাজউদ্দিন, ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এবং রহমত আলী এই তিনজনের মধ্যে আমার পরিচিত বেগম জোহরা তাজউদ্দিন ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন আর গোলাম হোসেনের পরিচিত রহমত আলী। আমি প্রথম দেখলাম ও কথা বললাম রহমত আলী সাহেবের সাথে আর গোলাম হোসেন প্রথম কথা বললো সৈয়দ জোহরা তাজউদ্দিন ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের সাথে। রহমত আলী ও ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের সাথে কথা বলে পরিস্কার ধারণা পেলাম তাজউদ্দিন সৈয়দ নজরুল জেলখানা থেকে বঙ্গভবনে আসেন নাই। তারা প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী হন নাই।

www.pathagar.com

কাজেই ৪ঠা নভেম্বর বেলা ১০/১১ টার সময় আমাদের সূর্যসেন হলের গেস্ট রুমে জাতীয় ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা ফুলের মালা নিয়ে বঙ্গভবনে যাবার যে প্রস্তুতি নিয়েছে তা থেকে দূরে থাকলাম। ৪ঠা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় আমি সাধ্য অনুযায়ী প্রতিবাদ করলাম তাজউদ্দিন সৈয়দ নজরুলের নেতৃত্ব কোনও ক্যু হয় নাই বলে। এতে অনেকেই আমার প্রতি ক্ষিপ্ত ও অসন্তুষ্ট হয়। এই প্রতিবাদ করার জন্যই আবার ৫ই নভেম্বর থেকে আমার পরিচিত জনদের মধ্যে আমার পজিশন বেশ ভালো হয়ে গেল এই বলে যে আমি সত্য ঘটনা জানি গুজবে বিশ্বাস করি না। ৪ঠা নভেম্বর দুপুরে ভাত খেয়ে ঘুম থেকে বেলা ৫টার দিকে উঠে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাকিম ভাইয়ের চায়ের দোকানে গিয়ে সবেমাত্র দাঁড়িয়েছি। এমন সময় পাবনা জেলার একজন ছাত্র আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠে "বাবলু ভাই আপনি এখানে কেন, কি সর্বনাশ আপনি জানেন না? আমি বলি না কি হয়েছে? সে তখন বলে আপনার সর্বনাশ হয়েছে তাজউদ্দিন, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামান ও সৈয়দ নজরুল কে খুন করেছে জেলখানায় গতকাল ভোরে আর আপনি এখানে। সবাই শহীদ মিনারে আপনি সেখানে যান। আমি শহীদ মিনারে না গিয়ে তাজউদ্দিন সাহেবের বাসার দিকে রওনা দিলাম। পথে নীলক্ষেতের মোড়ে জাতীয় ছাত্রলীগের মিছিলের সাথে দেখা হয় কিছুক্ষণ মিছিলে অংশ গ্রহণ করে তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় যাই।

তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখি মিসেস তাজউদ্দিন কান্নাকাটি করছেন। ফকির শাহবুদ্দিন, ময়েজ উদ্দিন, মহিউদ্দিন সাহেবসহ অনেকেই রয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ঐ সময়ে ছাত্রলীগের নেতাদের মধ্যে শেখ শহীদুল ইসলাম ছাড়া মনে হয় আমার মতো আর কোনও ছাত্র নেতা কর্মী ছিল না যার এত আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। যার ফলে তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব আমার উপর পড়া শুরু করে দিল। যাক ঐখানে ফকির শাহাবউদ্দিন সাহেব ময়েজউদ্দিন সাহেব মহিউদ্দিন সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন ঢাকা শহরে মাইকিং করতে হবে ৫ই নভেম্বর বুধবার বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণে প্রতিবাদ সভা ও জানাজা হবে জাতীয় নেতাদের। আমার উপর দায়িত্বে দেওয়া হলো কল-রেডিতে গিয়ে মাইক ঠিক করার এবং মাইকিংয়ে যারা ঘোষণা করবে তাদের ঠিক করা।

ঐ সময়ে তাজউদ্দিন সাহেবের দ্বিতীয় মেয়ে সিমিন হোসেন রিমি তখন স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী, আমার দিকে এগিয়ে এসে খুব করুণভাবে আমাকে জিজ্ঞাসা করে "আব্বুর লাশটা কি বাসায় আনা যাবে না? আমরা কি একটু দেখতে পাব না?" ক্লাস সেভেনে পড়া একটি ছোট মেয়ের এই কথা আমার বুকের মধ্যে বন্দুকের গুলির মতো প্রবেশ করলো, আমি প্রায় উম্মাদ হয়ে যাই এই কথা শুনে।

আমি তাজউদ্দিনের বাসা থেকে সোজা একটি রিক্সা নিয়ে জেলখানার উদ্দেশ্যে ছুটে চলি। মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেল পর্যন্ত যাওয়া যায় রিক্সায়। এরপরে হেঁটে জেলের দিকে রওনা দেই, এদিকে রেডিও বলছে কার্ফিউ চলছে ওদিকে ছাত্র নেতারা হরতাল ডেকেছে রাস্তায় লোকজন নাই, ভয়ে আতংকে অস্থির হয়ে পড়ি। এর মধ্যে জেল

www.pathagar.com

এলাকায় বি,ডি,আর সেনাবাহিনীর পাহারা ভয়ে ভয়ে জেলের প্রধান গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম, প্রহরীরা আমাকে থামতে বলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে আমি কে, কোথায় যাচ্ছি, ভয়ে ভয়ে কান্না ভেজা কণ্ঠে মিথ্যা কথা বলি, আমি তাজউদ্দিন সাহেবের আত্মীয়, জেল গেইটে যাচ্ছি জেলখানা থেকে খবর দিয়েছে জেল গেটে যাবার জন্য। এভাবে মিথ্যা বলে জেলগেট যাই- এখন জেলগেট গিয়ে কি বলি, ভয়ে আতংকে কি যে অবস্থা তা ভাষায় প্রকাশ করা মুশকিল। যাক খুব ভয়ে গেটে একজন মেজর সাহেবকে বলি ভাই আমি তাজউদ্দিনের বাসা থেকে এসেছি, উনি আমার আত্মীয়, কি খবর জানার জন্য। মানুষ কথায় বলে যত মুশকিল তত আছান, ভদ্রলোক ভালো ব্যবহার করলেন এবং বলেন "আসলে আমরা ওনাদের আত্মীয়দের খোঁজাখুঁজি করছি কাউকে পাচ্ছি না, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওনাদের লাশ বাসায় আত্মীয়দের দেখার জন্য দেওয়া হবে"। আমি তখন বলি ভাই সবাই এ সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠায় আছে আমি যাই গিয়ে বাসায় খবর দেই। জেল থেকে আবার চলে এসে তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় ময়েজউদ্দিন ফকির সাহাবুদ্দিনকে লাশ বাসায় দিবার সংবাদ জানাই।

কিন্তু এখানে আর আমার পক্ষে থাকা সম্ভব হয় না। নেতারা আমার প্রতি প্রেসার দেয় লক্ষ্মী বাজারে কলরেডিতে গিয়ে মাইকিং করার লোক সংগ্রহ করতে যে আগামীকাল বায়তুল মোকাররমে প্রতিবাদ সভা ও জানাযা নামাজ হবে। রাত প্রায় ৮/৯টার সময় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা শাহজাহান সাহেবকে নিয়ে তাঁর মোটর সাইকেলসহ লক্ষ্মী বাজার কলরেডি মাইকের দয়াল বাবুর সাথে মাইক দেবার জন্য আলোচনা করি এবং বর্তমানে ম্যাডোনা এ্যাড ফার্মের কর্মরত তখনকার নগর ছাত্রলীগের নেতা তোফাজ্জল হোসেনের মাধ্যমে সোহরাওয়ার্দি কলেজের ছাত্রাবাস থেকে বেশ কয়েকজন ছাত্রলীগের কর্মীকে কলরেডিতে এনে মাইকিং করতে ঢাকার রাস্তায় নামার জন্য কথা বলি। এবং সকালে কলরেডিতে যেতে বলি। রাতে শাহজাহান সাহেবও আমি ওয়ারীতে রাত ১২টার দিকে তাঁর এক আত্মীয়দের বাসায় থাকি। সকালে আবার সোহরওয়ার্দী কলেজের ছাত্রাবাস ও কলরেডিতে গিয়ে মাইকিং করার জন্য ছাত্রদের নামাই। প্রায় দশটি মাইক নামানো হয়, কিন্তু খালেদ মোশাররফের সেনাবাহিনী সব ছাত্রদের গ্রেফতার করে, মাইক কেড়ে নেয়। ছাত্ররা মার খায় জেলে যায় কলরেডির মাইক খোয়া যায়। কয়েকদিন পরে এসব ছাত্ররা জামিন পেয়ে সূর্যসেন হলে এসে আমার প্রতি চড়াও হয়, আমি তাদের সামনে চোরের মতো মাথা নিচু করে বসে থাকি এবং মাফ চেয়ে রক্ষা পাই।

৫ তারিখ সকালে কলরেডি থেকে ধানমণ্ডি তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় এসে দেখি কার্ফিউ ও হরতাল উপেক্ষা করে হাজার হাজার লোক তাজউদ্দিনের লাশ দেখার জন্য এসেছে, আসলেই সে এক অভাবিত দৃশ্য। সেনাবাহিনীর কার্ফিউ, জাতীয় ছাত্রলীগের হরতাল, এর মধ্যে জানের মায়া ত্যাগ করে তাজউদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, লাশ দেখতে এত লোক এসেছে তা বলার বাইরে। বায়তুল মোকাররমে জানাযার নামাজের কথা ও প্রতিবাদ সভার কথা না বললে হয়তো আরও অনেক লোক হতো তাজউদ্দিনের

www.pathagar.com

বাসায়। ৫ তারিখ বুধবার ধীরে ধীরে বেলা বাড়ে এর মধ্যে শামসুল হক ও মহিউদ্দিন সাহেব সোহরওয়ার্দি ময়দান এর দক্ষিণে জাতীয় নেতাদের মাজারের পার্শ্বে চার নেতার কবর খোঁড়ার জন্য গেলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ তাজউদ্দিন সাহেবের বন্ধু সাবেক মন্ত্রী শামছুল হক সাহেব এবং মহিউদ্দিন সাহেবকে ধরে নিয়ে রমনা থানায় আটক রাখে। পরে সেখান থেকে ছেড়ে দেয়। আস্তে আস্তে বেলা বাড়ে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় ছাত্রলীগ নেতারা প্রস্তুতি নেয় তাজউদ্দিনের লাশ বায়তুল মোকাররমে নিয়ে যাবে এবং সেখানে জানাযা হবে। কিন্তু পুলিশ বাধা দেয়। একপর্যায়ে পুলিশ বেদম ভাবে লাঠি পেঠা আরম্ভ করে লোক জনকে সরায়ে দিয়ে লাশ পুলিশের ট্রাকে তোলে। কাছেই মনসুর আলী সাহেবের লাশ ছিল সেটাও আনা হয় এবং পুলিশ ট্রাক নিয়ে রওনা হয়। আবাহনীর মাঠ অতিক্রম করে। আমি তখন ঢাকার ডি,আই,জি আমিনুর রহমান সাহেবের কাছে গিয়ে হাত জোড় করে করুন ভাবে অনুরোধ করি, লাশ ফিরিয়ে আনতে এবং তাজউদ্দিনের বাসার সামনে জানাযা করার সুযোগ দিতে। তিনি তখন ফরিদ নামে একজন পুলিশ সার্জেন্টকে লাশ বহনকারী ট্রাক ফিরিয়ে আনতে বলেন। ট্রাক ফিরে আসে লাশ নামানো হয় তাজউদ্দিন সাহেবের বাসার সামনে জানাযা হবে বলে ঘোষণা করেন। জানাযা নামাজ শেষ হলে আমি আমিনুর রহমান ডি,আই,জি সাহেবকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অনুরোধ করি পুলিশের ট্রাকে তাজউদ্দিন সাহেবের আত্মীয় এবং কিছু লোককে বনানী কবরস্থানে লাশের ট্রাকে করে নিয়ে যাবার জন্য। আমার অনুরোধ আমিনুর রহমান সাহেব রাখেন। এবং আমাকে বলেন কে কে যাবেন আপনি দেখিয়ে দিন। আমি তখন তাজউদ্দিন সাহেবের কাজের বিশ্বস্তলোক হাইয়ের বাবাকে বলি বনানী কবরস্থানে তাজউদ্দিনের আত্মীয় ও তাঁর পরিচিত লোকদের পুলিশের ট্রাকে তুলতে। ১৯৭৫ সালে খুব অল্প লোকের গাড়ি ছিল তার উপরে অস্বাভাবিক অবস্থা। আমার বুদ্ধির জন্য এবং ডি,আই,জি আমিনুর সাহেবের করুণার জন্য পুলিশের ট্রাকে চেপে তাজউদ্দিন মুনসুর আলীকে দাফন করার জন্য অনেক লোক বনানী কবরস্থানে যেতে সক্ষম হয়।

বনানী কবরস্থানে গিয়ে দেখি সৈয়দ নজরুল ইসলামের লাশ কবরে নামানো হয়েছে। একজন লুঙ্গি পরা গেঞ্জি গায়ে ঘাড়ে গামছা মাথায় টুপি পরা মৌলভী সাহেব কয়েকজন খালি পায়ে আনসার নিয়ে বনানী কবরস্থানে এগিয়ে আসে তাজউদ্দিন মনসুর আলীর লাশ জানাযা করবে বলে। দৃশ্য দেখে মনে হলো যেন মুনির চৌধুরীর কবর নাটকের বাস্তব অবস্থা। লুঙ্গি পরা গেঞ্জি পরা মাথায় টুপি ঘাড়ে গামছা মৌলভী সাহেব বলেন সৈয়দ নজরুল ও তাজউদ্দিন মনসুর আলীর জানাযা করার জন্য সরকার বা পুলিশ তাকে ঠিক করে রেখেছে। এই মাত্র সৈয়দ নজরুলের জানাযা সে করেছে এখন তাজউদ্দিন মনসুর আলীর জানাযা সে করবে। শুনে দুঃখে আমার বুক হোঁচট খেল। আহারে সৈয়দ নজরুল সাহেবের কবর নাটকের শহীদদের মতো জানাজা হয়েছে। কবরস্থানে আগত সবাই মৌলভী সাহেবকে বললেন আর জানাযা করার দরকার নেই। তাজউদ্দিন সাহেবের লাশ কবরে নামানো হবে এমন সময় বনানী কবরস্থানে গেট থেকে জোরে চিৎকার বাবলু-বাবলু-বাবলু তাকিয়ে দেখি ঢাকা জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি

www.pathagar.com

এম,পি এ হেদায়েত সাহেবের ছোট ভাই ইকবাল আমাকে ডাকছে। আমি তাজউদ্দিন সাহেবের লাশ একটু পরে কবরে নামাবার কথা বলে গেটে গেলে ইকবাল কান্না জড়িত কণ্ঠে বলে 'বাবলু তাজউদ্দিন ভাই মারা গেছে তাঁর লাশ দেখবার জন্য বায়তুল মোকাররমে গিয়ে সেখানে না পেয়ে সেখান থেকে তার ধানমণ্ডির বাসায় গেলাম। ধানমণ্ডির বাসায় থেকে শুনলাম লাশ বনানী কবরস্থানে সেখান থেকে দৌঁড়ে বনানীতে এলাম এত কাছে এসে আর গেটে ঢুকতে পারছি না লাশ দেখতে পারবো না। এর চেয়ে দুঃখ আর কি, এই দুঃখ আর সইতে পারবো না।' গেটে সেনাবাহিনী পাহারা। আমি তখন ডি,আই,জি আমিনুর রহমানকে ইকবালের উক্ত বর্ণনার কথা বললাম, এবং অনুরোধ করলাম একটু তাজউদ্দিনের লাশ ইকবালকে দেখার সুযোগ দিতে। আমিনুর রহমান তখন এসপি মুজিবুর রহমান সাহেবকে (আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান) আমার সাথে গেটে পাঠালেন ইকবালকে আনতে। মুজিবুর রহমান সাহেব গেটে গিয়ে আর্মিদের যেই বলেছেন 'ডি,আই,জি সাহেব বলেছেন ওনাকে ভিতরে যেতে দিতে"। সাথে সাথে আর্মির এক হাবিলদার বলে উঠল "কোন বেটা ডি,আই,জি ধরে নিয়ে আয় তাকে।" এ কথা শুনে এসপি মুজিবুর রহমান সাহেব দৌঁড়। তখন তার বডিগার্ড হাবিলদার বাঁশি বাজিয়ে সব পুলিশদের ডাকে এবং আর্মির ঐ হাবিলদারকে বলে' বেটা ডি,আই,জিকে ধরে আনতে বলো তোমার সাহস কত, ডি,আই,জি মানে বুঝো'। সেখানে আর্মি ছিল জনা বিশেকের মতো আর পুলিশ ছিল প্রায় দেড়শর উপরে। কাজেই আর্মি কয়েকজন ভয় পেয়ে যায়। আমিও মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাই যাতে বেশি গোলমাল না হয়। আর্মিরা তখন ইকবালকে গেট থেকে কবরের কাছে যেতে দেয়। ইকবাল তাজউদ্দিন সাহেবের লাশ দেখে।

তাজউদ্দিনের লাশ কবরে নামানো হয়। তাজউদ্দিনের কপাল কিছুটা ভালো বলতে হবে তার পাঁচ বছরের ছেলে সোহেল (বর্তমান এম,পি) তার মামা কিবরিয়া সাহেবের কথামতো কচি হাতে একমুঠো মাটি প্রথম তাজউদ্দিনের কবরে দেয়, তার পর অন্যরা মাটি দেয়া শুরু করে। তারপর মনসুর আলীর লাশ কবরে নামানো হয়। তাজউদ্দিন মনসুর আলীর লাশ কবরে নামানো ও মাটি চাপা দেওয়ার সময় পুলিশ অফিসার হেলাল সাহেব বলেন বাবলু সাহেব "জীবন্ত ইতিহাসকে জোর করে মাটির নিচে চাপা দেওয়া হচ্ছে"। কথা কয়টি এখনও আমার কানে বাজে।

লেখক : মুক্তিযোদ্ধা ১৯৭২-৭৩ ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ৭৩ সনে ঢাকা নগর ছাত্রলীগের সম্মেলন প্রস্তুতির কমিটির আহ্বায়কসহ ছাত্রলীগের অনেক পদে ছিলেন।

লেখা-২৫/১০/২০০২।

দৈনিক সংবাদ-৩/১১/২০০২, তারিখে প্রকাশিত

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫-দুই

॥ এক ॥

১৯৭৫ সনের নভেম্বর মাসের ১লা তারিখ থেকে ঢাকা স্টেডিয়ামে স্বাধীনতার পর প্রথম আগাখান গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্টে খেলা শুরু হয়। ২রা নভেম্বর রোববার খেলা ছিল থাইল্যান্ডের রাজবীথি ক্লাব বনাম বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ২রা নভেম্বর রোববারের খেলা দেখবার জন্য আমি জেল হত্যাকাণ্ডে নিহত বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম প্রাণ পুরুষ তাজউদ্দিন আহমদের একমাত্র ছেলে- তানজীম আহমদ সোহেল, বর্তমানে এম, পি তাজউদ্দিন আহমদের ৩য় মেয়ে মাহজাবিন মিমিকে সাথে নিয়ে স্টেডিয়ামের ভি,আই,পি তে খেলা দেখি। সোহেলকে খেলা দেখতে নিয়ে যাবার সময় মিমিও খেলা দেখতে স্টেডিয়ামে যেতে চায়, আমি মিমিকে নিতে চাই না তখন মিমি চিৎকার করে কান্নাকাটি শুরু করে খেলা দেখবার জন্য। তখন বেগম জহুরা তাজউদ্দিন আমাকে উচ্চ কণ্ঠে বলেন- "একটি বাচ্চা মেয়ে বাবা জেলে এ ভাবে খেলা দেখবার জন্য কাঁদছে আর তুমি নিতে চাও না"। তখন আমি রাজি হই সোহেল মিমি দুজনকেই ঢাকা স্টেডিয়ামে সাথে নেবার জন্য। ঐ সময় ১৯৭৫ সনে মনে হয় মিমির বয়স ছিল ৭ এবং এম, পি, সোহেল সাহেবের বয়স ছিল ৫।

ঐ সময়ে ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সচিব ছিলেন জনাব কাজী আনিসুর রহমান। কাজী আনিসুর রহমান ঢাকা শহরের একজন শ্রদ্ধেয় ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব, তিনি সংবাদ সম্পাদক জনাব আহমেদুল কবীর প্রখ্যাত ধনী মরহুম জহুরুল ইসলাম ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুম আতাউর রহমান খানের নিকটতম আত্মীয়। বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়নের অবদানের জন্য একমাত্র আন্তর্জাতিক অলিম্পিক খেতাবপ্রাপ্ত ব্যক্তি জনাব কাজী আনিসুর রহমান, এ ছাড়াও তাঁর আরও অনেক সম্মানজনক পরিচয় রয়েছে। আনিসুর রহমান সাহেব ও তখনকার ফুটবল ফেডারেশনের কোষাধ্যক্ষ জোহা ভাই আমাকে সবসময় ফুটবল খেলার ভি,ভি,আই,পি পাশ দিতেন। ঢাকা স্টেডিয়ামের ভি,ভি আইপিতে ১৯৭৫ সনের ২রা নভেম্বর রোববার যখন সোহেল ও মিমিকে নিয়ে প্রবেশ করি তখন কাজী আনিসুর রহমান ও জোহা সাহেব ওদের দেখে খুবই খুশি হন, আমার খুব প্রশংসা করেন ওদের স্টেডিয়ামে নিয়ে আসবার জন্য। আনিস সাহেব সোহেল, মিমি আমাকে কেক, কলা ও কোকোকোলা খাওয়ান এবং ভি,আই,পির সবচেয়ে সামনের সোফাতে বসার ব্যবস্থা করে দেন। কিছুক্ষণের মধ্যে স্টেডিয়ামের ভি,ভি, আই,পি গ্যালারি লোকে ভরে যায়। যেহেতু সেনাবাহিনীর খেলা তাই সেনাবাহিনীর বহু অফিসার ভি,আই,পিতে খেলা দেখতে আসেন। আমার মনে হয় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেদিন সমস্ত মেজর জেনারেল ও বিগ্রেডিয়ার ও কর্ণেল পদবীর অফিসার ভি,আই,আই, পিতে ছিলেন। আরও ছিলেন মোস্তাক ও বঙ্গবন্ধু মন্ত্রী সভার সদস্য প্রফেসর ইউসুফ আলী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহের উদ্দিন ঠাকুরসহ কয়েকজন। তখন ভি,আই,পি আজকের মতো এতবড় ছিল না ছোট ছিল যার জন্য সবার বসতে বেশ অসুবিধা হয়। এর মধ্যেও আমি, সোহেল মিমি একবারের জন্যও সামনের সোফা ছাড়ি নাই, বসে

www.pathagar.com

আছি, খেলা প্রায় শুরু হয় এমন সময় সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান আসেন, কোনও সিট খালি নাই। তখন আমি আমাদের সোফা ছেড়ে জিয়াউর রহমানকে বসতে দেই। জিয়াউর রহমান আমাকে মিমি সোহেলকে পিছনে যেতে নিষেধ করেন এবং তার পায়ের সামনেই বসতে বলেন। এখানে জিয়াউর রহমান তাঁর স্বভাব সুলভ একটি কাজ করেন- তা হলো সেনাবাহিনীর কর্ণেল ব্রিগেডিয়ার পদবীর বেশ কয়েকজন অফিসার সামনে বসে ছিলেন এবং মন্ত্রী ও মেজর জেনারেল পদবীর অফিসার পিছনে বসে ছিলেন। জিয়াউর রহমান সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে ধমক দিলেন 'হোয়াট ইজ দিজ, আপনারা পিছনে বসে আর এরা সামনে আসেন আপনারা সামনে আসেন, এই তোমরা কেন সামনে বসেছো-যাও পিছনে যাও।' তখন দুই একজন মন্ত্রী দালালী করার জন্য বলেন না আমরা এখানেই থাকি তখন জিয়াউর রহমান সাহেব বলেন, 'স্যার প্লিজ ডোনট সে সো'। সামনে যারা বসেছিলেন তাদের জোরে ধমক মারেন পিছনে যাবার জন্য। তখন সামনের কর্নেল মেজর পদমর্যাদার অফিসারগণ পিছনে যায় এবং পিছনের মন্ত্রী ও মেজর জেনারেলগণ সামনে আসেন। জেনারেল জিয়া ছাড়া আরও যেসব মেজর জেনারেল ছিলেন তার মধ্যে বি,ডি, আর এর মেজর জেনারেল দস্তগীর সাহেবের কথা এখনও আমার মনে পড়ছে।

যাক খেলা শুরু হলো থাইল্যান্ডের রাজবিথী ক্লাব প্রথম এক গোল সেনাবাহিনীকে দিলো, সমস্ত স্টেডিয়াম স্তব্ধ, ভি, আই, পির সবাই স্তব্ধ, একমাত্র গোল গোল বলে চিৎকার করে উঠে তাজউদ্দিন সাহেবের একমাত্র পাঁচ বছর বয়সের ছেলে সোহেল, জিয়াউর রহমান সাহেবের পায়ের কাছে বসে থেকে। আমি সোহেলকে ধমক দেই- আর যেন এমন না করে লাল জার্সি গায়ে যারা তারা গোল খেলে যেন চিৎকার না করে, হলুদ জার্সি গায়ে যারা তারা গোল খেলে যেন চিৎকার করে। কিছুক্ষণ পর আবার সেনাবাহিনী ২য় গোল খায় সমস্ত স্টেডিয়াম নীরব, কিন্তু সোহেল আবার গোল গোল বলে চিৎকার করে উঠে। এবার আমি বেশ বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যাই, মিমিকে বলি সোহেলকে নিষেধ করতে ৭ বছরের মিমি ৫ বছরের সোহেলকে নিষেধ করে এবং বলে আবার লালজার্সি গোল খেলে চিৎকার করলে থাপ্পড় দিবো। আর্মি আবার ৩য় গোল খায় সোহেল আবার গোল গোল বলে চিৎকার করে, এবার মিমি সত্যই সোহেলকে থাপ্পড় মারে। সেদিন সেনাবাহিনী ৫ গোল খায় থাইল্যান্ড রাজবিথী ক্লাবের কাছে। বিকাল ৫টায় খেলা শুরু হয়, ৬-৩০ মিঃ এর খেলা শেষ হয়। খেলা শেষ হলে সোহেল মিমি কে নিয়ে বের হই রিক্সার খোঁজে, তোপখানা রোডে এলে সচিবালয়ের উত্তর পার্শ্বে ঈগলু আইসক্রিম দোকানে ওরা আইসক্রিম খেতে চায় আমি সেখানে নিয়ে যাই। আইসক্রিম মেনু দিয়ে বিক্রি হয় জীবনের প্রথম দেখলাম। আমার বয়স তখন ২০ বছর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। মিমি সোহেল আইসক্রিমের দোকানে মেনু দেখে যে আইসক্রিম খেতে চায় তার দুটোর দাম ৯০ টাকা, ৭৫ সনে ১০০ টাকা দিয়ে আমার একমাসের হলের থাকা খাওয়া ও লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ চলে। আমি আইসক্রিমের দাম ৪৫ টাকা দেখে থ হয়ে যাই ওদের বলি আমার পকেটে আছে সর্ব মোট তিন টাকা, এই তিন টাকার মধ্যে ২টা আইসক্রিম পেলে খাও, না পেলে বাড়ি

www.pathagar.com

চলো। অবশেষে দেখা যায় সবার নিচে একটার দাম এক টাকা চার আনার আছে। ওদের এক টাকা চার আনা দামের ২টা আইসক্রিম দিতে বললাম, ওদের আইসক্রিম খাওয়া শেষ হলে আড়াই টাকা বিল পরিশোধ করে, তোপখানা থেকে রিক্সা যোগে ধানমন্ডির ১৯নং রোডে তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় রাত ৮টার দিকে ওদের নামিয়ে দিয়ে ঐ রিক্সা যোগে সূর্যসেন হলে চলে এসে আমার রুমমেট বর্তমানে বৈদেশিক কর্মসংস্থান অফিসের সহকারী পরিচালক নজরুল অথবা বর্তমানে ক্যানাডা প্রবাসী আঃ রশীদ পুনুর কাছ থেকে দশ টাকা নিয়ে রিক্সা ভাড়া সাত টাকা দেই এক টাকা দিয়ে সুর্যসেন হলের ডাইনিং রুমে রাতের খাবার খাই, ২ টাকা অবশিষ্ট থাকে। সূর্যসেন হলে রাতে ভাত খাওয়ার সময় ছাত্রদের মধ্যে কানাঘুষা শুনতে পাই বেঙ্গল রেজিমেন্ট আজ রাতে বের হবে, ট্যাংক রেজিমেন্ট কু করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মেরেছে, বেঙ্গল রেজিমেন্ট তাই পাল্টা কু করবে, আজ রাতে হলে থাকা ঠিক হবে না, ইত্যাদি কথা।

আমি ১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বর সুর্যসেন হলের ৫৫০ নং কক্ষের ছাত্র, ভোর রাতে হেলিকপ্টার ও বিমান বাহিনীর মিগ বিমান উড়ার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আস্তে আস্তে শোনা গেল পাল্টা কু হয়েছে হলের সাধারণ ও আওয়ামী লীগ বিরোধী ছাত্রদের মধ্যে ভয় ও আতংক দেখা দিলো। কেননা ৭০,৬০,৫০ দশকের কু মানেই লক্ষ, লক্ষ লোকের গুলি খেয়ে মৃত্যু বরণ, উদাহরণ ইন্দোনেশিয়ায়, ফিলিপাইনে চিলি ইত্যাদি দেশ। এর মধ্যে ৩রা নভেম্বর সোমবার খুব সকালে হন্তদন্ত হয়ে চলে আসে সূর্যসেন হলের ৫৫০ নং কক্ষে আমার বন্ধু বর্তমানে একটা রাষ্ট্রয়াত্ত ব্যাংকের ডি,জি, এম জনাব আকিকুর রহমান চৌধুরী, ধানমন্ডির শংকর এলাকা থেকে। সে আমাকে বলে 'আমাদের গ্রামের একটি লোক ট্রাফিক পুলিশের কনসটেবলের চাকুরি করে গত রাতে সে লালবাগ থানার ভিতরে শুয়ে ছিল। লালবাগ থানা জেলখানার পশ্চিমের দেয়ালের মধ্যে, জেলখানায় অনেক গুলি হয়েছে, জেলে অনেক লোক মারা গিয়েছে চল জেলখানায় যাই তাজউদ্দিন সাহেবের খোঁজ নিয়ে আসি'। আমি তার কথা হেসে উড়িয়ে দেই তাজউদ্দিনের কি হবে তাকে কে কেন মারবে। তার সাথে ইন্দিরা গান্ধীর, ব্রেজনেভের, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সাথে ভালো সম্পর্ক, তাকে কেউ মারতে সাহস পাবে না। জবাবে আকিক চৌধুরী বলে 'তুমি যাই বলো আমার খুব খারাপ লাগছে কেন জানি'। আমার মাধ্যমে আকিক চৌধুরীর তাজউদ্দিন সাহেবের পরিচয় হয় এবং দুজনের খুব ভালো সম্পর্ক হয়, আকিক চৌধুরী ১৯৭৫ সনের এম, এ, ইংরেজির ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৪ঠা নভেম্বর বিকাল ৫টায় তাজউদ্দিন আহমেদ, নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান মুনসুর আলীর মৃত্যু সংবাদ শুনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাকিম চত্বরে।

॥ দুই ॥

১৯৭৫ সনের ৮ই নভেম্বর শনিবার রাতে আমার ডাইরিতে আমি লিখে রেখেছি ১৫ই আগস্ট সামরিক বাহিনীর কয়েকজন মেজরের নেতৃত্বে মেজর ডালিম, ফারুক, রশিদ, শাহরিয়ার, নুর একটি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সবাইকে হত্যা করে এবং খন্দকার মোস্তাক

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট হন। মোস্তাক সাহেব প্রেসিডেন্ট হয়ে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র এবং ১৯৭৭ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচন দেবার কথা ঘোষণা করেন। জনাব তাজউদ্দিন মুনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল, কামরুজ্জামান গ্রেপ্তার হন।

দেশে যখন গণতন্ত্রের আশায় মানুষ বসে আছে, নির্বাচনের দিন গুনছে, সেই সময়ে ৩রা নভেম্বর সকালে বিমানের গর্জনে ঘুম ভাঙে, বাংলাদেশ বেতার নীরব থাকে, পরে জানা যায় খালেদ মোশাররফ, শাফায়েত জামিল অভ্যুত্থান করে ক্ষমতা নেয়। এই ক্যুর খবর পেয়ে আগের ক্যুয়ের নায়করা প্রেসিডেন্ট মোস্তাকের নির্দেশে জেলে গিয়ে তিন তারিখ সোমবার ভোর রাতে অমানুষিকভাবে তাজউদ্দিন, নজরুল ইসলাম, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামান কে বর্বর ভাবে হত্যা করে এবং একইদিন সোমবার সন্ধ্যায় বিমান যোগে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংকক এ পৌঁছায়।

মঙ্গলবার দুপুরের পরে জানা যায় এই বর্বর হত্যাকাণ্ডের কথা। আমি খবর শুনে তাজউদ্দিন সাহেবের বাসায় চলে যাই শেষ বিকেলে। সেখানে গিয়ে অনেককে দেখতে পাই। তারপর সেখান থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা শাহজাহান কে নিয়ে রাতে মাইক ঠিক করতে লক্ষীবাজারে কল-রেডিতে যাই। এর আগে জেল গেটে যাই। সেখান থেকে শাহজাহান ও আমি রাত ১২টার দিকে তাজউদ্দিনের বাসায় যাই। সেখান থেকে আমি ও শাহজাহান ভাই সূর্যসেন হলের ক্যাফেটিরিয়াতে ভাত খেয়ে রাত কাটাই শাহজাহানের আত্মীয়ের ওয়ারির এক বাসায়। সেখান থেকে সকালে আমি একা সারওয়ার্দী কলেজের ছাত্রাবাস থেকে মাইকিং করার জন্য ছাত্রদের নিয়ে কলরেডিতে যাই এবং মাইকিং করার জন্য পাঠাই দুপুরে বাইতুল মোকাররমে প্রতিবাদ সভা ও জানাযা হবে বলে। আগের দিন রাতে তাজউদ্দিনের বাসায় ফকির সাহাবুদ্দিন ময়েজউদ্দিন সাহেব ও মহিউদ্দিন আহমেদ আমাকে মাইকিং করার জন্য লোক জোগাড় করতে ও কলরেডির মাইক নিতে বলেন। কলরেডি থেকে সকালে একটি মাইক নিয়ে তাজউদ্দিনের বাসায় চলে আসি। সেখানে হাজার হাজার লোক তাজউদ্দিনকে লাইন ধরে দেখছে।

আস্তে আস্তে বেলা বাড়ে দুপুর শুরু হতে তাজউদ্দিনের লাশ নিয়ে শুরু হয় খেলা।

উপরে পর্যন্ত লেখা রয়েছে আমার ডাইরিতে এর চেয়ে বেশি লেখা হয় নাই। ডাইরির এই লেখা উল্লেখ করলাম যার জন্য তাহলো যারা বলেন জিয়াউর রহমান সাহেব বাংলাদেশ বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন সাধারণ নির্বাচন দিয়েছেন তারা সম্পূর্ণ সত্য বলেন না, অর্ধেক সত্য বলেন। বঙ্গবন্ধু কে হত্যা করার পরে মোস্তাক বহু দলীয় গণতন্ত্র ও সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা প্রদান করেন। ১৯৭৫ সনের শবে বরাতের রাতে খোন্দকার মোস্তাক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বলেন "১৯৭৬ সনের ১লা আগস্ট থেকে ঘরোয়া রাজনীতি চালু হবে এবং ১৯৭৭ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনে অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক দল গঠন করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।" কিন্তু ১৯৭৫ সনের ৭ই নভেম্বর মোস্তাকের পতন হয় প্রেসিডেন্ট হন আবু সাদাত মো. সায়েম, সাথে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। ১৯৭৭ সনে সাদাত সাহেব কে সরিয়ে প্রেসিডেন্ট হন জিয়াউর রহমান সাহেব। ১৯৭৮ সন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়।

www.pathagar.com

১৯৭৮ সনের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়াউর রহমান সাহেব প্রার্থী হন, সেনা বাহিনীর চাকুরিতে থাকা অবস্থায় সেনাবাহিনীর ড্রেস পরে। কাজেই জিয়াউর রহমান সাহেব বাংলাদেশ গণতন্ত্র পুণঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এটা পূর্ণ সত্য নয়। পূর্ণ সত্য খন্দকার মোস্তাকই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি দেন। আমার উল্লেখিত ডাইরির ১৯৭৫ সনের ৮ই নভেম্বর এর লেখাটুকু সেজন্য উল্লেখ করলাম। ঐ ডাইরিতে না লিখে রাখলে আমিও বিশ্বাস করতাম জিয়াউর রহমানই বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্গবন্ধু হত্যার পর।

॥ তিন ॥

১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বর ভোরে নিহত চারজনের অন্যতম একজন জনাব এ, এইচ,এম, কামরুজ্জামান। তিনিও স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নেতা। স্বাধীনতার পর মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। আমার সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। আমাকে বেশ স্নেহ করতেন। ১৯৭৪ সনে তিনি ধানমন্ডির ৩নং রোডে থাকতেন জেলে যাবার আগে পর্যন্ত। আমি থাকতাম ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত ঢাকা কলেজের সাউথ হোস্টেলের ৩২২ নং কক্ষে। ৩০ নং মিরপুর রোড ছিল ছাত্রলীগের অফিস, ৩নং ধানমন্ডি, ছাত্রলীগ অফিস, ঢাকা কলেজ খুব কাছাকাছি। কামরুজ্জামান সাহেব বেশ মজলিশী লোক ছিলেন আলাপ আলোচনা প্রিয় মানুষ, দুই চারটি কবিতাও লিখতেন সংস্কৃতিমনা মানুষ। ঢাকায় থাকলে প্রতিদিন ফুটবল খেলা দেখতেন। যে ফুটবল খেলায় দশজন দর্শক ও হয় না সে খেলাও তিনি দেখতে যেতেন। আমি প্রায় প্রতিদিনই তার সাথে স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে যেতাম। ৫টা বাজার দুই মিনিট আগে স্টেডিয়ামে পৌঁছাতেন, পাকা হিসেবে। রাতে তার বাসায় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী কথাবার্তা বলতে যেতেন। একদিন তার বাসায় আমরা ছাত্রলীগের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী উপস্থিত আছি জনাব মনিরুল হক চৌধুরী ছাত্রলীগের সভাপতিসহ। ঐদিন জনাব কামরুজ্জামান সাহেব বললেন চা দিতে অসুবিধা হবে, যে ছেলেটি চা দিতো সে বাসায় চুরি করেছে সেজন্য তাকে ধানমন্ডি থানায় পুলিশের হেফাজতে দেয়া হয়েছে। সাধারণতঃ সবসময় মন্ত্রী সাহেবদের সামনে বা আশেপাশে যেসব লোক থাকে তারা মন্ত্রী সাহেবরা যা বলেন তাই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন দেন। ছাত্র লীগের নেতা কর্মীরাও সেদিন রাতে কামরুজ্জামান সাহেবের খুব প্রশংসা করলেন, বাসার কাজের লোক বিশ্বাস ভঙ্গ করে চুরি করেছে, পুলিশে দিয়ে খুব ভালো করেছেন বলে সবাই বললো। আমি একমাত্র লোক যে তীব্র ভাষায় এর প্রতিবাদ করি এবং বলি আপনি একটা মারাত্মক ভুল বা অন্যায় করেছেন, কোনোক্রমেই ঐ ছেলেটিকে থানায় দিয়ে আপনি ঠিক কাজ করেন নাই। উপস্থিত সবাই আমার বিরুদ্ধে বললো, কামরুজ্জামান সাহেব চুপ থাকেন, কিছু বলেন না। পরের দিন সকালে দেখি ঢাকা কলেজ সাউথ হোস্টেলে কামরুজ্জামান সাহেব একজন লোক পাঠিয়েছেন সিভিল ড্রেসে

www.pathagar.com

বাসার এক কনস্টেবল। সে আমাকে বললো কামরুজ্জামান স্যার আপনাকে এখনই ডেকেছেন। সাথে সাথে আমি তার সাথে ৩নং রোডের বাসায় গেলে কামরুজ্জামান সাহেব বলেন 'গতরাতে তোর কথা শুনে আমি সারারাত একটুকু ঘুমাতে পারি নাই' সারা রাত ছটফট করেছি। ফোন করে ছেলেটিকে থানা থেকে ছাড়িয়ে এনেছি। ওকে বাসায় আবার রাখতে চাই কিন্তু থাকতে রাজি হয় নাই। তাই গ্রামের বাড়িতে সকালে চলে গিয়েছে। তুই আমার একটা বড় ভুল ধরে দিয়েছিস, তোর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, আমার সাথে আজ নাস্তা খেয়ে যাবি'। কামরুজ্জামান সাহেবের এই ব্যবহারের মাধ্যমে প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি কত সংবেদনশীল ও উচ্চস্তরের মানুষ ছিলেন। ৩রা নভেম্বর তাঁকেও হত্যা করা হয়েছে এই দিনে তাঁকে সহ নিহতদের স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই।

২৪/১০/২০০২

www.pathagar.com

১৯৯৫ সন : আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কয়েকটি কথা

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের বিরোধী-দলের সদস্যদের গত ২৮শে ডিসেম্বর সংসদ সদস্য থেকে পদত্যাগ করার ফলে বর্তমান জাতীয় সংসদ বৈধতা হারিয়ে ফেলে। প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়া যতই জোর কণ্ঠে জনসভায় এবং রেডিও-টিভিতে ঘোষণা করুন যে, তারা বানের পানিতে ভেসে আসেন নি, সংসদে তাদের ১৬৬ জনের বেশি সদস্য রয়েছেন-৩৩০ জনের মধ্যে, কাজেই সংসদের বৈধতা হারিয়ে যায় নি। কিন্তু গণতান্ত্রিক সরকারে প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়ার স্মরণ রাখা উচিত গত ১৯৯১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে বিএনপি ১৪০টি আসন লাভ করে, বাকী ১৬০টি আসনের এমপিগণ পেয়েছেন শতকরা ৬৯ ভাগ ভোট। বিএনপি ১৪০টি আসন নিয়ে পেয়েছে শতকরা ৩১ ভাগ ভোট কিন্তু জামাতে ইসলামির ১৮ জন সংসদ সদস্যর সমর্থনের জোরে বিএনপি অতিরিক্ত আরও ২৮টি মহিলা সংসদ সদস্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়, যার জন্য বিএনপি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে দেশ চালাবার সুযোগ পায়। জামাতে ইসলামির বিএনপি'র ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার ফলে বিএনপি'র ২৮ জন মহিলা সদস্যর সংসদ সদস্যা হিসেবে বহাল থাকা কতটুকু নৈতিকতা সম্পন্ন-তা ভেবে দেখবার বিষয়। মোট কথা জামাতে ইসলামির সংসদ সদস্যদের বিএনপি'র প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার পরে বিএনপি'র ক্ষমতায় থাকা অনৈতিক কাজ, কেননা বিএনপি এবং মিসেস খালেদা জিয়া ক্ষমতায় গিয়ে যা কিছু কাজ করেছে তার মূলে রয়েছে জামাত। জামাতের সমর্থন ছাড়া বিএনপি বা মিসেস জিয়া কোনোক্রমেই ক্ষমতার মসনদে বসতে পারত না। কাজেই জামাতের সমর্থন বিএনপি থেকে প্রত্যাহারের পরেও বিএনপির ক্ষমতায় থাকা চূড়ান্ত অনৈতিক কাজ। অনৈতিক নৈতিক আজকের বাংলাদেশ বিরাজিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা মনে হয় অবান্তর, কেননা আজকের বাংলাদেশের রাজনীতির নৈতিক ভিত্তি খুবই দুর্বল। ব্যক্তি স্বার্থ, চাটুকারিতা হচ্ছে আজকের বাংলাদেশের রাজনীতির সফলতার অন্যতম ভিত্তি। যদিও রাজনীতি শাস্ত্রের জন্মদাতা দার্শনিক সক্রেটিস বলে গিয়েছিলেন "রাজনীতি হচ্ছে সমস্ত নীতির মধ্য শ্রেষ্ঠনীতি। রাজনীতির চর্চা করবে রাষ্ট্রের বা সমাজের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষেরা। যারা রাজনীতির চর্চা করবে তাদের সত্যবাদী, শিক্ষিত, জ্ঞানী, দয়ালু, পরোপকারী, ভদ্র, ত্যাগী, বিনয়ী ও সাহসী মানুষ হতে হবে (দ্রষ্টব্য প্লেটোর রিপাবলিক)।" কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা দার্শনিক সক্রেটিসের শিক্ষার সম্পূর্ণ উল্টা। বিপরীত চরিত্রের মানুষদের রাজনীতি চর্চা করতে এবং রাজনীতি তাদের দখল বা নিয়ন্ত্রণে দেখতে পাচ্ছি। ফলাফল যা হবার তাই হচ্ছে- দেশে প্রাচুর্য আছে- কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে, কিন্তু দেশের শতকরা প্রায় ৯০% ভাগ মানুষের জীবন আজ অনাচার-অবিচারে জর্জরিত ও দুঃখে-কষ্টে অতিষ্ঠ।

www.pathagar.com

যাক এ প্রসঙ্গ, আলোচনা শুরু করেছিলাম বর্তমান বিরাজিত বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট নিয়ে। জাতীয় সংসদের ১৫২ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করার পরে কিভাবে বর্তমান জাতীয় সংসদের লিগ্যাল বা আইনগত বৈধতা থাকে তা নিয়ে যেকোনও সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়া যতই উচ্চকণ্ঠে বলুন না কেন তিনি বানের পানিতে ভেসে আসেন নি, তিনি আগেও জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ছিলেন, আজও আছেন, এটা অন্তঃসারশূন্য কথা– একথার পিছনে তার কোনও যুক্তি নেই। তিনি বানের জলে ভেসে প্রধানমন্ত্রী হন নি ঠিকই; কিন্তু তিনি জামাতে ইসলামের দয়ার দানে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। যদি মিসেস জিয়ার আত্মমর্যাদা বোধ থাকত তবে যেদিন জামাত তার উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছেন সেদিনই তার এবং তাঁর মন্ত্রীসভার সদস্যদের পদত্যাগ করা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয় নি, যা হবার নয় তাই হয়েছে। বিএনপি'র ২৮ জন মহিলা সদস্যদের সংসদ সদস্য হিসেবে থাকাও অবৈধ হয়ে গিয়েছে জামাতের সমর্থন প্রত্যাহার করার সাথে। মিসেস জিয়ার সরকার বিরোধীদলের ১৫২ জন সংসদ সদস্য পদত্যাগ করেছেন একটি যুক্তিসঙ্গত ন্যায়নীতিভিত্তিক দাবি বা আইন প্রণয়নের জন্য। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ৬০ বা ৯০ দিন আগে দলীয় সরকার যারা ক্ষমতায় থাকবেন তারা পদত্যাগ করবেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কয়েকজন নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির সমর্থনে ৯০ বা ৬০ দিনের জন্য একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন, যারা কোন ধরণের দলীয় আনুগত্য বা বিরোধ থেকে দূরে থেকে ঐ সময়ের জন্য দেশ চালাবেন এবং একটি সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবেন এবং নির্বাচনে বিজয়ী দলের নিকট নির্বাহী ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন। কোনও সুস্থ চিন্তাভাবনায় বিশ্বাসী ব্যক্তি এই দাবির বিরোধী হতে পারে না। যারা অসুস্থ বা অনৈতিক চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী তারাই এ দাবির বিরোধিতা করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস। যারা মনে করেন বাংলাদেশ আমার নিজস্ব সম্পত্তি, এদেশের সব মানুষ আমার ক্রয় করা ক্রীতদাস-দাসী তারাই একমাত্র নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সাধারণ নির্বাচনের বিরোধিতা করেন বলে আমার ধারণা হয়। বিএনপি'র নেতা-কর্মী ও প্রধানমন্ত্রী মিসেস জিয়া গত এক বছরের দাবির বিরুদ্ধে অনেক বাক্য প্রয়োগ করেছেন, বহু কথা বলেছেন, কিন্তু জনতার দাবির কাছে বা শুভবুদ্ধির কাছে বিএনপি পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। গত ২৮শে ডিসেম্বর বিরোধী সংসদ সদস্যদের পদত্যাগের সময় বিএনপি'র কয়েকজন মন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন নির্বাচনের এক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন তার মন্ত্রী পরিষদসহ। প্রধানমন্ত্রী নিজেও কয়েকবার প্রকাশ্যে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছেন (গত ২৮শে ডিসেম্বরের পরে) তিনি নির্বাচনের আগে পদত্যাগ করবেন।

বিরোধীদলের উচিত কমপক্ষে নির্বাচনের ৯০ দিন আগে ক্ষমতাসীন সরকার পদত্যাগ করবেন এ দাবিতে অটল থাকা, নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা এই ৯০ দিনের জন্য ক্ষমতায় গিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন করবেন, তার ব্যবস্থা করা।

www.pathagar.com

নির্বাচনে কোনও ব্যক্তি বা দল সরকারি টেলিফোন, গাড়ি, অফিস, বাড়ি, ব্যবহার করতে পারবে না। সরকারি রেডিও টেলিভিশনে, সংবাদপত্রে কোনও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দল বা ব্যক্তির পক্ষে-বিপক্ষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংবাদ বা বক্তব্য পরিবেশন বা ছাপতে পারবে না। ঐ ৯০ দিন সরকারি সংবাদপত্রে এবং রেডিও টেলিভিশন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী কোনো দলের কোনও ধরণের কথা প্রচার করা যাবে না। এই ৯০ দিন শুধুমাত্র নির্বাচন সংক্রান্ত সরকারের বক্তব্য বা প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে। কোনও পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি (যেমন বেসরকারি ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠান) থেকে কোনও অর্থ-গাড়ি-বাড়ি, অফিস নিয়ে কোনও দল বা ব্যক্তি, যারা নির্বাচনে অংশ নেবে তাদের পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করা যাবে না। পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে চাকরিরত কোনও ব্যক্তি (ড্রাইভার বা অফিসার) ডাইরেক্টর কোনও প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে নির্বাচনে কাজ করতে পারবে না। প্রজাতন্ত্রের কোনো সরকারি কর্মচারী কোনো প্রার্থী বা দলের পক্ষে বিপক্ষে নির্বাচনে সামান্য পক্ষপাতিত্ব দেখালে তাকে সাথে সাথে চাকরিচ্যুত এবং কঠোর দণ্ড দিতে হবে। নির্বাচনের দিন কোনো ভোটকেন্দ্রে কোনো গোলযোগ হলে তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হবে কর্তব্যরত কর্মচারীরা। নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে অস্ত্রধারীদের সাধারণ জনগণ দেখতে পায়; কিন্তু কর্তব্যরত আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সদস্যরা দেখতে পায় না কেন? কোনও ভোটকেন্দ্রে গোলমাল হলে তার দায়-দায়িত্ব কর্তব্যরত সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের।

নির্বাচনের আগে গ্রামের নিরীহ মানুষকে হুমকি দেবে-ভোটকেন্দ্রে গেলে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেবে, ভারতে পাঠিয়ে দেবে, বৌ ধরে নেবে, যুবতী-কিশোরী মেয়ে ধরে নিয়ে যাবে। এরকম হুমকি দিলে যে এলাকায় দেবে সে এলাকার টিএনও, ওসি, ডিসি, এসপি সবার চাকরি যাবে, তাদের জেলে দিতে হবে- কেন এলাকায় এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তার বিরুদ্ধে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে। তাহলে এধরণের কোনো হুমকি কেউ দিতে সাহস পাবে না। প্রশাসনিক দুর্বলতা, প্রশাসন দলীয়করণের এই পরিণতি রোধ করার জন্যই এধরণের কঠোর ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

দৈনিক সংবাদে মঙ্গলবার ২৫শে মাঘ ১৪০১ (১৯৯৫) তারিখে প্রকাশিত

বিঃ দ্রঃ- ১৯৯৫ সনে দৈনিক সংবাদে এ লেখাটা ছাপা হয়, আর সংবিধানের ১৩তম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯৬ সনে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যার সাথে এই লেখার অনেক মিল রয়েছে।

www.pathagar.com

চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র

চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র লেখাটির উপরে দৈনিক ইত্তেফাকের জনাব রাহাত খান, জিয়াউল হক, সৈয়দ তোশাররফ আলী, সৌরভ জাহাঙ্গীর, দৈনিক নিউ নেশনের সম্পাদক জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন এর মন্তব্য ও আমার কথা :-

আজ ১১-০৯-২০০২ তারিখ (বুধবার) থেকে প্রায় একমাস আগে উপরের শিরোনামে লেখাটি লিখে টাইপ করে দৈনিক ইত্তেফাকের ৫ এর পাতায় মতামত বিভাগে ছাপানোর জন্য ইত্তেফাকে কবি সৌরভ জাহাঙ্গীর এর নিকট জমা দেই। লেখাটি যখন জমা দেই মি. সৌরভ আমার সামনেই লেখাটি পড়ে শেষ করেন এবং আমাকে বলেন "ভালো লেখা চার পাঁচ দিনের মধ্যেই ছাপা হবে"। কিন্তু চার পাঁচ দিন চলে যাবার পরও যখন লেখাটি ছাপা হতে দেখলাম না তখন ইত্তেফাকে গিয়ে ইত্তফাকের সহকারী সম্পাদক ও সাপ্তাহিক রোববারের সম্পাদক সৈয়দ তোশাররফ আলী সাহেবের মাধ্যমে লেখাটির খোঁজ নেই। তোশারফ সাহেব মি. সৌরভকে রুমে ডেকে এনে লেখাটির বিষয় খোঁজ নিলে মি. সৌরভ বলেন "লেখাটি ছাপার জন্য আমি জিয়া ভাইকে দিয়েছিলাম তিনি লেখকের নাম দেখে লেখাটি না পড়েই আমার কাছে আবার ফিরিয়ে দেন"। তখন তোশারফ সাহেব সৌরভ এর হাত থেকে লেখাটি নিয়ে লেখাটি সাথে সাথে পড়ে বলেন "বেশ ভালো লেখা এই লেখা ছাপা না হবার তো কোনও কারণ নেই, অবশ্যই ছাপা হবে"। তিনি লেখাটি রেখে দেন। বেশ কয়েকদিন চলে যায় কিন্তু লেখা আর ইত্তেফাকে ছাপা হয় না। আমি লেখার ব্যাপারে আজ যদি টেলিফোন করি তো আগামীকাল ইত্তেফাকে গিয়ে হাজির হয়ে লেখাটি ছাপানোর জন্য মি. সৌরভ, তোশারফ সাহেব এবং জিয়াউল হক সাহেবকে যথেষ্ট তোয়াজ তোষণ এবং অনুরোধ করি, কিন্তু কোনও কাজ হয় না। এইভাবে ইত্তেফাকে লেখাটি ছাপার জন্য আমার বাসা থেকে ইত্তেফাকে যাতায়াত বাবদ প্রতিদিন ১০০ টাকা এবং দুপুরের খাওয়া বাবদ ৫০ টাকা করে (প্রতিদিন ১৫০ টাকা করে প্রায় ২০ দিন) ৩০০০ (তিন হাজার) টাকা খরচ হয়।

অবশেষে ১১-০৯-২০০২ তারিখ (বুধবার) অনেকটা মন খারাপ করেই ইত্তেফাকে যাই এই মনে করে আজ যদি লেখা ছাপার ব্যাপারে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না পাই তবে লেখাটি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। বেলা দেড়টার দিকে তোশারফ সাহেবের রুমে উপস্থিত হই। বেলা দুইটার সময় ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক জনাব জিয়াউল হক সাহেবের ফোন আসে তোশারফ সাহেবের কাছে - তোশারফ সাহেব ফোনে বললেন, "জিঃ জিয়া ভাই, জিঃ জিয়া ভাই, জিঃ জিয়া ভাই"। ফোন ছেড়ে তোশারফ সাহেব আমাকে বললেন, "বাবলু তোমার লেখা জিয়া সাহেব ছাপতে রাজী নন, লেখার মান খারাপ"। আমি বললাম - এর আগেতো আপনি কয়েকবার জিয়া সাহেবকে বলেছেন - লেখাটি আমি পড়েছি, লেখাটি ভালো বাবলুর লেখাটি ছাপেন"। আর আজ বলছেন অন্য কথা - লেখাটিতে আপনি লিখিত মতামত দিন ছাপার জন্য। তখন তোশারফ সাহেব বললেন - "আমি যদি তা দেই তখন লেখাটি নিয়ে গিয়ে অন্য আরেক জায়গায় গিয়ে দেখিয়ে

www.pathagar.com

বলবেন- "তোশারফ সাহেব একটি বাজে লেখা ছাপার জন্য চাপ দিচ্ছেন। ফলে আবার এক নতুন ভেজাল সৃষ্টি হবে। কাজেই ইত্তেফাকে লেখা ছাপার কথা বাদ দাও"। অগত্যা আর কি করা, তাই মেনে নিলাম। এর মধ্যে জিয়াউল হক সাহেব পিয়ন দিয়ে লেখাটি তোশারফ সাহেবের কাছে ফেরত পাঠান। ফেরত দেওয়া লেখাটি নিয়ে তোশারফ সাহেবের রুম থেকে বের হবার আগে তার রুমে একজন তরুণ এডভোকেট আশরাফ খান এর সাথে পরিচয় হয়। তিনি বলেন "আমি একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ। আমি বিভিন্ন দেশের সংবিধানের উপরে বিরাট বড় একটি বই লিখে প্রকাশ করেছি।" আমি তখন তাঁকে অনুরোধ করলাম এই বলে যে - ভাই দয়া করে আমার এই লেখাটি পড়ে দেখে যদি কোনও ভুল ধরে দেন তবে আমি খুব খুশি হবো। তিনি আমার উল্লেখিত লেখাটি পড়ে দেখে বললেন - "সম্পূর্ণ ঠিক লিখেছেন, আপনার এই লেখায় কোনও ভুল নাই"।

বেলা প্রায় পাঁচটার সময় তোশারফ সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান সাহেবের কক্ষে গিয়ে সালাম দিয়ে বসে তাঁকে আমার লেখাটি একটু পড়ে দেখতে অনুরোধ করলাম। রাহাত খান সাহেব লেখাটি পড়ে আমার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন এই বলে যে- তুমি কিচ্ছু জানো না, সম্পূর্ণ ভুল লিখেছো। পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গর্ভমেন্টে প্রেসিডেন্ট নো বডি, তুমি যা লিখেছো তা কোনও দিন ঠিক হতে পারে না।" সেখানে জনাব মোরসালিন সাহেব বসে ছিলেন, তিনিও জনাব রাহাত খান সাহেবকে সমর্থন করলেন এবং আমাকে মৃদু তিরস্কার করলেন। আমি রাহাত খান সাহেবকে খুবই বিনীতভাবে বললাম যদি ভারতের সংবিধান একটু পড়ে দেখতেন তাহলে দেখতেন আমি ঠিক না বেঠিক। আমার কথা শুনে রাহাত খান সাহেব খুব ক্ষেপে উঠে বললেন- "অন্যকে পড়ার জন্য বলার আগে নিজে খুব ভালো করে পড়বে।" আমি আর তাঁকে বলতে সাহস পেলাম না যে - আমি ভারত ও বাংলাদেশের সংবিধান একবার নয় অনেকবার পড়েছি।

রাহাত খান সাহেবের রুম থেকে বেরিয়ে জনাব জিয়াউল হক সাহেবের রুমের সামনে দাঁড়াই - তিনি আমাকে দেখে ডাক দিয়ে তার রুমে বসতে বলে বললেন - "তোমার লেখাটি আমার কাছে আছে আমি এখনও পড়ে দেখি নাই, পড়ে দেখবো যদি ভালো হয় তাহলে ছাপবো।" আমি বললাম না আমার লেখাটি আপনার কাছে নাই, আমার পকেট থেকে লেখাটি বের করে তাকে দেখিয়ে বললাম লেখাটি এই যে- আমার কাছে। আপনি লেখাটি পড়েছেন এবং লেখাটি আপনি ছাপবেন না বলে জানিয়ে তোশারফ সাহেব এর কাছে ঘন্টা দু'এক আগে ফেরত দিয়েছেন। তিনি একটু চুপ থেকে বললেন "ও হ্যাঁ তোমার লেখা ছাপা হবে না। গুণগতমান খারাপ, এইসব তোমাকে কে লিখতে বলেছে যা ইচ্ছে তাই। এসব বিষয়ে লিখবে কোনও ব্যারিস্টার, মন্ত্রী মিনিস্টার বা কোনও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। তুমি লিখবার কে?" বেশ উত্তেজিতভাবে কথাগুলো বললেন মান্যবর জিয়াউল হক। আমি বললাম দেখুন আমি এসব নিয়ে পড়াশুনা করি এবং এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করি তাই লিখেছি। আপনি যে ভাষায় আমার সাথে কথা বলছেন আমার সাথে এ ভাষায় কিন্তু ড. কামাল হোসেন সাহেব, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম সাহেব, সাবেক প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. এমাজ উদ্দিন ও ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান সাহেব কথা বলবেন না। ওনারা সবাই

www.pathagar.com

আমাকে ভালোভাবে জানেন ও চেনেন। তখন তিনি বললেন- ঠিক আছে তুমি এখন যাও। আমি তাকে সালাম দিয়ে তাঁর রুম থেকে বের হয়ে আসি। মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল রাহাত খান ও জিয়াউল হক সাহেবের কথা শুনে।

এখান থেকে সাথে সাথে ইত্তেফাক ভবনের চার তলায় চলে গেলাম ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা নিউ নেশনের সম্পাদক সাহেবের কক্ষে। সম্পাদক জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন সাহেবকে পেলাম, (জীবনে এই প্রথম তাঁকে দেখলাম এর আগে তাঁকে কোনও সময় দেখি নাই ও তাঁর সাথে কোনও কথা হয় নাই) তাঁকে 'চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র'লেখাটি পড়তে দিলাম। নিউ নেশনের সম্পাদক সাহেব এক নিঃশ্বাসে লেখাটি পড়ে বললেন– "খুব সুন্দর লেখা, লেখাটিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে, এ লেখার বক্তব্য দেশের শিক্ষিত মানুষের জানা উচিত, আপনি লেখাটির ইংরেজি অনুবাদ করে দিন, যে দিন অনুবাদ করে লেখাটি আমকে দিবেন তার পরের দিনই লেখাটি নিউ নেশনে ছাপা হবে। এই লেখা যে পত্রিকায় ছাপা হবে সে পত্রিকার গুণগতমান বাড়বে।" আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম লেখাটি আমি ইত্তেফাকে দিয়েছিলাম, কিন্তু লেখাটি ইত্তেফাকের জিয়াউল হক সাহেব ছাপতে রাজি নন, গুণগতমান খারাপ বলে। তিনি বললেন- "এই বিষয়ে আমি কোনও মন্তব্য করতে চাই না, তবে লেখাটি যদি ইংরেজি অনুবাদ করে নিউ নেশনে ছাপার জন্য দেন তাহলে আমি খুশি হব"। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে খুশি মনে জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন সাহেবের রুম থেকে চলে এলাম। ইত্তেফাক ভবনের বাইরে এসে দেখি ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গিয়েছে অন্ধকার নেমে এসেছে। ইত্তেফাক থেকে বেবি ট্যাক্সিযোগে বাসায় আসার সময়ে চিন্তা করলাম লেখাটি কোনও পত্রিকায় না দিয়ে, এ বিষয়ে যারা বিশেষ ভালো জ্ঞানের অধিকারী তাদের কয়েকজনের মতামত সহ, দশ হাজার কপি বুকলেট হিসেবে ছাপবো। এবং দেশের সচেতন মানুষের মধ্যে বিতরণ করবো। আর সে সিদ্ধান্তের জন্যই লেখাটি এইভাবে বুকলেট হিসেবে ছেপে প্রকাশ করলাম।

আমি ধনী লোক নই। অভাব অনটনের মধ্যেই বসবাস করে থাকি,তবুও বিশ হাজার টাকা খরচ করে দশ হাজার কপি এই বুকলেট বিনা মূল্যে প্রচারের জন্য ছেপে প্রকাশ করলাম-এই বিশ্বাসে যে "পৃথিবীর কোনও দেশের কোনও কালে কোনও মানুষের মহৎ বা সৎচিন্তা ব্যর্থ হয় না।" আমারও দৃঢ় বিশ্বাস যে, অভাব অনটনের মধ্যে থেকে বিশ হাজার টাকা খরচ করে "চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র" নামে যে বক্তব্য এদেশের মানুষের সামনে তুলে ধরলাম তা নিয়ে এদেশের মানুষের মধ্যে হতে কেউ না কেউ অবশ্যই এগিয়ে আসবেন এবং কথা বলবেন। কেননা "মানুষের সৎ ও মহৎ চিন্তা কোনোদিন বৃথা যায় না।" এই বক্তব্যের প্রতি আমার বিশ্বাস অটল।

সবিনয় নিবেদনে
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩৮৩/২-ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট,
ঢাকা-১২০৫।
তারিখ : ২০/০৯/২০০২

www.pathagar.com

চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র লেখাটির উপরে বিচারপতি হাবিবুর রহমান, অধ্যাপক এমাজ উদ্দিন আহমদ, ড. তালুকদার মনিরুজ্জামান ও ড. মিজানুর রহমান শেলীর মন্তব্য

বিচারপতি হাবিবুর রহমান

১৩-০৯-২০০২ ইং তারিখ শুক্রবার সকালে ঢাকার ইস্পাহানী কলোনিতে বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি ও সাবেক প্রধান উপদেষ্টা, প্রখ্যাত লেখক ও জ্ঞানী ব্যক্তি জনাব হাবিবুর রহমান সাহেবের সাথে তাঁর বাসায় আমি দেখা করে "চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র" লেখাটি তাঁকে পড়তে দেই। তিনি আমার লেখাটি পড়েন এবং লেখাটির সাথে একমত পোষণ করেন। লেখাতে কোনও তত্ত্ব ও তথ্যগত ভুল নেই বলে আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি জানান। তাঁর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে বেশ কিছু জ্ঞানগর্ভ বিষয় অবহিত হলাম। ''চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র'লেখাটি লিখবার জন্য তিনি আমাকে খুবই আন্তরিকতার সাথে ধন্যবাদ দিলেন।

লেখক

ডক্টর এমাজউদ্দিন আহমদ

এমাজউদ্দিন আহ্মদ, সাবেক প্রফেসর, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমার প্রিয় ছাত্র আবু মোহাম্মদ খানের (বাবলু) লেখা- "চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের" সাথে আমি পুরোপুরি একমত।

এদেশের রাজনীতিকে সুস্থ ও সাবলীল করতে হলে চাই সংসদীয় ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ এবং সংসদীয় ব্যবস্থার সঠিক কার্যকারিতার জন্য চাই সংসদীয় সংস্কৃতি। সংসদীয় ব্যবস্থার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য প্রয়োজন একদিকে যেমন এর অবকাঠামোগত পরিবর্তন অন্যদিকে তেমনি প্রয়োজন যারা এই ব্যবস্থাকে কার্যকর করবেন তাদের আচরণগত পরিবর্তন। এই লেখায় এই দুটি দিকের প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাই আমি আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কে অভিনন্দন জানাই, 'চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র' নামে তার এই সুচিন্তিত লেখাটির জন্য।

এমাজ উদ্দিন আহমদ
১৩/০৯/২০০২

প্রফেসর ডক্টর তালুকদার মনিরুজ্জামান-

প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.pathagar.com

আমার স্নেহভাজন ছাত্র আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) "চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র" নামে যে লেখাটি লিখেছে তার সাথে আমি সম্পূর্ণ একমত পোষণ করি এবং এরকম একটি সাহসী ও তথ্যবহুল বক্তব্য প্রকাশের জন্য তাকে অভিনন্দন জানাই।

তার এ লেখার মূল প্রতিপাদ্য হলো বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের খোলসে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত এবং আমি এখানে তাঁর সঙ্গে পুরোপুরি একমত। আমি এই স্নেহভাজন ছাত্রকে এই ধরনের মুক্তচিন্তা করতে দেখে একদিকে গর্ব অন্যদিকে অনুপ্রাণিত হচ্ছি।

"চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র" নামক লেখাটির প্রতি দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আল্লাহ্ তাঁর সহায়ক হোক।

তালুকদার মনিরুজ্জামান
১২-০৯-২০০২ ইং

ড. মিজানুর রহমান শেলী

ড. মিজানুর রহমান শেলী ১৯৬৪/৬৫/৬৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৬৭ সনের সি,এস,পি। নিয়মিত সাহিত্য চর্চা করেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপরে বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। ১৯৮৯ ও ৯০ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী ছিলেন।

'চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র' নামে লেখাটিতে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) বাংলাদেশে বিদ্যমান সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন তা বাস্তব নির্ভর ও যুক্তি সমর্থিত।

বস্তুত ১৯৯১ সনে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে যে সমস্ত ত্রুটি ও দুর্বলতা ছিল তা এই বিশ্লেষণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঐসকল অসংগতির ফলে ক্ষমতার বিভাজন ও ভারসাম্য রক্ষা দুষ্কর হয়েছে। অন্যদিকে এর পরিণতিতে এবং বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতি চর্চার অভাবে সরকারের প্রধান নির্বাহীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রিভূত হওয়ার প্রবণতা প্রবল হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকার প্রধানকে সমতুল্যদের মধ্যে প্রথম (First among equals) বলা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৯১ সন থেকে যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাতে সরকার প্রধানের প্রবল ক্ষমতাধর হয়ে উঠার সম্ভাবনা তীব্র। এতে করে গণতন্ত্রর মূল তাৎপর্য জনজীবনে প্রতিফলিত হয় না। প্রবন্ধকার আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) এই জটিল সমস্যার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই অসম্পূর্ণ সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তনের সময় উপযোগী আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর এই আহ্বান সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও জনগণের কাছ থেকে যথাযোগ্য সাড়া পাবে বলে আমি আশা করি।

ড. মিজানুর রহমান শেলী
ঢাকা, ২১শে সেপ্টেম্বর ২০০২।

www.pathagar.com

চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র

সংসদীয় শাসন পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী মূল ক্ষমতাসীন ব্যক্তি হলেও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাও অনেক। ভালোভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বেশি না প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বেশি তা বলা বেশ কঠিন। যেমন:-

প্রথমত প্রধানমন্ত্রীকে ক্ষমতা থেকে সরাতে সংসদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যরাই পারেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে বা সরাতে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের প্রয়োজন। ৩০০ জন যদি সংসদ সদস্য থাকেন তবে ১৫১ জন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গেলেই প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতাচ্যুত হবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে ৩০০ জন সদস্যের মধ্যে ২০০ জন সদস্যের প্রয়োজন হবে, তার বিরুদ্ধে ভোটের জন্য। কাজেই প্রধানমন্ত্রীর চেয়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভিত শক্তিশালী।

দ্বিতীয়ত সংসদ নির্বাচনের পরে রাষ্ট্রপতিই প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ দান করেন। রাষ্ট্রপতির নিকট যাকে সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন বলে প্রতীয়মান হবে তাকেই প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। এখানে রাষ্ট্রপতি অনেক ক্ষমতা ভোগ করেন।

তৃতীয়ত রাষ্ট্রপতি সংসদ অধিবেশন ডাকেন এবং সংসদ অধিবেশন বিলুপ্ত করেন। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন বর্তমান সংসদ সদস্যদের প্রতি দেশের মানুষের আস্থা নেই বা তারা ভালো কাজ করছেন না, তাহলে রাষ্ট্রপতি সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন। সংবিধানের এই ধারায় পাকিস্তানে অনেক বার সংসদের মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই সংসদ ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ভারতে একবারও রাষ্ট্রপতি তার ইচ্ছায় সংসদ ভেঙ্গে দেন নাই। (দুই একবার রাষ্ট্রপতি ভেঙ্গে দিয়েছেন মেয়াদ শেষ হবার আগে প্রধানমন্ত্রী বা সরকারের অনুরোধে যেমন ১৯৮০ ও ১৯৯৮ সনে)। সে যাই হোক রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সংসদের মেয়াদ শেষ হবার আগেই সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারেন এবং নতুন সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। সংবিধানে এ ধারা রাখার জন্যই প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যগণ সংযত আচরণ করে থাকেন সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায়। তাঁদের মধ্যে ভয় থাকে যদি তারা কোনও অবৈধ ও বেআইনী কাজ করেন তবে রাষ্ট্রপতি নুতন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিবেন অথবা সংসদ ভেঙ্গে দিবেন। কাজেই এতে সংবিধান ও আইনের শাসনের ভিত শক্তিশালী থাকে।

চতুর্থত রাষ্ট্রপতি দেশের নাগরিকদের উপরে প্রযোজ্য দেশের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিমকোর্টের যে কোনও শাস্তি বা দণ্ড কমাতে পারেন বাড়াতে পারেন বা সম্পূর্ণ মওকুফ করে দিতে পারেন। কাজেই রাষ্ট্রপতি এখানে বিরাট শক্তিধর ব্যক্তি।

পঞ্চমত রাষ্ট্রপতি দেশের হাইকোর্ট ও সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

ষষ্ঠত রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট সংসদে যে সব বিল পাশ হয় তাতে অনুমোদন দিয়ে থাকেন, রাষ্ট্রপতি সংসদে পাশ হওয়া কোনও বিলে অনুমোদন না দিলে সে বিল আইনে

www.pathagar.com

পরিণত হয় না বা তার কোনও কার্যকারিতা থাকে না। যেমন রাজীব গান্ধী যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন ভারতীয় পার্লামেন্টের বিপুল (কংগ্রেস আই) সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে পোস্টাল সেন্সার বিল পার্লামেন্টে পাশ হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি জ্ঞানী জৈল সিং পার্লামেন্টে পাশ হওয়া সে বিলে সম্মতিসূচক স্বাক্ষর না দেওয়ায় সে বিল বাতিল হয়ে যায়। বিলে সহি না করার জন্য ভারতের বিরোধী দল ও বুদ্ধিজীবীদের আকুল আবেদন ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে।

সপ্তমত : রাষ্ট্র পরিচালনায় যাবতীয় খবরাখবর প্রধানমন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতির নিকট গিয়ে অবহিত করতে হয়-এটা সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে মাসে কমপক্ষে একবার প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির কার্যালয় বা বাসস্থানে গিয়ে বিনয়াবনতচিত্তে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন। ভারতে রাজীব গান্ধী একসাথে তিন মাস রাষ্ট্রপতি জৈল সিং এর সাথে দেখা না করার জন্য সংবিধান অমান্যের অভিযোগে রাজীব গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বহিষ্কার করার জন্য ভারতের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের মধ্যে থেকে প্রচণ্ড দাবী ওঠে। ফলে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী দেশবাসীর কাছে ক্ষমা চেয়ে রক্ষা পান।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থায় অবশ্যই বিরাজমান থাকে। আর সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার মানেই হলো নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন, কনভেনশন ইত্যাদির বাইরে কোনও কাজ না করা এবং আইনের শাসনের ভিত্তি শক্তিশালী করা। উপরে বর্ণিত বিষয় ছাড়াও যেসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বা কাজ রাষ্ট্রপতি করে থাকেন সেগুলোতে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ নিয়ে করতে হয়। তবে সংবিধানে শর্ত আছে যে, রাষ্ট্রপতি যদি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ না নিয়ে কোনও কাজ করে থাকেন তবে তার জন্য কেউ কোনও আদালত বা অন্য কোনও জায়গায় কোনও ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না। উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আসলে সংসদীয় গণতন্ত্রের কে বেশি শক্তিশালী সাংবিধানিকভাবে তা বলা শক্ত। মোট কথা প্রেসিডেন্টকে কোনোক্রমেই দুর্বল বা রাবার ষ্ট্যাম্প বলার উপায় নাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মূল কারণ ছিল সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য। পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে গণহত্যা শুরু করে, সে জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতিগণ বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে পরে এখান থেকে সরে আসেন একদলীয় এবং রাষ্ট্রপ্রতি শাসন ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হলে সামরিক অফিসারদের ঘাড়ে ভর দিয়ে প্রেসিডেন্ট হন এবং থাকেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, আবু সাদাত মো. সায়েম, জিয়াউর রহমান, বিচারপতি ছাত্তার, বিচারপতি আহসান উদ্দিন এবং জেনারেল এরশাদ ১৯৯০ সনের ৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট কথা ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ছিল।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সনের ২৫শে জানুয়ারি থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৯১ সনে বেগম খালেদা জিয়ার বিএনপি সংসদ নির্বাচনে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসনে জিতলে খালেদা জিয়ার বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব প্রতিপত্তি এবং ইগো অনেক বেড়ে যায়। তখন তিনি রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন। এখানে বি,এন,পির শীর্ষ নেতারা সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় গণতন্ত্রের পদ্ধতির দুইটি ধারায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে খর্ব করেন। ১ নং রাষ্ট্রপতি সংসদ আহব্বান ও ভেঙ্গেঁ দিবেন প্রধানমন্ত্রীর লিখিত অনুরোধের ভিত্তিতে। প্রধানমন্ত্রী যদি লিখিতভাবে অনুরোধ না করেন তবে রাষ্ট্রপতি সংসদ ডাকতে এবং ভাঙ্গতে পারবেন না। কাজেই এখানে রাষ্ট্রপতির বিরাট ক্ষমতা খর্ব হয়ে গেল, বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রী অনেক ক্ষমতাশীল হলেন, ভারতের, জাপানের, ইংল্যান্ডের, অস্ট্রেলিয়ার, কানাডার, নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীদের চেয়ে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা অনেক বেশি।

দ্বিতীয়ত : মিসেস খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী পদে রাজী করাতে বি,এন,পির শীর্ষ নেতারা আরও একবার রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করেন– তা হলো সংসদে কোনও বিল পাশ হলে রাষ্ট্রপতি তাতে যদি সম্মতি সূচক স্বাক্ষর নাও করেন তবে দুই সপ্তাহ অতিক্রান্ত হলে ধরে নেওয়া হবে রাষ্ট্রপতি বিলে স্বাক্ষর করেছেন এবং বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে। উল্লেখিত রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করার দুটি বিষয়ে সেদিন ১৯৯১ সনে যদি শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগ ও জামাতের এমপিরা আপত্তি জানাতেন, যদি সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতির প্রতি সৎ থেকে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করতে সম্মতি না দিতেন তারা তবে এই দুটি ধারা বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে সংযোজন হতে পারতো না। কিন্তু শেখ হাসিনা, আওয়ামী লীগের ও জামাতের এমপিরা সংসদীয় গণতন্ত্রের দুটি ধারাকে সংবিধানের বারতম সংশোধনীর মাধ্যমে হত্যা করতে আনন্দিতচিত্তে সম্মতি দিয়েছেন বলে জানা যায়।

এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানে আরও একটি ধারা সংযোজিত হয়েছে, সংবিধানের ৭০ ধারা। যাতে বলা হয়েছে, যে দল থেকে নমিনেশন নিয়ে যে ব্যক্তি এম,পি হবেন, তিনি যদি সেই দলের পক্ষে ভোট দিতে ব্যর্থ হন তবে তার এম,পি শিপ চলে যাবে। এটাও সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়মনীতির পরিপন্থী কাজ। দুনিয়ার কোনও দেশে এই নিয়ম নেই। বাংলাদেশের এই খারাপ নজিরটির প্রতি অনুরাগী হয়ে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তাঁর দল কংগ্রেস (আই) ভারতের সংবিধানে ১৯৮৫ সনে ৫২তম সংশোধনীর মাধ্যমে এই নিয়মনীতি চালু করতে চান। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট রায় দেন যে, যদি কোনও দলের এক তৃতীয়াংশ সদস্য যদি কোনও দল থেকে নমিনেশন পেয়ে এমপি নির্বাচিত হয়ে দল বদল করতে চান বা সেই দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন তবে তাদের এম.পি শিপ বা মেম্বারশিপ চলে যাবে না। (যেমন ৩০জন সদস্যের মধ্যে ১০ জন যদি দল বদল করে তবে তাদের মেম্বারশিপ যাবে না)। এছাড়া দুনিয়ার আর কোনও দেশ নেই যেখানে, সে সংসদীয় গণতন্ত্র বা রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা যাই হোক না কেন,

www.pathagar.com

নির্বাচিত এমপিরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারেন না।

মোট কথা আমাদের সংবিধানের উল্লেখিত তিনটি ধারা সংযোজিত করে সংবিধানকে সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থা থেকে অনেক দূর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে ১৯৯১ সন থেকে বাংলাদেশে যে সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থা চালু রয়েছে তাকে কোনও ক্রমেই সংসদীয় পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা বলা যায় না। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠার জন্যই স্বাধীন বাংলাদেশের সৃষ্টি হয়েছে কয়েক লক্ষ বাঙালির তাজা রক্তের বিনিময়ে। কয়েক লক্ষ বাঙালির তাজা রক্তের প্রতি যাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আছে তাদেরকে বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্র কায়েম করার জন্য এগিয়ে আসতে আহব্বান ও অনুরোধ জানাই।

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে দূরে চলে যাওয়ার ও থাকার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান সাহেব মর্মান্তিকভাবে নিহত হয়েছেন, এবং তাদের হত্যাকাণ্ডের সাথে আরও অনেক অমূল্য প্রাণের হানি হয়েছে; অনেক মা বোন বিধবা হয়েছেন। যদি বঙ্গবন্ধু সংসদীয় গণতন্ত্রের নিয়ম নীতির প্রতি আস্থাশীল থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের শাসন ব্যবস্থায় প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী থাকতেন তবে মনে হয় এমন মর্মান্তিকভাবে তাঁকে নিহত হতে হতো না। তাঁর হত্যাকাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে জিয়াউর রহমান সাহেব যদি সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সংসদীয় গণতন্ত্র ভিত্তিক বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হতেন তবে তাঁকেও এমনভাবে নিহত হতে হতো না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমানের পরিণতি দেখে যদি এরশাদ সাহেব সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা করে এর প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট না হতেন তবে তাঁকেও প্রায় আট বছর অপমানজনকভাবে জেল খাটতে হতো না।

বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রকে হাত পা কেটে চোখ দুটো নষ্ট করে দিয়ে অঙ্গহানি করা হয়েছে, আর এই অঙ্গহানি করার জন্য দায়ী বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা এবং এদের স্তাবকরা। ইতিহাসের ও রাজনীতির স্বাভাবিক গতিধারা অনুযায়ী সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যা, এর অঙ্গহানি ও এর থেকে দূরে থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করার পরিণাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান ও এরশাদের মতোই এদের পরিণামও হওয়ার কথা। তবে একজন বিবেকবান ও মানবিক চেতনাবোধ সম্পন্ন মানুষ কোনো ক্রমে চাইবেন না খালেদা জিয়া, শেখ হাসি-না ও এদের স্তাবকদের অবস্থাও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, জিয়াউর রহমান বা এরশাদের মতো হোক। কিন্তু কেউ না চাইলেও রাজনীতি ও ইতিহাসের স্বাভাবিক গতিধারাকে কেউ রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিরাট সাংবিধানিক একনায়কতন্ত্রের ক্ষমতার অধিকারী। গণতন্ত্রের খোলস বা মুখোশ এর আড়ালে বর্তমান বাংলাদেশে চলছে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় একনায়ক স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা। এক নায়ক ও স্বৈরাচারী শাসন পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থার জন্য ১৯৭১ সনে কয়েক লক্ষ বাঙালির বুকের তাজা রক্ত ঢেলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা

www.pathagar.com

করেন নাই। লক্ষ লক্ষ বাঙালির রক্তের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে রাষ্ট্রপতি নামক এক নায়ক শাসন পদ্ধতি যারা কায়েম করেছেন তার ফলাফল তাঁরা পেয়েছেন। এখন আবার গণতন্ত্রের লেবাস বা মুখোশের আড়ালে সংসদীয় পদ্ধতির নামে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধানের কর্তৃত্বে স্বৈরশাসন ব্যবস্থা চালুর পরিণাম ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতিতে যা হয় তাই হবে। তবে বিবেকবান ও মানবতাবাদী মানুষ ইতিহাসের এইসব স্বাভাবিক পরিণতি যা সাধারণত খুবই অমানবিক ও নিষ্ঠুর হয় তা দেখতে চান না। তারা চান সুস্থ স্বাভাবিক শান্তি শৃঙ্খলাময় নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। আর তা সম্ভব একমাত্র ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে যা ছিল ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রধানতম ভিত্তি ভূমি।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রের জনক এরিস্টটল তাঁর পলিটিক্স গ্রন্থে প্রায় দুই হাজার তিনশত বছর আগে বলেছেন- "প্রাণী জগৎ এর মধ্যে সেই মানুষ শ্রেষ্ঠ- যে সংবিধান বা আইন মেনে চলে- আর প্রাণী জগৎ এর মধ্যে সেই মানুষ নিকৃষ্টতম প্রাণি যে সংবিধান বা আইন মেনে চলে না।"

এছাড়াও আমরা জানি যে- "Absolute Power Tends to corrupts absolutely." ১৯৯১ সনের বাংলাদেশের সংবিধানে ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে যে পরিমাণ Absolute Power প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে, তাতে যে কোনও ব্যক্তি প্রধানমন্ত্রী হলে corrupts absolutely হওয়া অতি স্বাভাবিক। মিসেস খালেদা জিয়া ও মিসেস শেখ হাসিনা তো অতি সাধারণ মহিলা। সংবিধানের ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে যে Absolute Power দেওয়া হয়েছে তার জন্যই মিসেস খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হয়ে সংবিধান রক্ষা করার শপথ নিয়ে সংবিধান অমান্য করেন। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও অযোগ্য লোকদের বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদে বসিয়ে বাংলাদেশের মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করে তুলেছে। ইসলাম ধর্মে বর্ণিত আছে মানুষের জীবনে সবচেয়ে ঘৃণিত ও নিকৃষ্টতম পাপ কাজের একটি হচ্ছে শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা। পবিত্র কোরআনে অনেকবার বর্ণিত আছে "মোনাফেকি করিও না।" যারা কথা দিয়ে কথা রাখে না, যারা প্রতিশ্রুতি বা শপথ ভঙ্গ করে তারাই মোনাফেক। এমনকি জেনে শুনে মোনাফেকদের মুখ দেখলেও কবিরা বা বড় ধরনের গুনাহ হয়।

কাজেই যারা সংবিধান রক্ষা করার শপথ নিয়ে ক্ষমতায় বসে সংবিধান অমান্য করে স্বজনপ্রীতি-দুর্নীতি করে তারা মুনাফেক ও পাপী। এদের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করা জরুরি প্রয়োজন। আর সংবিধান অমান্য করে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি করার সাহস পাচ্ছে সংবিধানের ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে; সংসদীয় গণতন্ত্রের যে Balance of power বা check and balance থাকে তা নষ্ট করে দিয়ে একতরফাভাবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা খর্ব করে এককভাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিরাট ক্ষমতাবান করার জন্য।

এছাড়াও সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশে যিনি প্রধানমন্ত্রী হন তিনি দলীয় প্রধান থাকেন না। যেমন গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ইত্যাদি দেশ। টনি ব্লেয়ার ব্রিটিশ

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী, তিনি লেবার পার্টির সভাপতি নন। জাপানের মি. কোরি প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তিনি তার দলের প্রধান নন। ভারতে অটল বিহারী বাজপাই প্রধানমন্ত্রী কিন্তু বিজেপির সভাপতি ভেংকটিয়া নাইডু। ভারতের মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী একই সাথে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান ছিলেন। আর এই দু-জনই দুঃখজনকভাবে নিহত হয়েছেন ভারতের ১২জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে। মিসেস গান্ধী প্রায় সতের বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন এরমধ্যে মাত্র দু-এক বছর দলীয় প্রধান ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশে মিসেস খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা একই সাথে প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় প্রধান হিসাবে বহাল থাকেন। যা কোনও ক্রমেই সংসদীয় গণতন্ত্রের নর্ম ও ফর্ম এর মধ্যে পড়ে না।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বাংলাদেশের বিবেকবান ও দেশপ্রেমিক ভাই বোন, সম্মানিত অভিভাবক, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক ছাত্র, সমাজ অর্থনীতি রাষ্ট্র বিষয়ে চিন্তাশীল তথা সর্বস্তরের জনগণের প্রতি সবিনয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আল্লাহ আমাদের সৎ চিন্তা ও সৎ কাজ করার শক্তি দিন।

"এইসব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা, ডাকিয়া বলিতে হবে
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্রে দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে।
যখনি দাঁড়াবে তুমি সমুখে তাহার তখনি সে
পথ কুক্কুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে।
দেবতা বিমুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার,
মুখে করে আস্ফালন, জানে সে হীনতা আপনার
মনে মনে।"
(কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবার ফিরাও মোরে)

* আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কর্তৃক ৩৮৩/২ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫ থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত।

তারিখ : ২০.৯.২০০২

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেইসব বিরল ও অসাধারণ মানুষদের কথা ঃ

		পৃষ্ঠা নং
১।	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাকে যেমন দেখেছি	১৩৭
২।	স্মৃতির পাতায় মওলানা ভাসানী	১৪৯
৩।	তাজউদ্দিন আহমদের জন্মদিনে শ্রদ্ধাঞ্জলী	১৫৭
৪।	একজন সাত্বিক নেতা আব্দুল মোমিন	১৬২
৫।	সব মানুষের প্রিয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী	১৬৫
৬।	মহান নেতা সামসুল হক	১৭০
৭।	ইসমাইল মোহাম্মদ উদয়ন চৌধুরী এবং বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি	১৭৪
৮।	মানবতাবাদী মানুষ রশীদ আহমদ আর নেই	১৭৭
৯।	রিচার্ড নিকসন অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব	১৮৯
১০।	আমার ভাই, আমার বন্ধু সংসদ সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টো	১৮৫
১১।	কবি আবুল হাসান	১৮৯

www.pathagar.com

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : তাকে যেমন দেখেছি-

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব বাঙালি তথা পূর্বপাকিস্তানের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের মানউন্নয়নের জন্য ৬ দফা দাবী পাকিস্তানের শাসক তথা জনসাধারণের সামনে পেশ করেন। এই ছয় দফা দাবী পেশ করার ফলে পূর্ব পাকিস্তানতো বটেই, সমগ্র পাকিস্তানের মধ্যে শেখ মুজিবর রহমান সাহেব রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। পূর্বপাকিস্তান বা বাঙালি জনগণের শিক্ষিত শ্রেণী, উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, কবি-সাহিত্যিক, ব্যবসায়ী ছাত্র-শিক্ষকসহ সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। ১৯৬৬ সনে আমার বয়স ১২ বছর। সিরাজগঞ্জ জেলার তামাই হাইস্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমাদের গ্রাম তামাই একটি ধনী গ্রাম। এখনতো শহরের মতো গ্রামে প্রায় ৫০ জনের মতো কোটিপতি ব্যবসায়ী। ১৯৬৬ সনে আজকের মতো স্বাভাবিকভাবেই এরকম ছিল না। তবুও অন্যান্য গ্রামের চেয়ে ব্যতিক্রম ছিল। আমার বাবার রংপুর কাপড়ের ব্যবসা ছিল, নিয়মিত রংপুর যাতায়াত করতেন। আমার নানা একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন ইসলামিক চিন্তাচেতনায় সমৃদ্ধ, যদিও তিনি মনে হয় ম্যাট্রিক পাশ ছিলেন না, কিন্তু খুবই শিক্ষিত লোক হাতের লেখা মুক্তার মতো সুন্দর। নানার প্রভাবে ১৯৬৭ সনে ক্লাশ সেভেনে পড়ার সময়ে নানার কাছে সংগৃহীত ১৯২০ সন থেকে ১৯৩০ সন পর্যন্ত কলকাতা থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সম্পাদনায় প্রকাশিত অর্ধ সাপ্তাহিক সোলতান পত্রিকার কপিগুলো পড়ে ফেলেছি- যা আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে, ১৯৬৭ সনে সোলতান পড়ে আজ ২০০৮ সনেও আমি যেখানে রাজনীতি ও ইসলাম নিয়ে কথা বলি ঐ সোলতান পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার কথাই বলি, ফলে ইসলাম প্রসঙ্গে আমার কথার কেউ ভুল ধরেছে বলে আমার মনে হয় না। তাই ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব ও মওলানা মনিরুজ্জামান সাহেবের সোলতানের কথা উল্লেখ করলাম। ১৯৬৭ সনে মোটামুটি আমার কচি মনে একটা রাজনৈতিক ভিত্তি ভূমি গঠন হয়েছে ওনাদের সম্পাদিত ও প্রকাশিত সোলতান পত্রিকা পড়ে। এছাড়াও রেডিওর সংবাদ, আমাদের গ্রামের ২/৪ জন শহরে কলেজে পড়ে, তারা আলোচনা করে তাদের মুখ থেকে শুনে মাঝেমধ্যে দৈনিক খবরের কাগজ পড়ে আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের নাম শুনি, ওনার সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর পাই ধীরে ধীরে ওনার ভক্ত হয়ে যাই। এরমধ্যে আবার ১৯৬৫ সনে আইয়ূব খান সাহেব ও ফাতেমা জিন্নার ইলেকশনে কলেজে পড়া সিনিয়র ছাত্রদের সাথে ভাঙ্গা হারিকেন নিয়ে মিছিল সমাবেশেও যোগ দিয়েছি ফাতেমা জিন্নার স্বপক্ষে।

এই অবস্থায় বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তি সনদ ছয় দফা পেশ করলে পাকিস্তানি শাসকরা ওনার প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে তার জনপ্রিয়তায় হিংস্র হয়ে তাঁকে একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করে জেলে রেখে দেন। শুধু বঙ্গবন্ধুকেই নয় ওনার সহযোগী অনেক

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগও ছাত্রলীগ কর্মীদের মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে ভরে রাখেন। শুধু জেলে ভরেই পাকিস্তানি শাসকরা শান্ত হন না, তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও দুই চারজন সিভিলও সামরিক বাহিনীর সদস্য সব মিলিয়ে প্রায় ৩০ জনকে আসামী করে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন এই বলে যে– আসামীরা গোপনে ভারতের সাথে যোগাযোগ করে তাদের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র করেছে। এই মামলা দায়ের করার জন্য পাকিস্তানের রাজনীতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। শিক্ষিত দেশবাসী দুই ভাগে বিভক্ত হয় যায়– একভাগ শেখ মুজিবের পক্ষে, আবার অন্য ভাগ-আইয়ূব খান মুসলিম লীগ, ন্যাপ, ইত্যাদি দলের পক্ষে। কিন্তু যখন আগরতলা ষড়যন্ত্রের বিচার শুরু হয় তদন্তের সময়ে অভিযুক্তদের অমানুষিকভাবে দৈহিক নির্যাতন করা হয়েছে এই মর্মে আদালতে অভিযুক্তরা যখন বক্তব্য রাখেন, তখন বাঙালি ছাত্র-জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে শেখ মুজিবের পক্ষে, পাকিস্তানী শাসক ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে। ১৯৬৮ সনের নভেম্বর ডিসেম্বর মাস থেকে আন্দোলন শুরু হয় ১৯৬৯ সনের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে গরিব সাধারণ ব্যাপক লক্ষ লক্ষ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তার সমর্থক নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে-সারা পূর্ব পাকিস্তানের আনাচে কানাচে বা গ্রামেগঞ্জে এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

ফলে পাকিস্তানি শাসক চক্র বাঙালি ছাত্র-জনতার দাবীর কাছে মাথা নত করে শেখ মুজিবর রহমানকে জেল থেকে মুক্তি দেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন। শেখ মুজিবর রহমান সাহেব শেখ মুজিব থেকে বঙ্গবন্ধু খেতাবে ভূষিত হয়ে বঙ্গবন্ধু নামে অভিহিত হন।

১৯৬৯ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন জেল থেকে ছাড়া পান তখন আমি ১৫ বছর বয়সের কিশোর রক্তের তেজ অনেক বেশি, ১৯৬৬ সন থেকে গ্রামের কলেজ পড়ুয়া সিনিয়ার ছাত্রদের সাথে কথা বলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের একজন সমর্থক ও কর্মী হয়ে পড়েছি। থানা ও মহকুমা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সাথে পরিচয় হয়েছে। এখন যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্য এত আন্দোলন, এত দৌড়াদৌড়ি করলাম, যার জন্য এত চোখের পানি ফেললাম, যার জন্য এত নামাজ পড়ে দোয়া করলাম, এখন তিনি মুক্ত অথচ তাঁকে নিজের চোখে দেখতে পারবো না তা কেমন করে হয়। তাকে দেখার জন্য ছটফট করতে থাকি।

এখন দেখা করতে চাইলেই তো আর দেখা করা যায় না। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই গ্রাম থেকে ঢাকা শহর ঐ সময়ে অনেক দূর, ট্রেন একমাত্র ভরসা, আগেরদিন বিকাল ৪টায় সময় বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে জামতৈল রেলস্টেশনে এসে ৫টায় রাজশাহী মেল ধরে সিরাজগঞ্জঘাট জগন্নাথগঞ্জঘাট ষ্টিমারে পার হয়ে রাত ১টা-২টায় ঢাকার ট্রেন ধরে সকাল ৮টায় ঢাকায় নামি। অনেক দূরের অনেক কষ্টের পথ, তার উপরে আছে টাকা পয়সার খরচের ব্যাপার, আসা যাওয়া ৩/৪ দিন ঢাকায় থাকা হোটেলে খাওয়া সব মিলিয়ে কমপক্ষে ২৫ টাকার দরকার। ১৯৬৯ সনে ২৫ টাকার অনেক দাম। প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকদের ও পুলিশের কনস্টেবলদের মাসে বেতন ছিল, ৩০ টাকা করে। কাজেই ২৫ টাকার দাম অনেক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে দেখার জন্য

www.pathagar.com

একদিকে প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছি, ২৫ টাকা হলে তবেই ঢাকা যাওয়া সম্ভব, প্রিয় নেতাকে দেখা সম্ভব। ১৯৬৯ সনের মার্চ ও এপ্রিল দুই মাস কষ্ট করে সাধ্য সাধনা করে ২৫ টাকা সংগ্রহ করে তামাই থেকে ঢাকা আসি বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য। ১৯৬৯ সনের ৩০শে এপ্রিল ঢাকার ফুলবাড়ি রেলস্টেশনের কাছে হানিফিয়া হোটেলের একটি সিঙ্গেল সিট ভাড়া করি ৩ টাকায়, ওখানেই উঠি। পরের দিন ১লা মে ১৯৬৯ সন সকালে বঙ্গবন্ধুর ৩২নং ধানমন্ডির বাসায় যাই, হানিফিয়া হোটেলের কাছ থেকে। এখনও বেশ মনে পড়ে রিক্সাওয়ালাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ির কথা বললে সে চেনে বলে জানায় এবং বলে এত সকালে ওদিকে গেলে ভাড়া পাই কিনা ঠিক নাই, বেশি ভাড়া দিতে হবে, আমি বলি বেশি ভাড়া দিব, রিক্সাওয়ালা আবার জিজ্ঞাসা করে যা ভাড়া চাই তাই দিবেন তো? আমি বলি, হ্যাঁ সে বলে ঠিক, আমি বলি ঠিক, তখন বলে পাক্কা এক টাকা ভাড়া দিতে হবে, আমি রাজি হয়ে যাই, রিক্সাওয়ালা খুব খুশি হয়ে খুব জোরে চালিয়ে খুব ভোরে ৩২নং ধানমণ্ডির বাসায় এনে নামিয়ে দেয়। এত ভোরে বাসায় কোনও লোকজন দেখি না, বাইরে ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকি, তারপর ঘন্টাখানেক পরে দেখি বাবু মামু (আকরাম হোসেন) এলেন। তাঁকে আমার পরিচয় দিলাম, সব বৃত্তান্ত খুলে বললাম। আকরাম মামু বললেন, দেখা করতে পারবেন, অপেক্ষা করেন দেরী হবে। আমার অপেক্ষা করা সহ্য হয় না উত্তেজনায়, আমি বাবু মামু বা আকরাম সাহেবকে তাগিদ দেই তাঁকে গিয়ে আমার কথা বলার জন্য। এক পর্যায়ে তিনি উপরে গিয়ে আমার কথা বলেন তিনি বসতে বলেন, আমি অধৈর্য হয়ে পড়ি। আসলে তখন আমার ১৫ বছর বয়স, দ্বিতীয়ত গ্রামের ছেলে গ্রামের জীবনধারার সাথে পরিচিত, শহরের মানুষের স্টাইল একেবারেই জানতাম না, তার জন্য অধৈর্য হয়ে পড়ি। এক সময়ে দেখলাম পত্রিকায় যাদের নাম পড়ি তাদের অনেকেই বঙ্গবন্ধুর বাসায় আসছেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, খন্দকার মোস্তাক আহমদ, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ওবায়দুর রহমানসহ অনেক নেতা ধীরে ধীরে সাধারণ জনতার ভিড়ও বাড়তে থাকে আমার মতো যারা বঙ্গবন্ধুকে দেখতে এসেছে। সকাল সাড়ে আটটার সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জোরে চিৎকার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নামছেন এবং জিজ্ঞাসা করছেন– "সিরাজগঞ্জের বাবলু কে, সিরাজগঞ্জের বাবলু কে?" আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম আমি। তিনি আমার সাথে হাত বাড়িয়ে খুব জোরে হ্যান্ডশেক করলেন– দুই গালে আস্তে আস্তে কয়েকটি আদরের থাপ্পর মারলেন, মাথায় হাত বুলালেন। বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলেন কি করেন, কয় ভাইবোন এবং এক পর্যায়ে বললেন ঠিক আছে আবার দেখা হবে।" এই বলে তিনি ওখানে সমবেত আরও শতেক খানেক লোকের সাথে হাত মিলালেন শুভেচ্ছা বিনিময় করে গাড়িতে উঠলেন, নেতারাও গাড়িতে উঠলেন। ১৯৬৯ সনের ১লা মে বগুড়ায় প্রথম ঘরোয়া রাজনৈতিক মিটিং হয় আওয়ামী লীগের এবং ওনারা বগুড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

আমি মানুষজনের সাথে পায়ে হেঁটে পূর্বদিকে মিরপুর রোডে এলাম গুলিস্তানের বাসের জন্য। বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি আমিসহ প্রায় শ'খানেক লোক বিভিন্ন বয়সের। কিন্তু দেখলাম কিছুক্ষণ আগে বঙ্গবন্ধুর বাসায় পরিচিতি হওয়া তাজউদ্দিন সাহেব সেখানে সাদা রংয়ের একটি টয়োটা গাড়িতে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি

www.pathagar.com

কোথায় যাব? আমি বললাম গুলিস্তানের দিকে। তিনি গাড়ির দরজা খুলে গাড়িতে উঠতে বললেন। জীবনের প্রথমবার কার গাড়িতে উঠলাম ১৯৬৯ সনের ১লা মে তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সাথে। তিনি আমাকে আওয়ামী লীগের পুরানা পল্টন অফিসে নিয়ে এলেন, রাস্তায় আমার সাথে কথা বললেন, অফিসে চা এবং বিস্কিট খাওয়ালেন, এক পর্যায়ে বিদায় দিলেন। আমি গুলিস্তান মতিঝিল দিয়ে হাঁটাহাটি করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার জিন্নাহ আজকের সূর্যসেন হলে এলাম ৪৭৪ নম্বর কক্ষে, বছর খানেক আগে ট্রেনের ২য় শ্রেণীতে যেতে পরিচয় হওয়া ইউসুফ তালুকদারের কাছে। তিনি আমাকে যথেষ্ট সমাদরের সাথে গ্রহণ করলেন। আমাকে দুপুরে হলের ডাইনিং হলে ভাত খাওয়ালেন, আমাকে হানিফিয়া হোটেল ত্যাগ করে ৪৭৪ নং সূর্যসেন হলে উঠতে বললেন। আমি বিকালে ৪৭৪ নং কক্ষে জিন্নাহ হলে চলে এলাম। বিকালে ইউসুফ ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবকিছু ঘুরিয়ে দেখালেন– আজও মনে পড়ছে সেদিনের টিএসসি যেন স্বপ্নপুরী। রাতে ইউসুফ ভাই হলে তার খাটে শোবার জন্য আমাকে বলেন এবং তিনি নিচে বিছানা করে শুতে চান। আমি প্রবল আপত্তি করি এবং বলি তাই যদি হয় তা হলে এখান থেকে চলে যাব। অগত্যা তিনি নিচে আমার জন্য বিছানা করলেন উনি খাটে ঘুমালেন এবং মনে হলো খুশিও হলেন। এখানে ইউসুফ তালুকদারের কথা একটু বলা দরকার– ১৯৬৫ সনে ইউসুফ তালুকদার ঢাকা বোর্ডে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৬৭ সনে ঢাকা বোর্ডের আই,কম, পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্সের একাউন্টেন্সিতে প্রথম শ্রেণী প্রথম হন। এম,কমে প্রথম হন, ১৯৭৪ সনে একাউন্টেন্সি বিভাগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ রেহানার স্বামী শফি সিদ্দিকী ১৯৬৬ সনে এস,এস,সি পাশ করেন, তিনিও খুব ভালো ছাত্র এস,এস,সিতে প্লেস পাওয়া ১৯৭২-৭৩ সনে ৪৭৪ নং কক্ষে আমরা ৩ জনে বেশ কয়েক দিন থেকেছি। শফি সিদ্দিকী সাহেব ইউসুফ তালুকদারের কাছে পড়া বুঝতে আসতেন। ১৯৮৮ সন থেকে ইউসুফ তালুকদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে প্রথমে ১০ বছর লন্ডন, পরে আমেরিকার জর্জিয়ার স্ট্রেটের জর্জিয়া সাউথ ওয়েস্টার্ণ স্টেট ইউনিভার্সিটিতে (আটলান্টার কাছে) একাউন্টেন্সি এবং স্কুল অব বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রফেসর হিসেবে চাকরি করছেন। ইউসুফ তালুকদারের একজন জুনিয়ার বন্ধু বা ছোট ভাই হবার জন্য জনাব শফি সিদ্দিকীসহ ঐ সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের অনেক কৃতি বা ভালো ছাত্ররা আমাকে খুবই সম্মান ও ভালো বাসেন। ইউসুফ তালুকদার বাংলাদেশের এক কৃতি সন্তান। যার জন্য বঙ্গবন্ধুর কথা লিখতে নিয়ে তার কথা যেহেতু এসে গেল তাই বাদ দিলাম না।

এরপরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখা হয় বেশ কয়েকবার ১৯৭০ সনে। ১৯৭০ সনে আমি মাঝে মধ্যেই ঢাকা আসি ৪৭৪ সূর্যসেন হলে ইউসুফ ভাইয়ের রুমে থাকি। ঢাকার বিভিন্ন আওয়ামী লীগের সভা সমাবেশে যাই, আওয়ামী লীগ অফিসে যাই বঙ্গবন্ধুর বাসায় যাই বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা হয় সালাম বিনিময় হয় তেমন কথা হয় না। এরমধ্যে একদিন তিনি তাঁর বাসায় হঠাৎ আমাকে ডাক দিয়ে একটু আড়ালে নিয়ে চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করেন "বাবলু পাবনার মুনসুর আলীকে চিনিস" আমি বলি হ্যাঁ, উনি

www.pathagar.com

বলেন মুনসুর আলী কেমন লোক? আমি বলি খুব ভালো মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করেন ঠিক, আমি বলি ঠিক। উনি আবার বলেন "তুই কেমন করে জানিস যে সে ভালো মানুষ? আমি বলি আমি তার পাবনার বাড়ি ২-৩ বার গিয়েছি, পাবনায় ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগের মিটিং এ গিয়েছি তাকে দেখেছি। আর কেউ তার বিরুদ্ধে কোন কথা বলে নাই। একথা শুনে মনে হলো বঙ্গবন্ধু খুব খুশি হলেন, তখন আমাকে বলেন শোন "মুনসুরকে সামনের নির্বাচনে সিরাজগঞ্জ থেকে নমিনেশন দিবো, ও ১৯৫৪ সনে সিরাজগঞ্জ থেকে ভোটে পাশ করে পালাইছে, আর কোনদিন সিরাজগঞ্জ যায় নাই। তুই মুনসুর আলীকে নিয়ে সিরাজগঞ্জের বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগের মিটিং করাবি।" জবাবে আমি বলি লিডার আমি একজন ছেলে মানুষ, সবে এস,এস,সি পরীক্ষা দিয়েছি, দ্বিতীয়ত আওয়ামী লীগের মিটিং করতে তো কোন ইউনিটের প্রয়োজন হয়, তা না হলে কাদের উদ্যোগে মিটিং হবে? তখন বঙ্গবন্ধু খুব আস্তে করে আমার গালে আঘাত করে বলেন, বলবি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে মিটিং, আর ইউনিয়নে হলে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন, আর থানা সদরে মিটিং হলে বলবি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি সভাপতিত্ব করবেন। আমি রাজি হই, এবং ১৯৭০ সনে ক্যাপ্টেন মুনসুর আলীকে পাবনা থেকে এনে সিরাজগঞ্জের অনেক গ্রামাঞ্চলে আমি অনেক জনসভা করাই। এরজন্য সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের নেতারা আমার প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিল। একাজে আমার সাথে ছিল আমার গ্রামে আমার বন্ধু জুলফিকার রফিক রঞ্জু, এখন ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর ডিগ্রী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। মুনসুর আলী সাহেবকে আমার মনে হয় বঙ্গবন্ধু আমাকে দিয়ে সিরাজগঞ্জে মিটিং করানোর কথা বলেছিলেন, কেন না এর পরে যখন মুনসুর আলী সাহেবের সাথে প্রথম দেখা হয়– তিনি আমাকে খুব আদর আপ্যায়ন করেন, মিষ্টি মিষ্টি হাসেন। এবং আমি যে জনসভায় বা মিটিং এর কথা বলতাম তিনি তা কোনোদিন না করেন নাই, খুব কষ্ট করে এসব জনসভায় অংশ নিতে পাবনা থেকে আসতেন। মুনসুর আলী সাহেবও এজন্যে আমাকে খুব স্নেহ করতেন। মন্ত্রী হবার পরে তিনি আমাকে খুব ভালো বেসেছেন, বিভিন্ন জায়গায় তাঁর পাশে বসিয়ে নিয়ে গেছেন, তাকে দিয়ে অনেক লোকের অনেক কাজ করিয়ে দিয়েছি। তিনি বলতেন ''তোর কাজ এম,এ পাশ করা, ইংরেজিতে কথা বলা শেখা, তোকে কি বানাতে হবে সে দায়িত্ব আমার।'' কিন্তু তার ছেলে মো. নাসিম মন্ত্রী হয়ে আমার সাথে প্রচণ্ড খারাপ ব্যবহার করেছে, একদিন তাকে জিজ্ঞেস করি আমার সাথে আপনি এই ধরনের খারাপ ব্যবহার কেন করেন? জবাবে বলেন– আমার বাবা মুনসুর আলী মন্ত্রী ছিলেন কিন্তু তোমার জন্য আমরা তার কাছে তেমন ভিড়তে পারি নাই, আবার এখন আমি মন্ত্রী আমার কাছেও তুমি ভিড়তে চাও। জানি না এই কথা দিয়ে তিনি কি বুঝাতে চেয়েছেন। আমি সর্বক্ষণ কোনও সময়েই মুনসুর আলী সাহেবের সাথে থাকি নাই, সপ্তাহে ৩-৪ দিনে সন্ধ্যায় ১ ঘন্টার মতো সময় মুনসুর আলী সাহেবের বাসায় এবং সপ্তাহে ১-২ দিন তার সচিবালয় অফিসে দেখা হতো। আমার জন্য নাসিম সাহেব তাঁর বাবার কাছে ভিড়তে পারে নাই, এটা অসত্য কথা। দ্বিতীয়ত নাসিম সাহেবকেও তাঁর বাবা খুবই স্নেহ করতেন বলে আমি জানি। তবে মুনসুর আলী সাহেব আজীবন স্কলারশিপ স্টাইপেন্ট পাওয়া ভালো ছাত্র ছিলেন, সে তুলনায় নাসিম

www.pathagar.com

সাহেব ছাত্র জীবনে লেখাপড়াটাকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রেম করে বেশি সময় কাটিয়েছে, এজন্য এবং নাসিম সাহেব যুবলীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন, এটাও মুনসুর আলী সাহেব পছন্দ করতেন না, তিনি এ নিয়ে আমার কাছে বেশ কয়েকবার খুব দুঃখ করেছেন, এসব কথা মনে হয় কোনও সময়ে কেউ নাসিম সাহেবের কানে লাগিয়েছে। মুনসুর আলী সাহেব প্রচণ্ড মুজিব বাহিনী ও যুবলীগ বিরোধী ছিলেন (এফ, এফ, বা মুক্তিযোদ্ধাদের দলে ছিলেন) যার জন্য মনে হয় নাসিম সাহেব আমার সাথে মন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে খুব খারাপ ব্যবহার করেছেন। ১৯৯৮ সন থেকে আমি আর নাসিম সাহেব এর বাসায় যাই নাই, শুধু একদিন গিয়েছিলাম, তার ছোট ভাই আমার বন্ধু ডাঃ মারুফের মৃত্যুর মিলাদে। আল্লার কাছে প্রার্থনা করি জীবনে কোনদিন যেন নাসিমের মুখ আর না দেখি।

বঙ্গবন্ধু একটি বিরাট বটগাছের মতো তাঁর কথা বলতে গেলে অনেক শাখা প্রশাখার কথাও বলতে হয়, যার জন্য ঐসব কথা বা মুনসুর আলী নাসিম সাহেবের কথা উল্লেখ করতে হলো।

এরপরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখার যে ঘটনাটা সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে- ১৯৭০ সনে আগস্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাসে আমাদের বেলকুচি চৌহালী থানার বন্যা স্বচক্ষে দেখবার জন্য আসেন। আমরা প্রথমে খবর পেলাম বঙ্গবন্ধু সকাল ১০টার দিকে লঞ্চযোগে আসবেন। পরে খবর পেলাম না ওয়াপদার বাঁধ দিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে আসবেন। আমরা সেভাবেই মাইকিং করি ও প্রস্তুতি নেই। সকাল দশটায় বঙ্গবন্ধু আসবেন, কিন্তু রাতে উত্তেজনায় ঘুম হয় না, খুব ভোরে দেখি বর্তমানে ফুলপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জুলফিকার রফিক রঞ্জু খুব ভোরে এসে হাজির। সেও একই কথা বলে উত্তেজনায় রাতে ঘুম হয় নাই। ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয়তা খুবই তুঙ্গে। মানুষ গাছের পাতায় শেখ মুজিবও নৌকার ছবি দেখে। সেই বঙ্গবন্ধু আমাদের থানায় আমাদের বাড়ির কাছে আসবেন, তার আগের রাতে কি আর আমাদের ঘুম হয়? যাক রঞ্জুকে জিজ্ঞাসা করলাম এত সকালে কিছু খেয়েছো কি না খালি পেটে। ও না করলে দুজনে আমাদের বাড়ির পান্তা ভাত পেট ভরে খেয়ে সকালে নৌকা দিয়ে পার হয়ে ওয়াপদার বাঁধের চালা নামক স্থানে যেখানে বঙ্গবন্ধুর জন্য ছোটখাটো মঞ্চ বানানো হয়েছে সেখানে গেলাম। দেখি শুধু আমরা দুজনেই নয় আমাদের মতো আরও দুচারজন এসেছে। যাক আস্তে আস্তে সময় গড়ায় সকাল দশটার মধ্যে ওয়াপদার বাঁধে হাজার হাজার মানুষ সবই বঙ্গবন্ধুকে দেখবার জন্য। প্রায় ২০/৩০ হাজার মানুষ। সময় যায় বঙ্গবন্ধু আসে না, ১২টা ১টা ২টা, ৩টা, ৪টা বেজে যায় বঙ্গবন্ধু আসেন না মানুষের মধ্যে চরম উত্তেজনা অবশেষে বেলা ডোবার অল্প আগে সিরাজগঞ্জ থেকে জিপ নিয়ে বঙ্গবন্ধু এলেন। হাজার হাজার মানুষের মধ্যে বঙ্গবন্ধু, আমরা চার পাঁচজন জিপের সাথে রইলাম, যাতে কোনও পাগল বা উন্মাদ কোন দুর্ঘটনা না ঘটায়। আমি বঙ্গবন্ধু কে বললাম লিডার আপনার আসবার কথা সকাল দশটায় লোকজন ভোর থেকে অপেক্ষা করছে, এখন বিকাল শেষ, এত দেরি করে এলেন অনেক লোক খুব রাগ করেছে। জবাবে বঙ্গবন্ধু বললেন– 'তুই থাম, আমি দেখছি" বঙ্গবন্ধুকে মঞ্চে তোলা হলো। ঐ সময়ের ছাত্র লীগ নেতা আজকের সোহাগপুর গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, সাবেক

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতা স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমার মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার জনাব সাইদুর রহমান সাহেব সেই বিশাল সমাবেশে একমাত্র স্বাগত বক্তব্য রাখেন। এরপরেই বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা শুরু করলেন এই বলে যে "ভাইসব বাবলুর কাছে শুনলাম আপনারা আমার উপর রাগ করেছেন, আমার আসবার কথা বেলা দশটায় এলাম বিকাল ৫টায়, স্বাভাবিক ভাবেই আপনাদের রাগ হবার কথা, কিন্তু এই দেরির জন্য আমি দায়ী নই। এখানে সকাল দশটার মধ্যে আসবো বলে কাল সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে রওনা দিয়েছি, কিন্তু রাস্তার মধ্যে লোকজন আমার আসা যাবার খবর পেলে আমাকে থামায়, আমাকে দেখতে চায়, আমার কথা শুনতে চায় তারা আমাকে ভালো বাসে। আপনারাই বলুন যারা আমাকে ভালোবাসে, তাদের ডাকে সাড়া না দিয়ে তাদের সাথে দেখা না করে দু'চারটি কথা না বলে চলে আসা কি ভালো?" আপনারা কি বলেন? হাজার হাজার জনতা উত্তরে বলেন না-না। তখন বঙ্গবন্ধু বলেন "এরপরেও কি আমার উপর আপনাদের রাগ আছে?" জনতা উত্তর দেয় না, না। হাজার হাজার মানুষ মুহূর্তের মধ্যে আবার বঙ্গবন্ধুর ভক্ত হয়ে গেল।

এরপর বঙ্গবন্ধু রাজনীতি ও বন্যা নিয়ে বক্তৃতা দেন। এবং বক্তৃতা শেষ করেন এই বলে যে "এখানে আমার বাবলু আছে- আপনাদের কোনও সময়ে কোনও অসুবিধা হলে ওর কাছে যাবেন, বাবলু আমাকে তা জানাবে, জয় বাংলা" আজ শ্রদ্ধায় ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যাই বেলকুচি থানায় কত লোক, অথচ প্রায় ৩০ হাজার জনতার সামনে আমার নাম কত আস্থার সাথে তিনি বললেন। বঙ্গবন্ধুর এই বক্তৃতার প্রায় ২০ বছর পর ১৯৯০ সন পর্যন্ত বেলকুচি কামারখন্দের হাজার হাজার মানুষ আমাকে শেখ মজিবরের দলের বাবলু বলে পরিচয় দিতেন।

বঙ্গবন্ধু বেলকুচির চালার অনুষ্ঠান শেষ করে চৌহালী থানার দিকে দীঘলকান্দি স্কুলের দিকে গেলেন চালা থেকে প্রায় ১৫/২০ মাইল দূরে। আজ এই লেখা লিখতে গিয়ে ভাবি ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু কি শারীরিক পরিশ্রম করেছেন রাজনীতির জন্য, ঐ সময়ে ওয়াপদার বাঁধ কাঁচা ছিল, আজকের মতো পাকা রাস্তা নয়, উচু নিচু গাড়িতে যাবার সময় ধাক্কা আর ধাক্কা। সেই রাস্তা দিয়ে জিপযোগে সিরাজগঞ্জ থেকে প্রায় ৪০ মাইল পথ গেলেন আবার ফিরবেন। বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা শুনে যা বুঝলাম এবং নিজের চোখে যা দেখলাম সকাল দুপুরে কোনও খাদ্য খাবার কোনও রকম সুযোগ পান নাই, তার উপরে এত শারীরিক কষ্ট মানুষের দুঃখ নিজের চোখে দেখবার জন্য তিনি এত কষ্ট করেছেন।

বঙ্গবন্ধু দক্ষিণ দিকে দীঘলকান্দি স্কুল পর্যন্ত যাবেন, চালা থেকে যেতে এবং আসতে কম পক্ষে রাত ১টা এবং সিরাজগঞ্জ পৌঁছিতে রাত ২টা। এরমধ্যে আমাদের মধ্যে আমরা যারা আমাদের তামাই গ্রামের লোক তাদের মধ্যে অনিল চন্দ্র পাল বললেন "বাবলু সারাদিন না খেয়ে, এত রোদে, বৃষ্টিতে ভিজে এত হাজার হাজার মানুষের ভিড়ে থেকে এত কষ্ট করলাম কিন্তু শেখ সাহেবকে ভালোভাবে দেখতে পেলাম না ২/১ টি কথাও বলতে পারলাম না। লোকজনতো সব চলে গেছে এখন ভীড় নেই, আকাশে খুব জোসনা আছে আলো আছে, এতই কষ্ট করলাম আর একটু কষ্ট করে যাবার সময় একটু ভালোভাবে দেখি এবং সম্ভব হলে ২/১টি কথা বলি, বাড়ির এত কাছে আসছেন, এ সুযোগ আর কোনো দিন পাওয়া যাবে না।" অনিল দা আমার সিনিয়ার, একজন কবি

www.pathagar.com

ও নেতা মানুষ, তার কথা ফেলে দেয়া যায় না। তার উপরে তিনি মনে হয় আমাদের সবার মনের কথাই বলেছেন। আমরা সবাই রাজী হই, এবং সুবর্ণ সারার এখন যেখানে বাস ষ্টেশন সেখানে অপেক্ষা করতে থাকি। সারাদিন আমরা যে কেউ কিছু খেলাম না, তা সবাই ভুলে গেলাম।

আমাদের বা বাংলাদেশের সব জায়গায় পানি উঠলে লোকজন যেখানে উচু জায়গা সেখানে ধান, খেরের পালা, গরু বাছুর ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিস রেখে দেয়। সেদিনও ওয়াপদার বাঁধে অনেক গরু বাছুর ধানের পালা খড়ের পালা ছিল। আমরা যে জায়গায় বঙ্গবন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছি সে জায়গায়। রাত ২টার দিকে একটি খড়ের পালার উপরে উঠে দক্ষিণ দিকে দেখে আমি চিৎকার করে উঠেছি যে ঐযে লিডার আসছেন দূরে গাড়ির লাইট দেখা যায়। যখন লাইট কাছে আসছে আমি তখন লাফ দিয়ে নেমেছি। এবং ঐ সময়ে আমাদের সাথে উপস্থিত বয়রা বাড়ি নামক গ্রামের ক্লাশ টেনে পড়া আমার বন্ধু আঃ হাই যেই খড়ের পালায় হাত দিয়েছে এমনি এক বিষাক্ত সাপ আঃ হাইয়ের হাতে কামড় বা ছোবল দিয়েছে। হাই "ও মারে মরলাম" বলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, সাথে সাথে আমার গায়ে একটি ১৪ টাকা দামের নতুন সার্ট ছিল তা খুলে দেই এবং তা দিয়ে ওর হাত কষে বাঁধা হয়। ঐ সময়ে একটি খুব ভালো সার্টের দাম ৫টাকা কিন্তু বিভিন্ন যায়গায় যাই তাই সখ করে ১৪ টাকা দিয়ে একটি সার্ট বানিয়েছিলাম। ১৪ টাকা তখন আমাদের কাছে অনেক টাকা।

এই সময়েই বঙ্গবন্ধু তার জীপ নিয়ে এলেন। আমাদের হাত উঁচু দেখে গাড়ি থামতে বললেন, তিনি গাড়ি থামলে বললেন "ওরে পাগলের দল কি সর্বনাশ তোরা এখনও রয়েছিস।" আমি বললাম লিডার তখন ভিড়ে আমাদের অনেকে আপনাকে ভালোভাবে দেখতে পারে নাই, একটু কথা বলতে পারে নাই, তাই আমরা এখন পর্যন্ত আছি আপনাকে ভালোভাবে দেখার জন্য, কিন্তু এই মাত্র একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, আমার বন্ধু আঃ হাই ওকে দেখিয়ে বললাম ওকে এইমাত্র সাপে কেটেছে, অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। আমার একথা শুনে বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে বলে উঠেন– "কি বললি" এবং গাড়ি থেকে নেমে হাইয়ের কাছে যান। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঐদিনের গাড়িতে ছিলেন– কোরবান আলী সাহেব, আঃ মোমেন তালুকদার, আনোয়ার হোসেন রতু, আমির হোসেন ভুলু বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'ওকে জিপে উঠা, আমি নিয়ে যাব। তখন জনাব কোরবান আলী সাহেব বলেন "লিডার এতরাতে এই ভেজাল গাড়িতে উঠায়েন না, ওকে এখানেই রেখে যান, কোন লোকাল ট্রিটমেন্ট ওরা করাবে।" সাথে সাথে বঙ্গবন্ধু খুব ক্ষেপে যান রাগ করেন এবং বলেন" "ড্রাইভার ভাই তুমি আমার সিটে এই ছেলেকে নিয়ে যাও এবং সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে ওকে ভর্তি করে দিবে। আমি এদের সাথে যাব না, আমি এখানেই ওদের সাথে থাকবো, যদি সম্ভব হয় কাল সকাল আটটার মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে যাবা, তা না হলে এরা আমাকে যেভাবে পাঠায় আমি সেইভাবে যাব।" এই বলে বঙ্গবন্ধু ওয়াপদার বাঁধ থেকে দ্রুত নিচে নেমে যান, এবং পূর্বদিকে জোসনা রাতের বন্যার পানির দিকে তাকিয়ে থাকেন।

কেউ ভয়ে সাহস করে কোন কথা বলেন না সবাই চুপ, ৫/৬ মিনিট এইভাবে থাকার পর আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে তার হাতে ধরে বলি লিডার চলেন, আপনি

www.pathagar.com

গাড়িতে উঠেন, দেখি আমরা কি করতে পারি। তিনি গাড়িতে উঠেন ওনার সিটে বসেন এবং বলেন ওকে আমার কোলে বসিয়ে দে। আমরা সর্পদংশনে অজ্ঞান, মৃত অথবা অর্ধমৃত, ১৮ বছর বয়সের আঃ হাইকে বঙ্গবন্ধুর কোলে শুইয়ে দেই। বঙ্গবন্ধু সারাদিন না খেয়ে প্রায় ৮০ মাইল কাঁচা রাস্তার জিপে জার্নি করে রাত প্রায় ২টার সময় সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন।

যাবার সময় বঙ্গবন্ধু আমাকে বলেন "বাবলু তুই গাড়ির পিছনে উঠ"। আমি বঙ্গবন্ধুকে না বলি, না লিডার আমি যাব না, আমাকে তখন ধমক দেন এই বলে "তুই আমার কথা অমান্য করতে সাহস পাস।"

তখন আমি বলি লিডার দেখছেন না আমি খালি গায়ে, আমার গায়ের গেঞ্জি ও শার্ট দিয়ে ওর হাত বেঁধে দেওয়া হয়েছে। ওর বাঁধন এখন খুললে ও নিশ্চিত মারা যাবে। খালি গায়ে কোন দিন শহরে যাওয়া যায়?

তখন বঙ্গবন্ধু নরম সুরে বললেন, "ওহ-তাই-তো" তখন আমি আমাদের গ্রামের আমার মায়ের মামা আমার নানা-ওসমান গণি সরকারের কথা বলি যে উনি আমার নানা ওনাকে নিয়ে যান। তখন বঙ্গবন্ধু জিপের পিছনে ওসমান গণি সরকারকে উঠায়ে সিরাজগঞ্জে নিয়ে যান। এরপরের ঘটনা আরও উত্তেজনাকর মহাপুরুষদের মানব সেবার দৃষ্টান্তকে হার মানায়। বঙ্গবন্ধু একজন মৃত বা অর্ধমৃত ১৮ বছরের মানুষকে কাঁচা উচু নিচু রাস্তায় ২০ মাইল পথ কোলে বসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন সিরাজগঞ্জ হাসপাতালে, হাসপাতালে গিয়ে দেখেন রাত সাড়ে তিনটা, কোন ডাক্তার নেই ডাক্তার বাসায়, বঙ্গবন্ধু তার জিপ নিয়ে নিজে ডাক্তারের বাসায় গিয়েছেন ঐ সময়ে সিরাজগঞ্জ হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ছিলেন আমাদের তামাই গ্রামের পাশের গ্রাম কাজীপুরা গ্রামের ডা. সিরাজুল হক চুনু। তিনি কয়েক বছর আগে ঢাকার পঙ্গু হাসপাতালের ডাইরেক্টর ছিলেন। ডা. সিরাজুল হক সাহেবকে বঙ্গবন্ধু তার সিরাজগঞ্জের বাসায় গিয়ে ডেকে তুলেছেন। তিনিতো বঙ্গবন্ধুকে দেখে মুর্ছা যাওয়া অবস্থা। যাইহোক তাঁকে অনুরোধ করে গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন। হাসপাতালে এসে দেখেন সাপে কাটার চিকিৎসার ঔষধ (ইনকেজশন) হাসপাতালে নেই। দোকানে আছে। বঙ্গবন্ধু ঐ শেষ রাতে আবার ঔষধের দোকানে এসেছেন, এসে দেখেন দোকান বাহির থেকে তালা মারা। পাশের এক দোকান দেখেন ভিতর থেকে বন্ধ তাদের ঘুম থেকে ডেকে তোলেন এবং ঔষধের দোকানদার কোথায় থাকেন তা জিজ্ঞাসা করেন, সেখান থেকে তাদের একজনকে সাথে নিয়ে ঔষধের দোকানদার এর বাড়ি যান এবং দোকানে এনে দুইশত পঞ্চাশ টাকা দিয়ে ২টি ইনজেকশন কিনে আবার হাসপাতালে যান। সাপে কাটা আঃ হাইকে ডাক্তার ইনজেকশন দেয়, হাইয়ের জ্ঞান ফিরলে তারপর বঙ্গবন্ধু আঃ মোমেন তালুকদারের ভায়রা মফিজ তালুকদারের বাসায় এসে রেস্ট নেন। সকাল ৯টার ট্রেন ধরে আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সকালে ট্রেনে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার দেখা হয়, এবং তখন বঙ্গবন্ধুর মুখ থেকে এসব কথা শুনি। আঃ হাইকে যখন সাপে কাটে সে রাতে বঙ্গবন্ধুকে দেখার জন্য ওয়াপদার বাঁধে আমার সাথে আরও যারা ছিলেন তারা হচ্ছে আমাদের গ্রামের গোলাম সারওয়ার, অনিল চন্দ্র পাল, নারায়ণ চন্দ্র বর্মন, ওসমান গনি সরকার, আনোয়ার হোসেন, সাবের হোসেন, জুলফিকার রফিক রঞ্জুসহ আরও বেশ কয়েকজন। এখানে যাদের নাম উল্লেখ করলাম একমাত্র ওসমান গনি সরকার মৃত্যুবরণ করেছেন। বাকী সবাই জীবিত আছেন।

www.pathagar.com

এরপরে বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার যে ঘটনাটা বেশ উল্লেখযোগ্য সেটা হচ্ছে- ২/১ মাস আগে বঙ্গবন্ধু সিরাজগঞ্জের আসেন জনসভা করার জন্য, হাজার হাজার লোক সিরাজগঞ্জ শহরে। আগের দিন জনসভা করে পরের দিন রাজশাহী এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে বঙ্গবন্ধু ঈশ্বরদী হয়ে নাটোর যাবেন। আমিও ঐ ট্রেনে বঙ্গবন্ধুর কম্পার্টমেন্টে জামতৈল রেলষ্টেশন থেকে উঠে পড়ি। জামতৈলে আমরা একটা মাইকের ব্যবস্থা করি ওবায়দুর রহমান এখানে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেন। বঙ্গবন্ধুর কম্পার্টমেন্টে থাকার সময়ে বঙ্গবন্ধু তার প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্ট থেকে অন্য যে ২/৩ জন ছিলেন তাদের একটু বাইরে যেতে বলেন, আমাকে এবং ওবায়দুর রহমানকে বসতে বলেন। সবাই বের হয়ে গেলে বঙ্গবন্ধু দরজা বন্ধ করে দেন এবং আমাকে বলেন "বাবলু তোকে একটা কাজ দিবো, তুই কাজটা করবি। কিন্তু আমি যে তোকে এই কাজ বা এই কথা বলেছি তা যেন সাবধান কেউ না জানে, গোপনীয়তা বজায় রেখে এই কাজটি করবি। আমি রাজি হলে তিনি বলেন- উল্লাপাড়া থেকে মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগীশকে আওয়ামী লীগ থেকে সামনের নির্বাচনে এম,এন,এ নমিনেশন দেব। তুই সবখানে এইকথাটি বলে বেড়াবি", আমি তখন বলি লিডার উনি না পি,ডি,এম, পন্থী আওয়ামী লীগের সভাপতি। বঙ্গবন্ধু তখন বিরক্ত হয়ে আমাকে বলেন, "সেটা আমার ব্যাপার, তোর না, তোকে যা বললাম তাই করবি, খবরদার আমার মুখ থেকে শুনেছিস তা যেন কেউ না জানে।" আমি রাজি হই এবং সিরাজগঞ্জ, পাবনা, ঢাকায় অনেক আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ কর্মীকে একথা বলি যে উল্লাপাড়া থেকে মওলানা তর্কবাগীশ আওয়ামী লীগের এম,এন,এ, নমিনেশন পাবেন। সিরাজগঞ্জের অনেক আওয়ামী নেতা এজন্য আমাকে পাগল বলেছে। কিন্তু যখন দেখা গেল তর্কবাগীশ সাহেব ১৯৭০ সনে উল্লাপাড়ায় আওয়ামী লীগের নমিনেশন পেলেন তখন তারাই আবার আমি অনেক কিছু খোঁজ খবর রাখি বলে মন্তব্য করে আমাকে সমীহ করেছেন।

এরপরে বঙ্গবন্ধুর যে ব্যক্তিগত মানবিক স্মৃতিটা আমার সাথে জড়িত রয়েছে তাও খুব গভীর। ১৯৭৪ সনে আগষ্ট মাসে আমার মাকে আমি, পি,জি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসি। ঐ সময়ে পি,জি হাসপাতালে সিট পাওয়া এক কঠিন ব্যাপার। এ ব্যাপারে তখনকার স্বাস্থ্যমন্ত্রী আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নান সাহেব বেশ সাহায্য করেছিলেন, তিনি তাঁর ব্যক্তিগত সচিবের স্বাক্ষরে পি,জির পরিচালক বরাবরে আমার মাকে ভর্তি করে নেবার জন্য সরাসরি নির্দেশ দিয়েছিলেন, ভালোভাবে কেয়ার নিয়ে চিকিৎসা করার জন্য এবং যদি প্রয়োজন হয় মন্ত্রণালয় চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করবেন বলে উল্লেখ করেছিলেন ঐ চিঠিতে। পি,জি পরিচালক নুরুল ইসলাম সাহেব মন্তব্য করেন, এত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় থেকে আর কোনও চিঠি লিখে নাই। যে জন্য আওয়ামী লীগ নেতা মান্নান সাহেবের এত ভক্ত ছিলাম, তার অনেক কারণের এটাও একটি। যাক মায়ের চিকিৎসায় পি,জি, হাসপাতালে প্রায় দুই হাজার টাকার মতো বিল হয়, আমি নিজেই বিল দিয়ে দেই মন্ত্রণালয়ে বিল পাঠাতে না করি। ঐ সময়ে ২ হাজার টাকা আজকের অনেক টাকা। তিনতলার ২৪১নং কেবিনে আমার মায়ের সিট ছিল। ২৪২নং কেবিনে ছিলেন ঐ সময়ের বাংলাদেশের শ্রম ও সমাজ কল্যাণমন্ত্রী চট্টগ্রামের জহুর হোসেন চৌধুরী। জহুর হোসেন চৌধুরী প্রবীণ

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ নেতা তাকে ভি.আই.পি রুম ১২৪ নং না দিয়ে আওয়ামী লীগে নুতন আগত মহিউদ্দিন সাহেবকে দেবার জন্য জহুর হোসেন চৌধুরী ভীষণভাবে ক্ষেপে যান। চট্টগ্রামের মানুষ ডা. নুরুল ইসলাম, যে এমন বেঈমানী করতে পারে চট্টগ্রামের জহুর হোসেন চৌধুরী প্রবীণ ব্যক্তি, প্রবীণ নেতা তা ভাবতেও পারেননি। জহুর হোসেন সাহেব ভীষণ অশালীন ভাষায় নুরুল ইসলাম সাহেবকে গালাগালি করেন ২৪২ নং কেবিনে যা যা ভাঙ্গার মতো ছিল সব নিজ হাতে ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলেন। ডা. নুরুল ইসলামকে নিজ হাতে মারার জন্য খুঁজতে থাকেন। নুরুল ইসলাম সাহেব সাময়িকভাবে পালিয়ে থেকে রেহাই পান। জহুর হোসেন সাহেব হাসপাতাল থেকে বাসায় চলে যান। এরপর মনে হয় বঙ্গবন্ধু জহুর হোসেনকে ফোনে কথা বলে ডা. নুরুল ইসলাম এর বেয়াদবির বিচার করবেন এবং মুনসুর আলী সাহেবকে পাঠানোর কথা বলেন যে, তিনি যেন চিকিৎসার জন্য ২৪২ নং কেবিনে চলে আসেন। বিকালে দেখি ক্যাপ্টেন মুনসুর সাহেবের ঘাড়ে হাত দিয়ে জহুর আহমদ সাহেব করিডোর দিয়ে হেঁটে ২৪২ নং কেবিনে এলেন। আজও দৃশ্যটি মনে হলে জহুর চৌধুরী সাহেবের জন্য খুব দুঃখ হয় ২৪২ নং কেবিনে এসে তিনি খুব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে অনেকক্ষণ চোখের পানি ফেলে কাঁদলেন। রুমে শুধু আমি, ক্যাপ্টেন মুনসুর আলী সাহেব এবং জহুর চৌধুরীর পি.এস মোহাম্মদ আলী, (সাবেক পরিচালক জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর)। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মুনসুর সাহেব আমার মায়ের ২৪১ নং রুমে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে চলে গেলেন। এই জহুর চৌধুরী সাহেবকে পি,জি, হাসপাতালে দেখবার জন্য বঙ্গবন্ধু বেশ কয়েকবার এসেছেন। যেদিন জহুর চৌধুরী সাহেব মারা যাবেন তার আগের দিন সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু, মুনসুর আলী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর ও আমি ২৪২ নং কেবিনের পাশে প্রায় ১ ঘন্টার মতো চুপচাপ বসেছিলাম, বঙ্গবন্ধু ও জনাব মুনসুর আলীর চোখ ছিল কান্নাভেজা। প্রথমে আমি দাঁড়িয়েছিলাম বঙ্গবন্ধু আমাকে একটি খালি চেয়ারে বসতে বলেন। অনেকক্ষণ কোনও কথা না বলে বঙ্গবন্ধুর সাথে চেয়ারে বসেছিলাম।

এখানে আমার মাকে এবং আমাকে নিয়ে যে মানবিক স্মৃতি তা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু জহুর হোসন চৌধুরী সাহেবকে দেখে একদিন ফিরে আসছেন পি,জির তিন তলার পশ্চিম দিক থেকে, আমি পূর্বদিক থেকে পশ্চিমে যাচ্ছি– আমার হাতে একটি টিফিন ক্যারিয়ারের বাটি তাতে আমার মায়ের জন্য সুপ কিনে নিয়ে আসছি। বঙ্গবন্ধু আমার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন– "কি ব্যাপার তোমার হাতে টিফিন ক্যারিয়ার?"

আমি জবাবে বললাম আমার মা ২৪১ নং এ ভর্তি হয়েছে।" একথা শুনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আমার মাথার ঐ সময়ে লম্বা চুল ধরে খুব জোরে দুই গালে ৪/৫ থাপ্পড় মারলেন, এবং বললেন "হারামজাদা তোমার মা সিরাজগঞ্জ থেকে এসে পি,জি, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে, আর তুমি আমাকে জানাও নাই।"

এরপর ডা. নুরুল ইসলামকে বললেন নুরুল ইসলাম খুব ভালোভাবে খেয়াল রেখে চিকিৎসা করবা খরচ পাতির জন্য চিন্তা করবা না। তখন নুরুল ইসলাম সাহেব বললেন– স্যার ঐ মহিলার গায়ে রক্ত নাই, না খাওয়া মানুষ।" তখন বঙ্গবন্ধু আবার আমার গালে দুই থাপ্পড় মারলেন জোরে জোরে 'মাকে ভাত দাও না কেন।" বেশ জোরেই আমাকে বঙ্গবন্ধু মেরেছিলেন, কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না, চোখ দিয়ে পানি এসেছিল।

www.pathagar.com

বঙ্গবন্ধু আবার আমার সাথে উল্টাপথে পশ্চিম দিকে ২৪১ নং কেবিনে গেলেন ২/১ মিনিট থেকে চলে গেলেন। আমার মা প্রায় ১ মাস পিজিতে ছিলেন, এর মধ্যে ৪ বার বঙ্গবন্ধুর বাসা থেকে ভাত এসেছে খাবারের জন্য শেখ কামাল ভাই বেশ কয়েকবার ৪/৫ দিন দেখতে এসেছিলেন। যাক বঙ্গবন্ধুর হাতে ১৯৭৪ সনে পি,জি হাসপাতালে সজোরে থাপ্পড় খেয়ে আমার চোখে জল পড়েছে– কিন্তু এর ফজিলত পেয়েছে আমার কয়েকজন নিকট আত্মীয় এবং আমাদের গ্রামের বেশ কিছু মানুষ। পি,জি, হাসপাতালের পরিচালক ডা. নুরুল ইসলামের সামনে আমাকে বঙ্গবন্ধু মেরেছিলেন এটা নুরুল ইসলাম সাহেব খুব কাছে থেকে দেখেন ফলে ১৯৭৪ সন থেকে ১৯৮৪ সন পর্যন্ত নুরুল ইসলাম যতদিন পি,জির পরিচালক ছিলেন আমি কোনও রোগী পি,জি হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে ফিরে আসি নাই। কোনও রোগী আমি নুরুল ইসলাম সাহেবের কাছে নেবার সাথে সাথে রোগীর নাম লিখে আর এস, অ্যাডমিট লিখে স্বাক্ষর করে দিতেন। বঙ্গবন্ধু যদি নুরুল ইসলাম সাহেবের সামনে আমাকে এভাবে না মারতেন তবে কোনোদিন এভাবে পি,জি, হাসপাতালে রোগী ভর্তি করাতে পারতাম না। কমপক্ষে ২০ জন অসহায় দুঃখী রোগী আমার দ্বারা নুরুল ইসলাম সাহেব ভর্তি করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর সাথে আমার অনেকবার দেখা হয়েছে কিন্তু এরমধ্যে যে কয়টি আমার বিচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা এই লেখায় উল্লেখ করলাম।

(যদি কেউ ভগবান শিবের কথা বলতে যান, তবে তাকে শিবের আশেপাশের নন্দীদের কথাও বলতে হয়। আর সেজন্য এ লেখাতেও বঙ্গবন্ধুর কথা বলতে গিয়ে তাঁর আশেপাশের অনেকের কথা স্বাভাবিকভাবেই বলতে হয়েছে।)

৪/৯/২০০৮, সকাল ৬টা থেকে বেলা ১২টা।
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

স্মৃতির পাতায় শ্রদ্ধেয় জননেতা মওলানা ভাসানী

শ্রদ্ধেয় জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম ১৮৮০ সালে, মৃত্যু ১৯৭৬ সনের নভেম্বর মাসের ১৭ তারিখে। এই হিসেবে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রায় ৭৬ বছর বাংলা ও আসামের রাজনৈতিক গগনে দেদীপ্যমান বা জলন্ত সূর্য হিসাবে বিরাজ করেছেন। ১৯৭৬ সন থেকে তার আগে প্রায় ৭৬ বছর মওলানা ভাসানী বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদদের মধ্যে প্রধানতম প্রাণ পুরুষ। শেরে বাংলা ফজলুল হক ঐ সময়ের (১৮৭৬ থেকে ১৯৬২) কিন্তু আসামে মনে হয় ফজলুল হক সাহেবের তেমন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না। সোহরাওয়ার্দী সাহেব অবাঙালি এবং রাজনৈতিক পদের জন্য উগ্রভাবে লালায়িত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের বাংলার অন্যতম প্রধান ব্যক্তি, ১৯৪৭ বাংলা ভাগ হলে এম, এল, এ, দের ভোটে খাজা নাজিম উদ্দিন এর কাছে হেরে পাকিস্তানের মায়া ত্যাগ করে পশ্চিম বাংলার বিধান সভায় যোগদান করে ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং পশ্চিম বাংলার বিধান সভার বিরোধী দলের নেতা হিসেবে সুবিধা করতে না পেরে পূর্ব বাংলায় আগমন করেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে, আবার আইনমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ ইত্যাদি অনেক ঘটনা সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিত্বহীন বা পদলোভী রাজনীতির দৃষ্টান্ত। ফজলুল হক সাহেবেরও এমন দৃষ্টান্ত আছে, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী আবার পূর্ব পাকিস্তানে এসে মুসলিম লীগ সরকারের অধীনে ঢাকা হাইকোর্টে সামান্য এ্যাডভোকেট জেনারেলের চাকুরি নেন। কিন্তু মওলানা ভাসানীর এমন পদলোভী ঘটনার কোন সামান্যতম দৃষ্টান্ত নাই। বেশ কিছু প্রবীন লোকের কাছে শুনেছি মওলানা ভাসানীর প্রধানতম পেট্রোনাইজার ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। এ কথা আমার বিশ্বাস হয় যে, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের সমর্থন না পেলে মওলানা ভাসানীর পক্ষে এমন উচ্চপর্যায়ের জাতীয় নেতা হওয়া সম্ভব ছিল না। তার পরেও বলতে চাই সে শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী এই তিনজনের মধ্যে মওলানা ভাসানীই ছিলেন অবিভক্ত বাংলার ও আসামের বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে কাছের, প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় নেতা। মওলানা ভাসানী বাঙালী মুসলিম গরিব ও সাধারণ মানুষের অতি আপনজন ছিলেন। তার জনসভায় সব সময় তখনকার বিশাল পল্টন ময়দান লোকে ভরে যেতো। রাজনীতিতে তার একটি একান্ত নিজস্ব ষ্টাইল ছিল। মানুষের সাধারণ সমস্যা ছিল তাঁর রাজনৈতিক বক্তৃতার প্রধানতম বাহন। আচার ব্যবহারে একজন সত্যিকারের নেতা, তাঁর কাছে যারা গিয়েছেন, তাঁকে যারা দেখেছেন তাঁরা কোনওদিন মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে ভুলতে পারবেন না। একটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে যেখানেই দেখতেন সেখানেই তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়তেন। এমনকি বঙ্গবন্ধু যখন ১৯৭৫ সনের মে মাসে টাঙ্গাইলের সন্তোষে যান তখন তিনি প্রেসিডেন্ট ও এক

www.pathagar.com

দলীয় বাকশাল সরকারের প্রধান। লক্ষ লোকের সামনে সেদিনও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মওলানা ভাসানীর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসেছিলেন। এ থেকেই নতুন প্রজন্মের পাঠক পাঠিকারা বুঝতে পারবেন মওলানা ভাসানী কত বড় মাপের নেতা ও মানুষ ছিলেন। বাংলা ও আসামের প্রায় প্রতিটি গ্রামের নাম তাঁর মুখস্থ ছিল, বাংলা আসামের প্রতিটি গ্রামের দু-এক জন মানুষের সাথে তার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল, তাদের নাম বলতে পারতেন সঠিকভাবে, অসাধারণ তাঁর স্মৃতিশক্তি।

এই মহান নেতার সাথে আমার প্রথম দেখা হয় ও কথা হয় ১৯৭১ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারিতে রাত ৮টার দিকে টাঙ্গাইল জেলার সন্তোষে তাঁর বাড়িতে। ১৯৭১ সনের ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারিতে মওলানা ভাসানী সন্তোষে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার জন্য বিরাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই অনুষ্ঠানে দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত করেছেন তিনি। ১৯৭১ সনের ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারির ঐ অনুষ্ঠানের সন্তোষে যারা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে আজ (০৯-১১-২০০২ তারিখ) যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন জনাব ও বেগম আবুল হাশিম সাহেব, কাজী মোতাহার হোসেন, শিল্পাচার্য্য জয়নুল আবেদীন, সাহিত্যিক শাহেদ আলী, শহীদ আলতাফ মাহমুদ, শিল্পী ফেরদৌসি রহমানসহ অনেকে। সন্তোষে ঐ দুই দিন দেশের বহু শিক্ষিত পণ্ডিত এবং শিল্পী সাহিত্যিকদের সমাবেশ হয়েছে। ১৯৭১ সনে আমার বয়স ১৭ বছর। আমিও সৌভাগ্যবান যে সন্তোষের ঐ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞাণীগুণী সমাবেশে যোগদান করেছিলাম এবং মওলানা ভাসানীসহ উপরে উল্লেখিত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার ও পরিচিত হবার সুযাগ পেয়েছিলাম।

মজিবুর রহমান বিশ্বাস (ছদ্মনাম ভবঘুরে) সিরাজগঞ্জ জেলার জামতৈল ধোপাকান্দি হাইস্কুলের একজন প্রবীণ শিক্ষক ১৯৭১ সালে। জামতৈল আমাদের বাড়ি তামাই থেকে তিন মাইল দূরে এবং আমাদের রেল স্টেশন। মজিবর রহমান বিশ্বাসের বাড়ি ঈশ্বরদী লক্ষ্মীকুণ্ডায়। তিনি একজন লেখক ও কবি। পঞ্চাশ দশকে তিনি বেশ কয়েক বছর রাজনৈতিক কারণে জেল খেটেছেন। বই কিনে, বই পড়ে, বই লিখে, বই প্রকাশ করে মজিবুর রহমান বিশ্বাস দিওয়ানা বা দেওলিয়া। জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি। আমাদের তামাই গ্রামের গোলাম সারোয়ার, তামাই হাই স্কুলের শিক্ষক, রইছ উদ্দিন ভূঁইয়া, বেলকুচি কলেজের বাংলার অধ্যাপক, অনীল পাল, তামাই গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষক, জুলফিকার রফিক রঞ্জু ময়মনসিংহের গৌরিপুর অথবা ফুলপুর কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ও আমার সাথে ভালো পরিচয় ও সম্পর্ক ছিল মজিবুর রহমান বিশ্বাসের। ১৯৭১ সনের ২৫শে ফেব্রুয়ারি তিনি আমাদের গ্রামে এসে উপরে নাম বর্ণিতদেরসহ আমকে বললেন- 'সন্তোষে মওলানা ভাসানী ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করবেন, দেশের অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি সেখানে সমবেত হবেন, আমি যাচ্ছি তোমরা চল। উপরে বর্ণিত আমরা সবাই তখন ছাত্র এবং ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভক্ত। তাছাড়াও এত দূরে যাওয়ার টাকা পয়সার ব্যাপার আছে, শারীরিক পরিশ্রম আছে। অন্যরা কিছুতেই রাজি হলো না তারা সবাই আমাকে বেশ অনুরোধ করলো মজিবর

www.pathagar.com

স্যারের সাথে টাঙ্গাইলের সন্তোষে যেতে। যাই হোক আমি স্যারের সাথে রওনা দিলাম টাঙ্গাইলের সন্তোষের উদ্দেশ্যে মওলানা ভাসানীর ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য। সকাল আটটার দিকে আমাদের গ্রাম তামাই থেকে স্যারের সাথে রওনা দিলাম পায়ে হেঁটে। সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই গ্রাম থেকে সন্তোষের দূরত্ব কমপক্ষে চল্লিশ মাইল। ফেব্রুয়ারি মাস যমুনা নদীর পানি কমে গিয়েছে লঞ্চ চলে না। তামাই থেকে সোহাগপুর চার মাইল, এটা আমাদের সব সময় হাঁটা হয়। এটা হাঁটা কোনও ব্যাপার নয়। বেলকুচি থানার থানা অফিস ও আমাদের প্রধান হাট সোহাগপুর। সোহাগপুর থেকে তিন/চার মাইল যমুনা নদীর চর দিয়ে হেঁটে গিয়ে নৌকা ভাড়া করে নৌকায় উঠলাম বেলা এগারটার দিকে। নৌকা বেলা চারটার দিকে এক জায়গায় নামিয়ে দিল। সেখান থেকে পাঁয়ে হেঁটে যেতে হবে সন্তোষ। বেলা চারটার সময় হাঁটা শুরু করলাম আমরা দুইজনে যমুনার চরের মধ্য দিয়ে, নতুন গজিয়ে উঠা ছোট ছোট গ্রামের পাশ দিয়ে। সাতটার মধ্যে অন্ধকার নেমে এল। পেটের ক্ষুধার জ্বালায় ও এত হাঁটার কষ্টে আমি খুব ভেঙ্গে পড়ি এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করি এবং আমাকে নিয়ে আসার জন্য স্যারকে গালাগালি করি। সকালে তিন ঘন্টা হেঁটে নৌকায় উঠি আবার চারটা থেকে হেঁটে রাত আটটায় সন্তোষ পৌঁছি। আজও বেশ মনে পড়ে যখন অগ্রহায়নের শীতের মধ্যে সন্ধ্যা রাতের অন্ধকারে যমুনার চর দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে মুজিবর স্যারের সাথে হেঁটে আসছি তখন চরের বাড়ি ঘর থেকে বেশ কয়েকজন লোক আমার কান্না শুনে সমবেদনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আহারে বাবারে কে মারা গিয়েছে, বাপ না মাও।

সন্তোষ এসেই প্রথমেই মজিবর স্যার মওলানা ভাসানীর কাছে যান আমাকে নিয়ে, তাঁকে মওলানা সাহেব ভালোই চিনতেন, আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তামাই আমার বাড়ি এ কথা শুনে তিনি তামাই গ্রামের হাজী আবুদল মজিদের কথা জিজ্ঞেস করে বললেন যে তিনি তাঁর বন্ধু। আমি বললাম তিনি আমার মায়ের খালু। এই পর্যায়ে মজিবর স্যার হুজুরকে বলেন যে “বাবলু ফুপায়ে ফুপায়ে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে ওকে কিছু খিচুরি বা খাবার দেওয়া দরকার”। এই পর্যায়ে ভাসানী হুজুর মজিবর স্যারকে ধমক দিলেন ও বললেন “তোমার অনেক বয়স হয়েছে কিন্তু এখনো আক্কেল হয় নাই, ও আমার বন্ধু মজিদ হাজির আত্মীয় কোন বংশের ছেলে তা আমি বুঝতে পারছি। ওকে খিচুড়ি দেওয়ার জন্য তুমি আমাকে কোন সাহসে বলো? কি খাওয়াতে হবে আমি জানি।” তখন হুজুর আমাকে বললেন “বাবা তুমি ভাল বংশের ছেলে, তোমাকে চার নাম্বার রুমে যারা আছে তাদের খেদমতগার নিয়োগ করলাম। তুমি তাদের রুমে থাকবে, খাবে এবং তাদের খেদমত বা সেবা করবে। খবরদার উনারা অনেক সম্মানিত ব্যক্তি তাদের ভালোভাবে খেদমত করবা বংশের মান সম্মান যেন নষ্ট করো না।” একজন লোক দিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের ছাত্রাবাসের চার নাম্বার রুমে পাঠালেন আমাকে ঐ রুমে যারা আছেন তাদের খেদমতগার বা সেবক হিসাবে। ঐ রুমে গিয়ে পরিচিত হলাম জনাব ও বেগম আবুল হাশিম সাহেবের সাথে, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সাথে, ড. কাজী মোতাহার হোসেনের সাথে, সাহিত্যিক শাহেদ আলী

www.pathagar.com

সাহেবের সাথে। যিনি নিয়ে গেলেন তিনি বললেন এই আপনাদের দেখাশোনা করবে হুজুর একে পাঠিয়েছেন। দেখাশোনা মানে হাত মুখ ধোয়া, অজু করা, পায়খানায় যাওয়ার জন্য বদনাতে পানি এনে দেওয়া, কেউ টয়লেট গেলে তাঁর সাথে যাওয়া, ভোরে মর্নিংওয়াকে সাথে যাওয়া, খাবার তুলে দেওয়া, আবুল হাশিম সাহেবের হুক্কার কলকিতে তামাক, কয়লা ও আগুন দিয়ে দেওয়া এ সব।

উপরে বর্ণিত সবার নামের ও কাজের সাথে আমি ভালোভাবে পরিচিত ছিলাম উনাদের এত কাছে পেয়ে ভীষণ খুশি হলাম। এর অল্প পরেই টের পেলাম "কষ্ট করলে কেস্ট মেলে" এ কথার। কারণ কিছুক্ষণ পরেই ওনাদের খাবারের জন্য যা আনা হলো তা দেখে আমি থ হয়ে গেলাম, এবং ঐ সতের বছরের জীবনে প্রথম এত উন্নতমানের খাবারের সাথে পরিচিত হলাম। সুগন্ধী কাটারীভোগ চাউলের ভাত, ঘি দিয়ে আলু ও বেগুন ভাজি, খাসি ও মুরগির মাংসের তিন/চার রকমের রান্না, আইড় মাছ, বড় চিংড়ি মাছ, বড় পাবদা মাছ, কই মাছ এবং সবচেয়ে উন্নতমানের খির খাসা দই। ওনাদের খাইয়ে আমি জীবনের প্রথম এত উন্নত মানের খাওয়া পেট ভরে খেয়ে ঐ রুমেই ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে নামাজ পড়ার জন্য অজুর পানি দিলাম। নামাজ পড়ে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব সন্তোষে আমাকে নিয়ে মর্নিংওয়াকে বের হলেন। মর্নিংওয়াকে উনি একটি গাছ দেখেন আর ঐ গাছের নাম বলেন তার ইতিহাস ও বৃত্তান্ত আমাকে শোনান আমি তার বৃক্ষ সম্বন্ধে জ্ঞান দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ২৬ ও ২৭ শে ফেব্রুয়ারি আলোচনাসভা ও বক্তৃতা হলো। ২৭শে ফেব্রুয়ারি রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলো। শহীদ আলতাফ মাহমুদ, ফেরদৌসি রহমানসহ অনেকেই গান গাইলেন। ও পদ্মার ঢেউরে নজরুল ইসলামের গানটি ফেরদৌসি রহমান গান, মওলানা ভাসানী ঐ গানটি ফেরদৌসি রহমানকে তিনবার গাইতে বলেন এবং শুনেন। মওলানা ভাসানী ১৯৭১ সনের ২৬শে ফেব্রুয়ারি রাতে নিমন্ত্রিত অতিথিদের ঢোলের বাজনা শোনান ও শুনেন। আজ পর্যন্তও আমার ঐ ঢোলের বাজনা কানে বাজে এমন পাগল করা ঢোলের বাজনা এ পর্যন্ত আর কোনোদিন শুনি নাই। ওখান থেকেই আমার সাথে জনাব ও বেগম আবুল হাশিম, শিল্পাচার্য্য জয়নুল আবেদীন, কাজী মোতাহার হোসেন ও শাহেদ আলী সাহেবের সাথে খুবই ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠে। আমৃত্যু তাঁরা আমাকে খুবই স্নেহ করেছেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারি সকালে আবার প্রায় চল্লিশ মাইল পথ পাঁয়ে হেঁটে ও নৌকায় চড়ে যমুনা নদী পাড়ি দিয়ে আমার গ্রাম সিরাজগঞ্জ জেলার তামাইতে ফিরে আসি। তবে ফিরে আসবার সময় যাবার সময় এতো কষ্ট অনুভব করি নাই, এত সুন্দর অনুষ্ঠান মওলানা ভাসানীসহ এতো গুণী লোকের সাথে পরিচয়, এত উন্নত মানের খাওয়া তাঁর জন্য। ঐ অনুষ্ঠানে যাওয়া আসার সময় বিশাল যমুনা নদীকে যেভাবে দেখার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছি তাও মনে দাগ কাটার মতো ঘটনা।

দ্বিতীয়বার মওলানা ভাসানীকে দেখি ও কথা বলি পি,জি হাসপাতালে স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে। আমি তাঁকে দেখতে যাই যখন তখন পি,জি হাসপাতালের করিডোর দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভাসানী হুজুরকে দেখে ফিরে আসছেন। বঙ্গবন্ধুর সাথে করিডোরে আমার দেখা ও কথা হয়। আমি ভাসানী

www.pathagar.com

হুজুরের রুমে গিয়ে দেখি রাশেদ খান মেননসহ অনেকে রয়েছেন। হুজুর আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। অনেক কথা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি জবাব দিলাম। এক পর্যায়ে মেনন সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন "হুজুর প্রধানমন্ত্রী আপনাকে কি বলে গেল", হুজুর জবাব দিলেন "যাই বলে যাক তা শুনে তোমার কাজ কি" মজিবর তোমাদের মতো চোর না। ও আমার সেক্রেটারি ছিল কাজ দিলে কাজ করতো কোনোদিন পয়সা চায় নাই। তোমরা কোনও কাজ দিলে আগে পয়সা চাও তারপরে কাজ, সে পয়সার অর্ধেক কাজের জন্য খরচ কর।" উপস্থিত সবাই এ কথা শুনে খুব হাসলেন।

এরপরে মহান নেতা মওলানা ভাসানী হুজুরের সাথে আমার দেখা হয় ১৯৭৩ সনের ১৪ই নভেম্বর। আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। বাড়ি থেকে ঢাকায় আসছি আমাদের রেলস্টেশন সিরাজগঞ্জ জেলার জামতৈল থেকে প্রথম শ্রেণীতে ট্রেনে উঠেছি বিকালে রাজশাহী মেলে, জামতৈলের উত্তরে ছোট লম্বা দুইটি ষ্টেশন কালিয়া হরিপুর ও রায়পুর তারপরেই সিরাজগঞ্জ সদর বা বাজার রেলস্টেশন। ঐ দিন ১৪ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জে মওলানা ভাসানী জনসভা করেছেন। জনসভা শেষ করে হুজুর ঢাকায় আসবেন, বহুলোক স্লোগান দিয়ে সিরাজগঞ্জ বাজার স্টেশনে হুজুরকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন, প্রথম শ্রেণীর আমার সামনের কামরায়। আমি চিৎকার করে বলি হুজুর আমি এইখানে এই কোম্পার্টমেন্টে সিট খালি আছে এখানে আসেন। হুজুর আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন ও তখনকার বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আতিকুর রহমান সালুকেসহ আমার কম্পার্টমেন্টে চলে এলেন। কম্পার্টমেন্টে এসেই হুজুর বললেন "এবার সিরাজগঞ্জে এসে বাবার কবর জিয়ারত করে গেলাম, অনেক দিন যাবত বুকের উপরে জগদ্দল পাথর চাপা পড়েছিল, আজ বুকটা হালকা হলো। বুকের উপর থেকে পাথর নেমে গেল, বাবার কবর জিয়ারত করেছি, অনেক দিন পরে। যাবার সময় তোমাকে সাথে পেলাম খুব ভাল"। আতিকুর রহমান সালু সাহেব ও আমি ভাসানী হুজুরসহ সিরাজগঞ্জ ঘাটে ট্রেন থেকে নেমে স্টিমারে উঠলাম। হুজুর প্রথম শ্রেণীর স্টিমারের কক্ষে গেলেন না। তিনি ছাদের উপরে বিছানার চাদর পেতে বসে পড়লেন, রাত দশটার দিকে স্টিমার ছাড়লো, বেশ কিছু লোক হুজরের চারদিকে তাঁকে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে গিয়ে বসে রইলেন। কিন্তু কেউ উনার সাথে কথা বলতে সাহস পেলেন না। একমাত্র আমিই রাত দুটো পর্যন্ত স্টিমার জগন্নাথগঞ্জের ঘাটে আসা পর্যন্ত কথা বললাম তর্ক-বিতর্ক করলাম। চার ঘন্টা মহান নেতা মওলানা ভাসানীর সাথে কথা বললাম তর্ক করলাম আমার জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্যজনক অধ্যায়। স্টিমারের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ট্রেনের একটি অতিরিক্ত টিকিট ক্রয় করলাম আমার টাকায় এবং একটি চার বার্থের কম্পার্টমেন্ট রিজার্ভ করলাম কেননা আমরা তিনজন মওলানা ভাসানী, আতিকুর রহমান সালু ও আমি, কম্পার্টমেন্টে বার্থ থাকে চারটি তাই অন্যকোনও লোক যাতে আমাদের কম্পার্টমেন্টে না আসে তাঁর জন্য। স্টিমারে হুজুরকে কিছু খাওয়ার জন্য বারবার আমি অনুরোধ করি কিন্তু কিছুই খেলেন না। জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে আমরা আমাদের রিজার্ভ করা ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লাম রাত দুটার দিকে। হুজুর নিচের বার্থে আতিকুর রহমান সালু ও আমি কম্পার্টমেন্টে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে উপরের দুটি

www.pathagar.com

বাথে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছেড়ে দিল আমরা ঘুমাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাসানী হুজুরের জন্য আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। এবং ময়মনসিংহ বা গফরগাঁও রেলস্টেশন পর্যন্ত হুজুরের সাথে ঝগড়া করতে করতে আসি। একটি ষ্টেশন আসে আর ষ্টেশনের যাত্রীরা দরজা খোলার জন্য দরজায় শব্দ করে, হুজুর গিয়ে দরজা খুলতে যান, আমি নিচে নেমে হুজুরের সামনে বাধা দেই এই বলে যে-এটা আমরা রিজার্ভ করেছি এখানে আর কারো উঠবার অধিকার নেই, আর এটা প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্ট যারা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী তাদের জন্য কম্পার্টমেন্ট নির্দিষ্ট আছে তাঁরা সেখানে যাবে। এখানে যারা আসে তাঁরা বিনা টিকেটের বা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী। এইভাবে কথা বলতে বলতে ট্রেন ছেড়ে দেয় বাহির থেকে কেউ উঠতে পারে না। আবার অন্য স্টেশনে ট্রেন দাঁড়ায় আবার একই ঘটনা ঘটে। হুজুর কামরায় দরজা খুলতে যান আমি বাঁধা দেই। শেষ পর্যন্ত দেখি ভোররাত হয়েছে, হুজুরের গালাগালি আমার প্রতি তীব্রতর তখন আমি আর বাঁধা দেই না। আমাদের কম্পার্টমেন্টে লোক ভরে যায়। ঢাকায় এসে নামলাম সকাল আটটার দিকে। সে দিন সাধারণ মানুষের প্রতি ভাসানী হুজুরের দয়ামায়া দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি, যদিও আমি তাঁর দরজা খোলার বিরোধিতা করেছি। ভাসানী হুজুর সারারাত বসেছিলেন, ওজিফা বা তছবিহ গুনে সর্বক্ষণ আল্লাকে ডেকেছেন একটুকুও ঘুমান নাই। ঐ রাতে সুফী, সাধক, পীর, দরবেশ মওলানা ভাসানীর পরিচয় পেলাম।

এরপর হুজুর পি,জি হাসপাতালে মৃত্যুর আগে আরো বেশ কয়েকবার ভর্তি হয়েছেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্র। প্রতিবার পি,জি হাসপাতালে এক/দুই দিন পরপর হুজুরকে দেখতে গিয়েছি। অনেক তর্ক করেছি অনেক কথা বলেছি, অনেক সম্মানিত লোকের সাথে পরিচিত হয়েছি হুজুরের সাথে দেখা করতে গিয়ে; যা আমার জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এরপর মওলানা ভাসানী হুজুরের সাথে আমার এককভাবে বেশ লম্বা সময় দেখা ও কথা হয় ১৯৭৪ সনের বন্যার সময়। আমি আমার বাড়ি থেকে সেবার সোহাগপুর হয়ে লঞ্চে চারাবাড়ি ঘাটে এসে সেখান থেকে টমটমে টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল থেকে বাসে ঢাকা আসি। চারাবাড়ি ঘাট থেকে টাঙ্গাইল আসতে ভাসানী হুজুরের সন্তোষের বাড়ির উপর দিয়ে টাঙ্গাইল শহরে আসতে হয়। আমরা টমটমে ছিলাম মোট আটজন এর মধ্যে ছয়জন পথিক আমার অপরিচিত একজন আমার সাথে আমার আত্মীয় ক্লাস সেভেনের ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের ছাত্র। ঢাকা কলেজে ঐ সময়ে দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিনের সাহেবের ছেলে সাদী (এখন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী)। ভাসানী হুজুরকে তখন ১৯৭৪ সনে মার্চ মাসে বাইতুল মোকাররম থেকে ধরে নিয়ে সন্তোষে তাঁর বাড়িতে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে পুলিশ পাহারায়। আসবার সময় দেখি একেবারে ভাসানী হুজুরের ছনের ঘরের পাঁচ/দশ হাত দূর দিয়ে টমটম চলছে, আমি টমটম বা ঘোড়ারগাড়ি একটু থামাতে বললাম, ভাসানী হুজুরের সাথে একটু দেখা করার জন্য। টমটম থামালে সাদীকে নিয়ে মওলানা ভাসানীর ঘরে গেলাম। হুজুর আমাকে দেখে খুশি হয়ে বললেন খুব খুশি হলাম তোমাকে দেখে,আরও বেশি খুশি হলাম তুমি বাড়ি যাও তা দেখে, মুসলমানের ছেলেরা মেট্রিক পাশ করে কলেজে ভর্তি হয়ে আর গ্রামে যেতে চায় না, গ্রাম ভুলে যায়, মা বাবাকে ভুলে

www.pathagar.com

যায়, কিন্তু হিন্দুরা তা করে না, হিন্দুরা নিয়মিত গ্রামের বাড়িতে আসা যাওয়া করে, মা বাবার সেবা করে। তিনি খুব আদর করলেন পাকা সুস্বাদু, পেঁপে ও মুড়ি খেতে দিলেন। এদিকে টমটমের লোকেরা ডাকাডাকি করছেন প্রথমে আমি বাইরে এসে একটু সময় চেয়ে নিই, এরপর আবার ডাকাডাকি। এরপর হুজুর বাইরে এসে বিরাট ধমক, কিছুক্ষণ পর আবার ডাকাডাকি অগত্যা ঐ টমটমওয়ালাকে আমাদের দুই জনের টাঙ্গাইল শহর পর্যন্ত ভাড়া দিয়ে ছেড়ে দিই। হুজুর ভাত না খেয়ে আসতে দিবেন না। আমি না করি হুজুর ধমক দেন "একটি সেভেনে পড়া কচি বয়সের ছেলেকে নিয়ে আমার বাড়িতে এসে ভাত না খেয়ে চলে যেতে চাও তুমি কোন সাহসে? তুমি আমার কথা অমান্য করতে চাও? ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ করে বেয়াদব হয়ে যাচ্ছো।" অগত্যা আমরা দুইজনে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে হুজুরের সাথে কথা বলে সময় কাটাই। ভাত রান্না হলে বড় বড় কই মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে অন্য টমটমে চড়ে রওয়ানা দিলাম। সাদী পরবর্তী পর্যায়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেভেনে পড়ার সময়ে মওলানা ভাসানীর ঐ দিনের ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সাদী বামপন্থী রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ে। সাদী এখন অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী। ওর বড় ভাই মো. মহসিন ওরফে রুমি ঢাকা ওয়াসার একজন নির্বাহী প্রকৌশলী। বর্তমানে জাপানে রয়েছে ট্রেনিংয়ে, যার জন্য সাদীর ভাল পুরো নাম লিখতে পারলাম না। ঐ দিনও প্রায় দুই/তিন ঘণ্টা গৃহবন্দি মহান নেতা মওলানা ভাসানীর সাথে একান্তভাবে অনেক কথা বলি।

পি,জি হাসপাতালে কয়েকবার ভাসানী হুজুরের সাথে দেখা করার বর্ণনা আমার ডাইরিতে লেখা আছে। ২০০৩ সনের ১৭ই নভেম্বর তা নিয়ে আলাদা আরও একটি মওলানা ভাসানী হুজুরকে নিয়ে লেখা লিখে প্রকাশ করার ইচ্ছা রইল। ১৯৭৬ সনের ১৭ই নভেম্বরের দুই/তিন দিন আগে এই মহান নেতার সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৯ নম্বর কেবিনে আমার শেষ দেখা হয়। সেদিন আমি তাঁর সাথে খুব তর্ক ও রাগারাগি করে আসি, এই জন্যে যে তিনি ১৯৭৭ সনের ২৭শে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য পিছিয়ে দেবার জন্য সায়েম/জিয়া সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। আমি তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধিতা করি, বেশ তর্ক হয়। সিকুরিটির লোকজন আমাকে ৯ নাম্বার কেবিন থেকে জোর করে বের করে দেয়। তাঁরা আমাকে বেশ তিরস্কার করেন এমন বয়োবৃদ্ধ অসুস্থ রুগীর সাথে তর্ক করার জন্য। ঐসময় কেউ হুজুরের সাথে দেখা করার সুযোগ পায় নাই, আমি আমাদের গ্রামের পাশের গ্রামের চৌবাড়ী অথবা রসুলপুর গ্রামের একজন সিকিউরিটি বা পুলিশের লোক পাই যিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৯ নম্বর কেবিনে ডিউটিরত। আমার বাড়ি তামাই এ কথা শুনে সে ভিতরে গিয়ে হুজুরকে আমার নাম বলে, যার জন্য আমি দেখা করার সুযোগ পাই।

১৯৭৬ সনের ১৭ই নভেম্বর সন্ধ্যায় তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজের ৯ নাম্বার কেবিনে ইন্তেকাল করেন। টেলিভিশনে এ খবর শুনে সাথে সাথে সূর্য সেন হল থেকে আমি হাজার হাজার লোকের সাথে মেডিকেলে যাই এবং সারারাত থাকি। ১৮ই নভেম্বর ঢাকা শহরে ভীষণভাবে কুয়াশা পড়ে অন্ধকার হয়ে থাকে, কোনও আলো দেখা যায় না।

www.pathagar.com

সবাই বলে, শোকের ছায়া নেমেছে প্রকৃতিতে। দুপুরে রেসকোর্স বা সারওয়ার্দী ময়দানে দুই/তিন লাখের বেশি লোক মজলুম জননেতা শতাব্দীর মহানায়ক মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জানাযা নামাজ পড়েন। ২০০২ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁর মহান তিরোধান দিবসে ভাসানী হুজুরের দলের লোকেরা যে স্লোগানটি সব সময় দিতো তাই উল্লেখ করে এ লেখাটি শেষ করছি- "যুগ যুগ জিয়ো তুমি, মওলানা ভাসানী"।

১৭/১১/০২ দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত

www.pathagar.com

২৩শে জুলাই তাজউদ্দিন আহমদের ৬৭তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৮২১ সনে এই বাংলাদেশে একজন অসাধারণ বড় মাপের মানুষে জন্ম গ্রহণ করেন। এই বড় মাপের মানুষটি একাই বাঙালি জাতির জীবনে এক বিরাট তোলপাড় তুলে ফেলেন, বাংলাদেশের মানুষের চিন্তা-চেতনার বিশ্বাসের মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনে তদানীন্তন বাঙালী সমাজে বিরাজিত নানা কুসংস্কারের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েন। তিনি বাঙালী জাতিকে আধুনিকতার সাথে পরিচয় ঘটান সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করে বাঙালী তথা ভারতীয় মানুষের জীবনে অবতারের ভূমিকা পালন করে যান। বাঙালীকে মুক্ত চিন্তা বিশ্বাসের সাথে পরিচয় ঘটিয়ে দিয়ে সমগ্র বাঙালির অন্তরে শ্রদ্ধার আসন পেতে রয়েছেন, এই ব্যক্তির নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সাথে সাথে যিনি দয়ার সাগর হিসেবেও পরিচিত।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রাম মোহন রায় বাঙালী ছিলেন, কিন্তু তাদের প্রগতির ডাকে শিক্ষার ডাকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়ার ডাকে বাঙালি হিন্দু সমাজ সাড়া দিলেও বাঙালী মুসলিম সমাজ সাড়া দেন নাই। ফলে বাঙালী হিন্দুরা বিদ্যা শিক্ষায় ধনে-মানে এগিয়ে যায়। বাঙালী মুসলিমরা ইংরেজি শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষাকে গ্রহণ না করে আরবী, ফারসী শিক্ষা, মক্তব–মাদ্রাসার শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। ফলে ইংরেজ শাসকদের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হন, সরকারী চাকরীতে ঢুকতে পারেননা, ব্যবসা বাণিজ্যেও পিছনে পড়ে থাকেন। অভাব অনটন, মহামারী, অশিক্ষা কুশিক্ষায় বাঙালী মুসলিম সমাজ হাবুডুবু খেতে থাকে, ধর্মকে একমাত্র জীবন জীবিকার এবং ইহকাল ও পরকালের মুক্তির পথ হিসেবে ধরে থাকে। রাজা রাম মোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর জন্ম গ্রহণের আগে বাঙালী হিন্দুদের অবস্থাও মুসলিমদের মতই ছিল, কিন্তু মাত্র দুইজন লোক সমগ্র বাঙালী হিন্দু সমাজের জীবনের গতিধারা আমূল বদলে দেন।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে হলেও বাঙালী হিন্দু সমাজের সাথে মুসলিমরা সমান তালে বা সমানভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হন। ভারতের মুসলিমদের স্যার সৈয়দ আহমদের ডাক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যা প্রায় ৬০ বছর পরে, তাও সৈয়দ আহমদ এর ডাক সীমাবদ্ধ থাকে পশ্চিম ভারতে উর্দু ও হিন্দি ভাষী মুসলিমদের মধ্যে, বাঙালী মুসলিমদের মধ্যে উদার ইংরেজি শিক্ষার আহ্বান আসতে দেরি হয় প্রায় একশত বছর। ফলে ভারতের মুসলমানদের মধ্যেও বাঙালী মুসলমান সমাজ উর্দু-হিন্দি ভাষী মুসলিমদের চেয়েও অনেক পিছিয়ে পড়েন।

ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের একশত চার বছর পরে ১৯২৫ সনের ২৩শে জুলাই বাঙালী মুসলিম সমাজে একজন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন যার নাম তাজউদ্দিন আহমদ। একটি মধ্যবিত্ত কৃষক পরিবারে তাজউদ্দিন আহমদের জন্ম। একশত বছর আগে ১৮২৫ সনে বাঙালী ও বাঙালীর সমাজে ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর যেভাবে তোলপাড় তোলেন,

www.pathagar.com

একশ চার বছর পর ১৯২৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেও তাজউদ্দিন আহমদ বাঙালী মুসলিম সমাজে একটা বড় ধরনের নাড়া এবং ঝাকুনি দিয়ে গিয়েছেন। যে নাড়া এবং ঝাকুনির ফলশ্রুতি আজকের স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্মের পিছনে এবং সামনে তাজউদ্দিন আহমদের অবদান বিরাট এবং বিশাল। "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অস্তিত্ব চিন্তা করা খুবই কষ্টকর তাজউদ্দিন আহমদকে বাদ দিয়ে, আবার তাজউদ্দিন আহমদের অস্তিত্বও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে বাদ দিয়েও চিন্তা করা যায় না– একজন অপরজনের পরিপূরক"। একথাগুলো আমার নিজস্ব নয়, কথাগুলো ১৯৯১ সনের ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে তাজউদ্দিন আহমদের স্মরণে আলোচনা সভায় প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবনগর সরকারের অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা জনাব আবদুল মান্নানের এবং দেশের প্রখ্যাত আইনজীবী রাজনীতিবিদ ডঃ কামাল হোসেনের। কাজেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র গঠনে তাজউদ্দিন আহমদের অবদান ও ব্যক্তি তাজউদ্দিন আহমদ কতবড় তার সঠিক তথ্য ব্যাপক দেশবাসীর কাছে অজানা রয়েছে। দেশবাসী তাজউদ্দিনকে পূর্ণাঙ্গভাবে যেদিন জানতে পারবেন সেদিন অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইবেন না যে এত উঁচু মাপের একজন মানুষ এই বাংলাদেশে বাঙালী মুসলমান সমাজে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৫ সনের ২৩শে জুলাই তাজউদ্দিন সাহেব বর্তমানের গাজীপুর জেলার কাপাসিয়ার দরদরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিশু বয়সে তাঁর প্রথমেই স্কুলে পড়ার সুযোগ হয় নাই, হাফেজিয়া মাদ্রাসায় পড়তে হয়েছিলো, কোরআনে হাফেজ হবার জন্য পারিবারিক সিদ্ধান্তের ফলে। কিন্তু বেশিদিন তাকে হাফিজিয়া মাদ্রাসায় আবদ্ধ থাকতে হয় নাই, খুব অল্পদিনের মধ্যেই তিনি কোরআনে হাফেজ হয়ে যান, খুব কম সময়ে তিনি হাফেজ হন, যা নিয়ে কাপাসিয়া অঞ্চলে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে যায় এরপরে তিনি কাপাসিয়া থানা সদরে এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থেকে প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়া লেখা শুরু করেন।

কাপাসিয়া থানাতে তখন কয়েকজন রাজ বা নজর বন্দীকে রাখা হোত। এইসব রাজ বা নজর বন্দীরা স্বদেশী আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকতেন, সুস্পষ্ট প্রমাণের অভাবের জন্য এঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা যেত না, ফলে এদের নজরবন্দী করে রাখা হোত, এরা রাতে থানায় ঘুমাতেন, থানার পুলিশের পাহারা নিয়ে হেটে অথবা ঘোড়ায় চরে দিনে ঘোড়াফেরা করতেন। এইসব নজরবন্দী তাদেরই করতেন যাদের বিদ্যা শিক্ষা এবং সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল অনেক উচ্চে। কাপাসিয়া থানায় এসব নজর বন্দীদের নিকট বালক তাজউদ্দিন গেলে নজরবন্দী রাজনীতিবদগণ তাজউদ্দিনের সাথে কথা বলতেন, তারা তাজউদ্দিন সাহেবকে প্রথমে মুখে মুখে সব বলতেন, পরের দিন পূর্বালোচনার মধ্যে থেকে প্রশ্ন ধরতেন, একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হলে একটি মিষ্টি বা একটি আপেল দেওয়া হবে, এই শর্তে কাপাসায়িা থানায় আটক রাজবন্দীরা শিশু তাজউদ্দিনকে বিদ্যাশিক্ষা দেবার জন্য খেলা করতেন। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে বলেছেন– "এমন কোনদিনের কথা মনে নেই যে, যেদিন একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নাই, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতাম। প্রায় প্রতিদিনই বাড়িতে মিষ্টি, কমলা, আপেল নিয়ে যেতাম।" এইভাবে চলতে চলতে তাকে

www.pathagar.com

বই দিতেন আগের দিন, পরের দিন বই থেকে প্রশ্ন ধরতেন। একদিন এমন অবস্থা হয়েছে যে মধ্যম মাপের একটি সম্পূর্ণ বই পড়ে শেষ করে নিয়ে যাই, তা থেকে তারা প্রশ্ন ধরেন, বানান ধরেন, আমি একটি করে প্রশ্নের উত্তর দেই আর একটি করে কমলা, আপেল অথবা মিষ্টি পাই, শেষে এমন অবস্থা হয় যে আপেল কমলা ও মিষ্টির বড় বোঝা হয়ে যায়, যা বাসায় নিয়ে গেলে রীতিমত হৈ-চৈ পড়ে যায়, কেন না তখনকার সময়ে এত মিষ্টি, আপেল কমলা কেনা হতো না।"

এই ঘটনার পরে এই রাজবন্দীরা কালিগঞ্জের খৃষ্টান মিশন স্কুলের প্রধান শিক্ষককে খবর দিয়ে নিয়ে এসে তাজউদ্দিনের মত প্রতিভাবান ছেলেকে তাদের স্কুলে ভর্তি করার জন্য অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধে কালিগঞ্জের খৃষ্টান মিশনের স্কুলে তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধান শিক্ষক নিয়ে গিয়ে ভর্তি করান। ভর্তি হবার পরে কালিগঞ্জের খৃষ্টান মিশনের স্কুলের শিক্ষক মন্ডলী দেখতে পান, তাজউদ্দিন তাদের স্কুলের যোগ্য ছাত্র নয়, তার জন্য আরও ভালো স্কুলের দরকার যেখানে তাঁর সত্যিকারের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ থাকে। তখন তাঁরা ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী হাইস্কুলের সাথে যোগাযোগ করে, ঐ স্কুলে ভর্তি করে পড়ালেখা করার ব্যবস্থা করলেন। ক্লাশ টেনে পড়ার সময় তাজউদ্দিন আহমদ প্রচণ্ড রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় তাজউদ্দিন আহমদ বোর্ডে ৩য় স্থান লাভ করেন ১৯৪৪ সনে। এখানেও একটি তথ্য আছে– যা বেশ গুরুত্বপূর্ণ যেদিন প্রথম ম্যাট্রিক পরিক্ষা শুরু হয় সেদিন ঢাকাতে মুসলিম লীগের মিটিং চলছিলো; মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম সাহেব কলকাতা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন মিটিং করতে। সকালে মিটিং চলছিলো সে মিটিং এ তাজউদ্দিন সাহেব উপস্থিত ছিলেন, পরীক্ষা শুরুর, একঘণ্টা বাকী এমন সময় আবুল হাশিম সাহেবের নজরে পড়ে যে তাজউদ্দিন পরীক্ষা না দিয়ে মিটিং এ উপস্থিত রয়েছে, তখন আবুল হাশিম সাহেব তাজউদ্দিনকে গালাগাল করেন এবং মিটিং বন্ধ করে হাত ধরে উঠিয়ে দেন পরীক্ষা দেবার জন্য। প্রথম সাবজেক্টের ইংরেজি পরীক্ষা মাত্র দেড় ঘণ্টা দিয়েছিলেন, এরপরেও বোর্ডের পরীক্ষায় ৩য় স্থান লাভ।

এরপরে ঢাকা কলেজে ও সলিমুল্লাহ কলেজ থেকে আই, এ, ১৯৪৮ সনে। আই, এ, পরীক্ষাতেও তিনি ৪র্থ স্থান দখল করেছিলেন। এরপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে অনার্স পাশ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি প্রচণ্ড রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন, ঠিকমত পরীক্ষা দেন নাই ক্লাশ করেন নাই। পরে এল,এল,বি পাশ করেন।

১৯৫৭ সনে আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি হয় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে। ১৯৫৭ সনের আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির মাত্র দুজন সম্পাদক আওয়ামী লীগে ছিলেন, একজন তাজউদ্দিন আহমদ, অপরজন সাবেক রাষ্ট্রপতি মাহমুদউল্লাহ, আর দু'তিন জন কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য, এছাড়া সবাই ন্যাপে চলে গিয়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু তখন মন্ত্রী। তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৫৭ সনের এই দুঃসময়ে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন। কিভাবে তিনি ১৯৫৭ সনে আওয়ামী লীগের হাল ধরেন এবং আওয়ামী লীগকে ন্যাপের চেয়ে বেশী জনপ্রিয় ও শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন সে সম্পর্কে

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন সাহেব ১৯৭৪ সনে আমাকে বলেছিলেন "তোমাদের (এই লেখকের বাড়ী সিরাজগঞ্জ), সিরাজগঞ্জের প্রতি আমার একটি বিশেষ দুর্বলতা আছে। ১৯৫৭ সনে আওয়ামী লীগ থেকে নেতা কর্মীরা চলে গিয়ে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপ সৃষ্টি হবার অল্পদিনের মধ্যে সিরাজগঞ্জে আইন সভা সদস্য নির্বাচনের একটি উপনির্বাচন, এই উপনির্বাচন চ্যালেঞ্জ হিসেবে আসে মওলানা ভাসানীর জন্য, কেননা তার বাড়ী সিরাজগঞ্জ থানায়, বা সিরাজগঞ্জ শহর তলীতে। সারা পাকিস্তানের ন্যাপ নেতা কর্মীরা সিরাজগঞ্জে ন্যাপের প্রার্থী তমিজুল হককে জেতাবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন, কয়েকশত ন্যাপ নেতা কর্মী সিরাজগঞ্জে কয়েক মাস আগে থেকে সমবেত হয়ে প্রচার চালান, এছাড়াওতো মওলানা ভাসানী রয়েছেন, কয়েকদিন আগেও যিনি আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলন। আওয়ামীলীগ ত্যাগ করে ন্যাপ সৃষ্টি করে ন্যাপের সভাপতি হয়েছেন, তাদের মান ইজ্জত অস্তিত্ব বাঁচানোর প্রশ্ন, "আমি তাজউদ্দিন সবেমাত্র আওয়ামী লীগের হাল ধরেছি, মওলানা ভাসানীকে প্রতিরোধ করার জন্য মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশকে আওয়ামীলীগের সভাপতি করা হয়েছে। মুজিব ভাইকে মন্ত্রী থেকে পদত্যাগ করায়ে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে তাদের ঢাকায় থাকতে হয়, প্রচুর কাজ। বাধ্য হয়ে আমি একা সিরাজগঞ্জের উপনির্বাচনের দায়িত্ব নেই, একমাস এক নাগারে সিরাজগঞ্জ ছিলাম, একমাত্র আওয়ামীলীগ নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের পক্ষে। অন্যদিকে মাওলানা ভাসানী, ওয়ালী খানসহ কয়েকশত ন্যাপের নেতা কর্মী ছোট শহর সিরাজগঞ্জে মাসাধিক সময় ধরে আছেন। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেলো আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাসির ডাঃ বিপুল ভোটে জয় লাভ করেছে।" তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে বলেছিলেন "সিরাজগঞ্জের সেই উপনির্বাচনের ফলাফলের মাধ্যমে ভীষণভাবে আমার মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম হয়, যে আমাকে দিয়ে বড় কিছু করা সম্ভব। এত বড় বড় প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের জাতীয় নেতাদের বিরুদ্ধে আমি একা জনসভা করি, তাদের সমস্ত বক্তব্যের জবাব দেই, পাল্টা প্রশ্ন করি, তারা জবাব দিতে পারেনা। মূলত ঃ সিরাজগঞ্জের ১৯৫৭ সনের উপনির্বাচনের প্রচারের বক্তব্য ও ফলাফল দিয়েই দেশের মানুষ আওয়ামী লীগ ও ন্যাপকে মূল্যায়ন করেন। সিরাজগঞ্জে একমাস একনাগারে থেকে আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে পাশ করানোর মধ্যে দিয়েই আমার রাজনীতির নূতন গতিধারা শুরু হয়। তাই সিরাজগঞ্জের মানুষের প্রতি আমার একটি বিশেষ কৃতজ্ঞতা রয়েছে। তারা যদি সেদিন ন্যাপের প্রার্থীকে জিতিয়ে দিতেন রাজনীতিতে আমার আত্মবিশ্বাসের জন্য যে শক্তি পেয়েছিলাম তা হয়তো পেতাম না।" আসলেই কিন্তু বিষয়টি ভাবতেও চমকে উঠতে হয়, মওলানা ভাসানীর বাড়ী সিরাজগঞ্জ শহরে, তিনি রয়েছেন, পাকিস্তান থেকে ওয়ালী খান এসছেন একঝাঁক নেতা কর্মী নিয়ে ন্যাপের সমস্ত নেতাকর্মী সিরাজগঞ্জে। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একমাত্র একজন লোক তাজউদ্দিন আহমদ তখন তার বয়স মাত্র ৩২ বছর। আওয়ামী লীগ তখন ক্ষমতায়, অন্য সব নেতা মন্ত্রী বা সরকারী পদে, কাজেই তাদের পক্ষে নির্বাচনের প্রচারে অংশ নেওয়া সম্ভব ছিল না। কৃষক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ধরণের লোকদের সংগঠিত করে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বসির ডাক্তারকে জিতিয়ে নিয়ে আসেন। ঢাকায় মওলানা তর্কবাগীশ এবং বঙ্গবন্ধু মাহমুদ উল্লাহ তিনজন

www.pathagar.com

মাত্র নেতা রয়েছেন হেড কোয়ার্টার রক্ষা করার দায়িত্বে। ১৯৫৭ সনের তখন থেকে ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি এই সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নামে আওয়ামী লীগের পক্ষে যা কিছু হয়েছে তাঁর মূলে বা পিছনে ছিলেন তাজউদ্দিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংগঠন গড়ে তোলার জন্য ও স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি জন্মের পিছনে তাজউদ্দিন এর অবদানের পরিমাণ অনেক। ২৩শে জুলাই তাঁর জন্মদিনে তাকে জানাই অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা।

তথ্যসূত্র : ১৯৭৪-৭৫ সনে তাজউদ্দিন আহমদের সাথে লেখকের ব্যক্তিগত কথোপকথন।

১৯৯২ সনে লিখিত

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের একজন সাত্বিক নেতা
আব্দুল মোমিন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একজন সাত্বিক নেতা ছিলেন জনাব আব্দুল মোমিন। নেত্রকোনার মোহনগঞ্জের জমিদার পরিবারের সন্তান আব্দুল মোমিন ১৯২৮ সনে জন্ম গ্রহন করেছিলেন এবং ২০০৪ সনের ১৫ই জুলাই মৃত্যু বরণ করেন। জনাব আব্দুল মোমিনের বাবার নাম খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ ১৯৭৮ সনে মৃত্যু বরণ করেন। খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ সাহেব ময়মনসিংহ এর প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ জনাব নুরুল আমিন, জনাব মোনায়েম খান, আবুল মুনসুর আহমেদসহ আরও অনেক মান্যগণ্য লোকের খুব ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। নেত্রকোনার মানুষ খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ সাহেবকে বড় সাহেব এবং আব্দুল মোমিন সাহেবকে ছোট সাহেব বলে ডেকেছেন বা ডেকে থাকেন।

জনাব আব্দুল মোমিন ১৯৪৫ সনে ম্যাট্রিক পাশ করেন খুবই কৃতিত্বের সাথে। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকেই ১৯৪৭ সনে আই,এ পাশ করেন।

কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আই,এ পাশ করার পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অনার্স ভর্তি করানোর জন্য মোমিন সাহেবের বাবা তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সময়ের রেজিষ্ট্রার সাহেবের অফিসে নিয়ে যান। রেজিষ্ট্রার সাহেবের বাড়ি ছিল নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ এলাকায়, একজন সজ্জন হিন্দু পরিবারের লোক। খান বাহদুর আব্দুল আজিজ সাহেব তাদের জমিদার। তাদের খোদ জমিদার তার অফিস কক্ষে স্বয়ং উপস্থিত, এটা দেখে তিনি খুশীতে আত্মহারা। রেজিস্ট্রার সাহেব মোমিন সাহেবের বাবা আব্দুল আজিজ সাহেবকে মোমিন সাহেবসহ ১৯৪৭ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবের অফিস কক্ষে নিয়ে যান। রেজিষ্ট্রার সাহেব ভাইস-চ্যান্সেলর সাহেবের নিকট মোমিন সাহেবের বাবার খুব প্রশংসা করেন এবং তাদের জমিদার স্বয়ং তার অফিসে এসেছেন এটা তার সৌভাগ্য- তাই ভি,সি, সাহেবের সাথে পরিচয় করে দেবার জন্য নিয়ে এসেছেন বলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সাহেবও মোমিন সাহেবের বাবা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ সাহেবকে ও মোমিন সাহেবকে আন্তরিকতার সাথে খুবই আদর আপ্যায়ন করেন। এর পরে ভাইস চ্যান্সেলর সাহেব কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের ঐ সময়ের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অধ্যক্ষ এ,কে চন্দকে প্রেসিডেন্সী কলেজে অনার্সের ছাত্র ভর্তির একটি ফরম নিয়ে তার রুমে আসতে বলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ চলে আসেন। এ, কে, চন্দ সাহেবের সাথে পরিচয় করে দেন এবং মোমিন সাহেবকে অনার্সের ভর্তি ফরম পূরণ করতে দেন। মোমিন সাহেব ইতিহাসে অনার্স এবং সাবসিডিয়ারী সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজী ও অর্থনীতির বিষয় লিখেন। ফরমটি পূরণ করে দেবার পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ডাক সাইটে অধ্যক্ষ এ,কে, চন্দ তার কলম দিয়ে

www.pathagar.com

সাবসিডারী ইংরেজী বিষয়টি কেটে সেখানে বাংলা লিখে দেন নিজ হাতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, মোমিন সাহেবের বাবা খান বাহাদুর আব্দুল আজিজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের সামনে চন্দ সাহেব মন্তব্য করেন এই বলে যে "তোমরা মুসলিম ছেলেরা এই জন্যই হিন্দু ছেলেদের সমান বা তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পার না। বাংলাদেশের মানুষ অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি দরদ বা আগ্রহ নেই।" অবশেষে মোমিন সাহেবের সাবসিডারী সাবজেক্ট বাংলা ও অর্থনীতিই থাকে। পাঠক পাঠিকাদের মধ্যে যারা সচেতন তারাই এ থেকে বুঝতে পারবেন আওয়ামী লীগ নেতা মোমিন সাহেব কোন পর্যায়ের কোন স্তরের মানুষ ছিলেন।

তিনি জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কালিয়াকৈরের বলিয়াদীর জমিদার বংশের জনাব চৌধুরী আরহাম আহমদ সিদ্দিকী সাহেবও মোমিন সাহেবের আত্মীয় ও ঘনিষ্ট বন্ধু। আরহাম সিদ্দিকী সাহেব ও তাজউদ্দিন সাহেব ঢাকার সেন্টগ্রেগরী হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত। এই ৫ বছর তাজউদ্দিন ও আরহাম সিদ্দিকী সাহেব ক্লাশে প্রথম হয়েছেন। তাজউদ্দিনের আগে সেন্টগ্রেগরী হাই স্কুলের কোন মুসলিম ছাত্র প্রথম হয় নাই। আরহাম সিদ্দিকী সাহেবও মানুষ হিসেবে খুবই উন্নতমানের, ১৯৫০ এর দশকের প্রথমে ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার বিরাট অবদান। আরহাম সিদ্দিকী সাহেব এখন আমার আত্মীয় হন। আরহাম সিদ্দিকী সাহেবের একমাত্র মেয়ে মুনীরা সিদ্দিকীর সাথে আমার মায়ের চাচাতো বোনের এক ছেলের সাথে আমি বিয়ের ব্যবস্থা করেছি ১৯৮২ সনে, আওয়ামী লীগ নেতা কালিয়াকৈরের সামসুল হক সাহেবকে দিয়ে। তাজউদ্দিন সাহেব, মোমিন সাহেব, আরহাম সিদ্দিকী সাহেব, সামসুল হক সাহেব একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। মোমেন সাহেব আমাকে বলেছেন, বরিশালের অপর জমিদার পুত্র বাহাউদ্দিন চৌধুরী ১৯৪৯ সন থেকেই আওয়ামী লীগের বলিষ্ঠ নেতা। আরহাম সিদ্দকী সাহেবও মোমেন সাহেবের আত্মীয় ও বন্ধু। এদের প্রভাবে বাবা মুসলিম লীগের নেতা হওয়া সত্ত্বেও আওআমী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েন জনাব আব্দুল মোমিন।

১৯৬৪ সন থেকে মোমিন সাহেব ১৯৭২ সন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ছিলেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ, জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরী সাংগঠনিক সম্পাদক, জনাব চৌধুরী আরহাম আহমেদ সিদ্দিকী কোষাধ্যক্ষ। এই ছিল ১৯৬৪ সন থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতাদের পদবী বা অবস্থান। এ থেকেই মোমিন সাহেবের আওয়ামী লীগের রাজনীতির অবস্থান জানা যাবে। ১৯৬৬ সনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলনে জনাব আব্দুল মোমিন অনেক দিন বিনা বিচারে জেল খেটেছেন।

আজ অনেকে অনেক কথা বলবেন, কিন্তু একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে, এই বাংলাদেশে জমিদার ও জমিদার পরিবারের সন্তানদের অসীম প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল, তাদের ভয়ে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে নিরবে পানি খেত বলে মানুষ কথায় কথায় বলে থাকে।

www.pathagar.com

আওয়মী লীগ ১৯৪৯ সনে প্রতিষ্ঠিত হলে চারজন জমিদার পরিবারের সন্তান আওয়ামী লীগের যোগ দিয়ে রাজনীতি করেছেন এবং আওয়ামী লীগে নেতা হয়েছিলেন- এরা হলেন ১, জনাব আব্দুল মোমিন, নেত্রকোনার জমিদার ২, জনাব চৌধুরী আরহাম আহমদ সিদ্দিকী, গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈরের বিখ্যাত বলিয়ার্দীর জমিদার ৩, বাহাউদ্দিন চৌধুরী, বরিশালের উলানিয়ার জমিদার বংশের ৪, সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেব।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এদের খুবই সম্মান ও ভালোবেসেছেন। এদের মধ্যে ১৯৭২ সনে ফরিদ গাজী সাহেবের সাথে বঙ্গবন্ধু আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন ''বাবলু ফরিদ গাজী জমিদার বংশের মানুষ, উনাকে সব সময় সম্মান করবা, আমিও কিন্তু এদের সামনে চেয়ারে বসতে ভয় পাই।'' কথাটি আমার কানে এখনও বাজে, বঙ্গবন্ধুর কথা মত আমি এখনও ফরিদ গাজী সাহেবকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। ফরিদ গাজী সাহেবও আমাকে খুব স্নেহ করেন ও ভালোবাসেন। আব্দুল মোমিন একজন জমিদার পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত মার্জিত রুচির সত্যনিষ্ঠ রাজনীতিবিদ ছিলেন। ১৯৭০ সন থেকে জাতীয় সংসদে নির্বাচন করে শুধুমাত্র ১৯৯১ সনে একবার পরাজিত হয়েছেন। ১৯৭০ সনে এম, এন, এ, এবং ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬, ১৯৯৬ এবং ২০০১ সনে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মন্ত্রী সভায় ১৯৭৩ সন থেকে জনাব আব্দুল মোমিন খাদ্য, ত্রান ও পূর্নবাসন মন্ত্রী ছিলেন।

১৯৭৭ সন থেকে জনাব আব্দুল মোমিন ২০০১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১০ সদস্য বিশিষ্ট মনোয়ন বোর্ডের সদস্য, ১৯৮১ সন থেকে ২০০২ সন পর্যন্ত দশ সদস্য বিশিষ্ট প্রেসিডিয়াম বা সভাপতি মণ্ডলীর প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন।

১৯৮১ সনের ১৭ ই মে জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে ফিরে আসবার পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বকে শক্তিশালী করার জন্য, প্রভাব পতিপত্তি বৃদ্ধি করার জন্য আওয়ামীলীগ নেতা জনাব আব্দুল মান্নানকে সাথে নিয়ে আন্তরিক ও নিষ্ঠার সাথে নিঃস্বার্থভাবে আমৃত্যু নিবেদিত চিত্তে কাজ করে গিয়েছেন জনাব আব্দুল মোমিন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সৎ রাজনীতি ও মূল্যবোধের রাজনীতির কথা যতদিন থাকবে তত দিন আব্দুল মোমিনের নাম ও প্রভাব অক্ষুন্ন থাকবে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ।

তথ্য সূত্র : লেখকের সাথে জনাব আব্দুল মোমিনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

তারিখ ঃ ১৬/৯/২০০৮

প্রিন্স টাওয়ার

১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড

ঢাকা-১২০৫।

www.pathagar.com

সব মানুষের প্রিয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী

জননেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন ২০০৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি শেষ রাতে। ১৯৫৬ সনে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনীতির অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৯৬২ সনে এবং ১৯৬৫ সনে তিনি পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে এম,এন,এ নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৬৫ সনে মিজানুর রহমান চৌধুরীসহ মোট ৫জন আওয়ামী লীগ দলের এম, এন, এ ছিলেন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের–

(১) মিজানুর রহমান চৌধুরী (২) এ, এইচ এম কামরুজ্জামান (৩) সোহরাব হোসেন, (৪) অধ্যাপক ইউসুফ আলী (৫) এ,বি,এম, নুরুল ইসলাম।

১৯৬৬ সনে বঙ্গবন্ধু বাঙালিদের মুক্তি সনদ ৬ দফা দাবী পেশ করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তার সমর্থক নেতা কর্মীদের উপরে নেমে আসে জেল জুলুম অত্যাচার, মিজানুর রহমান চৌধুরীও গ্রেপ্তার হন কিন্তু তিনি যেহেতু পাকিস্তানের এম,এন,এ ছিলেন, তাই তাঁকে একসাথে খুব বেশিদিন জেলে রাখতে পারেন নাই।

একজন সুবক্তা মিজানুর রহমান চৌধুরী, পাকিস্তানের সময়ে ১৯৭১ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের নেতা ছিলেন– মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, সবুর খান, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ, ফজলুল কাদের চৌধুরী, অধ্যাপক গোলাম আজম, এরা ছিলেন দলের প্রধান ব্যক্তি। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির অপর প্রধান কর্ণধার জনাব আতাউর রহমান খান ও নুরুল আমিন সাহেবও প্রভাবশালী নেতা ছিলেন, কিন্তু ওনাদের মতো গণমানুষের মনের কথা বলে বক্তৃতা দিতে পারতেন না। আওয়ামী লীগ দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব জেলেই থাকতেন বেশি, নেতাকর্মীসহ ৬০ এর দশকে।

সেই দুঃসময়ে দুজন লোক আওয়ামী লীগের হাল ধরে সারা পূর্বপাকিস্তানের মানুষকে এবং আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ নেতা কর্মীদের মাতিয়ে উজ্জীবিত করেছেন এদের একজন আমিনা বেগম, অপর জন মিজানুর রহমান চৌধুরী। খুলনার হাদিস পার্ক, রাজশাহীর মাদ্রাসা ময়দান, চট্টগ্রামের লালদিঘী ময়দান, বগুড়ার আলতাফুন নেসা খেলার মাঠ, দিনাজপুরের বড় ময়দান রাজনৈতিক জনসভার জন্য বিখ্যাত ছিল। ১৯৬৬, ৬৭, ৬৮ সন এসব ময়দানে উল্লেখিত বড়বড় নেতাদের সাথে তাল মিলিয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরী ও আমেনা বেগম বক্তৃতা করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ৬ দফার মর্মবাণী প্রচার করে, বাংলার মানুষকে উজ্জীবিত করেছেন। পরবর্তী পর্যায়ে আওয়ামী লীগের সুবিধাবাদী লোকদের ষড়যন্ত্রে আমিনা বেগম আওয়ামী লীগ থেকে বিতাড়িত হন।

মিজানুর রহমান চৌধুরী আওয়ামী লীগে টিকে থাকেন ১৯৭০ সনে এম,এন,এ হন, ১৯৭১ সনে স্বাধীনতাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন, মুক্তি সংগ্রামে অংশ নেন। ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধু প্রথমে মিজানুর রহমান চৌধুরীকে তথ্য মন্ত্রী পরে ত্রাণ ও রিলিফ মন্ত্রী হিসেবে

www.pathagar.com

নিয়োগ করেন। ১৯৭৪ সনে তিনি মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। মিজানুর রহমান চৌধুরীর পদত্যাগের মাধ্যমেই আওয়ামী লীগের পতন শুরু হয়। সত্যি বলতে কি আওয়ামী লীগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পরে তাজউদ্দিন আহমদ এবং মিজানুর রহমান চৌধুরীই ছিলেন মূল ব্যক্তি। মা দুর্গার দুই ছেলে একজন গণেশ অন্যজন কার্তিক। একজন সম্পদ ও ধন ভাণ্ডারের দেবতা, অন্যজন বীর ও যোদ্ধা। এখানেও বঙ্গবন্ধুর দুই সাথী তাজউদ্দিন ছিলেন গণেশের মতো বুদ্ধিমান ধনভাণ্ডার তথা আদর্শের নেতা, অপরজন মিজান চৌধুরী সাহেব কার্তিক, বীর ও জনগণে মন জয়ের নেতা। বঙ্গবন্ধু যদি এই দুজনকে তাঁর সাথে রাখতেন তবে কোনোদিনই বঙ্গবন্ধুর পতন হতো না। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার আগে এ দুজনকে শেষ করেছে। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫ সনের পত্র-পত্রিকা এবং রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের ভাষণ দেখলে প্রমাণ পাওয়া যায় কি পরিমাণ মিথ্যা গুজব মিজানুর রহমান চৌধুরী ও তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে। গাছিরা যেমন বড় গাছ কাটার সময় প্রথমে তার ডাল কাটে, ডাল পালা আগে না কেটে কোনও সময় বড় গাছ কাটা যায় না, তেমনি বঙ্গবন্ধুকে শেষ করার আগে দুটি বড় ভালো লোক তাজউদ্দিন ও মিজানুর রহমান চৌধুরীকে কাটা হয়েছে, বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে। শতশত স্তাবক দালাল বা নেতাকর্মী যদি বঙ্গবন্ধুর কানের কাছে সব সময় বলেন– নেতা তাজউদ্দিন মিজান চৌধুরী খারাপ, তখন বঙ্গবন্ধুরই বা কি করার থাকে, প্রথমে ধমক দিবেন, তারপরেও ধমক দিবেন, তার পর একটু বিরক্ত হবেন তারপর কম বিরক্ত হবেন, এরপর কিছুটা শুনতে চাইবেন, এরপর চিন্তা করবেন এত নেতাকর্মী এদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই কিছু বলার আছে এইভাবে একদিন তিনি এ্যাকশনে যাবেন। তাই হয়েছে, তাজউদ্দিন আহমদ ও মিজানুর রহমান চৌধুরীর বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছেন তারাই বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামীলীগের আসল শত্রু।

আর এ চক্রের প্রধান ছিলেন জনাব সিরাজুল আলম খান ও তার জাসদ এবং শেখ ফজলুল হক মনি ও তার যুবলীগ। আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ, শ্রমিকলীগের নেতা আঃ মান্নান, এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ। যাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী সুবক্তা ছিলেন মানুষের মনের কথা বলে বক্তৃতা করে মাতিয়ে রাখতেন, মানুষের মন জয় করতেন। তিনি একজন পড়া লেখা জানা মানুষ ছিলেন রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ছিলেন, তার বক্তৃতার প্রধান অলংকার ছিল রবীন্দ্রনাথের কবিতা। বহু বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতা তিনি আবৃত্তি করতেন উপমা হিসেবে ব্যবহার করতেন। মিজানুর রহমান চৌধুরী ৩০০ পৃষ্ঠার বৃহৎ আত্মজীবনীমূলক বই লিখেছেন– "রাজনীতির তিনকাল" নামে এ বই পড়ে জানা যায় মিজানুর রহমান চৌধুরী ১৯৫২ সনে বি,এ, পাশ করে নোয়াখালী জেলার বসুরহাট থানার বসুরহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন; পরে চাঁদপুর হাই মাদ্রাসার সিনিয়ার ইংরেজি শিক্ষক পদে যোগদান করেন। এরপরে ১৯৫৬ সনে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান। ১৯৫২ সনে একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ১৯৫৪ সনে হাই মাদ্রাসার সিনিয়র ইংরেজির শিক্ষক হিসেবে কাজ করা সহজ কাজ ছিল না, যোগ্যতার দরকার ছিল পড়ালেখার দরকার ছিল।

www.pathagar.com

মিজানুর রহমান চৌধুরীর চরিত্রে ভণ্ডামী বা মোনাফেকী ছিল না, ভিতর বাহির এক যার জন্য মানুষ তাকে ভালোবেসেছে। মিজানুর রহমান চৌধুরীর চেয়ে বেশিবার বাংলাদেশের কোনও লোক জাতীয় সংসদের প্রতিনিধি হতে পারেন নাই মনে হয় পারবেনও না। ১৯৬২ সন থেকে ১৯৯৬ সন, ৩৪ বছর পার্লামেন্ট থেকে এদেশের মানুষের দাবী দাওয়া দুঃখকষ্টের কথা তুলে ধরেছেন।

ব্যক্তি জীবনে সদালাপী নিরহংকার মিজানুর রহমান চৌধুরীর ব্যবহার ছিল মাধুর্যমণ্ডিত। দলমত নির্বিশেষে সব ধরনের মানুষের সাথে তিনি মিশেছেন, কোনও ধরনের সংকীর্ণ মন-মানসিকতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর ছিল না। বহু মানুষের ব্যক্তিগত উপকার করেছেন, সরকারি কর্মচারীদের সাথে বিনয়ের সাথে, অনুরোধের সাথে কথা বলতেন। যার জন্য তারাও খুশি হয়ে মিজানুর রহমান চৌধুরীর তদবির আমলে নিতেন।

দুপুরে এবং রাতে ১৯৮৬ সনে প্রধানমন্ত্রী হবার আগ পর্যন্ত অনেক লোককে নিয়ে খাবার খেতেন পাটিতে বসে। মানুষ তা দেখে অবাক হতো এবং মিজানুর চৌধুরীর প্রশংসা করতো। অনেকে এ বিষয়ে কথা বললে মাথার উপর হাতের আঙ্গুল তুলে দেখাতেন আল্লায় মানুষকে খাবার খাওয়ায়, আমি না।

আমি মিজানুর রহমান চৌধুরীর একজন খুব বিশ্বস্ত চেলা এবং শিষ্য ছিলাম, আমাকে অশেষ স্নেহ করেছেন, অনেক স্মৃতি অনেক কথা মিজানুর রহমান চৌধুরীকে নিয়ে আমার আছে তার সব লেখা এক লেখায় সম্ভব নয়। এখানে ৩টি ঘটনা বা স্মতির কথা বলে এ লেখার যবনিকাপাত করছি।

প্রথমটি হচ্ছে আমার বন্ধু সংসদ সদস্য জুলফিকার আলী ভূট্টোর নামাজে জানাজায় অংশ গ্রহণ করতে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় গিয়েছি ২০০০ সনের মে মাসে। মিজানুর রহমান চৌধুরী আমার প্রিয় মিজান ভাই, আমার প্রিয় নেতা মিজান চৌধুরীকে দেখে তাঁর কাছে এগিয়ে যাই, যাবার সাথে সাথে বললেন বাবলু সর্বনাস হলো বাংলাদেশের মানুষের। ভূট্টো বাংলাদেশের মানুষের জন্য অনেক কাজ করতে পারতো, জুলফিকার আলী ভূট্টোও মিজান চৌধুরীর একজন বিশ্বস্ত ঘনিষ্ঠ শিষ্য ছিলেন। তিনি ভূট্টোর ২/১টি স্মৃতিচারণ করে কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর আমার হাত ধরে বললেন- 'ভাই বাবলু তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে আশা করি রাখবে, এক সময় তুমি আমার কাছে খুব আসতে, এখন কম আসো, অবশ্য এর জন্য কারণ আছে তোমার আমার দুজনের বয়স বেড়েছে- কর্মের ও সংসারের চাহিদার পরিবর্তন হয়েছে স্বাভাবিকভাবে আগের দিনের মতো তোমারও নেই আমারও নেই- তবুও মনে করি তোমার প্রতি আমার দাবি আছে- তাই এই অনুরোধ"- আমি বলি মিজান ভাই আপনি বলেন- সম্ভব হলে অবশ্যই রাখবো। তিনি বলেন "ভাই তোমার কাছে কোনোদিন কোনো মানুষ সামনে এসে যদি বলে পেটে খাবার নেই, না খেয়ে আছি, তবে সাধ্য অনুযায়ী যা পারো সাহায্য করো ১ টাকা ২ টাকা যা পারো" এই আমার অনুরোধ।

আমি তার অনুরোধের কথা শুনে আশ্চর্য্য হলাম, পাঠকরা এ থেকে ধারণা করবেন মিজান চৌধুরী কোন মাপের নেতা কোন মাপের মানুষ। দ্বিতীয়তো আমার বন্ধু পার্থ

www.pathagar.com

সারথী চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্যের শ্যালক। এখন কলকাতার হরিদেবপুরে থাকে। ২০০৪ সনে কলকাতার কিড্ স্ট্রীটে আমার হোটেলে পার্থর সাথে কথা বলার সময়ে পার্থ বলে "বাবলু তুমি ঢাকায় গিয়ে জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে দেখা করে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে মহাপুরুষ বা বড় মাপের নেতারা কেন খারাপ বদমায়েস লোকদের ভালো বাসেন, কাছে রাখেন। পার্থ আরও বলেন, 'মিজানুর রহমান চৌধুরী মহা মানুষ নন তবে তাদের কাছাকাছি, ভদ্রলোক দেশের মানুষের পক্ষে বহু বছর যাবত কথা বলছেন অনেক জেলজুলুম সহ্য করে চলেছেন।"

পার্থর কথা মতো ২০০৪ সনে কলকাতা থেকে ঢাকায় এসে আমি মিজান ভাইয়ের গুলশানের বাসায় যাই। তিনি আমাকে দেখে খুশি হন, অনেক কথা বলেন– এক পর্যায়ে পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের কথা উপস্থাপন করে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, মিজান ভাই আপনারা যাঁরা বড় মাপের মানুষ, তারা খারাপ ও বদমায়েশ টাইপের লোকদের এত কাছে রাখেন, তাদের অনেক সুযোগ সুবিধা কেন দেন? দেখলাম তার মন খারাপ হলো। আমি বললাম এটা শুধু আপনার জন্য নয় স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবার জন্য প্রযোজ্য।

এবারে মিজান ভাই হাসলেন এবং বললেন "প্রথমে তোমার কথায় কিছুটা রাগ করেছিলাম এখন তুমি যাদের নামের সাথে আমার নাম করলে তাতে খুব খুশি হলাম। শোন যারা ভালো লোক তারা প্রখর অনুভূতিশীল হয়ে থাকে, তাদের দিকে কথা প্রসঙ্গে কোনোভাবে একটু খারাপভাবে তাকালেই তাদের আর ৬ মাস ১ বছর দেখা যায় না, কিন্তু যারা খারাপ মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আসে তারা লেগে থাকে, গালি এমনকি লাথি মারলেও যায় না। তাই ভালো লোকেরা সুযোগ পায় না, খারাপ লোকেরা বড় নেতাদের কাছ থেকে সুযোগ পায়।"

এরপরে যেটা, সেটা হচ্ছে– আমার প্রিয় নেতা মিজান ভাইয়ের সাথে যত বার দেখা হয়েছে গত ২০ বছরে তিনি আমাকে বিয়ে করার জন্য তাগিদ দিতেন এবং বলতেন তাকে যেন আমার বিয়ের দাওয়াত দেই। আমি রাজি হলে বলতেন আমার পরিবারের সবাইকে কিন্তু দাওয়াত দিবে। আমি রাজি হই। এরপরে তিনি জিজ্ঞাসা করতেন জানোতো আমার ছেলেমেয়ে নাতিনাতনী নিয়ে কতজন? আমি জিজ্ঞাসা করতাম কতজন? তিনি বলতেন ৪০ জন। আমি বলতাম ৪০জনকেই দাওয়াত দিব। তিনি খুশি হয়ে বলতেন আমি জানি ঢাকা শহরে তুমিই একমাত্র ব্যক্তি যে আমার পরিবারের ৪০ জনকে একসাথে তোমার বিয়েতে দাওয়াত করবে। গত ২০ বছরে যতবার ওনার সাথে দেখা হয়েছে ২/১বার বাদে সব বারেই উক্ত কথপোকথন হয়েছে।

আশ্চর্যের বিষয় ২০০৬ সনের ফেব্রুয়ারির ১ তারিখ দিবাগত বুধবার রাতে ১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোডে প্রিন্স টাওয়ারের ফ্লাটে রাত ১১টার সময় আমার মা ও ৮জন ভাইবোন কাজী ও মেয়ে নিয়ে এসে এক প্রকার জোর করে আমাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। আর ২০০৬ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি রাতেই আমার প্রিয় নেতা আমার বাসার সাথেই বারডেম হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করে চির বিদায় নেন। ২রা ফেব্রুয়ারি রাতে ছোটখাট বৌভাতের ব্যবস্থা করি মিজান ভাই থাকলে অবশ্যই খুশি হয়ে আসতেন ৪০ জন না হলেও কমপক্ষে ২০ জন নিয়ে আসতে অনুরোধ করতাম।

www.pathagar.com

মিজান ভাই চলে গিয়েছেন সেটা আমার জন্য বিরাট দুঃখ। সে দুঃখ অনেকটা ভুলে যাই যখন তার বড় ছেলে দিপু ও মেজ ছেলে রাজু (৪০ এর কাছাকাছি বয়স হবে) যেখানেই যে অবস্থাতেই আমাকে দেখে চিৎকার করে বাবলু ভাই বলে লাফ দিয়ে ঘাড় জড়িয়ে ধরে। ওদের এই অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমি মিজান ভাইয়ের আদরের গন্ধ পাই।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই মৃত্যুর সময়ে তিনি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার অন্যতম প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন। মারা যাবার প্রায় দশ বছর আগে তিনি জাতীয় পার্টি থেকে আওয়ামী লীগে ফিরে এসেছিলেন।

আওয়ামী লীগ দিয়েই রাজনীতিতে শুরু আওয়ামী লীগের নেতা হিসেবেই জীবন অবসান আমার প্রিয়নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরীর।

৭/৯/২০০৮

www.pathagar.com

মহান নেতা শামসুল হক

জনাব শামসুল হক সাহেব একজন ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদী, মানব দরদী, সজ্জন, জাত ভদ্রলোক বাংলাদেশ প্রেমিক মানুষ ছিলেন।

গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর থানার মধ্যগ্রাম ইউনিয়নের ঠেংগর বান্ধ গ্রামে ১৯২৭ সনে ১লা মার্চ এক স্বচ্ছল ধনী কৃষক পরিবারে শামসুল হক সাহেব জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সনে সম্ভবত শামসুল হক সাহেবের দাদা হাজী জমির উদ্দিন মুন্সির জমির পরিমাণ ছিল হাজার বিঘার উপরে। শামছুল হকের দাদা হাজী জমির উদ্দিন মুন্সি ও বাবা ওসমান গণি মধ্য পাড়া ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং চেয়ারম্যান ছিলেন প্রায় ৮০ বছর। ১৯৮০ সন পর্যন্ত। ৫০/৬০/৭০ এর দশকে শামসুল হক সাহেবের বাবা ঢাকায় আসতেন পিছনে লাইসেন্স করা বন্দুক নিয়ে, আমি দুই চারবার দেখেছি-৭৮, ৭৯, ৮০ সনের দিকে শামসুল হক সাহেবের বাসায়।

জনাব শামসুল হক ১৯৪৪ সনে ম্যাট্রিক ১৯৪৭ সনে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন এবং অত্যন্ত সফলতার সাথে এম, এ পাশ করেন ১৯৫২ সনে। ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের সময় ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের শামসুল হক সাহেব ছিলেন সংসদের নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট। ফলে ঐ সময়ের সমস্ত ছাত্র সভায় সভাপতিত্ব করতেন শামসুল হক। ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র থাকার সুবাদে জনাব শামসুল হক সাহেব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময়ে ঢাকা শহরের সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত ছিলেন। তার চোখের সামনে ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৪ সনের যাবতীয় ঘটনা ঘটেছে এবং তরুণ ছাত্রনেতা হিসেবে উক্ত সালগুলোর যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন। এই সময়েই জনাব সামসুল হক সাহেবের ব্যক্তিগত পরিচয় হয়েছে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল হাশিম, টাংগাইলের শামসুল হক, আতাউর রহমান খান, জহিরউদ্দিন, আবুল মুনসুর আহমদ, ময়মনসিংহের খালেক নেওয়াজ খান, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আব্দুল মোমিন, আব্দুল মান্নান, ময়েজউদ্দিন আহমদসহ এদেশের অনেক শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতাদের সাথে। উপরে যাদের নাম উল্লেখ করেছি তাঁদের মধ্যে সোহরাওয়ার্দী সাহেব, টাংগাইলের শামসুল হক সাহেব এবং ময়মনসিংহের খালেক নেওয়াজ খান সাহেব ছাড়া আর সব শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের সাথে আমার খুব ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় ছিল– এঁরা সবাই শামসুল হক সাহেবের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। বাংলাদেশের রাজনীতির আর এক প্রাণপুরুষ তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব ছিলেন শামসুল হক সাহেবের জানের দোস্ত। দুজন দুজনকে তুই বলে সম্বোধন করতেন। তাজউদ্দিন সাহেব ১৯৪৪ সনে ম্যাট্রিক পাশ করলেও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন ১৯৪৮ সনে, দুজনের বাড়িও পাশাপাশি থানায় কালিয়াকৈর কাপাসিয়া

www.pathagar.com

একই জেলার মানুষ। একই পরিবেশ, একই সামাজিকতা, একই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। তাজউদ্দিন সাহেবের যেসব ব্যক্তিগত দৈনন্দিন ডাইরি ছাপা হয়েছে তা পড়ে দেখা যায়, ১৯৪৮ সন থেকে ১৯৫৪ সন পর্যন্ত অনেকদিন তাজউদ্দিন সাহেব ডাইরিতে লিখেছেন- আজ আমাদের হোটেলের খাবারের বিল শামসুল হক দিল, আজ আমাদের রিক্সা ভাড়া শামসুল হক দিল, আজ আমাদের সিনেমা দেখার টিকিট কাটার টাকা শামসুল হক দিল, আজ আমাদের নাস্তার বিল শামসুল হক দিল, আজ ট্রেনের টিকিট কাটার টাকা শামসুল হক দিল, লিফলেট ছাপার জন্য ১০ টাকা শামসুল হক দিল। মোট কথা তাজউদ্দিন সাহেব এর ১৯৪৭ সন থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত ডাইরিতে একমাত্র শামসুল হকের কথা অনেকবার উল্লেখ আছে যে শামসুল হক সাহেব টাকা পয়সা খরচ করেছেন, আর কারও কথা উল্লেখ নেই। এ থেকে পাঠকদের ধারণা নিতে বলি ছাত্র জীবনে, তরুণ জীবনে শামসুল হক সাহেব তাজউদ্দিনের কেমন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। অনেক শ্রদ্ধেয় আওয়ামী লীগ নেতা বলেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং তাজউদ্দিন আহমদ দুইজন দুইজনের পরিপূরক। একজন ছাড়া অপরজনের রাজনৈতিক অস্তিত্বের কথা কল্পনা করা যায় না"- তেমনি আমিও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই- তাজউদ্দিন আহমদ এবং শামসুল হক সাহেব দুজনের দুজন পরিপূরক, একজনকে বাদ দিয়ে অপরজনের কথা ভাবা যায় না। বঙ্গবন্ধু ও তাজউদ্দিন সাহেবের সম্পর্ক ছিল রাজনৈতিক। কিন্তু তাজউদ্দিন এবং শামসুল হকের সম্পর্ক ছিল রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত বন্ধনে আবদ্ধ। ১৯৫৩ সন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন শামসুল হক এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব তাজউদ্দিন আহমদ। শামসুল হক সাহেব ১৯৭২ সন পর্যন্ত ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। আর ১৯৮৪ সনের আগের ঢাকা জেলা মানে আজকের ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর জেলা গুলো নিয়ে ঢাকা জেলা এই ঢাকা জেলার ১৯৫৪ থেকে ১৯৭২ সন পর্যন্ত শামসুল হক সাহেব ছিলেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি। তার চেয়ে বড় কোনও নেতা আওয়ামী লীগে ঢাকা জেলায় ছিলেন না। শামসুল হক সাহেব শুধু ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিই নয়, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক এবং পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন উচ্চস্তরের নেতা ও সংগঠক হিসাবে নিবেদিত চিত্তে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার জন্য যে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয় তাঁর প্রথম একটি ছিল ১৯শে মার্চ জয়দেবপুর চৌরাস্তায়। জয়দেবপুর চৌরাস্তায় আজ মুক্তিযোদ্ধার যে ভাস্কর্য দেখা যায় তা সেই প্রতিরোধ যুদ্ধের স্মরণে। ১৯৭১ সনের ১৯ শে মার্চ ছাত্র-জনতার সাথে পাকসেনাদের প্রথম সংঘাত শুরু হয় জয়দেবপুর চৌরাস্তায়- ঐ সশস্ত্র জনতার সংঘর্ষে পাকসেনাদের গুলিতে ৪ জন শহীদ হন। ঐ সশস্ত্র জামায়েতের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনাব শামসুল হক। ঐ এলাকার নির্বাচিত এম.এন.এ হিসেবে। ঐ আন্দোলনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথী ছিলেন হাবিবুল্লাহ সাহেব সাবেক এম,পি, আ ক ম মোজাম্মেল হক, শ্রমিক নেতা সাত্তার, শহীদুল্লাহ বাচ্চু, হারুন ভূইয়াসহ আরও অনেকে। ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ শুরু হবার পিছনে জয়দেবপুরের

www.pathagar.com

১৯শে মার্চের ঐ এলাকার নির্বাচিত এম,এন,এ শামসুল হকের নেতৃত্বে সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধের একটি বিরাট অবদান রয়েছে। ১৯৭২ সনে তিনি বাংলাদেশের প্রথম স্থানীয় সরকার ও সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হন। পরে পাট মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব শামসুল হক সাহেব ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। উক্ত মন্ত্রণালয়গুলোতে দায়িত্ব পালন করার সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়েছেন। মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীদের নিকট এমন জনপ্রিয় মন্ত্রী বাংলাদেশে আর কেউ হয়েছেন কিনা সন্দেহ আছে। তথ্যমন্ত্রী থাকার সময় তিনি তথ্য অধিদপ্তরের ক্যামেরাম্যানদের ২/১ জন করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীদের সাথে বিদেশে সফর সঙ্গীর ব্যবস্থা করেন। সমসুল হক সাহেব ১৯৮৪ সনে তথ্য মন্ত্রী হবার আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনে বাংলা সংবাদ রাত ৯ টায় ইংরেজী সংবাদ রাত ৮ টায় প্রচারিত হতো, তিনি বর্তমানে সংবাদ প্রচারের সময় বাংলা সংবাদ রাত ৮ টায় ইংরেজী সংবাদ রাত দশটায় প্রচারের ব্যবস্থা করেন, ঢাকায় অবস্থানকারী বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের অনুরোধে তিনি এই ব্যবস্থা করেন বলে একদিন তার সাথে আলাপের সময় তিনি আমাকে একথা বলেছিলেন।

সামসুল হক সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ছিলেন ১৯৪৮ সন থেকে ১৯৫২ সন পর্যন্ত। তিনি রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনে অন্যান্য জাতীয় নেতা ও কর্মীদের সাথে কারাবরণ করে কয়েক মাস জেল খেটেছিলেন। ঐ সময় যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তারা সবাই সামসুল হক সাহেবকে সম্মান শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমীহ করতেন। এইসব ছাত্ররাই পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের উচ্চপদে চাকুরি করেছেন। ফলে শামসুল হক সাহেব অনেক গরিব ও বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন বিভিন্নভাবে। শামসুল হক সাহেবের কোনও অনুরোধ তাঁর পরিচিত কোন সরকারি কর্মকর্তা প্রত্যাখান করেছেন এমন দৃষ্টান্ত মনে হয় পাওয়া যাবে না। সারা জীবন রাজনীতি করে তিনি ব্যক্তিগত কোনও সম্পদ বাড়ি-গাড়ি করেন নাই। তিনি বাবার অর্থে পাকিস্তানের সময় ক্রয় করা বনানী ১১ নং রোডের বাড়ি ৮০ দশকে বিক্রি করে ধারদেনা মুক্ত হন ও সংসার পরিচালনা করেছেন। বনানীর ১১নং রোডের বাড়ি সহ আরও অনেক পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে রাজনীতি করে মানুষের সেবা করেছেন।

তাজউদ্দিন আহমেদ সাহেবের সাথে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে অনেক দিন বলেছেন "রাজনীতিতে আমার প্রতিষ্ঠা হবার পিছনে শামসুল হক ও ফকির সাহাবুদ্দিনের অবদান কোনও দিন আমি শোধ করতে পারবো না। ঢাকা শহরে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শামসুল হক এবং কাপাসিয়াতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ফকির সাহাবউদ্দিন যা করেছে তা কোনও দিন ভুলবার নয়। আমার শরীরের সমস্তরক্ত ও যদি দুইজনকে দান করি তবুও আমার ঋণ শোধ হবে না।' জনাব শামসুল হক ১৯৫৪ সনে যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী হিসেবে এমএলএ নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯৫৬ সনে আতাউর রহমান খান সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের মূখ্যমন্ত্রী হলে জনাব শামসুল হক তাঁর রাজনৈতিক

www.pathagar.com

সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ৬ দফা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একজন বিশ্বস্তসহকারী হিসেবে আন্দোলন করেছেন এবং আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য সংগঠক হিসেবে কাজ করেছেন ও জেল খেটেছেন। ১৯৬৯ সনের গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৬৯ সনে আইয়ূব খানের পতনের কয়েকদিন আগে রাওয়াল পিণ্ডিতে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের যে ব্যবস্থা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের দলে যে ১০জন সদস্য ছিলেন, তার মধ্যে শামসুল হক সাহেব ছিলেন একজন। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ জন সদস্য তাদের সংক্ষেপে বলা হতো এম,এন,এ,। ১৯৭০ সনের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে সামসুল হক সাহেব কালিয়াকৈর, গাজীপুর সদর, শ্রীপুর থানা থেকে এম,এন,এ নির্বাচিত হয়েছিলেন, ১৯৭৩ সনে কালিয়াকৈর শ্রীপুর থেকে এম,পি, নির্বাচিত হয়েছিলেন। শামসুল হক সাহেবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো– তিনি তাজউদ্দিন আহমদের জানি দোস্ত ছিলেন, তার আচার ব্যবহার ছিল মাধুর্য্যমণ্ডিত, নিরাহংকার, এবং একজন সৎমানুষ। বই, পুস্তক পত্র-পত্রিকা পড়ার জন্য তিনি বহু সময় ব্যয় করতেন।

বাংলাদেশের মানুষের সব সময় একটি কথা বলতে শোনা যায়, যে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনও ব্যক্তি নেই যাকে অনুসরণ করা যায়, নূতন প্রজন্মকে বলা যায় ঐ ব্যক্তির চলার পথ অনুসরণ করো, কথাটা খুবই সত্য। এর মধ্যেও আমি বলবো সামসুল হক সাহেব একজন দৃষ্টান্ত, যাকে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে অনুসরণীয় চরিত্র হিসেবে গ্রহণ করার জন্য বলা যায়। বাংলাদেশ ও বাঙালি মুসলমানদের স্বার্থে শামসুল হক সাহেবের স্মৃতি ও চরিত্রের কথা ধরে রাখা দরকার, তার নামে বড় রাস্তা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবাসের নাম করা উচিৎ, মহৎ প্রাণ মহৎব্যক্তি শামসুল হকের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, তাঁর ত্যাগ তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে। এতে শামসুল হক সাহেবের কোনও লাভ হবে না, তিনি পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছেন ১৯৯৮ সনের ১৬ই জুন, লাভ হবে আমাদের বাঙালি মুসলমানদের, আমরা বলতে পারবো আমাদের মধ্যে একজন শামসুল হক জন্ম নিয়েছিলেন।

২৩/৮/২০০৮

শনিবার-সকাল ৬টা থেকে ৮টা

পিন্স টাওয়ার

১৩৫/এ, এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

www.pathagar.com

ইসমাইল মোহাম্মদ (উদয়ন চৌধুরী) এবং বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতি

মতিঝিলের সমকাল পত্রিকার অফিসে পরিচয় হয় ইসমাইল মোহাম্মদ (উদয়ন চৌধুরী)র সাথে ১৯৭৫ সালে।

কবি সিকেন্দার আবু জাফর সাহেবের মৃত্যুর পরে তিনি বনেদি ও প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা সমকাল সম্পাদনার ভার নেন।

১৯৭৫ সনের পরে ১৯৮৬ সন পর্যন্ত সমকাল পত্রিকা অফিসে প্রায় প্রতিদিন নিয়মিত বসতেন আবু জাফর সামসুদ্দিন, হাসান হাফিজুর রহমান, ব্যারিষ্টার সেলিম, অজয় রায় পরে শওকত ওসমান। ১৯৭৪ সন থেকে ১৯৮১ সন পর্যন্ত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯ পর্যন্ত সাপ্তাহিক অগ্নিবীনা পত্রিকায় সাংবাদিক ও বিজ্ঞাপন ম্যানেজার হিসেবে কাজ করি। যার জন্য ১০, ১১টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যায়ে ক্লাস করে মতিঝিলে বিভিন্ন অফিসে কাজ সেরে সমকাল অফিসে ২/১ ঘন্টা প্রায় প্রতিদিন বসতাম। এমনি ভাবে উদয়ন ভাইয়ের একজন এক নিষ্ঠ ভক্ত ও শিষ্য হয়ে যাই। তিনি সাপ্তাহিক অগ্নিবীনা পত্রিকায় ১৯৭৭,৭৮,৭৯ সনে জিয়াউর রহমানের শাসনের বিরুদ্ধে জালাময়ী লেখা লিখতেন নিয়মিত। ঐ সময়ে আবার উদয়ন ভাইয়ের নেতৃত্বে আমরা বিকেলে এবং রাতে নিয়মিত আবাহনীর ফুটবল খেলা দেখতে যেতাম- ত্রিদিব দস্তিদার, নির্মলেন্দু গুন, কবি সানাউল হকসহ অনেকে।

সমকাল পত্রিকা ঢাকার সাহিত্যে জগতে খুব প্রভাবশালী সাহিত্য পত্রিকা ছিল প্রায় ৩৫ বছর। কাজেই ঐ অফিসে বাংলাদেশের অনেক কবি সাহিত্যিক নিয়মিত যাতায়াত করেছেন। উদয়ন চৌধুরী ভাই অনেক সিনিয়র লোক ছিলেন, মনে হয় তিনি ১৯৩৪ সনের ম্যাট্রিক এবং ১৯৩৮ সনের গ্রাজুয়েট। গ্রাজুয়েট হয়ে তিনি কলকাতায় চলে যান এবং সেখানে সিনেমা শিল্পের সাথে জড়িয়ে পরেন। কলকাতায় তিনি সিনেমার গল্প বা চিত্র নাট্য লিখেছেন, সিনেমা পরিচালনা করেছেন বেশ কয়েকটি ছবির। ঐ সব ছবি হিট হয়েছিল বলে শুনেছি।

তিনি ১৯৬০ সনে কলকাতা থেকে আবার ঢাকায় চলে আসেন এবং সিনেমার চিত্র নাট্য লেখার কাজেই নিয়োজিত হন, এটাই ছিল ওনার নেশা এবং পেশা। সিনেমায় আমি খুব একটি উৎসাহ পাই না, যার জন্য এ বিষয়ে আমার ধারণা কম তাই যা শুনেছি তা খুব মনে নেই। তবে উদয়ন চৌধুরী সাহেবের সাথে দীর্ঘদিন থেকে এবং তার আশে পাশের লোকজন যারা বাংলাদেশ ও পূর্ব পাকিস্তানের সিনেমার দিকপাল তাদের কাছ থেকে যা শুনেছি তা হচ্ছে গত ৪০ বছরে ঢাকাতে যদি একশটি হিট, রুচিশীল দর্শক নন্দিত উঁচুমানের ছবি হয়ে থাকে তাঁর ৯০ টি ছবির কাহিনীকার বা চিত্রনাট্য লেখক উদয়ন চৌধুরী।

উদয়ন চৌধুরীর আর একটি খুব বড় কাজ স্বাধীনতা যুদ্ধের ১৫ খণ্ডের ইতিহাস, বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত। জনাব হাসান হাফিজুর রহমান

www.pathagar.com

সাহেব বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণায়লয়ের এই ১৫ খণ্ড ইতিহাস রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সম্পাদক ছিলেন। কবি হাসান হাফিজুর রহমানও খুব শিক্ষিত ভালো সংগঠক ও মাধুর্য্যময় ব্যবহারের ব্যক্তি ছিলেন। রতনে রতন চেনে, কাজেই হাসান হাফিজুর রহমান চিনেছিলেন উদয়ন চৌধুরীকে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ১৫ খণ্ডের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসের যে বই বের হয়েছে আমি খুব দায়িত্ব নিয়ে ও দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি এ বৃহৎ কাজের উদয়ন চৌধুরীর একক অবদান ৭৫ ভাগ এবং হাসান হাফিজুর রহমানসহ অন্য সবার অবদান ২৫ ভাগ।

কথাটি আমি উদয়ন ভাইকে বেশ অনেক দিন বলেছি এবং জিজ্ঞাসা করেছি উদয়ন ভাই আমার একথা সত্যি না মিথ্যা। উদয়ন ভাই জবাবে বলেছেন ''বাবলু নিজের কথা নিজে বলা মানায় না। তুমি কোন কাগজে কথাটি লিখে প্রকাশ করো দেখি কেউ এ কথার প্রতিবাদ করে কিনা।'' আমার খুব দুঃখ উদয়ন ভাই ২০০৪ সনের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মৃত্যু বরণ করেছেন প্রায় ৯০ বছর বয়সে। কিন্তু তিনি বেঁচে থাকতে এ কথাটি লিখে কোন কাগজে প্রকাশ করা হয় নাই আমার অলসতাপূর্ণ স্বভাবের জন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পের কাজ করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান, কবি ত্রিদিব দস্তিদার, আমার বন্ধু আফসান চৌধুরীসহ কয়েকজন। এদের মধ্যে হাসান হাফিজুর রহমান, ত্রিদিব দস্তিদার মারা গিয়েছেন, বেঁচে আছেন আমার বন্ধু আফসান চৌধুরী সাহেব। স্বাধীনতা যুদ্ধের ১৫ খণ্ডের ইতিহাস বই বের হওয়ার জন্য উদয়ন চৌধুরীর একার অবদান ৭৫ ভাগ এই মন্তব্যের কতটা সত্য আর কতটা মিথ্যে তা বন্ধু আফসান চৌধুরীর কাছ থেকে জানার জন্য খুব প্রতিক্ষায় রইলাম। আমার খুব দুঃখ আমি নিজে এবং বাংলাদেশের কোন কবি বা লেখক স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্পে উদয়ন চৌধুরীর অবদান নিয়ে কেউ উদয়ন ভাই বেঁচে থাকতে কিছু লিখে নাই। তবে উদয়ন ভাইকে দিয়ে জমের মত লেগে থেকে কবি হাসান হাফিজুর রহমান কাজ করায়ে নিয়েছেন তা আমি খুব কাছে থেকে ভালোভাবে দেখেছি, এর জন্য হাসান হাফিজুর রহমান খুবই প্রশংসা ও ধন্যবাদ পাবার যোগ্য।

উদয়ন চৌধুরী বা ইসমাইল মোহাম্মদ একজন উঁচু দরের মননশীল লেখক ছিলেন। তিনি দেশ, সমাজ, সম্প্রদায়িকতা মানুষের মূল্যবোধ, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে গত ৪০ বছরে অনেক মননশীল লেখা লিখেছেন এবং তার বইও আছে।

উদয়ন চৌধুরী বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু গুণগত মানের বাংলা গদ্য লেখক বলে কবি লেখক আহমদ ছফা অনেক জায়গায় অনেক বার বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেছেন, কেউ আহমদ ছফার একথার প্রতিবাদ করেছেন বলে শুনে নাই। আরও অনেক কবি সাহিত্যিক আহমেদ ছফার মতের সাথে এমত হয়ে একথা বলেছেন যে উদয়ন চৌধুরী বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নত মানের বাংলা গদ্য লেখক। উদয়ন চৌধুরী কথাও বলতেন শুদ্ধ উচ্চারণে শুদ্ধ বাংলায়, ওনার মত এত বিশুদ্ধ সুন্দর উচ্চারণে ঢাকা শহরে আর কেউ কথা বলেন তা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

১৯৮৩ সনে ঢাকায় প্রখ্যাত আইনজীবী ফকির সাহাব উদ্দিনের বাড়িতে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির যে কমিটি গঠন হয়, এই কমিটিতে ডক্টর আজিজুর রহমান মল্লিক

www.pathagar.com

সভাপতি ও উদয়ন চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৮৩ সন থেকে আমি ১৯৯৪ সন পর্যন্ত ঐ কমিটির একজন কর্মকর্তা ছিলাম। উদয়ন চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করা এবং ঐ কমিটি করার পিছনে আমার বিরাট অবদান ছিল। বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মুজিব নগর সরকারের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী প্রয়াত আব্দুল মান্নান, আমি, উদয়ন চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম বেদু ও জাকারিয়া সিরাজী এই পাঁচ জনে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির ঐ কমিটির কর্মকর্তা ও সদস্যদের নাম ঠিক করেছিলাম, ঐ সময়ের ভারতের মাননীয় হাই কমিশনার আই,পি খোশলা সাহেবের পরামর্শে। ঐ কমিটিতে বাংলাদেশের সবচেয়ে উন্নত মানের মানুষেরা ছিলেন, তাদের নাম-যশ, ত্যাগ, বিদ্যা, শিক্ষা অনেক উঁচু ছিল। আজ ২০০৮ সনে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির যে কমিটি তা ঐ কমিটির গুণগত মানের সম্পূর্ণ উল্টা।

উদয়ন ভাই মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির কার্যকরী সভাপতি ছিলেন। যতদিন জীবিত ছিলেন তিনিই ছিলেন বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতির মুখ্য ও মূল ব্যক্তি। উদয়ন চৌধুরী জীবিত থাকতে বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতিতে আমার কোন কথাকে তিনি অবজ্ঞার সাথে দেখেন নাই, আমি যা বলেছি তাই তিনি সমর্থন করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আমার প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ভারত মৈত্রী সমিতিতে আমার আর কোন অস্তিত্ব নেই।

ইসমাইল মোহাম্মদ্ উদয়ন চৌধুরীর অপর একটি বিরাট অবদান এদেশের কবি সাহিত্যিকদের মস্কো পন্থী কমুনিষ্টদের সমর্থন থেকে বঙ্গবন্ধু এবং আওয়ামী লীগ পন্থী করা। আবু জাফর সামসুদ্দিন সাহেব, শওকত ওসমান সাহেবের মতো উঁচু স্তরের পন্ডিত ও লেখকরা উদয়ন চৌধুরীকে ভাই বলে ডাকতেন। আবু জাফর সামসুদ্দিন সাহেবের জন্ম ১৯১১ সনে। এ থেকে বুঝা যায় উদয়ন চৌধুরী কোন পর্যায়ের মানুষ ছিলেন।

উদয়ন চৌধুরী সাহেব যেহেতু ১৯৩৮ সনে ঢাকা থেকে বি,এ পাশ করে কলকাতায় গিয়ে ১৯৬০ সন পর্যন্ত কলকাতায় সিনেমা শিল্পের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত ছিলেন, সে জন্য ১৯৭১ সনে তিনি কলকাতায় গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে কলকাতা ও বোম্বের সিনেমা শিল্পের নায়ক, নায়িকা, প্রযোজক, পরিচালকদের সংগঠিত করতে পেরে ছিলেন সহজভাবে, যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।

১৯৮২ সন থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত আমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক পরিবর্তনের যতগুলো নিয়মিত অনিয়মিত সংখ্যা বের হয়েছে তার প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় ইসমাইল মোহাম্মদ উদয়ন চৌধুরী নিয়মিত লিখেছেন, যার জন্য সাপ্তাহিক পরিবর্তনের গুণগত মান ছিল উঁচু। আশা করি পাঠক পাঠিকারা এ থেকে বুঝে নিতে পারবেন আমার সাথে উদয়ন চৌধুরীর কত নিবিড় ও ভালো সম্পর্ক ছিল।

২৬/৯/২০০৮
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

মানবতাবাদী মানুষ জনাব রশীদ আহমদ আর নেই-

আমরা গভীর দুঃখ ও বেদনার সাথে পরিবর্তনের পাঠক/পাঠিকাদের জানাচ্ছি যে, সাপ্তাহিক পরিবর্তনের অন্যতম উপদেষ্টা জনাব রশীদ আহমদ আর জীবিত নেই। গত ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ সনে, তিনি লন্ডনে পরলোক গমণ করেছেন। (ইন্নালিল্লাহে......... রাজেউন)।

জনাব রশীদ আহমেদ বেঙ্গল এভিয়েশন লিঃ, বেঙ্গল এয়ার লিফট, এয়ার এ্যালায়েন্সের সত্বাধিকারী। তিনি আটাবের সভাপতি ও ট্যুর বাংলা লিঃ এর চেয়ারম্যান।

জনাব রশীদ আহমেদ একজন ক্রীড়া অনুরাগী হিসেবে বাংলাদেশ ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ও সূর্য তরুণ ক্লাবের সভাপতি। সাপ্তাহিক পরিবর্তনের ক্রীড়া সাংবাদিক হিসেবে তিনি ১৯৮৬ সনে মেক্সিকোতে বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি ঢাকা ক্লাবের গলফ চেয়ারম্যান এবং প্রতিদিন নিয়মিত গলফ খেলতেন। ঢাকা শহরে অনেক অর্থনৈতিক অস্বচ্ছল ব্যক্তি তার আর্থিক সাহায্য সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী হয়েছেন। একজন উদার মুক্তমনের সদাহাস্য মুখের মানুষ হিসেবে জনাব রশীদ আহমদ তাঁর পরিচিত জনদের মাঝে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবেন। জনাব রশীদ আহমেদ গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন পরিচালক, ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স ও ডেল্টা মেডিকেল সেন্টারেরও তিনি পরিচালক। তিনি ১৯৫৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়র ক্যামেষ্ট্রিতে অনার্স পড়ার সময়ে বি,এস,সি পাশ কোর্সে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে পি,আই,এ-তে চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৮০ সনে তিনি বাংলাদেশ বিমানের চাকুরী থেকে পদত্যাগ করে ব্যবসা শুরু করেন। তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। ১৯৭১ সনে ম্যানিলায় পিআইএ'র জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে চাকুরীতে থাকা সময়ে তিনি এপ্রিল মাসেই পিআইএ'র চাকরী ছেড়ে দিয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সংগঠক হিসেবে কাজ করেন। ম্যানিলাতে ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী সভাপতি ও রশীদ আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক সমিতির।

সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদককে তিনি নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন এবং একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মনে করতেন। গত ছয় বছর দুইজনে প্রায় প্রতিদিন অনেক সময় একত্রে থাকতেন। গত ১৭ সেপ্টেম্বর শনিবার তিনি চিকিৎসার জন্য রাত ১১ টায় বাংলাদেশ বিমানে লন্ডন যান, সবার মন খারাপ, তিনি হাসিমুখে সবাইকে সান্তনা দিচ্ছিলেন- "আরে চিন্তার কোনও কারণ নেই, অল্পদিনের মধ্যেই আমি ভালো হয়ে ফিরে আসছি।"

রাত নয়টার দিকে যখন তার বেডরুমে অন্য কেউ ছিলেন না,- তখন সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদককে বুকে জড়িয়ে ধরে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদেন এবং আবু মোহাম্মদ খান বাবলুকে তার একটি ছোট ছেড়া হাত ব্যাগ আলমারিতে বের করে ফুপিয়ে ফুপিয়ে

www.pathagar.com

কান্নারত অবস্থায় প্রদান করেন এবং বলেন– "এই ব্যাগটি আমার সবচেয়ে আদরের সবচেয়ে প্রিয়, কোটি কোটি টাকার বিনিময়ে এই ব্যাগ আমি কাউকে দিব না, ব্যাগটি তোমাকে দিলাম যদি ভালো হয়ে ফিরে আসি আমাকে ফিরে দিবে, আর যদি ফিরে না আসি তুমি ভালোভাবে এই ব্যাগটি রেখে দিবে, জীবনের অসহায় অবস্থায় এই ছোট ব্যাগটি নিয়ে ব্যবসা করে কোটিপতি হয়েছি। আমার বিশ্বাস এই ব্যাগটি যার কাছে থাকবে সেও কোটিপতি হবে। আমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসটি তোমার কাছে রেখে গেলাম।" তার মৃত্যুতে স্বাভাবিক ভাবেই সাপ্তাহিক পরিবর্তন অর্থনৈতিক দিকসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে। আমরা তাঁর আত্মার মঙ্গল কামনা করি।

মরহুম রশীদ আহমদ ১৯৩২ অথবা ১৯৩৩ সনে কক্সবাজার জেলার ঈদগায়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তার বড় ভাই ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার সদস্য প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ৪০এর দশকের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ফরিদ আহমদ। রশীদ আহমদের বাবার নাম নাদেরুজ্জামান, তিনি হাইস্কুলের অংকের শিক্ষক ছিলেন। ১৯২০, ১৯৩০, ১৯৪০ এর দশকে। রশিদ আহমদ ১৯৪৯ সনে ম্যাট্রিক পাশ করে সিলেটের এমসি কলেজ থেকে ১৯৫১ সনে এইচ,এস,সি পাশ করেন। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৫১ সন পর্যন্ত রশীদ আহমদ সাহেবের সাথে সিলেট এম,সি কলেজে যারা একসাথে এক ক্লাশে পড়েছেন তাঁরা হলেন- গ্রীণ ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিঃ এর প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নাসির আহমদ চৌধুরী, ১৯৫৭ ব্যাচের সি,এস,পি, বাংলাদেশ সরকারের সচিব হেদায়েত আহমদ, ফারুক আহমেদ চৌধুরী, ডাঃ জহুরুল ইসলাম, এ, এস, মাহমুদ, ডাঃ সদরুদ্দিন আহমদ, জনাব তোফাজ্জল আলী প্রমুখ।

মরহুম রশীদ আহমদ কক্সবাজার জেলার ঈদগাও ফরিদ আহমদ কলেজের একক প্রতিষ্ঠাতা, আর এই কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য রশীদ আহমদকে সর্বপ্রথম প্রস্তাব, অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সার্বিক সহযোগিতা করেছেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৮৮ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বর সাপ্তাহিক পরিবর্তনে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব : রিচার্ড নিক্সন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন পরলোক গমন করেছেন ১৯৯৪ সনের এপ্রিল মাসের ২২ তারিখে। প্রয়াত মার্কিন প্রেসিডেন্টের মৃত্যুর পর জনাব শাহ এ, এম, এস কিবরিয়া একটি ইংরেজি ও একটি বাংলা দৈনিকে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মূল্যায়ন করে দু'টি নিবন্ধ লিখেছেন, যাতে কিবরিয়া সাহেব প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে, মানুষ হিসেবে খাটো করে দেখার চেষ্টা করেছেন। নিক্সনকে বাংলাদেশ বিরোধী ও পাকিস্তানী প্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত করারও প্রয়াস পেয়েছেন। জনাব কিবরিয়া লেখায় উল্লেখ করেছেন যে, প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নিক্সন সম্পর্কে তাঁর এসব লেখার প্রয়োজন হতো না যদি না বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে বা পত্র-পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের স্বপক্ষে তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাত্রাতিরিক্ত লেখা প্রকাশ হতো।

আমি গত বেশ কিছুদিন হলো ঢাকা থেকে প্রকাশিত ১৪টি দৈনিক পত্রিকা প্রতিদিন নিয়মিত পড়ি বা দেখি, কিন্তু আমার চোখে আজ ১০/৫/৯৪ তারিখ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মৃত্যুর পরে কোনো পত্রিকায় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগ জানিয়ে মাত্রাতিরিক্তভাবে কোনো লেখা প্রকাশ পেয়েছে বলে চোখে পড়ে নি। যদি কিবরিয়া সাহেব দয়া করে নিক্সনের প্রতি আবেগ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রকাশিত লেখাগুলোর কথা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতেন তাঁর লেখায় তবে পড়ে দেখে বুঝতে পারতাম কোথায় মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে, যার জন্য কিবরিয়া সাহেবের এতো খারাপ লেগেছে। যাক কিবরিয়া সাহেব প্রয়াত প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ এনেছেন তা নিয়ে বাস্তব তথ্যের আলোকে কিছু আলোচনা করতে চাই।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে একটু অনুরাগ আছে এইজন্য যে, ১৯৬৮ সালে ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী হামফ্রেকে পরাজিত করে নিক্সন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তখন আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তখনই আমি ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সবে জড়িত হয়ে পড়েছি, রাজনীতিতে সবেমাত্র আমি বা আমার বয়সের অনেকে হাঁটাহাঁটি শুরু করেছি, সেই সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার চলছে-যার বিবরণ পত্রিকায় পড়ে আমাদের চোখের জল পড়ছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের নেতা থেকে জাতীয় নেতা হবার পথে। কাজেই সেই সময়ে নিক্সনের প্রেসিডেন্ট হওয়া এবং ছাত্রলীগের রাজনীতিতে আমার যাত্রা শুরু প্রায় একই সময়ে। একারণেই মনে হয় প্রেসিডেন্ট নিক্সন আমার মনের পাতায় একটা স্থান করে নিয়েছেন। এ ছাড়াও নিক্সনের প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার আরও একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে নিক্সন একজন গরিব মানুষের সন্তান, ছাত্র জীবনে নিক্সনের বহুদিন খাবার জোটে খুব কষ্টে, ভালো কাপড় পরতে পারে নি স্বীয়

www.pathagar.com

চেষ্টা ও অটল মনোবলের মাধ্যমে, তিনি শিক্ষাজীবন শেষ করেন উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণ করে খুবই দুঃখ কষ্ট সয়ে। আমিও একজন গরিব মানুষের সন্তান,স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমিও দু'একদিন পয়সার অভাবে না খেয়ে থেকে দুঃখকষ্টের মধ্যে অনার্সসহ মাস্টার ডিগ্রি পাস করি। এক্ষেত্রে নিক্সন ছিলেন আমার ছাত্রজীবনে প্রেরণার অন্যতম উৎস।

এ লেখাটা লিখবার সময়ে আমি আমার নিজের কাছেই পরিষ্কার নই, নিক্সনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা কি আমার বয়সের একজন হিরোর প্রতি অনুরাগ নাকি রাজনীতির সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ফলশ্রুতি। এ বিচারের ভার পাঠক-পাঠিকাদের ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি এবং শাহ এ.এম.এস. কিবরিয়া সাহেবের লেখায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন সম্পর্কে এ মূল্যায়ন করেছেন তা নিয়ে কিছু আলোচনা করে আমার মতামত জানাচ্ছি।

কিবরিয়া সাহেবের লেখায় যেসব বিষয় এসেছে তা হচ্ছে: প্রথমত প্রেসিডেন্ট নিক্সন একজন বিতর্কিত এবং নীতিজ্ঞানহীন ব্যক্তি যিনি একমাত্র প্রেসিডেন্ট যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন জনমতের চাপে।

দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট নিক্সন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ব্যক্তি এবং পাকিস্তানের স্বপক্ষের কাজ করেছেন ১৯৭১ সনে।

তৃতীয়ত তিনি কমুনিস্ট বিরোধী বক্তব্য দিয়ে ক্ষমতায় এসে কমুনিস্ট চীনের সঙ্গে মিতালী করেছেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে ভোটে জিতে ভিয়েতনামের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন।

মূলত এই তিনটি বিষয়ই কিবরিয়া সাহেবের লেখায় নিক্সনের বিরুদ্ধে অভিযোগ। এবারে প্রথম অভিযোগ প্রসঙ্গে বলতে চাই যে– নিক্সন একজন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন বলে তিনি জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে নীরবে নিভৃতে সরে দাঁড়ান। তিনি কংগ্রেস দ্বারা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আদালত দ্বারা ওয়াটারগেট কেলেংকারির জন্য অভিযুক্ত হন নি। তিনি ইচ্ছা করলে কংগ্রেস এবং আদালত পর্যন্ত যেতে পারতেন তাদের রায়ের জন্য। কিন্তু নিক্সন তা করেননি। শুধু পত্রিকায় তাঁর বিরুদ্ধে রিপোর্ট বের হয়েছে, বেশ কিছু মার্কিন জনমত তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছে।

বিরোধী দলের কয়েকজন কংগ্রেস সদস্য তাঁর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন, 'তাতেই নিক্সন স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন, এ ঘটনাটি কি খুবই কম তাৎপর্যপূর্ণ? এ থেকে কি নিক্সন চরিত্রের একটা মহত্ত্বের লক্ষণ পাওয়া যায় না? কিবরিয়া সাহেবের কি মনে হয় জানি না তবে আমি কিন্তু এজন্য নিক্সনকে যথেষ্ট সম্মান ও ভক্তি করি, তার আত্মমর্যাদাবোধের জন্য। এই ওয়াটার গেট কেলেংকারি নিয়েও কথা আছে যেহেতু প্রেসিডেনট নিক্সন যুদ্ধবিরোধী ভূমিকার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের

www.pathagar.com

সঙ্গে আতাঁত করে উত্তেজনা কমাতে চেয়েছেন, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের জন্য কাজ করেছেন।' সেজন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্রের ব্যবসায়ীরা নিক্সনের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে কিছু সাংবাদিককে নিক্সনের পেছনে লাগিয়ে দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করে তাঁকে হেনস্থা করেছেন। নিক্সনের স্বপক্ষে এ বক্তব্যটিতে খুব হালকা করে দেখলে তার প্রতি খুব সুবিচার করা হবে বলে মনে হয় না। কাজেই ওয়াটার গেট কেলেংকারি ও প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর পদত্যাগ করার জন্য নিক্সনকে ঘৃণা করতে হবে এটা অনেকেই মেনে নিলেও সবাই মেনে নেবেন না অতি সহজে।

আমরা যারা আমেরিকার রাজনীতি বা আমেরিকার শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কিছুটা খোঁজখবর রাখি তারা জানি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী তিনটি প্রতিষ্ঠান খুবই গুরুত্বপূর্ণ বা ক্ষমতাশীল: আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, আমেরিকার কংগ্রেস, আমেরিকার সুপ্রিমকোর্ট। এই তিনটির ক্ষমতা সমান, কোনোটির চেয়ে কোনোটির ক্ষমতা কম নয়, বেশিও নয়। একথা লিখছি কিবরিয়া সাহেবকে এবং পাঠক-পাঠিকাদের স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য যে, আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা আমাদের বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস সাহেবের ক্ষমতার মতো নয়। আমেরিকা প্রেসিডেন্ট একজন খুবই ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারেন, যেমন কেনেডি, ট্রুম্যান, আইজেনহাওয়ার যুদ্ধ করেছেন, বোমা ফেলেছেন, দেশে দেশে মানুষ হত্যা করেছেন, এরজন্য আমেরিকার কংগ্রেস ও সুপ্রিমকোর্ট এদের শাস্তি দেন নি। কাজেই প্রেসিডেন্ট নিক্সনও যদি তাঁদের মতো যুদ্ধ করতেন তবে মনে হয় তারও কিছুই হতো না। ১৯৭১ সনে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নিক্সন যদি পাকিস্তানকে- সত্য সত্যই মনেপ্রাণে সমর্থন করতেন, চীনের মাওসেতুং সৌদী বাদশা ফয়সালের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন দিতেন তবে ১৯৭১ সনে যে দুঃখকষ্ট করে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি তারচেয়ে আরও অনেক অনেক বেশি দুঃখকষ্ট আমাদের সহ্য করতে হতো, আরও কয়েক লাখ বাঙালির জীবন বিসর্জন দিতে হতো, আরও কয়েক মাস বা কয়েক বছর আমাদর স্বাধীনতা যুদ্ধ চলতো, বাংলায় আরও বাঙালির রক্তে রক্তগঙ্গা বয়ে যেতো। সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর অভিমুখে রওনা হবার সংবাদে মহান নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের লিওনেদ ব্রেজনেভ যখন অষ্টম নৌবহর প্রেরণ করার নির্দেশ প্রদান করেন সঙ্গে সঙ্গে নিক্সন গুরুতর সংঘাত এড়াবার জন্য সপ্তম নৌবহর ফিরিয়ে নেন। যদি তিনি সপ্তম নৌবহর ফিরিয়ে না নিতেন তবে কি হতো তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আমি একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য (এফ.এফ. নং টি/১৮১ সেক্টর নং ৬) হিসেবে যুদ্ধ করেছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে। একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে অবশ্যই নিক্সনকে আমি সম্মান করি, তাঁর শুভবুদ্ধি উদয় হবার জন্য। যত তথ্যই ঘাটা যাক '৭১ সনে গণচীনে যেভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র দিয়ে জাতিসংঘে ভেটো দিয়ে সাহায্য করেছি

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৭১ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার বা প্রেসিডেন্ট নিক্সন তা করেন নি বলেই আমার বিশ্বাস। অথচ পাকিস্তানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল, দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও ছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে কি '৭১ সনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক বা বন্ধুত্বের কোনো চুক্তি ছিল? ছিল না। এরপরেও ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসেই আওয়ামী লীগ নেতা এম.আর. সিদ্দিকী, অধ্যাপক রেহমান সোবহান সাহেবরা যখন আমেরিকায় গিয়ে বাংলাদেশে পাকিস্তানী গণহত্যার কথা তুলে ধরেন তখন নিক্সন সরকার পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দেন। ইয়াহিয়া খানের অর্থমন্ত্রী এম.এম. আহমদ ওয়াশিংটন থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসেন '৭১-এর এপ্রিল মাসে। মূলত ওয়াশিংটন থেকে পাক অর্থমন্ত্রী এম.এম, আহমদের এইড কনসোর্টিয়ামের বৈঠক থেকে শূন্য হাতে ফিরে আসবার ফলেই পাকিস্তান '৭১ সনে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে, তা আমরা রেহমান সোবহান সাহেবের লেখা পড়ে জানতে পারছি (দ্রষ্টব্য মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ১৫ খণ্ড)। এটা কি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বাংলাদেশের জনগণের প্রতি নমনীয়তার মনোভাব নয়? যদিও এর জন্য ধন্যবাদ পাবার যোগ্য এম.আর, সিদ্দিকী, রেহমান সোবহান সাহেবরা এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে সঠিকভাবে জনমত সৃষ্টি করার জন্য। মোটকথা ১৯৭১ সনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন যদি সত্যি সত্যি মনেপ্রাণে পাকিস্তানকে সমর্থন দিতেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে মনেপ্রাণে একরোখা ভূমিকা নিতেন, তবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আরও বেশি রক্তক্ষয় হতো, আরও বেশি ধ্বংসযজ্ঞ হতো, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নকে আরও অনেক বেশি শক্তি ক্ষয় করতে হতো।

এরপরে বাংলাদেশ ১৯৭১ সনের ১৬ ডিসেম্বরের স্বাধীন হবার কয়েকদিন পরেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন স্বাধীন বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন, নতুন বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা করা শুরু করেন। কিন্তু চীনের মাওসেতুং, সৌদী বাদশা ফয়সাল কি করেছেন? চীন ও সৌদী আরব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হবার আগ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেন নি। ১৯৭২-৭৩ সনে জাতিসংঘ বাংলাদেশকে সদস্যপদ না দেবার জন্য মাওসেতুং-এর নির্দেশে গণচীন ভেটো প্রয়োগ করেন। সৌদি আরব স্বীকৃতি না দেবার জন্য ১৯৭৪ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারকে বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে হজ্বে পাঠাতে হয় ভারতীয় সরকারের সাহায্য ও তত্ত্বাবধানে। অথচ সেই মাওসেতুং ও বাদশা ফয়সালের মৃত্যুর পরে বাংলাদেশ সরকার কি না করেছেন। মাওসেতুং মারা যাবার পরে বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান সাহেবের সরকার ৪০ দিন যাবৎ সরকারীভাবে রাষ্ট্রীয় শোকদিবস পালন করেছেন। তখন জনাব কিবরিয়া সাহেব কোথায় ছিলেন? এরকম একটি গুরুতর অন্যায় কাজ যে সরকার করেছেন কিবরিয়া

www.pathagar.com

সাহেব কিন্তু তখন সেই সরকারের অধীনে অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চাকরি করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু ও বাংলাদেশে পাইকারী মানুষ হত্যার মদদদাতা মাওসেতুং-এর স্মরণে রাষ্ট্রীয়ভাবে চল্লিশদিন শোক পালন যে সরকার করে তার প্রতিবাদ করে কিবরিয়া সাহেব যদি জিয়া সরকারের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জনতার সামনে এসে দাঁড়াতেন তবে তাকে আমরা অবশ্যই আরও বেশি সম্মানের চোখে দেখতাম। অথচ আজ কিবরিয়া সাহেব প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মৃত্যুর সংবাদ পত্রিকায় ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্যই তার খারাপ লাগছে।

কিবরিয়া সাহেব বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন কর্মকর্তা। তিনি নিক্সনকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন শত্রু বলে মনে করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীর কথা স্মরণ করছি, তিনি কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়ক, বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম স্থপতি ও নির্মাতা, ঘটনার মূল চালিকাশক্তি। ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী কিন্তু ১৯৭১ সনের ৫ নভেম্বর ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের বলেছেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁর এবং ভারতের অতি নিকটতম বন্ধু। নভেম্বর (৭১) ৪ ও ৫ তারিখে দু'দিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলোচনা করে মিসেস গান্ধী মুগ্ধ হয়েছেন (Highly impresed) দু'জনের অসুবিধা দু'জনে বুঝতে পারছেন, ভারত মার্কিন সম্পর্ক আগের চেয়ে এখন অনেক নিকটতর। নিক্সনের সঙ্গে তার মতবিরোধের যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, এর কোনো ধরনের ভিত্তি নেই। ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনের ভূয়সী প্রশংসা করেন (দ্রষ্টব্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্ট ২য় খণ্ড)। কাজেই দেখা যাচ্ছে কিবরিয়া সাহেব ও মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিক্সন সম্পর্কে মতামত দু'ধরনের হচ্ছে।

এবারে ব্যক্তি নিক্সন সম্পর্কে দু'একটি কথা বলতে চাই। নিক্সন সাহেব প্রেসিডেন্ট থেকে পদত্যাগ করার পরে প্রায় বিশ বছর জীবিত ছিলেন, এই বিশ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার বাইরের পৃথিবীতে অনেক অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিক্সন এসব ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য কোনোদিন কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে আমাদের চোখে পড়ে নি। নীরবে নিভৃতে তিনি একাকী জীবনযাপন করেছেন। এ থেকেও এই মানুষটার চরিত্রের নির্মলতার প্রমাণ পাওয়া যায়। গুরুতর অসুস্থ হবার পরে মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তিনি তাঁকে চিকিৎসা বা কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেবার জন্য নিষেধ করেছেন। মৃত্যুর পরে তার মরদেহ অতিসাধারণ মানুষের মতো সমাহিত করার জন্য বলেছেন-কোনো হৈ-চৈ-বা আড়ম্বর করার জন্য নিষেধ করেছেন। এসব থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি একজন খুবই ভালো মানুষ ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা একাত্তর সনে তিনি শুভবুদ্ধির কাছে, জনমতের কাছে মাথা নত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পদক্ষেপ নিয়েছেন। কোনো জিদ গোয়ার্তুমি বা ক্রোধ দ্বারা পরিচালিত হন নি। জিদ বা

www.pathagar.com

ক্রোধ দ্বারা নিক্সন পরিচালিত হলে বাংলাদেশে আরও কয়েক লাখ লোক নিহত হতো। আমি আবার উল্লেখ করছি আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একজন খুবই ক্ষমতাবান ব্যক্তি। নিক্সন সম্পর্কে আমার এটাই মতামত ১৯৭১ সন প্রসঙ্গে। প্রয়াত নিক্সনের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। ঈশ্বর তাঁর মঙ্গল করুন। ১০/৫/১৯৯৪ ইং।

২৯/০৫/১৯৯৪ তারিখে সাপ্তাহিক রোববারে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

আমার ভাই, আমার বন্ধু জুলফিকার আলী ভুট্টো

আমার ভাই, আমার বন্ধু জুলফিকার আলী ভুট্টো তার পরিচিত জনদের শোক সাগরে ভাসিয়ে অকালে চিরতরে চলে গেলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো তার নিজস্ব স্বভাব, নিজস্ব চরিত্রগুণে স্বমহিমায় উজ্জ্বল এক ব্যক্তিত্ব। যেখানে জুলফিকার আলী ভুট্টো উপস্থিত ছিলেন সেখানেই হাসিঠাট্টা প্রাণ প্রাচুর্যে ভরিয়ে রাখতেন। দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ এসব ভুট্টোর আশেপাশে স্থান ছিল না।

ভুট্টো ভাইকে চিনতাম সেই ১৯৭২ সাল থেকে। ছাত্রলীগের একজন প্রথম কাতারের কর্মী ও নেতা হিসেবে। ১৯৭২-৭৩ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো কবি নজরুল কলেজের ছাত্রলীগের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময় আমি ছিলাম ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। তখন থেকে ভুট্টো বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ৩০ নং মিরপুর রোড এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে নিয়মিত আসা-যাওয়া করতেন। ছাত্রলীগের প্রতিটি কর্মসূচীতে নিয়মিত যোগদান করতেন। ভুট্টো কোনও সময়ই একা চলাফেরা করতেন না। সব সময় বেশ কয়েকজন সঙ্গী থাকত এবং তার উপস্থিতি প্রবলভাবে টের পাওয়া যেত। ১৯৭৫ অথবা ৭৬ থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ২৪৯ নং কক্ষের ছাত্র। সূর্যসেন হলের ২৪৯, ৩৪৯, ৪৪৯, ৫৪৯ নম্বর, এসব কক্ষগুলো বেশ বড়, সম্ভবত ৪/৫টি সিটের কক্ষ। ভুট্টো ভাই ২৪৯ নং কক্ষে থাকতেন ৮-১০ জন ছাত্র এবং তার এলাকার লোকজন নিয়ে। এই ৮-১০ জন সকালে এক সাথে নাস্তা খেতেন, এক সাথে ডাইনিং হলে খাবার খেতেন। মোট কথা সূর্যসেন হলে ১৯৭৫-১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮১/৮২ সাল পর্যন্ত যারা ছাত্র ছিলেন তারা সবাই জুলফিকার আলী ভুট্টোকে খুবই ভালোভাবে চিনতেন তার হাসিঠাট্টা বা সদানন্দময় স্বভাবের জন্য। দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি ছাত্রের কাছে ভুট্টো ছিলেন সবার আপনজন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হবার পরে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে জুলফিকার আলী ভুট্টোর অবদানও উল্লেখ্য। ১৯৭৭-৭৮ সালে সামরিক শাসনবিরোধী হরতালে অংশগ্রহণ করার জন্য দুবার পুলিশের দ্বারা মার খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। এখনও যেন আমি দেখতে পাই রক্তাক্ত ভুট্টোর মাথা দিয়ে প্রবল বেগে রক্ত পড়ার দৃশ্য। সে দিনই তার মুখে হাসি ছিল না। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম তার মলিন চোখ মুখ দেখে, তার মাথা থেকে রক্ত ঝরা দেখে।

১৯৭৯ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং শফিকুল ইসলাম বাবুলের নেতৃত্বে জন্ম নেয় মিজান চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (ভুট্টো-

www.pathagar.com

বাবুল)। জুলফিকার আলী ভুট্টো সেই ছাত্রলীগের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৮০ ডাকসু নির্বাচনে ডাকসুর ভিপি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, এ থেকেও ভুট্টো ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। আমি সে সময়ে ছাত্রলীগের মূল ধারা আওয়ামী লীগ মালেক-রাজ্জাক সমর্থিত ছাত্রলীগের সাথে, ওবায়েদুল কাদের এবং রবিউল আলম চৌধুরীর প্যানেলের একজন সক্রিয় কর্মী। স্বাভাবিকভাবে ভুট্টোর পক্ষে কাজ করার কোনও প্রশ্ন আসে নি। কিন্তু এই নিয়ে ভুট্টো ভাইয়ের মনে সামান্য দুঃখ ছিল না। কোনও দিন ভুলেও বলেন নি "বাবুল ভাই আমি ভোটে দাঁড়িয়েছি দেখবেন।" ভুট্টো কোনও ভণ্ডামির রাজনীতি করেন নি। সস্তা মুখরোচক বিপ্লবী বুলি আওড়াননি বা নিজেকে সমাজতন্ত্রেরপন্থী বলে দাবি করেন নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৭২ থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছাত্র আন্দোলন জুলফিকার আলী ভুট্টোর উপস্থিতি ছিল অবশ্যই প্রথম সারিতে। তিনি ছিলেন শান্তিপ্রিয়, ভদ্র, অমায়িক চরিত্রের মানুষ। তার পরিচিত জনদের সমস্ত দুঃখ কষ্ট নিজের কাঁধে নিতেন, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন।

মানুষ একটু বড় পদ বা পোস্টে গেলে বদলে যায়, কথাবার্তা স্বভাব চরিত্র আগে যা থাকে তা আর থাকে না। কিছু কিছু লোক এর ব্যতিক্রম থাকেন, তারা সব সময় একই ধরণের কথা বলে আচার আচরণেও একই থাকে, পদ ও অর্থপ্রাপ্তির সাথে তাদের আচার-আচরণ বদলায় না। ভুট্টো ছিলেন দ্বিতীয় দলে। তিনি উপজেলা চেয়ারম্যান হয়েছেন। প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন। তিনি তিনবার এমপি হয়েছেন, কিন্তু আচার-আচরণ সেই ছাত্রজীবনের মতোই সহজ ও স্বাভাবিক। কোনও ধরণের কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দিতেন না। সবার সাথে হাসিঠাট্টা জমজমাট ভাব।

ভুট্টোর সাথে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অথবা ঢাকার রাস্তায় যেখানে যে অবস্থাতে দেখা হতো দূর থেকে চিৎকার করে উঠত "ও বাবুল ভাই" বলে। তার চিৎকার বহু লোক শুনতে পেত। পাশাপাশি চলার সময় দেখা হলে বাচ্চা ছেলের মতো লাফ দিয়ে জড়িয়ে ধরতো বাবুল ভাই বলে (সে আমাকে বাবলু না বলে বাবুল ভাই বলতো)। অনেক মন্ত্রী সচিবের কক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে দেখা হয়েছে, কেউ যদি আমাকে হেয় করে বা "অবজ্ঞা করে কোনও কথা বলতেন সাথে সাথে ভুট্টো তার প্রতিবাদ করতেন। বলতেন, "এই মিয়া বাবুল ভাইয়েরে চেনেন আপনি? তিনি একজন বিরাট মুক্তিযোদ্ধা, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান" বেঁচে থাকলে বাবুল ভাই কোথায় থাকত তা জানেন? বাবুল ভাই তাদের সবার স্নেহের পাত্র ছিলেন।" ন্যায় এবং উচিত কথা বলতে সে যত বড় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি হোক না কেন, তার সামনে বলতে ভুট্টো সামান্যতম কুণ্ঠিত হতেন না।

ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গত ২২শে মে, ২০০০ সনে আমি কলকাতা যাই এবং ২৭শে

www.pathagar.com

মে ঢাকায় ফিরে আসি। কলকাতা গিয়ে শুনলাম কলকাতায় বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল এসেছে। ২২ তারিখ তাঁরা দার্জিলিং যান ট্রেনযোগে এবং ২৫শে মে সকালে তাঁরা কলকাতা ফিরে আসেন। প্রথমে আমি শুধু ডেপুটি স্পিকার হামিদ সাহেব এবং দেওয়ান ফরিদ গাজীর নাম শুনি। বাকি আর কারা তা তখনও জানি না। ২৫শ মে বৃহস্পতিবার কলকাতাসহ সারা পশ্চিম বাংলায় কংগ্রেস হরতাল আহবান করেছিল। ফরিদ গাজী সাহেবের সাথে আমার ব্যক্তিগত সম্পর্ক খুবই ভালো। তিনি কলকাতায় আর আমিও কলকাতায় অথচ দেখা হবে না সে কি করে হয়? কাজেই আমি তাঁর সাথে দেখা করার জন্য কিড স্ট্রিটের আমার হোটেল থেকে অল্প দূরে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের উদ্দেশ্যে বাসে উঠলাম। তখন বেলা ১২টার মতো হবে। কাউন্টারে খবর নিলাম দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেব ৩৩৪নং কক্ষে আছেন। ৩৩৪ নং কক্ষে গিয়ে দেখি দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেব রয়েছেন, সেখানে তাঁর বিছানায় আধো শোয়া অবস্থায় রয়েছে আমার প্রিয় ভুট্টো ভাই। দু'জনই আমাকে দেখে চিৎকার করে উঠেন। কক্ষে দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবের ছোট ছেলেও ছিল। গাজী সাহেবের এই ছেলের সাথে আমার কোনও পরিচয় ছিল না। গাজী সাহেবের ছেলে একটি বিদেশী বৃহৎ তেল কোম্পানির এক্সিকিউটিভ। বাবার সাথে কলকাতায় এসেছে। এই চারজনে ঘণ্টাখানেক কথা বললাম। বেলা ১টার মতো বেজে গেল, আমি দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবকে বললাম লিডার, আপনারা তো বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনে লাঞ্চ খেতে যাবেন এখন, কাজেই আমি যাই। গাজী সাহেব বললেন, "তুমি থাকো- তুমিও যাবে আমাদের সাথে।" আমি প্রতিবাদ করে বলি অফিসিয়াল লাঞ্চ আপনারা সরকারি প্রতিনিধি আর আমি বেসরকারি সাধারণ মানুষ, আমার যাওয়া ঠিক হবে না। এ কথা জুলফিকার আলী ভুট্টো শুনে বলেন, "আরে বাবুল ভাই আপনাকে রেখে আমরা দাওয়াত খেতে পারি। আপনি অবশ্যই আমাদের সাথে যাবেন। যদি আপনাকে প্লেট না দেয় তবে আমাকে যে প্লেট দেবে সেই প্লেট দু'জনে ভাগ করে খামু।" অগত্যা বাংলাদেশের সংসদীয় দলের সদস্যদের সাথে আমিও কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল থেকে রওনা দিলাম বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশনের উদ্দেশ্যে। ডেপুটি স্পিকার আবদুল হামিদ, দেওয়ান ফরিদ গাজী, জুলফিকার আলী ভুট্টো, আবুল কালাম আজাদ, মিজানুর রহমান মানু এবং বিএনপির আবদুল ওহাব। এরা সবাই এমপি, আমাদের জাতীয় সংসদের একজন উপসচিবও ছিলেন সস্ত্রীক। আমি দেওয়ান ফরিদ গাজী সাহেবের ছেলে এবং বিএনপির ঝিনাইদহের এমপি আবদুল ওহাবের এক ভাই এই তিনজন প্রতিনিধি দলের বাইরে। বাংলাদেশ হাইকমিশনের এই লাঞ্চে আরো ছিলেন পশ্চিম বাংলার বিধান সভার স্পিকার হাসিম আবদুল হালিম, পশ্চিম বাংলা সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী এবং বালিগঞ্জ বা পার্ক সার্কাস এলাকার এম,এল,এ মি. রথিন দে। বেশ খাওয়া-দাওয়া হলো। গল্পও

www.pathagar.com

জমলো। কলকাতায় বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার হুমায়ুন কবিরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের ছাত্র। ছাত্র জীবনে হুমায়ুন কবিরও রাজনীতি করতেন, তিনি আমার এবং ভুট্টোর ২-১ বছরের সিনিয়র। মোট কথা, আমরা তিনজনই এক সাথে সূর্য সেন হলে ছাত্র রাজনীতি করতাম। বহুদিন পর তিনজনের দেখা হলে সবাই খুশি হলাম। খাবার পরে ২৫শে মে বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বেলা ৩-৪৫ মিনিটে বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিস থেকে হামিদ সাহেব ও মিজানুর রহমান মানু এবং আমি বাদে সবাই দমদম বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। বিমান বন্দরে যাবার সময় পশ্চিম বাংলার স্পিকার হালিম সাহেবের হাত ধরে ভুট্টো বললেন, " হালিম ভাই আপনি কিন্তু বাংলাদেশে আসবেন। কবে আসবেন বলেন। আমি আপনাকে আমার নির্বাচনী এলাকায় নিয়ে যাব। আমার নির্বাচনী এলাকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাকে দেখাব। দেখবেন আমার এলাকার মানুষ আপনাকে পেয়ে কি আদর সম্মান করে, তারা যে খাবার খাওয়াবে জীবনে ভুলতে পারবেন না। স্পিকার হালিম সাহেব বললেন, "অবশ্যই বাংলাদেশে যাব, গেলে আপনার নির্বাচনী এলাকায়ও যাব। ভুট্টো ভাই বললেন তাড়াতাড়ি আসবেন।" এটাই সেদিন ভুট্টো ভাইয়ের শেষ কথা ছিল। আর কোনও দিন পশ্চিম বাংলার স্পিকার হাশিম আবদুল হালিম সাহেবের জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্রিয় নির্বাচনী এলাকা ঝালকাঠি- নলসিটিতে আসা হবে না।

৩০ শে মে মঙ্গলবার ভোরে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মর্নিং ওয়াক করার সময় স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব শফিউর রহমান সাহেবের সাথে কলকাতা ভ্রমণের কথা বলছিলাম, ভুট্টোর নাম উচ্চারণ করার সাথে সাথে তিনি বলেন-জুলফিকার আলী ভুট্টো মারা গিয়েছেন জানেন তো? আমি বলি- কি বলেন? অন্য কোনও ভুট্টো মনে হয়। তিনি বলেন " না আমি নিজে কাল রাত এগারটার টেলিভিশনের সংবাদে শুনেছি, সংসদ সদস্য জুলফিকার আলী ভুট্টো গতকাল বিকেলে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে মারা গিয়েছেন।" জুলফিকার আলী ভুট্টোর মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে স্তব্ধ হয়ে পড়ি। ৩০ শে মে মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় জুলফিকার আলী ভুট্টোর নামাজে জানাযায় অংশগ্রহণ করি। অনেক রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের সাথে দেখা হয়। আমাকে দেখে আমার পুরনো নেতা শ্রদ্ধেয় মিজানুর রহমান চৌধুরী এগিয়ে এসে বলেন, "বাবলু সর্বনাশ হয়ে গেল, বাংলাদেশের মানুষের বড় ক্ষতি হয়ে গেল, বেঁচে থাকলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ভুট্টো বিরাট উপকারে আসত। ব্যক্তি ভূট্টো মারা গিয়েছেন, কিন্তু তার চাল-চলন, স্বভাব ও কর্ম যেন আমাদের সবার মাঝে বেঁচে থাকে।

১৫/৬/২০০০ তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত

www.pathagar.com

কবি আবুল হাসান

প্রকৃতির কবি, সহৃদয়তার কবি, মানবতাবাদী কবি আবুল হাসান, সাথে সাথে একজন যথার্থ প্রকৃতি প্রেমিক হৃদয়বান মানবতাবাদী মানুষ আবুল হাসান। তাঁর ভিতরে একটা সার্বক্ষণিক চেতনা ছিল, কৃত্রিমতা, জটিলতা এবং ভন্ড আনুষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে। আবুল হাসানের সাথে আমার যত স্মৃতিই মনে হয়, সব সময়ই মনে পড়ে তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের মানব প্রেমিক ও প্রকৃতির প্রতি নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি। যতদিন মিশেছি, যতদিনই তাঁর আকর্ষণীয় সান্নিধ্য পেয়েছি ততদিনই এগুলির প্রকাশ পেয়েছি।

কবিতা আমি খুব একটা বুঝিনা, তবে কবিতার যে প্রাণস্পর্শী আকর্ষণ আমাকে আকর্ষিত করে, সেই সাথে সাথে আকর্ষিত করে কবিতার লেখক কবিকে এবং তাঁদের জীবনকে জানার জন্য। এটানেই আমি আবুল হাসানের নামের সাথে পরিচিত হই গ্রামে থাকতেই। তারপর ৭২ সনের প্রথম দিকেই গ্রাম পাড়ি দিয়ে ঢাকায় এলাম, ঢাকা কলেজে ভর্তি হলাম, মহানগরী রাজধানী ঢাকার সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হল। আবুল হাসানের সাথে পরিচয়। ঢাকাতে আমার যাদের সাথে সবচেয়ে বেশি হৃদ্যতা স্থাপিত হয়েছে হাসান ছিলেন তাদেরই একজন। ৭৩ এবং ৭৪ সালের এই দুই বৎসর নিবিড় ভাবে আবদ্ধ ছিলাম দুইজন। ঢাকা কলেজের দক্ষিণ ছাত্রাবাসের ১১৩ নং কক্ষে হাসান হাফিজ (গোলাম মওলা শাহজাদা) এর রুমে এসে আশ্রয় নিলেন ঠিকানাবিহীন আবুল হাসান ৭৩ এর শেষের দিকে এবং ৭৪ এর মে মাস পর্যন্ত মনে হয় অবস্থান করেছিলেন। এই ছাত্রাবাসে অবস্থানকালীন সময়ে প্রত্যেকদিন সূর্য উঠার আগে প্রাতঃভ্রমণ করতাম আর বিভিন্ন আলোচনায় বিভোর হয়ে যেতাম আমরা দুজন। প্রাতঃভ্রমণ করতেই একদিন সে আমাকে বলেছিলেন কি জন্যে তার ডিগ্রী নেওয়া হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অনার্সের ছাত্র ছিলেন, ক্লাশ তাঁর ইচ্ছামতই করেছেন ফলে পারসেন্টেন্জ কম (ক্লাসে উপস্থিত), যার জন্য পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান নাই। অনুমতির জন্য দেখা করেছিলেন তদানীন্তন বিভাগীয় চেয়ারম্যান সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন সাহেবের সঙ্গে। অনুমতি চাওয়াতেই নাকি সাজ্জাদ হোসেন সাহেব বলেছিলেন নো-নো-নো-নো-নো..। হাসান আমাকে বলেছিলেন "সেই দিন একটি নিশ্বাস ছেড়েছিলাম, অত জোরে নিশ্বাস আর কোনদিন আমি তো ছাড়ি নাই, আমার মনে হয় দুনিয়ার আর কেউ অত জোরে নিশ্বাস ছাড়তে পারে নাই।" তারপরেই অভিমানী আবুল হাসান সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আর একাডেমী লেখা পড়া না করতে এবং সেখানেই যবনিকাপাত হয়েছিল ডিগ্রীর। সেই সকালে বেড়ানোর সময় এত আপন এবং এত সরল হয়ে যেতেন হাসান ভাই, অনর্গল অনেক কথাই বলে যেতেন। সংসারের কথা, বাবার

www.pathagar.com

কথা, মায়ের কথা, ভাই, বোন এদের কথা, শুনলে আমার মনে হতো যেন সে আমার মনের কথাগুলোই বলে চলছেন। কথা বলতে বলতে শিশির সিক্ত মাঠের দুর্বা ঘাসগুলোকে কোন কোন সময় হাত দিয়ে ধরতো অথবা কোন কোন সময়ে পা দিয়ে লেপটিয়ে দিত। মাঝে মধ্যে শরীর চর্চাও করতাম দুইজনে।

তারপর শুনতে পেলাম আবুল হাসান অসুস্থ অবস্থায় হলি ফ্যামেলীতে ভর্তি হয়েছেন, পরে পিজিতে আসেন। একদিন দুইদিন পর পরই দেখতে যেতাম বার্লিন যাবার আগ পর্যন্ত, একদিন গিয়ে দেখি নাকে অক্সিজেন নিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছেন ভালভাবে নড়তে চড়তে পারছেন না, তারই মধ্যেই বিছানার নিচ থেকে একটি লেখা বের করে দিয়ে আমাকে বললেন গণকণ্ঠে গিয়ে দিয়ে আসতে টিপু সুলতান রোডে। তখন বাংলাদেশে না খেয়ে পথে ঘাটে মানুষ মরছে, লেখাটির নাম ছিল "চাবুকের অক্ষরে লিখিলাম নাম"। সেদিন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম কি করে নাকে অক্সিজেন নিয়ে একজন লোক লিখতে পারেন পত্রিকার জন্য লেখা। আমি সে কথা মনে করে আজও বিস্মিত হই। লেখাটি নিয়ে গণকণ্ঠে দিয়ে আসি, তার একদিন পড়েই লেখাটি ছাপা হয়েছিল এবং আমার মনে হয় এটিই আবুল হাসানের শেষ সম্পাদকীয় লেখা যা নিজের নামে প্রকাশিত। ঐ সম্পাদকীয় লেখাটিতে এক যায়গায় কবি ভারত চন্দ্রের প্রশংসা করে লেখা ছিল: "আমার সন্তানেরা যেন থাকে দুধে ভাতে", সেই কবি সম্পর্কে কেউ বিরূপ কিছু বলুক এটা ছিল কবি আবুল হাসানের নীতি বিরুদ্ধ। মনে হয় শামসুর রাহমান সাহেব ভরত চন্দ্র প্রসঙ্গে সেদিন দৈনিক বাংলায় কিছু লিখেছিলেন।

১৯৭৪ এর ২১শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্য এসেছিলেন পাবনা জেলার একজন লেখক মুজিবুর রহমান বিশ্বাস (ভবঘুরে)। তিনি একজন এম, এ পাশ ব্যক্তি এবং লেখক, তার সাথে আবুল হাসানের পরিচয় করিয়ে দেই বাংলা একাডেমীতে। ঐ ভদ্র লোকের দারিদ্র আর তার অবস্থা দেখে মানবতাবাদী আবুল হাসান যেভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন তা বর্ণনাতীত। ঢাকা কলেজের দক্ষিণ ছাত্রাবাসেই মজিবর রহমান বিশ্বাস সাহেব আমার রুমেই ছিলেন এবং যাবার সময়ে আমার রুমমেটকে একটি কবিতা লিখে দিয়ে যান, পরে আবুল হাসানের কাছে কবিতাটি দিলে সে কবিতার কিছু ছন্দগত ভুল সংশোধন করে দেন এবং কবিতাটির বেশ প্রশংসা করেন এবং নাম দেন "নশ্বর সৌন্দর্য।" আমাকে বলেছিলেন "আমাকে কবিতাটি দাও আমি "গণবাংলায়" (সাপ্তাহিক) ছেপে দিব।" কিন্তু আমি পূর্বদেশে দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করি এবং কবি হেলাল হাফিজকে দেই, কিন্তু হেলাল হাফিজ কবিতাটি আর পূর্বদেশে প্রকাশ করেন নাই। আমার গ্রাম থেকে ঢাকা এসেছিলেন গোলাম সারওয়ার নামে একজন হাইস্কুলের শিক্ষক, সেও কবিতা লেখেন, দীর্ঘ দিন যাবত কবিতা লেখেন কিন্তু ঢাকার কোন কাগজে প্রকাশ পায় না, সে একটি কবিতা হাসানের কাছে দেয়

www.pathagar.com

হাসপাতালে, কবি আবুল হাসান সাথে সাথে কবিতাটির কয়েকটি শব্দ পরিবর্তন করে দেন, আর তার পড়েই ঢাকার একটি পত্রিকায় গোলাম সারওয়ারের ঐ কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

বার্লিন যাবার আগে পি,জিতে একদিন দুপুরে গিয়ে দেখি এক হিন্দু রুগী মারা গিয়েছে তার রুমেই, রুগীর বাড়ি ময়মনসিংহে একজন মহিলা মাত্র তার সাথে, গিয়ে দেখি মহিলা কাঁদছেন আর আবুল হাসান বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন। আমাকে পেয়ে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো এবং আমাকে পাঠায়ে দিলেন চানখারপুলে একটি ট্রাক ভাড়া করে আনার জন্য, আবুল হাসানের কি ব্যস্ততা, দেখে মনে হল ডাক্তার, নার্স, হাসপাতালের লোকদের চেয়ে লাশ সৎকার করার তার দায়িত্বই অনেক বেশি।

পিজিতে একদিন সন্ধ্যার পরে গিয়ে দেখি তার রুমের আর একজন প্যাসেন্ট দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাঁর সাথে আবুল হাসান ধর্মতত্ত্ব, এবং সৃষ্টিরহস্য নিয়ে প্রগাঢ়ভাবে আলোচনা করছেন ইংরেজিতে। সেদিন ঐ আলোচনায় আবুল হাসান ইংরেজিতে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক সাহেবকে বলছিলেন যে, "যদিও আমি বিশ্বাস করি না তবুও মাঝে মধ্যেই মনে হয় ঈশ্বর হলো ডঃ জাকেল এন্ড হাইড।" (Though I don't believe it, but, I think sometime that God is like Dr. Jekyell and Mr. Hyde.)

পৃথিবীর মানুষের অভাব, অভিযোগ, দুঃখ আর্তনাদ, ক্ষুধা, মহামারি, হত্যাযজ্ঞ, রক্তপাত, ইত্যাদি দেখেই আবুল হাসানের মনে ঈশ্বর সম্বন্ধে এমনি ধারণা মাঝে মধ্যে হয়েছিল তা পরিস্কার বুঝতে পারা যায়।

নভেম্বর ১৯৭৫ সনে লিখিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

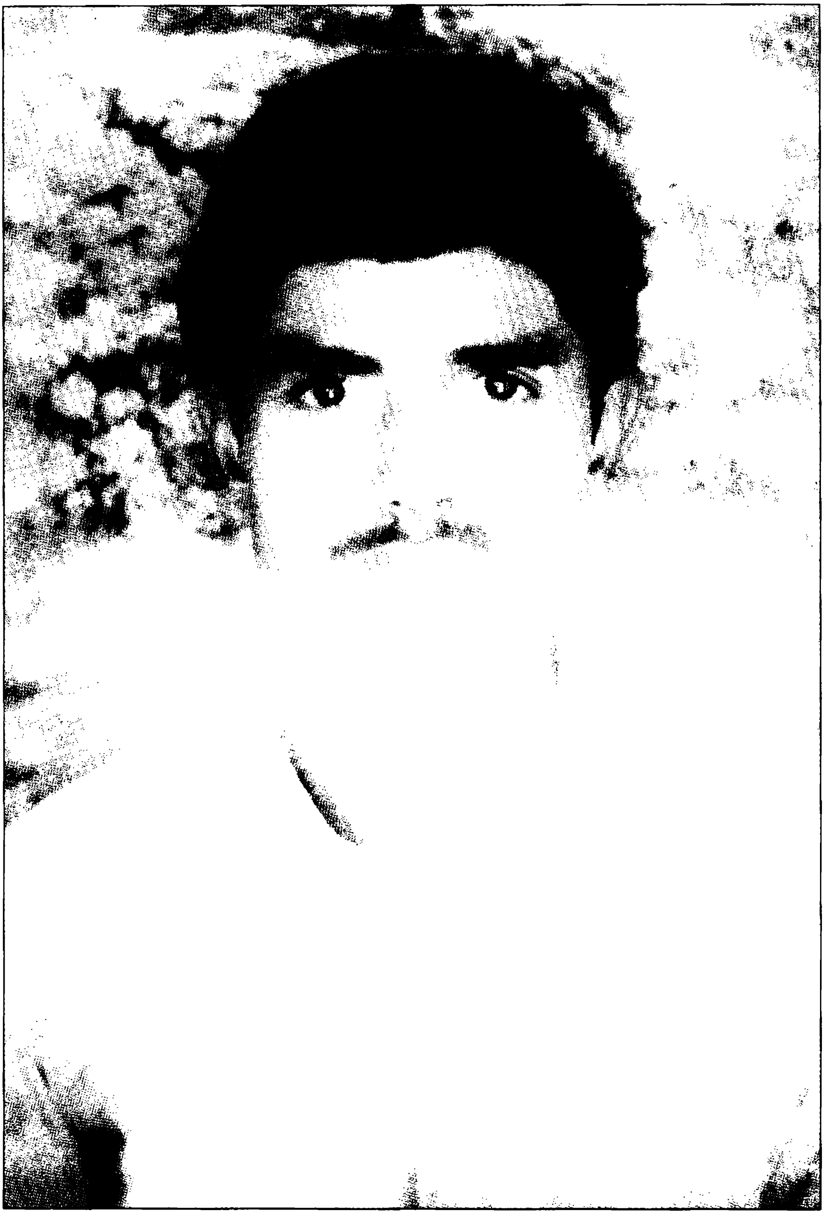

১৯৬৮ অথবা ১৯৬৯ সনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), সিরাগঞ্জের একটি স্টুডিও থেকে তোলা জীবনের প্রথম ছবি।

www.pathagar.com

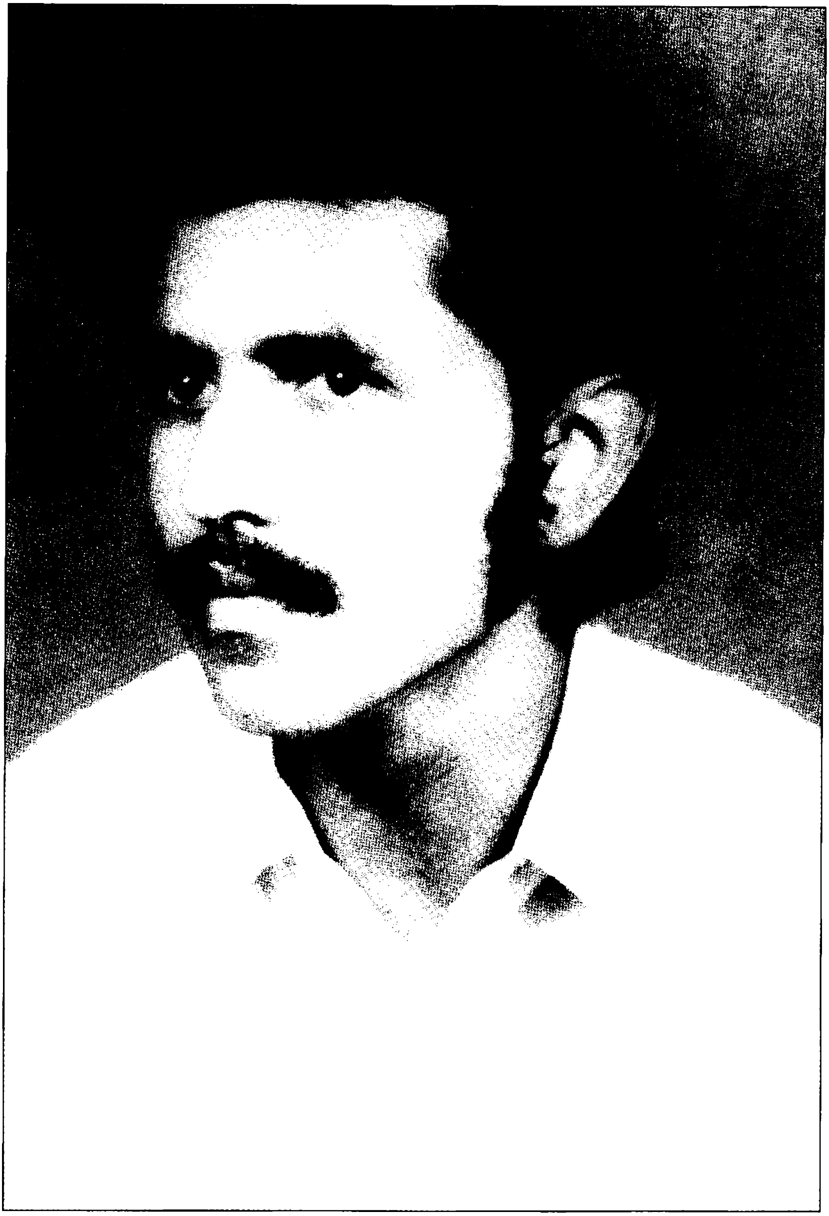

১৯৭৩ সনের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার কোন স্টুডিও থেকে তোলা আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)-র ছবি।

www.pathagar.com

ঢাকা কলেজের অডিটোরিয়াম ১৯৭৩ সনে বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী সভার সদস্য জেনারেল এম.এ.জি. ওসমানী সাহেব বক্তৃতা করছেন ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের এক অনুষ্ঠানে। মঞ্চে প্রথমে ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), এরপরে নগর ছাত্রলীগের নেতা সৈয়দ নুরুল ইসলাম। সৈয়দ নুরুল ইসলাম ১৯৭৬ সনে ভারতে নিহত হন। অনেকে বলে থাকে কাদের সিদ্দিকীর আদেশে নাকি তাকে হত্যা করা হয়েছে।

১৯৭৩ সনে ঢাকার রমনা পার্কে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নগর সম্মেলনে সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে বক্তৃতা করছেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

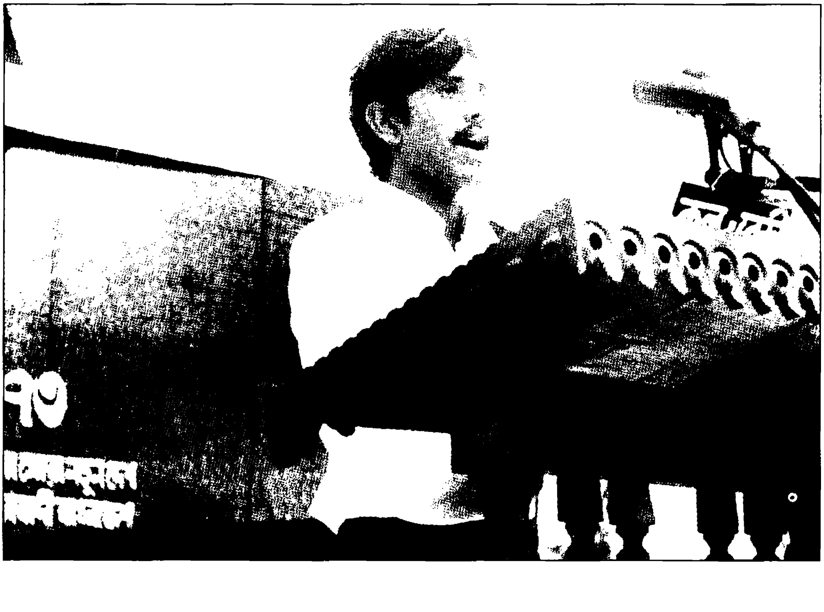

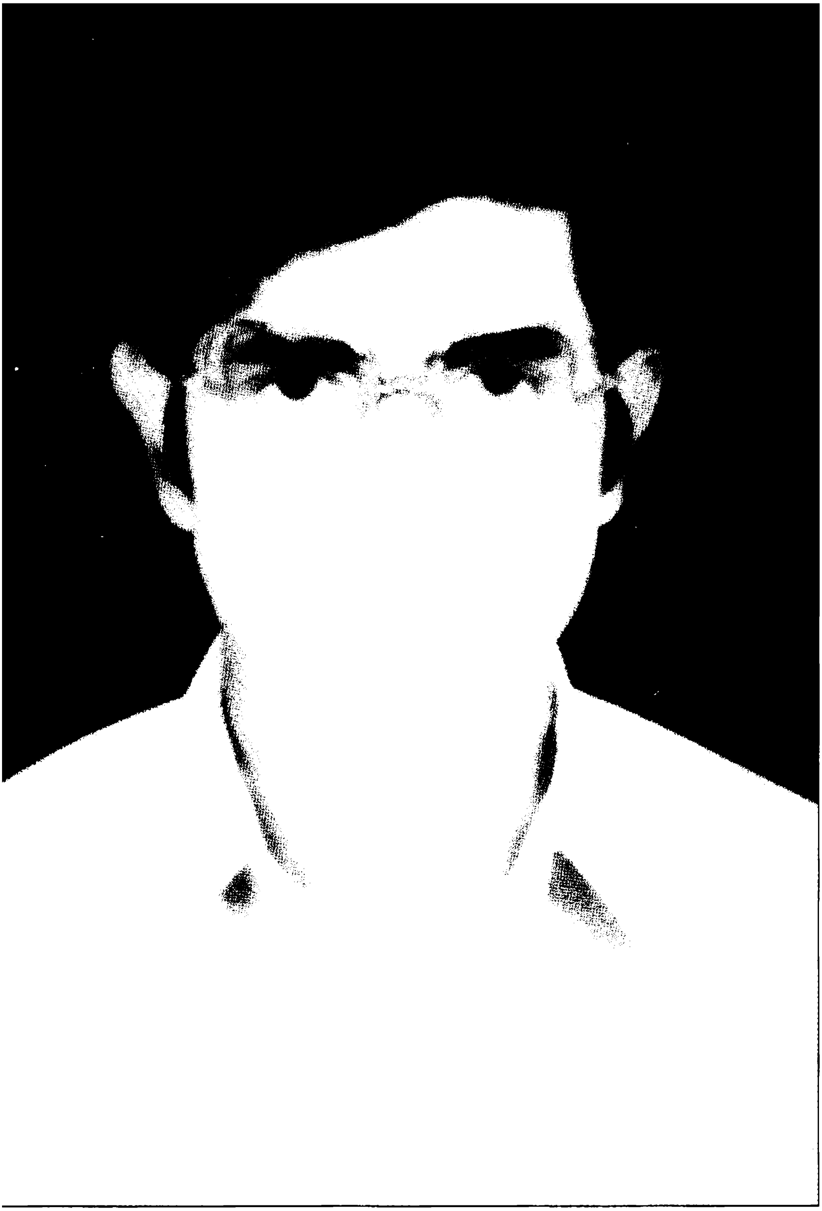

১৯৭৪ সনে ঢাকা কলেজ থেকেই আইএ পাশ করার পর তোলা আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)-র ছবি।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সনে কবি নির্মলেন্দু গুণের প্রকাশিত কবিতার বই চৈত্রের ভালবাসার প্রচ্ছদ শিল্পী, শিব নারায়ণ রায়ের কন্যা মৈত্রী রায় খুকুর সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। ১৯৭৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকার একটি ষ্টুডিও-তে ছবিটি তোলা হয়েছে।

www.pathagar.com

কলকাতার প্রয়াত কবি সমশের আনোয়ারের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। ২৭-০২-১৯৮০ তারিখে ঢাকায় ছবিটি তোলা হয়। সমশের আনোয়ার কবি বেলাল চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)'র বন্ধু আহমেদ জাফর ইমাম স্বপনের খালাতো ভাই।

আশির দশকে কোন এক সময়ে ছবিটি তোলা হয়েছে। ছবিতে রয়েছে ডান থেকে কবি শিহাব সরকার, কবি শিকদার আমিনুল হক, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), সাহিত্যিক হুমায়ন আহমেদ, ভারতীয় হাইকমিশনের তথ্য বিভাগের অফিসার মি. বাইন ও কবি রুদ্র মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ।

www.pathagar.com

১৯৮৬ সনে হোটেল সোনারগাঁয়ে আটাব-এর সভাপতি ও গ্রীন ডেল্টা ও ডেল্টা লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক জনাব রশীদ আহমদ প্রদত্ত একটি নৈশভোজের অনুষ্ঠানে প্রয়াত রশিদ আহমেদ, মেজর জেনারেল মান্নান সিদ্দিকীর ছোটভাই সাংবাদিক রকিব সিদ্দিকী, সি.এস.পি অফিসার ফয়েজুর রাজ্জাক (ঐ সময়ে বিমানের এম.ডি) ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৮৭ সনে হোটেল সোনারগাঁয়ে আটাব-এর সভাপতি ও গ্রীন ডেল্টা ও ডেল্টা লাইফ ইনসুরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক রশীদ আহমদ প্রদত্ত একটি নৈশভোজের অনুষ্ঠানে ঐ সময়ের পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্ণেল সাহাব ও মিসেস সাহাব, মিসেস ফরিদা রশীদ, রশীদ আহমেদ ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

www.pathagar.com

১৯৯১ সনের ২৬ শে ফেব্রুয়ারি রাতে ৩২ নং ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনে জননেত্রী শেখ হাসিনার সাথে রাজীব গান্ধীর মন্ত্রী সভার সদস্য প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা আরিফ মোহাম্মদ খান আবু মোহাম্মদ খান বাবলু কে সাথে নিয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন।

ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ প্রয়াত রাজীব গান্ধীর মন্ত্রীর সভার সদস্য আরিফ মোহাম্মদ খানের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

www.pathagar.com

১৯৮৯ সনে ঐ সময়ের বাংলাদেশের পরিকল্পনা মন্ত্রী এয়ার ভাইস মার্শাল এ.কে খন্দকার সাহেবের অফিসে শিল্পপতি জনাব মোঃ তালহা সাহেব ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) মন্ত্রী এ. কে খন্দকার সাহেবের সাথে কথা বলছেন। তালহা সাহেবের বড় ভাই ডাঃ আমজাদ হোসেন সাহেব সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে 'খাজা ইউনুস মেমোরিয়াল কলেজ ও হাসপাতাল' নামে বিশাল এক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

১৯৯০ সনে বাংলা ভাষার প্রখ্যাত কবি, লেখক, শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা ও পরিচালক পুর্ণেন্দু পত্রী মহাশয় কলকাতা থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে আসেন। পুর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের সম্মানে সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ঢাকা ক্লাবে এক সংবর্ধনা ও নৈশভোজের আয়োজন করেন। উক্ত নৈশভোজ ও সংবর্ধনা সভায় প্রায় ১৫০জনের মত ঢাকার প্রধান প্রধান কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও ঐ সময়ের বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েকজন সচিবসহ উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী উপস্থিত ছিলেন। ঐ সংবর্ধনা ও ভোজসভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ১৯৮৯ সন থেকে ১৯৯২ সন পর্যন্ত ঢাকার আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক শাখার প্রথম সচিব মিস শিলা পিটার তার বেশ কয়েকজন কলিগ ও বিদেশী বন্ধু নিয়ে।

এখানে ১৯৯০ সনের ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রী মহাশয়ের সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের ১২ টি ছবি ছাপা হলো। ঢাকা ক্লাবের ঐ সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

www.pathagar.com

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছেন শওকাত ওসমান।

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) আয়োজিত অনুষ্ঠানে দৈনিক সংবাদের সম্পাদক বজলুর রহমান, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), সাবেক সচিব সৈয়দ আব্দুস সামাদ ও কবি শামসুর রহমান।

www.pathagar.com

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তদানীন্তন সাংস্কৃতিক সচিব হামেদ শফিউল ইসলাম, কবি রফিক আজাদ ও অন্য দুইজন অতিথি।

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ও কবি শামসুর রাহমান।

www.pathagar.com

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে কবি ও সাবেক সচিব মনজুরে মাওলা এবং কবি বেলাল চৌধুরী ও অন্যরা।

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) সাবেক সচিব জনাব আলমগীর ফারুক চৌধুরী।

www.pathagar.com

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে কবি শামসুর রাহমান ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)'র এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেখক ইমদাদুল হক মিলন।

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে, সাবেক সচিব লেখক মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন এবং ঐ সময়ের আমেরিকান এম্বেসীর প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) মিস শিলা পিটার

www.pathagar.com

সাপ্তাহিক পরিবর্তন সম্পাদক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কর্তৃক ১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে পুর্ণেন্দু পত্রীর সাথে হ্যান্ডশেক করছেন সাবেক সচিব জনাব ওয়ালীউল ইসলাম, পাশে রয়েছেন সাবেক কেবিনেট সচিব জনাব সৈয়দ আহমেদ।

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে, পুর্ণেন্দু পত্রী ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু লেখক ইমদাদুল হক মিলন।

www.pathagar.com

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে ঐ সময়ের আমেরিকান এম্বেসীর প্রথম সচিব (রাজনৈতিক) মিস শিলা পিটার ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৯০ সনে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে অনুষ্ঠানে, সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) পাশে রয়েছেন পুর্ণেন্দু পত্রী ঐ সময়ের বাংলাদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সচিব হামেদ শফিউল ইসলাম।

www.pathagar.com

১৯৯২ সনে বন্ধু শামসুদ্দোহা বিল্টু ভাগ্নে ইঞ্জিনিয়ার উল্লাস ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ভাগ্যকুলে জমিদার বাড়িতে বসে রয়েছেন।

১৯৯২ সনে ঢাকা জেলার দোহার থানার মালিকান্দা গ্রামের পশ্চিম বাংলার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ি দেখতে যান আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) বন্ধু শামসুদ্দোহা বিল্টুকে সাথে নিয়ে। বিল্টুর বাড়ি ভাগ্যকুল। উল্লেখ্য ১৯৭৪ সনে তাজউদ্দিন আহমেদ আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কে ড. প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ি দেখবার জন্য বলেছিলেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চিঠি-পত্র

১।	অন্নদা শঙ্কর রায়কে লেখা চিঠি	২১১
২।	তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গে অন্নদা শঙ্কর রায়ের সাথে পত্রালাপ	২২০
৩।	শিব নারায়ণ রায় ও গীতা রায়ের চিঠি	২২৬
৪।	ভবানী সেন গুপ্ত/চানক্য সেনের চিঠি	২৩৭
৫।	অধ্যক্ষ আবুল হামিদের চিঠি	২৪২
৬।	কুনাল চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি	২৪৬
৭।	পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি	২৪৭
৮।	দিলীপ মৈত্রের চিঠি	২৫৫
৯।	জীবন চন্দ্র চক্রবর্তীর চিঠি	২৬১
	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কে লেখা চিঠি	২৬৮
১১।	সিদ্দিকুর রহমানের সিএসপি এর চিঠি	২৭২
১২।	সন্তোষ কুমার দেব মিশ্রের চিঠি	২৭৪
১৩।	ভারতীয় হাইকমিশনার কে লেখা চিঠি	২৭৮
১৪।	কুমুদিনীর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের এম,ডিকে লেখা চিঠি	২৮০
১৫।	নজরুল, কামাল, পুনু, ঝন্টু	২৮২
১৬।	সরদার আব্দুস সাত্তারের চিঠি	২৮৬
১৭।	নাটোরের ডি,সি সদরুদ্দীনকে লেখা চিঠি	২৮৭
১৮।	দেবী প্রসাদ মিশ্রের চিঠি	২৮৮
১৯।	শিপ্রা আদিত্যের চিঠি	২৯০
২০।	চন্দনা খানের চিঠি	২৯৩
২১।	সিমিন হোসেন রিমিকে লেখা চিঠি	২৯৪
২২।	শারমিন আহমদ রিপিকে লেখা চিঠি	

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অন্নদা শঙ্কর রায় কে লেখা চিঠি

২০/১/১৯৯২, ঢাকা

পূজনীয় কাকা বাবু–

আমার ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানবেন। আপনার সাথে অনেকদিন হলো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার কারণ আমার পক্ষ থেকে, কেননা আপনার সাথে আমার যোগাযোগ চলে ১৯৮৯-৯০ সনে, ঐ যোগাযোগ বা চিঠিপত্র আদান প্রদানের সময় বাবরী মসজিদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে যে বর্বরভাবে হিন্দুদের মন্দির ভাঙ্গা হয়, তা আমার অন্তরে দারুণভাবে ব্যথার সৃষ্টি করে, ভীষণভাবে লজ্জা পাই, আপনার নিকট চিঠি লিখতে অপমানিত বোধ করি, এই ভেবে যে আমি একটি নিকৃষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষ, আপনার মতো মানুষের সাথে কিভাবে ভাবের আদান প্রদান হতে পারে। এরপরে ১৯৯০ সনের ২৭শে অক্টোবর জেনারেল এরশাদের সরকারের পাণ্ডারা আবার হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে ঢাকা চট্টগ্রামসহ বাংলাদেশের অনেক যায়গায় হিন্দুদের মন্দির এবং বাড়ি আক্রমণ করে।

এসব দেখে আমার বাসার অল্প দূরে থাকে তরুণ লেখক দিলওয়ার হোসেন এসে আমাকে বলে– "আসেন বাবলু ভাই, আমরা দু'জনে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে মুসলমানদের এই বর্বতার প্রতিবাদ জানিয়ে মুসলিম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করি। কেননা বাঙালী মুসলমানেরা খ্রিষ্টানদের ভয় পায়, আমেরিকা, ইংল্যান্ড এবং জার্মান কানাডার ধর্ম খ্রিস্টান। এরা শক্তের ভক্ত দুর্বলের যম।" দিলওয়ারের একথার আমি কোনও জবাব দিতে পারি নাই। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে থাকি। সব সময় অপরাধ বোধ কাজ করে, কি বলে বা লিখে চিঠি লিখবো? নিজেকে মনে হতো পরাজিত যুদ্ধবন্দী সৈনিক।

জেনারেল এরশাদ গণআন্দোলন থামাবার জন্য দাঙ্গা বাধিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা পেলেন না। ৫ই ডিসেম্বর তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরশাদ সাহেব হিন্দুদের জন্য বেশ কিছু কাজ করেছেন একথাও সত্য। এরশাদ একদিকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করে হিন্দুদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছেন, অন্যদিকে তিনিই আবার সবচেয়ে বেশি হিন্দুদের জন্য করেছেন, হিন্দুদের ধর্ম সভায় যেতেন, এতে হিন্দুদের মনোবল চাঙ্গা হতো। শত্রু সম্পত্তি নতুন করে অধিগ্রহণ করা হবে না বলে এরশাদই ঘোষণা দিয়েছেন, এটা হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য একটি অনেক বড় কাজ, যা বাংলাদেশের অন্য শাসকরা করেন নাই। হিন্দু মন্দির সংস্কার করার জন্য এরশাদ সরকারি তহবিল থেকে অর্থও দিয়েছেন। মোট কথা এরশাদ সাহেব ছিলেন বড় সর্বগুণে এবং সর্বদোষে উঁচু ধরণের একজন প্রেসিডেন্ট বা শাসক। তাঁর দোষ হিমালয় পর্বতের মতো উঁচু, গুণও আবার সেই মাপের। হিন্দুদের মধ্যে গিয়ে হিন্দুদের প্রকৃত বন্ধু বলে পরিচয় দিত। মুসলমানদের মধ্যে গিয়ে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিত। উন্নয়নমূলক অনেক কাজও করেছেন দেশের মানুষের জন্য। কিন্তু বর্তমানের ক্ষমতাসীন বি,এন,পি প্রকাশ্য

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িক একটি রাজনৈতিক দল। এরশাদের চেয়ে বি.এন.পি অনেক নিকৃষ্ট। এরা সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়েই নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় এসেছে। এরশাদ 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করেছেন এবং ৯০ সনের অক্টোবর নভেম্বরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগিয়েছেন একথা লেখবার সময় সে যে হিন্দুদের জন্য বেশ কিছু ভালো কাজ করেছেন তাও উল্লেখ করলাম। কেননা আপনার যুক্ত বঙ্গের স্মৃতি বইয়ে ১২৬ পৃষ্ঠায় আপনি লিখেছেন- 'লেখকদের সুবিচার করা কর্তব্য।'

আপনার সাথে দেখা হবার পরে "কাঁদো প্রিয় দেশ" পড়েছি, এখন পড়লাম "যুক্ত বঙ্গের স্মৃতি" (আরও কিছু লেখা পড়েছি) দুইটি বই অসাধারণ শক্তিশালী মনে হয় দুই বইয়ের প্রতিটি বাক্য বা বক্তব্য 'অর্জুনের ধর্নুবান।'

কাকাবাবু-

লেখক অন্নদা শঙ্কর রায় নয়, আই,সি,এস অন্নদা শঙ্কর রায়কে জিজ্ঞেস করছি আপনি লিখেছেন যে- আইনের শাসনের মূল কথা হচ্ছে তিনটি- (১) প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা। (২) প্রত্যেকটি মানুষের মানসম্মানের নিরাপত্তা প্রদান করা। (৩) প্রত্যেকটি মানুষের সম্পত্তির নিরাপত্তা, নিশ্চয়তার নিরাপত্তা প্রদান করা।

এই তিনটি কাজ করাই রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মূল নৈতিক দায়িত্ব। একথাগুলো কি আসলেই সত্য? আমরা তো বাংলাদেশে এবং সাবেক পূর্বপাকিস্তানে এর উল্টাটিই দেখে আসছি। ভারতেও তো এখন মনে হয় এর অবক্ষয় শুরু হয়েছে। হিন্দু মুসলিম নয় আমাদের বাংলাদেশে তো দেখছি কোন মানুষেরই জীবনের মানসম্মানের এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা নেই। প্রশাসনের সাহায্যেই এসব হচ্ছে, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, মন্ত্রী, কমিশনার এরাই তো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের ভক্ষক হয়ে কাজ করছে। প্রশাসন বা শাসকরা যদি নিজেরাই ভক্ষক হয় তাহলে এর প্রতিকার কিভাবে করবে? এত মানুষ বোমার আঘাত অথবা গুলি খেয়ে মরে আমাদের দেশে এর প্রতিকার কি? এর দায়-দায়িত্ব কার? মহাভারতের মুষল পর্ব চলছে। আপনি আইনের শাসনের মূল কথা যা বলেছেন- তার যদি প্রয়োগ না হয় তাহলে এর দায়-দায়িত্ব কার এটাই আমার আপনার কাছে জানবার বিষয়।

১৯৭৪ সনে আমি তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে (তখন আমার বয়স ২০ বছর) প্রথম শুনি পশ্চিম বঙ্গের প্রথম মূখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্ল ঘোষের নাম। তাজউদ্দিন বলেছিলেন "যদি এই লোকের পায়ের ধূলা কপালে নিতে পারো, তবে জীবনে একটা বড় ধরণের কাজ হবে তোমার" এরপরে অনেকদিন চলে যায়, মাঝেমধ্যে তার কথা মনে হতো, এরপর ভুলেই গিয়েছিলাম। হঠাৎ নভেম্বর (৯১) থেকে তার কথা খুবই মনে হতে থাকে, অনেককে ঢাকায় জিজ্ঞেস করি কেউ বলতে পারেন না, তার বাড়ি কোথায়, তাজউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন ঢাকা জেলায়। এর মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে ২১/১২/৯১ তারিখের দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায় দেখলাম 'বিরল মানুষ' নামে একটি ছোট লেখা, সেখানে পড়লাম ড. প্রফুল্ল ঘোষ সম্পর্কে কিছু কথা এবং জানলাম ঢাকা জেলায় মালিকান্দা

www.pathagar.com

গ্রামের তাঁর বাড়ি। অনেককে জিজ্ঞাসা করি মালিকান্দা গ্রাম কোথায় কেউ বলতে পারে না। এমন সময় আপনার যুক্ত বঙ্গের স্মৃতি বইটি হাতে এল এবং পড়লাম- পড়ে দেখলাম আপনিও মহাত্মা গান্ধীজীর সাথে দেখা করার জন্য কুমিল্লা থেকে চাঁদপুর হয়ে স্টিমারযোগে মালিকান্দায় এসেছিলেন। আপনার যুক্তবঙ্গের স্মৃতি বই পড়ে প্রথম জানলাম মালিকান্দায় মহাত্মাজী, সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এসেছিলেন। এদিনই সামসুজোহা বিল্টু নামে আমার এক বন্ধু আসে আমার বাসায়, তার বাড়ি ভাগ্যকুল। তাকে জিজ্ঞেস করি মালিকান্দা গ্রাম চেনে কিনা, সে বলে 'আমাদের এলাকায়' তবে আমি যাই নাই।' আমি বলে উঠি আমি যাব, যে গ্রামে ড. প্রফুল্ল ঘোষ জন্ম গ্রহণ করেছেন, যে গ্রামে মহাত্মা গান্ধী, সর্দার প্যাটেল এসেছেন গামছা গায়ে নদীতে গোসল করেছেন, সে গ্রাম দেখতে যাব। আমার বন্ধু রাজি হয়। সে মতো গত ১৬/১/৯২ তারিখ বৃহস্পতিবার ঢাকা থেকে রওনা দেই বিকাল চারটায়, সন্ধ্যে ৭টার দিকে ভাগ্যকুলে পৌঁছে সেখানে মান্দ্রা গ্রামে বন্ধুর বাড়িতে রাত থেকে ১৭/১/৯২ তারিখ শুক্রবার সকাল আটটায় ভাগ্যকূল থেকে রওনা দেই রিক্সাযোগে মালিকান্দা গ্রামের উদ্দেশ্যে। ভাগ্যকূল থেকে মালিকান্দা যেতে প্রায় তিনঘণ্টা লাগে রিক্সায়। অবশেষে মালিকান্দা গিয়ে বেলা ১২টার দিকে পৌঁছি। ড. প্রফুল্ল ঘোষের বাড়ি এখন বিরান ভিটা-শুধু একটি বড় ও একটি ছোট ঘর আছে। ১৪ বিঘা জায়গার উপর ড. প্রফুল্ল ঘোষদের বাবা চাচাদের বাড়ি। জায়গা আছে, পুকুর আছে, ছোট বড় গাছ আছে, কিন্তু বাড়িতে কোনও মানুষ নেই, একজন মেয়ে দুইটি ঘরের দেখাশোনা করে। পার্শ্বের বাড়ির দুইজন হিন্দু বৃদ্ধা মহিলা এবং একজন বয়স্ক মুসলমানের সাথে কথা বললাম, জানতে পারলাম একটু দূরে গান্ধী আশ্রম ছিল, গিয়ে দেখলাম গান্ধী আশ্রম ছোট একটি পাকা দালান আছে, তা আজ বেদখল, আশেপাশের জায়গা সরকার শত্রুর সম্পত্তি হিসেবে লিজ দিয়েছে, বাড়ি ঘর উঠেছে। এখনও বেশ কিছু গান্ধীজীর খালি জায়গা আছে। কেউ না কেউ শত্রু সম্পত্তি হিসেবে লিজ নিয়ে নিবে, অনেকেই নাকি চেষ্টা করছে। ঐ জায়গায় ইতিহাসের একটি গৌরবজনক অধ্যায় চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যাক, ঐ জায়গার স্থানীয় জনসাধারণ যদি এতবড় গৌরবময় ইতিহাসকে ধরে রাখতে না চান, বাংলাদেশের শাসকরা যদি না চান, তবে আমার আপনার কি আসে যায়। আমরা দোহার থানার মালিকান্দা, মেঘলা গ্রামের মানুষের মূর্খতা দেখে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলতে পারি, এর বেশি আর কি? ভাগ্যকূলের জমিদার বাড়িগুলো দেখলাম শত্রুদের সম্পত্তি হিসেবে এগুলোও সরকার লিজ দিয়েছে। জমিদারদের বাড়ির খালি আঙ্গিনায় নতুন করে টিনের ঘর তুলছে। অথচ এগুলোকে স্মৃতি হিসেবে রাখা যেত। ভাগ্যকূলের জমিদাররা নাকি বেশ সজ্জন লোক ছিলেন, যে বাড়িতে রাতে ছিলাম সেখানে একজন বৃদ্ধ শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম, তিনি ভাগ্যকূলের জমিদারদের খুবই প্রশংসা করলেন, অনেক গুণের কথা বললেন।

এসব কথা লিখলাম আপনার যুক্ত বঙ্গের স্মৃতি বইটি এ সময়ে পড়ে উপকৃত হয়েছি, এসময়ে এ বই না পড়লে মালিকান্দা যাওয়া হতো না। আপনার শরীর এখন কেমন? এখনও কি হাঁটতে বের হতে পারেন? কয় মাইল এখন হাঁটতে পারেন? আমিও সকালে হাঁটি বেশ অনেক বৎসর হলো রেসকোর্স ময়দান এবং রমনা পার্কে। কিন্তু

www.pathagar.com

আজকাল আর হয়ে উঠছে না। আমার খুব ইচ্ছে আপনার ১০০তম জন্মদিন পালন করার, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে। আমাদের দেশের সওগাত পত্রিকার সম্পাদক নাসির উদ্দিন সাহেবের ১০০তম জন্মদিন তো বেশ কয়েক বছর আগেই পালিত হয়েছে, এখনও উনি বেশ সবল সুস্থ আছেন, আমার গ্রামে (সিরাজগঞ্জের তামাই) আমার এক আত্মীয় ছিলেন হাজী আব্দুল মজিদ উনি ১১৫ বছর বেঁচে মাত্র ২/৩ বছর আগে মারা গিয়েছেন, এবং বেশ সবল ছিলেন, মৃত্যুর ২/১ বছর আগেও বাড়ি থেকে হেঁটে গিয়ে বাজার করে নিয়ে আসতেন। হাজী আব্দুল মজিদ সাহেব আমার মায়ের আপন খালু (মেসো) আমার সম্পর্কে নানা, তার চেহারার সাথে আপনার চেহারার বা স্বাস্থ্যের বেশ মিল আছে। কাজেই আমার বিশ্বাস আপনার সাথে আপনার ১০০তম জন্মবার্ষিকী পালন করার জন্য কলকাতায় যেতে পারবো। সাপ্তাহিক পরিবর্তন গত কয়েক মাস যাবত আর বের করছি না, একটু বিরতি দিচ্ছি, খুবই লোকসান হতো। সামনে আবার বের করার ইচ্ছা আছে।

সুখময় দত্ত নামে বাংলাদেশে একজন সজ্জন ব্যক্তি আছেন। মানুষ হিসেবে তিনি খুবই ভালো, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, তিনি আমাকে বেশ স্নেহ করেন– তিনি যুক্তবঙ্গের স্মৃতি বইটি পড়ে মন্তব্য করেন যে বইটিতে লেখক ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতি ন্যায় বিচার করেন নাই, বইটির ৯৫ পৃষ্ঠায় লেখা "শিউড়িতে আগে কলেজ ছিল না। যুদ্ধকালে বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যাপকরা কলকাতা থেকে এসে শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একদিন আমার আদালতে একজন মুসলমান কর্মচারি আমাকে বলেন যে তার ছেলেটিকে কলেজে পড়াতে চান, কিন্তু মুসলমান বলেই ওকে ভর্তি করা হচ্ছে না। সে কি কথা। আমি খোঁজ নিয়ে জানতে পারি যে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজেও মুসলমান ছাত্রদের ভর্তি করা হয় না। সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আমল থেকেই কলেজের নিয়মাবলীতে ধর্ম নিয়ে বাছ-বিচার আছে। তাহলে জে, আর, ব্যানার্জি অধ্যক্ষ হলেন কি করে? বোধ হয় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ডি,এল,রিচার্ডসনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। হিন্দু কলেজেও ছাত্রদের বেলায় বাছ-বিচার করা হতো। সেই কারণেই প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় ও তাতে খ্রিস্টান মুসলমান এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদেরও ভর্তি হতে দেওয়া হয়। মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ থাকলে তারা হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে থাকত না। পিছিয়ে না থাকলে বিশেষ সুবিধা দাবী করতো না। এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমদর্শিতার অভাব সূচিত হয়।"

সুখময় দত্ত সাহেবের বক্তব্য প্রসঙ্গে আপনার অভিমত জানতে পারলে খুশি হবো।

আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

আর্শিবাদ কামনা করে, স্নেহভাজন–

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৬১, নর্থ সার্কুলার রোড
ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

অন্নদা শঙ্কর রায়কে লেখা চিঠি

২/২/১৯৯২
৬১, নর্থ সার্কুলার রোড
ঢাকা-১২০৫

কাকা বাবু-

আমার প্রণাম জানবেন। গত ২০/১/৯২তে আমার লেখা একটি চিঠি গত ৩০/১/৯২ তারিখে রেজেস্ট্রি ডাকে পাঠিয়েছি আপনাকে, আশা করি ঐ চিঠি পেয়ে থাকবেন। ৩০/১/৯২ তারিখ সকালে চিঠি পাঠিয়েছি, ঐদিনই বিকালে 'অন্নদা শঙ্কর রায়ের রচনাবলী' চার খণ্ড কিনে এনেছি। এখন পথে প্রবাসে পড়ছি, এতক্ষণে শেষ হওয়া উচিৎ ছিল, কিন্তু আমার কিছু ঝামেলার জন্য শেষ করতে পারি নাই, পথে প্রবাসে এবং সত্যাসত্য পড়ার জন্য প্রবল আগ্রহ ছিল, কিন্তু এসব লেখা আমার সামনে এর আগে পড়ে নাই, যার জন্য পড়া হয় নাই, চার খণ্ড রচনাবলী পেয়ে যা খুশি হয়েছি তা বলার বাইরে। পথে প্রবাসে মাত্র ৩০ পৃষ্ঠার মতো পড়া হলো। মুগ্ধ হয়ে পড়ছি, খুব ভালো লাগছে। দুই এক দিনের মধ্যে শেষ করে ফেলবো।

৩০ তারিখে যে চিঠি পাঠিয়েছি তাতে সুখময় দত্ত নামে একজন সজ্জন ভদ্রলোক যুক্তবঙ্গের স্মৃতি বই পড়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় সম্পর্কে আপনার মন্তব্যে একমত হতে পারেন নাই বলে লিখেছি, লিখেছি সুখময় দত্ত বলেছেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি আপনি ন্যায় বিচার করেন নি। কেন না বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময় ওটাই ছিল স্বাভাবিক। ঐ সময়ের কথা চিন্তা করলে "এতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমদর্শিতার অভাব সূচিত হয়।" বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু আমি ৩০/১/৯২ তারিখের চিঠিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সময়ের কথা লিখতে ভূলে গিয়েছিলাম। আমি আপনার স্নেহ এবং আশির্বাদ প্রার্থনা করি।

আবু মোহাম্মদ খান বাবলু
ঢাকা

www.pathagar.com

অন্নদা শঙ্কর রায়কে লেখা চিঠি

৪/২/১৯৯২

পূজনীয় কাকা বাবু-

আমার প্রণতি গ্রহণ করুন। আজ ৪/২/১৯৯২ রোজ মঙ্গলবার আপনার লেখা পথে প্রবাসে পড়ে সকালে শেষ করেছি। ৩০/১/৯২ তারিখ রাতে ৩০ পৃষ্ঠা পড়েছিলাম।

পথে প্রবাসে পড়ে যেভাবে হৃদয়ে ও মনে বিস্ময় ও মুগ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে তা বর্ণনা করার ভাষা আমায় বিধাতা দেন নাই, এবং আমার পক্ষে চেষ্টা করেও তা অর্জন করা সম্ভব হয় নাই। এ বিস্ময় ও মুগ্ধতার কথা যদি সঠিকভাবে কাগজে কলমে লিখতে পারতাম তবে যে কি হতাম তা নিজেই নিজেকে নিয়ে ভাবতে পারি না। শুধু কায়মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারি, হে ঈশ্বর আমায় জ্ঞান দাও, আমায় বিদ্যা দাও, আমায় শক্তি দাও, আমি যেন পথে প্রবাসের মতো বই পড়ে যে আনন্দ পাই, হৃদয়ে যে ভাব পাই, মাথায় যে বুদ্ধি পাই তা যেন কাগজে-কলমে লিখে প্রকাশ করতে পারি।

পথে প্রবাসে পড়ে আমার যা মনে হচ্ছে তাহলো- ফুল প্রেমিক মানুষ ফুলের বাগান দেখে, কবি সাহিত্যিকরা সাগরের ঢেউ দেখে, পূর্ণিমার চাঁদ দেখে, পাহাড় পর্বত, গভীর অরণ্য দেখে, বুদ্ধিদীপ্ত সুন্দরী নারীকে দেখে প্রেমিক পুরুষ যে আনন্দ পায় তার চেয়ে অনেক বেশি আনন্দ পাওয়া যায় পথে প্রবাসে বইটি পড়ে। ইতিহাস, ভূগোল, নগর, বন্দর, সমুদ্র, পাহাড় পর্বত, সভ্যতা, শিল্পকলা, রাজনীতি, সমাজনীতি নারী-পুরুষ, জীবন ও যৌবনের কত বিচিত্র বিষয়ের সুন্দর এবং জীবন্ত চিত্রই যে আপনি কলমের মাধ্যমে 'পথে প্রবাসে' ফুটিয়ে তুলেছেন তা দেখে আমিও শুধু অবাক এবং অবাক হয়েছি। যদি Keats এর মতো কবি হতাম তবে সে হোমারের লেখা পড়ে যেভাবে লিখেছেন- On First looking into chapmans Homer নামক কবিতা, আমিও তেমনি লিখতাম- After reading Pathe Probashe of Annoda Sanker Roy. যেহেতু কবিতা লিখবার ক্ষমতা আমার নাই তাই পথে প্রবাসে পড়া শেষ করে বারেবারে John keats এর লেখা On first looking into chapmans Homer কবিতাটি পড়ে দুধের সাধ ঘোলে মিটাচ্ছি-

Much have I travell. I in the realms of gold
And many goodly states, and kingdoms seen.
Round many western islands have I been
Which bards in fealty to apollo hold.
Open of one wide expanse had I been told
That deep browd homer ruled as his demesne.
Yet did I have breath its pure srene
Till I heard chapman seak out loud and bold;
Then felt I like some watcher of the skies

www.pathagar.com

When a new planet swims into his ken;
or like staut cortes-when with eagle eyes
He stared at the pacific, and all his men
Look'd at each others with a wild surmise-
Silent, upon a peak in darien.

বারে বারে উল্লেখিত কবিতাটি পড়ছি।

আমার আশ্চর্য লাগছে পথে প্রবাসে পড়ে বাংলাভাষার কোনও কবি কেন Keats এর মতো একটি কবিতা লিখলেন না (জানি না কেউ লিখেছেন কিনা)। পথে প্রবাসে পড়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্ম নিলো যে প্রতিভা জন্ম সূত্রে পাওয়া, কর্মসূত্রে যতটুকু পাওয়া যায় তাজন্ম সূত্রের ধারেকাছেও না। আপনি তেইশ অধ্যায়ে লিখেছেন– "আমার তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সের এই আমি, এই আমার শ্রেষ্ঠ আমি। এই দুটি বছরে যা পেলুম তার বেশি এ জীবনে পাওয়া যাবে না। এই বা ক'জন পায়? এত জ্ঞান, এত মান, এত প্রীতি এত মমতা। চক্ষু যত দেখলো লেখনী তার ভাষা পায় নি আভাস দেবার সাধনা করেছে। শ্রবণ যা শুনলো স্মরণ রাখতে পারলো না।"

বিধাতাকে ধন্যবাদ আপনাকে এর চেয়ে বেশি ভাষা এবং এর চেয়ে বেশি স্মরণ শক্তি দেন নাই। যদি এর চেয়ে বেশি ভাষা, এর চেয়ে বেশি স্মরণ শক্তি আপনার থাকতো তবে তা হতো দেব দেবীর ভাষা ও স্মরণ শক্তি, যা বোঝার ও শোনার মতো শক্তি অর্জন করার জন্য ঋষি, ধ্যানী, বা যোগী হতে হতো, আমাদের মতো সাধারণ মানুষ তা বুঝতে পারতো না। বাংলা ভাষার পাঠক পাঠিকারা, বাংলা ভাষার লেখক লেখিকারা আপনাকে অনন্ত কাল ধরে শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান ও সমীহ করে চলবে পথে প্রবাসের জন্য। 'পথে প্রবাসে' পড়ে যে আনন্দ, যে তথ্য, যে তত্ত্ব যে জ্ঞান লাভ করলাম বাংলা ভাষায় আর কোনও বই পড়ে এত জ্ঞান এত আনন্দ এত তত্ত্ব ও তথ্য পেয়েছি বলে স্মরণ কতে পারছি না, (অনুবাদ নয়, মৌলিক বাংলা লেখা)।

আপনার লেখা জার্মান সম্পর্কে মন্তব্য দশ বৎসরের মধ্যে ফলে যায়,– 'মহাযুদ্ধের অশেষ ক্ষতিকে স্বপ্ন করে দিয়ে জার্মানি নূতন দিনের আলোয় নূতন করে বাঁচছে। তার ধনবল নেই, সৈন্য বল নেই, কিন্তু তার লক্ষ লক্ষ বালক বালিকা যুবক যুবতী প্রৌঢ়, প্রৌঢ়া যেরূপ উৎসাহ আগ্রহ ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে যৌবন চর্চা করছে তা দেখে মনে হয় ভাবীকালের জার্মান জাতিকে নিয়ে আবার বিপদ বাধবে।' ১৯৩০ সালের আপনি দশ বছর আগে মনে হয় জার্মান নিয়ে এ মন্তব্য করেছিলেন, দশ বৎসর পর জার্মান জাতি যুদ্ধ বাধায়।

এগারো অধ্যায়ে লেখা– "তবে ইউরোপ যে তাড়াতাড়ি এক রাষ্ট্র হয়ে উঠছে এর সন্দেহ নেই Enited States of Europe আর বেশি দিন নয়, পঞ্চাশ বছর।" এ ভবিষ্যৎ বাণীও ফলে গিয়েছে, EEC, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টারি পার্টি হয়েছে, ইউরোপে ভিসা নাই যা মূলত এক রাষ্ট্রই হয়েছে পঞ্চাশ বছরের আগেই। চব্বিশ বছর বয়সে কত বড় দুটি ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, যা ফলে গেল এবং আপনি জীবিত অবস্থায় তা দেখে

www.pathagar.com

গেলেন। এটা আপনার জন্য সাথে সাথে বাঙালি হিসেবে আমাদের জন্যও বিরাট পরিতৃপ্তির বিষয়। 'পথে প্রবাসে' কি অন্য ভাষায় অনুবাদ হয়েছে? ২৪ বছরে এত বই কিভাবে পড়েছিলেন আর এত বইয়ের বিষয়বস্তু এবং ভাবরস কিভাবে আপনার মনে ও হৃদয়ে জীবন্ত থেকেছে তা ভেবে পাই না। প্রমথ চৌধুরী সাহেব আমাদের জেলার মানুষ। নমস্য ও পূজনীয় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাকে গুরু মেনেছেন। বাংলাভাষায় তার অবদান অনেক। কিন্তু অনেকদিন আগে 'শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চিঠিপত্র' নামে একটি বই পড়েছিলাম তাতে দেখেছি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুব দুঃখ করে চিঠি লিখেছেন যে- "জীবনের এই বয়সে আজ প্রমথ চৌধুরীর কাছ থেকে শুনতে হলো যে আমি নাকি শুদ্ধ বাংলা লিখতে পারি না।" শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঐ চিঠি পড়ে আমার খুব দুঃখ লেগেছিল। শরৎচন্দ্র, শরৎচন্দ্রই তার তুলনা তিনিই।

আজ পথে প্রবাসের প্রমথ চৌধুরী সাহেবের ভূমিকা পড়ে যার একটি বক্তব্য আমি বুঝতে পারছি না, উনি আগ বাড়িয়ে একথা কেন লিখলেন যে– "কোনও প্রবীণ অথবা নবীন পাঠক পুস্তকখানিকে শাস্ত্র হিসেবে গণ্য করবেন না, কারণ তা করলেই সোনা ফেলে আঁচলে গেরো দেওয়া।" একথার স্বপক্ষে উনি যে যুক্তি দিয়েছেন তা আমার কাছে স্ববিরোধিতা বলে মনে হলো। আমার তো মনে হচ্ছে উনার লেখা উচিৎ ছিল এই পুস্তকখানিতে এমন অনেক বক্তব্য রয়েছে যা বেদ বাক্যের মতো সত্য। দৃষ্টান্ত– "যে সমাজ দুর্ভিক্ষও চায় না, যুদ্ধও চায় না সে সমাজের তৃতীয় পন্থা জন্ম শাসন। কিন্তু যে সমাজ না চায় দুর্ভিক্ষ না চায় যুদ্ধ, না চায় জন্ম শাসন, সে সমাজের আবদার প্রকৃতির অসহ্য।" (১২-অধ্যায়) এমন অর্জুনের ধনুর্বানের মতো তীব্র, জোড়ালো বাক্য পথে প্রবাসে অনেক আছে। তাছাড়া আপনিও তো কোথাও লিখেন নাই যে পথে প্রবাসে একটি শাস্ত্রীয় বই। এছাড়া ভূমিকায় তাঁর অন্যসব কথা পড়ে ভালো লেগেছে। কয়েকদিনের মধ্যে 'সত্যাসত্য' পাঁচ খণ্ড পড়া শুরু করবো–

কারণ– আপনি পথে প্রবাসে ঠিকই লিখেছেন– "ঈশ্বর ভক্তির মতো রাজ ভক্তিও মানুষের নিজের তৃপ্তির জন্য এবং একটা কাল্পনিক দূরত্বই তার প্রাণ। এবার মানুষ যে নূতন জগৎ এর ধারে দাঁড়িয়েছে সে জগৎ দিনের আলোর জগৎ- জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা তার নাড়ী নক্ষত্র জানা, কোথাও একটু কল্পনার অবকাশ নেই, নিদারুণ মোহ ভঙ্গের মধ্যে তার পথ। কোন রাজ প্রসাদকে দেখে স্বর্গ কল্পনা করবে? কোন রাজাকে দেখে দেবতা, কোন রাজপুত্রকে নিয়ে উপকথা রচনা করবে? কোন রাজ বংশকে নিয়ে কাব্য? তাই শেক্সপিয়ারও আর হয় না, রবীন্দ্রনাথও আর হবে না।" (১৩ অধ্যায়ের শেষে) এটা আপনার অতি সত্য উপলব্ধি। কিন্তু এর সাথে সাথে সৃষ্টির প্রথম থেকেই এখন পর্যন্ত যারা ছিল এবং আজও আছে তারা হচ্ছে কমনীয় মোহনীয় লক্ষ্মী মেয়েরা যাদের দেখে মুগ্ধহয়ে দ্যা-ভিঞ্চি মোনালিসা এঁকেছেন, ভ্যানগগ নিজের হাতে নিজের কান কেটেছেন, মাইকেল এঞ্জেলো মুগ্ধ হয়ে ছবি এঁকেছেন, শেক্সপিয়র, রবীন্দ্রনাথ গ্যেটে, কোলরিজ, ওয়ার্ডস ওয়ার্থ, ব্রাউনিং, বায়রণ, শেলি, কিটসরা কবিতা লিখেছেন, আবার কিটসসহ অনেকে অযত্নে অবহেলায় যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়ে ধুকে ধুকে অকালে মরতে বাধ্য হয়েছেন।

www.pathagar.com

আপনার রচনাবলীর ১ম খণ্ডের ছয়ের পৃষ্ঠায় অমৃতের স্বাদের মতো চার লাইনের একটি কবিতা রয়েছে–

"এক নারী এক দেবী এই নিয়ে আমার জীবন।
নারী সে আমার সত্তার অর্ধাঙ্গিনী।
নক্ষত্র সভার তলে রাসমঞ্চে নৃত্যের সঙ্গিনী।
দেবী সে আমায় দিয়ে লেখায় যে কত কি লিখব।"

কাজেই এখনও সম্পূর্ণ হতাশ হবার কারণ নাই,

গুণবতী সুন্দরী মেয়েরা আছে, যারা তাদের ভালো লাগার মানুষের সমস্ত অপরাধ এবং পাগলামী ঈশ্বরের মতো যিশুখ্রিস্টের মতো দয়ালু হয়ে ক্ষমা করে দিয়ে থাকে। তাই মেয়েদের উৎসাহে অনুপ্রেরণায় তাদের রূপে তাদের গুণে মুগ্ধ হয়ে কোনও না কোনও দেশ থেকে কেউ না কেউ বেরিয়ে আসবে, কারও না কারও বুকের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলবে, আর সে আগুনের উত্তাপে কেউ ছবি আঁকবে, কেউ উপন্যাস লিখবে, কবিতা লিখবে, কেউ গৃহ-সংসার ত্যাগ করে রামকৃষ্ণ মিশনে সাধু হিসেবে নাম লিখিয়ে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে আর্তমানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করবে।

আমরা অবাক বিস্ময়ে সে ছবি দেখবো, গভীর অনুরাগ নিয়ে সে কবিতা ও উপন্যাস পড়বো এবং মিশনারীর সাধু সন্ন্যাসীদের ত্যাগ ও একনিষ্ঠতার সাথে মানুষের সেবা করা দেখে প্রাণ জুড়াবো। পৃথিবীতে রাজ্য নেই, রাজ প্রাসাদ নেই, রাজা-রাণী, রাজপুত্র রাজকন্যারা নেই, শুধু অবশিষ্ট রয়েছে নারীরা স্বদেশে এবং বিদেশে। আর আপনার মতো দেবতুল্য মানুষের কাছে আমার প্রার্থনা আপনি আশির্বাদ করবেন আমার জন্য।

আপনার লেখা পড়ে মনে হয় আপনি এ যুগের বিদুর, ভীষ্ম, সঞ্জয় দ্রোণাচার্য। আমরা কি আপনার আশির্বাদে যুধিষ্ঠির অর্জুনদের গুণাবলীর একবিন্দুও পাব না? ধীমান দাশগুপ্তকে যদি সম্ভব হয় আমার শ্রদ্ধা জানাবেন। অসাধারণ সুন্দর ও মহৎ কাজ করার জন্য, রচনাবলী সম্পাদনার জন্য। তাঁর লেখা ভূমিকাটিও খুব সুন্দর।

এ চিঠির প্রাপ্তিসংবাদ দিলে আমার ভালো লাগবে।

Annada Sankar Ray I.C.S. (Retd.)
Flat No. 1C
P-17A Ashutosh Chawdhury Avenue
Calcutta-700019

আপনার স্নেহ প্রার্থী
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৬১, নর্থ সার্কুলার রোড,
ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

তসলিমা নাসরিন প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায়ের সাথে পরিবর্তন সম্পাদকের পত্রালাপ-

১০/৩/১৯৯৫

বাবলু

সম্পাদক, পরিবর্তন,

ঢাকা।

পরম পূজনীয় কাকাবাবু,

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রণাম জানবেন। অনেক দিন হলো আপনাকে চিঠি লেখা হয় না। জানি না আপনার শরীর এখন কেমন আছে। আশা করি আপনি ভালো আছেন।

আমার সম্পাদিত ও প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিবর্তনের প্রকাশনা বর্তমানে অনিয়মিত। তবে আশা করি দু'এক মাসের মধ্যে নিয়মিত প্রকাশনা শুরু করতে সক্ষম হবো। আপনাকে আমার বছর দুই আগে চিঠি লেখা উচিত ছিল তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে আমার মতামত জানিয়ে, কিন্তু লেখা হয় নি। মনে করেছিলাম এ বিষয়ে নীরব থাকাই ভালো। কিন্তু এখন দেখছি আপনাকে চিঠি লিখে ওর সম্পর্কে আমার মতামত না জানিয়ে আমি মস্তভুল করেছি, মানবসভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশের প্রতি।

আমি তসলিমা নাসরিনকে খুবই নিচু ও ইতর শ্রেণীর একজন টাউট মনে করি। সে যা করে বা লেখে তার মূলে থাকে শস্তা চমক সৃষ্টি ও অর্থ উপার্জন। কিভাবে মানুষকে প্রতারণা করতে হয় তা সে খুব ভালো জানে ও বুঝে। সে একজন বেয়াদব ও ভণ্ড। সে আনন্দ পুরস্কার পাবার আগে কোনও দিন এক লাইন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের পক্ষে লিখে নি। আনন্দবাজার পুরস্কার ওকে যারা দিয়েছে তাদের আন্তরিকতা ও সততা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে।

বাংলাদেশে প্রথমে ও নিজেই কিছু বেকার টাউট ছেলেদের পয়সা দিয়ে ওর বিরুদ্ধে কাজ করায়, যাতে পত্রিকায় ওর বিরুদ্ধে সংবাদ ছাপা হয় এবং আলোচিত হয়। ও নিজেই নিজের বিরুদ্ধে প্রথমে আন্দোলন গড়ে তোলে। অনেকে মনে করে তসলিমা কিছু সরকারি কর্মচারীকে তুষ্ট করে ওর বই 'লজ্জা' বাজেয়াপ্ত করে সফল হয় ব্যাপক কাটতির ক্ষেত্রে। মোট কথা ওকে আমি ঘৃণা করি মানবতার নামে ব্যবসা করার জন্য, মিথ্যা ও প্রতারণা করার জন্য। তবে তসলিমা সম্পর্কে আপনার দুটি লেখা পড়েছি। আমি আপনার লেখার সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমি লেখকের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি- যার যা ইচ্ছে লিখবে, তা প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। আপনি এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ওর সম্পর্কে দুটি লেখা লিখেছেন। আমি ঘৃণাকরি ঐসব লেখকদের যারা তসলিমা নাসরিনের লেখা ভালো বলে বাহাদুরী দেখিয়ে পত্রিকায় লেখা লিখে থাকে এবং তাদের ঘৃণা করি যারা তসলিমা নাসরিনের শাস্তিচেয়ে আন্দোলন করে। এরা সমান পাপী এবং সমানভাবে

www.pathagar.com

ঘৃণিত। আমার চিন্তা-ভাবনা ও রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে আপনার যে ধারণা আছে আশা করি তসলিমা সম্পর্কে আমার মতামত আপনাকে জানানোর ফলে তা কমে যাবে না। মহাভারত এবং মহাত্মা গান্ধীর "আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ" এখনও আমার প্রিয়তম গ্রন্থ। আমি রামকৃষ্ণ মিশনের একজন অনুরাগী ও ভক্ত, গান্ধীবাদের প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল। কাজেই দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আপনাকে আগের একটি চিঠিতে লিখেছিলাম আমি আপনাকে এ যুগের ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্য বলে মনে করি। আমার এ বিশ্বাস এখনও অটল আছে। আমি মনে করি বাংলা গদ্য লেখক হিসেবে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর আপনি শ্রেষ্ঠ। আপনার মতো এত সুন্দর পরিষ্কার ঝর ঝরে বাংলা আর কারো লেখায় খুঁজে পাই না। আমার এ মতের সাথে ঢাকার সামাদ সাহেব নামক এক ভদ্রলোকও একমত। সামাদ সাহেবের বয়স ৭০-এর উপরে। খুবই প্রতিষ্ঠিত ও ধনী সজ্জন ব্যক্তি। তার স্ত্রী লায়লা সামাদ একজন প্রগতিশীল মহিলা, এদেশের একজন নাম করা লেখিকা। ভদ্রমহিলা বেশ কয়েক বছর আগে মারা গেছেন। মোরারজী দেশাইয়ের একশত বছর পূর্ণ হলো, আপনার ও হবে, আমার এ বিশ্বাস আছে। ভগবানের কাছে প্রার্থনা আমার মজিদ হাজী সাহেব নানার মতো আপনিও ১১৫ বছর সবল সুস্থভাবে বেঁচে থাকুন। কিছুদিন আগে ঝরা বসুর আপনার সম্পর্কে একটি লেখা দৈনিক সংবাদের সাহিত্য পাতায় ছাপা হয়েছিল, তা পড়েছি। ঝরা বসুর লেখা লীলা রায় সম্পর্কে ঢাকার ভারত বিচিত্রায় একটি লেখা ছাপা হয়েছিল, তাও পড়েছি। রম্যাঁ রল্যাঁ লিখিত ভারত বর্ষ দিনপঞ্জী বইটি পড়েছি বছর দুই আগে। তার মধ্যে আপনার কথা রয়েছে, ৩০মে ১৯২৭ সনে মনীন্দ্র লাল বসু ও আপনি রম্যাঁ রল্যাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন। স্বয়ং রম্যাঁ রল্যাঁ আপনার সম্পর্কে লিখেছেন-তিনি শিক্ষিত, বিদগ্ধ।

বাংলাদেশের বেশ কিছু কবি-সাহিত্যিক জানে যে আপনার সাথে আমার পত্র যোগাযোগ আছে, আপনি আমাকে স্নেহ করেন। যে জন্য আমাকে অনেকেই তিরস্কার করে যে, তোমার অন্নদাশঙ্কর রায়ের জন্যই তসলিমার মতো একজন টাউট আজ এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি পেলো। জানি না একথা বলার কারণ কি। অনেকে বলে, আপনি নাকি আন্তর্জাতিক লেখকগোষ্ঠির কাছে ওর জন্য আবেদন করেছেন।

আপনি যদি তা করে থাকেন আর যদি আপনি ভালো বা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন তবে আমার এ চিঠির ইংরেজি অনুবাদ করে বা কাউকে দিয়ে করিয়ে আন্তর্জাতিক লেখকগোষ্ঠির কারোও কাছে পাঠাতে পারেন। যদি তা করেন তাহলে আমি খুবই খুশি হব এবং ঢাকার ৯৯% বাঙালি মুসলিম কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনৈতিক কর্মীরা খুশি হবে। আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

উপরে আমি তসলিমা সম্পর্কে আমার ধারণা উল্লেখ করেছি, কিন্তু ধারণার কোনও ব্যাখ্যা দেই নি, কেন তসলিমা একজন টাউট ও একজন ইতর বা বাজে মেয়ে। এখানে একটি ব্যাখ্যা দেই- আপনি মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন, আমিও করি। মহাত্মা গান্ধী তাঁর 'আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ' বইতে লিখেছেন, যারা পুরস্কারের টাকা বা অর্থ দুঃস্থ, গরিব বা সর্বসাধারণকে দান না করে নিজের কাজে বা নিজের প্রয়োজনে

www.pathagar.com

ব্যবহার করে তারা গর্হিত অপরাধ করে, তারা পাপী। তাদের ঘৃণা করা উচিত। গান্ধীজী এ বিশ্বাসে কেমন অটল ছিলেন তাও ঐ বইতে উল্লেখ করেছেন। আফ্রিকাতে গান্ধীজীকে জনসেবার জন্য প্রবাসী ভারতীয়রা কিছু অর্থ ও কিছু স্বর্ণ দান করেন। গান্ধীজী তা সর্বসাধারণের কাজের জন্য দান করে দিতে চান, কিন্তু তাঁর স্ত্রী মহিয়সী নারী কস্তুরীভা প্রতিবাদ করেন। প্রচণ্ড ঝগড়া হয় স্বামী স্ত্রীতে। তিনি কড়া ভাষায় স্ত্রী কে দমন করেন। স্ত্রী বলেন, অল্প কিছু সোনা রেখে দাও নিজেদের বিপদ বা প্রযোজনের জন্য। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তা মেনে নেন না। এক পর্যায়ে গান্ধীজী কস্তুরীভাকে আফ্রিকার বাসা থেকে হাত ধরে রাস্তায় বের করে দেন এই বলে যে, তুমি পুরস্কারের অর্থ নিজের প্রয়োজনে রাখতে চাও, তোমার সাথে আমার ঘর করা সম্ভব নয়। তখন কস্তুরীভা পরাজয় স্বীকার করে বাসায় ফিরে আসেন।

আপনি নিজেও মনে হয়, এ দৃষ্টিভঙ্গিকে শ্রদ্ধা করেন এবং মেনে চলেন, কেননা আপনি আনন্দ পুরস্কারের সমস্ত অর্থ গরিব শিশু সন্তানদের কল্যাণের জন্য দান করে দিয়েছেন, পুরস্কারের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে লাগান নি। কিন্তু তসলিমা যে লক্ষ লক্ষ ডলার পুরস্কার পেয়ে যাচ্ছে- তা থেকে সামান্য পরিমাণ অর্থ কোনও গরিব বা সর্বসাধারণের কল্যাণের কাজে দান করেছে এমন কোনও কথা আমি শুনি নি। সে পুরস্কারের অর্থ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করে চলেছে। কাজেই শুধু আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নয়, মহাত্মা গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও সে একজন নিচু বা পাপী শ্রেণীর মানুষ। দয়াকরে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি আপনার একজন ভক্ত ছিলাম, আছি এবং থাকবো।

যে মেয়ে রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বেগম রোকেয়ার চেয়ে নিজেকে বড় দাবী করে পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেয়, তাকে ঘৃণা না করে সম্মান করার কোনও কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

আজ ১০/৩/৯৫ শুক্রবার রাতে দূরদর্শনের সংবাদে আপনাকে দেখলাম, একটি ক্যাসেট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে। দেখে খুব খুশি হলাম।

তসলিমা 'লজ্জা' উপন্যাস লিখে প্রশংসনীয় কাজ করেছ, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার চিত্র তুলে ধরেছে। কিন্তু 'লজ্জা' ছাড়া আর যা সে লেখে, বলে ও করে তা আমি মানতে পারি না।

আমি আপনার স্নেহ ও আশির্বাদ প্রার্থী। দয়া করে যদি এ চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ দেন তবে খুশি হবো।

ইতি
আপনার স্নেহধন্য-
আবু মোহাম্ম খান বাবলু
৬৩/৩ নর্থ সার্কুলার রোড,
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

Annada Sankar Ray,
P-17 D, Asutos Chaudhuri Avenue,
Calcuta-19
Date : 06-04-1995

জনাব আবু মোহাম্মদ খান বাবলু
ঢাকা।

প্রিয় বাবলু,

তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার বয়স এখন একানব্বই বছর পূর্ণ। হাতের লেখা পড়া যায় না বলে টাইপ করি।

তাতেও ভুল থাকছে। এক জন লেখকের প্রাণ বিপন্ন হলে লেখকের কর্তব্য তাকে প্রাণে বাঁচতে সাহায্য করা। দাউদ হায়দার নামে এক অচেনা লেখকের প্রাণ বিপন্ন দেখে আমি তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিই ও বারো বছর ধরে রক্ষা করি। অবশেষে ভারতেও তার প্রাণ বিপন্ন বুঝতে পেরে তাকে জার্মানিতে পাঠিয়ে দিই। সেখানে সে নিরাপদে বাস করছে।

তসলিমা নাসরিন নামক এক অচেনা লেখিকার প্রাণ আরো বেশি বিপন্ন। তাকে ভারতেও আশ্রয় দেয়া যায় না। এদেশেও তার শত্রু অনেক। তাই তাকে বিদেশ পাঠাতে চেষ্টা করি। সে চেষ্টা এখন পর্যন্ত সফল হয়েছে। কিন্তু বিদেশেও তাকে দিনরাত পুলিশ পাহারায় রাখতে হচ্ছে। বিদেশে তার ঘাতক সংখ্যা অনেক। পাহারা শিথিল করলে অপঘাত ঘটে যাবে।

তসলিমার পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য আমি সুপারিশ করি নি। সে একটার পর একটা পুরস্কার পাচ্ছে এটা তার ভাগ্য। পুরস্কার ও রয়েলিটি ছাড়া তার জীবন ধারনের অন্য কোনও উপায় নেই। সুইডেন তাকে সরকারি তহবিল থেকে বেতন, ভাতা বা পেনশন দিচ্ছে না। সেখানকার জীবনযাত্রা ব্যয়বহুল। তাকে হয়ত দশ বছর কি বিশ বছর বিদেশে বাস করতে হবে। দাউদ হায়দার তো বিশ বছর দেশ ছাড়া। প্রথম চার বছর মাঝে মাঝে যেতে পারতো, তারপর থেকে পাসপোর্ট আটক। তসলিমার পাসপোর্ট আছে, কিন্তু ফিরে গেলে মরণ অবশ্যম্ভাবী। সে দেশে ফেরার জন্য ব্যাকুল, বিদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে না পুলিশ পাহারায় একেবারে নিঃসঙ্গ। তবু প্রাণটা তো আছে। প্রাণে বাঁচার জন্য তাকে দাউদের মতো বিদেশে বিশ বছর থাকতে হতে পারে। সুতরাং পুরস্কারের টাকা জমিয়ে রাখাই ভালো। পুরস্কার তো বরাবর পাওয়া যাবে না। তবে দেশের লোক যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখার বিশ্বাসযোগ্য ব্যবস্থা করে তবে সে দেশে ফিরে যেতে পারে ও জমানো টাকা সৎ কাজে দান করতে পারে। আমি ওর অভিভাবক নই, তবে আমার পরামর্শ সে শুনবে, যদি আমি দেখি যে বাংলাদেশ তাকে প্রাণরক্ষার নিশ্চয়তা দেবে সেই সঙ্গে লেখার স্বাধীনতা। এই মুহূর্তে দু'টোর কোনোটাই সম্ভবপর নয়। কেবল মোল্লারা নয়, তোমরা বুদ্ধিজীবীরাও তাকে ঘৃণা কর।

www.pathagar.com

প্রাণে বাঁচার অধিকার মানুষমাত্রের জন্মগত অধিকার। লেখার স্বাধীনতাও লেখকের মৌল অধিকার। বাংলাদেশ যত দিন না এই দুটি অধিকার স্বীকার করছে ততদিন সে সভ্য জগৎ থেকে এক ঘরে থাকবে। তসলিমার বই এখন ইউরোপের দশ বারোটা ভাষায় তর্জমা হচ্ছে। তার উপর লেখা বইয়ের সংখ্যাও অনেক। আমার টেবিলেই দু'খানা ফরাসি বই রয়েছে। সত্যজিৎ রায় এর পরে তসলিমা নাসরিনই সবচেয়ে বিখ্যাত বাঙালি। এর জন্য তোমাদের মোল্লারাই দায়ী। প্রাণনাশের ফতোয়া জারির আগে কেউ ওর নাম জানত না। মামলা দায়ের করার পর সবাই অপেক্ষা করছে আদালতের রায়ের জন্য।

স্নেহ জেনো। ইতি। শুভার্থী-

অন্নদা শঙ্কর রায়

১৯৯৬ সনের জানুয়ারি মাসে সাপ্তাহিক পরিবর্তনে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

অন্নদা শঙ্কর রায়

শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায় মহাশয়ের সাথে আমার চিঠি পত্রের আলাপ ছিল, তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

বেশ কিছু চিঠি তিনি আমাকে লিখেছেন ১৯৮৯ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত, তার মধ্যে অনেকগুলো হারিয়ে গিয়েছে। ৮/৬/১৯৮৯, ৬/৭/১৯৮৯, ১৫/১১/১৯৮৯, ৬/৫/১৯৯২, ৩/৮/১৯৮৯, ৪/৮/১৯৮৯, ৪/৮/১৯৮৯, ৬/১/১৯৯২ তারিখের মোট বড় ধরণের ৭ টি অন্নদা শঙ্কর মহাশয়ের চিঠি আমার কাছে এখনও আছে।

কিন্তু চিঠিগুলোর পাঠ উদ্ধার করা খুব কষ্ট সাধ্য, যার জন্য চিঠিগুলো ছাপাতে পারছি না, এটা আমার জন্য খুব দুঃখজনক ব্যাপার। উক্ত চিঠি গুলো ছাপতে পাড়লে খুব আনন্দ পেতাম।

আবু মোহাম্মদ খান বাবলু ৩/৯/২০০৮।

www.pathagar.com

SIBNARAYAN RAY
Editor Jijnasa
Bengali Quarterly

AC 158 Salt Lake,
Sector I, Calcutta-700 064

শিব নারায়ণ রায়ের চিঠি

১২/২/১৯৮৭

স্নেহের বাবলু,

বম্বে রওনা হওয়ার পথে তোমার চিঠি পেলাম। ২১ শে মার্চ আমাদের পক্ষে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। ঐদিন এদেশে অনেকগুলো মানবেন্দ্রনাথ রায় সংক্রান্ত অনুষ্ঠান হবে। মার্চ মাসে খুব ব্যস্ত থাকব।

তোমার চিঠি থেকে মনে হয় তোমরাও বিশেষ তৈরি হওনি। ১৯৮৭ সনে এম এন রায় শতবর্ষ ঐ বছরে যেকোন সময়েই শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান করা যায়। আমার মনে হয় তোমরা বরং ভাল করে তৈরী হয়ে বছরের শেষ দিকে অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা করো।

আমি বম্বে থেকে দিল্লী যাব। সেখানে তারকুন্ডেকে তোমাদের প্রস্তাবের কথা বলব। মালেক সাহেবকে লিখেছি তারককুন্ডেকে সরাসরি চিঠি দিতে। আমরা কলকাতায় ফিরব ৩রা মার্চ। তারপর যোগাযোগ করো।

'পরিবর্তন' এ গোলযোগের খবর শুনে তোমার জন্য উদ্বিগ্নবোধ করছি।

ভালোবাসা যেনো।

শিব নারায়ণ রায়

দ্রঃ তারককুন্ডে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি। এম, এন রায়ের শিষ্য।

Abu Mohammad Khan Bablu
100 Central Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

Professor SIBNARAYAN RAY
Research Director, Indian Renaissance Institute
Editor, Selected Works of M. N. Roy
Editor Jijnasa Bengali Quarterly

AF 533 SALT LAKE
Sector I, Calcutta-700 064

"RUDRAPALASH"
63 Purvapalli
Santiniketan-731 235

৩/১১/১৯৯১

স্নেহের বাবলু

অনেকদিন তোমার খবর পাই না। তোমার পত্রিকাও অনেকদিন পাইনি। তুমি এখন কী করছ?

আমি ভেবেছি এই শীতকালে দিন আষ্টেকের জন্য একবার বাংলাদেশে যাব। বাংলাদেশের উপরে জিজ্ঞাসার আবার একটি বিশেষ সংখ্যা বার করতে চাই। তার জন্য বাংলাদেশের এখনকার ভাবুক সাহিত্যিক ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, সাংবাদিক এদের সঙ্গে সাক্ষাতে আলাপ পরিচয় দরকার। যদি বাংলা একাডেমী থেকে একটি আমন্ত্রণ পাই খুবই ভালো হয়- সেক্ষেত্রে সেখানে আগের বারের মত একটি নির্বাচিত বিষয়ে দু'তিনটি বক্তৃতা দিতে পারি। কিন্তু বর্তমানে বাংলা একাডেমীর কে মহাপরিচালক জানি না। তুমি যদি একটু খোঁজ খবর করে আমাকে জানাও খুশী হই।

আমন্ত্রণের ব্যবস্থা না করতে পারলেও নিজের উদ্যোগে যেতে পারি। জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি যে কোনো সময়েই যাওয়া আমার দিক থেকে কোন অসুবিধা নেই। আমি এ বিষয়ে বাসন্তী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, সেলিনা হোসেন, এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকেও চিঠি দিচ্ছি। আমি গেলে গীতাও সঙ্গে যাবে। তোমার উত্তর পেলে যাবার তারিখ ঠিক করব। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উত্তর দিও।

ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রেখো।

শিব নারয়ণ রায়

Abu Mohammad Khan Bablu
Editor, Paribattan
3/4 Naya Paltan
Dhaka-1000
Bangladesh

www.pathagar.com

Professor SIBNARAYAN RAY
Research Director, Indian Renaissance Institute
Editor, Selected Works of M. N. Roy
Editor Jijnasa Bengali Quarterly

AF 533 SALT LAKE
Sector I, Calcutta-700 064

"RUDRAPALASH"
63 Purvapalli
Santiniketan-731 235

২৬/৬/১৯৮৯

কল্যাণীয়েষু,

তোমার অসুস্থতার সংবাদে চিন্তিত আছি। ভাল করে চিকিৎসা করাও। শরীরে অবহেলা কোরো না।

পরিবর্তনের পরবর্তী কপিগুলি পাঠিয়ে দিও। শান্তিনিকেতনের ঠিকানাতেই পাঠাতে পারো। আমাদের নাতনীর নাম মিরান্ডা।

কাজের চাপে তোমার জন্য লেখায় হাত দিতে পারিনি। আমি যে কাজটি করছি তা এই বছরের ভিতরে সম্পন্ন করতে চাই। ফলে অন্য কিছু করবার সময় বড় একটা পাই না। তুমি পরিবর্তন পাঠালে যদি সময় করে উঠতে পারি লেখা পাঠাব।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সঙ্গে দেখা হলে বোলো তার নতুন বই এখনো দেখিনি। জিজ্ঞাসায় তার লেখা প্রকাশে আমি আগ্রহী।

তুমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে ওঠো এই কামনা করি।

শুভার্থী

শিব নারায়ণ রায়

Abu Mohammad Khan Bablu
Editor, Paribattan
3/4 Naya Paltan
Dhaka-1000
Bangladesh

www.pathagar.com

Professor Sibnarayan Ray
Research Director, Indian Research Institute
Editor, Selected Works of M. N. Roy
Editor, Jijnasa Bengali Quarterly

AF 361 Salt Lake
Sector-1. Calcutta-700 064
"Rudrapalash"
63 Purvapalli
Santiniketan-731 235
9/12/1989

কল্যাণীয়েষু,

ঢাকা থেকে ফিরে শান্তিনিকেতনে এসে তোমার পরিবর্তন পেয়েছি। অন্নদাশঙ্করের চিঠি ও প্রবন্ধ পড়লাম। এদেশের রাজনীতিতে মস্ত পরিবর্তন ঘটল। দিল্লির প্রাধান্য কমবে, কিন্তু দেশের প৻ কতটা ভালমন্দ হবে তা এই মুহূর্তে অনুমান করা শক্ত।

ডিসেম্বর এবং জানুয়ারিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকব। শিলচর, দিল্লি, আহমেদাবাদ বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা/সেমিনার ইত্যাদি আছে। যদি সম্ভব হয় ই"ছা আছে ফেব্রুয়ারিকে আরেকবার বাংলাদেশে যাবার।

তুমি আমাদের স্নেহ ও শুভেচ্ছা জেনো।

শিভ নারায়ণ রায়

Abu Mohammad Khan Bablu
Editor, Paribartan
3/4 Naya Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh

www.pathagar.com

SIBNARAYAN RAY
Editor Jijnasa
Bengali Quarterly

AC 158 Salt Lake,
Sector I, Calcutta-700 064

২৯/৪/১৯৮৬

কল্যাণময়ী,

তোমার চিঠি পেয়েছি। সাপ্তাহিক পরিবর্তন আবার পাচ্ছি। তোমরা যে নিজেদের ছাপাখানা করতে পেরেছ এবং তোমাদের পত্রিকা যে ঢাকার কিছুটা প্রভাব ফেলেছে এখবরে খুশী হয়েছি।

এই চিঠি যখন পাবে তখন বাংলাদেশে হয়ত একটা নতুন পর্বের সূচনা ঘটছে। এখানে খবরের কাগজ থেকে বাংলাদেশে কী ঘটছে তা স্পষ্ট করে বুঝা যায় না। তোমাদের পত্রিকা থেকে কিছুটা আভাস পাই।

আমি ১লা মে এক মাসের জন্য বাইরে যাচ্ছি। প্রথমে লন্ডনে, অক্সফোর্ড এবং ক্যামব্রিজে কয়েকটি বক্তৃতা-সেমিনার আছে। তারপর জার্মানীতে কয়েকটি বক্তৃতা। জুন মাসের গোড়ায় কোলকাতায় ফিরব।

তুমি সাবধানে থেকো। আমাদের দুজনের শুভ কামনা রইলো।

শিব নারায়ণ রায়

Abu Mohammad Khan Bablu
100 Central Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

SIBNARAYAN RAY
Editor Jijnasa
Bengali Quarterly

AC 158 Salt Lake,
Sector I, Calcutta-700 064

২১/১০/১৯৮৭

স্নেহের বাবলু

বাসন্তী ও মালেকের কাছে আশা করি খবর পেয়েছো যে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি আমি বাংলাদেশে আসতে পারি। ১৭ ও ১৮ই রাজশাহীতে নিমন্ত্রণ আছে। বাসন্তী ও মালেককে জানিয়েছি যে ১৯ তারিখে রাজশাহী থেকে ঢাকায় যাব এবং ২৪ শে নভেম্বর পর্যন্ত থাকব। যদি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু করতে চায় সে ব্যবস্থার দায়িত্ব তাদের।

তোমাকেও খবরটা জানিয়ে রাখলাম। জানি না এই চিঠি তুমি পাবে কি না। তোমার পত্রিকা বেশ কিছুদিন পাই না। তুমি ঠিকানা পাল্টিয়েছো কিনা জানি না।

সম্ভব হলে কামাল হোসেনকে জানিও তাঁর সঙ্গে দেখা হলে খুশী হব। তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে।

শুভার্থী

শিব নারায়ণ রায়

Abu Mohammad Khan Bablu
100 Central Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

শ্রী মতি গীতা রায়ের চিঠি

Gita Ray
14 Fuller St.
Bulleen 3015.
Victoria, Australia
6.4.1977

স্নেহের বাবলু, বহুদিন পরে তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হলো। চিঠিপত্তর লেখালেখি থেমে গেলেই কি মানুষ মানুষকে ভুলে যায়? সংসারের নানান ঝঞ্ঝাট, অসুখ, বিসুখ, চাকরি, বড়বাবুর মুখ ঝামটা, কিছু কথা না বলা সব মিলিয়ে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা– এরমধ্যেও দূরকে কাছে আনার চেষ্টা বা স্মরণ করতে যখন কারুর ইচ্ছে হয় সেটা আন্তরিক। কোনও ভেজাল বা কর্তব্য নয়– এককথায় বলতে চাইছি বহুদিন চিঠি না দেওয়া হলেও তোমার এই যে মনে পড়াটাই আসল। তোমার চিঠি আমাদের দুজনেরই খুব ভালো লেগেছে।

এই সময়টা উনি খুবই ব্যস্ত থাকেন। সময়মতো চিঠি দেবেন।

পড়াশোনাটাও চালিয়ে যাচ্ছ এটা খুব ভালোকথা। টেপে শ্যামা নাটক শুনেছ জেনে ভালো লাগলো। সম্প্রতি আমি কিছু রেকর্ড আনিয়েছি পুরোনো দিনের। নভেম্বরে প্রথমে কলকাতায় যাচ্ছ জেনে ভালো লাগলো। আমিও ১০ই নভেম্বর কলকাতা পৌঁছবো। সপ্তাহখানেক গোলপার্কের রামকৃষ্ণমিশনে থাকবো, তারপর নেপাল যাব। এপ্রিলের শেষে মেলবোর্ন ফিরবো। তুমি আমাকে অযথা পত্রিকা পাঠাতে যেও না– এখানে মুরশিদ সাহেব "বিচিত্রা" আনাচ্ছেন। আমি থাকছিনাতো।

আমার সঙ্গে আমার পুত্র যাচ্ছে ওতো বারো বছর পরে কলকাতা যাচ্ছে, বাংলা বলেও না, তবে পড়াশুনো বেশ করে খুকুর তো এ বছর দেশে যাওয়া হোচ্ছেনা– ও ঠিক গত বছরই এশিয়া ঘুরে এসেছে নিজের খরচে এ বছর Bed শেষ করছে ও পড়াচ্ছে। ওর নভেম্বরে একটি ছবির প্রদর্শনী হবে, তাই নিয়েও ব্যস্ত আছে অবসর সময়ে। সবাই খুব বড় ও স্বাবলম্বী হোয়ে যাচ্ছে– আমি বুড়ো হোয়ে যাচ্ছি। মধ্যবয়স যাকে বলে।

মেলবোর্নের দিনগুলো খুবই ঝলমলে যাচ্ছে– আমার মনটাতে বেশ উড়ুউড়ু হোয়েছে। দেশে বোনেরা আত্মীয়বন্ধুরা আমাদের দেখার জন্যে অস্থির হোয়ে আছে। তুমি কলকাতায় গিয়ে আমাদের খোঁজ কর। আনন্দবাজার অফিসে গৌর দা আমাদের গতিবিধির খবর রাখবেন। বলাবাহুল্য তোমার সঙ্গে দেখা হোলে আমাদের ভাল লাগবে। প্রীতিভালবাসা ও শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি শেষ করলাম। সাবধানে থাকবে। শরীরে যত্ন নেবে।

মাসিমা

Abu Mohammad Khan Bablu
548 Surjasen Hall, Dhaka University
Dhaka, Bangladesh

www.pathagar.com

Gita Ray
14 Fuller St.
Bulleen 3015.
Victoria, Australia
৩/১০/১৯৭৮

স্নেহের বাবলু,

আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই অধ্যাপক রায় গ্রামোফোনে কবিগুরুর সেই গানটি চাপালেন "দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুরও রথ এসে থামলো" কথাটি কি সুন্দর তাই না? আমাদের সকলের জীবনে যদি তাই হোত তাহলে এইসময় আমাদের মেলবোর্নের দরজায় তোমরা সবাই হৈহৈ করতে করতে এসে নামতে, আমি চা বানাতাম, খাওয়ার জোগাড় করতাম, গল্প হোত, তর্ক হোত আরও কত কি। কেমন আছ তাই বল আগে?

তোমাকে আমি গত বছরে কিংবা ৭৫ সালের শেষে একটা চিঠি ও দু'একটা রঙিন পোষ্টকার্ড দিয়েছিলাম, পাওনি? তোমার নাম পুরো লিখিনি তখন জানতাম 'বাবলু' নামেই তুমি পরিচিত। তোমাদের দেশে গোলমালের সময় তোমার জন্যেত খুব চিন্তা হোত, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ এদের সকলের কাছে তোমার খবর জানতে চেয়েছি। জিনাত আরা রফিকের সঙ্গে দেখা হোলে আমাকে চিঠি দিতে বলবেত। ওর জন্যে চিন্তিত থাকি।

তোমার নিজের পড়াশুনো কেমন হোচ্ছে? রাজনীতি করছ? পারলে একবার কলকাতা ঘুরে এস– ওখানে জীবন কোন সময় থেমে নেই, বুদবুদ কাটছে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষ দারুণ জোরে বল করলো– ফরোয়ার্ড খেল্ল অবশ্য আমার দেশের গরিব সাধারণ লোক– একটা জিনিষ প্রমাণ হোল স্বাধীনতার ইচ্ছে মানুষের রক্তের মধ্যে– পেটে ভাত না থাকলেও কেউ আমাকে চালাচ্ছে এইটা বুঝবার শক্তি অশিক্ষিত চাষারও আছে। ওপরওয়ালা যেই হোক, জনতা প্রাপ্তবয়স্ক হোয়ে গেছে– আর চিন্তা নেই। আল মাহমুদের সেই কবিতাটি মনে পড়ছে।

"মনে হোল ডাক দিলে জড়ো হয়ে যাবে সব নদীর মানুষ, অসংখ্য নাওয়ের বাদাম মুহূর্তে গুটিয়ে ফেলে রেখে জমা হোয়ে যবে এই চরের ওপর। খেতের আড়াল থেকে কালো মানুষের ধারা এসে বলে দেবে সরোষে আমাকে কিভাবে এগোবে তারা দুর্ভেদ্য নগরের তোরণে প্রথম।" ভদ্রলোকের কবিতা যতই পড়ি শ্রদ্ধা ততই বাড়ে।

অধ্যাপক রায় দেশে গিয়েছিলেন এত ব্যস্তড় ছিলেন ইচ্ছে থাকলেও বাংলাদেশে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে আসতে পারেননি। কি পড়ছো? কি করছ জানতে ইচ্ছে করে। আমি এখন চিত্রশিল্পী মদিলিয়ানীর জীবনী পড়ছি– কতবড় শিল্পী, কিভাবে জীবনটা শেষ হোয়েছে পড়লে এত কষ্ট হোচ্ছে, অথচ ছাড়তে পারছিনা। আমার ছেলে খুব বই কেনে, ওর যেটা ভাল লাগে আমাকেও পড়তে দেয়। খুকুতো এখন এখানে নেই, একটা চার্টার্ডপ্লেনে অষ্ট্রেলিয়ান ছাত্রছাত্রীরা এশিয়া ভ্রমণে গেছে ও গেছে– চাকরি করে পয়সা জমিয়ে গেছে, পয়সা যতদিন চলবে ততদিন ঘুরবে এই প্ল্যান। বাংলাদেশ

www.pathagar.com

যাওয়ারও প্ল্যান আছে তবে ভিসা পাবে কিনা জানি না। থাইল্যান্ডের একটি গ্রাম থেকে চিঠি দিয়েছে নাম "কো সামুই" গ্রামের লোকের প্রধান আয় নারকেল ও সুপারী বিক্রী। বেশীরভাগ লোকের ধর্ম বৌদ্ধ। প্রচুর বৌদ্ধমঠ আছে। ভীষণ সবুজ ও শান্তির দেশ মনে হোচ্ছে গ্রামটি, দুঃখের বিষয় ভাষা না জানার জন্যে একেবারে মিশে যেতে পারছে না।

আমাদের মেলবোর্নে এখন হেমন্তকাল। গাছের পাতার রং বদলানো দেখতে খুব ভাল লাগে। তোমাদের দেশে সাহিত্য কবিতা জগতের খবর কি? কারা ভাল লিখছেন? তোমার কাদের লেখা ভাল লাগে? কার কার বই বেরোলো? আমি পশ্চিমবঙ্গের খবর যতটা রাখতে পারি বাংলাদেশের ততটা পারিনা, কারণ চিঠিপত্র লেখা ব্যাপারে বন্ধুরা কুঁড়ে, এবং পত্র পত্রিকা চাঁদা দিলেও হাতে আসে না- মাসিমা কি করবেন বল? মাঝে মাঝে সময় পেলে চিঠি দিও। মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়ে আম্মা আব্বাকে দেখে আসতো? স্নেহ ও শুভেচ্ছা নিও। তোমার অন্যান্য বন্ধুদের ভালবাসা জানাচ্ছি।

মাসিমা

Abu Mohammad Khan Bablu
548 Surjasen Hall
Dhaka University
Dhaka, Bangladesh

www.pathagar.com

Gita Ray
14 Fuller St.
Bulleen 3015.
Victoria, Australia
4.8.1977

স্নেহের বাবলু,

তোমার চিঠিটি বড্ড মেলবোর্ন আন্তরিকতায় পূর্ণ ছিল। আমাকে এত সুন্দর এবং ভালবাসায় ভরা চিঠি বহুদিন কেউ লেখেনি, তাই তোমার চিঠিটি পেয়ে আমি খুব খুশি হোয়েছি– ওঁর সঙ্গে তোমাকে নিয়ে অনেক আলোচনাও করেছি। তুমি যে তোমার বাংলাদেশে ঘোরার ছবিটি আমাকে দিয়েছ, আমি যেন মেলবোর্নে বসে তা দেখতে পারছি– ঐ যে তুমি লিখেছ "দুঘণ্টায় যে স্বর্গীয় আনন্দ পেলাম তার দাম মাত্র একটাকা।" কথাটা খাঁটি সত্যি। বাংলাদেশে (পূর্ব এবং পশ্চিম বাংলায়) যখন ঘুরছিলাম এই বোধ আমি বারবার উপলব্ধি করেছি। বটগাছের তলায় বসে ভাঁড়ে চা খেতে খেতে অল্পবয়েসী কবি সাহিত্যিক ও সমাজসেবকদের সঙ্গে আলোচনা করার সময় অথবা তরুণ ছাত্রদের সঙ্গে গল্প করার সময় অথবা বাউলদের ডেরায় বসে গান শোনার সময় আমাদের বারবার মনে হোয়েছে একথাটা। তোমার মনের গভীরতা আসবে বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু তোমার দেখার চোখ যে আছে, উপলব্ধি করার মন আছে– একটা প্রাণবন্ত জীবন্ত প্রাণ যে আছে এটাইত একটা ভীষণ Gift, পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকইত মনেপ্রাণে আধমরা। রবীন্দ্রনাথের "সবুজের অভিযান" কবিতাটি আমার ভীষণ প্রিয়।

তোমার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে চমচম খেতে খেতে আমাদের কথা মনে করেছ জেনে আমরা দুজনেই খাওয়ার আনন্দ পেয়েছি। গরমের ছুটিটা তোমার বেশ ভালই কেটেছে বল। এবার বৃষ্টি কেমন হোল? ফসল কেমন হোয়েছে? তোমাদের কলেজে পরীক্ষা কবে হয়? রওনক জাহানের হাতে দেওয়া বইগুলি কি পেয়েছ? কেমন লাগলো? গুণকে ও রফিক আজাদকে বইগুলি পৌঁছে দিয়েছ? ওরা ব্যস্ত লোক চিঠি দেবে না, তুমি একলাইন AIRMAILএ আমাকে খবরটা দেবে? বিচিত্রাকে একটা আবার চেক পাঠিয়েছি এবার BANK TO BANK কাজেই হারিয়ে যাবে না, তুমি কি একটু খোঁজ নেবে যে গীতারায়ের নামে $৪ মতন একটা চেক ওঁরা পেয়েছিন কিনা এবং ঐ পয়সায় যতদিন চলে আমাকে এয়ার মেলে পত্রিকা পাঠাবেন কিনা। আমি জানি না তোমাকে বিব্রত করছি কিনা, আসলে চিঠি দিলে ওঁরা জবাব দেন না, গতবারে চেক পাননি ইত্যাদি। তোমাকে দুটো লেমন টী ব্যাগ্ পাঠালাম। যদিও জানি না গন্ধ থাকবে কিনা তোমার হাতে যখন পৌছবে। আমরা ভাল আছি। সাবধানে থাকবে। আশির্বাদ নেবে।

মাসিমা ৪.৮.১৯৭৭

Abu Mohammad Khan Bablu
548 Surjasen Hall, Dhaka University
Dhaka, Bangladesh

www.pathagar.com

Gita Ray
14 Fuller St.
Bulleen 3015.
Victoria, Australia
Date : 10/10/1977

বাবলু,

এই চিঠিতে তোমাকে আমাদের চারজনের তরফ থেকে বিজয়ার প্রীতি ভালোবাসা জানাচ্ছি। শরতের নীল আকাশে ছুটির গন্ধ না ভীষণভাবে পড়াশুনো করতে হবে তাই চিন্তা ছাত্রবন্ধুদের? নিশ্চয় ভাল আছ। বইগুলো পেয়েছ বা হাতে পৌঁছে গেছে ভদ্রমহিলা জানিয়েছেন। সময় পেলে কুশল সংবাদ জানিও। আমরা ভালো আছি। সাবধানে থেকো।

মাসিমা

বিঃ দ্রঃ ভদ্র মহিলা হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক রওনক জাহান।

Abu Mohammad Khan Bablu
548 Surjasen Hall
Dhaka University
Dhaka, Bangladesh

www.pathagar.com

চানক্য সেন বা ভবানী সেন গুপ্তকে লেখা চিঠি

ভবানী সেন গুপ্ত।
এ-৯৬ চিত্তরঞ্জন পার্ক।
নিউ দিল্লী - ১১০০১৯।
১৫.৯.২০০৪
ঢাকা।

শ্রদ্ধেয় দাদা বাবু-

আজ ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৪ ইং, বুধবার। গত তিন/চার দিন যাবত ঢাকায় বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। গত সোমবার সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়েছে, ঢাকা শহরে বৃষ্টির পানি জমেছে- যার জন্য গতকাল মঙ্গলবার সরকার সরকারি, আধা সরকারি অফিস ছুটি ঘোষণা করেছে। আজ বুধবারও হালকা পাতলা বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টি দেখতে আমার খুব ভালো লাগে, ভগবত গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ২৬নং শ্লোক মনে পড়ে- "খাদ্য খেয়ে জীব বাঁচে, খাদ্যই জীবন, সেই খাদ্য উৎপাদনে বৃষ্টিই যে কারণ।" বৃষ্টি ছাড়া পানি বা জল হয় না, জল বা পানি ছাড়া কোনও খাদ্য উৎপাদন হয় না। বাংলাদেশের বর্ষা, বৃষ্টি, পানি ভগবান বা আল্লাহর দান। পানির জন্যই এদেশে খাদ্য উৎপাদন- যার জন্য ভারতবর্ষ বা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি ঘনবসতি এই বাংলাদেশে। আমরা ৬০/৭০ এর দশকে যে পরিমাণ বানের পানি দেখেছি তার দশ ভাগের একভাগ পানিও এখন হয় না, এতেই মানুষের কি চিৎকার, গেল সব গেল। যদি ৫০,৬০,৭০ দশকের বন্যার মতো বন্যা এখন হতো তবে কিযে হতো তা ভেবে পাই না।

যাক গত ২৯.১১.২০০৩ ইং তারিখে আমি দিল্লীতে আপনার বাসায় গিয়েছিলাম, বেশ কয়েকজনসহ প্রায় দশজন। আপনি দিল্লীর সন্দেশ দ্বারা আমাদের আপ্যায়ন করেছেন। ঐ দিন আপনি আমাকে তিনটি বই দিয়েছেন আপনার ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে- সে নহি সে নহি, অরাজনৈতিক, রাজপথ জনপথ। সাথের দুটি মেয়েকেও দুটি বই দিয়েছেন। সে নহি সে নহি বইটিতে নিজে স্বাক্ষর করে লিখে দিয়েছেন- আবু মোহাম্মদ খান বাবলুকে শুভেচ্ছা ও প্রীতির সঙ্গে। চানক্যসেন, নিউদিল্লী-২৯.১১.০৩। আপনার হাতের লেখায় সই পাওয়া জীবনের একপরম অমৃত পাওয়া। আজ সকালে ১৫.৯.০৪ ইং তারিখে বইটি পড়ে শেষ করলাম। গত ২/৩ দিন যাবত পড়া শুরু করেছিলাম। পড়া শেষ করে আমার তাই মনে হচ্ছে জীবনের এক পরম অমৃত পাওয়া। বইটি পড়ার সময়মনে হয়েছে এ বইয়ের লেখক এ শতাব্দীর কৃপাচার্য, ভীষ্ম আচার্য, দ্রোনাচার্য, বিদুর, এ শতাব্দীর সঞ্জয়। সঞ্জয় যেমন দিব্য দৃষ্টি ও কর্ণ দ্বারা সবকিছু দেখে ও শুনে নিপুণভাবে গীতা বর্ণনা করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে তেমনি লেখক চানক্যসেন নামক এক মুনিঋষি বিশ্বম্ভর চৌধুরী, বাসন্তী দেবী, দেবযানী, রামসুব্রামনিয়াম, সাবিত্রী আম্মা, সরোজা, ধর্মরাজ, বিপিন ভাই দেশাই, হিমাদ্রী বসু, গোকুল ভাই, মহাত্মাগান্ধী, এ্যানীবেসান্ত এঁদের জীবন গাঁথা বাংলাভাষী তথা ভারতবাসীর কাছে অনুপমভাবে, সুক্ষ্মভাবে বর্ণনা করেছেন। সাবিত্রী, বাসন্তীদেবী, দেবযানীদের জীবন গাঁথা বর্ণনা করতে

www.pathagar.com

গিয়ে মহাভারত রামায়ণ, গীতা, বেদ উপনিষদ এর বিদ্যা শিক্ষা মহাত্ম Gloryfy করে তুলে ধরেছেন- যার জন্য বইটি আমার কাছে আরোও অনেক বেশি ভালো লেগেছে, আর এই ভালো লাগার তাড়না থেকে এই চিঠি লিখছি। অসাধারণ ভালো বই, খুবই উন্নতমানের উপন্যাস - সে নহি সে নহি।

এই বইয়ের গুণগতমানের তুলনা চলে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরার সাথে', তলস্তয়ের রিজারেকশন বা পুনঃজন্মের সাথে। আমি সবই পড়ে মুগ্ধ এবং মুগ্ধ হয়েছি। এর কয়েক মাস আগে অরাজনৈতিক পড়েছি- সেটাও খুব ভালো উপন্যাস, বিহারের মানুষের জীবন গাঁথা, বিহারের রাজনীতি, রতনলাল ড্রাইভার, দিল্লীর পুলিশ, কংগ্রেস রাজনীতি, বিহারের দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে রেখা অরাজনৈতিক উপন্যাস পড়ে খুব ভালো লেগেছে।

আরও যেজন্যে এই চিঠি লিখছি তা হচ্ছে আপনার প্রতি একটি অনুরোধ, সে অনুরোধ হচ্ছে- আপনি আপনার চানক্যসেন নামে যে লেখাগুলো লিখেছেন সারা জীবন দয়া করে তার রচনাবলী বের করার ব্যবস্থা করুন। যাতে আপনার লেখাগুলো আরও দুই/একশত বছর বা তারও বেশি সময় মানুষ সহজে পড়ার সুযোগ পায়, তার জন্য রচনাবলী বের করা খুব প্রয়োজন অতিসত্তর। এখন আপনার বয়স ৮৪ বছর, ২৯.১১.২০০৩ ইং বা গত ২৯শে নভেম্বর আপনার বাসায়, আপনাকে কিছুটা শারীরিক দুর্বল মনে হলো। যেভাবে ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে বই বিলিয়ে দিলেন তা দেখে আমার দুঃখ লাগলো। যাক, দয়া করে আপনার লেখার রচনাবলী যাতে দ্রুত বের হয় তার ব্যবস্থা করবেন, এই আমার একান্ত অনুরোধ আপনার কাছে। এর আগে আপনার লেখা পিতা-পুত্রকে, পুত্র-পিতাকে তিন খণ্ড আমি পড়েছি, খুব ভালো লেগেছে। ১০/১৫ কপি ঢাকায় আমি কিনে উপহার দিয়েছি - তা আপনাকে আগে টেলিফোনে বলেছি।

অনুগ্রহ করে কি এই পত্রের প্রাপ্তি সংবাদ জানাবেন? আমি আপনার আর্শিবাদ চাই- আবার বলছি- আপনি আমাদের কৃপাচার্য, বিদুর, ভীষ্ম আচার্য, দ্রোনাচার্য, সঞ্জয়।

'সে নহি সে নহি' উপন্যাসের ৩১৮ পৃষ্ঠায় দেববানীকে মধ্যাহ্ন আহারের নেমন্তন্ন করেছিলেন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক সমীর ঘোষ। কনট প্লেসের মাঝারি রেস্তোরায়, আরোও যারা উপস্থিত ছিলেন চারজন, শশধর চট্টোপাধ্যায় অর্থনীতির অধ্যাপক দিল্লী স্কুল অব ইকোনোমিক্স, সন্তোষ ভাটিয়া ইংরেজি পড়ান সেন্ট স্টিফেন কলেজে, মহীতোষ দত্ত বাংলা পড়ান মিরিন্দা হাউসে, শিবশংকর ত্রিপাটি রাজনীতি পড়ান দিল্লী কলেজে।

এদের জমজমাট হৃদয়গ্রাহী আলোচনার বর্ণনা সত্যিকারের অমৃতের জীবন স্বাদ। সে নহি সে নহি উপন্যাসে ১৯১০, ২০, ৩০, ৪০, ৫০ এই পঞ্চাশ বছরের অভিভক্ত বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতবর্ষের প্রবাহমান প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলী বাস্তব দলিল নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৯৬০ সালে যখন আপনি এই উপন্যাস লিখেছেন তখন আপনার বয়স ছিল ৪০ আর আমার বয়স ছিল ৬। ১৯৬০ সালে সাবেক পাবনা বর্তমানের সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই কালিবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি।

www.pathagar.com

খুশবন্ত সিং এর আত্মজীবনী 'ট্রুথ লাভ এন্ড এ লিটল ম্যালিস' কয়েকবার পড়লাম। উনি ১৯২০ সন থেকে ১৯৩০ পর্যন্ত দিল্লীর মর্ডান স্কুলে এবং ১৯৩০ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত আইয়ে পড়েছেন দিল্লীর ষ্টিফেন কলেজে। এবার দিল্লী গেলে মর্ডান স্কুল ও ষ্টিফেন কলেজ নিজ চোখে দেখে আসবো।

রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, বেদ পড়েছি - এগুলো মানুষের আত্মার মূল্যবান খাদ্য, মানুষ, সমাজ ও দেশের প্রাণ বা আত্মা। উপনিষদটা এখনও পড়া হয় নাই- আপনার সে নহি সে নহি পড়ে, পড়ার জন্য তাড়নাবোধ করছি-আশা করি অল্পদিনের মধ্যে উপনিষদ পড়তে সক্ষম হবো। ২৯.১১.০৩ইং তারিখে আপনার বাস ভবনে যে ভদ্র মহিলা আমাদের সন্দেশ দ্বারা আপ্যায়ণ করেছেন ঐ ভদ্র মহিলাকে আমার প্রণাম ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

আপনার স্নেহভাজন
আবু মোহাম্মদ খান বাবলু
৩৮৩/২- ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট, ধানমন্ডি
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রখ্যাত সাহিত্যিক চানক্য সেনের চিঠি (ভবানী সেন গুপ্ত)

ভবানী সেন গুপ্ত।
এ-৯৬ চিত্তরঞ্জন পার্ক।
নিউ দিল্লী - ১১০০১৯।

তারিখ - ১২/১১/২০০৪

প্রিয় বাবলু,

তোমার ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের দীর্ঘ চিঠি পেয়ে বিশেষ আনন্দ হলো। আরো এই কারণে যে এই চিঠি, অসম্পূর্ণ ঠিকানার জন্যে তোমার কাছে ফেরত গেলেও তুমি আবার তাকে কুরিয়ারে আমার কাছে পাঠিয়েছ। কয়েকজন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে গত বছর নভেম্বরে আমার বাড়িতে তোমার আগমণ খুব মনে আছে। আমার উপন্যাসগুলি পড়ে তোমার ভাল লেগেছে জেনে স্বভাবতই খুশি হয়েছি। সে নহি সে নহি উপন্যাস তুমি যে প্রশংসার অতিভাষণে গ্রহণ করেছ তা আমাকে এবং আমার মেয়েকে যথেষ্ট স্পর্শ করেছে। পশ্চিমবাংলায় ও দিল্লীর বর্তমান পঞ্চাশের নিচে বাঙালিরা আমার উপন্যাসকে এভাবে এত উচ্ছ্বসিত স্বাগত জানায় না। এ বছর জুলাই এর প্রথমার্ধে আমেরিকান বেঙ্গলী কনফারেন্সের ২৪তম অধিবেশনে বল্টিমোর গিয়েছিলাম। সেখানেও দেখে মজা লাগলো যে মার্কিনবাসী বাঙালীরা আমার প্রথমদিককার উপন্যাসগুলিকে যে গভীর অনুভূতির সঙ্গে মনে রেখেছে নিজের দেশের বাঙালীদের মধ্যে তা এখন বিরল। আমার প্রকাশকরা বলেন পিতা পুত্রকের উপন্যাসের যে দুখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তার বিক্রি বাংলাদেশে যতটা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে ততটা হয় নি। ভাবতে ভালো লাগে যে বাংলাদেশে আমার লেখার এখনও কিছু অন্তরঙ্গ মূল্য আছে। বাংলাদেশ-ই তো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলা তোমাদের শুধু মাতৃভাষা নয়, জাতীয় ভাষা। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা শুধু মাতৃভাষা, রাজ্য স্তরে সবে মাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় ভাষা হিন্দি, জাতীয় স্তরের ব্যবহারিক ভাষা ইংরেজি।

দিল্লীতে বাঙালিদের মধ্যে এখন প্রায় শুনতে পাই বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে হতশার কথা। আসলে আমাদের দেশে সাক্ষরতা এখনও ৬০ এর কোঠা পেরিয়ে যায় নি। বই পড়ার মতো ভাষাজ্ঞান ২০ শতাংশের বেশি লোকদের নেই। এদের মধ্যে উচু দরের উপন্যাস পড়বার মত ৫ শতাংশও আছে কি না আমার সন্দেহ। বাংলার চার পাঁচটি টেলিভিশন চ্যানেল টেলিফ্লিম ও সিরিয়ালের দ্বারা মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষকেও টেনে নিয়েছে। বই পড়ার সময় নেই মানুষের, ইচ্ছাও কমে গেছে।

আমি দিল্লীতে বাস করছি ৫০ বছরেরও বেশি। আমার যা সাহিত্যকৃতি তা দিল্লী থেকে। আমি বাংলাভাষী ভারতীয় লেখক। বাঙালি জীবন নিয়ে আমি বিশেষ উপন্যাস

www.pathagar.com

লিখি নি। আমার উপন্যাসগুলিতে পটভূমিকা ভারত ও পৃথিবী, বাংলা জীবন নয় এবং এ কারণে আমার যারা বাঙালি পাঠক তারা নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি দেখতে পায় না আমার উপন্যাসে। তারা বলে, আমার চরিত্রগুলো তাদের জানা চেনা চরিত্রের মধ্যে নয়; "আমরা এদের চিনি না।"

শুধু বাংলা নিয়ে নয়, ভারতের সব ভাষা সম্বন্ধেই এই অবস্থান দেখতে পাচ্ছি। সব ভাষা ও সাহিত্যই আঞ্চলিক বিষয়বস্তু, চরিত্রগুলি সমস্যাগুলি ভাষাগত অঞ্চল ভিত্তিক। তোমাদের দেশে সারা বাংলাদেশ নিয়ে লেখা হয়। আমাদের দেশে মারঠি সাহিত্য মারাঠিদের নিয়ে, তামিল সাহিত্য তামিলদের নিয়ে, বাঙালি সাহিত্য বাঙালিদের নিয়ে। আহারে বিহারে, পোশাক আশাকে, ব্যবসা বাণিজ্যে, পর্যটনে ভারত একত্র মিলিত হয়েছে, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যে হয় নি, হবার কোনও সম্ভাবনা আমি দেখতে পাই না। আমরা এখনও ট্রানশ্লেষনে একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করি। এই বাস্তব অবস্থান ভারতের গণতান্ত্রিক প্রশাসনের পক্ষে এবং শাসকদের জন্যে বিশেষ অনুকুল। একটা অঞ্চলের কোনও সমস্যা সারাদেশের মন কাড়াতে অনেক সময় নেয়। ভারত, সর্বভারতীয় গণতন্ত্র এখন সারা পৃথিবীর সম্মান পাচ্ছে। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মুসলমান, প্রধানমন্ত্রী শিখ। ভাবতে পারো মার্কিন মুলুকে কখনও দুই সংখ্যা লঘু মানুষ দুটি প্রধানতম ক্ষমতার আসন দখল করে নিয়েছে? সর্বভারতীয় গণতন্ত্র কিন্তু সর্বভারতীয় সাহিত্য তৈরি করতে পারে না, যদিও ক্রমশ পদক্ষেপের মাধ্যমে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি তৈরী হচ্ছে সঙ্গীত সিনেমা, নাটক (বিশেষ করে বলিউড) আহার, বিহার, পোশাক পরিচ্ছদ, বসন ভূষণ, ভ্রমণ পর্যটন ও আত্মজীবন তৈরি করছে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের হয়ে থাকতে হবে আঞ্চলিক, সর্বভারতীয় সাহিত্যের সূচনা হয়েছে ইংরেজি ভাষায়। এই নিয়ে আমাদের দেশে দক্ষিণ এশিয়ায় খুব একটা আলোচনা আমার চোখে পড়ে না।

একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে ডিসেম্বরে আমার ঢাকা যাবার। হবে কি না এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যদি হয় তোমাকে আগে থেকে জানাবো যাতে তোমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ হতে পারে। অঙ্কুর প্রকাশনীর মেসবাহউদ্দিন আমার পরিচিত। আরো এক ভদ্রলোক গত এপ্রিল মাসে আমার বাড়িতে এসেছিলেন তার নাম সিরাজুল আলম খান। ঢাকায় "স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটির" সঙ্গে সংযুক্ত। এদের ঠিকানা ৯-এ ধানমণ্ডি, ৩৬ নং বাড়ি। ইনি আমাকে বলেছিলেন ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকাতে একটা বড় রকমের সম্মেলন হবে এবং সেখানে উনি আমাকে নিমন্ত্রণ করবেন। তার পরে এখন পর্যন্ত যোগাযোগ এর সঙ্গে হয় নি।

তুমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে খুশি হবো। এরপরে যখন দিল্লী আসবে তোমার নিজের স্ত্রী পুত্র কন্যাকে নিয়ে এসো। এবং আমার সঙ্গে দেখা ও আলোচনার জন্যে সময় রেখো।

ইতি
ভবানী সেন গুপ্ত।
দাদা বাবু

www.pathagar.com

লেখক ও অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ সাহেবকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় স্যার–

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানবেন।

আমার বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে। পাকিস্তান আমলে যখন আপনি পাবনা এ্যাডওয়ার্ড কলেজের অধ্যাপক ছিলেন, তখন আমাদের তামাই গ্রামের বেশ কয়েক জন ছাত্র এ্যাডওয়ার্ড কলেজের পড়ালেখা করেছে। এর মধ্যে আমার আপন মামা আ: বাকী তালুকদার একজন। তারা সবাই আপনার ভক্ত ও অনুরাগী ছিল। বালক ও কিশোর বয়সে তাদের মুখে আপনার সুখ্যাতিও প্রশংসা শুনেছি। একবার তামাই হাইস্কুলের বাৎসরিক মিলাদ বা ধর্ম সভায় আপনি এসেছিলেন তখন আপনাকে দেখেছি। এরপরে আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখন আপনার চলনবিলের ইতিকথা বইটি পড়ি সূর্য সেন হলে আমার এক বন্ধুর কাছ থেকে এনে। ঐ বই পড়ে আমি আপনার ভক্ত হয়ে পড়ি, তখন থেকে আপনি আমার হৃদয়ের পাতায় শ্রদ্ধার সাথে স্থান করে নিয়েছেন। কয়েকদিন আগে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলীতে তাঁর ভ্রমণ কথা পড়তে ছিলাম, শরৎচন্দ্র ১৯২০ সনের দিকে দিল্লীতে কংগ্রেসের এক সম্মেলনে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ঘুরে এসে লিখেছেন– "দিল্লীর ঐ সম্মেলনে কত হাজার হাজার মানুষকে দেখলাম কিন্তু ঐ হাজার হাজার বা লক্ষ লোকের মধ্যে একজন মাত্র মানুষের মুখ, চোখ, কান, নাক বা চেহারা মনের পাতায় গেঁথে রয়েছে তিনি হলেন দেশ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। কত বড় ভারত বর্ষের কত প্রান্ত থেকে কত লক্ষ লোক দিল্লীতে এসেছে কিন্তু তার মধ্যে গেঁথে রয়েছে একজনের চেহারা তিনি হলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।" শরৎচন্দ্রের কাছে থেকে ধার করে নিয়ে আমিও বলতে চাই সেই পাকিস্তানের সময়ে তামাই হাইস্কুলে আপনাকে দেখবার পরে দেশ-বিদেশের কত লক্ষ লক্ষ লোক দেখেছি তার মধ্যে যে দুই চারজন মানুষের চেহারা এখনও হৃদয় পটে ভেসে বেড়ায় তার মধ্যে আপনি অন্যতম।

আপনার পায়ের ধুলা একবার কপালে নেবার খুব ইচ্ছা, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে সুযোগ হচ্ছে না বলে খুবই কাতর অবস্থায় আছি। আপনার 'চলনবিলের ইতিকথা 'বইটির গুণগতমান যে কত উচ্চস্তরের তা লিখবার মতো যোগ্যতা আমার নেই, সে যোগ্যতা বাংলাদেশের কয়জনেরই বা আছে তাও প্রশ্ন সাপেক্ষ। আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে বইতে আপনি জ্ঞানী লোকদের নাম লিখবার সময়ে যে সম্মান ও সমীহের সাথে লিখেছেন তা দেখে। খুবই অসাম্প্রদায়িক মানুষ আপনি, অন্যকথায় সত্যিকারের ধার্মিক। ধর্মের শিক্ষার সঠিক মর্যাদা আপনার মধ্যে আছে। সেই ১৯৭৭ অথবা ১৯৭৮ সনে চলনবিলের ইতিকথা বইটি পড়েছি এখনও ঐ বইয়ের অনেক কথা আমার

www.pathagar.com

হৃদয়পটে ভেসে বেড়ায়। এটা আপনার ঐ বইয়ের বিরাট গুণ। আমার মতো একজন চঞ্চল ও অস্থিরমনা পাঠককে যেভাবে চলনবিলের ইতিকথা ধরে রেখেছে এখন পর্যন্ত তা বলার বাইরে। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি তারমধ্যে অন্যতম একটি একবার ৮৯/৯০ সনে মনে হয় কিছু গুণবান ভালো মানুষ আপনাকে ঢাকার যাদুঘরে সম্বর্ধনা দিয়েছে। ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারা। ঢাকার যাদুঘর আমার বাসার খুবই কাছে পরেরদিন পত্রিকায় সংবাদ দেখে এত দুঃখ পেলাম তা এখনও বয়ে বেড়াচ্ছি।

সূর্য ও চন্দ্র যেমন পৃথিবীকে আলো সরবরাহ করে চলছে তেমনি আপনি আমাদের মতো মুর্খ লোকদের মাঝে জ্ঞানের আলো সরবরাহ করে যাচ্ছেন- আপনার জ্ঞান, আপনার ত্যাগ, মানুষের প্রতি আপনার ভালোবাসার কথা মনে হলে আমার চোখ দিয়ে পানি পড়ে। চলনবিলের ইতিকথা ছাড়াও আরও ২/১টি আপনার বই আমি পড়েছি।

যাক আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন। একবার আপনার পায়ের ধুলা আমার কপালে নেবার সুযোগ কিভাবে পাব তার খুবই প্রতিক্ষায় আছি। আমার কয়েকটি লেখা আপনার নিকট পাঠালাম– শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায় এর সাথে আমার পত্র যোগাযোগ ছিল। তিনি আমার কিছু লেখা পড়েছেন পত্র লিখে তাঁর মনোভাব জানিয়েছেন। সেই সাহসে আপনার মতো একজন প্রাজ্ঞ-জ্ঞানী-পূণ্যবান মানুষকে আমার লেখাগুলো পাঠালাম খুবই বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি দয়া করে পড়ে দেখবার জন্য।

সেই ১৯/১০/১৯৮৫ সনে দৈনিক সংবাদে একটি চিঠি ছাপা হয়েছিল আপনার সেই চিঠি থেকে ঠিকানা লিখে রেখেছিলাম– সেই সূত্রধরে এই ঠিকানায় এ চিঠি পাঠালাম জানি না আপনি পাবেন কিনা। যদি পান দয়া করে জানাবেন। জানি এই বয়সে এতে আপনার তা করতে কষ্ট হবার কথা।

চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের বুকলেটের শেষ পৃষ্ঠায় লেখার শেষে আমার পরিচিতি দেওয়া আছে।

আবার আপনার দোয়া আর্শিবাদ চেয়ে এই পত্র শেষ করছি।

আপনার গুণমুগ্ধ ভক্ত :
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩৮৩/২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট
ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৯৬৬৯৫৪৪
২৪/১২/২০০২

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ এম এ হামিদের চিঠি

১/১/২০০৩

ভাই বাবলু,

আপনার চিঠি গত ২৯/১২/০২ তারিখে পেয়েছি। আমি দীর্ঘ দশ মাস যাবৎ স্ট্রোকে ভুগছি। ঠিকমতো কথা বলতে পারি না ও নড়াচড়া করতে পারি না। হাত দিয়ে লেখার শক্তিও আমার নাই। অন্যকে দিয়ে আমি চিঠি পড়িয়ে নিয়েছি এবং লিখিয়ে নিচ্ছি। আপনার কথা সব মনে নেই। তবে তামাই গ্রামে আপনাদের সঙ্গে পরিচিতির কথা কিছু মনে আছে। আল্লাহ্ যদি আমাকে আবার সুযোগ দেন আপনাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ায় তাহলে হয়ত আমার চিঠি পত্র পাবেন, অন্যথায় আমার এ চিঠি শেষ চিঠি হতে পারে। আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনার অনেক লেখা পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। আমার সাথে আপনার দেখা হবে কিনা সন্দেহ। যদি বেঁচে থাকি তবে দেখা হবে ইনশাল্লাহ্।

মাওলানা ভাসানী সাহেবের কলেজে আমি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত প্রিন্সিপাল ছিলাম। উনার সাথে আমি অনেক সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করেছি। ঈশ্বরদীর মুজিবর রহমান আমাদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর লেখা বিভিন্ন বই আমি পড়েছি। তিনি অনেক বই আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমার অনেকগুলো বই তাঁর কাছে পাঠিয়েছি। আমার "চলনবিলের ইতিকথা" ঢাকা থেকে নতুন প্রকাশ হয়েছে। প্রকাশক, জাহাঙ্গীর হোসেন (মৎস্য অফিসের বিপরীতে শেকার্স মসজিদ, ব্যারিষ্টার রওশন সাহেবের বাড়ি) দাম : ৩৫০/-। আপনি ঢাকা থেকে একখানা সংগ্রহ করবেন। আমার কাছে নাই।

আশীবাদক

অধ্যক্ষ এম এ হামিদ

www.pathagar.com

লেখক ও অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদকে লেখা চিঠি

পূজনীয় স্যার–

আমার আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানবেন। আমার ২৪/১২/০২ তারিখের লিখিত চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে আপনার ১/১/০৩ তারিখের লেখা পত্র আজ ৭/১/০৩ তারিখ এইমাত্র (রাত দশটা) পেলাম।

শুনে মর্মাহত হলাম আপনি দশ মাস যাবত স্ট্রোকে শয্যাশায়ী হয়ে খুবজীপুরে আছেন। আপনি আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাকে হেফাজত করেন ও মানবসেবা করার ক্ষমতা দান করেন। আপনার জন্যও আমি দোয়া করবো। প্রায় দশ বছর আগে বাংলাদেশের প্রখ্যাত লোক ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবের কাছ থেকে একটি বই এনে পড়েছিলাম "We the people" বইটির লেখক গত ৫০/৬০ বছরের ভারতের এক নম্বর আইনবিদ ননীভিলা পালকিওয়ালা। পালকিওয়ালা সাহেবের অনেক বিষয়ের লেখা নিয়ে ঐ বই। ঐ বইতে একটি লেখা ছিল বোম্বে শহরের একজন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের মৃত্যু হলে তাকে নিয়ে। ননীভিলা পালকিওয়ালা সাহেব লিখেছেন– " 'বোম্বে' শহরে অনেক দেখবার মতো সুন্দর দৃশ্য আছে অনেক পুরানো মন্দির অনেক নতুন পুরাতন ইমারত, নদী আছে সমুদ্র আছে, অনেক বাগান আছে, কিন্তু এসব সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিতেন ঐ শিক্ষক যখন মাথা উচু করে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন। তিনি ষাট বৎসর বোম্বে শহরের সুন্দরতম শোভা বর্ধন করেছেন।"

ননীভিলা পালকীওয়ালা সাহেবের মতো আমিও বলতে চাই আপনিও আমাদের দেশের বোম্বের ঐ শিক্ষকের মতো সুন্দরতম শোভা বর্ধনকারী একজন। আপনার লেখা আপনার শিক্ষক রবিউল হোসাইন সাহেবকে নিয়ে লেখা বইটি মুজিবর রহমান বিশ্বাস সাহেব আমাকে দিয়েছিলেন পড়ে মুগ্ধ হয়েছি আপনার শিক্ষকের প্রতি ভক্তি দেখে।

আপনার চিঠি পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। এ চিঠি আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাওয়া। আমার ২৪/১২/০২ তারিখের চিঠিটি দয়া করে আপনি আবার কাউকে দিয়ে পড়িয়ে শুনলে খুশি হবো। আজ ৭/১/০৩ মঙ্গলবার সকালে সামবেদ সংহিতা পড়ার সময় আপনার কথা মনে পড়ছিল। সামবেদ সংহিতায় এক জায়গায় লেখা রয়েছে শরৎকালীন আকাশে চন্দ্রিমার স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার স্পর্শে উর্দ্ধাকাশে শুভ্র খণ্ডবৎমেঘের নিরন্তর আনাগোনা যে স্বর্গীয় শোভা সৃষ্টি করে সেই ঐশ্বরিক আহ্লাদ 'আস্বাদন করেন জগতে জ্ঞানীগণ।" আপনিও আমাদের শরৎ কালীন আকাশের স্নিগ্ধ শুভ্র মেঘের মতো সৌন্দর্য দানকারী।

আল্লাহ আপনাকে অনেক অনেক বৎসর সুস্থ করে সবল করে বাঁচিয়ে রাখুন এই প্রার্থনা করি।

আপনার স্নেহভাজন
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩৮৩/২ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ঢাকা-১২০৫
৭/১/২০০৩

www.pathagar.com

কুনাল চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

মান্যবরেষু,

আপনার আন্তরিকতার স্পর্শ মাখা পত্রের জন্য ধন্যবাদ। চিঠির উত্তর দিতে বিলম্বের জন্য দুঃখিত, চট্টোপাধ্যায়ের প্রতি আপনার দুর্বলতার কথা জানলাম। জানি না এই চট্টোপাধ্যায় আপনার সযত্নে লালিত ধারণাটি রক্ষা করতে পারবে কিনা। আমার লেখা পড়ে আপনি মুগ্ধ হয়েছেন জেনে আনন্দিত হলাম। আজন্ম আমি শুনে আসছি ঢাকার বিক্রমপুরে আমাদের বহু পুরুষ আগে আদিবাস ছিল। অথচ আজও আমার ঢাকা দর্শন হয় নি। বিদ্যে বুদ্ধি টাকার জন্য যে ঢাকা বিখ্যাত সেই ঢাকার যা আমি দেখতে চাই সেটা হলো এই ফেব্রুয়ারির ঈদুজ্জোহার পরবর্তী দূষণ, অনেকটা কিপলিঙের কলকাতার আঁস্তাকুড় দেখার মতো। আমার অবশ্য একটু গবেষণার ইচ্ছে আছে।

আমার যে সকল বন্ধু বাংলাদেশ দর্শন করেছে সকলেই সেখানকার আতিথ্যে মুগ্ধ। আমি সামনের ঈদে একবার ঢাকা যেতে চাই। আপনার দিক থেকে কোনও রকম সাহায্য পেলে কৃতজ্ঞ থাকব। অধ্যাপক অশোকরুদ্রের সাথে তাঁর জীবনের শেষ সাতমাস আমি তাঁর গবেষণা সহকারী হিসেবে যুক্ত ছিলাম। আমার জীবনে সেটা এক মহার্ঘ অভিজ্ঞতা। আশা করি আপনি কুশলে আছেন। কলেজ ষ্ট্রীট অফিসে আপনাকে সেদিন কোন রকম অবজ্ঞা করার ইচ্ছে আমার ছিল না। বোধ হয় তসলিমা সম্পর্ক বোধ বিনিময়ে আপনার চিত্ত আহত হয়েছে। আমি এটুকু বলতে পারি তসলিমার কোনও বই আমি পড়ি নি। তসলিমা বিতর্কে খুব একটা আগ্রহীও নই।

শুভেচ্ছা সহ

কুনাল চট্টোপাধ্যায়

৪৬ রামলাল ব্যানার্জি রোড

কলকাতা ৭০০০৩৬

কুনাল কুমার চট্টোপাধ্যায় একজন লেখক ও সাহিত্যিক

কলকাতার জলাভূমি নামে তার সুন্দর একটি বই আছে, যা তিনি আমাকে পড়তে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায় আমার প্রিয় বন্ধু। ১৯৭৪ সনে বরিশাল বি,এম, কলেজ থেকে কৃতিত্বের সাথে আই, এ, পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগে অনার্সে ভর্তি হয়। তুখোড় ছাত্র, এখানে পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে ১৯৭৬ সন পর্যন্ত আমি ইংরেজি বিভাগে অনার্সে পড়েছি, দুই বছর।

এই সময়ে আমাদের দুজনের সাথে অসাধারণ বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। প্রায় সবসময় একজন ওপর জনের ঘাড়ে হাত দিয়ে বেড়াতাম। অনেক রাত দুজনে কথা বলতে বলতে রেসকোর্স ময়দানে বসে সারারাত কাটিয়েছি। পার্থ যখন বরিশালে যেতো তখন প্রতিবারই আমি সদরঘাটে ওকে স্টিমারে উঠিয়ে দিতে যেতাম।

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কথা বলে এক অমৃতের স্বর্গীয় স্বাদ পাওয়া যায়। ১৯৭৭ সন থেকে সে কলকাতার হরিদেবপুরে থাকে, এখনও আমি কলকাতা গেলে পার্থর সাথে যখন ময়দানে বসে ঘণ্টা দুয়েক কথা বলি তখন যে আনন্দ পাই তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায় একজন সুলেখক। প্রখ্যাত দেশ পত্রিকায় তার লেখা মাঝে মধ্যে ছাপা হয়। রবীন্দ্র, বিবেকানন্দ সম্পর্ক এবং লেডি অবলা বসু ও তিন মনীষী, নামে তার দুটি অসাধারণ বড় মাপের বই আছে। রবীন্দ্র বিবেকানন্দ সম্পর্কে বইটি প্রকাশের জন্য পার্থকে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের বাবার নাম শ্রী উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বরিশাল ল'কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন অনেকদিন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাস সাহেবসহ বরিশালের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে খুবই ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন। খুব উঁচুমানের একজন মানুষ ছিলেন। ১৯১৪ সনে উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় উজিরপুর থানার শোলক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৯২ সনে বরিশাল শহরে মৃত্যু বরণ করেন।

আমাকে তিনি অশেষ স্নেহ করতেন। সব সময়ে বলতেন "বাবলু ভগবান তোমাকে অনেক বড় করবেন। ভগবান তোমাকে দিয়ে দেশের মানুষের অনেক উপকার করাবেন।" পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের বড় বোনের জামাই প্রখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর দুর্গা দাস ভট্টাচার্য। পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের মাও আমাকে নিজের ছেলের মতোই স্নেহ করেছেন। আমাকে দেখলেই বাবলু এসেছে, বাবলু এসেছে বলে অনেকক্ষণ চিৎকার করতেন। এখানে পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায় এর কয়েকটি চিঠি ছাপা হলো, বহু চিঠি হারিয়ে গিয়েছে।

www.pathagar.com

প্রিয় বাবলু (১)

তুমি, যাওয়ার পর আর কোনো চিঠি পাই নি। অথচ তোমাকে লেখার কথা ভাবছিলাম বারবার। কিন্তু, এখন আমার অবসরের মুহূর্তগুলোয় অখণ্ড মনোযোগ দাবি করে আমার দুরন্ত কন্যা। যার সাথে তোমার খানিকটা পরিচয় হয়েছে। এছাড়া আমি একা হয়ে যাওয়ায় পেট, মন এবং সৌজন্যের দাবি মেটাতেও অনেকটা সময় ফুরিয়ে যায়। যার ফলে ক্যালেন্ডার পাল্টে যায়, নিয়মমাফিক উৎসব অনুষ্ঠান এগিয়ে আসে, আর আমি ভাবতে থাকি, আরও একটা বছর কেটে গেল, অথচ কিছুই তো হইলো না। ('কিছুইতো হলো না' রবীন্দ্র সংগীত খানি রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে শুনেছ কি?)

এমন সময় ফিরোজের টেলিফোন এল। ওকে সঠিক ঠিকানা না পাওয়ায় বেচারা অহেতুক ভুল জায়গায় দৌড়াদৌড়ি করেছে– যাই হোক্ অবশেষে যোগাযোগ হলো। তোমার কাগজ ভালো লাগছে। নতুন যে কাগজ ফিরোজের মাধ্যমে পাঠালে তাতে 'শান্তিনিকেতন কলকাতা ঘুরে এলাম' কাল রাতেই কিছুটা দেখলাম। তোমার লেখা, তাই ধীরে সুস্থে পড়ার ইচ্ছে, মনে হচ্ছে ভালো হয়েছে। নববর্ষ সংখ্যাও তো কলেবরে আকর্ষণীয় লাগছে, কিন্তু এখনো পড়ার সুযোগ হয় নি।

তুমি আমাকে লিখতে বলায় ধন্যবাদ। আমিও প্রত্যেক সপ্তাহে একটা বিশেষ কলম ধরনের লেখা পত্রিকার কথা ভাবছিলাম। 'কলকাতার চিঠি' শীর্ষক হলে পাঠকরা কলকাতার টুকিটাকি খবরাখবরও তথ্যের এবং কালিক ঘটনায় জন্যই অপেক্ষা করবে। কিন্তু, সেরকম সাংবাদিকের মতো ঘুরে ঘুরে লেখার অবসর আমার কোথায়? তার চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মানবিক সৃষ্টিশীল অথচ লঘু ধরনের লেখার কথা ভাবা যেতে পারে। দেখি, লেখা হয়ে ওঠে কি-না, আর ডাকবিভাগের কল্যাণে তা তোমাদের কাছে পৌঁছায় কি-না।

তোমার শীঘ্রই কলকাতা আসার সম্ভাবনা রয়েছে কি? এলে অবশ্যই আমার এখানে আসবে, না এলেও চিঠিতে যোগাযোগ রাখবে। জীবনের একটা সুন্দর অথবা ঝড়ের সময় আমরা একসাথে ছিলাম, তার স্মৃতি আজও আমার ব্যাকুল করে, মনে হয় যেন পূর্বজন্মের স্মৃতি।

আশা করি শারীরিক ও মানসিক ভালো আছো।

প্রীতি ও শুভেচ্ছাসহ–

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়

২১/৭/১৯৮৯

পুণঃ আমার একবন্ধুর বিপর্যয় নিয়ে এত ঝামেলায় কাটাচ্ছি যে, ফিরোজকে কলকাতা ঘুরিয়ে দেখানো হলো না। রোববার ওকে নিয়ে বেরোনোর সময় বের করেছিলাম, কিন্তু, এর আগেই ও চলে যাবে বলছে। আমার দিদি এ মাসের শেষে অথবা সামনের মাসের প্রথমে কলকাতা আসবে সম্ভবত, তপুর আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে। ওকে তোমার বাকী পরিবর্তনগুলো অর্থাৎ Up to date সংখ্যাগুলো সম্ভব হলে দিয়ে দিও। তোমার লেখা পড়ার জন্যই বললাম। আমি মাঝে মরতে বসেছিলাম, হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে ডাক্তারি পেশায় বলে Vasovogal attack - গত বিশ

www.pathagar.com

বছর ডাক্তার ওষুধ লাগে নি কখনো, এখন আর শরীর বুঝি স্ববশে নেই। তবু এখন বেশ ভালো স্বাভাবিক মনে হয় দিদিকে জানিও না যেন এসব। দিদির সাথে একটু যোগাযোগ রেখো। কে কী ভাবল, তার চেয়েও বড় কথা বিবেক, সেখানে তুমি পরিষ্কার থাকলে অনেক কিছুই সহজ হয়ে যায়।

প্রিয় বাবলু, (২)

তোমার কাছে লিখতে বসলে এত সবকথা, সামনে এসে ভিড় করে যে সে ভিড় ঠেলে এগোনো দায়। কলম থামিয়ে ভাবতে বসি। কিভাবে শুরু করি? তোমার চিঠি পেয়েছি গত ১৮ অগাস্ট। তৎক্ষণাৎ উত্তর না দেবার কারণ, অখণ্ড অবসর খুঁজছিলাম, যাতে বেশ বড় করে এক এক চিঠি লেখা যায়। মনে হচ্ছে তেমন অবসর খুঁজতে গেলে হয়তো দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে হবে। আর তুমিও নিশ্চয়ই তাতে খুশি হবে না। তোমার সাথে যে দু'বছরের মতো চিঠিপত্রের যোগাযোগ ছিল না তার মাঝে কতো পরিবর্তন ঘটে গেল। শুধু আমার কেন, তোমার জীবনেও। তোমার পিতৃবিয়োগের খবর আমার জানা ছিল না, এ চিঠিতেই জেনে ব্যথিত হলাম।

যে কথা বলছিলাম, ভাবতে বসি, এলোমেলো কতো টুকরো টুকরো স্মৃতি ভেসে বেড়ায়। আমার বাবার সাথে তোমার শেষ দেখার কথা; তুমি যেভাবে গুছিয়ে লিখেছো সমস্ত চিত্রটা যেন আমার চোখে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর মৃত্যুর সময় আমি কাছে ছিলাম না– এ দুঃখ আমার চিরদিন থেকে যাবে। পরিণত বয়সে মৃত্যু হওয়া সত্বেও তাঁর অভাব বা শূন্যতা এখনো আমি তীব্রভাবে অনুভব করি। তিনি আমায় বড্ড বেশি ভালো বাসতেন। সব পিতামাতাই পুত্রকন্যাদের স্নেহ করেন, ভালোবাসেন। এ নতুন কথা নয়। তবু সব কিছু ছাপিয়ে তাঁর সাথে আমার মনের, রুচির, চিন্তাধারার কোথায় যেন একটা বিশেষ যোগ ছিল। আমার শিক্ষা, রুচি, জীবনদৃষ্টির বিস্তর্উীর্ণ এলাকায় তাঁর সার্বভৌম অবস্থান। জীবন ও জগতের দিকে আমি তাকাতে শিখেছি দু'জনার কাছ হতে-প্রথম তিনি, দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ। এ আমার প্রাণের কথা, বোধ ও বোধি হতে উৎসারিত পরম সত্য উচ্চারণ। বাবা ছিলেন আমার পরম বন্ধু, অনায়াসে অকপটে যাঁর কাছে সবকথা খুলে বলতে পারতাম। আমি জানতাম আমার অনেক সমস্যার সমাধান তাঁর সাধ্যের মধ্যে নয়, তবু তাঁর কাছে সব কিছু বলে স্বস্তি পেতাম, শান্তি পেতাম, আশ্রয় পেতাম। সেইদিক থেকে আজ আমি আশ্রয়হীন।

হাজারের মধ্যে থেকেও আমি ভীষণ নিঃসঙ্গ। তাই ব্যক্তিগত সুখ দুঃখের অনুভূতি তোমাদের মতো ঘনিষ্ঠজনদের কাছেই লেখা যায়। তুমি কিন্তু ব্যক্তিগত খবর তেমন কিছু লেখ নি। বিয়ে-টিয়ে করেছো না করবে? তসলিমার প্রসঙ্গে আমার অভিমত চেয়েছো। ১৯৯২ এর ১৩ জুন 'দেশ'-এ 'রবীন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী প্রসঙ্গ' শীর্ষক আমার এক দীর্ঘ চিঠি প্রকাশিত হয়। আমার লেখার সাথেই আর একখানি চিঠি প্রকাশিত হয় ভিন্ন বিষয়ে 'নারী ও পুরুষ'– লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সেই-ই তসলিমার নাম ও লেখার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। তারপর তো অনেক ব্যাপার। বাবরি মসজিদ, দাঙ্গা, লজ্জা, চিৎকার চেঁচামেচি ইত্যাদি। ওঁর লেখার সাথে আমার তেমন, পরিচয় নেই, একমাত্র

www.pathagar.com

'নির্বাচিত কলাম' ছাড়া কিছুই পড়ি নি। তবে লজ্জার বিষয়বস্তু শুনেছি। 'নির্বাচিত কলামে' উগ্র নারীবাদী কথাবার্তা ঝাঁঝের সাথে লিখে গেছেন। আমার পরিচিতা অত্যন্ত শান্ত, ও রুচিসম্পন্না এক ভদ্রমহিলা 'নির্বাচিত কলাম' পড়ে বললেন 'তসলিমার লেখা পড়ে আপনাদের পুরুষ জাতটার উপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে।' লক্ষ করো 'পুরুষ জাত' কথাটা। ওর লেখাও একরকম সম্প্রদায়িকতাদোষে দুষ্ট। হোক না সে যতোই নারী মুক্তির মোড়কে পরিবেশিত। আমার মনে হয় এই সব বই সংসার ও সমাজ ছারখার করে দেবার ইন্ধন জোগাবে। এখানের প্রেস ওঁকে নিয়ে হৈচৈ করার ব্যাপারে বাঙালির হুজুক প্রিয়তা ও সংস্কৃতিহীনতার পরিচয় দিচ্ছে।

অনেকদিন তোমার সাথে দেখা নেই। প্রায়ই তোমার কথা মনে পড়ে। ভাবি, বাবলু একবার এখানে এলে হতো। চুটিয়ে আড্ডা দেয়া যেত। এদিকে আমি আবার পাহাড়ে যাচ্ছি। সিমলা যাবো। ২১ অক্টোবর যাচ্ছি। সম্ভবত ২ নভেম্বর ফিরব।

মানসিক দিক দিয়ে আমিও ভালো নেই। ভালো থাকা সম্ভবও নয়। আমার শৈশব - কৈশোরে এক কাকার স্নেহ ভালোবাসা পেয়েছিলাম। তাঁর নাম সৈয়দ মোতাহার উদ্দিন আহমেদ। তিনি আজ বেঁচে আছেন কিনা জানি না। জ্ঞানী ছিলেন তিনি। তাঁকে আমি দেখেছি নানা রকম বিপর্যয়ের মধ্যেও হাসি মুখে জীবন যাপন করার আশ্চর্য দার্শনিক শক্তি। তিনি আমার জীবনের শুরুতেই অনেক সাবধান বাণী শুনিয়েছিলেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত রসিক সেই কাকার সব কথার অর্থ তখন বুঝতাম না, এখন মাঝে মাঝে সব কথা মনে পড়ে এবং জীবনের মধ্যে দিয়ে তাঁর সত্যতা অনুধাবন করি। মাঝে মাঝে ভাবি কাকা কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন? এই মোতাহার কাকাকে নিয়ে আমার অনেক কিছু লেখার ইচ্ছে ছিল। আমার জীবনের এক ঘনায়মান অন্ধকারে যেভাবে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিলেন তা আজও আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

যখন তোমাকে লিখতে বসেছি মনটা নানা কারণে বিক্ষিপ্ত। শ্রাবণ আকাশের মতোই মেঘে মেঘে আঁধার। তাই ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্তি প্রসঙ্গে চলে এসেছি। সে কথা তোমার কাছেই শুধু বলা যায়। পৃথিবীময় শুধু বক্তা, সবাই বলতে চায়, শুধু কথা কথা আর কথা। শ্রোতা কোথায়? মনোগ্রাহী শ্রোতা? তোমাকে চিরদিন আমি মনোগ্রাহী শ্রোতা হিসেবেই জেনে এসেছি। তাই হয়তো লক্ষণরেখা অতিক্রম করি।

তোমার ইদানীংকার খবরাখবরসহ চিঠি চাই।

ভালোবাসা রইলো।
পার্থ সারথী
১০/৯/১৯৯৪

www.pathagar.com

২৮.৭.১৯৯৪ (৩)

প্রিয় বাবলু

প্রায় আড়াই বছর হয়ে গেল তোমার কোনো চিঠি নেই। আমাকে বিস্মৃত হও নি জানি কিন্তু তোমার নীরবতার কারণ জানি না। ৯২ এর ৭ মার্চ তুমি যে চিঠি এবং তোমার লেখার কিছু পেপার কাটিং পাঠিয়েছিলে তা পেয়ে আমার মতামত জানিয়ে উত্তর পাঠিয়েছিলাম যথাসময়ে। এবং স্মৃতি যদি আমায় বিভ্রান্ত না করে তাহলে তোমার লেখার বলিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার যে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, তাও মুক্তকণ্ঠে জানিয়েছিলাম। তারপর আর তোমার কোনো সাড়া পাই নি। অবশ্য, আমারও আর লেখা হয়ে ওঠে নি। কিন্তু মাঝেমাঝেই তোমায় লেখার কথা ভাবতাম। গত কয়েক বছরে আমার প্রাত্যহিক জীবনের ছন্দ বিঘ্নিত হয়েছে, ব্যস্ততা বেড়েছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে ধূসরতর। পত্রপত্রিকায় কিছু কিছু লিখতে হয়েছে। যথাসময়ে আলোচনা করা যাবে।

আমি জানি না এ চিঠি তোমার হাতে পৌঁছবে কিনা। কেননা যে ঠিকানায় তোমায় লিখছি সেখানে তুমি আদৌ আছো কিনা। কাজেই বেশি লিখতে ভরসা পাই না। তোমার আশ্বাসযুক্ত চিঠি পেলে তবেই সব কথা হবে। তোমার সার্বিক খবরাখবরসহ চিঠি চাই। কলকাতায় শীঘ্রই এলে খুব খুশি হবো। এলে, আমার এখানেই আসবে এবং থাকবে। ভালোবাসাসহ–

পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়
২১ কে কে রোড
পোঃ হরিদেবপুর
কলকাতা-৭০০০৮২

২১, কে কে রোড (৪)
কলকাতা ৭০০০৮২

প্রিয় বাবলু,

প্রায় বছরখানেক হতে চলল তোমার কোনো খবর নেই। কী ব্যাপার? ভালো আছো তো? গতবছর এমনি দিনে তুমি এখানে ছিলে। হয়তো তাই বেশ কিছুদিন যাবত তোমার কথা খুব মনে পড়ছে। গতবছর তুমি এখান থেকে ঢাকায় ফিরে আমায় যে চিঠি দিয়েছিলে, তার উত্তর আমি লিখেছিলাম। কিন্তু, তারপর আর তোমার কোনো চিঠি পাই নি।

আমি ভাই, খুব একটা ভালো নেই। সমস্ত জুলাই মাস অসুখ ভুগেছি, টাইফয়েড হয়েছিল। অসুস্থতার মাঝেও তোমাদের কথা খুব মনে আসছিল। আদতে শারীরিক সমস্যা খুব একটা দেখা দেয় নি কখনো। বলা যায়, নীরোগ ছিলাম কৈশোর থেকেই। এখন যেন বয়স জানান দিতে চায় বিভিন্ন সূত্রে। যাক্ সেসব কথা। নালন্দার চোখের সমস্যা নিয়ে সেপ্টেম্বরের শেষে হয়তো মাদ্রাজ যেতে হবে। নানান সব সমস্যার মাঝেও

www.pathagar.com

বইয়ের কাজ করে যাচ্ছি। জানি না কী হবে? কী আছে পথের শেষে!

তোমার যাবতীয় সব খবরসহ শীঘ্র চিঠি চাই। তারপর আবার লিখব। কলকাতায় আসার সম্ভাবনা থাকলে জানাবে। ভালোবাসা জেনো।

পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়
৫/৮/১৯৯৭

পুনঃ গত ২৬ জুলাই '৯৭ সংখ্যা 'দেশ'-এ (১৬-১৭ পাতায়) 'জীবনানন্দ' শীর্ষক আমার একটি লেখা বেরিয়েছে। জানি না, তোমাদের ওখানে 'দেশ' পাওয়া যায় কিনা।

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায় (৫)
২৬/১১/১৯৮৭

পার্থ–

প্রথমেই তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী, গত ১৬ই নভেম্বর তোমাকে উৎকণ্ঠার মধ্যে রাখবার জন্য, সেদিন ফোন করে বলেছিলাম রাতে তোমার সাথে থাকবো। কিন্তু ফোন করে বাংলাদেশ বিমান অফিসে গিয়ে দেখলাম পরের দিন ১৭ই নভেম্বর সকালের ফ্লাইটে সিট আছে তাই সকালের ফ্লাইটে সিট কনফার্ম করে ফেলি তখন বিকাল ৫টার মতো হবে। সেখান থেকে চলে যাই শিব নারায়ণ রায়ের সাথে দেখা করার জন্য, তার সাথে দেখা হয় কলেজ স্ট্রীটে কফি হাউসে, তিনি তার সল্টলেকের বাসায় নিয়ে যান, সেখানে রাতে থাকি, পরের দিন সকালে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেই, দেখলাম সল্টলেক থেকে দমদম বেশ কাছে কাজেই আর টালিগঞ্জে তোমার কাছে যাই নাই। অন্তত ফোন করে জানানো উচিৎ ছিল কিন্তু সে সুযোগ ছিল না। যাই হোক তোমার বেশ কষ্ট হয়েছে। আর কি প্রচুর কষ্ট হয়েছে তা বুঝতে পারি, কেননা এ ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আছে, কেউ যদি রাতে আসতে চেয়ে না আসে রাত তিনটা পর্যন্ত আমার ঘুম হয় না, এই মনে হয় এল হয়তো কোনও অসুবিধা হয়েছে ইত্যাদি। যাই হোক তোমার কথা ভেবে বেশ খারাপ লাগছে।

তোমাদের সবার সাথে মিশতে পেরে বেশ ভালো লেগেছে। তোমার ভাড়াটে দিদির আন্তরিক আপ্যায়নের খাবারের কথা অনেকদিন মনে থাকবে। তোমার বাসার সাথের বাসার পশ্চিমের(?) বাসার দিদি প্রথম দিন যে আন্তরিকতার সাথে আমাকে বাসায় বসবার সুযোগ দিয়ে কফি খাইয়েছেন এবং ছোট ছোট ছেলে মেয়ে দিয়ে তোমার শ্বশুর বাড়িতে পাঠিয়েছেন তোমার সাথে দেখা করার সুযোগ করে দেবার জন্য তা ভেবে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। তাদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবে।

তোমার শ্বশুর বাড়ির সবাইকে ভালো লেগেছে– অত্যন্ত ভদ্রলোক। বৌদিকে বেশ

www.pathagar.com

ভালো লেগেছে। তোমার সাথে কথা বলে যা মনে হলো অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই তোমার ঢাকা আসার ইচ্ছে নেই। তবুও আমার কথা ভেবে বৌদিকে নিয়ে ঢাকায় বেড়াতে আসার একটা প্রোগ্রাম করে ফেলো। তোমাদের সবাইকে কষ্ট দিয়ে আমি আনন্দ লাভ করে এসেছি। ঢাকার বর্তমান অবস্থা মোটেই ভালো না-কি হয় কেউ কিছু বলতে পারছে না। তোমার চিঠি পেলে খুশি হবো।

ভালোবাসাসহ
বাবলু
১০০ সেন্ট্রাল রোড
ঢাকা-১২০৫

পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায় (৫)

প্রেরক
পার্থ সারথি চট্টোপাধ্যায়
২১, কে কে রোড
পোঃ হরিদেবপুর, কলকাতা-৮২
কলকাতা ৮২
২-১১-১৯৯৮

প্রিয় বাবলু,

দেখতে দেখতে আরও একটা বছর পেরিয়ে গেল। তোমার চিঠি পেয়েছিলাম গত বছর এমনি সময়। কিন্ত তখন আমি এত ব্যস্ত অথবা শতাব্দীর পূর্বে পথ পরিক্রমা করছি তৎকালীন নবজাগরণ পর্বের সূর্যসন্তানদের সাথে, কাজেই ফুরসত মেলেনি। অর্থাৎ অবসর খুজছিলাম বর্তমান যোগসূত্রের সাথে মিলিত হবার জন্যে। তোমাকে লেখা হয়নি সত্যি, কিন্ত লেখার তাগিদ অনুভব করি প্রায়ই। পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই কে কোথায় আছে জানি না। তোমার চিঠি পেলে এত ভাল লাগে মনে হয় পুরানো সময়ে যেন ফিরে গেলাম, কিন্তু ফেরাতো যায় না। Nostalgia ভালো কি মন্দ জানি না কিন্তু তোমার কাছে লিখতে বসলেই একঝাঁক পুরনো স্ম'তি মনের মধ্যে বাসা বাঁধে।

'তিন মনীষী ও অবলা বসু' প্রকাশিত হয়েছে এ বছর জানুয়ারির বইমেলায়। প্রকাশক নাথ পাবলিশার্স। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে তোমায় সম্ভবত আলোকপাত করেছিলাম। জীবনানন্দের সম্বন্ধেও একখানা গ্রন্থ লেখার ইচ্ছে ছিল। কাজ খানিকটা এগিয়েও ছিল। কিন্তু কেন যেন আর দম পাচ্ছি না। মনে হয় বিশ্রামের দরকার। ১৯৯১ সাল থেকে ক্রমাগত পরিশ্রম করে এখন মনে হয় কিছুদিন জিরানো দরকার। এই এলোমেলো জীবন আর পারিবারিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ভাঁটার টানে কতদিন আর গুন টেনে চলতে পারবো জানি না। যাক শুধু আমার কথা বলে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

তোমার খবর কী বলো? কেমন আছ? শারীরিক ও মানসিক? বিয়ের কি হলো? কিছুতো লিখলে না? কলকাতা আসছ কবে? পরিচিত মহলের কার কি খবর? যে ঠিকানায় চিঠি লিখেছি এটা কি তোমার স্থায়ী ঠিকানা? তোমার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। ভালবাসা নিও।

পার্থ সারথী
২.১১.১৯৯৮

আবু মোহাম্মদ খান বাবলু
২/৮ রয়াল সোসাইটি
৩৮৩/২ ফ্রী স্কুল স্ট্রীট
ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ

www.pathagar.com

দিলীপ কুমার মৈত্রকে লেখা চিঠি-

১লা জানুয়ারি ২০০৪

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, নমস্কার ও প্রণাম জানবেন।

গত ১০ই ডিসেম্বর ২০০৩ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল বেলা পর্যন্ত আপনাদের সাথে আমি ছিলাম। আপনার মানবতাবাদী মন, আপনার আন্তরিকতা, আপনার সৌজন্যতাবোধ আপনার পাণ্ডিত্য মানুষের প্রতি আপনার ভালোবাসা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। রামায়ণ ও মহাভারত বৃহৎ বই দুটি অনেক টাকার বিনিময়ে কিনে আমাকে উপহার দিয়ে ঋণের দায়ে চির কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। আমি আপনার অগণিত ভক্তের আরও একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত হয়েছি। রামায়ণ মহাভারতে আপনি যে উপহার বাণী আমাকে লিখে দিয়েছেন তা কলকাতায় আমার প্রিয়বন্ধু পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় পড়ে আপনার খুব প্রশংসা করেছে, এবং আপনি যে একজন অতি উচ্চস্তরের গুণবান মানুষ সেকথা বারবার বলেছে। পার্থ খুব জ্ঞানী মানুষ অনেক পড়ালেখা। ৪টি উন্নত মানের বই বের হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন পার্থের বইয়ের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে। দেশ পত্রিকায় মাঝেমধ্যেই পার্থের লেখা ছাপা হয়।

যাক চুপিতে আপনি আমার প্রতি যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন তা বিস্ময়কর। জীবনে কি দিয়ে যে আপনার ঋণ শোধ করতে পারবো তা ভেবে পাচ্ছি না। চুপিতে মর্নিংওয়াক করার সময়ে আপনাদের গ্রামের পশ্চিম পার্শ্বে যে জায়গাটায় আপনি নিয়ে গিয়েছিলেন- সে জায়গাটা হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে- বিরাট প্রান্তর অনেক দূরে অন্যজন পথ বা গ্রাম ফসলের মাঠ, মাথার উপরে উন্মুক্ত বিরাট আকাশ। এই ধরনের জায়গায় উপস্থিত হলে প্রাণটা অনেক হালকা হয় মনটা অনেক বড় হয়। আপনি একজন পুণ্যবান মানুষ। আমার মতো একজন অতি নগণ্য মানুষের প্রতি আপনি যে অনুরাগ দেখিয়েছেন- সেকথা কৃতজ্ঞতার সাথে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপনার কাছ থেকে আর্শিবাদ চাই। আপনি আমার জন্য আশির্বাদ করবেন। শম্ভুর কথা মনে হলেই দাতাকর্ণের কথা মনে হয়, খুব দয়ালু ছেলে, আমার বিশ্বাস ও অনেক বড় হবে। ভগবান ওকে সাহায্য করবেন। কাবা গান্ধীকে আমার কথা বলবেন। উনার পড়ালেখার ব্যাপ্তী দেখে চমৎকৃত হয়েছি। একেবারেই মাটির মানুষ। উনাকে দেখে কিন্তু সত্যিই মনে হয় ইনিই মহাত্মা গান্ধীর বাবা। (গান্ধীজীর লেখায় তাঁর বাবা সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে সে অনুযায়ী) মহিউদ্দিন হোসেন ওরফে কাবা সাহেব একজন গুণবান মানুষ। আমার জন্য তাঁকে দোয়া করতে বলবেন। আপনার দেওয়া রামায়ণ মহাভারত বেশ অনেকটাই পড়ে ফেলেছি। এসব বই আরও ৩০/৩৫ বছর আগে না পড়ে পাপ করেছি-ভাষার দখলের জন্য এসব বই কিশোর বয়সে পড়া একান্ত উচিৎ। চুপী, পূর্বস্থলী, কাষ্ঠস্থলী একত্রে তিনটি গ্রামের দক্ষিণে রেল লাইন যা পশ্চিম বাংলা তথা সারা ভারতের সাথে গেঁথে রয়েছে- পূর্বে গঙ্গা নদী হিমালয় থেকে সাগরের সাথে একসূত্রে গাঁথা-পশ্চিমে অবারিত ফসলের মাঠ উত্তরে আবার গঙ্গা-হিন্দু-মুসলিম সব মানুষের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান- মাঝখানে মধ্যমনি হয়ে বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদের আলো আমার দীলিপদা। আমি আবার

www.pathagar.com

আমার কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাকে, আপনার আশির্বাদ কামনা করি। পূর্বস্থলী, চুপী, কাষ্ঠস্থলী গঙ্গা নদী, উদার আকাশ, অবারিত ফসলের মাঠ, সুন্দর আমগাছ, দীলিপদা সবাইকে আবার আমার প্রণাম।

বিঃ দ্রঃ- আপনার দোকানে একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতার সাথে পরিচয় হয়। ওনাকে আমার প্রণাম জানাবেন। ভদ্রলোককে আমার বেশ ভালো লেগেছে। আমার জন্য ওনাকে আশির্বাদ করতে বলবেন।

খুব শীত পড়েছে মনেহয় জানুয়ারি মাসে মানিকগঞ্জের চকমীরপুরে যাওয়া সম্ভব হবে না, ফেব্রুয়ারি মাসে যাবার ইচ্ছে আছে। খুব শীত।

আপনার স্নেহভাজন-
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩৮৩/২- ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট
ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

হে মহাজীবন

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

হিমাদ্রি - গম্ভীর, নীল-শূন্য মায়া, ছায়াময় শান্ত পবিত্রতা
পয়োধি-শরীর জুড়ে দয়া আর দয়া, আদর্শ ও ধ্যান
যে জীবন দানের, যে জীবন ত্যাগের, সন্ন্যাসীর ----
শিক্ষক তপন মৈত্রকে মনে গেঁথে রাখি
গেঁথে রাখি তার মূল্যবোধ, শিক্ষার কাহিনী।
যিনি অন্ধকারে জ্ঞানের দীপ্তি জ্বেলে
অজ্ঞানের হাতে তুলে দেন জ্বলন্ত মশাল
ভোরের দুয়ার খুলে সূর্যোদয়ের পথ দেখান
যিনি ছাত্র/ছাত্রীদের সুখ-দুঃখে ডুবে যেতে যেতে
তুলে আনেন মণিমুক্তোগুলি, প্রবালের দ্বীপ।
এত বড় প্রাণ, স্বচ্ছ চোখ, আহা, মুগ্ধ চরাচর
জানু পেতে বসি তাঁর সানুদেশে,
তাঁকে দেখি তৃতীয় নয়নে, বেঁধে রাখি গাঢ় আলিঙ্গনে
তপন মৈত্রের মত তপোদীপ্ত আদর্শ শিক্ষক
জীবিত থাকুন স্বপ্নে, আমাদের গৌরব, গাথায়।

(আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কর্তৃক ১৪০৯ সনের
দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকার
পূজা সংখ্যা থেকে সংগৃহীত)

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপি গ্রামে আমি ২০০৩ সনের ১০ই ডিসেম্বর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর সকাল বেলা পর্যন্ত লেখক দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে অবস্থান করি। চুপি গ্রাম একটি ঐতিহাসিক গ্রাম, প্রখ্যাত কবি সত্যেন দত্তের দাদু বাংলার প্রথম প্রখ্যাত বিজ্ঞান লেখক অক্ষয় কুমার দত্ত এই গ্রামের মানুষ ছিলেন। মা কালীর সাধক অকিঞ্জিত রঘুনাথ রায় এই গ্রামের লোক ছিলেন ১৭৫০ থেকে ১৮৩৬ সন পর্যন্ত।

চুপি গ্রামে তপন চন্দ্র মৈত্র বসবাস করেন ১৯৪৮ সন থেকে। চুপি থেকে ১৯৫৪ ম্যাট্রিক পাশ করেন এবং বি,এ, পাশ করেন ১৯৫৮ সনে। তপন মৈত্রের অপর নাম দিলীপ মৈত্র। তপন মৈত্রের এক ভাই এখনো মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর থানার চক মিরপুর গ্রাম বসবাস করেন। হিন্দুদের মৈত্র বংশীয় বংশের পদবী খুবই উচু জাতের। চুপিতে অবস্থান কালে তপন দা দিলীপ মৈত্র আমাকে স্নেহ ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ১৬ ডিসেম্বর ২০০৩ সনের সকালে যখন পূর্বস্থলী ষ্টেশনে ট্রেনে উঠি তখন তিনি ফুপিয়ে কেঁদে উঠেন আমার বিদায় বেলায়। তাকেও আমার খুব ভালো লাগে।

www.pathagar.com

দিলীপ কুমার মৈত্রের লেখা চিঠি

প্রিয় বাবলু ভাই,

আপনার দুটো চিঠিই আমি পেয়েছি। উত্তর দিতে অসম্ভব দেরি হলো বলে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি আশ্বিন মাসে দুর্গাপুর, বোকারো, রামগড় বাঁচিরাজাবাপ্পা বেড়াতে গিয়েছিলাম। আবার ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখে পুরী, ভূবনেশ্বর এবং কোনারক গিয়েছিলাম।

আপনার মতো সদালাপী নিরহঙ্কার মানুষ খুব কমই দেখা যায়। আপনাকে কি ভোলা যায়? রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে লেখার মাধ্যমে চিনি। পশ্চিম বাঙলার অনেক গুণীজনের সাথেই আপনার এতো পরিচয় দেখে আমি বিস্মিত। আপনার মধুর ব্যবহারে মানুষ এতো মুগ্ধ হয়। আপনি আমার সামান্য দান গ্রহণ করে আমাকেই ঋণী করেছেন। কাবা এবং কৃষ্ণমোহন চক্রবর্তীকে আপনার চিঠি দেখিয়েছি। সবাই খুব খুশি হয়েছে। মাতৃভূমি মাতৃদুগ্ধের মতো, তৎকালীন রাজনৈতিক নেতাদের দাক্ষিণ্যে সেই মাকে হারিয়েছি এখনো সেই মাটির সোঁদা গন্ধ আমার নাকে এসে লাগে।

ছেলে বেলার গল্প শোনার দিনগুলো
এখন কতো দূরে,
আর আসেনা রাজার কুমার
পক্ষীরাজে উড়ে॥

শম্ভু আপনার কথা বলে। বাড়িতে সবাই একরূপ আছি। আপনার মা বোনেরা আশা করি ভালো আছেন। মাকে নমস্কার বোনেদের স্নেহাশিষ দেবেন।

প্রসঙ্গ পালটে দিচ্ছি। বুদ্ধদেব নির্বাণের অবতার, শঙ্করাচার্য জ্ঞানের অবতার, চৈতন্য দেব প্রেমের অবতার। আর রামকৃষ্ণ ভক্তির অবতার। বুদ্ধদেবের মতবাদ নিরীশ্বর বাদ? ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলতে চান নি। একবার তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করেছেন? তিনি চুপ করেছিলেন শঙ্করাচার্য বলেছিলেন– ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এর মানে অনেকে বুঝতে পারেন নি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ সত্য, চৈতন্য দেবের বক্তব্যে অনেকটা এই রকম, ঈশ্বর ভাব আর সব অভাব, বাড়ি গাড়ি স্ত্রী পুত্র এ সব অভাব।

ভক্তি হলো তরল জিনিষ আর জ্ঞান হলো কঠিন। আখ পিষলে রস বার হয়, ঐ রস হলো ভক্তি। রসটাকে জাল দিলে প্রথমে গুড়ের মতো হয়। আরও স্বচ্ছ অবস্থায় চিনি। আরও কঠিন অবস্থায় মিছরি। মিছরি দিয়ে মারলে ভীষণ আঘাত লাগে। আখের রস যেমন করে মিছরিতে রূপান্তরিত হয় ঠিক ভক্তি ঐভাবে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। তাহলে দেখুন রূপ আছে আবার রূপ নেই।

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে। (গীতা পঞ্চদশ অধ্যায়) এই পৃথিবীতে প্রায় কোনও মানুষই আত্মার রূপ কি তা জানে না। আত্মা দেখতে কেমন, তাও বোধ হয় জানে না। আমি কোথায় ছিলাম কোথা থেকে এসেছি, মৃত্যুর পর কোথায় যাবো– এ প্রশ্নের উত্তর নেই। আত্মার বা আমি-র আদি নেই অন্ত নেই। আত্মার প্রতিষ্ঠা নেই। অর্থাৎ আত্মা একটা বিশেষ জায়গায় আছেন, এমন নয়, আত্মা সর্বব্যপ্ত

www.pathagar.com

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং নত্বং নেমে
জনাধিপা ঃ। ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে
বয়মতঃ পরম"॥ (গীতা ২য় অধ্যায়,
(শ্লোক বারো)

"শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন ঃ দেখো অর্জুন সামনের এই রাজন্যবর্গ ছিলেন না, এমন নয়। এরা আছেন– এমনও নয়, এঁরা নেই– এমনও নয়।" ব্যক্ত আর অব্যক্ত এই পৃথিবীতে কোথাও আত্মাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আত্মা তাই অব্যক্ত। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে কি আত্মা নেই? এমনও নয়। আত্মা নিত্য কিন্তু অব্যক্ত। আত্মা আছেন কিন্তু দেখতে পাচ্ছি কই! অব্যক্ত ব্যক্ত হওয়ার নাম লীলা। তখন আত্মা আছেন আমি আছি আবার ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত বা নিত্যে চলে যাওয়া আমি নেই।" অব্যক্তের চরমে "আছির" বোধও নেই, নেই এর বোধও নেই। কিছুরই বোধ নেই। তাই আত্মার আলো আছে আবার নেই। এটাই বুদ্ধদেবের নির্বাণ বাদের শেষ কথা, অর্থাৎ ঈশ্বরের আকার আছে, আবার নেই।

বাবলু ভাই আমি, কাবা সাহেব এবং আপনি তিনজনে একদিন ভগবানের আকার আছে কি নেই তাই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সঠিকভাবে পড়বেন। ভালোভাবে পড়লে ঠিক উত্তরটা খুঁজে পাবেন। আমার বাঙলাদেশের ভাইপো সঞ্জীব মৈত্র, ডাক নাম ভোলা। ঢাকা শহরে মেহেদী জুয়েলার্স এ চাকুরী করে। তার অর্থাৎ মেহেদী জুয়েলার্সের ফোন নং দিলাম। ফোন নং-৯৬৭৬৫৯৩ যোগাযোগ করবেন। আমাদের বাড়ি মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত চকমিরপুর গ্রাম। এখন দৌলতপুর উপজেলায় আবার বলছি চিঠির উত্তর এতো দেরিতে দেওয়া খুবই অন্যায় কাজ হয়েছে। এবার থেকে নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে। মন চাইলে চলে আসবেন। দীপালোকদের বাড়ির সবাই ভালো আছে। শুভেচ্ছা রইল।

ইতি- দিলীপ মৈত্র, ১২/৭/২০০৪

www.pathagar.com

দিলীপ কুমার মৈত্রের লেখা চিঠি

চুপি

ওঁ

প্রিয় বাবলু ভাই আপনার চিঠি যথা সময়ে পেয়েছি। আমার শক্ত আন্ত্রিক হওয়াতে অনেক দিন শয্যাশায়ী ছিলাম। এখনও দুর্বল। মৃত্যু কি রকম অনুভব করেছি।

আমার ভাইপোদের ভারতে আসতে নিষেধ করে খুব ভালো কাজ করেছেন। জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়। এখানকার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়। এসে কি করবে। ওখানেই থাক। আপনি ভোলাকে বলবেন ওর পিসিমার মেয়ের ২২শে অঘ্রাণ বিয়ে। ওরা খুবই গরিব বিয়েতে যতটা পারে যেন আর্থিক সাহায্যে করে। ওদের বলবেন আসামে ছোট কাকা মারা গেছেন। আমার ভাই শঙ্কর যেন চিঠি দেয় আমাকে। আপনার কথা প্রায়ই ভাবি। আপনি খুবই উদার হৃদয়, মন সমুদ্রের মতো। ইঁদুরের উৎপাত হলে টাকা পয়সা আসে। আমি অনেক জিনিষ এখন বিশ্বাস করি। বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা মেলে না। বিবেকানন্দ বলেছিলেন তোরা এখন গীতা ছেড়ে বল খেলা কর। এর কারণ দেশ তখন পরাধীন। দেশের মুক্তির জন্য শরীর চর্চ্চার প্রয়োজন, দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচন করা যায় না তাই আগে শরীর চর্চ্চার প্রয়োজন আপনি ভীষণ পড়েন সেটাতো আপনার সাথে পরিচয় এবং আলাপ আলোচনায় জেনেছি। আমার খুবই ভাগ্য ভালো যে আপনার মতো বিদগ্ধজনের সাথে পরিচয় হয়েছে। আমি নুনের পুতুল, কি করে সমুদ্রের জল মাপবো? কাবার সাথে আপনাকে নিয়ে মাঝেমধ্যে আলাপ হয়। কৃষ্ণমোহন বাবুকে আপনার কথা বলেছি। বাপ্পা খুবই ভালো লেখে এবং ভালো ছেলে। আপনাকে চিঠি দিয়েছে। আপনার নিমন্ত্রনের কথা মনে থাকবে। যেতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। আপনিও আসুন। মন টানলেই চলে আসবেন। বাপ্পার লেখার সাথসদার সম্প্রদায়দের নিয়ে আমার একটা প্রবন্ধ আছে আশা করি পড়েছেন। শক্তি মুখোপাধ্যায়ের 'হে মহাজীবন' কবিতা অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের আমি আপনার হৃদয়ে এতটা উঁচু স্থান করতে পারায় আনন্দে আপ্লুত। শম্ভু আপনার কথা বলে। আমার মনে হয় আগে যদি আপনার সাথে পরিচয় হতো তা হলে আমি খুবই লাভবান হতাম। ঢাকা যদি কাছাকাছি হতো তাহলে আরো নিবিড় হওয়া যেত। খুসবন্ত সিংহ খুবই বড় মাপের লেখক। আপনার মতো পাঠক এখন আর পাওয়া যায় না। ঢাকা কখনো দেখি নি। ছবিতে টিভির দৌলতে অবশ্য দেখেছি। ইতিহাসে এই শহরের গুরুত্ব অপরিসীম। ভালো জায়গাতে রয়েছেন। গর্ব করবার মতো স্থান বটে। আপনি দূরে থাকলেও আমার মনের মনি কোঠায় সব সময়ে রয়েছেন। আপনাকে শুভ কামনা জানাই। ভালো থাকুন মঙ্গল হোক আপনার তথা আপনার পরিবারের। দরিদ্রের উপর আপনার দয়া বর্ষিত হোক চিঠির প্রতীক্ষায় থাকলাম।

ইতি

দিলীপদা।

পুনঃ বাপ্পার সাথে দেখা হলো বললো-আপনার চিঠি পেয়েছে আপনি পাকিস্তান যাবেন এবং ভারতে আসবেন।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

৩৮৩/২, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, ঢাকা-১২০৪, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

জীবন চন্দ্র চক্রবর্তী

জীবন চন্দ্র চক্রবর্তী সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি উপজেলা আমাদের তামাই গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৬০ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত তামাই কালিবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত একসাথে পড়েছি। ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৬৮ সন পর্যন্ত ৬ষ্ঠ, ৭ম ও অষ্টম শ্রেণীতে এক সাথে পড়েছি, তামাই হাইস্কুলে। ১৯৬৮ সনে ওরা, ওর ভাই স্বপন-বোন পুতুল ওর মা এদেশ ত্যাগ করে-হাওড়া চলে যায়।

সেখানে জীবন পড়ালেখা করে প্রথমে পশ্চিম বাংলা পুলিশের একজন দারোগা হয়। পরে বি,সি,এস দিয়ে পশ্চিম বাংলা সিভিল সার্ভিসের একজন অফিসার হিসেবে চাকরি শুরু করে।

এখন সে পশ্চিম বাংলার শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেনের একান্ত সচিব, এর আগে মন্ত্রী মৃণাল ব্যানার্জীর একান্ত সচিব ছিল। ১৯৯৮ সনের আগ পর্যন্ত আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ১৯৯৮ সন থেকে সম্পর্কের অবনতি শুরু হয়, ২০০০ সন থেকে সে আমাকে খুব একটা ভালো মানুষ মনে করে না, আমিও তাকে তাই মনে করি।

এখন সে অনেক বিত্ত, বৈভব ও ক্ষমতার মালিক তার সাথে আর আমার সম্পর্ক নেই। জীবনের ১ বছরের বড় বোন পুতুলের যময ভাই প্রভাত কুমার চক্রবর্তী ওরফে স্বপন ও পুতুল আমাকে খুব ভালোবাসে, আমিও তাদের সম্মান করি ও ভালোবাসি। এখানে জীবন চক্রবর্তীর কয়েকটি আমাকে লেখা চিঠি ছাপা হলো

৩১/৮/২০০৮

লালগড় (১)

১.১.১৯৮৮

সুপ্রিয় বাবলু

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর গতকাল পর্যন্ত বিকেলে তোর বিমানে আসা রঙিন চিঠি হাতে এলো। তুই ভালভাবে পৌঁছেছিস এটা জানানো উচিৎ ছিল অনেক আগেই? বোধ হয় দেশে ফিরে সে কথা ভুলেই গিয়েছিলি অথবা বাংলাদেশের টালমাটাল অবস্থায় তোকে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করার সুযোগ দিচ্ছিল। তুই কোলকাতা পৌঁছেই বাংলাদেশ বিমানের টিকিট পেয়ে গিয়েছিলি এ খবর উদয় দা আমাকে ফিরে এসেই দিয়েছিলেন, অনেকদিন পর তোর সাথে দেখা হলো কিন্তু তোকে বেশিদিন ঠিকমত ঠিকভাবে কাছে না পাওয়া বেদনা না রয়েই গেল। "জয়া ভাদুরী" ভালই আছে আর তোর প্রতি তার কোন অভিমান নেই। সে সযত্নে আবার টি যা বাংলাদেশের একমাত্র ৮৭ সালের চিহ্ন-সেটা রেখেছে এমনকি জলও ভরেনি একেবারে খাপসহ আলমারির নিচের তাকে। কি অসাধারণ অনুরাগ। তাঁর শরীর সত্যিই ভাল ছিল না। এছাড়া মৌ-ও ভাল ছিল না। যাই

www.pathagar.com

হউক কোন ভুল বোঝাবুঝির স্থান নেই তুই আমাদের একান্তই আপন। দিদির সঙ্গে গত ১১.১২.৮৭ তাং হাওড়ায় বাড়িতে দেখা হ'ল। তোর উচ্ছ্বসিত প্রশংসাই করলো, জামাই বাবুর প্রতিক্রিয়া জানার সুযোগ হয়নি, কারণ তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। ভাগ্নে দুটি সম্ভবত আবার ব্যাটের আশায় রয়েছে কারণ তারা তোমার প্রশংসায় স্পষ্টমুখ। আমি রঞ্জি ভবনে গিয়েছিলাম শ্রী ঝুলন বাবু তোমার কথা বারবারই বলেছেন। ভদ্রলোকের এখনও ঘোর কাটেনি, বোধ হয় ইলিশের গন্ধ নাকে আসছে বা কবে আসবে সেই ভাবছেন। আমি বর্তমানে সপরিবারে লালগড়ে কারণ সামনে পঞ্চায়েত, নির্বাচন, সারাক্ষণই হেডকোয়ার্টারে থাকা প্রয়োজন।

আর বিশেষ কি আমার অফুরন্ত ভালবাসা তোমাদের সকলের জন্য রইল।

জীবন

লালগড় (২)

২৮.৩.১৯৮৬

১.৪.১৯৮৬

প্রিয় বাবলু

আজ কয়েকদিন হলো তোর চিঠি পেয়েছি; উত্তর দেবো দেবো করে আর দেয়া হচ্ছিল না– অত্যন্ত কাজের চাপ কিন্তু উত্তর দেবার তাগিদ বরাবরই রয়েছে। ভাবছি দীর্ঘ চিঠি লিখা অনেক বিষয় আলোচনা করব কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে তোর শরীর খারাপ জেনে খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে আছি। কাছাকাছি থাকলে তোকে দেখে আসতাম, কিন্তু এত দূর যে এ ব্যাপারটা চিন্তা করা বাতুলতা মাত্র। তোর মতো তেজী, উৎসাহী এবং উদ্যমী ছেলের পক্ষে কোন রোগে বা মানসিক চাঞ্চল্যে ভোগা অত্যন্ত অস্বাভাবিক ঘটনা। আসলে এটা হওয়ার অনেক কারণ আছে প্রথমতঃ অনেক স্বপ্ন ছিল জীবনে তা বাস্তবায়িত হয়নি; দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী যেমন হওয়া উচিৎ ছিল তেমন হয়নি। তৃতীয়তঃ দেশের জন্য যাদের বিন্দুমাত্র অবদান নেই তাদের চোখের সামনে দেশপ্রেমিক সাজতে অথবা সাজাতে দেখতে পাওয়া; চতুর্থত; রাজনৈতিক দেওলিয়াপনা ও নির্ভেজাল শঠতার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে সহাবস্থান করা ইচ্ছের বিরুদ্ধে; আরও অনেক অনেক কারণ আছে আমার বিশ্লেষণ যদি সঠিক হয়। দ্যাখ বাবলু অনেক কিছু আছে বা দেখতে হয়, বা আমাদের অংকে মেলে না কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে হয় কৌশলগত কারণে। সুতরাং চাঞ্চল্য না থাকাই শ্রেয় চাঞ্চল্য থাকলে শুধু তোর নিজের শরীরেরই ক্ষতি না তাতে দেশের ক্ষতি কারণ তুই সুস্থ থাকলে দেশ অনেক কিছু পাবে। আমি তোকে জ্ঞান দিচ্ছি কিন্তু আমার চাঞ্চল্য আরও বেশি আমার ভীষণ রাগ হয় অনেক আপত্তিকর জিনিষ দেখলে, তোর বৌদি আমাকে প্রশমিত করে।

বাবলু গতকাল তোর প্রেরিত 'সাপ্তাহিক পরিবর্তন' হাতে এলো। আনন্দবাজার, যুগান্তর, বর্তমান, এই কাগজগুলো ভীষণ কমার্শিয়াল কোনটাই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন

www.pathagar.com

সংবাদপপত্র নয়। The statesman পত্রিকাটি আমি পড়ি ধৈর্য্য ধরে। বস্তুনিষ্ঠ খবর এরা পরিবেশন করে– আজ 'Good Friday'। সারাদিন অফিস ছুটি ছিল। সকাল আটটা থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত তোর সম্পাদনায় প্রকাশিত কাগজটি পড়লাম। তুইতো জানিস আমি ভীষণ সমালোচনা করি। তাই গঠনমূলক সমালোচকের মত বলছি তোর সম্পাদিত সাপ্তাহিক পরিবর্তন দৈনিক সংবাদপত্র হওয়া বাঞ্ছনীয়। সংবাদ পরিবেশনায় চটক আছে কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ প্রথম পাতায় প্রকাশিত ছবিটি (একটি শিশু মাতৃগুণ পান করছে) সংবাদ পত্রটির নিজস্ব দর্শন কি তা বলে দিচ্ছে। Headline Arrangement ভাল 'চোরাচালান'-এর উপর সম্পাদকীয় আরও চাবুকের মত হওয়া উচিৎ ছিল। যাই হউক সব মিলিয়ে তোর সম্পাদিত এই "জাতীয় ও প্রগতিশীল" সংবাদপত্রটি পড়ে আমি ভীষণ খুশি। এই পত্রিকাটির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল এটা আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি পাঠালে খুবই খুশি হবো।

তোর বিয়ে কবে? অন্তত: মাস ন'মাস আগে জানাবি। ভিসা পেতে সময় লাগবে ৩। সপরিবারে যাব। তুই যেকোন সময় চলে আসবি।

দাদা ভাল আছে। আমার দিদির বড় ছেলে– বয়স ১৫ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিল মায়ের শরীর ভাল যাচ্ছে না– আর কি তোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি– আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা রইল– আর তোর বন্ধু বান্ধব ভাই বোন সবার জন্য প্রাণঢালা ভালবাসা। মা বাবার জন্য নমস্কার– আজ এখানে টানলাম– ইতি : জীবন।

কোলকাতা (৩)

১৪ই মে ১৯৭৭

সুপ্রিয় বাবলু

বসন্তকাল গত হলেও আমার বাসন্তিক উচ্ছ্বাসভরা প্রাণঢালা সবুজ সতেজ ভালবাসা তোর জন্য সর্বকালের জন্য সঞ্চিত আছে আমার হৃদয়ের মনিকোঠায়। আমাদের নিবিড় বন্ধুত্বের উপলব্ধি আমাদের অন্তরাত্মায়, আমাদের দেহ, মন বৈচিত্র, বিভিন্নতার ও ভৌগেলিক সীমারেখায় অতিক্রান্ত করে– অবিশ্বাস্য ও অচ্ছেদ্য মিশনের মধ্যেই নিহিত। এটাই চিরন্তন এবং সর্বব্যাপী। কোন কৃত্রিম বা বাহ্যিক কারণ চিরন্তন সত্যের গণ্ডীকে অতিক্রম করতে পারে না। গত ২৫শে এপ্রিলে লিখিত চিঠিতে তোর অভিমান ভরা কয়েকটি যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন আমার মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করেছে। তুই লিখেছিস ১৩ই জানুয়ারির চিঠির জবাব না পাবার জন্য তোর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে তুই হয়ত তোর চিঠিতে এমন কোন কথা লিখেছিস যাতে আমি আশাহত হয়েছি এবং সেইজন্য তোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এ ধারণাটা সম্পূর্ণ অমূলক ও ভ্রান্ত। ১৩ই জানুয়ারিতে লিখিত তোর চিঠিটা যথাসময়ে পাওয়া সত্ত্বেও কেন উত্তর দেওয়া আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি তা এই মুহূর্তে এবং এই চিঠিতে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় পরে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট সুবিধাজনক সময়ে কারণটা জানাব আপাতত: অন্ধকারেই থাক্। কেমন?

আমি প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি যে তুই আমার চিঠি না পেলে কত মর্মাহত

www.pathagar.com

হোস এবং হওয়াকে খুবই স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত এটাও আমার অজানা নয়। প্রশ্নটা হল এত জেনেও কোন উত্তর দেইনি তাই ত? এখন বলব না, তবে তুই জেনে রাখ তোর প্রতি আমার রাগ অভিমান কিছুই হয়নি বা তোর চিঠিতে তুই এমন কোন কথা কোথাও লিখিস্‌নি যাতে করে আমার রাগ হওয়াটা সঙ্গত হতে পারে। আর যদি হোতই তবুও তার জন্য চিঠি লেখা বন্ধ করব এমন ছেলে আমি নই। তোর ঐ চিঠিটার আঙ্গিক সৌন্দর্য্য, বিষয়বস্তুগত সৌন্দর্য এতই হৃদয়গ্রাহী ও তাত্ত্বিক যে আমার একজন এখানকার বন্ধু (ছেলেটি বাংলাদেশের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ও ৭১এর যুদ্ধে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর একজন সৈনিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের Applied Chemistryর একজন স্নাতক) রাতারাতি তোকে গুরু বানিয়ে ফেলেছে। বাস্তবিক পক্ষেই তোর চিঠিটা আমার খুব ভাল লেগেছে এবং আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছে। আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার যে ফারাক কত ব্যাপক তা তোর ঐ চিঠিটা পড়ে আমি confirmed হয়েছি। যাই হউক Political Controvercy আমার কাছে কোন Factorই নয় কেননা কোন দুইজন মানুষ সবসময়ই সব ব্যাপারে একই মতের অনুসারী হবে একথা আমি বিশ্বাস করি না– আর Difference Political ব্যাপারে থাকা ভাল কেননা আজ উভয়েরই সুবিধে হবে। আমার এখনকার দিনগুলো অত্যন্ত কর্মক্লান্তি ও ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে কাটছে– অবশ্য নিতান্তই ব্যক্তিগত কারণ। তোর দিনগুলো কেমন কেমন কাটছে জানাবি– তোকে পত্রিকাগুলো পৌঁছাতে না পারাটা আমার একটা অপমানকর discredit তুই যেমন প্রতি- নিয়তই আমার কথা ভাবিস আমিও তেমন ভাবি আমাদের শৈশব ও কৈশোর জীবনের সোনালীও রঙ্গীণ দিনগুলো আমাদের জীবনের অত্যন্ত মূল্যবান গল্প। একে অপরকে বোকাদের জন্য ও গুলো সযত্নে ব্যবহার করতে পারি। বাবলু আমি তোকে ১৩ই জানুয়ারি চিঠির জবাব দেব কিন্তু কিছু দেরি হবে। এই চিঠিটা ২৪শে এপ্রিলের চিঠির জবাব বলে ধরে নিবি– ভারতীর তথা এই উপমহাদেশের দেশগুলোর সাম্প্রতিক রাজনৈতিক চিত্রের বিশ্লেষণ আশা করে তোর চিঠির অপেক্ষায় থাকব। পাকিস্তানের রাজনৈতিক চাঞ্চল্যে আমি অত্যন্ত উদ্বেগ বোধ করছি। বাংলাদেশ এখন কেমন– ভারতের ব্যাপারে তুইও বুঝতেই পারছিস্‌। এই মুহূর্তে আমার মন্তব্য আশা করিস্‌ না– যথাসময়ে বক্তব্য জানাব অনেককিছু বলার আছে। তোর চিঠির শেষ লাইনটা আরও কথা লেখার থাকলেও লিখছি না, কেননা তুই আমাকে কিভাবে রেখেছিস তা না বুঝতে পারার জন্য এটা আমার কাছে ভাল লাগছে না। যেকোন সময়ে যেকোন ব্যাপার frank ও discussion তুই আমার কাছে করবি আমি তোর কাছে কবর এটাই তো স্বাভাবিক তুই আমার একমাত্র নির্ভরযোগ্যস্থল যেখানে অনেক আবদার, অভিমান, সরাসরি সব চলতে পারে সেখানে freelessness মানায় নাকিরে?

তুই আরও লিখেছিস আমি তোকে এড়িয়ে যেতে চাইছি এটা তোর অভিমান ভরা অভিযোগ এটাতো আমি বুঝতে পারছি সেরকম তুইও আমাকে interpet করবি একান্তই অন্তর দিয়ে এটাই চাই। শোন বাবলু আমি তোকে কোনওদিন এড়াইনি এবং এড়িয়ে চলবও না– এটা আমার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত প্রযোজ্য। তুই-ই আমার একমাত্র প্রাইমারী জীবনের বন্ধু যার সঙ্গে আমার চিঠির যোগসূত্র আছে আর আমাদের

Commitment হওয়া উচিৎ সেটা চিরদিন বজায় রাখা। আমার তরফ থেকে কোন দোষ ত্রুটি থাকলে ক্ষমা করবি, আমি তোকে কোনদিনই ব্যথা দিতে চাই না। যদি কোন কারণে ব্যথা পেয়ে থাকিস্ তবে সেটা রজনীগন্ধার মালা বলে মনে করবি। আগামীতে তোর কুশল জানিয়ে সত্তর চিঠি দিবি। আমার চিঠি পেতে দেরি হলে অন্যরকম ভাববি না। আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ভালবাসা জানাবি। এখানে শেষ করছি–

ইতি
জীবন চক্রবর্তী
১৪/৫/১৯৭৭

লালগড় (৪)
৫/৭/১৯৮৬

সুপ্রিয় বাবলু

যদিও নিয়মিত তোর পত্রিকা পাচ্ছি কিন্তু কোন চিঠি পাচ্ছি না। আমি প্রায় একমাস আগে তোকে চিঠি দিয়েছি আশা করছিলাম চিঠির উত্তর আসবে কিন্তু নিরাশ হলাম। তাই আজ রাত ১১টায় তোকে আবার চিঠি লিখতে বসলাম,জানি না এ চিঠি তোর হাতে পৌঁছুবে কিনা!

সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটে সেজন্যই রাতে চিঠি লিখতে হচ্ছে। এখন তোর বৌদি এখানে নেই। মাঝখানে পিত্রালয়ে-দুএকদিনের মধ্যেই হয়ত এসে যাবে। বাচ্চাটিও তার মায়ের সঙ্গে দাদুর বাড়িতেই। তাই ঘরটা ফাঁকা।

একটু আগে পান্না লাল দাশগুপ্তের একটা লেখা পড়ছিলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অম্লান দত্তের সঙ্গে উনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই লেখাটা। বাংলাদেশ সংক্রান্ত লেখা পড়তে ভীষণ ভাল লাগে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানতো মাঝে মাঝে শুনি এত কাছে থেকেও কত দূর বুকটা কান্নায় ভরে যায়। যেতে বড্ড মন চায় কিন্তু বহু বাঁধা। বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ইদানিং বেড়েছে কোলকাতাতে বাংলাদেশ থেকে আগত সাংস্কৃতিক দল একটা অনুষ্ঠান করে গেল, ওরা শান্তিনিকেতন গিয়েছিল। খবরের কাগজে ওদের ছবি দেখলাম জ্যোতি বাবুর সঙ্গে? ভাল লাগল। এই সাংস্কৃতিক আদান প্রদানটা খুবই জরুরি সামগ্রিকভাবে ভারতীয় উপমহাদেশের দেশগুলোর সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ব্যবসায়িক লেনদেন ইত্যাদি জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থেই প্রয়োজন। পশ্চিমী দেশগুলোতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোকে শুষে নিচ্ছে। এই যে শোষণ এটা বন্ধ করার জন্যই আরও নিবিড় সম্পর্ক এই উপমহাদেশের দেশগুলোর সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি আমার মনে হয় আগামী

www.pathagar.com

দিনগুলোতে এই নৈকট্য বাড়বে কারণ এই দেশগুলোর জনগণ চান, সেটা অত্যন্ত জোরালোভাবে কিছু কায়েমী স্বার্থারেষীরা এটা তাদের শ্রেণীস্বার্থ টিকিয়ে রাখার জন্য বিরোধিতা করে। আমার মনে হয় তোর সংবাদপত্রের মাধ্যমে এটা তুলে ধরতে পারিস। অবশ্য তোর পত্রিকার চরিত্রটা একটু আলাদা। একথা স্বীকার করতেই হবে যে সংবাদপত্রগুলো সবসময়ই নির্ভীক নয় তাদের একটা বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা রক্ষা করতে হয় তোর পত্রিকাতে অবশ্য শ্রেণীস্বার্থের শ্রেণী বিন্যাস করতে পারিনি। 'পরিবর্তন' পরিবর্তনমুখী, গতিশীল এবং সম্পাদনশীল অনেক আজেবাজে বকলাম তাই না? আসলে তোকে চিঠি লিখতে গেলে খেই হারিয়ে ফেলি। কত কথা মনে আসে ? লিখতে লিখতে সব হারিয়ে যায়। তোর সঙ্গে অনেক অনেকক্ষণ গল্প করলেও মনের সব কথাও শেষ হবে না? আচ্ছা বাংলাদেশি সাংবাদিকরা ও ভারতে আসে তুই ও তো আসতে পারিস। একবার এলে বেশ মজা হবে।

আর বেশি বিব্রত করবো না তোকে। তুই কেমন আছিস শরীরের প্রতি নজর দিবি।

আমার উষ্ণ ভালবাসা রইল। তোর বন্ধু বান্ধবী এবং পত্রিকার সঙ্গে জড়িত সবাইকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাস। ভাই বোনকে ভালবাসা জানাতে। ভুলবি না।

ইতি
জীবন
৫.৭.১৯৮৬

www.pathagar.com

(5)

Calcutta
October 28, 1997

Dear Bablu,

My visit to Bangladesh after a gap of almost two decades and a half was not only exciting but also a splendid event of my life. As a matter of fact, this Bangladesh-trip gave me an opportunity to refresh the memories of my childhood days. Naturally, therefore, my feeling is one of bliss and ecstacy. I will fail in my duty if I donot express my unqualified gratitude to you for inspiring me to undertake the visit during your brief stay in Calcutta. My wife and children also got the opportunity to see my motherland- the place that has spaped me as I am today. My wife and children had heard of it,its people,its landscape, its flora and fauna but had not had the opportunity to come in touch with the inner soul that sustains the human civilisation. I really wonder whether there is any second country in the world which is so majestic and beautiful. My wife and children have always been waxing eloquent about not only their trip but also the love and affection they have got from all of you. It is particularly important because their impression has telling effect on me. The hospitality extended to us far exceeded the usual limits. It is really enviable. I must tell you that I very much enjoyed the company of your younger brothers and sisters. They are very nice. I will remember their lively and vibrant analysis of the history of the Liberation struggle of Bangladesh. I share the intensity of their feelings. I deeply appreciate their love for our motherland and equally admire the burning hatred for the exploiting ruling class of the times. I cannot really forget the genocide in Bangladesh. Please tell them that my love for my motherland is as intense as anybody's and that my positive support to the growth of Bengali nationalism has always been unqualified and will continue to be so.

Before I conclude I tell you that have reached Calcutta safely on October 16, 1997 . I have met my mother and elder brother a couple of days back. They are o.k.

We are fine. Please convey my sincerest love to your brothers and sisters and also to Mr. Murad and his wife. I would expect a quick reply.

Yours sincerely,
Jibon Chandra Chakrabarty

www.pathagar.com

শ্রীমতি মমতা বন্দোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি

১৩/১/১৯৯৫, ঢাকা, বাংলাদেশ

দিদি–

আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, নমস্কার ও ভালোবাসা জানবেন। জানি না এ চিঠি আপনার হাতে পৌঁছবে কিনা। তবু এক প্রচণ্ড অনুরাগ ও ভালোবাসা থেকে আপনাকে এ চিঠি লিখছি। আপনার সাথে আমার সরাসরি পরিচয় নাই সত্য, কিন্তু আমার মনের পাতায় আপনি একটি সম্মানজনক শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার আসন পেতে রয়েছেন অনেক বছর যাবত, আপনার কর্মের গুণে আপনার মানবিক ধর্মের প্রতি নিষ্ঠার গুণে। আমার নাম আবু মোহাম্মদ খান, ডাকনাম বাবলু, বাবলু নামেই পরিচিত জনেরা চেনে। ১৯৫৪ সনের সাবেক পাবনা জেলার বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার তামাই নামক গ্রামে ১৪ই জানুয়ারি আমার জন্ম। তামাই হাইস্কুল থেকে এস,এস,সি, পাশ করে ঢাকার ঢাকা কলেজ থেকে আই,এ, পাশ করে ঢাকা বিশ্ববদ্যালয় থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স পাশ করেছি ১৯৮১ সনে, রাষ্ট্র বিজ্ঞানে অনার্স পড়ার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বছর ইংরেজিতে অনার্স পড়েছি কিন্তু কোনও ডিগ্রি নিতে পারি নি। ১৯৭১ সনের আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করার জন্য ভারতে যাই এবং মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করি, ভারতের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে অস্ত্র ট্রেনিং নেই তাদের তত্ত্বাবধানে অস্ত্রহাতে সাড়ে পাঁচ মাস পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। ছোট বেলায় মা-বাবা এবং গ্রামের মানুষেরা শিখিয়েছেন "যার তার লবণ খাবে না, একদিন যার নুন খাবে চিরদিন তার গুণ গাবে।" সেই হিসেবে সাড়ে আট মাস ভারতের জনগণের ভারত সরকারের ভারত সেনাবাহিনীর লবণ খেয়েছি, কাজেই আমার কত জন্ম-জন্মান্তর ভারতের জনগণের, ভারতের সেনাবাহিনীর গুণ গাওয়া উচিৎ তা আপনিই ভেবে দেখবেন। তবে আমি ভারতবর্ষের জনগণের, ভারতবর্ষের সেনাবাহিনীর, ভারতবর্ষের মাটি, জল, আকাশ, বাতাস সবকিছুর একজন মুগ্ধ ভক্ত। আমার কাছে পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ও প্রিয় বই 'মহাভারত' এবং মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা বা 'সত্যের প্রয়োগ' নামক বই দুটি। আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় নেতা যিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৭১ সনে, তিনি বলেছিলেন অনেক বার, '৭১ সনে ভারত সরকার ও ভারতের জনগণ যা করেছেন তার জন্য বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের পিঠের চামড়া দিয়ে ভারতের মানুষের জন্য জুতা বানিয়ে দিলেও তাদের ঋণের শত ভাগের এক ভাগও শোধ হবে না।' আমি এ বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত। আপনি সেই মহান দেশের মহানগরী কলকাতার মেয়ে এবং একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বা নেত্রী। গুণীজনেরা বলেন– মসজিদ বা মন্দির বানালে যে পূণ্য হয় তার চেয়ে বেশি পূণ্য যদি একজন মানুষের উপকার করা যায়, আপনি মানুষের উপকার করার কঠিনতম পথ বেছে নিয়ে মানব উপকার করে পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করার কাজে নিয়োজিত বহু মানুষের উপকার করে চলছেন আপনাকে নমস্কার।

www.pathagar.com

চিঠিটি লিখতে গিয়ে আমি মনে হয় কিছুটা খেই হারিয়ে ফেলেছি, আসলে আপনার কাছে চিঠি লেখা আমার জন্য বেশ কষ্টকর, কি দিয়ে কিভাবে লিখে শুরু করবো তা ঠিক করা নিয়ে, যার জন্য অনেকদিন যাবত লিখবো লিখবো করে লেখা হয় নাই, আজ সাহস করে লিখতে বসলাম, আজ আমাদের ঢাকার ভোরের কাগজে আমার বন্ধু কবি সোহরাব হাসানের নেওয়া আপনার সাক্ষাৎকারটি পড়ে। ভোরের কাগজে ইন্টারভিউয়ে আপনি বলেছেন– "অন্যের কথা আমি জানি না। তবে আমার ধারণার কথা যদি বলেন, বলবো বাংলাদেশ আমার ভীষণ প্রিয়। বাংলাদেশের মানুষকে শ্রদ্ধা করি। আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, এখনো হয়ে উঠে নি। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষকে দেখেই তাদের ভালো লেগেছে, সীমান্তের দিকে কোনো জনসভায় গেল আমি এপার থেকে মুগ্ধ বিস্ময়ে ওপারকে দেখি।" আপনার একথাগুলোর পড়তে নিয়ে আমার চোখ দিয়ে দুফোটা জল পড়েছে, এখন লিখতে নিয়েও চোখ দিয়ে নীরব অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। যার জন্য আজ সাহস করে লিখতে বসেছি।

মোটকথা আপনাকে আমি অনেকদিন হলো চিনি, জানি, সম্মান করি দূর থেকে। আমার মা অন্যসব ভাই বোন সবাই আপনাকে চেনে জানে, তারাও আপনাকে ভালোবাসে। আমরা ৫ ভাই-৪ বোন আমি সবার বড়। আমি দীর্ঘদিন ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের বদৌলতে দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকা পেয়েছি এবং পড়েছি। যারজন্য আমার মা এবং ভাই বোনেরা আপনাকে চেনেন বা জানেন ১৯৯২ সনে শ্রদ্ধেয় নরসিমা রাও সাহেব ক্ষমতায় এসে ঘোষণা করলেন ভারত গরিব হয়ে গিয়েছে দশভাগ খরচ কমাও, Austrety পালন করতে হবে। আমি একজন অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি নরীসমা রাও সাহেবের এ ঘোষণার শিকার হয়ে দুই বছর যাবত আনন্দ বাজার পড়া থেকে বঞ্চিত রয়েছি। যার জন্য আজকাল আপনাকে কম জানছি। আমি আবার আনন্দ বাজার পত্রিকা হাইকমিশন থেকে পাবো, যোগাযোগ করেছি। আগেই পেতাম কিন্তু খেয়া ভট্টাচার্য নামে একজন মেয়ে গত তিনবছর ঢাকার হাইকমিশনে তথ্য সচিব ছিল, ঐ মেয়েটির জন্যই আমার আনন্দ বাজার পেতে দেরি হলো। ভোরের কাগজের বার্তা সম্পাদক সোহরাব হাসান আমার ২০ বছরের পুরানো বন্ধু, আমরা পাশাপাশি বাসায় থাকি প্রতিদিন সকালে আমি ওর বাসায় গিয়ে ঢাকার বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা পড়ি, সে আপনার সাথে সাক্ষাৎকার নিয়ে এসে আমার সাথে কথা বলেছে, আপনি বাংলাদেশের মেয়েদের রান্নার প্রশংসা করেছেন প্রণব মুখার্জী সাহেবের মুখ থেকে শুনে, খুব খারাপ লাগলো আমি ধনী নই সে কথা ভেবে। যদি আমি ধনী হতাম তবে সেদিনই ঢাকা থেকে মাছ রান্না করে কলকাতায় আপনার কাছে উপস্থিত হতাম। আমি মোটামুটি ভোজনরসিক মানুষ। আগের দিনের যারা রাজনীতি করতো আমাদের বাংলায় তারা মনে হয় প্রায় সবাই বেশ ভোজনরসিক ছিলেন- যারা বেশি খান তারা অপরকে খাইয়ে আনন্দ পান। আমি

www.pathagar.com

কলকাতায় এসে এবার আপনার সাথে অবশ্যই দেখা করবো। আমি বেশ কয়েকবার কলকাতা গিয়েছি, কলকাতায় গিয়ে সাথে ঘুরে দেখাবার মতো কোনও মানুষ পাই নি তাই যাদের সাথে মিশতে চেয়েছি- দেখা করতে চেয়েছি তাদের সাথে দেখা হয় না। একবার আপনার সাথে দেখা করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম আপনি কলকাতায় ছিলেন না।

যাক আপনাকে আমি ঢাকা নিয়ে আসবো, আপনি আমার বাসায় থাকবেন, দুইজনে সাধারণ মানুষের সাথে ঘুরে বেড়াবো লঞ্চ, স্টিমারে চাঁদপুর বা বরিশালে, খুলনা যাব। ট্রেনে চট্টগ্রাম বা খুলনা থেকে দিনাজপুর যাব। সারা বাংলাদেশ আমি আপনাকে দেখাবো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, শহীদ মিনার, লালবাগ কেল্লা, ঢাকেশ্বরী মন্দির, সদরঘাট, সাভার জাতীয় স্মৃতি সৌধ সব দেখাবো। আমার আত্মীয় ও বন্ধুদের বাড়িতে আপনাকে নিয়ে নিমন্ত্রণ খাওয়াবো।

যদি আমি একাজটি করতে পারি তবে খুব খুশি হবো। আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং আপন বন্ধু পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায়, সে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে ১৯৭৪-৭৫ সনে, তখন সে থাকতো ঢাকার জগন্নাথ হলে আমি থাকতাম ঢাকা কলেজ হোস্টেলে এবং সূর্যসেন হলে, দুইজনে প্রায় সময় এক সাথে থাকতাম অনেক রাত পর্যন্ত দুইজনে একজন অপর জনের ঘাড়ে হাত রেখে ঢাকা শহরে হেঁটে বেড়াতাম কোনো কোনো রাত এমন হয়েছে ও আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছে ঢাকা কলেজ হোস্টেল পর্যন্ত, আমি বলেছি চলো তোমাকে তোমার হল পর্যন্ত এগিয়ে দেই। আবার সে আমাকে এগিয়ে দিতে এসেছে এইভাবে কোনও কোনও রাত শেষ হয়ে গিয়েছে। একজন অপর জনের ঘাড়ে হাত দিয়ে এমনিভাবে সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতিসহ নানা প্রসঙ্গে তার সাথে কথা বলে হেঁটে হেঁটে রাত শেষ করেছি- সেই পার্থ এখন কলকাতার, ২১ নং কে, কে, রোড, হরিদেবপুর, টালিগঞ্জ থাকে। আমার বাল্যবন্ধু জীবন চক্রবর্তী আমাদের গ্রামের ছেলে সে এখন পশ্চিম বাংলা সিভিল সার্ভিসে চাকরি করে, ক্লাশ ওয়ান থেকে ক্লাশ এইট পর্যন্ত স্কুলে পাশাপাশি বসে ক্লাশ করেছি- জীবনের বড় ভাই প্রভাত কলকাতার রিজার্ভ ব্যাংকে চাকরি করে ওদের দেখবার জন্য প্রাণটা সব সময় ছটফট করে। কিন্তু সহজে যাওয়া হয় না। আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমার সম্পর্কে জানতে তবে পার্থকে ঐ ঠিকানা থেকে ডেকে এনে কথা বলে দেখতে পারেন। যাক কি থেকে কি লিখলাম জানি না, ভুলত্রুটি মমতাময় হৃদয় দিয়ে ক্ষমা করে দিবেন। আর হ্যাঁ আপনার নামটি কিন্তু হিন্দু মুসলিম সবার কমন নাম। প্রচুর মুসলিম মেয়ের নাম আছে মমতা, কিন্তু হিন্দু মেয়ের নাম আপনারটাই প্রথম আমার চোখে পড়েছে, ভারতে মমতা নামে অনেক হিন্দু মেয়ে থাকতে পারে- কিন্তু পূর্ব বাংলা বা বাংলাদেশে মমতা মুসলিম মেয়েদের নাম সে হিসেবে। আপনি হিন্দু মুসলিম সবার ঘরের একান্ত আপন। দয়া করে কি এ চিঠি প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন? যদি কষ্ট করে চিঠি প্রাপ্তির সংবাদ দেন তবে নিম্ন ঠিকানায় দিবেন। আমি

www.pathagar.com

একটু আধটু লেখালেখি করে থাকি, মাঝে মধ্যে দুএকটি ছাপা হয়, সম্প্রতি প্রকাশিত ঢাকার দৈনিক সংবাদে আমার একটি লেখা এবং ভোরের কাগজে প্রকাশিত আপনার ইন্টারভিউ পাঠিয়ে দিলাম। আপনার মাকে আমার জন্য আর্শিবাদ করতে বলবেন।

আপনার শুভকামনা করি।

আপনার গুণমুগ্ধ–

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

৬৩/৩, নর্থ সার্কুলার রোড

ঢাকা–১২০৫

বাংলাদেশ।

১৯৯৫ সন

বরাবর–

শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম,পি

বালিগঞ্জ, কলকাতা।

www.pathagar.com

জনাব সিদ্দিকুর রহমান, ১৯৫৭ সন ব্যাচের সি,এস,পি

বাংলাদেশ সরকারের পল্লী উন্নয়ণ ও স্থানীয় সরকার, প্রতিরক্ষা ও কেবিনেট সচিব ছিলেন। ১৯৯৬ সনে ভোটারবিহীন নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে বি,এন,পির নমিনেশনে এম,পি হয়েছিলেন কয়েক মাসের জন্য। ১৯৯৬ সনের ১২ই জুনের নির্বাচনে বি,এন,পি, থেকে নমিনেশন পান নাই যার ফলে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত ছিলেন শেষের দিকে খালেদা জিয়াও বি,এন,পির প্রতি। তাঁর সাথে আমার সুসম্পর্ক ১৯৭২ সন থেকে। ঐ সময় বাংলাদেশের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী এ,এইচ,এম কামরুজ্জামান তাঁর সাথে পরিচয় করে দেন। আমার মতে তিনি অতি সজ্জন ও সাধারণ মানুষ ছিলেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ছিলেন মিশরে। মিশরের কায়রো শহর থেকে এই চিঠিটি আমাকে দিয়েছিলেন।

১৯৮৬ সনে তাঁর মিশরে যাবার আগে ঢাকার হোয়াংহো চাইনিজ রেস্তেরায় সিদ্দিকুর রহমান সাহেবের সম্মানে আমি একটি ডিনার পার্টি দিয়েছিলাম। ঐ পার্টিতে বাংলাদেশ সরকারের ৩০ জন সচিবসহ প্রায় একশত অতিথি ছিলেন। অতিথিদের সবাই খুবই গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন।

কায়রো

২৫/৫/১৯৮৬

প্রিয় ভাই বাবলু,

আপনার ১০/৫/৮৬ তারিখের চিঠিটি দিন তিনেক আগে পেয়েছি। আপনার চিঠি পেয়ে খুবই ভালো লাগলো। চিঠিপত্র লেখার নেশা বা অভ্যাস আমার বিশেষ নেই। কিন্তু বিদেশ বিভূয়ে আত্মীয় বন্ধুদের চিঠিপত্র পেলে সত্যিই বড় আনন্দ পাই। কিছুদিন আগে কাগজের মধ্যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বলে লিখেছেন- কিন্তু সে চিঠি আমার হাতে পৌঁছে নি– আপনার কাগজ মোটামুটি রীতিমতই পাচ্ছি- সে জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। দেশের খবরাখবর পাওয়ার জন্য মনটা সব সময়ই আন্‌চান্‌ করে- তাই খবরের কাগজ আর চিঠিপত্রের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি।

এখানকার খবরের কাগজ সবই আরবী ভাষায়, একটি শুধু আছে ইংরেজিতে Egyption Gazette - তবে খুবই সংক্ষিপ্ত ও কাঠখোট্টা। দৈনিক পত্রিকা সবগুলিই সরকারি ব্যবস্থাপনায়-কয়েকটি সাপ্তাহিক অবশ্য আছে সরকারি আওতার বাইরে- কিন্তু ভাষার ফ্যাসাদে সেগুলোর রস থেকে বঞ্চিত।

প্রাতঃভ্রমণের দিনগুলো, বিশেষ করে প্রাতঃভ্রমণ করে স্বাস্থ্যরক্ষার নাম করে ভূরি ভোজনের উৎসবগুলো খুব মনে খুব মনে পড়ে বন্ধু-বান্ধব, বিশেষ করে আপনাদের গ্রুপটার কথা চিন্তা করলে চোখের সামনে সবাইকে দেখতে পাই। এখন সেই প্রাতঃভ্রমণ

www.pathagar.com

কেমন চলছে! আর ভূরি-ভোজন! বেশ কিছুদিন হলো নাসির ভাইকে চিঠি লিখেছিলাম- পেয়েছেন কিনা জানি না- ইনস্যুরেন্সে কোম্পানি নিয়ে তিনি নিশ্চয়ই এখন খুবই ব্যস্ত। অন্যান্য সবাই কেমন আছেন। প্রাতঃভ্রমণ ক্লাবের সমস্ত বন্ধুদেরকে আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাবেন।

এখানকার জীবন চলে যাচ্ছে মোটামুটি ব্যস্ততার মাঝেই– মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও আরব কূটনীতির সঙ্গমস্থল হিসেবে কায়রোতে কূটনৈতিক কার্যকলাপ বেশ গুরুত্বপূর্ণ শেখার ও জানার আছে অনেক। এছাড়া মানব সভ্যতার আদি পীঠস্থান ও প্রাচ্য-প্রতিচ্যের মিলনে এখানকার জীবনধারাও বেশ বৈচিত্রময়। একদিকে আরব ও ইসলামী ধ্যান-ধারণা, অন্যদিকে পুরানো ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সাথে সমাজ জীবনে পাশ্চাত্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ-সব মিলে একটা বহুদর্শী জীবন-বোধ। নীল বিধৌত কায়রো কালের জীবনধারার প্রতিফলন ইতিহাসকে উপলব্ধি করতে হয় প্রতিপদে ফারাও-দের মমিগুলো যেন অতৃপ্ত হৃদয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কায়রোর আকাশে বাতাসে-ওরা যে এককালে এই দেশটি গড়ে তুলেছিল ওদের শৌর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের দৃপ্ততায়, সে কথা পদে পদে মনে করিয়ে দেয়।

শহরটা অনেক বেশি সুন্দর হতো যদি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতো সেই অভ্যাসটির অভাব এখানে। অবশ্য রাত্রে সুন্দর লাগে নীল নদীর দুধারে রঙীন আলোর ঝলমলানি-আর ময়লাগুলোর অন্ধকারে আত্মগোপন। তবুও সব মিলিয়ে একটা আকর্ষণ আছে।

আশা করি ভালো আছেন।

সিদ্দিক

বিঃ দ্রঃ- নাসির ভাই হচ্ছেন, গ্রীণ ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানীর লিমিটেডের এমডি জনাব নাসির আহমেদ চৌধুরী।

www.pathagar.com

সন্তোষ কুমার মিশ্র দেব শর্মার লেখা চিঠিঃ-

ওমাঁ

ময়না ডাঙ্গা পূর্বপাড়া
চুঁচুড়া আর এর, ৭১২১০২
হুগলী
৪-৩-২০০৪

কল্যাণবরেষু

পরম প্রিয় আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) সাহেব, আপনার অতি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা মুখর ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্ণ গত ২৮/০১/২০০৪ তারিখের প্রদত্ত পত্র খানি গত ২১/০২/২০০৪ তাং প্রাপ্ততে আনন্দিত ও অভিভূত। নানাভাবে ব্যস্ততার জন্য অত্যধিক বিলম্বহেতু বিশেষ লজ্জিত, এজন্য কিছু মনে করিবেন না আশাকরি, গত ২৫/০২/২০০৪ তারিখ চুপ গ্রামের কল্যাণীয় শ্রীদীপালোক ও কল্যাণীয়া শ্রীমতী ছায়ার একমাত্র পুত্র তথা আমার অতি প্রিয় দৌহিত্র শ্রীমান ঋভুর উপনয়নে গিয়া আপনার সম্পর্কে সম্মক অবগত হয়েছি। আপনার ন্যায় কর্মঠ মহান ব্যক্তির নিকট আমি তুচ্ছাতি-তুচ্ছ। যা হোক, আপনি আমার অনূদিত পরম পূজ্যপাদ ভাগবতাচার্য্য নীলকান্ত গোস্বামী মহোদয় রচিত মানব সমাজের হিতার্থে শত বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও প্রচারিত “পঞ্চরত্ন” পুস্তকের প্রতিপাদ্য মাতা, গুরু, ধর্ম, বিবেক ও হরিণাম এই পাঁচটি রত্ন (তাঁহার নির্বাচিত) ক্ষয়িষ্ণু মানব সমাজের কি অমূল্য সম্পদ- ইহাঁদের কি বিরাট অবদান তাহা এই পতনোম্মুখ সমাজের কল্পনাতীত। আপনি অতি যত্ন সহকারে অধ্যয়নে ইহা অনুধাবন ও উপলব্ধি করায় আমি অতীব মুগ্ধ ও অভিভূত। ভগবান খোদাতালার নিকট একান্ত প্রার্থনা আপনার সুকর্ম ভাবনাময় নির্মল উদার চিত্ত জীব তথা মানব সেবার মাধ্যমে ভগবতচিন্তায় বিকশিত হোক, উদ্বুদ্ধ হোক।

আপনার কর্ম-সন্ন্যাসময় জীবনে মানবের উপকার করার প্রবৃত্তি আরও অবারিত প্রসার লাভ করুক- ইহাতেই আনন্দ, যে মহানন্দহতে “আনন্দাদ্ধের খল্বিমানি ভূতানি জয়ন্তে” ইতি শশ্ব্শতিঃ জীব সৃষ্টি- সেই জীব মানবের প্রতি ভালবাসাই পরম পবিত্র কর্ম, জীবই ব্রক্ষ, জীবই শিব জীব ই স্বয়ং আল্লাহ্। স্বামীজীর শিক্ষায় সেবাই পরম ধর্ম।

কে কার গুরু, কে কার ভক্ত, স্বয়ং ভগবানই ভক্তাধীন গুরু হরি, হরি গুরুরূপে ভক্তে করেন উদ্ধার।

আর বিশেষ কি আপনার কর্মময় জীবনের ব্যস্ততার ফাঁকে অতি প্রিয় জীবনের একমাত্র সম্পদ আল্লাহর নাম শ্রবণ, মনন, পুনঃ পুনঃ চিন্তনই নিদিধ্যসন এর পরই এজীবনের সর্বজয় ইন্দ্রিয় জয়ই প্রকৃত জয়। তাঁর কৃপা না হলে এ জীবন পঙ্গু, সাধিতে আল্লাহ যদি কৃপা করেন তবেই সব কিছু সার্থক। দয়াময় ঈশ্বর আপনার মনোবাসনা পূর্ণ করুন– এই আমার একান্ত প্রার্থনা, তাঁর অমোঘ আশীর্বাদে আপনার স্বাচ্ছন্দ্য নিরাময় দীর্ঘজীবন সেবায় উৎসর্গী কৃত হউক।

www.pathagar.com

আপনার সহিত সাক্ষাৎ কারের সৌভাগ্য হবে কিনা জানি না– যদি ইষ্টদেবীর কৃপা হয় আর আপনি পর্য্যটনে যদি চুপীতে শ্রীমান দীপালোকের বাড়িতে উপনীত হন, হবে হয়ত বাসনা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা।

পরিশেষে অধিক কি– পারে যাওয়ার কড়ি সংগ্রহে মন উদ্বিগ্ন, তাঁর কি কৃপা হবে এ দীনে!!!

ইতিশম্।
সতত শুভাকাঙখী
শ্রী সন্তোষ কুমার মিত্র, দেবশর্মা

ময়নাডাঙ্গাঁ– পূর্ব্বপাড়া
চুঁচুড়া আর,এস,
পিন-৭১২১০২
জিলা-হুগলী
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

www.pathagar.com

সন্তোষ কুমার মিশ্র দেব শর্মার নিকট লেখা চিঠি

ঢাকা ১৪.৩.২০০৪ইং

পরম শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় গুরুদেব

আমার আন্তরিক প্রণাম ও শ্রদ্ধা জানবেন। আপনার ৪.৩.০৪ তারিখে লিখিত পত্র ১১.৩.০৪ তারিখে পেয়ে খুবই খুশিও কৃতার্থ হয়েছি। আপনি গত ২৫.২.০৪ তারিখে সোনামনী ঋভুর উপনয়নে চুপিতে গিয়ে আপনার সম্পর্কে আমার যে বাস্তাব ধারণা তাহাতে আপনার ন্যায় কর্মঠ মহান ব্যক্তিত্বের নিকট আমি তুচ্ছাতি তুচ্ছ। একথা পড়ে আমি খুবই লজ্জা পেয়েছি। বরং আমার মতো দুই চারশত বাবলুর ওজন আপনার পায়ের একটি ধুলি কণার চেয়ে কম। এটাই বাস্তব সত্য। আসলে আপনি প্রবীণ ও জ্ঞানী ব্যক্তি এবং দীপালোকদের মুরুব্বী, আপনি মনে হয় আমার কথা জিজ্ঞাসা করেছেন কেন আমি ছয় সাত দিন চুপিতে ছিলাম,- সে জন্য ওরা ভয় পেয়ে আপনাকে আমার সম্পর্কে অনেক বাড়িয়ে বলেছে আমি যা না তাই। আমি তুচ্ছ, নগন্য একজন ব্যাক্তি। আপনার পায়ের ধুলার চেয়ে আমার দাম অনেক কম। আপনি পঞ্চরত্ন বই অনুবাদ করে এটি প্রকাশ করে বাঙ্গালি জাতির যে উপকার করেছেন তাহার জন্য আপনি যতদিন বাংলা ভাষা থাকবে ততদিন অমর হয়ে থাকবেন। আমরা যে দিন মরে যাব তার পরের দিনই সবাই আমাদের ভুলে যাবে। কিন্তু আপনি অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন।

চুপি থেকে ১১.১২.২০০৩ তারিখ বৃহস্পতিবার মায়াপুরে ইসকনের মন্দির দেখতে যাই। ইসকনের মন্দির দেখে ও গঙ্গা নদীতে স্নান করে খুবই আনন্দিত হয়েছিলাম। গঙ্গা নদীতে গোসল করলে শরীর যে এত হালকা পাতলা লাগে তা আগে জানতাম না। ইসকনের মায়াপুর মন্দির থেকে দুটি বই কিনি একটির নাম কৃষ্ণ কৃপাশীল অভয় চরনার বিন্দু ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এর লেখা 'কৃষ্ণ ভাবনার অমৃত' বইটি বেশ কয়েকবার পড়লাম- খুবই সুন্দর বই। মানুষকে নাস্তিক থেকে আস্তিকে পরিণত করার জন্য এবং আস্তিক মানুষকে ভগবানের প্রতি ভক্তিবান হওয়ার জন্য স্বামী প্রভুপাদ এর এই বই একটি শক্তিশালী অস্ত্র। যাই হোক এই বইটির ১১৯ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে" গোবিন্দ ব্রহ্মাকে তাঁর হৃদয়াভ্যন্তর থেকে তত্ত্ব জ্ঞান দান করেছেন, ব্রহ্মা সেই জ্ঞান তাঁর শিষ্য নারদ মুনিকে দান করেছিলেন, নারদ মুনি সেই জ্ঞান তাঁর শিষ্য ব্যাসদেবকে দান করেছিলেন, ব্যাসদেবের শিষ্য মাধবাচার্য সেই বাণী পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, তারপর ঈশ্বরপুরী এবং তার পর তাঁর শিষ্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভূ, তারপর গোস্বামীগণ। এইভাবে এই জ্ঞান গুরূপরম্পপরা সূত্রে প্রাপ্ত হতে হয়। স্তরে স্তরে গুরু থেকে শিষ্যতে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয়। "একথা এখানে উল্লেখ করার কারণ হলো দেখা যাচ্ছে গোস্বামী পদবীর লোকদের স্থান অনেক উচ্চে। গোস্বামীদের স্থান যে এত উঁচুতে তা আমার আগে জানা ছিল না। বৈষ্ণব কবি জয়দেবও গোস্বামী। সেই গোস্বামী শ্রী নীলকান্ত গোস্বামী পঞ্চরত্ন

www.pathagar.com

এর লেখক। স্বামী প্রভুপাদ ঐ বইতে এক জায়গায় লিখেছেন– "গো মানে প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা- যারা প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, মন ও আত্মাকে শাসন বা নিয়ন্ত্রন করার ক্ষমতা রাখেন তারই গোস্বামী।"

পঞ্চরত্ন বইটিতে লেখক নীলকান্ত গোস্বামী ও অনুবাদক শ্রী সন্তোষ কুমার মিশ্রর জীবনী থাকলে আরো ভালো হতো। তবে একটি বই লেখা অনুবাদ করা তা প্রকাশ করা কত কঠিন ও জটিল কাজ তা খুব ভালো জানি। কাজেই আমি বুঝতে পারি কেন তা হয় নাই। তবে আপনি যদি পারেন এখন আপনার ও নীলকান্ত গোস্বামীর জীবন বৃত্তান্ত তৈরি করে রাখতে পারেন। ভবিষ্যতে পঞ্চরত্নের পুনঃমুদ্রণে যাতে তা দেওয়া যায়।

যদি সম্ভব হয় তবে আমার চিঠিটির একটি ফটোকপি যদি পাঠান তবে ঐ চিঠিটি টাইপ করে আপনাকে আবার পাঠাব। আমার এত খারাপ হাতের লেখা না জানি কত কষ্ট হয়েছে তা পড়তে। সোনামনি ঋভুই কিন্তু আপনার সাথে আমার যোগসূত্র করে দিয়েছে- ঐ আপনার বইটি আমাকে চুপিতে পড়তে দিয়েছিল, তা না হলে আপনার সাথে এই যোগসূত্র হতো না।

আমার বিশ্বাস মানুষ যা চায় ভগবান তা পূরণ করেন। আমার ইচ্ছা আছে একবার আপনার আশ্রমে গিয়ে আপনার পায়ের কাছে বসে থাকবার। নিশ্চই আল্লাহ, ঈশ্বর আমার এ সাধ পূর্ণ করবেন।

আপনার চিঠি পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। ২২.১২.২০০৩ তারিখে কলিকাতা থেকে ঢাকায় এসে পহেলা জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে দীপালোক ও দিলীপ মৈত্র দাদাকে চিঠি লিখি এবং ৫.১.০৪ তারিখে চিঠি পোস্ট করি। সেই চিঠির কোনও প্রাপ্তি সংবাদ না পেয়ে গত ১৭.২.০৪ তারিখে আবার রেজিষ্ট্রি ডাকে দীপালোকের কাছে চিঠি পাঠাই কিন্তু আজ ১৪.৩.২০০৪ তারিখে দীপালোক ও দিলীপ দার কাছ থেকে কোন চিঠি না পেয়ে বেশ দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে রয়েছি।

আপানার একান্ত বিশ্বস্ত ভক্ত
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩৮৩/২, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।
২৬ শে মার্চ, ২০০৩ ইং

www.pathagar.com

ভারতে হাইকমিশনার শ্রী পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি

তারিখ ঃ ০৪/০৪/২০০৭ ইং
সম্মানিত
শ্রী পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তী
মাননীয়
ভারতীয় হাই কমিশনার
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বাড়ী নং-২, সড়ক নং- ১৪২
গুলশান- ১, ঢাকা-১২১২।

মহাত্মন,

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার হিসাবে আপনার আগমণকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ১৯৯৯ ইং সন হইতে ২০০২ ইং সন পর্যন্ত একবার আপনি ঢাকায় ছিলেন। এরপর আবার এই ঢাকায় আপনি আসতে সম্মত হয়েছেন, এ থেকে আমি ধারণা করতে পারি আপনি ঢাকা ও বাংলাদেশকে কত প্রাণ দিয়ে গভীরভাবে ভালোবাসেন। আপনার এবার ঢাকায় আগমণে আমি আপনার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমি ভারতে গিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত মুর্তি ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে ভারতের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে দুই মাসের সামরিক বা যুদ্ধবিদ্যা ট্রেনিং নিয়ে ৬নং সেক্টরে দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী সাব-সেক্টরে (জলপাইগুড়ি জেলার হলদিবাড়ী থানায় বাংলাদেশের চিলাহাটি সীমান্তের কাছে) ভারতের সেনাবাহিনীর কমান্ডে একজন সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার হিসাবে দিনে-রাতে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করি। ১৯৭১ সনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্যাগ ও ভূমিকার কথা মনে পড়লে এখনও চোখ দিয়ে নীরবে অশ্রু গড়িয়ে যায়।

১৯৫৪ সনের ১৪ই জানুয়ারি সাবেক পাবনা বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই নামক গ্রামে আমার জন্ম, ১৯৭০ সনে তামাই হাইস্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পাস করি। মোট কথা আমি গ্রামবাংলার ছেলে, গ্রামবাংলার গরিব মানুষের মাঝে তাদের মূল্যবোধ নিয়ে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বেড়ে উঠেছি। গ্রামের এইসব মানুষদের কাছে ছোটবেলায় শিখেছি "যার তার নুন খাবে না, একদিন যার নুন খাবে চির জীবন তার গুণ গাবে"। আমি এখনও এই কথার প্রতি আস্থাশীল। ১৯৭১ সনে চরম বিপদের দিনে ভারত আমাকে আশ্রয় দেয়, সাড়ে আটটি মাস ভারতের নিমক খেয়েছি। আমি চির জীবন ভারতের গুণগান গেয়ে যেতে চাই। আমি একজন ভারত ভক্ত মানুষ, অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে ভারতকে স্মরণ করি। ১৯৭১ সনে যুদ্ধে একদিন আমি যে ট্রেঞ্চে ছিলাম

www.pathagar.com

সেই ট্রেঞ্চে পাকিস্তানী আর্মির সেল পড়ে ছয়জনের মৃত্যু হয়, চারজন ভারতীয় সেনা, দুইজন মুক্তিসেনা, সমস্ত ট্রেঞ্চ রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর মিলিত রক্তে এই বাংলাদেশ জন্ম নিয়েছে।

আমি আপনার বাংলাদেশে আগমনে খুবই খুশি হয়েছি, আপনি যে একজন অতি উঁচু মাপের খুবই উন্নত মনের মানুষ তার প্রমাণ মিলে বাংলাদেশে আপনার দ্বিতীয়বারে আগমনে। বাংলাদেশে ভারতীয় যেসব হাই কমিশনার সাহেবেরা এসেছেন তাদের দু'একজন ছাড়া সবার সাথেই আমার পরিচয় হয়েছে, তারা সকলেই আমাকে স্নেহ করেছেন, তবে এদের মধ্যে মি. আই,পি, খোশলা ও মি. শ্রীনিবাসন সাহেব আমাকে অশেষ স্নেহ করেছেন। শ্রীনিবাসন সাহেবের পরিবারের এখনও আমি একজন সদস্যের মত। তাঁর শ্বাশুড়ী মা শ্রীমতি অদিতি মুখার্জি আমাকে ছেলে বলেই মনে করেন।

আমি আবার আপনাকে অতীশ দীপংকর, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাপ-দাদা, লালন শাহ, মহারাণী মা ভবানী, মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসুর বাংলাদেশে আসবার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমি আপনার ও ভারতবর্ষের মানুষের মঙ্গল কামনা করি।

আপনার একান্ত অনুগত

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা, সেক্টর নং- ৬
বর্তমান ঠিকানা ঃ
এপার্টমেন্ট # এ-১২
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫।
ফোন ঃ ৯৬৬৯৫৪৪, ০১৭১৫৬৮০০২৩

www.pathagar.com

কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের এম ডি রাজীব প্রসাদ সাহাকে চিঠি–

১৪.১১.২০০১

প্রিয় রাজিব প্রসাদ সাহা

আমার আন্তরিক প্রণাম ও নমস্কার রইলো আপনার প্রতি। আমি গত ২৬শে অক্টোবর ২০০১, রোজ শুক্রবার সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব রবিউল ভাইয়ের সাথে আপনাদের পুণ্য ও তীর্থস্থান মির্জাপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে আপনার সাথে আমার দেখা হয়। আমি সেই ব্যক্তি যে পুণ্যগ্রন্থ্ মহাভারত নিয়ে ২/১টি কথা বলেছিলাম। আশা করি এবারে আমাকে মনে করতে পারছেন।

যাক সেই ছোটবেলা থেকে কুমুদিনী হাসপাতাল ও ভারতেশ্বরী হোমসের সুখ্যাতি ও প্রশংসা শুনে আসছিলাম। গত প্রায় ৪০ বছর। সেই পুণ্যভূমি বাসস্থান দেখতে পেয়ে বা সেখানকার মাটিতে পা-রাখতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে। গত ত্রিশ বছর থেকে আপনাদের বাড়ির খাবারের অমৃত স্বাদের কথা বহু উচ্চস্তরের লোকদের মুখে শুনে আসছিলাম। অবশেষে গত ২৬শে অক্টোবর শুভ বিজয়া দশমীর দিনে আপনাদের বাড়ির অমৃতের স্বাদ খাবার সুযোগ পেলাম।

আপনি যে আন্তরিকতা নিয়ে আমাকে আদর আপ্যায়ন করেছেন তা লিখে ভাষায় প্রকাশ করা আমার মতো এতকম পড়ালেখা জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আপনার ব্যবহারে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছি।

আমি ঐদিন আপনাদের বাড়িতে খাবার সময়ে বলেছিলাম আপনার মায়ের মুখের বা চেহারার সাথে মা সারদা দেবীর মুখের মিল আছে, কিন্তু ঐখানে যারা ছিলেন সবাই একমত বা আমার কথা সমর্থন করলো না। কিন্তু আমি ঢাকায় এসে মা সারদা দেবীর ছবি দেখে বারেবারে চিন্তা করে দেখেছি বা এখনও দেখছি আপনার মায়ের দয়াময়ী মুখের বা চেহারার সাথে সারদা মায়ের মুখের মিল রয়েছে। দু'জনের চেহারাই দয়াময়ী বা কৃপাময়ীর ভাব। কেউ একমত না হলেও কেন জানি আমার তাই মনে হয়।

আপনাকে আমার আরও যে কারণে ভালো লেগেছে তা হচ্ছে আপনি হিন্দুত্বটা ছেড়ে দেন নাই– এখনও ধরে আছেন– দয়া করে হিন্দুত্বটাকে আরও ভালো আরও বেশি করে গ্রহণ করবেন। তাহলে জীবনে আরও বেশি সুখ-শান্তি পাবেন।

গতকাল ১৩ই নভেম্বর থেকে ঋষি ও মণীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শেষ লেখা উপন্যাস সীতারাম পড়ছি, এই উপন্যাসের একটি সংলাপ এখানে লিখে এই চিঠি শেষ করছি– "কাজী সাহেবও বিস্মিত হইয়া সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন– একি বলিতেছেন রায় মহাশয় এ আপনার কে যে ইহার জন্য আপনার প্রাণ দিতে হইবে?"

এ পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়, কেননা এ আমার শরণাগত, হিন্দুশাস্ত্রের বিধি এই যে– সর্বস্বদিয়া নিজের প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে।"

www.pathagar.com

আর মনে হয়, হিন্দুধর্মের এ শিক্ষা থেকেই ১৯৭১ সনে ভারত সরকার ও জনগণ এই বাংলাদেশের ছিন্ন বা শরণাগত মানুষের পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। যাক সেকথা, মূলকথা এই যে ২৬শে অক্টোবর বিজয় দশমীতে আপনাদের ওখানে আমি আপনার কাছ থেকে যে আদর আপ্যায়ন ও সৌজন্যতা পেয়েছি- তার জন্য আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আন্তরিকভাবে আপনার ও আপনাদের সবার সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করি। আপনার মাকে আমার ভক্তি ও প্রণাম জানাবেন। এই চিঠিটি যে আপনি পড়েছেন তা কি আমি জানতে পারবো? চিঠিটি লিখতে বেশ দেরী হলো। আরও আগে লিখা উচিৎ ছিল। নমস্কার।

আপনার গুণমুগ্ধ ঃ
আবু মোহাম্মদ খান বাবলু
রয়্যাল সোসাইটি
৩৮৩/২ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

নজরুল, কামাল, আব্দুর রশিদ পুনু ও ঝন্টু

১৯৭৫ সনের ১৫ আগষ্ট থেকে আমি, নজরুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুর রশিদ পুনু, ঝন্টু ও কামাল আনোয়ার আমরা একসাথে ৫৫০ সূর্যসেন হলে, তারপরে অনেকদিন ৫৪৮ নং সূর্যসেন হলে একসাথে থাকি, সবাই একই বছরের ছাত্র। প্রখ্যাত লেখক সলি-মুল্লাহ খান আমাদের ৩ বছর জুনিয়ার সেও ১৮ মাস ৫৪৮ নং সূর্যসেন হলে আমার অতিথি হিসেবে ছিল, পরে মহসিন হলে যায়। আমি ঐ সময়ে ইংরেজি বিভাগে অনার্স পড়ি। নজরুল, কামাল ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে, পুনু, ঝন্টু ও সলিমুলাহ খান ল' বিভাগে অনার্সের ছাত্রছিল।

পুনু ও ঝন্টু এল,এল,এম পরীক্ষা দিয়ে আমেরিকায় চলে যায় ১৯৮০ সনে, পরে কানাডায়। কামাল আনোয়ার আমেরিকায় যায় ১৯৯৮ সনে। নজরুল এখন জনশক্তি ও কর্মসংস্থান ব্যুরোর উপ-পরিচালক এবং ডিভির মাধ্যমে আমেরিকার সিটিজেন।

আমার এবং নজরুলের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানায়। কামাল আনোয়ারের বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ের মুগড়া পাড়া, কামালের বাবা আব্দুল কাশেম সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম.এ পাশ করেন ১৯৪৯ সনে। সোনারগাঁও মুগড়া পাড়া হাইস্কুলের অনেকদিন প্রধান শিক্ষক ছিলেন। খন্দকার আব্দুর রশিদ পুনুর বাড়ি টাংগাইল শহরের পুরানো জেলখানার উত্তরপার্শ্বের দেওয়াল ঘেঁষে।

ঝন্টুর বাড়ি ঝিনাইদহে ওর বাবা সাব এসিসট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সরকারি চাকরি করেছেন। উপরে উল্লেখিত নজরুল, কামাল, পুনু, ঝন্টুর সাথে পরিচয় হবার সময় থেকে এখন পর্যন্ত আমাকে খুব ভালোবাসে, ওরা সবাই আমাকে অনেক বড়মাপের একজন মানুষ মনে করে সবাই আমাকে সখ করে ওস্তাদ বলে ডাকে।

আমিও সমানভাবে নজরুল, কামাল, পুনুও ঝন্টুকে খুব ভালো মানুষ মনে করি ও ভালোবাসি। এখানে খন্দকার আব্দুর রশিদ পুনুর দুটি চিঠি যা কানাডা থেকে লেখা হয়েছে তা ছাপানো হলো

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৫/৯/২০০৮

www.pathagar.com

53 Westwood Ave.
Toronto, Ontario
Canada M4K 2A7
Tel : (416) 423-1943

Nov. 28, 1989

ওস্তাদ,

কেমন আছেন। অনেকদিন হয় আপনার সাথে কোন যোগাযোগ নেই। আসার পরে আপনাকে একটা পত্র দিয়েছিলাম কিন্তু তার কোন উত্তর পাই নাই। কিছুদিন আগে আপনার দেওয়া একটা পত্র পেয়ে খুবই খুশি হলাম। সুমনের নিকট থেকেও আপনার কথা শুনলাম। যাক চিঠিতে গত সাত বৎসরের কথা লিখে শেষ করা যাবে না। আমি এবং ঝন্টু আগামী ডিসেম্বর ২২/৮৯-এ দেশে আসছি। আপনি আমাকে ১লা জানুয়ারি ১৯৯০ সকালে যদি ফোন করেন তবে আমাকে পাবেন অথবা আপনি ফোন করে আপনার নাম এবং নাম্বার রাখলে আমি আপনাকে ফোন করে আপনার সাথে দেখা করবো। আমার ঢাকার ফোন নাম্বার হচ্ছে-৩১৫৬৬৬।

নজরুল, কামাল এবং স্বপন ওরা কেমন আছে। আমি এবং ঝন্টু দেশে এসে বিয়ে করবো। যদি জানামতো ভালো, মেয়ে থাকে, তবে আমি আসলে জানাবেন। আমি ও ঝন্টু ফেব্রুয়ারি ২রা ১৯৯০-তে এখানে চলে আসবো। আসার পর অনেক কথা হবে। ভালো থাকেন।

শুভেচ্ছান্তে–
পুনু
(Rashid Khandaker)

Note : British Airways Flight No. 145
Arrival date : Dec. 22/89 at 04:25 P.M

www.pathagar.com

53, Westwood Avenue
Toronto, Ontario
M4K 2C7

ওস্তাদ :

প্রায় ৭/৮ বৎসর পর আপনার পত্র পেয়ে খুবই খুশি হলাম। আমার নিকট আপনার ঠিকানা ছিল না বলে লিখতে পারি নাই। তবে আপনার নিকট পত্র দেবার ইচ্ছা সব সময়ই ছিল। যাহোক এটা কখনো মনে করবেন না যে আমি আপনাকে ভুলে গেছি। যাহোক ৮ বৎসরের কথা সংক্ষেপে বলি। ১৯৮১ সালের একত্রিশ তারিখে Los Angeles -এ আসলাম। আসার পথে Thailand এবং Japan -এ কয়েকদিন ছিলাম। তারপর Los Angeles এর Hollywood -এ দুই বৎসর ছিলাম। আপনি তো জানেন দেশ থেকে পয়সা এনে পড়ার ক্ষমতা আমার ছিল না এবং আমার জানামতে তখন ওখানে কারোই ছিল না। যা হোক দুই বৎসর কাজ করলাম এবং টাকা সঞ্চয় করলাম। এর মধ্যে M.B.A-এর Course করলাম। যদিও আইনগতভাবে ছাত্ররা কাজ করতে পারে না। আমি এখানে Universal Studio (যারা সিনেমার ছবি তৈরি করে) তে কাজ করতাম। L.A.-এর আবহাওয়া খুবই ভাল। এটা প্রশান্ত মহাসাগরের পারে। যাহোক, আন্তর্জাতিক আইনে মাষ্টার ডিগ্রী করার জন্য Washington, D.C আসলাম ১৯৮৩ সালের September মাসে। যেখানে দুই বৎসর কাটালাম Master Degree করতে। অবশ্য চাকুরীও করতে হয়েছে। এখানে Law School খুবই Expensive.

$1000- $1500 per year. তারপর চিন্তা করলাম North America-তে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে Doctorate করতে হবে। আবার অনেক টাকার ব্যাপার। এখানে Lawতে Doctorate করার বড় অসুবিধা হচ্ছে Supervisor পাওয়া। তার পরেও সমস্যা ছিল এটা ঠিক করা আমি কি America তে থাকবো না Canada-তে থাকবো। শেষ পর্যন্ত যোগ বিয়োগ করে ঠিক করলাম Canada-তে স্থায়ীভাবে থাকবো। এর কারণ অনেক। America-র চাইতে Canada-তে এর Life-তে অনেক Secure.

Canada অনেক Peaceful. শুধু ঠান্ডা বেশি। এখানে Free Medical; চাকুরী না থাকলে চাকুরীর ৬০% টাকা পাওয়া যায় এক বৎসর পর্যন্ত। তারপর Social Assistant পাওয়া যায়। এখানে শহরগুলো অনেক পরিস্কার এবং Crime rate অনেক কম। যাহোক, শেষ পর্যন্ত Canada-এর Permanent Resident হবার জন্য Apply করলাম। LL.D. তে ভর্তির জন্য Apply করলাম University of Ottawa-তে। (Ottawa হচ্ছে Canada-এর রাজধানী). সব হয়ে গেল। তারপর ১৯৮৬ সাল থেকে LL.D আরম্ভ করলাম। বর্তমানে Thisis বাকী আছে আশা করি এ বৎসর শেষ হবে। যাহোক দুই বৎসর Ottawa-তে ছিলাম। তারপর Torento (Canada-এর সব চাইতে বড় শহর)

www.pathagar.com

শহরে গত বৎসর চলে আসলাম কারণ এখানে আমি একটা Correctional Agency-তে Records Manager হিসাবে কাজ পেলাম। আমাকে Parole নিয়ে Deal করতে হয়। ঝন্টু Organization Development Officer হিসাবে কাজ পায়। প্রথম থেকেই আমি, ঝন্টু এবং অরুণ (রাবেয়া ভূইয়ার ভাই) এক সাথে ছিলাম এবং একই Degree করেছি। অরুন অবশ্য দেশে গিয়েছে এবং আপনাদের Mayor-এর মেয়েকে বিয়ে করেছে। এরমধ্যে দেশে আর আসা হয় নাই। এ বৎসর শেষের দিকে দুই মাসের দুটি নিয়ে আসবো। ঝন্টুও আসবে। ভাল মেয়ে-টেয়ে থাকলে জানাবেন। দেশে এসে বিয়ে করবো।

যাহোক, আপনার পত্রিকার কথা শুনে দুঃখ পেলাম। আশা করি সব ঠিক হয়ে গেছে। স্বপন কোথায় আছে জানাবেন। পত্র দিবেন। দেশে আসার আগে অবশ্যই যোগাযোগ করবো। ভাল থাকেন। ঝন্টু আপনাকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছে।

শুভেচ্ছান্ত-
পুনু
১৯৮৯ সন

Md. Abu Mohammad Khan Bablu
61 North Circular Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

শেখ হাসিনার উপরে লেখা পড়ে সাহিত্যিক সরদার আব্দুস সাত্তারের লেখা চিঠি

বাবলু ভাই

শুভেচ্ছা জানবেন অনেকদিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা নাই। কথা নেই, যোগাযোগ নেই। আপনার দেয়া টেলিফোন নম্বরে বহুবার আমি যোগাযোগের চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঐ নম্বরে কোনও সংযোগ পাওয়া যায় না। আপনার অন্য কোনও নম্বর আমার এখন পর্যন্ত জানা নেই। তাই হাত গুটিয়ে বসে থাকাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে ভবিতব্য। তবে হঠাৎ করেই গতকালের ডাকে আপনার একটা অসাধারণ লেখা আমার হাতে এসে পৌছলো। একবার নয়, একাধিকবার আমি আপনার লেখাটি পড়লাম, পড়ে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হলাম।

একই সঙ্গে তথ্য ও তত্ত্বের এবং বুদ্ধি ও আবেগের এক চমৎকার যুগলবন্দি আপনার এই লেখাটি। লেখাটি পড়তে গিয়ে বারবার ছফা ভাইয়ের কথা মনে পড়ছিল। ছফা ভাই তাঁর সারাজীবনে যে মানুষের দুর্গত অথবা পীড়িত দেখেছেন, তৎক্ষণাৎ তার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। যা সত্য এবং ন্যায় বলে মনে করেছেন– নির্দ্বিধায় তা উচ্চারণ করে গেছেন। আপনার এই লেখার মধ্যে সেই আদর্শের প্রতিরূপ ছাড়ানো আছে। শেখ হাসিনার এই দুঃখের দিনে আপনি আপনার বুক ভরা ভালোবাসা, সাহস এবং মেধা নিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। অত্যন্ত যৌক্তিক এবং আবেগপূর্ণ ভাষায় পুরো বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন চোখের জলের ভেতর দিয়ে তাঁর জন্য ন্যায় বিচার প্রার্থনা করেছেন এবং প্রধান উপদেষ্টাকে তার প্রতি বিমুখ না হবার আবেদন জানিয়েছেন। আপনার এই আবেদন পত্রটি যে পড়বে তারই হৃদয় বিগলিত হবে স্নেহ ও করুণায়। আমি ইতিমধ্যেই আমার অনেক সহকর্মীকে লেখাটি পড়িয়েছি এবং আরো অনেককে পড়াবো আমার বিশ্বাস আপনার এই আবেদন ও প্রার্থনা ব্যর্থ হবে না। আপনার চিরকল্যাণ কামনায়–

সরদার আব্দুস সাত্তার
অধ্যক্ষ
সরকারী মহিলা কলেজ, নারায়ণগঞ্জ
তারিখ ঃ ২-৭-০৭ইং

ফখরুদ্দিনের প্রতি আবেদন, শেখ হাসিনাকে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখ নিও না, সত্য ও ন্যায় ধর্মকে করো না বিমুখ তব প্রাসাদ হতে আমার লেখাটি পড়ে সাহিত্যিক সরদার আব্দুস সাত্তার এ চিঠিটি দিয়েছেন।

www.pathagar.com

নাটোরের ডিসি সদরুদ্দিন কে লেখা চিঠি

৮.১.২০০৩ তারিখ

ভাই সদরুদ্দিন সাহেব–

আমার ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা জানবেন।

আমার নাম আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। জানি না এত দিনে আমার কথা আপনার মনে আছে কি না।

যাক নাটোর জেলার আপনি জেলা প্রশাসক। মহারানী মা ভবানীর পূণ্যভূমি। সেদিক দিয়ে আপনি সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। আমি ব্যক্তিগত ভাবে যা নিয়ে গর্ব করি তার প্রধানতম একটি হলো আমি বুক ফুলিয়ে বলি যে আমার পূর্ব পুরুষেরা মহারানী মা ভবানীর অনুগত প্রজা ছিলেন।

সে অন্যকথা, যে জন্য আজকের এই পত্র আমি আপনাকে লিখছি তা হচ্ছে, নাটোর জেলার খুবজীপুর নামক যায়গায় অধ্যক্ষ এম,এ, হামিদ নামে একজন বৃদ্ধ-জ্ঞান তাপস গত দশ মাস যাবৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। আপনি যদি দয়া করে খুবজীপুরে গিয়ে হামিদ সাহেবের সাথে দেখা করে তার পায়ের ধুলা কপালে নেন তবে জীবনে একটি বড় ধরনের ভালো কাজ করবেন। তারচেয়ে ও বড় ভালো কাজ হবে যদি জেলা প্রশাসনের কল্যাণ তহবিল থেকে ২৫/৩০ হাজার টাকা নিয়ে হামিদ সাহেবের পায়ের কাছে রাখেন। আমি আপনাকে উপরের দুটি কাজ করার জন্য বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি। ঐ দুটি কাজ প্রথমঃ- হামিদ সাহেবের বাড়ি গিয়ে তার পায়ের ধুলা কপালে নেওয়া, হয়তঃ- ২৫/৩০ হাজার টাকা কল্যাণ তহবিল থেকে তার পায়ের কাছে নিয়ে রাখা এই দুইটি কাজ যদি আপনি করেন তবে হামিদ সাহেব সম্পর্কে জানার পরে তার লেখা পড়ার পরে আপনি আজীবন আমাকে শ্রদ্ধা করবেন, আর যদি তা না করেন তবে যখন আপনি হামিদ সাহেব সম্পর্কে জানবেন যখন আজীবন আপনি নিজেকে ধিক্কার দিবেন। আপনার সাথে যতটুকু মিলবার সুযোগ হয়েছে তা থেকে আমার যে ধারনা হয়েছে তার জন্যই আমি একথা লিখলাম।

আপনি একজন জ্ঞান অনুরাগী ভালোমানুষ বলেই আপনাকে জানি। দয়া করে অধ্যক্ষ এম,এ, হামিদ সাহেবের সাথে দেখা করে পায়ের ধুলা কপালে নিবেন এবং ২৫/৩০ হাজার টাকা গুরু দক্ষিণা দিয়ে আসবেন।

এবং প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ বা কল্যাণ তহবিল থেকে যাতে হামিদ সাহেব লাখ পাঁচেক টাকা পায় তার জন্য সক্রিয় ভাবে চেষ্টা করবেন। একাজ করলে সারাজীবন আপনি গর্ব করে চলতে পারবেন।

আপনার শুভ কামনা করি–

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

৩৮৩/২ ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট

ঢাকা -১২০৫।

www.pathagar.com

দেবী প্রসাদ মিশ্রের চিঠি

মান্যবরেষু আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) মহাশয়,
পত্রে প্রথমে আমার নমস্কার নিবেন।

আমার নাম : দেবী প্রসাদ মিশ্র- "পঞ্চরত্ন" এর লেখক শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার মিশ্র হলেন আমার বাবা এবং চুপিগ্রামের শ্রী দীপালোক বন্দোপাধ্যায় হলো আমার ভগ্নিপতি। আপাততঃ এই হলো আমার পরিচয়।

কিছুদিন আগে বাবা একট চিঠি আপনাকে লিখেছে, সেই চিঠি এখনো আপনি পেয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। বাবার চিঠি পেলে অবশ্যই জানাবেন। 'পঞ্চরত্ন' বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের সবাইকে অভিভূত করেছে। আমাদের পরিবার আপনার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী। কোলকাতায় কখনো কোন কাজে এলে অবশ্যই আমাদের বাড়িতে আসবেন।

এবার আমার বিষয়ে আপনাকে দু'চার কথা জানাই। চাকুরি সূত্রে বাড়ি থেকে আমি প্রায় ৩০০ কি. মি. দূরে পঃ বঙ্গ এবং বিহার এই দুই রাজ্যের সীমানা এলাকায় একটি থার্মাল পাওয়ার প্লান্টে কর্মরত। জীবন ধারনের জন্য কর্ম আমি যাই করি না কেন, শখ বলুন বা নেশা বলুন আমার জীবনে একটি জিনিষ- তাহল ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত চর্চা করা। তবলা বাজানো আমার শখ ও নেশা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে যন্ত্র সঙ্গীত (যথা সেতার, সরোদ, সন্তর, গীটার, বেহালা), কণ্ঠ সঙ্গীত (খেয়াল, ঠুংরী, টপ্পা ইত্যাদি) এবং নৃত্য (কত্থক) এর সঙ্গে খুব মুন্সিয়ানার সঙ্গে তবলা বাজাই, যন্ত্র সঙ্গীত কণ্ঠসঙ্গীত এবং নৃত্য :- সঙ্গীতের এই তিনটি বিষয়কে একত্রিত করে আমাদের একটি Musical Troupe আছে-যারা সারা বৎসর দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ধরনের Classical সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে আমরা আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গীত পরিবেশন করবার কোনও সুযোগ পাই নি। আপনার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় বাংলাদেশের আপামর জনগণকে আমাদের সৃষ্টি সঙ্গীত শুনানোর অপেক্ষায় রইলাম। আমার বাড়ির ঠিকানা, টেলিফোন নং এবং ই-মেইল Address দিলাম, অবশ্যই চিঠির উত্তর দিবেন যদিও আমি জানি আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ।

আপনার লেখা "চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র" পড়ে খুব ভাল লাগল। আপনি যে একজন মুক্তিযোদ্ধা তা জানতে পেরে আমি আপনাকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আপনার লেখা ও প্রকাশিত যে কোন বই পড়বার অপেক্ষায় রইলাম। আপনার টেলিফোন নং এবং E-mail Address থাকলে অবশ্যই জানাবেন।

পত্রের দৈর্ঘ্য আর না বাড়িয়ে শেষ করছি-
ইতি
Office Address :
Debi Prasad Mishra (D.P Mishra)
Santaldih Thermal Power Plant
C/O : S/EMech = (M/O)
Dist : Purulia, Pin - 723146
W.B. India.

www.pathagar.com

শিল্পী শিপ্রা আদিত্যের চিঠি

২রা জুন, ১৯৮৫ কলকাতা
ভাই বাবলু
তোমার পত্রিকা মাঝেমাঝে পাই ভালো লাগে।
তারপর এখন নিশ্চয়ই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছো রিলিফ ইত্যাদির ব্যাপারে।

বাংলাদেশ এখন শোকের দিন। প্রতিবেশি দেশ হিসাবে আমরাও কম মর্মাহত নই। আসলে কি জান–শোকের কোন জাতি নেই। শোকের কোন বর্ণ নেই। শোকের কোন ধর্ম নেই। তাই আলাদা করে আর বলতে পারি না আমরা ভাল আছি। পারলে লিখ।

শুভেচ্ছাসহ
শিপ্রাদি

বিঃ দ্রঃ শিপ্রা আদিত্য কলকাতার একজন নাম করা চিত্রশিল্পী। ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে বিরাট অবদান রেখেছেন। ইসমাইল মোহাম্মদ উদয়ন চৌধুরীর মধ্যমে পরিচয় হয়।

www.pathagar.com

শিল্পী ও কবি চন্দনা খানকে লিখিত চিঠি

২৭.০২.২০০৭ ইং

মঙ্গলবার, ঢাকা

দিদি

আমার প্রণাম, নমস্কার ও ভক্তিপূর্ণ শ্রদ্ধা জানবেন। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি ২০০৭, রোববার আপনার সাথে আমার দেখা ও কথা হয় ঢাকায়- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি চত্ত্বরে জাতীয় কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানে। আপনার গান্ধারীকে নিয়ে লেখা কবিতাটির আবৃত্তি শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে আপনার সাথে পরিচিত হবার জন্য আপনার সাথে কথা বলি এবং পরিচিত হই। সেখানে আপনি আমাকে আপনার ঠিকানা দেন যার সূত্র ধরে এই পত্র।

আপনি ১৯শে ফেব্রুয়ারি সোমবার টাংগাইলের মির্জাপুর কুমুদিনী হাসপাতাল দেখতে যান। আপনার কুমুদিনী হাসপাতাল কেমন লাগলো তা আপনার মুখ থেকে শোনার জন্য সোমবার রাত ১০টা পর্যন্ত অপেক্ষা করি কবিতা সম্মেলনের মঞ্চের কাছে প্রবল আগ্রহ নিয়ে। কিন্তু সোমবার রাত দশটা পর্যন্ত আপনাকে সেখানে পাই না। আশা করি মির্জাপুর ভ্রমণ আপনার ভালো লেগেছে। মির্জাপুরে ভারতেশ্বরী হোমস্ (স্কুল কলেজ মেয়েদের) হাসপাতালও সম্প্রতি মেয়েদের মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি মির্জাপুরের হাসপাতালটি দেখে অবাক হয়েছি ১২০০ রোগীর চিকিৎসা হয়। সেখানে তাদের খাবার এবং ঔষধ ফ্রি দেওয়া হয়, কুমুদিনী ট্রাস্ট এই ব্যয় বহন করে। কিন্তু আমি যেটা দেখে অবাক হই তা হচ্ছে এই যে, ১২০০ রোগী, ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী এত লোক এখানে থাকে কিন্তু একটি শব্দ নেই, নীরব নিশ্চুপ। এত বাঙালি এক সাথে থাকে অথচ কোনও শব্দ নেই এটা দেখে আমি অবাক হই। দুর্গাপুজোর বিজয় দশমীর দিনে মির্জাপুরে শহীদ রণদা প্রসাদ সাহার বাড়িতে অতিথিদের জন্য যে নৈশভোজের আয়োজন করা হয় তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অনেক ধরনের মাছ, অনেক ধরনের মাংস, অনেক পদের সবজি, সরু কাটারী ভোগ চাউলের ভাত, খুবই উন্নতমানের দই মিষ্টি। আমি দুবার বিজয় দশমীর নৈশভোজ খাবার সুযোগ পেয়েছি ঐ বাড়িতে। আমি আমার দেখা কুমুদিনী হাসপাতাল ও শ্রদ্ধেয় আর, পি, সাহার বাড়ির কথা বললাম। আপনি কি দেখলেন এবং কেমন লাগলো তা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে, দয়া করে জানাবেন কি ?

১৯৭১ সনে আমার বয়স ছিল ১৮। আমি ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট থেকে সামরিক বা যুদ্ধ বিদ্যার ট্রেনিং নিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডে প্রায় সাত মাস দিনে রাতে সমানে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করি। ৮ মাস ভারতীয় সেনাবাহিনীর রেশন বা নেমক খেয়েছি চরম বিপদের দিনে। আমি ভারতবর্ষের একজন মুগ্ধ ভক্ত। ভারতীয় সেনাদের কথা মনে হলে এখনও আমার ভক্তিতে চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়। আপনার পরিচয় বাংলাদেশের যে শোনে

www.pathagar.com

সেই খুশিতে লাফ দিয়ে উঠে, সবাই বলে আমাদের টাংগাইলের মেয়ে হায়দারাবাদের মুখ্য সচিব। সবাই খুশিতে গদ গদ হয়। আপনি যে একজন বড় আত্মার এবং বড় মাপের মানুষ তার প্রমাণ কবিতা পড়ার জন্য আপনি সেই হায়দারাবাদ থেকে ঢাকায় এসেছেন। আমি আপনার সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক রাখতে একান্ত আগ্রহী। আপনি তো চাকরি করেন একদিন অবসরে যাবেন, একদিন বদলি হয়ে প্রমোশন পেয়ে অন্য কোথাও যেতে পারেন সে জন্য একটি স্থায়ী ফোন নং যদি আমাকে জানান আপনার নিকট কোনও আত্মীয়ের বা আপনার স্থায়ী ঠিকানার, তাহলে বর্তমান ফোন নং বদল হলে সেখানে ফোন করে আপনার ফোন নং সংগ্রহ করে যোগাযোগ করবো।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায় সাহেব, গৌর কিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, দিল্লীতে অবস্থানকারী ভবানী সেন গুপ্ত (চাণক্য সেন) এনাদের সাথে আমার ভালো পরিচয় ছিল বা আছে। দুইজন আর নেই দুইজন আছেন, উনারা আমাকে বেশ স্নেহ করেন বা করতেন। আমি মহাভারতের একজন ভক্ত পাঠক। মহাভারত আমার সবচেয়ে প্রিয় বই, সব সময় মহাভারত এবং গীতা পড়ার চেষ্টা করি। মহাভারতের একমাত্র শিক্ষা ন্যায় এবং সত্যের জয়। অন্যায় এবং অসত্যের পরাজয়। জোর করে কিছুই লাভ করা যায় না, ভক্তিতে ও ভালোবাসার মাধ্যমে সব কিছু পাওয়া যায়। সেই মহাভারতের গান্ধারীকে নিয়ে আপনার কবিতা শুনে সত্যিই আমি অভিভূত হয়েছি। রবীন্দ্রনাথের গান্ধারীর আবেদন কবিতাটিও খুবই উন্নতমানের। আমার তো মনে হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা গান্ধারীর আবেদন।

যাক অনেক কথা লিখলাম। জানি না নিজের অজান্তে কোনও বিরক্তিকর বা অবান্তর কথা লিখলাম কিনা। আপনি যদি আপনার বিশাল হৃদয়ের মাঝে আমাকে একটু মনে রাখেন আমি খুশি হবো। বাংলাদেশে আসবার জন্য আপনাকে আবার আমন্ত্রণ জানাই। প্রণাম ও নমস্কারসহ।

আপনার একান্ত অনুরাগী ও একজন ভাই
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
ফ্লাট নং এফ, এ/১২ (১৩ তলা)
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

শিল্পী ও কবি চন্দনা খানের লিখিত চিঠি

৭২, জুবুলিহীল রোড,
হায়দারাবাদ ২০০৭

প্রিয় বাবলু

বেশ অনেকদিন আগেই তোমার চিঠি পেয়েছি, কিন্তু নানা কাজে ব্যস্ততার জন্য তোমাকে চিঠি দেওয়া হয়ে ওঠে নি। তোমার আন্তরিক চিঠি পেয়ে আমার খুবই ভালো লেগেছে।

মির্জাপুরে গিয়ে মনে হয়েছিল যেন Time Machine-এ আমার সেই ছোটবেলার মির্জাপুরেই ফিরে গেছি। কিছুই বদলায় নি, সময় যেন সেখানে থেমে আছে। কলোনীর বাইরে অবশ্য দোকানপাট প্রচুর, আর লৌহজং নদী প্রায় শুকিয়ে গেছে। সত্যি, আমিও তোমার মতো আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেছি এত লোকজন এখানে কাজ করছে, এত রোগী, অথচ কি অদ্ভুত শান্তি এখানে, কি চমৎকার নৈঃশব্দ। মনের কোণে মির্জাপুর চিরদিনের জন্য ধরা রইলো।

বর্তমানে হায়দ্রাবাদের একটি বড়ো সরকারী গ্যালারিতে আমার ও আরও ছয়জন বাঙালি শিল্পীর ছবির প্রদর্শনী চলছে। আমার সাতখানা ক্যানভাস আছে সেখানে। তাই নিয়ে কিছুটা ব্যস্ত ছিলাম।

কখনো আমার বাড়ির ঠিকানা পরিবর্তন হলে জানাবো। তবে সম্ভবত হায়দ্রাবাদে যে ঠিকানায় চিঠি পাঠিয়েছ সেই ঠিকানাতেই থাকবো। তাছাড়া আমার বাড়ির ফোন নম্বরও letter head এর ওপরে আছে।

ভালো থেকো। যোগাযোগ রেখো। বাংলাদেশে আবার কখনো গেলে দেখা হবে।

–চন্দনাদি।

www.pathagar.com

সিমিন হোসেন রিমিকে লেখা চিঠি

২১/২/১৯৯৪ তারিখে

রিমি–

আমার শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানবে। তোমার বই "আমার বাবার কথা" দেখলাম ও পড়লাম। বইটি দেখে ও পড়ে আনন্দ ও দুঃখ পেলাম। আনন্দ পেলাম এই জন্য যে– সন্তানের মা যেমন জানে এটি কার সন্তান তেমনি আর কেউ না জানলেও আমি সন্তানের মায়ের মতো জানি যে– আমার বাবার কথা বইয়ের লেখিকা কোন পত্রিকার মাধ্যমে কার মাধ্যমে সৃষ্ট হয়েছে, কার সে সৌভাগ্য হয়েছে এই লেখিকাকে আবিস্কার করার, আমার আবিস্কৃত লেখিকার এমন একটি চমৎকার বই বের হলো, এটা খুবই খুশির ও আনন্দের বিষয় আমার জন্য। বইটি অত্যন্ত সুলিখিত, ভাষার একটি নিজস্ব ছন্দ বা প্রাণ আছে। সরদার ফজলুল করিম সাহেবের ভাষায় বলতে চাই "রিমির লেখা পড়ে রিমির বুকের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যায়।" বইয়ের বক্তব্য পাঠক পাঠিকাদের হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। প্রোডাকশন অতি সুন্দর। প্রচ্ছদ দেখতে প্রথমে যদিও তেমন সুন্দর দেখায় না, কিন্তু একটু বুঝিয়ে দিলেই অসাধারণ সুন্দর এবং আনন্দ লাগে তাজউদ্দিন সাহেবের আবক্ষ মূর্তি, অটল ব্যক্তিত্ব। সর্বোপরি বইটা খুবই চমৎকার এবং খুব চলছে সাথে সাথে প্রশংসা পাচ্ছে। এ বই প্রকাশের জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো।

বইটা দেখে দুঃখ পেলাম এই জন্য যে– প্রায় ৯৪ পৃষ্ঠার বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠার মতো বইয়ের লেখা সাপ্তাহিক পরিবর্তনে ছাপা হয়েছিল আর এই লেখাগুলোও কার আহবানে, কার উৎসাহে তুমি লিখেছো তা তুমিই সবচেয়ে ভালো জানো।

আমার বাবার কথা বইতে ৭২ সন থেকে ৭৫ এর ৫ই নভেম্বর পর্যন্ত সময়ের লেখা তাজউদ্দিন সাহেবের সম্পর্কে ৮টি বক্তব্য বা তথ্য রয়েছে যা আমার কাছ থেকে তুমি পেয়েছো তা মনে হয় তুমি অস্বীকার করবে না। এই ৮টি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের কয়েকটি আবার তুমি তাজউদ্দিন সাহেবের ভাষায় প্রকাশ না করে তোমার ভাষা ও ভাব দিয়ে লিখেছো, যা আমার ভালো লাগে নাই। এ নিয়েও আমার কিছু দুঃখ মনে করা ছাড়া আর কিছু বলার নেই। আমার দুঃখ আপত্তি ও বলার বিষয় হচ্ছে এই যে– আমার বাবার কথা বইয়ের ভূমিকায় লেখা রয়েছে "এই লেখার অংশ বিশেষ ৮৯তে আমি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় কয়েক মাস লিখেছিলাম।" এখানে পরিবর্তনের নামটি উল্লেখ না করা এবং অংশ বিশেষ বলা, ৯৪ পৃষ্ঠার বইয়ের ৭০ পৃষ্ঠার মতো লেখা যে পত্রিকার ছাপা হলো সেই পত্রিকার নাম উল্লেখ না করা এবং ৭০ পৃষ্ঠাকে অংশবিশেষ বলে উল্লেখ করা কি খুব শালীন কাজ বলা যায়? সবচেয়ে বেশি দুঃখ পেলাম এমন একটি কাজ তোমার মতো একজন নারী বা মেয়ের দ্বারা হলো যে শ্রদ্ধেয় নেতা বা ব্যক্তিত্ব জনাব তাজউদ্দিন আহমদের কন্যা এবং যার নাম রিমি।

www.pathagar.com

তুমি হয়তো যুক্তি দেখাবে লেখিকার পরিচয়ের সাথে পত্রিকার নামের সাথে পরিবর্তনের নামতো রয়েছে। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে– এটা শাক দিয়ে মাছ ঢাকা বা ত্রুটিপূর্ণ কাজ করে তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেবার মতো ঘটনা। কেননা সেখানে লেখা রয়েছে যেসব পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয় তাদের নাম, এই লেখাগুলো পরিবর্তনে ছাপা হয়েছে সেখানে এমন ভাবে কিছু লেখা নাই। ওটা ছাপা হয়েছে লেখিকার বিজ্ঞাপন বা ক্রেডিট হিসেবে। কাজেই ঐ যুক্তি মনে হয় সঠিক নয়।

পরিবর্তনে শ্রদ্ধেয় অন্নদা শঙ্কর রায়, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শওকাত ওসমানের মতো আকাশের মতো উঁচু স্তরের লেখকরা লেখা প্রকাশ করে, সে লেখা বইতে স্থান দিয়ে ছেপেছেন, বইতে লেখার শেষে বা বইয়ের ভূমিকায় পরিবর্তনের নাম উল্লেখ করেছেন। বিষয়টি তোমাকে জানিয়ে রাখলাম এতে তাঁদের চরিত্রের, মহত্ব বা উদারতাই প্রকাশ পেয়েছে। তোমাকে আমি একজন বুদ্ধিমতী রুচিশীল মেয়ে হিসেবে জেনে আসছি সেই ১৯৭৫ সনের ৪ঠা নভেম্বর রাত থেকে (এর আগেও তোমাদের বাসায় তোমাকে দেখেছি কিন্তু কথা হয় নাই প্রথম কথা তুমিই শুরু করেছো) আর সেই তুমি এমন একটি কাজ করলে যা দেখে দুঃখ পেলাম। যাই হোক তুমি যা করেছো তার জন্য আমার পরিচিত ঢাকা শহরের বেশ কিছু লোকের কাছ থেকে আমাকে কথা শুনতে হচ্ছে এবং তোমাকে গালাগালি দিচ্ছে অকৃতজ্ঞ হিসেবে যা আমার এবং তোমার জন্য মোটেই কাম্য নয়। যদিও এদের সংখ্যা খুবই কম তবে এরা সাংবাদিক, কবি, সাহিত্যিক সরকারি কর্মকর্তা অধ্যাপক যারা পরিবর্তন পড়েছে এবং তোমার বইটি দেখেছে বা পড়েছে।

এ বই প্রকাশ হবার পরেই জানতে পারলাম আমার এবং পরিবর্তনের প্রতি তোমার ধারণা কি। এতদিন মুখে বলছিলে যে না আমাকে তুমি আগের মতোই জানো এবং সে চোখেই দেখ, কিন্তু আচরণে ভিন্নতা প্রকাশ পাচ্ছিলো- জিজ্ঞেস করায় তুমি বলতে আমি নাকি উল্টা বুঝি। তবে তোমার আমার প্রতি এই পরিবর্তন হবার কারণ কি আমার দোষ কি তা লিখিতভাবে বা মৌখিকভাবে আমাকে গত দুইবছরে জানালে না। জানালে ভালো হতো। পালিয়ে যায় চোর ও ভীতুরা, তুমিতো ভীতু চরিত্রের মেয়ে নও, তোমার যথেষ্ট সাহস আছে বলেই আমি জানি।

আমার বিশ্বাস তুমি একজন সুবিবেচক মেয়ে, তোমার বর্তমান আচরণ নেহাত মান অভিমানজনিত। তুমি পরিবর্তন এবং আমার প্রতি যা করছো তা করার মতো মেয়ে তুমি নও। এটা কখনো বিশ্বাস করা আমার জন্য কষ্টকর। এখন তোমার দায়িত্ব তুমি কি তা প্রমাণ করার।

যাই হোক আমি তোমার সাথে কোনও সংঘাতে যেতে চাই না, লোক চক্ষুর নিকট তোমাকে ছোট করতে চাই না, তোমার নাম ডাক যশ প্রভাব প্রতিপত্তি চাই। আমি মনে করি সমানভাবে তুমিও আমার মঙ্গল এবং শুভকামনা করো। আমি সজ্ঞানে কোনোদিন তোমাকে কোনও অবস্থাতেই বিব্রত কর অবস্থায় ফেলতে চাই নাই। এরমধ্যে কোনও খাত নেই– আমি অতীতে তোমাকে বহুবার বলেছি এখনও বলছি- আমার সাথে যে আন্তরিকতার সাথে ভালো ব্যবহারকরে তাকেই আমার ভালো লাগে– যে অবজ্ঞা করে যে কৃত্রিম ব্যবহার করে তাকে আমি ঘৃণা করি।

www.pathagar.com

তোমার ছাত্রী জীবনে তুমি খুব সিংহের ভক্ত ছিলে, তা কি তোমার মনে আছে? আমি সেই সময়ে প্রচুর সিংহের ছবি তোমাকে উপহার দিয়েছি, যেখানেই সিংহের ছবি দেখতাম সেখান থেকেই সে ছবি নিয়ে এসে তা তোমাকে পৌঁছে দিতাম। প্রাণী জগতের রাজা এবং রাণী হচ্ছে সিংহ। সিংহের চরিত্রের অন্যতম গুণ উদারতা বা মহত্ত্ব। কাজেই সিংহের মতো ব্যবহার তোমার কাছ থেকে সবসময় স্বাভাবিক ভাবেই আশা করি, এর ব্যত্যয় দেখলেই খুব খারাপ লাগে।

অহংকার, ক্রোধ মানুষকে সর্বশান্ত করে দেয়, প্রতিটি মানুষের অহংকার ও ক্রোধ ত্যাগ করা উচিৎ একথাটি সবার মনে রাখা দরকার।

স্বদেশ রায়ও পরিবর্তনের সৃষ্টি। জগন্নাথ কলেজে বি,কম, পড়ার সময় ৮৫/৮৬ সালে প্রথম তার লেখা পরিবর্তনে ছাপা হয়। স্বদেশ ভালো ছেলে। তবে সেই সময়ে সে বাকশাল সমর্থিত রাজনীতি করতো। সাংবাদিক পেশায় তার স্থান পাবার পিছনে সাপ্তাহিক পরিবর্তনের বেশ অবদান রয়েছ। স্বদেশের মাধ্যমে তোমার বই বের হলো এটাও পরিবর্তনের ক্রেডিট। তোমার নাম রিমি-তুমি তাজউদ্দিন সাহেবের কন্যা তুমি কেন অতীতকে ভুলে যাবে?

আর হ্যাঁ 'আমার বাবার কথা' বইয়ের প্রথম থেকে এক বিরাট অংশ কলকাতা পৌঁছানো এবং সেখানে অবস্থানকালীন অনেক তথ্যই তোমার মা সৈয়দা জহুরা তাজউদ্দিন সাহেবার লেখা উদয়ের পথে নামক দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত লেখা থেকে নেওয়া হয়েছে। অন্যের লেখা নিজের নামে চালানো কিন্তু খুব বড় ধরণের একটি চুরি ও অনৈতিক কাজ।

তোমার শুভ কামনা করে

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

২১/২/১৯৯৪

www.pathagar.com

শারমিন আহমদ রিপিকে লেখা চিঠি : ১৯৯৪ সনে

রিপি–

আমার শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানবে। অনেক দিন পর তোমাকে চিঠি লিখছি। সেই ১৯৯১ সনের জুলাই মাসে তোমার সাথে শেষ দেখা, তোমার তোমাদের বাসা বাড়ি থেকে চলে যাবার দৃশ্য এখনও চোখে দেখতে পাচ্ছি। তোমার কথা প্রায়ই মনে পড়ে কিন্তু তুমি তো অনেক দূরে থাকো। তাই তোমাদের যোগাযোগ রক্ষা করা তো আমাদের মতো মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর, তা তো সহজেই বুঝতে পারো।

অনেকদিন পর পরিবর্তন আবার বের হচ্ছে। একটি সংখ্যা পাঠিয়ে দিলাম, এ সংখ্যায় সুমির আটলান্টিকের পাড়ে নামে একটি লেখা ছাপা হয়েছে যা তোমাকে বা তোমাদের নিয়ে লেখা।

রিপি, পরিবর্তনের সাথে আমার কিছু প্রকাশিত লেখার ফটোকপি পাঠালাম তুমি কি আমার লেখাগুলো পড়ে দেখে তোমার মনের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি চিঠি লিখে জানাবে? তোমার কি আমাদের মতো ক্ষুদ্র মানুষের লেখা পড়ার সময় হবে? তুমি তো অনেক বড় বড় লেখকের লেখা পড়া নিয়ে এবং মানব সমস্যার বিরাট বিরাট বিষয় সমাধান দিয়েই ব্যস্ত থাকো। তাই ভয় হচ্ছে এত কষ্ট করে ফটো কপি করে লেখাগুলো পাঠালাম যদি তুমি না পড়, তবে আমার বিশ্বাস তুমি যত ব্যস্তই থাকো মনে হয় আমার লেখা তুমি পড়বে এবং চিঠি দিয়ে তোমার মনের প্রতিক্রিয়া জানাবে।

লেখাগুলো পাঠাতে অনেক দেরি হলো কেননা আমার ধারণা ছিল এ লেখাগুলো হয়তো তোমাদের বাসা থেকে কেউ তোমাকে পাঠাবে, কেননা লেখাগুলোতে তোমার বাবার প্রসঙ্গ রয়েছে। কিন্তু আসলে আমার ধারণা ভুল ছিল, যার জন্য দেরি হলো।

তোমাকে আমার লেখার ফটোকপি ও চিঠি লিখবার সময় রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে' কবিতাটির কথা বারবার মনে পড়ছে, সাধারণ মেয়ে কবিতায় মালতি যেমন শরৎচন্দ্রের নিকট আবেদন জানায় 'শরৎ বাবু তুমিতো অনেক বড় লেখক তোমার হাতের কলম দিয়ে অনেক বড়বড় লোকের বড়বড় বিষয়ের চরিত্র ফুটে উঠে, কিন্তু আমার মতো মালতি নামের একজন সাধারণ বাঙালি মেয়ের দুঃখ কষ্টের কথা কি তোমার হাতের কলম দিয়ে লিখবে? দোহাই শরৎ বাবু, তুমি এই সাধারণ মালতির কথা একটু লিখো'। ইত্যাদি। তেমনি রিপি, মালতির যেমন শরৎচন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তার কলমের স্থান পাবার জন্য আমিও তেমনি তোমার কাছে আবেদন জানাই আমাদের মতো বাবলু ভাইদের কথা একটু আধটু তোমার মনের বা হৃদয়ের এককোণে এক বিন্দু পরিমাণ হলেও স্থান দিও। এই আমার মিনতি। পরিবর্তন পড়ে এবং আমার লেখাগুলা পড়ে কেমন লাগলো সব জানিয়ে চিঠি দিবে এবং পরিবর্তনের জন্য অবশ্যই লেখা পাঠাবে। রিমিতো এখন অনেক বড় প্রতিষ্ঠিত লেখিকা হয়ে গিয়েছে,

www.pathagar.com

ওর লেখা বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর দৈনিক পত্রিকায় গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়, কাজেই মনে হয় পরিবর্তনের মতো ছোট পত্রিকায় ওর আর লিখবার সময় হবে না। ওয়াশিং টনে তোমার বাসায় গিয়ে থাকার জন্য খুব ইচ্ছা জাগে মাঝে মধ্যে, কিন্তু সে সাধ কি পূর্ণ হবে? অজিত কেমন আছে? ওকে আমার ভালোবাসা জানাবে। তোমাদের সবার মঙ্গল কামনা করি। আমার জন্য দোয়া করিও।

তোমার শুভ কামনা করে

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

চিঠিটির মধ্যে কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে Sataire রয়েছে। পাঠক/পাঠিকার সে বিষয়টি বিবেচনায় রাখবেন বলে আশাকরি।

–লেখক

শারমিন আহমদ রিপি- তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে, মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রে বসবাস করে।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অভিমত, প্রতিবাদ ও দাবী

১।	বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধনী ও সংযোজনীর প্রয়োজন প্রসঙ্গে	২৯৯
২।	বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সৈয়দ সামসুল হকের কথা :- দুটি প্রতিবাদ	৩০১
৩।	প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা	৩০৪
৪।	তাজউদ্দিন আহমেদ, দৈনিক সংবাদ একটি ভিন্নমত	৩০৬
৫।	প্রসঙ্গে রেসকোর্স ময়দান ঃ	৩১০
৬।	বি.টি.ভি'তে প্রচারিত বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে	৩১৩
৭।	হাবিবুল আওয়ালকে আইন সচিব নিয়োগ সরকারের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত	৩১৩
৮।	রবিউল আলম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর উপর কয়েকজন দুস্কৃতিকারী পুলিশের এ বর্বর আচরণের বিচার চাই	৩১৫
৯।	রমনা পার্ক, সারোওয়ার্দী ময়দান, স্বাধীনতার স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ এবং এ বিষয়ে দু'একটি কথা।	৩১৮
১০।	কামারখন্দ থানার প্রিয়-ভাই ও বোনেরা	৩২০
১১।	বিষয় : আর্মি গলফ ক্লাবে (নিকুঞ্জ) মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেনাবাহিনীর সদস্য বা সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ফিতে মেম্বারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদন।	৩২২
১২।	বিষয় রমনা (সারোওয়ার্দী) ময়দানে একজন গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সহকারী প্রকৌশলীকে পোস্টিং দেবার জন্য আবেদন।	৩২৪
১৩।	১৯৯৫ সনে বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট	৩২৬
১৪।	ভারত সরকার ও ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের কাছে আবেদন : বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান এবং বার্মার নাগরিকদের মধ্যে অবাধ চলাফেরা ও পণ্যদ্রব্য বিক্রির সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার	৩২৮
১৫।	বাংলাদেশের কোন মহিলা বা নারীকে ৩টি সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার না করার আইন করার জন্য আবেদন	৩৩৫

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধন ও সংযোজন প্রয়োজন প্রসঙ্গে

বাংলাদেশের সত্যিকারের গণতন্ত্র বা প্রধানমন্ত্রীর ডিকটেটরমুক্ত শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০, ৭২, ও ৮০ ধারার সংশোধনীগুলো বাতিল করে ১৯৭৫ সনের আগে ১৯৭২ সনের সংবিধানে যা ছিল তা বহাল করা জরুরি প্রয়োজন।

সংবিধানে ৭০, ৭২ ও ৮০ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশকে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পতিতে ও রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর চাকরে পরিণত করা হয়েছে।

সংবিধানের ৭০ ধারা সম্পূর্ণ বাতিল করা যাবে না। ৭০ ধারা সম্পূর্ণ বাতিল করলে নেপালের মত ১২ বছরে ১৪টি সরকার বা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন। কাজেই শুধু ৭০ ধারার সংশোধন বাতিল করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য সংবিধানের ৪৮(১) ধারা সংশোধনী করে শুধুমাত্র সংসদ সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না করে- সংসদ সদস্য, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে এবং রাষ্ট্রকে যারা প্রতিবছর কমপক্ষে পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করেন তাদের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে।

শুধুমাত্র উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সদস্যদের নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করলে পাকিস্তান আমলের আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রীদের মতো টাকা খেয়ে ভোট দেবার সম্ভাবনা থাকবে। এটা বন্ধ করার জন্য ভারসাম্য হিসাবে রাষ্ট্রকে যারা পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করেন তাদের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোটার করা দরকার।

সমস্ত জনগণের বা রাষ্ট্রের সমস্ত ভোটারদের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপ্রতি নির্বাচন করা উচিত হবে না। কারণ, এতে রাষ্ট্রের বিপুল অর্থ খরচ হয় এবং সত্যিকারের প্রতিযোগিতা হয় না। যে দল ক্ষমতায় থাকবে সেই দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা কঠিনতম ব্যাপার।

কাজেই উপরে বর্ণিতভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করলে প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত ও গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী হবে।

বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানের'৫২/১ ধারায় রয়েছে কোনও ব্যক্তি ১০ বছর মেয়াদের বেশি সময় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি থাকতে পারবেন না।

অনুরূপভাবে আমাদের সংবিধানে ৫৭(৩) ধারা নামক একটি নতুন ধারা করতে হবে যে বাংলাদেশের কোনও নাগরিক ১০ বছর মেয়াদের বেশি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন কতে পারবেন না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্পিকার নির্বাচনের জন্য সংবিধানে একটি নতুন ধারা সংযোজন করতে হবে এইভাবে যে, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনে সংখ্যারিগষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রী সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতে পাঁচজন সদস্যের নাম স্পিকার হিসেবে প্রার্থীর জন্য প্রস্তাব করবেন, প্রস্তাবিত এই পাঁচজনের মধ্য হতে বিরোধী দলের নেতানেত্রী যার নাম সমর্থন করবেন তিনিই জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসাবে নির্বাচিত হবেন। একই ভাবে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

বাংলাদেশের সংবিধানের উপরের বর্ণিত বিষয়গুলো বাস্তবে রূপ দেবার মধ্যেই সত্যিকারভাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পেতে পারে।

আওয়ামী লীগ ও বিএনপির গঠনতন্ত্র দ্বারা বাংলাদেশ পরিচালিত হয় না। বাংলাদেশ পরিচালিত হয় বাংলাদেশের সংবিধান দ্বারা। কাজেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সংবিধানের '৭০, '৮২ ও '৮০ ধারার সংশোধনীগুলো বাতিল করতে হবে। ৪৮/১ ধারা সংশোধনী করে শক্তিশালী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করতে হবে।

দশ বছর সময়ের বেশি কেউ রাষ্ট্রপতির মতো প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না, তার জন্য সংবিধানের ৫৭/৩ ধারায় বিধান করতে হবে।

নিরপেক্ষ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচনের জন্য উপরে বর্ণিতভাবে সংবিধানে নতুন বিধান করতে হবে। উলেখিত বিষয়গুলো বাস্তবে রূপ দেবার জন্য সচেতন দেশপ্রেমিক ভাইবোনদের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত নিবেদন

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা, লেখক, রাজনৈতিক সংগঠক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র,
১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক।
৩৮২/২, ফ্রী স্কুল স্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা।
তারিখ ঃ ২০/০৯/২০০২ ইং

বিঃ দ্রঃ উপরের লেখাটি ২০/০৯/২০০২ তারিখে লিখে লিফলেট হিসেবে বিতরণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সৈয়দ সামসুল হকের কথা : দুটি প্রতিবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যায় সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সৈয়দ সামসুল হক এবং হুমায়ুন আহমদের দীর্ঘ কথোপকথন পড়ে বেশ ভালো লেগেছে। শাহাদত চৌধুরী, শাহরিয়ার কবীর, মইনুল ইসলাম সাবেরকে অনেক ধন্যবাদ। এমন সুন্দর একটি বিষয় আমাদের উপহার দেবার জন্য।

কিন্তু ঐ কথোপকথনে বা আলোচনায় সৈয়দ শামসুল হকের দুইটি মন্তব্যে আমি বেশ আশাহত এবং ব্যথিত হয়েছি। আমি সৈয়দ সামসুল হকের ঐ বক্তব্য দুটির প্রতিবাদ জানাই। সৈয়দ সামসুল হক একজন উঁচু দরের সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব, তার মুখ থেকে কোন বিতর্কিত এবং ১৯৭১ সনে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে তা নিয়ে বিরূপ মন্তব্য শুনলে প্রাণে ব্যথা লাগে। ঐ কথোপকথনে সৈয়দ হক ভারতে না গিয়ে লণ্ডনে কেন গিয়েছেন তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে আমার মত যারা ভারতে গিয়েছে এবং মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট থেকে ট্রেনিং নিয়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে তাদের কাছে। আমি মনে করি সৈয়দ হক ঐ সময়ে ভারতে না গিয়ে লন্ডনে গিয়েছেন দুটি কারণে, প্রথমতঃ- লণ্ডনে যাওয়া সৈয়দ হকদের মত ব্যক্তিদের জন্য সহজ ছিল, সে তুলনায় ভারত যাওয়া ছিল অনেক কঠিন কাজ। ভারতে যেতে তখন কয়েক দিন পায়ে হেঁটে, অথবা নৌকাযোগে যেতে হতো খুবই কষ্ট করে এবং জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। যে তুলনায় পয়সা থাকলে লণ্ডন যাওয়া বেশ সোজা ছিল। দ্বিতীয় কারণ আমার মনে হয় সৈয়দ হক মনে করেছিলেন লণ্ডন গিয়ে বি,বি,সিতে কাজ করে মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করা যাবে এ বোধ থেকে।

আমার বিশ্বাস ঐ দুই কারণে সৈয়দ হক ভারতে না গিয়ে বিলেতে গিয়েছিলেন এবং এটা সৈয়দ হকের সঠিক সিদ্ধান্তই ছিল, কেননা '৭১ সনে বি,বি,সিতে উনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অনেক কাজ করেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধেও পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কোন কোন বাঙালীর মত কাজ করতে অতি সহজেই পারতেন, তা তিনি করেন নাই, তার জন্য আমরা তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের বিশ বছর পরে দেশ যখন নানা রাজনৈতিক ঘূর্ণিপাকে পতিত হয়ে ৭১ সনের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন নূতন প্রজন্মের অনেক তরুণ-তরুনীর চেতনায় অস্পষ্ট এবং নূতন প্রজন্মের অনেক তরুণ-তরুণী স্বাধীনতা যুদ্ধকে হেয় করে বক্তব্য দেয় (বি,এন,পি সমর্থক ছাত্রদলে এদের সংখ্যা অনেক) স্বাধীনতা যুদ্ধের পরাজিত শত্রুরা তৎপর, এই নূতন দুঃসময়ে যদি সৈয়দ হক এর মত একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং দায়িত্বশীল মানুষ বলেন যে- "ভারতে

www.pathagar.com

গিয়ে দ্রুত দেশ স্বাধীন করাটা আমার কাছে কর্তব্য বলে মনে হয়নি" তখন এটা যে কত বড় একটা ভয়ংকর অন্যায় কথা তিনি বলেছেন তা মনে হয় সৈয়দ সামসুল হক সাহেব চিন্তা করে দেখেন নাই। সৈয়দ হক সাহেবের কথা যদি ঠিক হয়– তা হলে আমি নিজে এবং আমার মত ৮০ হাজার তরুণ বা কিশোর কি ভুল করেছি ১৯৭১ সনে ভারতে গিয়ে মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে যুদ্ধ করে তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মুনসুর আলী, কামরুজ্জামান, মওলানা ভাসানী, মনি সিংহ ওসমানী সাহেবরা ভুল করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন করে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে? না কেউ ভুল করেন নাই এবং করি নাই। ঐ সময়ে ঐ পরিস্থিতিতে এছাড়া আর কোন উপায় ছিল না মাতৃভূমিকে রক্ষা করার। কবির কল্পনা দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেখা এক জিনিস আর কঠিন বাস্তবতা অন্য জিনিস। সৈয়দ সামসুল হক সাহেবের এ কল্পনামূলক বক্তব্য স্বাধীনতা যুদ্ধের শত্রুদের উৎসাহিত এবং তাদের বক্তব্যকে জোড়ালো করবে তা কি সৈয়দ হক সাহেব একবারও চিন্তা করে দেখলেন না? বিশেষ করে মাওবাদী নামে এদেশে যারা রাজনীতি করে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে ছিল, তারা '৭১ সনে চীনের সাথে তাল মিলিয়ে বলতো– "৭১ এর মুক্তিযুদ্ধ দুই কুকুরের যুদ্ধ" "মুজিব-ইয়াহিয়ার যুদ্ধ" সাথে সাথে তারা কিন্তু তাদের ভাষায় এক কুকুর ইয়াহিয়াকে বিপুলভাবে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছে অপর পক্ষকে নিধন করার জন্য। মাওবাদী এবং রাজাকারদের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সৈয়দ হকের কথা বলার জন্য খুবই দুঃখ পেয়েছি, যেহেতু আমি নিজে একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য, যেহেতু দেশ আজ নূতন দুঃসময়ে পতিত আমাদের নূতন প্রজন্ম মিথ্যাপ্রচারে বিভ্রান্ত, যেহেতু সৈয়দ হক নিজে একজন মুক্তিযুদ্ধের কর্মী এবং তিনি আমাদের দেশের একজন অন্যতম প্রধান লেখক সেজন্য।

সৈয়দ হক যদি আমার প্রতিক্রিয়া দেখে বলেন– ভারতে গিয়ে তাদের সাহায্য নেবার জন্যই দেশ আজ নূতন দুঃসময়ে নিপতিত, তবে তা হবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত এবং তার জন্য বক্তব্য দেবার জন্য প্রস্তুত রইলাম।

সৈয়দ হকের অপর যে মন্তব্যে ব্যথিত হয়েছি তা হচ্ছে– "আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই নিয়ে সূর্যদীঘল বাড়ির মতোই ঘটনা ঘটেছে। যারা এটির প্রশংসা করেন আমি সন্দেহ করি তারা ক'জন এই বইটি পড়েছেন।" আমি সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক-সাহিত্য সমালোচক নই- আমি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের চিলেকোঠার সেপাই এক নিঃশ্বাসে পড়ে শেষ করেছি, এটা আমার কাছে একটি যথেষ্ট ভালো বই বলে মনে হয়েছে। যদিও এ বইয়ের রাজনৈতিক বক্তব্যের সাথে আমি এক মত নই, কেননা আমি ছাত্রলীগের সাবেক কর্মী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন সাহেব আমার নেতা, মার্কসবাদের কোন মোহ কোন কালে আমার ছিল না। মওলানা ভাসানীর দলে আমি ছিলাম না। কাজেই চিলেকোঠার সেপাই এর রাজনৈতিক মতামতের সাথে আমার দ্বিমত থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু এটা একটি সুলিখিত সুন্দর উপন্যাস এটা পড়ে আমার তা মনে হয়েছে- খুবই শক্তিশালী উপন্যাস– তাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। ১৯৬৯ সনের গণআন্দোলনের যে নিখুঁত চিত্র এই উপন্যাসে লেখক

www.pathagar.com

একেছেন তা দেখে মুগ্ধ হতে হয়। কাজেই সৈয়দ হকের সন্দেহ দূর করার জন্য আমি বলছি অন্ততঃ একজন পাঠক আমি আছি– যে চিলেকোঠার সেপাই পড়েছি এবং পড়েই এটার প্রশংসা করি।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা 'অপঘাত' নামে একটি ছোট গল্প পড়ে যেভাবে চোখের জল পড়েছে শরৎচন্দ্র ছাড়া এত চোখের জল আর কোন লেখকের লেখা পড়ে ঝরেছে কিনা স্মরণ করতে পারছি না। সৈয়দ হকের তো বটেই আমার মনেহয় সৈয়দ হকের যদি ১০০টি বই বেরিয়ে থাকে তবে আমি মনে হয় কমপক্ষে ৮০টি পড়েছি কিন্তু কোন লেখা পড়ে কেঁদেছি বলে মনে হয় না- তবে বেশ হেসেছি, প্রাণ ভরে হেসেছি এটা সহজেই স্মরণ করতে পারছি। কাজেই আমার ধারণা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস একজন শক্তিশালী এবং বড় মাপের লেখক। তাঁর চিলেকোঠার সেপাই কেউ না পড়ে প্রশংসা করে– সৈয়দ সামসুল হকের এ ধারণা ঠিক নয়। লক্ষ লক্ষ লোক নিশ্চয়ই চিলেকোঠার সেপাইয়ের প্রশংসা করে না, কয়েকশত লোক করে, কয়েকশত লোক নিশ্চয়ই চিলেকোঠার সেপাই পড়েই প্রশংসা করেন। মুক্তিযুদ্ধ ও চিলেকোঠার সেপাই সম্পর্কে সৈয়দ সামসুল হকের মন্তব্য পড়ে দুঃখ পেলাম আমি এর প্রতিবাদ জানাই।

বিঃ দ্রঃ- এই লেখাটি লিখবার জন্য প্রয়াত সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভাই আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, লেখাটি লিখবার পরে বলেছিলেন- "ভাই বাবলু তুমি ছাড়া এরকম একটি লেখা লেখবার মত আর কোন লোক ঢাকা শহরে আছে বলে আমার মনে হয় না।"

১৬/২/১৯৯২

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা

২২শে মে আজকের কাগজে প্রকাশিত "মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা" নামক লেখাটি পড়ে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে সে প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা না করলে আজকের কাগজের পাঠকদের প্রতি এবং নিজের বিবেকের প্রতি অন্যায় করা হবে।

এম এ মোহাইমেনের পরিচয় লেখা হয়েছে "প্রাক্তন সংসদ সদস্য।' তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ দল থেকে মনোনয়ন পেয়ে এমপিএ হয়েছিলেন। সে সুবাদে পরবর্তীকালে এমসিএ বা গণপরিষদ সদস্য ছিলেন। কাজেই মোহাইমেন সাহেব সাবেক সংসদ সদস্য কিভাবে হলেন বুঝতে পারছি না। উল্লেখ্য ১৯৭০ সনে তিন শত জন এমপিএ ১৬৯ জন এমএনএ পদে মোট ৪৬৯ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী দলীয় মনোনয়ন পেয়েছিলেন, এর মধ্যে একজন মোহাইমেন সাহেব ছিলেন। এ কথা সত্য যে, মোহাইমেন সাহেবের সঙ্গে তাজউদ্দিন সাহেবের বেশ ভালো পরিচিতি ও ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। মোহাইমেন সাহেব একজন সফল ব্যবসায়ী। অর্থ ও ধন উপার্জনই তার একমাত্র পবিত্র ব্রত বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে তিনি ভোল পাল্টিয়ে তার স্বধর্ম পালন করা শুরু করেন। যার জন্যে স্বাভাবিকভাবেই অনেক আগে তাকে আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মোহাইমেন সাহেবের দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত দুই একটি লেখা পড়ে ধিক্কার দিয়েছি। কেননা সেসব লেখা পাঠ করা অসহ্য ব্যাপার। ভারত বিরোধী-হিন্দু বিরোধী, আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিরোধিতায় পরিপূর্ণ। মোহাইমেন সাহেবকে এসব লিখতেই হবে। কেননা তার বিশাল ধন-সম্পত্তি রয়েছে। সবাই জানেন যে "ধন সম্পদ অর্জন করা যত কঠিন তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন হচ্ছে ধন সম্পদ রক্ষা করা।" সেজন্যে মোহাইমেন সাহেবের ঐসব লেখা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় নি বলে বিশ্বাস করি।

মোহাইমেন সাহেবের আরও একটু পরিচয় আছে। কয়েক বছর আগে তিনি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী '৭১ সালে দু'লাখ বাঙালি হত্যা করেছে। খুব বেশি হলে তিন লাখের বেশি কোন ক্রমেই নয়। যা নিয়ে দেশে বিরাট হৈ চৈ পড়ে যায় এবং তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিদের দ্বারা ধিকৃত হন। এই মোহাইমেন সাহেব কয়েক বছর আগে ৩০ জন বাংলাদেশের শীর্ষ স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর কাছ থেকে জাতীয় ঐক্যমতের কথা বলে একটি কাগজে সই নেন। সরল বিশ্বাসে প্রথমে দু'একজন বেগম সুফিয়া কামালসহ সই করেন– তা দেখে বাকি বুদ্ধিজীবীরাও সই করে দেন। পরে পত্রিকায় দেখা গেল যে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় বুদ্ধিজীবীরা গোলাম আযমের নাগরিকতা ফিরিয়ে দেবার আবেদন জানিয়ে বিবৃতি

www.pathagar.com

দিয়েছেন। এটা নিয়েও পত্রিকার পাতায় হৈ চৈ বেধে যায়। এর পর প্রগতিশীলদের দ্বারা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়ে এখন দৈনিক সংগ্রামে এবং দৈনিক ইনকিলাবে জায়গা পেয়েছেন। তিনি সেখানে থাকলেই আমাদের কোনো আপত্তি ও কোনো বক্তব্য থাকতো না। কিন্তু আপত্তি ও বক্তব্য আসছে তিনি আজকের কাগজের মতো একটি প্রগতিশীল সংবাদপত্রে তাজউদ্দিনের মতো একজন সৎ-ন্যায়নিষ্ঠ লোকের বাহন হয়ে ঢুকে পড়ছেন সেজন্যে।

আজকের কাগজের লেখাটিও সবই অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা। যেমন মওলানা ভাসানী ও বামপন্থীদের প্রসঙ্গে লেখাটি পড়ে মনে হবে মওলানা ভাসানী ও বামপন্থীদের ভূমিকার জন্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে মওলানা ভাসানীর অবদান আমরা জানি। ১৯৭১ সালে মওলানা ভাসানীর একান্ত সচিব গণতান্ত্রিক পার্টির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য আমাদের সিরাজগঞ্জের সাইফুল ইসলাম সাহেব "স্বাধীনতা, ভারত ও মওলানা ভাসানী" নামে একটি বই লিখেছেন, সে বইতে '৭১ সালে মওলানা ভাসানী কি করেছেন আর কি করেন নি তার বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। কিন্তু মোহাইমেন সাহেব যেভাবে মওলানা ভাসানীকে দেখিয়েছেন আজকের কাগজে তাজউদ্দিনের ত্রাণকর্তা হিসেবে সাইফুল সাহেব তা দেখান নি। কারণ সাইফুল সাহেব একজন সৎ রাজনীতিবিদ, তিনি ধান্দাবাজ নন,খুবই কষ্টে জীবনধারণ করেন। কাজেই সাইফুল সাহেব এমনভাবে মওলানা ভাসানীকে চিত্রায়িত করতে লজ্জা পাবেন। কিন্তু মোহাইমেন সাহেব পান না, এটাই স্বাভাবিক। কেননা সম্পত্তি রক্ষা করা খুব কঠিন কাজ। এখানে শুধু এইটুকু বলতে চাই মওলানা ভাসানীর প্রতি অশ্রদ্ধা না রেখেই তিনি ভারতে-ভারত সরকার কর্তৃক রাজকীয়ভাবে থেকেছেন, বাংলাদেশে ফিরে এসে ১৯৭২ সালে বলেছেন, "ভারত আমাকে গ্রেফতার করে নজরবন্দি করে রেখেছে। তাজউদ্দিন বাংলাদেশের স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় শত্রু। সে ভারতের সঙ্গে পঁচিশ বছরের গোপন চুক্তি করে এসেছে।" একথার জবাবে তাজউদ্দিন পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, "মওলানা ভাসানী যদি প্রমাণ করতে পারেন তাজউদ্দিন ভারতের সঙ্গে কোনো গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে তবে পল্টন ময়দানে প্রকাশ্যে জনতার সামনে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলতে রাজি আছি।" কিন্তু মওলানা ভাসানী তাজউদ্দিনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে অনর্গল চিৎকার করে যেতে থাকেন, তাজউদ্দিন ভারতের দালাল, তাজউদ্দিন পঁচিশ বছরে গোপন গোলামী চুক্তি করে এসেছে।" সেই মওলানা ভাসানীকে তাজউদ্দিনের একজন আপনজন হিসেবে মোহাইমেন সাহেব আজকের কাগজের মতো কাগজে লেখার সুযোগ পেলেন। এটাই ভেবে দেখবার বিষয়।

পরিশেষে আজকের কাগজের সম্পাদক মণ্ডলী ও সাংবাদিকদের কাছে বিনীত অনুরোধ আজকের কাগজ প্রগতিশীল পাঠক ও লেখকদের কাগজ একটি মিলন ক্ষেত্র। এটাকে আপনারা ক্ষুন্ন হতে দেবেন না।

১৯৯২ সনে দৈনিক আজকের কাগজে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন আহমেদ
দৈনিক সংবাদ একটি ভিন্নমত

গত ২২ শে জুলাই ১৯৯৩ সংবাদের বৃহস্পতিবারের সাহিত্য সাময়িকীতে জনাব আতিউর রহমান এর লেখা অধ্যাপক আনিসুর রহমানের লিখিত 'উন্নয়ন জিজ্ঞাসা' পুস্তক সমালোচনা নিবন্ধটি পড়ে নিবন্ধটির মধ্যে আনিসুর রহমান সাহেবের লিখিত তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের বর্ণিত একটি বক্তব্য প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই।

অধ্যাপক আনিসুর রহমান সাহেব এবং আতিউর রহমান সাহেব উল্লেখ করেছেন যে– "পথ হয়তো একটা উকি দিয়েছিল একাত্তুরের ডিসেম্বরে, বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী মরহুম তাজউদ্দিন আহমদই বোধ হয় ঘোষণা করেছিলেন, যেসব দেশের সরকার মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করেছে তাদের কাছ থকে কোনো সাহায্য নেয়া হবে না। তাতে যত কষ্টই আমাদের হোক।" "এই নীতি মেনে চললে কোমর বেঁধে সমাজকে নুতন ছাঁচে ঢালতে হতো।" আমার মনে হয় তাজউদ্দিন আহমদ সাহেব উপরে বর্ণিত ভাবে কথাগুলো বলেছিলেন কিনা তাতে সন্দেহ আছে– কেননা আমি বা আমার মতো আরও বেশ কিছুলোক তাজউদ্দিন আহমদকে একজন বাস্তববাদী প্রাজ্ঞ দেশ প্রেমিক রাজনীতিবিদ হিসেবে জানি। তিনি রাজনীতিতে রোমান্টিক বা ইউটেপিয়ন চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন না। উপরে বর্ণিত আনিসুর রহমান সাহেবের বক্তব্যে তাজউদ্দিনকে একজন বাস্তবতা বর্জিত রোমান্টিক বা হটকারী বিপ্লবী হিসেবে প্রতীয়মান হওয়া স্বাভাবিক।

বিদেশী সাহায্য প্রসঙ্গে ১৯৭১ সনের ডিসেম্বর মাসের ২২ তারিখে মুজিবনগর থেকে ঢাকায় পদার্পন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সর্বস্তরের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমাবেশে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি (তাজউদ্দিন) বলেছিলেন– মানুষের ক্ষুধা লাগলে মানুষ যেমন বিষযুক্ত খাবার খায় না, তেমনি আমাদের অভাব থাকলেও আমরা বিদেশী কোনও শর্তযুক্ত সাহায্য চাই না। আমরা বিদেশী সাহায্য চাই, তবে তা হতে হবে সব ধরণের শর্তমুক্ত সাহায্য। ঐ বক্তৃতায় যারা বা যেসব দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন (ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশ)। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন তাদের প্রতি তিনি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং যেসব দেশ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন এবং এখন পর্যন্ত (২২/১২/১৯৭১) বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেন নাই তাদের কঠোর সমালোচনা করে তাদের কৃতকর্মের জন্য ভুল স্বীকার করে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার আহবান জানিয়ে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বাংলাদেশকে সাহায্য সহযোগিতা করার আহবান জানান। এখানেই তিনি (তাজউদ্দিন) বলেন তবে এসব সাহায্য সহযোগিতা অবশ্যই শর্তমুক্ত হতে হবে ও কোনও শর্তযুক্ত

www.pathagar.com

সাহায্য স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করবে না।" সচিবালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ঢাকায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদকে বরণ করে নেবার জন্য এই সমাবেশের আয়োজন করেছিলেন। কাজেই একথা মনে হয় সত্য নয় যে, তাজউদ্দিন আহমদ এমন কথা কোথাও বলেছেন যে- যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাদের কোনও সাহায্য গ্রহণ করা হবে না। স্মরণীয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গণচীন, (কুয়েত ছাড়া) সমস্ত মুসলিম দেশগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে এবং পাকিস্তানকে যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করেছে।

অবশ্য আনিসুর রহমান সাহেবের ভিন্ন অভিজ্ঞতাও থাকতে পারে, কেননা তিনি একজন সুখ্যাত পণ্ডিত ব্যক্তি এবং বাংলাদেশের প্রথম প্লানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাজউদ্দিন সাহেব সেই প্লানিং কমিশনের মন্ত্রী ছিলেন। তাজউদ্দিন সাহেবের সাথে আনিসুর রহমান সাহেবের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা থাকা খুবই স্বাভাবিক, ব্যক্তিগত আলোচনায় কখনও এমন কথা বলেছেন কিনা জানি না।

তবে তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের সাথে ব্যক্তিগত পরিচয় ও তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ছিলেন সহজ-সরল-ন্যায়নিষ্ঠ, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ। মুখের কথা ও অন্তরের বিশ্বাস ছিল এক। অন্তরের বিশ্বাস এক, আর মুখে প্রকাশ ভিন্ন। এটা তার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অন্যসব লোক বিশ্বাস করলেও আমার পক্ষে বিশ্বাস করা খুবই কঠিন, তাজউদ্দিন সাহেব অমন লোক ছিলেন। ব্যক্তি জীবনে কর্মজীবনে রাজনৈতিক জীবনে তিনি যা হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করতেন মুখেও তাই বলতেন। রণকৌশলগত কারণের জন্য ব্যাখ্যা কার্যসিদ্ধির উপায়ের জন্য ব্যাখ্যা, চতুরতা এসব দ্বিচারিতাপূর্ণ আচরণ তাজউদ্দিনের জীবনে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল বলেই আমার বলিষ্ঠ ধারণা।

এখানে উল্লেখ্য যে প্রফেসর আনিসুর রহমান সাহেব ও আতিউর রহমান সাহেব দুজনকেই আমি ব্যক্তিগতভাবেই অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমীহ করি।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
ঢাকা

২৩/৭/১৯৯৩ দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়েছে

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ রেসকোর্স ময়দান ঃ

তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০০৬ ইং

মাননীয় সচিব মহোদয়,
গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বিষয় ঃ (সাবেক রেসকোর্স) বর্তমান রমনা ময়দানে মর্নিং ওয়াকারদের ওয়াক ওয়ের কাজটি সম্পূর্ণ করার জন্য আবেদন।

মহাত্মন,

সবিনয় নিবেদন এই যে, ঢাকা শহরের প্রাণ বা ফুসফুস একটি রমনা পার্ক, অপরটি সাবেক রেসকোর্স ময়দান বর্তমানে রমনা ময়দান। ১৯৭২ সন পর্যন্ত রমনা রেসকোর্স ময়দান ছিল ঘোড়দৌড় ও গলফ খেলার মাঠ, ঢাকার শহরের একটি ওপেন স্পেস, একটিও গাছ ছিল না। কালের বিবর্তনে রমনা ময়দান আজ নিম্নলিখিত ৫টি সত্ত্বা বা নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে আর্বিভূত হয়েছে।

১। রমনা ময়দান বা ওপেন স্পেস, কলকাতার গড়ের মাঠ, দিল্লীর ইন্ডিয়াগেট, বোম্বের শিবাজী পার্কের মতো, এ সব জায়গায় গাছ নেই, ওপেন স্পেস। রমনা ময়দান যা শত বছর আগের ঢাকাকে চেনার জন্য একটি কেন্দ্র বিন্দু।

২। রমনা ময়দান ওয়াকওয়ে, এখানে আগে হাজার হাজার লোক মর্নিং এবং ইভিনিং ওয়াক করতো। ঢাকা শহরের অনেক বয়োঃজ্যেষ্ঠ এবং শিক্ষিত লোকজন রমনা ময়দান ওয়াক ওয়েতে হাঁটতেন ১৯৯৮ সন পর্যন্ত। বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, সচিব, যুগ্ম সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, সিনিয়র ও জুনিয়র প্রফেসর সহ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি।

৩। রমনা কালীমন্দির।

৪। রমনা গলফ কোর্স।

৫। রমনা স্বাধীনতার স্মৃতি স্তম্ভ।

যে যাই বলুক উপরে বর্ণিত ৫টি বিষয় বস্তু বা প্রতিষ্ঠান, এর একটিও কেউ আজ উৎখাত করতে পারবেন না। উপরের বর্ণিত ৫টির, ৫নং টির স্মৃতি স্ভের মুরব্বি অভিভাবক, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান কনকর্ড এরা বিরাট শক্তিধর ও বলবান। স্বাধীনতা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণের নামে কোটি কোটি টাকা উপার্জনের জন্য জেঁকে বসেছে।

৪নং টি রমনা গলফ কোর্স-এর অভিভাবক ঢাকা ক্লাব, এরা বিরাট বলবান এবং শক্তিধর। এছাড়াও এটি দেশের একমাত্র বেসরকারি গলফ খেলার মাঠ। কাজেই এটা রাখা দরকার।

৩নং টি রমনা কালীমন্দির, এটির মুরুব্বি হচ্ছে, শতবছরের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ও দেশে কিছু প্রভাবশালী হিন্দুসমাজের নেতা, বিবেকবান ও অসম্প্রদায়িক মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক।

www.pathagar.com

২ ও ১ নং টি রমনা ময়দান ওয়াক ওয়ে এবং রমনা ময়দান। এটি সর্ব সাধারণের ব্যবহারের জন্য। দেশের দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের সম্পদ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষের সম্পদ। কিন্তু এই দুইটির কোনও মুরুব্বি বা অভিভাবক নাই। সর্ব স্তরের লক্ষ লক্ষ লোক ১৯৯৮ সনের স্বাধীনতা স্মৃতি স্তম্ভ ওয়ালাদের প্রবেশের আগে এই ময়দান ব্যবহার করত। ১৯৯৮ সনে রমনা ময়দান ও রমনা ময়দান ওয়াক ওয়ে বন্ধ হয়। এর জন্য এখানে গড়ে উঠে বিশাল জঙ্গল, ঢাকা শহরের বাজে পুলিশ কনস্টেবল, হাইজ্যাকার, ভাসমান পতিতা, গাঁজা ও হিরোইন খোর সহ বহু খারাপ ও সমাজ বিরোধীদের আড্ডা ও আশ্রয় স্থান। ২০০৫ সনে আপনি উক্ত অবস্থা থেকে রমনা ময়দান ও রমনা ওয়াক ওয়ে উদ্ধার এবং নতুন ভাবে নির্মাণের উদ্যোগ নিয়ে অনেকটা সফল হয়েছেন। রমনা ময়দানে ওয়াকওয়ে নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা করেছেন। অনেক অবাঞ্চিত গাছ ও জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা করেছেন। এখন রমনা ময়দান ওয়াকওয়ে অনেক লোক আবার মর্নিং ওয়াক করা শুরু করেছে। কিন্তু রমনা ময়দান ওয়াক ওয়ে এবং রমনা ময়দানের কাজ শেষ হয় নাই, অর্ধসমাপ্ত। রমনা ময়দানে ওয়াক ওয়ে ময়দানের পূর্ব প্রান্তের ইঞ্জিনিয়ারিং ইনষ্টিটিউশনের গেট থেকে পূর্ব প্রান্ত দিয়ে দক্ষিণ পূর্ব পর্যন্ত গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে তিন নেতার মাজার থেকে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে উত্তর পশ্চিমে পুলিশ কন্ট্রোল রুম পর্যন্ত বেশ সুন্দর একটি ওয়াক ওয়ে গণপূর্ত বিভাগ নির্মাণ করেছেন। কিন্তু এখানে এসে এই ওয়াক ওয়েটির নিজস্ব সত্ত্বা হারিয়েছে, এখানে এসে এটা কনকর্ডের স্মৃতি স্তম্ভ এর সাথে মিশে গিয়েছে। যার জন্য কনকর্ডের লোকজন প্রায়ই এখানে অবৈধভাবে গেট বন্ধ করে দিয়ে মর্নিং ওয়াকারদের হাঁটা বন্ধ করে হয়রানি করে।

তাই আপনার কাছে বিনীত নিবেদন পুলিশ কন্ট্রোলরুম পর্যন্ত ওয়াকওয়ে যেভাবে এসেছে এটাকে এখানে না থামিয়ে উত্তরে শিশু পার্কের সীমানা দেয়াল ঘেঁষে সোজা পূর্বপ্রান্তে এনে সেখান থেকে ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের গেট পর্যন্ত নিয়ে আসা হউক। এইভাবে ওয়াক ওয়ে না হওয়া পর্যন্ত, রমনা ময়দান ওয়াক ওয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে ওয়াক ওয়েটি কনকর্ডের লোকজন সম্ভবত তাদের কাজের ভিতরে চালাকি করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমরা মর্নিং ওয়াকাররা কনকর্ড বা স্বাধীনতা স্মৃতি স্তম্ভের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে চাই না, সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ দৃষ্টি নন্দন একটি ওয়াক ওয়ে চাই। স্মৃতি স্তম্ভের কাজ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, যা এখন নাই। কাজেই মাঠের পশ্চিম দিক দিয়ে যেভাবে ওয়াকওয়ে তৈরি করা হয়েছে, ঐ ভাবে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের কাছ থেকে শিশু পার্কের দক্ষিণের দেয়াল ঘেঁষে পূর্ব প্রান্ত দিয়ে একই মডেলের বা ডিজাইনের ওয়াক ওয়ে বা রাস্তা পূর্ব প্রান্তের ব্রিজের গেট পর্যন্ত আনার ব্যবস্থা করার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

নিবেদক

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা (সেক্টর নং–৬)
মর্নিং ওয়াকার রমনা ময়দান

www.pathagar.com

বি.টি.ভি'তে প্রচারিত বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ প্রসঙ্গে

"বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" নামে ২২শে ও ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০০৬ ইং তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রজাতন্ত্রের একজন বেতনভুক্ত কর্মচারী বা চাকর সালেহ আকরামের ধারা বর্ণনায় প্রচারিত অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধে একজন সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার এবং ১৯৬৮ সন থেকে ১৯৮০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন নেতা ও কর্মী হিসেবে বলতে চাই- ঐ অনুষ্ঠানে যা বলা হয়েছে- তা নতুন নয়, স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সনের শুরু থেকে জাসদ নামক রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা এসব কথা সোচ্চার কণ্ঠে বলে সারা বাংলাদেশ সরব করে তুলেছিল। যেমন "শেখ মুজিব ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে রহস্যজনক ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চান নি, তিনি পাকিস্তান ভাঙতে চান নি" ইত্যাদি। কিন্তু তাদের সে বক্তব্য সফল হয় নাই। বাংলাদেশের ব্যাপক বা সাধারণ জনসাধারণ ঘৃণা ভরে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। সময় প্রমাণ করেছে- জাসদ এর ঐ সব কথা ভণ্ড প্রতারণামূলক অন্তঃসারশূন্য কল্পনা বিলাসী। আর এই জাসদকে নির্মূল করার মহান কাজে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। আজ ঐ বক্তব্য প্রদানকারী জাসদের নেতা কর্মীরা অর্ধেক আওয়ামী লীগ, অর্ধেক রাজাকারদের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।

ইতিহাস ও স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম প্রমাণ করেছে, ১৯৭১ সনে (২৫শে মার্চ ও ৭ই মার্চসহ) ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজনীতিতে সামান্য ভুল করেন নি। তিনি অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, প্রাজ্ঞতাপূর্ণ বক্তব্য দিয়েছেন, সামান্যতম হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেন নি। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানী সেনাদের আক্রমণের আগে বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগ থেকে স্বাধীনতার সরাসরি ঘোষণা দিলে তা হতো হঠকারি সিদ্ধান্ত, পৃথিবীর কোনও দেশ তা সমথর্ন করতো না, ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বাচারে বাঙালি নিধন ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে আরো সহজ হতো, ১৯৭১ সনে যত বাঙালি নিহত হয়েছে, তার চেয়ে আরো অনেক অনেক গুণ বেশি বাঙালি নিহত হতো। ঐ সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঠিক ও বিজ্ঞজনোচিত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শুধু বাংলাদেশ পাকিস্তানের নয় সারাবিশ্বের একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কাজেই যারা বলেন, ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা না দিয়ে ভুল করেছে, তারা মারাত্মক রাজনৈতিক ক্যান্সার রোগে আক্রান্তড়, এদের চিকিৎসা হবে না, এদের রাজনৈতিক মৃত্যু অতীতেও হয়েছে, আজও হবে। দুনিয়ার যে যাই বলুক ১৯৭১ সনে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৭১ সনে ২৫শে মার্চের পরে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান

www.pathagar.com

যদি বলতেন, "আমি পাকিস্তান ভাঙতে চাই না, স্বাধীন বাংলাদেশ চাই না" তবে কোনোক্রমেই পৃথিবীর কোনও শক্তির পক্ষেই বাংলাদেশ স্বাধীন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি বাংলাদেশ থেকে হাজার মাইল দূরে নির্জন কারাগারে বসে মৃত্যুর প্রহর গুণেও এ কথা বলেন নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা জিয়াউর রহমান সাহেবের ভূমিকা বিকৃত করে মাত্রা অতিরিক্তভাবে বলে চলেছেন, তাদের বলতে চাই- জিয়াউর রহমান ১৯৭১ সনে মেজর ছিলেন। ১৯৭১ সনে ওনার মতো আরও অনেক বাঙালি মেজর ছিলেন, ওনার চেয়ে সিনিয়র মেজর, কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার ছিলেন, তারা ইতিহাসে সামান্যতম স্থান পান নাই, কেননা তারা জিয়াউর রহমান সাহেবের মতো বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করার সুযোগ পান নাই বা করেন নাই। জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলেই জিয়াউর রহমান আওয়ামী লীগের আমলে, লে. কর্ণেল, ব্রিগেডিয়ার, মেজর জেনারেল হয়েছিলেন- মাত্র ২ বছর সময়ের মধ্যে। যা ছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সনে এ দেশের মানুষের মধ্যে বিরাট বিরূপ সমালোচনা, বিশেষ করে জাসদ ও রাজাকাররা সবচেয়ে বেশি এ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছে। মোট কথা বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের অনেক সৃষ্টির একটি জিয়াউর রহমান সাহেব, আর তারই রেশ ধরে আজকের খালেদা জিয়া ও তারেক জিয়ার অবস্থান।

ব্যক্তি জিয়াউর রহমান আজকের বিএনপি'র যে কোনো সিনিয়র নেতার চেয়ে অনেক ভালো লোক ছিলেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ওনার সাথে আমার ১৯৭১ সন থেকে মৃত্যুর আগ (১৯৮১,৩০ মে) পর্যন্ত খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল। ব্যক্তিগতভাবে আমি ওনার দ্বারা বিরাট উপকৃত, ১৯৮১ সনে মৃত্যুর আগে আমার সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার ডিক্লারেশন তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোস্তাফিজুর সাহেবকে ফোন করে নিয়ে দেন। তার সাথে আমার ভালো পরিচয় ছিল। সে সূত্রে বলতে চাই, আজকের বিএনপি'র সরকার সেই ১৯৭২ সনের জাসদ প্রদত্ত দুর্গন্ধময় বস্তাপচা রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে আজ ৩৪ বছর পর "বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" নামে যা সৃষ্টি করেছে জিয়াউর রহমান সাহেব ক্ষমতায় থাকলে তা কোনক্রমেই সম্ভব হতো না।

তবে একথা সত্য জিয়াউর রহমান সাহেব মুজিব বাহিনীর বিরোধী ছিলেন, আমিও মুজিব বাহিনীর বিরোধী, বঙ্গবন্ধুর ছেলে শহীদ শেখ কামাল ভাইও মুজিব বাহিনী বিরোধী মুক্তিবাহিনীর অফিসার ছিলেন। ঐ সময়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেবসহ প্রায় সব আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা মুজিব বাহিনী বিরোধী ছিলেন, বরং উল্টা বালা যায়, মুজিব বাহিনীই তাদের বিরোধী ছিল।

"বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" নামে যা প্রচার করা হয়েছে, সেখানে মুজিব বাহিনীর প্রসঙ্গ ছাড়া যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা বেয়াদবী, ঔদ্ধত্য মিথ্যা ও বিকৃত মনমানুষিকতার কুরুচি পূর্ণ বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। স্মরণ করা দরকার "মিথ্যা বলা মহাপাপ, মানির মানহানী শিরচ্ছেদতুল্য অপরাধ"। বাংলাদেশের জনগণের টাকায় সরকারি উদ্যোগে এমন একটি অনুষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। মনে রাখা দরকার- "এভরি এ্যাকশন হ্যাজ এ্যান ইকুয়াল এণ্ড অপজিট রিয়্যাকশন"।

www.pathagar.com

ইতিহাস সোজাপথে চলে, বিকৃত ইতিহাসের জবাব সঠিক ইতিহাসই সঠিকভাবে দেয়, তবে তা হয় খুবই নিষ্ঠুর ও ভয়াবহ। বিটিভিতে প্রচারিত "বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ" যারা সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা জানাই এবং এই সুযোগ মহান নেতা আমার এবং পৃথিবীর লক্ষ কোটি মানুষের প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে লক্ষ কোটি ছালাম, ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানাই।

আবু মোহাম্মদ (বাবলু)
বি,এ (অনার্স) এম,এ (ঢা.বি.)
মুক্তিযোদ্ধা ৬নং সেক্টর
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড,
ঢাকা-১২০৫।
তারিখঃ ২৩/০৮/০৬, রাত ৯টা

(গত ৯/১০/০৬ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকের ৪র্থ পাতায় এ লেখাটি ছাপা হয়েছে)

www.pathagar.com

হাবিবুল আওয়ালকে আইন সচিব নিয়োগ সরকারের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত

ভাই আনিসুল হক-

আমার প্রেরিত লেখাটি প্রথম আলোতে যাতে ছাপা হয় তার জন্য তোমার সাহায্য কামনা করি।

তোমার শুভ কামনা করি।

(তোমার বাবলু ভাই)

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

১৩৫, এলিফ্যান্ট রোড ঢাকা

তারিখ ঃ ০২/০৭/২০০৭ ইং

প্রতিবাদ

দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় গত ১লা জুলাই ২০০৭ রোববারে অতিরিক্ত অংশের ২ এর পাতায় আইন অধিকার বিভাগে প্রকাশিত 'আইন সচিব নিয়োগ ও সুপ্রিম কোর্ট' শিরোনামে আইন সচিব নিয়োগ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক মাহবুব মোরশেদের লেখার শেষ প্যারাগ্রাফে প্রকাশিত তার মতামত ও বক্তব্যকে আমি তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানাই।

কাজী হাবিবুল আউয়ালকে আইন সচিব নিয়োগ দিয়ে সরকার কোনও বেআইনী বা নিয়ম বহির্ভূত কাজ করে নি। হাবিবুল আউয়ালকে আইন সচিব নিয়োগ দিয়ে সরকার একটি সঠিক এবং উত্তম কাজ করেছেন। হাবিবুল আউয়াল বি,এস,এস আইন সার্ভিসের লোক, তিনি প্রশাসন বা অন্য কোনও ক্যাডার থেকে আইন মন্ত্রণালয়ে আসেন নাই। কাজী হাবিবুল আউয়াল সহকারী জজ, সাব-জজ, অতিরিক্ত সচিব হিসেবে অনেক বছর চাকুরী করেছেন। ১৯৮১ সনের বি,সি,এস ব্যাচের বর্তমানে প্রায় ১২টি মন্ত্রণালয়ের সচিব রয়েছেন, এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আজ থেকে প্রায় এক বছর আগে সচিব হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন। কাজেই হাবিবুল আউয়ালের আইন সচিব হিসেবে নিয়োগ কোনোক্রমেই অন্যায় বা অনিয়মের মধ্যে পড়ে না।

হাবিবুল আউয়াল এবং আমি এক সাথে এক ক্লাশে ঢাকা কলেজে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত পড়েছি এবং এক সাথে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাসে থেকেছি। একই সময়ে ১৯৭৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি সে আইন বিভাগে আমি ইংরেজি বিভাগে। লেখাপড়া সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনার জন্য হাবিবুল আউয়াল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে সূর্যসেন হলে আমার রুমে সে নিয়মিত এসেছে। মোট কথা সে আমার ৩৪ বছরের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি হাবিবুল আউয়ালের বিদ্যাবুদ্ধি, ন্যায়নিষ্ঠতা দেখে তার একজন অতীব গুণমুগ্ধ ভক্ত। আমি আল্লাহর কাছে অনেক সময় শোকর আদায় করি এই বলে যে আল্লাহ আমাদের এই বাংলাদেশে হাবিবুল

www.pathagar.com

আউয়ালের মতো একজন সৎ, বিদ্যান, ন্যায়নিষ্ঠ, সদাচরণ সম্পন্ন সন্তানকে উপহার দিয়েছেন। ৪/৫ বছর আগেও হাবিবুল আউয়ালকে ছাতা মাথায় পায়ে হেঁটে ঢাকা শহরে যাতায়াত করতে দেখা যেত। নিজে এতোবড় চাকুরীজীবী, স্ত্রী নামকরা কলেজের অধ্যাপিকা অথচ ঢাকা শহরে ছাতা মাথায় পায়ে হেঁটে চলে এমন লোকের কথা আজকাল বাংলাদেশে কেউ ভাবেন বলে মনে হয় না।

এবার আসা যাক মাহবুব মোরশেদের লেখা প্রসঙ্গে- তিনি ঐ লেখায় একজন মাননীয় বিচারপতি এ, বি, এম, খায়রুল হক সাহেবের একটি রায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। মাহবুব মোরশেদের লেখা এইখানে আমার পাঠোদ্ধার বা তার বাক্যের মানে বুঝতে কষ্ট হয়েছে, আসলে তিনি কি বলতে চেয়েছেন। তিনি লিখেছেন "আমি বলব ২০০১ সনে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার আলোকে আইন সচিব নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কিন্তু দুদিন আগে বিজ্ঞ প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে ড্রাফটিং উইং এর অতিরিক্ত সচিব কাজী হাবিবুল আউয়ালকে ভারপ্রাপ্ত আইন সচিব নিয়োগ করা আইনসিদ্ধ করা হয় নি। কারণ সংবিধানের ৯৪ অনুচ্ছেদ মতে হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট।" কাজেই শুধুমাত্র প্রধান বিচারপতির মতামতই নাকি সঠিক নয়। মাহবুব মোরশেদের উক্ত কথার প্রথম অংশ প্রসঙ্গে বলতে চাই- মহামান্য রাষ্ট্রপতি অবশ্যই সুপ্রিম কোর্ট এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের নীতিমালার আলোকেই তাদের সুপারিশে হাবিবুল আউয়ালকে আইন সচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের মতামত দেওয়া মানে অবশ্যই হাইকোর্টেরও মতামত। আর নিয়মসিদ্ধ সব মতামত নিয়েই যে তাকে আইন সচিব করা হয় নি তা মাহবুব মোরশেদ কিভাবে জানেন? এখানে আমার জিজ্ঞাসা ড্রাফটিং উইং কি আইন মন্ত্রণালয়ের বাইরের কোনও বিভাগ? আর সংবিধানের ৯৪ ধারার কথা উল্লেখ করে মাহবুব 'বাঙ্গালকে জগন্নাথ কলেজ দেখিয়ে হাইকোর্ট দেখাবার চেষ্টা করেছেন' কারণ, সংবিধানের ৯৪ ধারার ৪টি উপধারার কোনও জায়গায় আইন সচিব নিয়োগ সংক্রান্ত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কোনও নির্দেশ নাই।

আমি মাহবুব মোরশেদের প্রথম আলোয় প্রকাশিত লেখার প্রতিবাদ জানাই এবং হাবিবুল আউয়ালের মতো একজন প্রাজ্ঞ এবং সাত্বিক ব্যক্তিকে আইন সচিব নিয়োগ দেবার জন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার প্রকাশক ও সম্পাদক

(আনিসুল হক কবি, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দৈনিক প্রথম আলোর উপ-সম্পাদক।)

তারিখ : ০৮/০৭/২০০৭ দৈনিক প্রথম আলোতে প্রকাশিত

www.pathagar.com

রবিউল আলম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর উপর কয়েকজন দুস্কৃতিকারী পুলিশের এ বর্বর আচরণের বিচার চাই

০৬-০৮-২০০৮ইং
জনাব ফখরুদ্দিন আহমেদ
মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা।

গত ৩রা আগষ্ট ২০০৮ইং রোববার ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক সাবেক প্রধান মন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সাবেক একান্ত সচিব (২), সাবেক প্রখ্যাত ছাত্রনেতা ১৯৬৯ সনের ঢাকা কলেজের প্রথম সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক, একজন অস্ত্রধারী বীর মুক্তিযোদ্ধা, যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে একটি পা হারিয়েছেন, ১৯৭৯ সনে ডাকসুতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে সাধারণ সম্পাদকের পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৪০ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন, ১৯৮২ সনের বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের একজন সাবেক অফিসার জনাব রবিউল আলম মোক্তাদির চৌধুরীর মাননীয় হাইকোর্টের নির্দেশে জামিন দেয়ার আদেশনামা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশেষ জজ আদালতের পিয়ন বেলা ৩-১৫ মিনিটে জমা দেয়।

জামিননামা জেল গেটে পৌছানোর পর ৩-১৫ মিনিট থেকে হতে ২০/৩০ মিনিটের মধ্যে বরিউল আলম চৌধুরীর জেল থেকে মুক্তি পাবার কথা। কিন্তু দেখা গেল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ডেপুটি জেলার অযথা সময় নষ্ট করে তাকে রাত ৮-০০ টায় জেল থেকে বের করে দেন। এখানে আমার বিশ্বাস ডেপুটি জেলার রহস্যজনক ও বেআইনী ভূমিকা পালন করেছে।

৩রা আগস্ট ২০০৮ বেলা ৩-১৫ মিনিট থেকে জেল গেটের সামনে আমি নিজে, রবিউল আলম চৌধুরীর স্ত্রী বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সিনিয়র সদস্য অধ্যাপিকা ফাহমিদা খাতুন, একমাত্র মেয়ে ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ছাত্রী অন্বেষা, ঢাকা নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল ইসলাম, রবিউল আলম চৌধুরীর ভাগ্নে মাসুম, খালাতো ভাই হেলালসহ আমরা আরও বেশ কয়েকজন রবিউল আলম চৌধুরীর ভক্ত-অনুরাগীরা অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশে তার মুক্তির আশায়।

এক পর্যায়ে দেখা গেল রাত্র ৭-০০ টার দিকে জেল গেটের সামনে একটি প্রাইভেট টেম্পু গাড়ি পার্ক করা হলো, তাতে ৫/৬ জন স্টেনগান এবং চাইনিজ রাইফেল হাতে সিভিল ড্রেসের লোক। তাদের আমি বারে বারে জিজ্ঞাসা করি- ভাই আপনারা কারা,

www.pathagar.com

কোন বিভাগের মানুষ, এখানে কেন এসেছেন? তারা কোনও উত্তর দেয় না। এক পর্যায়ে একজন আমাকে বলে তাতে আপনার কি? আমি বলি সিভিল ড্রেসে অস্ত্র হাতে এখানে এসেছেন আপনাদের পরিচয় জানা দরকার, ড্রেস পরে আসলে জিজ্ঞাসা করতাম না। তারা কোন জবাব দেয় না। সময় যায়, আমাদের উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

অবশেষে রাত ৮-০০ টার সময় রবিউল আলম মোক্তাদির চৌধুরীর জেল গেট থেকে বের হবার সাথে সাথে দাঁড়ানো সিভিল ড্রেসের একজন কমান্ডো স্টাইলে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে রবিউল আলম চৌধুরীর দুই হাত ঘাড়ের উপর উঠায়, সাথে সাথে অন্যান্য সিভিল ড্রেসের অস্ত্রধারী লোকজনও তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে চ্যাংদোলা করে ঐ প্রাইভেট টেম্পুতে টেনে হিচড়ে তোলে এবং মুহূর্তের মধ্যে জেল গেটের সামনে দিয়ে উত্তর দিকে দ্রুত বেগে চলে যায়।

একজন বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সাবেক কর্মকর্তা, একজন পুরানো অভিজাত জমিদার বংশের সন্তান, ঢাকা কলেজের সাবেক সাধারণ সম্পাদক, ২০০৭ সনের ২২শে জানুয়ারীর ঘোষিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা, একজন ৫৬ বৎসর বয়স্ক পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার ওপর এহেন বর্বর দৃশ্য চোখের সামনে দেখে সারারাত শোকে দুঃখে ঘুমোতে পারি না, সারারাত মনে হলো এই বুঝি আমার হার্ট এ্যাটাকে এখনই মৃত্যু হবে।

বিনা গ্রেফতারী পরোয়ানায় এইভাবে বাংলাদেশের একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা জমিদার বংশের সন্তান সম্মানিত নাগরিককে এমন বর্বরভাবে গ্রেফতার করা হলো। গ্রেফতার করে রবিউল মোক্তাদির চৌধুরীকে ক্যান্টনমেন্ট থানায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং গুলশান থানায় একটি মিথ্যা জিডি করা হয় এই মর্মে যে, "রবিউল আলম চৌধুরী ৬-৩০ মিনিটি জামিনে মুক্তি পেয়ে গুলশানে তাঁর বাড়িতে যায়, সেখানে সে তাঁর ভক্ত অনুরাগীদের নিয়ে মিটিং করে এবং সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক কথা বলে।"

এত বড় জালিয়াতি ও মিথ্যাচার ভাবতে গা শিউরে উঠে। এ কোন পুলিশ! আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মে মিথ্যা অভিযোগ বা মিথ্যা মামলা করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষী দিলে জেনা করার সমান অপরাধে সাব্যস্ত করে কঠোর শাস্তি দেবার কথা বলেছেন ইসলাম ধর্মের আলেম ও ওলামায়েগণ। বাংলাদেশের শতকরা ৯০% মানুষ মুসলমান এবং ইসলাম ধর্মের অনুসারী, এ দেশে এমন একটি বর্বর মিথ্যা মামলা দায়ের করবে এটাকে সহজভাবে মেনে নেওয়া যায় না।

বাংলাদেশ পুলিশ এর বর্তমান আই,জি,পি জনাব নূর মোহাম্মদ সাহেব একজন ন্যায়নিষ্ঠ মানবতাবাদী মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে অনেক ভালো কাজ করে চলেছেন, অনেক খারাপ পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। তাঁর কাছে একান্ত অনুরোধ গত ৩রা আগস্ট ২০০৮ রোরবার রাত ৮-০০ টায় যে সব পুলিশ সিভিল ড্রেসে অস্ত্র হাতে গিয়ে বিনা গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় বেআইনী ও বর্বরভাবে রবিউল মোক্তদির চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে তাদের খুঁজে বের করে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করার জন্য এবং এমন জঘন্য মিথ্যা জিডি বা মামলা দায়ের করার জন্য

www.pathagar.com

তাদের বিরুদ্ধে মামলা করে তাদের গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য।

উক্ত দাবীর স্বপক্ষে বিবেকবান ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ হিসাবে আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ আপনারা ঐ কয়েকজন দুস্কৃতিকারী পুলিশের উক্ত বেআইনী ও বর্বর আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। আল্লাহ ন্যায় সত্যের পক্ষের লোকজনদের সব সময় সাহায্য করে থাকেন। কাজেই ন্যায় ও সত্যের জয় অবশ্যই হবে, ঐ বর্বর পুলিশদের অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

নিবেদক

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা, ৬নং সেক্টর
লেখক ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতা
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

রমনা পার্ক, সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দান, স্বাধীনতার স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ এবং এ বিষয়ে দু'একটি কথা।

ঢাকার সম্মানিত নাগরিক বৃন্দ,

ব্রিটিশ সরকারের নগর পরিকল্পনাবিদ বা নগর উন্নয়নের কাজে যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা ঢাকাতে রেসকোর্স ময়দান করেছেন, পাশেই রমনা পার্ক করেছেন, রেসকোর্স ময়দান খোলা জায়গা কোনও গাছ লাগান নি, রমনা পার্কে গাছ লাগানো হয়েছে পরিকল্পিতভাবে। ঠিক তেমনিভাবে কলকাতায় গড়ের মাঠ বিরাট ময়দান সেখানে গাছ নেই। কিন্তু পার্শ্বে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল–সেখানে গাছ লাগানো আছে। দিল্লীতে ইন্ডিয়া গেট এলাকায় বিরাট খালি বা খোলা জায়গা, সেখানে গাছ লাগানো হয় নাই। আবার, লোধী গার্ডেনে গাছ লাগানো হয়েছে। দিল্লীর লাল কেল্লার সামনে বিরাট এলাকা প্রায় ১/২ বর্গকিলোমিটার এলাকা হবে, সেখানেতো কোনও গাছ নেই। বোম্বে শহরে বিশাল এরিয়া শিবাজী পার্ক, বিশাল এলাকা শিবাজী পার্কে একটিও গাছ নেই। আসলে কলকাতার গড়ের মাঠ, দিল্লীর ইন্ডিয়া গেট, লাল কেল্লা, বোম্বের শিবাজী পার্কে গাছ না রাখার যথেষ্ট বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণ রয়েছে। কেননা মানুষ কাজে কর্মে, অভাব অভিযোগে অতিষ্ঠ হয়ে একটি খোলামেলা জায়গায় গিয়ে বসে প্রাণ ভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস নেয়। মুক্ত আকাশের প্রতি তাকিয়ে সে নতুনভাবে শক্তি সঞ্চার করে। যার জন্য নগরের মধ্যে বড় আকারের খোলা জায়গা রাখার প্রভিশন রাখা হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও এটা সত্য বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যারা শিক্ষিত হয়ে নগর উন্নয়ন করার দায়িত্বে আছেন তাদের মধ্যে এই বোধ খুব কম কাজ করে চলছে। যার জন্য সোহ্‌রাওয়ার্দী ময়দানের মধ্যে গাছ লাগিয়ে উদ্যান করা হয়েছে। লন্ডনের কিউ গার্ডেনের উদ্যান ইঞ্জিনিয়ার প্রাউডলক সাহেব যে পরিকল্পিতভাবে রমনা পার্কে গাছ লাগিয়ে অতি সুন্দর একটি আকর্ষণীয় পার্ক করে গিয়েছিলেন তাতে আজ আরও অধিক মাত্রায় অপরিকল্পিতভাবে গাছ লাগিয়ে রমনা পার্ককে শেষ করে জঙ্গল বানানোর কাজে উঠে পড়ে লেগেছে।

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিশাল জনসমুদ্রে স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা বলে বাঙালি জাতির জন্যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন এই ময়দানে। রেসকোর্স ময়দানে পাক সেনাবাহিনী ভারতীয় সেনা বা মিত্র বাহিনীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেছিল ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাজনিত কারণেই কি ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ও ৭ই মার্চের যে চেহারা বা যে রূপে রেসকোর্স ময়দান ছিল তা রাখা উচিত ছিল না? ভবিষ্যত প্রজন্ম ও জেনারেশনকে দেখানোর জন্য? অবশ্যই রাখা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ও ৭ই মার্চে যে রূপে ঐ স্থান ছিল তার চেহারা বদলে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশরা যে উদ্দেশ্যে রেসকোর্স ময়দান করেছিল নগরের মধ্যে খোলা জায়গা রেখে যাতে ঢাকার নাগরিকরা প্রাণ ভরে আকাশ দেখতে পায় এবং প্রাণ ভরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস

www.pathagar.com

ছাড়তে পারে, তা ধ্বংস করা হয়েছে গাছ লাগিয়ে সারোয়ার্দী ময়দানে। এখন আবার সারোয়ার্দী ময়দানে স্বাধীনতার স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ চলছে, স্মৃতি স্তম্ভের সাথে আবার যাত্রার বা মুক্ত মঞ্চ বানানো হয়েছে, উন্মুক্ত মঞ্চ যাত্রার মঞ্চ ১টি কেন ১০০টি বানাও কিন্তু সর্বসাধারণের ব্যবহারের উন্মুক্ত খালি জায়গা সারোয়ার্দী ময়দানে কেন? এটা করে বিরাট পাপ বা অন্যায় করেছে। যারা এখানে যাত্রা বা মুক্ত মঞ্চ করার কাজে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য এবং ঐ যাত্রা বা মুক্ত মঞ্চ যাতে ভেঙ্গে ফেলা হয় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে একান্ত অনুরোধ জানাই।

স্বাধীনতার স্তম্ভ যা হয়েছে হোক বর্তমানে টিন দিয়ে ঘিরে যতটুকু করা হয়েছে তার মধ্যেই থাকুক এর বাইরে যেন আর না আসে। কলকাতার গড়ের মাঠ বা ময়দান দিল্লীর ইন্ডিয়া গেট ও লাল কেল্লা, বোম্বের শিবাজী পার্কের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সারোয়ার্দী ময়দানের সমস্ত গাছ কেটে ফেলার জন্য ব্যবস্থা করা হোক। ময়দানের চারিদিকে গাছ থাকবে কিন্তু ময়দানের ভিতরে একটি গাছও যেন না থাকে, দয়াকরে তার ব্যবস্থা করবেন। মানুষ সামনের দিকে যায়, ভূত পিছনে যায়। রমনা পার্ক ও সারোয়ার্দী ময়দানে ব্রিটিশরা একশত বছর আগে জঙ্গল পরিষ্কার করে ময়দান ও পার্ক বানিয়েছেন। একশত বছর পরে এখন আবার এখানে অপরিকল্পিতভাবে গাছ লাগিয়ে সেই একশত বছর আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়া বা জঙ্গল বানানো সুস্থ মানুষের কাজ নয়। স্মৃতি স্তম্ভ পাঁচ দশ কাঠা জায়গার উপর ৫/১০ কোটি টাকা খরচ করলে ভালো হতো। কিন্তু তা না করে সমস্ত ময়দান ধ্বংস করে শত কোটি টাকার উপরে খরচ করে স্বাধীনতা স্মৃতি স্তম্ভ নির্মাণ করে অন্যায় ও পাপ কাজ করা হয়েছে।

এ বিষয়ে দেশের বিবেকবান ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নিবেদনে :
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক কর্মী, লেখক ও সাংবাদিক,
ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ঢাকা-১২০৫।

২০/০৮/২০০২ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত

www.pathagar.com

কামারখন্দ থানার প্রিয় ভাই ও বোনেরা

আমাদের কামারখন্দ থানা এলাকায় দীর্ঘদিন যাবত যে মানুষ হত্যা ও ডাকাতি, রাহাজানি হচ্ছে তা নিয়ে দু'একটি কথা বলতে চাই।

প্রিয় ভাইয়েরা পৃথিবীতে নর বা মানুষ হত্যা একটি জঘন্যতম পাপ কাজ। মানুষ হত্যা করার পর তার শরীর থেকে যে রক্ত মাটিতে পড়ে তা খুবই ভয়াবহ সে রক্ত থেকে যে প্রতিহিংসা জন্ম নেয় তা যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকে। ফলে সমাজে সৃষ্টি হয় এক নারকীয় অশান্তি। যারা মারা যায়- তার বাবা-মা-সন্তান হারা হলো, স্ত্রী বিধবা হলো,- শিশু সন্তানরা এতিম হয়ে যায়। যারা মারে তারা পালিয়ে জীবন ধারণ করে ঠিকমতো ঘুমাতে পারে না, নিয়মিত খাবার খেতে পারে না, স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারে না, আত্মীয় স্বজন মা, বাবা, ভাই বোন, প্রিয়জনের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে না। যারা খুন হয়ে মারা যায় তাদের পরিবার, এবং যে বা যারা মানুষ হত্যা করে, তার তাদের পরিবারে এক নারকীয় অশান্তি নেমে আসে। সংসারের সুখ-শান্তি বহুদূরে চলে যায়।

প্রিয় ভাইয়েরা উপরের কথাটি একটু ভালোভাবে বিচার করে দেখবার জন্য যারা মানুষ হত্যা করে চলছেন- তাদের প্রতি একান্তভাবে অনুরোধ জানাই। একথা সত্য প্রতিটি খুনের পিছনে কোনও কারণ আছে। যারা মরছে তারাও হয়তো কোনও খুনের সাথে জড়িত। কিন্তু খুনের বদলে খুন কোনও সমাধান বা প্রতিশোধ হতে পারে না। এতে সমস্যা ও অশান্তি আরও বৃদ্ধি করে। ধরা যাক কোনও সংসারের একজন ব্যক্তি মারা গিয়েছেন ফলে সে সংসারের একজন মা-বাবা-সন্তান হারিয়েছেন, একজন নারী তার স্বামীকে হারিয়ে বিধবা হয়েছেন, ছেলেমেয়েরা এতিম হয়েছে, এখন যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার এই পরিবারের কোনও সদস্য কোনও খুনের ঘটনার সাথে জড়িত হয় তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে– একবার এই পরিবারের একজন খুন হয়ে পরিবার ও সংসারের বিরাট ক্ষতি হয়েছে আবার এই পরিবারের একজন খুনের বদলা খুন নিতে গিয়ে খুন করে সংসার ও পরিবার থেকে দূরে থেকে সংসার ও পরিবারে বিরাট ক্ষতি সাধন করছে। কাজেই খুনের বদলে খুন কোনও সমস্যার সমাধান দিতে পারে না, খুনের বদলে খুন আরও অশান্তি ও সর্বনাশ ডেকে আনে। কামারখন্দ থানার সেইসব ভাইয়েরা যারা মানুষ খুন করেছেন এবং আরও খুন করবেন বলে প্রতিজ্ঞা ধারণ করে চলছেন- এবং যারা খুনের বদলে খুন করবেন বলে শপথ নিয়েছেন- তাদের প্রতি একান্ত অনুরোধ দয়া করে এপথ ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসে বাবা-মা-ভাই বোন আত্মীয় স্বজনদের সাথে মিলে মিশে সুন্দরভাবে জীবন যাপন করুন।

এ স্বাভাবিক সুন্দর জীবনে ফিরে আসার উপায় হচ্ছে যারা খুন করেছেন তারা যাকে খুন করেছেন তার মা-বাবা, ভাই বোনদের কাছে গিয়ে ভুল স্বীকার করে তাদের পায়ে পরে তাদের কাছে নিজেকে আত্মসমর্পণ করুন– তাদের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিন, তাদের সাধ্য অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে চেষ্টা করুন। তাদের কাছ থেকে ক্ষমা ভিক্ষা

www.pathagar.com

চেয়ে নিন। যারা খুনের ঘটনায় জড়িত তারা উপরে উল্লেখিতভাবে কাজ করে মানসিক ও শারীরিক শান্তি ফিরে পেতে পারেন। নিজের মা-বাবা পরিবার পরিজন আপনার দ্বারা উপকৃত হবেন। যাদের নামে মামলা মোকদ্দমা বা পুলিশের খাতায় নাম আছে, যাদের কাছে অস্ত্র আছে তারা এই মুহূর্তে অস্ত্র পরিত্যাগ করুন, অস্ত্র থানায় জমা দিন এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে। এলাকার সংসদ সদস্যের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের ডি,সি-বা ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছে আত্মসমর্পন করুন, নিজের দোষ স্বীকার করে তাদের কাছে শাস্তি চান। আর কোনও অপরাধ করবেন না। বা আর কোনোদিন আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না বলে প্রশাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করে প্রতিশ্রুতি বা শপথ করুন। দেখবেন তারা নিশ্চয়ই তখন আপনাদের প্রতি নমনীয় ব্যবহার করবেন।

প্রিয় ভাইয়েরা কামারখন্দ এলাকার জনগণের সুখ ও শান্তির জন্য আপনাদের নিজেদের সুখ শান্তির জন্য আপনাদের মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী সন্তানদের সুখশান্তির জন্য উপরের বর্ণিত বক্তব্য মেনে নিন। খুনের বদলে খুন নয়, কেউ খুন হলে তার বিচার আইনের হাতে ছেড়ে দিন। অবশ্য অনেক জায়গায় মানুষ খুন হলে পুলিশ ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করে না, টাকা পয়সা খায় যার জন্য খুন হওয়া পরিবারে হতাশা নেমে আসে। কিন্তু এর এখানে কিছু না হলেও মাথার উপরে আল্লাহ আছেন তার বিচার থেকে কেউ রেহাই পায় না। তিনি অবশ্যই বিচার করবেন।

কাজেই ভাইয়েরা, যারা অস্ত্রহাতে নিয়েছেন ও মানুষ খুন করছেন তাদের এই লিফলেটের বক্তব্য পড়ে অবিলম্বে যাকে খুন করেছেন তার পরিবারের কাছে গিয়ে আত্মসমর্পণ করুন। যারা অস্ত্র ধরেছেন এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে অস্ত্র থানায় জমা দিন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে।

আল্লাহ কামারখন্দ থানার জনসাধারণের জীবনে সুখ-শান্তি বহাল রাখুন। কামারখন্দ থানায় যেন আর একফোটা মানুষের রক্ত মাটিতে বা পানিতে না পড়ে।

ভালোবাসার মাধ্যমে সেবার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর মানুষের হৃদয় জয় করা যায়– হিংসার মাধ্যমে ঘৃণার মাধ্যমে একজন মানুষের হৃদয় ও জয় করা যায় না। এই কথাটি আমাদের সবার মনে রাখা উচিৎ।

সবিনয় নিবেদনে ঃ
আবু মোহাম্ম খান (বাবলু)
পিতা ঃ মরহুম আব্দল মন্নাফ খান
গ্রাম+পোঃ = তামাই
থানা ঃ বেলকুচি, জিলা ঃ সিরাজগঞ্জ
২০/৯/২০০২

কামারখন্দ থানার কুড়া গ্রামের কৃতি সন্তান ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের একজন জাঁদরেল ছাত্র ও শিক্ষক আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু জামতৈল হাজী কোরাপ আলী মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ নজরুল ইলামের কথামতো এই লেখাটি এই বইতে অন্তর্ভূক্ত করা হলো।

www.pathagar.com

বিষয় : আর্মি গলফ ক্লাবে (নিকুঞ্জ) মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেনাবাহিনীর সদস্য বা সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ফিতে মেম্বারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদন।

২৬শে মার্চ, ২০০৪ ইং
মাননীয়
লে. জেনারেল হাসান মাশ্‌হুদ চৌধুরী
বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেনা সদর দপ্তর
ঢাকা।

মহাত্মন
সবিনয় নিবেদন এই যে, ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের আমি একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য বা মুক্তিযোদ্ধা। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ৬নং সেক্টরের দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী সাব সেক্টরের (নীলফামারী জেলার)– অধীনে সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার হিসাবে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি। মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের আমার নাম ঠিকানা তালিকাভূক্ত রয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্রও আমি পেয়েছি যা এ আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করে দিলাম।

আপনার কাছে বিনীত নিবেদন এই যে, আর্মি গলফ ক্লাবে মেম্বার হতে হলে যারা সরকারি কর্মচারী তাদের ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার মতো ফিস দিতে হয় এবং সেনাবাহিনীর সদস্যদের মনে হয় আরও কম দিতে হয়। আমি সরকারি কর্মচারী নই, কিন্তু গলফ খেলি, আমি আর্মি গলফ ক্লাবে (নিকুঞ্জ) মেম্বার হতে চাই এবং নিয়মিত গলফ খেলতে চাই। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সরকারি কর্মচারী অথবা সেনাবাহিনীর সদস্যদের জন্য যে হারে ফিস প্রযোজ্য তাই দিয়ে যাতে মেম্বার হতে পারি তার জন্য আমি আপনার সাহায্য সহযোগিতা কামনা করি। ১৯৭১ সনের মে/জুন মাসে সেই হিমালয়ের পাদদেশে মূর্তিপাহাড় থেকে এফ,এফ হিসাবে ২ মাসের ট্রেনিং নেই। ট্রেনিং শেষে প্রায় ৬ মাসে দিনে রাতে সমানে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার হিসাবে যুদ্ধ করি। আমি ঢাকা কলেজ থেকে আই,এ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে অনার্সসহ মাষ্টার্স ডিগ্রি নিয়েছি।

আশা করি আপনি সহৃদয়ের সাথে বিবেচনা করে একজন মুক্তিযোদ্ধার আবেদনের প্রতি ন্যায় ও সুবিচার করবেন। একজন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সরকারি কর্মচারী আর্মি

www.pathagar.com

গলফ ক্লাবে মেম্বার হতে যে সুযোগ পায় একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সেই সুযোগ না দেওয়ার কোনও যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে না। আপনার কাছ থেকে আমি ন্যায় বিচার পাব বলে বিশ্বাস করি।

আন্তরিক শ্রদ্ধাসহ
আপনার একান্ত বিশ্বস্ত,

আবু মোহাম্মদ বাবলু
পিতা মৃত আবদুল মোন্নাফ খান
৩৮৩/২, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম ও পোঃ তমাই
উপজেলা : বেলকুচি, জেলা : সিরাজগঞ্জ
ফোন : ৯৬৬৯৫৪৪
আজ ৫/১০/২০০৮ তারিখ পর্যন্ত এ দরখাস্তের কোনো জবাব আসেনি।

www.pathagar.com

বিষয় : রমনা (সরওয়ার্দী) ময়দানে একজন গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সহকারী প্রকৌশলীকে পোস্টিং দেবার জন্য আবেদন।

মাননীয় তাং ০৩.০৬.২০০৭ ইং

সচিব সাহেব

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা।

মহাত্মন,

সবিনয় নিবেদন এই যে, রমনা ময়দান ঢাকা শহরের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ময়দান। এটা ঢাকা শহরের ফুসফুস বা আত্মা। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ময়দান আজ নানা প্রতিকূল অবস্থায় পরে ধ্বংস হবার পথে। কাজেই এই রমনা ময়দানের জন্য একজন সার্বক্ষণিক অভিভাবক দরকার, যিনি রমনা বা সরওয়ার্দী ময়দানকে ধ্বংসের হাত রক্ষা করে উন্নয়নের কাজ করবেন। এর জন্য জরুরি ভিত্তিতে রমনা ময়দানের জন্য একজন সহকারী প্রকৌশলী বা এস,ডি,ওকে পোস্টিং দেওয়া, যার অফিস হবে রমনা ময়দানে।

রমনা ময়দানে পোস্টিং প্রাপ্ত উক্ত সহকারী প্রকৌশলী সাহেব নিম্নলিখিত কাজগুলো জরুরি ভিত্তিতে করবেন-

১। রমনা ময়দান রক্ষা করা এবং এর উন্নতি করা।

২। রমনা ময়দানে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভের আয়তন নির্দিষ্ট করে দিবেন।

৩। রমনা গলফ কোর্সের আয়তন ঠিক করে দিবেন, বর্তমানে গলফ কোর্সের আয়তনের বাইরে তারা যেন আর না যায় এবং সকাল ৭টা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত গলফ খেলবে। বাকী সময় গলফ ময়দান পি,ডাব্লিউ, ডির দখলে থাকবে।

৪। রমনা কালী মন্দিরের আয়তন এখন যতটুকু আছে এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, এর বেশি জায়গা যেন দখল না করে।

৫। রমনা ময়দানের মর্নিং ওয়াকারদের অসমাপ্ত ওয়াকওয়ের অসমাপ্ত নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা।

৬। আরবরি কালচার বিভাগের লোকেরা রমনা ময়দানের ভিতরে কোন গাছ যেন না লাগায়, তারা শুধু রমনা ময়দান ওয়াকওয়ের বৃত্তের বাইরে গাছ লাগাবে বা বাগান করবে।

উল্লেখিত বিষয়গুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়ণ করার জন্য জরুরি ভিত্তিতে রমনা ময়দানে একজন সহকারী প্রকৌশলীকে গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে পোস্টিং দেবার জন্য আবেদন জানাই। যার অফিস হবে রমনা ময়দানে

www.pathagar.com

আমার আবেদন সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করে দেখার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

ধন্যবাদসহ

আপনার একান্ত বিশ্বস্ত
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক
প্রিন্স টাওয়ার, ১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

১৯৯৫ সনে বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট

গত কয়েকদিন যাবৎ দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ ধর্মঘট করে চলেছেন, তাদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে একটি দফা রয়েছে- সরকারি কলেজ-স্কুলের শিক্ষকদের সমান সুযোগ-সুবিধা ও সমান বেতন স্কেল দিতে হবে।

ন্যায় বিচারের স্বার্থে, সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার স্বার্থে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের এই দাবিটি মেনে নেয়া যায় না। সরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পরীক্ষার ফলাফল অবশ্যই বেসরকারি শিক্ষকদের চেয়ে ভালো; আর যদি ক্ষেত্র বিশেষে ভালো নাও হয় তবুও তারা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে সরকারি স্কুল-কলেজে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করেছেন। তার ওপরে রয়েছে তাদের বদলি সংক্রান্ত ঝামেলা। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষকদের সকলের কি সরকারি কলেজ-স্কুলের শিক্ষকদের সমান শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে? সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যেভাবে নিয়োগ পেয়েছেন বেসরকারি শিক্ষকরা কি সেভাবে নিয়োগ পেয়েছেন? সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা যেভাবে বদলির ঝামেলা সহ্য করেন বেসরকারি শিক্ষকদের কি তা করতে হয়? উত্তর অবশ্যই না।

এ লেখাটি লিখবার সময়ে আমি ভুলে যাইনি যে বেসরকারি স্কুল-কলেজেও এমন বহু শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রয়েছেন যাদের যোগ্যতা, বিদ্যার পরিধি, শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা এবং সততার মান অনেক উচ্চে। তবে এরা সংখ্যালঘিষ্ঠ, অবশ্যই সংখ্যা গরিষ্ঠ নন। এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ সৎ যোগ্য, নিষ্ঠাবান শিক্ষক যারা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন এরা আবার এদেরই কলিগ বা সহযোগী অসৎ ফাঁকিবাজ, শিক্ষকদের দ্বারা যেভাবে অত্যাচারিত-নির্যাতিত হন তা খুবই বেদনাদায়ক। সেটা আর এক অধ্যায়, ভিন্ন এক চিত্র, সে প্রসঙ্গ এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে যথাযথ ব্যবস্থা ব্যতীত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সমান হলে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ন্যায় বিচারের ভিত্তির অবসান হবে। যার যেমন যোগ্যতা তার তেমন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত। বর্তমানেও মনে হয় কোনও কোনও ক্ষেত্রে সরকারি শিক্ষক এবং বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন স্কেল এক বা সমান বেতন পান। তবে পার্থক্য এই যে, সরকারি শিক্ষকরা মাসে মাসে বেতন পান, বেসরকারি শিক্ষকরা তিনমাস পরে মাসিক বেতনের ৭০ ভাগ পান। বাকি ৩০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রীদের বেতন থেকে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয় থেকে নিতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে বেসরকারি শিক্ষকদের একটি সমস্যার কথা তুলে ধরতে চাই, যার সমাধান হওয়া খুবই জরুরি প্রয়োজন। বর্তমানে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতন যে ৭০ ভাগ সরকার থেকে দেয়া হয় তা মনে হয় প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল বা প্রধান শিক্ষকের নামে সব শিক্ষকের বেতন তিন মাস পরে পরে একসাথে

www.pathagar.com

দেওয়া হয়। কিন্তু কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকরা কিছু কিছু শিক্ষকদের সরকার প্রদত্ত এই ৭০ ভাগ বেতনের টাকা ঠিকমতো দেন না। কোনও কোনও শিক্ষকদের সরকারের দেয়া এই অর্থ কেউ কেউ একেবারেই মেরে দেন, কেউ কেউ আবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে টাকাকে পয়সা বানিয়ে তারপর দেন বলে অনেক অভিযোগ শোনা যায় বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের বিরুদ্ধে। কাজেই এই সমস্যাটির সমাধান হওয়া একান্ত দরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানর নামে সব শিক্ষক-কর্মচারীর অর্থ তিন মাস পরে এক সাথে না দিয়ে থানা সদর থেকে প্রতিটি শিক্ষক-কর্মচারীর নামে প্রতি মাসে একাউন্টস পেয়ি চেকের মাধ্যমে সরাসরি বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারি বেতনের অর্থ দেবার ব্যবস্থা করা হোক। তবে প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপাল সাহেবরা যদি যুক্তিসঙ্গত কারণে কোন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন বন্ধ করার জন্য সুপারিশ করেন,তবে তা বাস্তবায়িত হতে হবে। তা না হলে প্রধান শিক্ষক বা প্রিন্সিপাল সাহেবদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হবে এবং প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে চলবে না

(লেখক ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক)

দৈনিক সংবাদ, মঙ্গলবার ২৭শে বৈশাখ, ১৪০১ বাংলা সন ইংরেজী ১৯৯৫ সন

বিঃ দ্রঃ- ১৯৯৫ সনে দৈনিক সংবাদে এই লেখাট ছাপা হবার পরে বেসরকারি শিক্ষকদের প্রায় ২০টি আমাকে অভিসম্পাদ করে লেখা চিঠি দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়। কোন সরকারি স্কুল কলেজের কোনও শিক্ষক আমার পক্ষে একটি চিঠি লেখেন নাই। তবে ঐ সময়ের শিক্ষা মন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার সাহেব আমাকে সচিবালয় তার দপ্তরে ডেকে নিয়ে ধন্যবাদ দেন এবং এক পিস কেক এবং বড় এক কাপ কফি খাওয়ান।

মুক্তিযোদ্ধা সি,এস,পি সচিব কাজী রকিবউদ্দিন আহমদ সংবাদ-এ প্রকাশিত আমার এ লেখাটি পড়েছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন- আল্লাহ যদি কোনওদিন সুযোগ দেন তবে তোমার কথা মতো শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নামে চেক দেয়ার ব্যবস্থা করবো। পরে তিনি যখন ১৯৯৮ সনে শিক্ষা সচিব হন, তখন শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেব ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সম্মত করিয়ে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নামে মাসে মাসে চেক দেবার ব্যবস্থা করেন। এতে দেখা যায় আগের চেয়ে বছরে ৪০০ কোটি টাকা কম খরচ হয়। প্রধান শিক্ষক ও অধ্যক্ষ সাহেবেদের নামে আগে একসাথে বেতনের টাকা পাঠানোর সময় ঐ সময়ে ১৯৯৮ সনে বছরে ১৬০০ কোটি টাকা খরচ হতো, পরে যখন ব্যক্তিগত নামে চেক পাঠান শুরু হয় তখন দেখা যায় ১২০০ কোটি টাকা খরচ হয়। বছরে রাষ্ট্রীয় এই ৪০০ কোটি টাকা চুরি হওয়া থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছেন- জননেত্রী শেখ হাসিনা, শিক্ষামন্ত্রী সাদেক সাহেব, এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিন আহমদ, আর শিক্ষা সচিব কাজী রকিবউদ্দিন সাহেব আমার এই লেখাটি পড়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান এবং বার্মার নাগরিকদের মধ্যে অবাধ চলাফেরা ও পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার

১৯৭১ সনে বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, পঁচিশ কোটি বাঙালির গর্ব, শ্রদ্ধেয় সিদ্ধার্থ শংকর রায়, ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র ও প্রতিরামন্ত্রী, জিন্নাহ ভারত, দেশভাগ, স্বাধীনতা বইয়ের লেখক, শ্রদ্ধেয় যশবন্ত সিংহ, প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধেয় অর্থনীতিবিদ, আপিলা চাপিলা গ্রন্থের লেখক, পশ্চিম বাংলার সাবেক অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র, বাঙালনামা বইয়ের লেখক, শ্রদ্ধেয় তপন রায় চৌধুরী শ্রদ্ধাস্পদেষু, এই লেখার বক্তব্য বাস্তবে রূপ দেবার জন্য আপনাদের সদয় সাহায্য কামনা করি।

সার্কভুক্ত দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, 'আফগানিস্তান, নেপাল, ভূটান এবং বার্মার নাগরিকদের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করার সুযোগ দেয়া এবং এসব দেশের নাগরিকরা যাতে অবাধে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে পারে তার ব্যবস্থা করার সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার।

এক দেশ থেকে আরেক দেশে মানুষ যাতায়াত করবে এটাই স্বাভাবিক। এটাকে আইন করে জোর জবরদস্তি করে বন্ধ করা খুবই অন্যায় ও মানবতা বিরোধী কাজ। সাথে সাথে দেশের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিরাট আঘাত করে তাদের ক্ষতি করা হচ্ছে। সারা দুনিয়াতে মানুষ অবাধে যাতায়াত করবে এটাই আমাদের পবিত্র কোরআনের শিক্ষা, পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অমান্য করা খুব বড় ধরনের বা কবিরা গুনাহ। পবিত্র কোরআনের নির্দেশে মানুষের ক্ষতি করার কোন বিধান বা বক্তব্য নেই। কোরআন শরীফের নির্দেশ-আদেশ মেনে চললে মানবজাতির কল্যাণ সাধিত হয় বা হবে। পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বহুবার উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ সমগ্র পৃথিবীর মালিক ও স্রষ্টা, তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সৌদি আরব সৃষ্টি করেন নাই, ভারত, চীন, রাশিয়া আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়াসহ সমগ্র পৃথিবী গ্রহ-নক্ষত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি শুধু মুসলমান সমাজকে সৃষ্টি করেন নাই হিন্দু, খৃষ্টান, ইহুদি, শিখ সবাইকে সৃষ্টি করেছেন– সমস্ত পশুপাখি সৃষ্টি করেছেন, আল্লাহ কোআন শরীফে বনি আদমের সমস্ত সন্তানদেরকে সমস্ত পৃথিবীর বুকে তেজারত বা ব্যবসা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ পাকের উক্ত কোরআনের নির্দেশকে অমান্য করে নাগরিকদের এক দেশ থেকে অবাধে অন্যদেশে চলাচল করার সুযোগ না দিয়ে অবাধে ব্যবসা করার সুযোগ না দিয়ে কিভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তা উল্লেখ করতে চাই।

বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী প্রায় ১৫ লাখ লোক চাকরি করেন। এই ১৫ লাখ লোকের সাথে আরও ৫ জন যোগ করলে সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৫ লাখ। এই ৭৫ লাখ লোক একটি বিরাট শক্তিশালী গোষ্ঠি বা সম্প্রদায়, এরা দুঃখ কষ্টে মোটামুটি ভালোই

www.pathagar.com

আছেন। মোট কথা ১৫ লাখ লোকের বেঁচে থাকার জন্য একটি কাজের অবলম্বন আছে।

যদি একদেশ থেকে অন্যদেশে অবাধে বাংলাদেশের মানুষ প্রবেশ অধিকার, বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য অন্যদেশে ক্রয়-বিক্রয় করার অধিকার পেতো তবে কমপক্ষে ১৫ লাখ লোকের কর্মের সুযোগ হতো, এতে আরও ৭৫ লাখ লোকের জীবনধারনের মান বেড়ে যেতো।

দ্বিতীয়ত : অনুরূপভাবে ১০/১৫ লাখ লোক বাংলাদেশে বিভিন্ন দ্রব্য বিক্রি ও ক্রয় করার জন্য আসতো সব সময়। এতে বাংলাদেশের হোটেল ব্যবসায়ী, ট্রেন, বাস ও রিক্সার মালিকরা পরিবহনের জন্য বিপুল অর্থ আয় করতো। বাংলাদেশের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে এদেশের বিরাট জনগোষ্ঠী লাভবান হতো।

কোরআন শরীফের সুরা জুমা'আতে বর্ণিত রয়েছে- "ইয়া আইয়োহাললাজিনা আমানু ইজা নুদিয়ালেছ ছালাতে মিঁউ ইয়াওমেল জুমুয়াতে ফাছাও ইলা জিকরেল্লাহি ওজারুল বাইয়া, জালিকুম খায়রোললাকুম ইন কুনতুম তাআলামুন। ফাইজা কুদিয়াতেসসালাতু ফানতাছিরু ফিল আরদে ওয়াবতাগুমিন ফাদলিল্লাহে ওয়াজকুরুল্লাহাকাছিরাল লায়াল্লাকুম তুফলেহুন।........ ও আল্লাহু খায়রুর রাজেকিন।

এর বাংলার তর্জমা হচ্ছে- "হে ইমানদারগণ যখন জুমআর দিনে জুমার নামাজের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর জিকরের দিকে ধাবিত হও, এবং ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ কর, ইহা তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। অতপর নামাজ সমাপ্ত হবার সাথে সাথে তোমরা সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়, (চলাচল কর) আল্লাহর প্রদত্ত পথে জীবিকা অন্বেষণ কর এবং সাথে আল্লাহকে ডাকো যাতে তোমাদের সফলতা হয়।..... আল্লাহর সর্বাপেক্ষা উত্তম জীবিকা প্রদানকারী।"

এইভাবে পবিত্র কোরআনের নির্দেশকে অমান্য করে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। কোরআন, রামায়ন, মহাভারত, বাইবেলের শিক্ষাও অনুরূপ, এসব পবিত্র গ্রন্থেও মানুষ একদেশ থেকে অন্যদেশে অবাধে যাতায়াত ও ব্যবসা করেছেন।

৩০.১০.২০০৮ তারিখে বাংলাদেশে এক কেজি চাউলের দাম ৪০ টাকা, ভারতে এ চাউল এক কেজির দাম ১২ রুপি বাংলাদেশের টাকায় ২০ টাকা। অর্থাৎ অবাধে পণ্য যাতায়াত থাকলে বাংলাদেশের মানুষ এক কেজি চাউল বড় জোর ২৪ টাকায় কিনতে পারতো।

ভারতে এক মন পাট বাংলাদেশের টাকায় ২০০০ (দুই হাজার) টাকা, বাংলাদেশে এক মন পাটের দাম ৮০০ টাকা যা ভারতের ৫০০ রুপি। যদি অবাধে ভারতে পাট পাঠানো করা যেতো তবে বাংলাদেশের কৃষক এক মন পাটের দাম পেতো দুই হাজার টাকার উপরে। এক মন পাট উৎপাদন করতে কি কষ্ট করতে হয় তা যারা গ্রামে থাকেন এবং পাট উৎপাদন খুব কাছ থেকে দেখেন তারাই বুঝতে পারেন, কি কঠিন কষ্ট অথচ সেই কষ্টের উৎপাদিত পাটের উচিৎ দাম কৃষকরা পান না আল্লাহর কোরআনের আদেশ না মানার জন্য। কোরআন শরীফ নাজিলের সময় বাইবেল, রামায়ন, মহাভারতের

www.pathagar.com

যুগেও আজকের মতই বিভিন্ন রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল, এক এক দেশে ভিন্ন ভিন্ন সরকার ও সরকারী কর্মচারী ছিল। কাজেই আমি রাষ্ট্রবিলুপ্ত করার কথা ভাবিনা বা বলছিনা। আমি বলছি রাষ্ট্র থাকবে, রাষ্ট্রের নিজস্ব সীমানা থাকবে, রাষ্ট্রের নিজস্ব সেনাবাহিনী, কর্মচারী থাকবে শুধু একদেশের নাগরিকদের অন্যদেশে অবাধে যাতায়াত ও পণ্যদ্রব্য বিক্রির সুযোগ করে দিতে হবে।

১৯৮০ সন থেকে সার্কের সমস্ত রাষ্ট্র প্রধানরা সার্কের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করার সময়ে বলেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ভিসামুক্ত সার্ক করার, কিন্তু সার্কের সম্মেলন থেকে নিজ দেশের নিজ অফিস কক্ষে ফিরে গিয়েই আবার ভেদাভেদ হানাহানি সংকীর্ণ চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে নিরাপত্তার অজুহাত তুলে সার্কের ভিতরে একদেশের মানুষ যাতে অবাধে যাতায়াত করতে না পারেন তার জন্য বিধি নিষেধ আরোপ করে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রকাশ্য লোকালয়ে একধরনের কথা বলেন, গোপনে চেয়ারে বসে তার উল্টা কাজ করেন যা খুবই দুঃখজনক। যাক যা হবার তা হয়েছে এখন আর দেরি না করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ, অবাধে মানুষের একদেশ থেকে অন্যদেশে যাবার ও পণ্যদ্রব্য বিক্রি করার সুযোগ দেবার।

আমি সার্কের রাষ্ট্র প্রধানদের প্রতিশ্রুতি ভিসামুক্ত সার্ক চাইনা আপাত; আমি চাই ভিসা সহজকরণ। এর জন্য ভারত সরকারের কাছে আমার দাবী আপনারা বাংলাদেশের প্রধান ৪টি শহরের ট্রাভেল এজেন্টদের মধ্যে থেকে ঢাকায় একশত জন এবং চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহীতে যেখানে আপনাদের দূতাবাস আছে সেখানে একশত জন মোট দুইশত ট্রাভেল এজেন্ট নিয়োগ করুন। তারা হাইকমিশনের প্রদত্ত ভিসা ফরম সরবরাহ করবেন, ফরম পূরণ করে তার ভুলত্রুটি পরীক্ষা করে হাইকমিশন থেকে ভিসা করিয়ে এনে ভিসা প্রার্থীদের ফেরৎ দিবেন। এর জন্য ট্রাভেল এজেন্টরা তিনশত টাকা করে রশিদ দিয়ে ফিস নিবেন। এর মধ্যে একশত বিশ টাকা নেবেন বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বোর্ড, ১২০ টাকার মধ্যে ৭৫ টাকা আয়কর বাবদ এবং ৪৫ টাকা মূল্য সংযোজন কর হিসেবে। ট্রাভেল এজেন্টরা নেবেন তাদের সার্ভিস চার্জ বাবদ বাকি ১৮০ টাকা।

বর্তমানে ভারতের হাইকমিশন ভিসার জন্য স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া দুইশত টাকা ফিস নেন, এবং এটা শুধু ঢাকার স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া জমা দেবার বিধান। এটা ভারতের মত একটি বড় রাষ্ট্রের জন্য একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। আইন-নিয়ম তৈরি করে প্রতিদিন পাঁচ হাজারের মত মানুষকে একটি অফিসে যেতে বাধ্য করে তাদের অমানুষিক শারীরিক, মানসিক নির্যাতন ও সময়ের অপচয় করানো একটি ঘৃণ্য অপরাধ। ভারতবর্ষ একটি প্রাচীন মর্যাদাপূর্ণ দেশ, এখনও এই দেশে পৃথিবীর সবচেয়ে গুণী ও ভালো লোকদের বসবাস বলেই আমার বিশ্বাস। রামায়ণ-মহাভারতের মত মহান গ্রন্থ যে দেশের প্রেরণার উৎস, সেই দেশের বাংলাদেশের হাই কমিশনে ভিসার জন্য এমন শাস্তি পেতে হয় তা দুঃখজনক।

সহজ ভিসার জন্য আমি যা বলেছি সেভাবে যদি ভারতের হাই কমিশন দুইশত ভিসা এজেন্ট নিয়োগ দান করেন, দুইশত এজেন্টের মাধ্যমে ভিসা ফরম গ্রহণ ও

www.pathagar.com

বিতরণের বিধান করা হলেই বাংলাদেশের মানুষদের বিরাট উপকার হবে। দ্বিতীয়ত: এই দুইশত ট্রাভেল এজেন্টগণ এর জন্য প্রতিমাসে ৯০ হাজার টাকা করে, বছরে ১০,৮০,০০০/- টাকা উপার্জন করবেন। এতে এইসব ট্রাভেল এজেন্ট-এর মালিক ও কর্মচারীরা তাদের পরিবারের সদস্যরা ভারত ও ভারত সরকারের প্রতি অনুরাগী হবেন। এর ফলে ভারত সরকারের একটি বিরাট সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি সৃষ্টি হবে বাংলাদেশে।

আর এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বার্মাসহ সব দেশের সরকার বা এ্যাম্বেসীর উচিৎ অনুরূপভাবে ভিসা ফরম গ্রহণ ও ভিসা প্রদানের জন্য এজেন্ট নিয়োগ দেওয়া, যারা ভিসা ফরম গ্রহণ এবং সেখান থেকে ভিসাযুক্ত পাসপোর্ট ফিরিয়ে দিবেন।

এছাড়াও রয়েছে এক মাসের বেশি ভিসা প্রদান করা হয় না, এটা বিরাট অন্যায়, ট্যুরিষ্ট ভিসা ছয়মাস এবং যারা পণ্যদ্রব্য বিক্রি করতে যাবে তাদের এক বছর মেয়াদের ভিসা দেওয়া উচিৎ। দৈনিক ৫ ডলার হিসেবে প্রতিদিনের জন্য কেউ যদি ১৮০ দিনের ৯০০ ডলার ক্রয় করে তবে তাকে ছয় মাসের ট্যুরিষ্ট ভিসা দিতে হবে।

এক বছর মেয়াদের পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যারা ভিসা চাইবেন, তাদের জন্য একটি পাঁচ/দশ হাজার টাকার ট্যাক্স দেবার বিধান করা যেতে পারে।

উপরের আমার মতামতের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কোটি কোটি লোক উপকৃত হবেন।

পবিত্র কোরআনের সুরা বাকারায় রয়েছে, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে মাথা নত করার চাইতে বিদেশী মুসাফির-পর্যটকদের সাহায্য ও সহযোগিতা করলে বেশী পুণ্য হবে। আর যেদেশে যত বেশী মুসাফির ও পর্যটক আসে সেদেশ তত বেশী লাভবান হয়। মানুষের কল্যাণের জন্য আল্লাহ তায়ালা বিদেশী মুসাফির ও পর্যটকদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য কোরআনের মাধ্যমে মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। সুরা বাকারার ১৭৭ আয়াত এর বর্ণনা ঃ- "লাইছাল বেররানতু ওয়াল্লাহু অজুহাকুম কেবলাল মাশরেকে ওয়াল মাগরেবে ওয়ালা কিন্নাল বেররামান আমানা বিল্লাহে ওয়াল ইয়াওমেল আখেরে ওয়াল মালয়িকাতে ওয়াল কিতাবে ওয়ান্নাবিয়িনা, ওয়াতাল মালা ওয়ালা হুববেহি জারেল কুরবা ওয়াল ইয়াতিমা ওয়াল মিছকিনা ওবনাছছাবিল, ওয়াছছা ইলিনা ওফিররেকাব, ওয়াকামাছছালাতা ওয়াতা জাকাতা, ওয়াল মুফুনা বেয়াহাদেহিম ইজা আহাদু ওয়াছছাবেরিনা ফিল বাছছায়ে ওয়াদদার রাআয়ে আইনালবাছে, উলাইকাললাজিনা ছাদাকু, ওয়াউলায়েকা হুকুমুলমুততাকুন"। বাংলায় তরজমা হচ্ছে ঃ- "সকল পুণ্য ইহাতে নহে যে, তোমরা শুধু স্বীয় মুখকে পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিকে নত করে প্রার্থনা কর, বরং সবচেয়ে পুণ্য বা নেক কাজ ইহাতে- যে ব্যক্তি ঈমান রাখে আল্লাহ'র প্রতি, কিয়ামতের প্রতি, ফেরেস্তাগণ, পবিত্র কোরান এবং নবীগণের প্রতি, আর সাধ্যানুযায়ী অর্থ প্রদান করে- গরীব আত্মীয় স্বজনকে, এতিমদিগকে, বিদেশী মুসাফির বা পর্যটকদেরকে, ভিক্ষুকদিগকে, দাস-দাসীদের মুক্তির জন্য এবং নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে, যাহারা বিপদে-আপদে, ধর্মযুদ্ধে,

www.pathagar.com

অভাব-অভিযোগে, অসুখে-বিসুখে আলল্লাহর নামে ধৈর্য্যধারণ করে, তাহারাই তো সত্যিকারের মোমেন বা মুসলমান, সত্যিকারের মানুষ এবং প্রকৃত খোদা ভীরু।"

[সূত্র : পবিত্র কোরানের সুরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াত। মূল : তফসীর মারেফুল কোরান, হযরত মওলানা মুহাম্মদ শাফী (রহঃ), অনুবাদ : মওলানা মহিউদ্দিন খান। খাদেমুল হারমাইন বাদশাহ ফাহাদ কোরান মুদ্রণ প্রকল্প]

৩/১০/২০০৮

আমাদের মনে রাখা দরকার আল্লাহ পবিত্র কোরআনে হালালপথে জীবিকা অর্জন বা তেজারত করার জন্য এবাদত-বন্দেগী করার জন্য, জ্ঞান অর্জনের জন্য সম স্ত পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং দক্ষিণ থেকে উত্তরে যত জায়গা আছে সব জায়গায় যাবার জন্য বারবার নির্দেশ প্রদান করেছে। কাজেই কোন মানুষের একস্থান বা একদেশ থেকে অপর দেশে যাওয়া আসার কাজে বাধা দেওয়া যিনি এই পৃথিবী ও মানুষ স"ষ্টি করেছেন সেই শ্রষ্টার নির্দেশ অমান্য করা।

হিন্দু ধর্ম তথা মহাভারতের শিার একটি অন্যতম শক্তিশালী স্তম্ভ অতিথি আপ্যয়ন ও অতিথির সেবা করা। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সামনে ভীস্ম আচার্য যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নের জবাবে বলেছেন পৃথিবীতে স্বশরীরে বেঁচে থাকার কোন উপায় নেই, তবে মৃত্যুর পরে অনেকদিন কোন ব্যক্তির নাম যশ পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে, যদি অতিথিকে সেবা ও আদর-আপ্যয়ন করে। আজ দুঃখজনকভাবে ভারতের কিছু অর্বাচীন আমলার কারণে ভারত ভ্রমণ করা খুব কষ্টকর, ভিসা জটিলতার জন্যে। শুধু পাসপোর্ট থাকলেই ভ্রমণের সুযোগ দেওয়া উচিৎ। তা যদি না হয় তবে ভিসা সহজ একান্ত কর্তব্য। যত লোক ভিসা চায় সবাইকেই ভিসা দিতে হবে, কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না। আজ বাংলাদেশের কাউকে এক মাসের বেশি ভিসা দেওয়া হয় না। তাহলে বাংলাদেশে ধর্মভক্ত হিন্দুরা কিভাবে ভারতে তীর্থে ধর্মীয় সফরে যাবে? মথুরা-বৃন্দাবন, বেনারশ কাশি, গয়া, প্রায়াগ, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরসহ আরও যেসব তীর্থ স্'ান রয়েছে এসব জায়গায় একজন তীর্থযাত্রী যদি সাতদিন করে অবস্'ান করতে চান তবে কমপে তিনমাস সময়ের প্রয়োজন। অথচ একমাসের বেশি ভিসা না দিয়ে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মচারিগণ মারাত্মক হিন্দুধর্ম বিরোধী কাজ করে চলছে। আর দুঃখজনক যে এটা বলার জন্য কেউ এগিয়ে আসছেন না।

মনে রাখা দরকার হাজার বছর যাবৎ বাংলাদেশ, ভারত, পাকি স্তান, বার্মা, আফগানিস্তান, নেপাল একদেশ ছিল, ১৯৪৭ সনে ভাগ হয়েছে, বাংলাদেশের দুই কোটি হিন্দুর ভারতে এবং ভারতের পঞ্চাশ লাখ মুসলমানের বাংলাদেশে রক্তের সম্পর্ক আত্মীয় রয়েছে। ১৯৮০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশের বিডিআর বর্ডারে রাতে-দিনে এক-দুইবার পেট্রোলে আসতো অন্যসময় বিওপিতে সময় কাটাতো, ১৯৯০ সনের আগে ভারতের বিএসএফ দিনে-রাতে একবার/দুইবার পেট্রোলে আসতো অন্যসময় বিওপিতে সময় কাটাতো, তারমানে ১৯৯০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ-ভারতের বর্ডার খোলা ছিল। সীমান্ত অঞ্চলের লোকজন অবাধে যাতায়াত করেছে, এতে ভারত বাংলাদেশের কোন তি হয়

www.pathagar.com

নাই, ল ল মানুষ লাভবান হয়েছে। প্রতিদিন কয়েক ল লোক ভারতে গিয়ে শ্রম বিক্রি করে অর্থ দ্বারা কিছু জিনিসপত্র কিনে এনে বাংলাদেশে বিক্রি করে লাভবান হতো ১৯৯০ সন পর্যন্ত, এবং ভারতের লোকেরাও স স্তায় শ্রম কিনে উপকৃত হয়েছেন। আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় বাংলাদেশে অস্ত্র নিয়ে এসেছে এমন কোন তথ্য বা রেকর্ড নেই। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের কোন লোক ভারতে অস্ত্র নিয়ে গিয়ে ধরা পড়েছে তারও কোন তথ্যপ্রমাণ আছে বলে জানি না। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অস্ত্র পাচারের যে অভিযোগ উঠেছে তা কোন সাধারণ পাবলিকের বিরুদ্ধে নয়। যারা নামায পড়ে, রোজা থাকে তাদের বিরুদ্ধে নয়। অসাধারণ মানুষ সেনাসদস্য রেজ্জাকুল হায়দারদের বিরুদ্ধে, কাজেই এরজন্য নিরীহ সাধারণ মানুষ ধর্মপ্রাণ মানুষ কেন চরম দুঃখ-কষ্ট পাবে তা বোধগম্য নয়।

বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ ভারতের আজমীর শরীফে, দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে, ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের, দিল্লির নিজামউদ্দীন আউলিয়ার মাজারে নিজেদের পয়সা নিয়ে গিয়ে একমাস, দুইমাস, পনের দিন, সাতদিন, প্রাণে শান্তির জন্য থাকতে চান। কিন্তু ভারতীয় ভিসা জটিলতার জন্য তা হচ্ছে না, নিরাপত্তার কথা বলে ভিসা কড়াকড়ি করা হয়, সাধারণ পাবলিক বা মানুষের জন্য। এ পর্যন্ত যেসব বোমা মেরে ধ্বংসাত্মক কাজ করে মানুষ হত্যা করা হয়েছে তার যেসব তথ্য বেরিয়ে এসেছে তা থেকে দেখা যাচ্ছে এসব নারকীয় মানুষ হত্যার কাজে ওইসব দেশের সেনাসদস্য ও নিরাপত্তার সদস্যরাই করেছে, এ পর্যন্ত কোন সাধারণ পাবলিক এইসব বড় ধরনের কাজ করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, আমেরিকান টুইন টাওয়ার ধ্বংস আমেরিকার বুশ প্রশাসন করেছে বলে এখন অনেকেই মনে করছে। ১৯৯২ সনে বম্বের ওয়াল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংস করার জন্য বম্বের ১৪জন পুলিশের বিচারে চারজনের ফাঁসি ১০ জনের যাবজ্জীবন জেল হয়েছে, বাংলাদেশে অনেক কয়জন সামরিক অফিসার জেল হাজতে রয়েছেন নিরীহ পাবলিকের উপর গ্রেনেড মেরে মানুষ হত্যার জন্য ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিউয়ের ঘটনায়। যেসব গ্রেনেড বোমা মারা হয় তার দাম অনেক। এগুলো সেনাবাহিনী উৎপাদন ও ক্রয়-বিক্রয় করে। পৃথিবীর কোন সাধারণ মানুষ এসব উৎপাদন বা সরবরাহ করে না। কাজেই এসব অস্ত্র প্রয়োগের জন্য নিরীহ জনগণ কেন খেসারত দিবে তা ভেবে পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও ভিসা নিয়ে যারা সীমান্তে যাতায়াত করে তাদের উন্নতমানের স্ক্যানার মেশিন দিয়ে কঠিনভাবে তল্লাসি করা হয়ে থাকে।

নিরাপত্তার কথা বলে ভিসা কমানো খুব অন্যায় এবং ইসলাম ও হিন্দুধর্ম বিরোধী কাজ। এছাড়াও ভারতে আগ্রার তাজমহল, কুতুব মিনার, ফতেপুর সিক্রি, হুমায়ুন টম্বসহ যেসব দর্শনীয় স্গান রয়েছে তা দেখতে ভারতীয়দের লাগে মাত্র ১০ রুপি বাংলাদেশ-পাকি স্তানীদের লাগে ৫৫০ রুপি। ইউরোপ আমেরিকার লোকদের লাগে নয়শ পঞ্চাশ রুপি, বাংলাদেশের লোকদের জন্য গলফ খেলতে ভারতীয়দের চেয়ে তিনগুণ অর্থ বেশি দিতে হয়। ভারতীয়দের লাগে একবার খেলার জন্য ৫০০ রুপি, বাংলাদেশিদের লাগে ২০০০ রুপির মত, খুবই ন্যাক্কারজনক ও ঘৃনার বিষয়। ভারতের কোটি কোটি লোক

www.pathagar.com

ইউরোপ, আমেরিকায় থাকে ও যায়, তারা তো ভারতীয়দের অতিরিক্ত কোন অর্থ নেয় না। তাহলে ভারত সরকার কেন এই ঘৃন্য ও বৈষম্যমূলক কাজ করবে। মহাভারতের শিা অনুযায়ী ভারতীয়দের চেয়ে বিদেশীদের জন্য অনেক কম অর্থ নেয়া উচিৎ। এসব বিষয়ে ভারতের শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এগিয়ে আসা উচিৎ।

ভারত মহান দেশ হিসেবে পরিচিত। মহান ভারত মানুষ বলে থাকে যে কারণে তা ভারতের অতীতের শাসকদের কাজের জন্য, তারা যেভাবে দেশ পরিচালনা করে মহান ভারত খেতাব অর্জন করেছেন তা বহাল রাখা উচিৎ। মহান ভারত পদবী থেকে হিংসুটে ভারত পদবী হবে এটা আমি চাই না। আমি চাই মহান ভারত খেতাব অুন্ন থাক। ভারতবর্ষ অতিথি সেবায় হিন্দু ধর্মের শিা মেনে চলুক এতে ভারতবর্ষই লাভবান হবে, অতীতের মতো আরও হবে, বিদেশী পর্যটক বা অতিথিদের ব্যাপক হারে ভারতে প্রবেশের সুযোগ দিলে। আর এর একমাত্র পথ হচ্ছে সহজে ভিসা পাবার সুযোগ করে দেওয়া, আর সহজে ভিসা পাবার একমাত্র পথ হচ্ছে ঢাকা শহরে একশজন ট্রাভেল এজেন্ট ও ঢাকার বাহিরে একশজন ট্রাভেল এজেন্ট ভারত হাইকমিশন কর্ত''ক নিয়োগ দান, যারা প্রতিটি ভিসা আবেদনের জন্য তিনশত টাকা করে রশিদ দিয়ে নিবে এবং হাইকমিশন থেকে ভিসা করে আনিয়ে দিবে ভিসা আবেদনকারীকে।

১০.০২.২০১০

www.pathagar.com

বাংলাদেশের কোন মহিলা বা নারীকে ৩টি সুনির্দিস্ট কারণ ছাড়া বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার না করার আইন করার জন্য মাননীয় আইন সচিব ও আইজিপি সাহেবের প্রতি আবেদন

মেয়েরা মায়ের জাতি। এরা অনেকেই অসহায় ও দুর্বল। নারী জাতি বা মেয়েদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা উচিৎ। ইতিহাসের সমস্ত মহাপুরুষ ও বীরেরা কোনদিন কোন নারীর প্রতি সামান্য খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য এদেশে নারী সমাজের প্রতি নির্যাতন চলে। আর এই নির্যাতনের সিংহভাগ করেন রাষ্ট্রের থানা পুলিশ, অহরহ যেখানে সেখানে থেকে নারীদের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করে। কাজেই কোন মেয়ে বা নারীকে আদালতের বিনা ওয়ারেন্টে নিম্নলিখিত ৩টি সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবেনা। যে ৩টি মাত্র কারণে পুলিশ গ্রেপ্তার করবে তা হচ্ছে :

১. যদি কোন নারী বা মেয়ের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যায় যে এই নারী বা মহিলা একজন মানুষ হত্যার সাথে জড়িত।

২. যদি কোন নারীর দেহে কোন মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র লুকানো থাকে।

৩. যদি কোন নারীর কাছে হিরোইন পাওয়া যায় কোন চুরি যাওয়া মালামাল পাওয়া যায়, তবেই মাত্র পুলিশ কোন নারীকে আদালতের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করতে পারবে।

এছাড়া কোন পুলিশ সদস্য যদি কোন মেয়েকে আদালতের বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার করে, তার বা তাদের দুই মাসের বেতন কেটে রাখা হবে বা বাজেয়াপ্ত করা হবে। কোন পুলিশ সদস্যের উক্ত অভিযোগে একবার ২ মাসের বেতন কাটার পরেও যদি আবার উক্ত অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে পুলিশ বাহিনীর চাকরি থেকে তাকে বহিস্কার করা হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ–

১। হাবিবুল আওয়াল

মাননীয় সচিব

আইন বিচার ও সংসদীয় মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাত্রী বাংলাদেশ সরকার।

২। জনাব নূর মোহাম্মদ

আই,জি,পি সাহেব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা

www.pathagar.com

বিঃ দ্রঃ-২০০৩ সনের ৫ই ডিসেম্বর দিল্লী থেকে কলকাতা আসবার সময়ে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনে ৪ টায়ারের একটি বগির মধ্যে পরিচয় হয় এক ভদ্রলোকের সাথে, তার বয়স তখন ১১০ বছরের বেশি, ঐ বয়সে তিনি বেশ সবল এবং সুস্থ আছেন। ভদ্রলোক ১৯১২ সনে বৃটিশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন- ম্যাট্রিক পাশ করে নন কমিশন অফিসার হিসেবে। ১৯১৪ সন থেকে ১৯১৯ সন পর্যন্ত বৃটিশ নৌবাহিনীর সদস্য হিসেবে প্রথম এবং ১৯৩৯ সন থেকে ১৯৪৫ সন পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, জীবনের অনেক সঞ্চয় ও অভিজ্ঞতা। ভদ্রলোক আমার সাথে অনেকক্ষণ কথা বলে আমার সম্পর্কে মন্তব্য করেন "ভগবান আপনাকে যে বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে জন্ম দিয়েছেন, সে মেধা ও বুদ্ধির প্রয়োগ করার এখনও সুযোগ দেননি। নিশ্চয়ই ভগবান যেহেতু আপনাকে অনেক বুদ্ধি ও মেধা দিয়ে জন্ম দিয়েছেন, তার প্রয়োগেরও সুযোগ দিয়ে অনেক মানুষের সেবা ও উপকার করাবেন। আপনি অনেক বড় হবেন।"

তার আগে শ্রদ্ধেয় নেতা মওলানা ভাসানী হুজুর কয়েকবার বলেছেন-"সমগ্র পাবনা জেলার মধ্যে একমাত্র লোক তুমি, যার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলে আনন্দ পাই। আল্লাহ তোমাকে দ্বারা অনেক মানুষের উপকার করাবেন।"

আমার বন্ধু পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের বাবা উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি ১৯১৪ সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, বরিশাল ল' কলেজের অনেকদিন প্রিন্সিপাল ছিলেন, খুব জ্ঞানী ও উন্নত পর্যায়ের একজন সাত্ত্বিক মানুষ ছিলেন। তাঁর সামনে আমি চেয়ারে বসার সুযোগ পেয়েছি, একথা শুনে বরিশালের অনেক প্রবীণ এ্যাডভোকেট আমাকে বেশ সমীহ করেন। শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও বেশ কয়েকবার বলেছেন- "বাবা বাবলু, ভগবান তোমাকে অনেক উন্নতমানের একজন মানুষ হিসেবে এ জগতে পাঠিয়েছেন, তোমার দ্বারা বহু মানুষের সেবা ও উপকার করার জন্য, বাবা তুমি অনেক বড় মানুষ হবে, দয়া করে যার তার সাথে মিশবে না, যেখানে সেখানে খাবার খাবে না, খারাপ লোকদের কাছ থেকে দূরে থাকবে, মনে রাখবে "সৎ সঙ্গে স্বর্গ বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ"।

এখন দেখা যাক মওলানা ভাসানী হুজুর, বৃটিশ নৌবাহিনীর ১৯১২ সনের সদস্য রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনের ঐ প্রবীন হিন্দু ভদ্রলোক এবং জ্ঞানী ও সাত্ত্বিক ব্যক্তি প্রয়াতঃ উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথার কতটুকু মর্যাদা প্রদান করেন আমার দুই ৩৮ বছরের পুরানো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বর্তমান আইন সচিব হাবিবুল আওয়াল এবং আই.জি.পি নূর মোহাম্মদ খান সাহেব। এদের দুজনকেও আমি বেশ উন্নত মনের শিক্ষিত ও মানবতাবাদী মানুষ বলে মনে করি।

আমার বিশ্বাস আইন সচিব হাবিবুল আওয়াল, আই.জি.পি নূর মোহাম্মদ সাহেব নারীদের গ্রেপ্তার নিয়ে আমি যে মতামত এখানে দিয়েছি- তা বাস্তবে বাস্তবায়ণ করার জন্য আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করবেন এবং সফল হবেন।

এর মাধ্যমে আমার আরও বিশ্বাস হাবিবুল আওয়াল, নূর মোহাম্মদ সাহেব এবং আমার দ্বারা বাংলাদেশের নারী জাতির এক বিরাট উপকার হবে।

www.pathagar.com

এখানে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই, তা হচ্ছে ১৮৬১ সনের ভারতীয় দণ্ডবিধি যিনি লিখেছেন সেই লর্ড টমাস ব্যাবিংটন ম্যাকোলে সাহেব কিন্তু একজন সাংবাদিক ও লেখক ছিলেন।

পরিশেষে বলতে চাই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, স্বামী বিবেকান্দ ও ইংরেজ কন্যা মারগারেট বা ভগিনী নিবেদিতাসহ পৃথিবীর অনেক মহা মানব যে কথাটি অনেকবার বলে গিয়েছেন তা হচ্ছে- কোন মানুষের কোন সৎ বা মহৎ চিন্তা বৃথা যায় না, একদিন না একদিন তা বাস্তবে অবশ্যই রূপ নেয়। একথার প্রতি আমার আস্থা অনেক গভীর। তাই আমি দৃঢ় আশা নিয়ে বলতে চাই- বাংলাদেশের নারীদের গ্রেপ্তার করা নিয়ে এখানে যে বক্তব্য দিয়েছি তা অবশ্যই এদেশে একদিন বাস্তবায়িত হবে।

তারিখ ১/১০/২০০৮

প্রিন্স টাওয়ার

এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ইংল্যান্ডের রাজা-রাণী, ভারতের সম্রাট-গর্ভনর জেনারেলগনের নাম, ভ্রমণ ২০০৮ ও অন্যান্য রচনা

১।	শামসুজ্জামান	৩৩৯
২।	এক হাজার বছরের গ্রেট বৃটেনের রাজা ও রানীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা।	৩৪২
৩।	ভারত বর্ষের ১৩৯৮ সন থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত শাসক বা সম্রাটদের নামের ধারাবাহিক তালিকা।	৩৪৪
৪।	১৭৫৭ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ভারত বর্ষের গর্ভণর জেনারেলদের ধারাবাহিক নামের তালিকা	৩৪৬
৫।	আমার একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় মানুষ : মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সাবেক সি.এস.পি.	৩৫২
৬।	কাজী আনিসুর রহমান ও শফিউল ইসলাম কামাল	৩৫৫
৭।	পুস্তক সমালোচনা : সময়ের মুখোমুখি, হাসান শফি	৩৫৮
৮।	অভিমানের বদলে, মোরশেদ শফিউল হাসান	৩৬০
৯।	ভ্রমণ ঃ জুলাই-২০০৮ বগুড়া, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর এবং বরিশাল	৩৭৪
১০।	জেলার নাম সিরাজগঞ্জ	৩৭৮
১১।	মানুষ এক বয়সে যা করে গর্ব করে পরবর্তী বয়সে গর্ব করা ঐ কাজের জন্য অনুশোচনা করে	৩৭৮
১২।	সলিমুল্লাহ খান	৩৮১

www.pathagar.com

সামসুজ্জামান

এই নামের তালিকাগুলো আমি সামসুজ্জামান সাহেবকে দিয়ে ওনার পিছনে লেগে থেকে তাগিদ দিয়ে করিয়ে নিয়েছি।

সামুজ্জামান একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। তিনি ১৯২৫ সনে বীরভূম জেলা নওহাটি থানার কয়ছা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৪১ সনে মুর্শিদাবাদ নবাব বাহাদুর ইনিস্টিটিউশন থেকে ম্যাট্রিক, ১৯৪৩ সনে আই,এ ১৯৪৫ সনে বি,এ পাশ করেন বাকুড়া খ্রিস্টান কলেজ থেকে। ১৯৪৭ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে এম, এ, পাশ করেন।

সামসুজ্জামান সাহেবের দাদার নাম আব্দুল বার। চট্টগ্রামের বাশখালী থানার কালিকাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসা থেকে লেখাপড়া করে বৃটিশ সরকারের ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে একাউন্টস বিভাগে চাকরি করেছেন এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে বাড়ি করেছিলেন আব্দুল বার। আব্দুল বার এর পুত্র সামসুজ্জামান সাহেবের পিতা আব্দুল ফাত্তাহ জুবের বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯১ সনে এবং বীরভূম জেলার নওহাটি থানার কয়ছা গ্রামে বিবাহ করেন। তিনি সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন।

সামসুজ্জামান ১৯৪৮ সন থেকে ১৯৫৬ সন পর্যন্ত ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজ এবং যশোরের মাইকেল মধুসূদন কলেজে অর্থনীতির অধ্যাপক হিসেবে চাকুরি করেছেন। ১৯৫৬ সনে তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয়ে রিসার্স অফিসার হিসেবে চাকরিতে যোগদান করে ১৯৮১ সনে অবসর গ্রহণ করেন বাংলাদেশ সরকারের শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে।

জনাব সামসুজ্জামান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাবেক শিক্ষক, কবি ও বাংলাদেশ কাপানো সুন্দরী নারী সুরাইয়া খানমের মা আপন চাচাতো ভাই-বোন। সামসুজ্জামান সাহেব এখন মোহাম্মদপুরের বাবর রোডে বসবাস করছেন, আমাকে তিনি খুবই স্নেহ করেন।

বই পুস্তক পড়ার ব্যাপারে আমার কিছুটা নেশা ও ধৈর্য আছে, সেজন্য খুব দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি এখানে নামের যে ৩টি তালিকা দেওয়া হলো ধারাবাহিকভাবে, তা সংগ্রহ করতে একজন পাঠকের বহু সাধনা করতে হবে। সামসুজ্জামান সাহেব আমার অনুরোধ ও অনুপ্রেরণায় এই কঠিন কাজটি করেছেন এর জন্য আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

লেখক

৮/৯/২০০৮

www.pathagar.com

The Name of King's and queen's of Great Britain:-

King Albert	871-899
King Caneut	1016-1035
Norman Plantazant Dynesty	
1. King William I =	1066 to 1087
2. King William II =	1087 to 1100
3. King Henry I =	1100 to 1135
4. King Stephen =	1135 to 1154
5. King Henry II	1154 to 1189
6. King Richard I	1189 to 1199
7. King John (Mad)	1199 to 1216
(Magna Carter Charter sing)	
8. King Henry III	1216 to 1272
9. King Edward I	1272 to 1307
10. King Edward II	1307 to 1327
11. King Edward III	1327 to 1377
12. King Richard II	1377 to 1399
13. King Henry IV	1399 to 1413
14. King Henry V	1413 to 1422
15. King Henry VI	1422 to 1461
16. King Edward IV	1461 to 1482
17. King Edward V	1482 to 1483
18. King Richard III	1483 to 1485
19. King Henry VII	1485 to 1909
20. King Henry VIII	1509 to 1547
21. King Edward VI	1547 to 1553
22. Queen Marry	1553 to 1558
23. Queen Elizabeth I	1558 to 1603

(Birth of Shakespear, 1564-1616)

Steward Dynesty

www.pathagar.com

24. King James I 1603 to 1625
25. King Charls I 1625 to 1649
(Beheaded)
26. King Charls II 1660 to 1685
27. King James II 1685 to 1688
(Power to Perliament)
28. King William III and Queen Marry II 1689 to 1702
(Democracy and English Bill of Wrights)
29. Queen Anne 1702 to 1714
Hanovarian German Dynesty
30. King george I 1714 to 1727
31. King george II 1727 to 1760
Battle of palasle, India occpy 1757
32. King george III 1760 to 1820
France Revulation 1789, War with Napolean 1802
33. King george IV 1820 to 1830
34. King William IV 1830 to 1837
35. Queen Victoria 1837 to 1901
36. King Edward VII 1901 to 1910
37. King george V 1910 to 1936
38. King Edward VIII 1936 to 1936
Left Kingdom For Love and wife
39. King george VI 1936 to 1952
Second World War 1939 to 1944, India
and Pakistan get Freedom 1947.
40. Queen Elizabeth II 1952 to

Collected by A.M. Khan (Bablu) and Mr. Shamsuzzam
Date 18/12/1999

www.pathagar.com

The Name of Ruler of India 1398 to 1857

1.	Taimur Long	1398-1398
2.	Sayed Kijir khan	1424-1431
3.	Mubarak Shah	1431-1434
4.	Mohammad Shah	1434-1444
5.	Alam Shah	1444-1451
6.	Mohad Lodi	1451-1489
7.	Sekandar Lodi	1489-1517
8.	Ibrahim Lodi	1517-1526
9.	Jahir Uddin Muhammad Babur, Battle of Panipath	1526-1530
10.	Humayan	1530-1540
11.	Sher Shah	1540-1545
12.	Humayan	1545-1556
13.	Akbar	1556-1605
14.	Jahangir	1605-1627
15.	Sahjahan	1627-1657
16.	Aourangajeb	1657-1707
17.	Bahadur Shah	1707-1713
18.	Farukh Shiar	1713-1719
19.	Mohammad Shah	1719-1748
	(Attack Delhi by Nadir Shah 1739)	
20.	Ahmed Shah	1748-1754
21.	Alamgir -2-	1754-1757
22.	Shah Alam	1757-1801
	Company Dewany	1765
23.	Akbar the Second	1806-1837
24.	Bahadur Shah Jafor	1837-1858

www.pathagar.com

Date of Some Important Historical Facts

1.	Rani Ma Bhabani Born	1715
	Marriage of Rani Ma	1730
	Death of Ma Bhabani-	1790-1802?
2.	Attack Dilhi by Nadir Sah	1739
3.	Battle of Polassy	1757
4.	Geart Femine of Bengal Bihar-Orissa	1771-72
5.	Permanent Sttlement of land Management by Lord Cornowalise	1784
6.	Sepahi Mutiny	1857-58
7.	British Goverment Take Over India Rule- 1858.	

www.pathagar.com

The Name of those greatmen who have made US half gentelman-

1.	Robert Clive-	1757-1760
2.	Henseart-	1760-1764
3.	Robert Clive-	1764-1767
4.	Verelot-	1767-1769
5.	Cartier-	1769-1772
6.	Waren Hestings-	1772-1784
7.	Lord Cornowalise-	1784-1793
8.	Sir Jhon Shore-	1793-1798
9.	Lord Waylesly-	1798-1807
10.	Lord Cornowilise-	1805-1805
11.	Sir george Barlow-	1805-1807
12.	Lord Minto-	1807-1813
13.	Lord Hestings	1813-1823
14.	Lord Amharst-	1823-1828
15.	Lord Benting-	1828-1835
16.	Charls Metecafe-	1835-1835
17.	Lord Auak Land-	1836-1842
18.	Lord Elembara-	1842-1844
19.	Lord Hardings-	1844-1848
20.	Lord Dalhousy-	1848-1856
21.	Lord Canning-	1856-1862
22.	Lord Algin-	1862-1864
23.	Lord John Lawarence-	1864-1869
24.	Lord Mayo-	1869-1772
25.	Lord North Brook-	1872-1876
26.	Lord Edward Robert Liton-	1876-1880

www.pathagar.com

27. Lord Ripon-	1880-1884
28. Lord Daffrin-	1884-1888
29. Lord Lands Down-	1888-1894
30. Lord Algin-	1894-1899
31. Lord Carzon-	1899-1905
32. Lord Minto-	1905-1910
33. Lord Hardings-	1911-1916
34. Lord Chamsford-	1916-1921
35. Lord Ridding-	1921-1926
36. Lord Ireveing-	1926-1931
37. Lord Welingdon-	1931-1936
38. Lord Linlilthgo-	1936-1943
39. Lord Wavel-	1943-1946
40. Lord Maunbaten	1946-1950

www.pathagar.com

আমার একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় মানুষ : মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সাবেক সি.এস.পি.

১৯৬১ সনের ব্যাচের সি.এস.পি. সাবেক সচিব বা সরকারি কর্মকর্তা লেখক নোয়াখালী তথা সারা বাংলাদেশের একজন কৃতি সন্তান মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সাহেব। আমি তাঁকে সিরাজ ভাই বলে ডাকি সেই ১৯৭৫ সন থেকে, ১৯৭৫ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ ইংরেজি অনার্সের ছাত্র, থাকি মাস্টারদা সূর্য সেন হলে। সূর্য সেন হলের সামনেই আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাস সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ, শিক্ষক, রিসার্চ স্কলার এবং অনেক বিদেশী ছাত্র এবং আমাদের অনেকের গুরু মুরুব্বী, বড় ভাই কবি লেখক, সংগঠকসহ আরো অনেক কিছু, আহমদ ছফা ভাই থাকতেন ১০৭ কক্ষে। ১৯৭৫ সনের নভেম্বর মাসের বাংলাদেশ, ভয়াবহ মাস ২রা নভেম্বর সেনাবাহিনীর খালেদ মোশাররফ এবং তার অনুসারীরা ক্ষমতা দখল করতে উদ্যোগ নেয়। গুজব রটে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন সাহেব প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। গুজব শুনে খোন্দকার মোস্তাক আহমদ কর্নেল রশীদ ফারুক চক্রকে দিয়ে ঘাতক পাঠিয়ে জেলে চার জাতীয় নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। ৪ঠা নভেম্বর বিকালে খালেদ মোশাররফ তেজগাঁ বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যাকারী কর্নেল ফারুক, রশীদ, ডালিম চক্রকে নিজে উপস্থিত থেকে তাদের নিরাপদে বাংলাদেশ ত্যাগের ব্যবস্থা করেন। ৫ই নভেম্বর জাতীয় ৩ নেতার মরদেহ বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়– কামরুজ্জামান সাহেবকে রাজশাহীতে। ৫ই নভেম্বর জাতীয় চার নেতার মরদেহ যাতে অনেক লোক না দেখে, অনেক লোক জানাযা করতে না পারে, তার জন্য ঢাকা শহরে ৫ই নভেম্বরে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বাঁধার সৃষ্টি করে। অনেক ছাত্র লীগ এবং আওয়ামী লীগ নেতাকে প্রহার করে এবং গ্রেপ্তার করে। পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা বা জানাযা ও দাফন কাজে সহযোগিতা করে এ নিয়ে বনানী কবরস্থানে পুলিশের সাথে সেনা সদস্যদের গোলাগুলি হবার উপক্রম হয়।

৬ই নভেম্বর রাতে আবার খালেদ মোশাররফ পন্থীদের পরাজয় হয়, জিয়াউর রহমান পন্থী বা তার অনুসারীদের বিজয় হয়। সারারাত ঢাকা শহরে গোলাগুলি ও মর্টার ফাটার আওয়াজ হয় ৭ই নভেম্বর ভোর রাত এবং সারাদিন ভয় ও আতংকের মধ্যে কাটায় ঢাকা শহরের মানুষ। ৭ই নভেম্বর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় বসেন। জাসদের কর্নেল তাহেরসহ একঝাঁক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, ১৭ই নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস,এম, হল থেকে। ১৯৭৫ সনের ২৬শে নভেম্বর কবি আবুল হাসান ঢাকার পি,জি, হাসপাতালে মৃত্যু বরণ করেন, এদিনই ২৬শে নভেম্বর ঢাকার ধানমণ্ডির ২নং রোডে ভারতীয় মাননীয় হাই কমিশনার সমর সেন সকালে নিজ অফিসে প্রবেশপথে কর্নেল তাহেরের ৩ ভাই এবং তাদের সহযোগিদের দ্বারা গুলি বিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্ত্বরে খবর পেলাম কবি আবুল হাসান মৃত্যু বরণ

www.pathagar.com

করেছে, খবর শুনে আমার বন্ধু ইংরেজি অনার্সের ২য় বর্ষের ছাত্র (এখন আই, এফ, আই, সি ব্যাংকের কর্মকর্তা) আহমদ জাফর ইমাম স্বপনসহ কবি আবুল হাসানের মরদেহ দেখতে পি,জি, হাসপাতালের প্রবেশের সময় দেখি ভারতের মাননীয় হাই কমিশনারের শরীর রক্তে লালে লাল। অনেক পুলিশ সবার মন খারাপ, চোখে মুখে আতংক। মাননীয় হাই কমিশনার সমর সেন সাহেব আমাকে খুব ভালো চিনতেন এবং একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য হবার জন্য যথেষ্ট স্নেহ করতেন। পি,জির গেটে দেখলাম তাকে ধরাধরি করে গাড়িতে তোলা হচ্ছে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নেবার জন্য। কেননা পি,জি, হাসপাতালে জরুরি বিভাগে তখন এ ধরণের চিকিৎসা করার ব্যবস্থা ছিল না, (এখন ও কি আছে?)। আমি আর স্বপন একেবারে কাছে থেকে দেখলাম ও তাঁকে নমস্কার করলাম তিনি ছল-ছল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৭১ সনের মুক্তিযুদ্ধের সময় সমর সেন অসাধারণ বড় ভূমিকা পালন করেন বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘে। সে সময়ে জাতিসংঘে সমর সেনের ভাষণ সারা পৃথিবীর বিবেকবান মানুষকে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে পাগল করেছে। ১৯৮২ সন থেকে আমার সম্পাদনায় সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকা প্রকাশ শুরু হলে ৮৩/৮৪ সনে সাপ্তাহিক পরিবর্তনে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত India in United Nations 1971. নামক বই থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের অন্যতম সিনিয়র সাংবাদিক একজন জাত ভদ্রলোক মনে প্রাণে বাংলাদেশ প্রেমিক খন্দকার মো. খালেদ সাহেবকে দিয়ে অনুবাদ করিয়ে ১৯৭১ সনে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের স্বপক্ষে কয়েকটি লম্বা বক্তৃতা পরিবর্তন পত্রিকায় প্রকাশ করেছি, এতে আমি মনে করি আমার পরিবর্তন পত্রিকার গুণগতমান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৭৫ সনের বাংলাদেশের নভেম্বর মাসের ভয়ংকর কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করলাম শ্রদ্ধেয় সিরাজ ভাইকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লিখবার জন্য আমার মনের তাড়না প্রকাশের জন্য। কেননা সেই ১৯৭৫ সনের নভেম্বর মাসেরই একদিন তার সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় তার ধানমণ্ডি ৭নং রোডের তখনকার তার বাসভবনে। ৭৫ সনের নভেম্বর মাসের এক রবিবার সকালে আমাদের গুরু বা বড় ভাই আহমদ ছফা সূর্য সেন হল ও আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসের চত্ত্বরে আমাকে বললো খুব মনমরা হয়ে- "বাবলু চলো বেচারা নির্মলেন্দু গুণের জন্য কিছু করার চেষ্টা করি," জবাবে আমি বললাম চলেন আজ রোববার আমার কোনও ক্লাশ এবং কাজ নেই। দুজনে একটি রিক্সা নিয়ে গ্রীণ রোডে আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যারের বাসায় গেলাম। ছফা ভাই আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যারকে কান্নাজড়িত কণ্ঠে নির্মলেন্দু গুণ এর জন্য কিছু করার জন্য অনুরোধ করলেন। ১৯৭৫ সনে নভেম্বর মাসে কবি নির্মলেন্দু গুণ পি,জি, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কবি আবুল হাসানকে দেখে আসবার অথবা যাবার সময়ে গেটের কাছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার কর্তৃক গ্রেপ্তার হন এবং তাকে ভারতের চর বলে সন্দেহ করে, এবং রমনা থানায় সোর্পদ করেন। কবি নির্মলেন্দু গুণ তখন রমনা থানা হাজতে আটক। যাই হোক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যার তখন কণ্ঠস্বর নামে একটি অভিজাত সাহিত্য পত্রিকার

www.pathagar.com

সম্মানিত সম্পাদক, অনেক কবি ও লেখকদের লেখা ছাপেন, ঐ সময়ে সমকাল এবং কণ্ঠস্বর পত্রিকায় যার লেখা ছাপা হতো সেই একমাত্র লেখক হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন। অনেক সি,এস,পি এ দু'পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করার জন্য সিকান্দার আবু জাফর সাহেব ও আব্দুল্লাহ আবু সাইদকে বেশ সমীহ করতেন। ঐদিন আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যার ছফা ভাই ও আমাকে নিয়ে ৭নং রোড ধানমণ্ডিতে সি,এস,পি, মো. সিরাজউদ্দিন ভাইয়ের বাসায় উপস্থিত হলেন। সিরাজ ভাই পাকিস্তান আমলের ৫০ এর দশকেই একজন নামকরা ছোট গল্প লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার মনে হয় সি,এস,পি হিসেবে চাকরিতে প্রবেশ করে তার চাকরি ও বৈষয়িক জীবনের আস্তে আস্তে উন্নতি হয় এবং গল্প লেখক সাহিত্যিক মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনের খ্যাতি ধীরে ধীরে কমে যায়।

যাক আব্দুল্লাহ আবু সাইদ স্যার কবি নির্মলেন্দু গুণের গ্রেপ্তার এবং রমনা থানা হাজতে রিমান্ডে থাকার কথা বললেন– এবং তার মুক্তির জন্য সিরাজ ভাইয়ের সাহায্য চাইলেন। সিরাজ ভাই আমাদের চা-নাস্তা খাওয়ালেন অনেক কথা আলোচনা করলেন।এক পর্যায়ে কবি নির্মলেন্দু গুণের মুক্তির জন্য ঢাকা রেঞ্জের ঐ সময়ের পুলিশের ডি.আই.জি জনাব আমিনুর রহমান সাহেবকে ফোন করলেন। সিরাজ ভাই তখন বিসিক– এর চেয়ারম্যান আমিনুর রহমান সাহেবকে তিনি দুলা ভাই বলে সম্বোধন করলেন এবং কবি নির্মলেন্দু গুণকে মুক্তি দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি নিজে জীবনে নিজের প্রয়োজনে অনেক লোকের কাছে করুণা ভিক্ষা চেয়েছি এই ৫৪ বছর বয়সের জীবনে, অনেক তদবির দেখেছি, অনেক লোককে অনেক করুণভাবে সাহায্য চাইতে দেখেছি, কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় সিরাজ ভাই একজন সিনিয়র সি.এস.পি অফিসার হয়ে সেদিন আমাদের সামনে যে করুণ ও বলিষ্ঠভাবে কবি নির্মলেন্দু গুণের মুক্তির জন্য ডি.আই.জি আমিনুর রহমান সাহেবের নিকট যে ভাষায় সাহায্য কামনা করলেন আমার হৃদয় পটে আজও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। সেদিন থেকেই মনে মনে আমি মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ভাইকে শ্রদ্ধা করা শুরু করেছি। আজও আমার কানে ভেসে উঠে "দুলা ভাই নির্মলেন্দু অনেক ভালো ছেলে ও দেশের কোনও ক্ষতি করতে পরে না, ও বাংলাদেশের মানুষকে ভালোবাসে, ও একজন জাত কবি– অনেক উন্নত মানের কবি, আমি ওর দায়িত্ব নিচ্ছি, আমার দায়-দায়িত্বে ওকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। দুলাভাই দয়া করে দেখবেন ওকে যেন পুলিশ না মারে।' দুজনে প্রায় ২০ মি. ফোনে কথা বলেন, এক পর্যায়ে মনে হলো, সিরাজ উদ্দিন সাহেবের আকুল অনুরোধ জয়ী হলো ডি,আই,জি, সাহেবের কাছ থেকে নির্মলেন্দু গুণের মুক্তির প্রতিশ্রুতি নিয়েই টেলিফোন ছাড়লেন। এর দুই একদিন পরেই কবি নির্মলেন্দু গুণ মুক্তি পান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দিন ভাইয়ের সেদিনের ভূমিকা না রাখলে কবি নির্মলেন্দু গুণের জীবনে আরও অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হতো।

মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের মানবতাবাদী অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের আরও একটি প্রমাণ আমি পাই-১৯৮৮ সনে। আমি তখন সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার সম্পাদক। নওগাঁ জেলার নওগাঁ সদরের একজন হিন্দু ব্যক্তি, আমার চেয়ে ৭ বছরের বয়সে ছোট, আমার

www.pathagar.com

মামা ইঞ্জিনিয়ার আলী কায়সার তালুকদারের বন্ধু। মামার সাথে আমাদের পরিবর্তন পত্রিকার অফিসে আসে, আমার সাথে, আমার ছোট ভাই পরিবর্তনের কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ আহমদ হাবুলসহ অন্যদের সাথে বেশ সহজে সম্পর্ক স্থাপন করে ফেলে। ১৯৭১ সনে তার বয়স ছিল ৭, শরণার্থী হয়ে ভারতে গিয়ে রিফিউজি ক্যাম্পে অমানবিক কষ্টে জীবনযাপন করেছে অনেক স্মৃতি, সে পরিবর্তনে লেখা শুরু করে। সে ঢাকায় থাকে সমবায় অধিদপ্তরের সহকারি রেজিস্ট্রার হিসেবে খুলনায় চাকরি করতো। সেই সময়ে আমার মামা কায়সার তালুকদারও খুলনায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের পাওয়ার হাউসে সহকারি প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি করতেন, তখন মামার সাথে তার পরিচয় হয়।

তখন মামার বয়স ২৬ বিয়ে করে নি, খুলনায় পি.ডি.বি'র এ, সি সহ বড় দুটো রুম নিয়ে একা থাকেন। অনেক ভালো খাবারের সমারোহ, খুব অনুরোধ করতো কয়েকদিন খুলনা গিয়ে থাকবার জন্য। কিন্তু সময়ও যাতায়াত ভাড়ার অভাবে যেতে পারি নাই। যাক ঐ সময়ে ১৯৮৮ সনে মামার ঐ বন্ধু ঢাকায় থাকে আমাদের পরিবর্তন পত্রিকায় লেখে, অফিসে সময় কাটায়। কারণ ঐ সময়ে সমবায় অধিদপ্তরের নাকি ৩৬ জন সহকারী রেজিস্ট্রার ছিল- পদ ৩২টি-৩৬জনের আবার মৌখিক পরীক্ষা হবে, এদের মধ্যে থেকে ৩২ জন নিয়োগ দিবে। ঐ সময়ে সমবায় মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. সিরাজউদ্দিন ভাই যুগ্ম সচিব জানিবুল হক সি,এস,পি, সাহেব আমার খুব ভালো পরিচিত এবং আমাকে বেশ ভালোবাসেন, রেজিস্ট্রার সাবেক কেবিনেট সচিব বর্তমানে পি.এস.সি'র চেয়ারম্যান সি,এস,পি সাদাত হোসেন। আমি ঐ ছেলেকে বলি দেখো ভাই দিনকাল খুব খারাপ রেফারেন্স ও ধরাধরি ছাড়া কোনও কাজ হয় না– তুমি হিন্দু মানুষ যদি প্রয়োজন মনে করো তবে তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য চেষ্টা করি, সচিব যুগ্ম সচিব, আমার পরিচিত, তোমাকে সাহায্য করতে পারে। সে বলে "আরে রাখেন আমি ১নং সিরিয়ালে আমার মতো সৎ ও যোগ্য লোক ৩৬জন কেন পুরা সমবায় ডিপার্টমেন্টে দ্বিতীয় জন নাই।" আমি বলি তাহলে তো বেশ ভালো।

কিন্তু একদিন বিকালে দেখা গেল সে ৩/৪ নয়া পল্টনের পরিবর্তন অফিসে এসে ফুপিয়ে কাঁদছে তার কান্না আর থামে না। বলে 'ভাই সর্বনাশ হয়েছে ৩৬ জনের মধ্যে ৩২জন নিয়েছে এর মধ্যে আমরা ৩জন হিন্দু ছিলাম ৩জনকেই এবং একজন মুসলিম ৪জনকে বাদ দিয়েছে। আমি গত ৬ বছর যাবত এ চাকরি করছি চাকরি নেবার বয়স নাই আমার ৪টি বোন, একটি ছোট ভাই, চার বোনের দুবোন বিবাহ যোগ্য ২ জন ১২/১৪ বছর বয়সের, বৃদ্ধ মা-বাবার আমিই একমাত্র উপার্জনশীল ব্যক্তি এখন আমার কি হবে' ইত্যাদি।

সাথে সাথে আমি সচিব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন সাহেবকে টেলিফোনে উক্ত ঘটনা বলি এবং তার সাহায্য চাই, সাথে সাথে মানবতাবাদী সিরাজ ভাই বলেন– "বাবলু তুমি ঐ ছেলেকে দুঃখ করতে এবং হতাশ হতে না করো আমি ওর চাকরির ব্যবস্থা করে দেবো। এর ৪/৫ দিনের মধ্যে আলোচ্য লোকের চাকরি হয়। সে এখনও সমবায় অধিদপ্তরে চাকরি করছে আমার ধারণা। যার জন্য তার নাম প্রকাশ করলাম না। ১৯৯০

www.pathagar.com

সনে আমাদের সিরাজগঞ্জে পোস্টিং ছিল– হঠাৎ করে সিরাজগঞ্জ রেল স্টেশনে দেখা হয় খুব কৃতজ্ঞতা জানায়, তখন সিগারেট খেতাম ২ প্যাকেট বেনসন সিগারেট কিনে দেয়, এই শেষ দেখা, জানি না সে আজ কোথায় কি অবস্থায় আছে।

আজ বাংলাদেশের ৪২ জন সচিব আছেন, তারা নিজেদের অনেক যোগ্য দক্ষ অনেক ভালো লোক মনে করেন, কিন্তু ১৯৮৮ সনে সি,এস,পি সমবায় সচিব মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন একজন হিন্দু ছেলের পক্ষে যে ভূমিকা নিয়েছিলেন এরকম একটি সামান্যতম দৃষ্টান্ত দেখাতে কেউ কি সাহস পাবেন? মনে হয় না।

সিরাজ ভাই যে অনেক বড় ও সৎ মনের মানুষ তার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই। সেটা হচ্ছে গত ২৭.৭.০৮ রোববার দৈনিক ইত্তেফাকের ৮ এর পাতায় ৮ এর কলামে প্রকাশিত '১৬ নং কোর্ট হাউস স্ট্রিটের দিনগুলি' মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ভাইয়ের লেখা। এই লেখার এক জায়গায় শ্রদ্ধেয় সিরাজ ভাই লিখেছেন– "১৯৫৪ সালে দৈনিক মিল্লাত পত্রিকায় যোগদান করি সাব এডিটর পদে। বেতন সর্বমোট মাসিক ৭৫ টাকা। কোনও মাসেই পুরো বেতন এক সাথে পেতাম না, কখনো আট আনা, পাঁচ টাকা, চার বছরে সর্বোচ্চ ত্রিশ টাকা। পরবর্তীকালে একদিন করে সিনেমার পাতা, ছোটদের কিশোর মজলিশ সাহিত্যের পাতার জন্য পঁচিশ টাকা করে মোট ৭৫ টাকা অতিরিক্ত পেতাম। সাকুল্যে বেতন দাঁড়াতো দেড়শো টাকা। আমার জন্য অনেক টাকা। দিনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসে বি,এ, অনার্স পরে এম, এ, পড়তাম, রাতে দৈনিক মিল্লাতে সন্ধ্যে ৮টা থেকে ভোর ৪টা অবধি চাকরি করতাম। এ দেড়শো টাকার মধ্যে একশো টাকা যেতো দাদা-দাদী, মা-বাবা, ভাইবোনদের সংসারে। বাকীটা আমার নিজের জন্য।"

অনেক বড়, অনেক মহৎ, অনেক উদার হৃদয়ের মানুষ বলেই মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন এমন সত্য স্বীকারোক্তি দিয়ে নিজের জীবন সম্পর্কে লিখতে পারেন। আজকাল বাংলাদেশে যারা একটা চেয়ার টেবিলে বসে চাকরি করার সুযোগ পান তারা সবাই বলে বেড়ান তাদের সবার বাবা-নানা-জমিদার-কেউ কোনও সময় অভাব অনটন দেখে নাই। অথচ ১৯৮০ সন পর্যন্ত এই বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক দিনেরাতে দু'বেলা খাবারের অভাবে না খেয়ে থাকতো। মাত্র শতকরা ১০ ভাগ লোক খুব কষ্ট করে দুবেলা খাবার পেত, শতকরা ১০ ভাগ লোক বিনা কষ্টে দু'বেলা খাবার পেতো অর্থনীতিবিদ লেখকদের লেখার সূত্রে আমরা তা জানি, সিরাজ ভাইয়ের ইত্তেফাকের এ লেখা পড়ে নূতন করে তাকে শ্রদ্ধা জানাতে উদ্যোগী হলাম এবং এই লেখা লিখবার তাড়না বোধ করলাম। ১৯৯০ সনে কবি শিল্পী চিত্র-পরিচালক, লেখক পুর্ণেন্দু পত্রী সাহেব ঢাকায় আসেন– আমি সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদক হিসেবে ঢাকা ক্লাবে পুর্ণেন্দু পত্রীর সম্মানে এক নৈশভোজের ব্যবস্থা করি। ঢাকা ক্লাবে অনুষ্ঠিত এই নৈশভোজে প্রয়াত কবি শামসুর রাহমান ও শওকত ওসমান সাহেবসহ প্রায় ১৫০ জন অতিথিকে নিমন্ত্রণ করি। এর মধ্যে ঢাকার প্রথম শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক শিল্পী কমপক্ষে ২০ জন সি,এস,পিসহ অন্যান্য ঊর্ধতন সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

ঐ সময়ে ঢাকার মার্কিন দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলার ছিলেন মিস শিলা পিটার, তাঁর সাথে আমার খুব ভালো বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শিলা পিটারের ঐ সময়ে বা ১৯৯০ সনে বয়স ছিল ৩৫, আমারও ৩৫, শিলা পিটার দেখতে অসাধারণ সুন্দরী ও অবিবাহিত ছিল, আমিও অবিবাহিত ছিলাম, আমরা দু'জনেই খুব শক্তিশালীভাবে মরালাইথিক্যাল ভ্যালুজের প্রতি অনুরাগী ছিলাম। আমাদের সম্পর্ক দেখে আমেরিকান দূতাবাসের পুরুষ ও মহিলা কর্মকর্তারা খুব হাসাহাসি করতো। কিছুদিন আগে শুনলাম শিলা পিটার এখন আমেরিকার সবচেয়ে উচ্চ বা আমাদের দেশের সচিব পর্যায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে চাকরি করেন, ১৯৯৪ সনে শিলা ঢাকা ত্যাগ করার পরে আমার সাথে আর যোগাযোগ নেই। শিলা পিটারের কথা উল্লেখ করছি এ জন্য যে আমার দেওয়া ঢাকা ক্লাবের ঐ পার্টিতে শিলা পিটার মার্কিন দূতাবাসের ও ইউসিস ও ইউ,এন,ডি,পির বড় ধরণের কয়েকজন কর্মকর্তাসহ উপস্থিত ছিলেন। দেশি বিদেশি প্রায় ৩০ জন সি,এস,পি, কবি, সাহিত্যিক সাংবাদিক, অধ্যাপকসহ ১৫০ জনের বেশি জমজমাট অতিথি সেই পার্টির যেসব ছবি আমার এ্যালবামে রয়েছে তাতে দেখছি সেই শিলা পিটার এত গণ্যমান্য বিগ ভি,আই,পি পার্টির অতিথিদের মধ্যে আমার প্রিয় সিরাজউদ্দিন ভাইকে বেছে নিয়েছেন তার সঙ্গী হিসেবে। শিলা পিটার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সিলার ৩৫ বছর বয়সের অসাধারণ সুন্দরী তরুণী সোফায় বসে রয়েছেন। এ ছবিটি আমি দেখি আর মনে মনে বলি- রতনে রতন চেনে-সোনা চেনে কর্মকার। আমিও মনে মনে কিছুটা গর্ববোধ করি যাক সিরাজ ভাইকে আমি আমার নিমন্ত্রণ খাওয়াতে পেরেছি, আমি ধন্য। জয় আমাদের প্রিয় মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন ভাইয়ের।

এ লেখার তারিখ : ২৯/৭/০৮ ইং মঙ্গলবার সময় বিকাল ৪টা থেকে-রাত ৯টা।

প্রিন্স টাওয়ার

১৩৫/এ, এ্যালিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

কাজী আনিসুর রহমান

ও

শফিউল ইসলাম কামাল

আজ ১০/১০/২০০৮ তারিখ শুক্রবার অনেকদিন পরে সোহরাওয়ার্দি ময়দান ও রমনা পার্কে মর্নিংওয়াক করতে এলাম। গতকাল দূর্গা পূজার বিজয় দশমী ছিল, রমনা কালী মন্দির পূজার সাজে।

অনেক পুরানো পরিচিতি লোকদের সাথে দেখা হলো এদের একজন কাজী আনিসুর রহমান সাহেব। কাজী আনিসুর রহমান সাহেব ঢাকা শহরের একজন অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বা অভিজাত বংশের সম্মানিত মানুষ। পূর্বপাকিস্তানের সাবেক মূখ্যমন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, প্রখ্যাত ধনী ব্যক্তি প্রয়াতঃ জনাব জহুরুল ইসলাম সাহেবের তিনি নিকটাত্মীয়। আওয়ামীলীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমদ ও ময়েজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ঠ লোক ছিলেন।

কাজী আনিসুর রহমান সাহেবের সাথে হাঁটার সময়ে অনেক কথা আলোচনা হলো। হাঁটার এক পর্যায়ে সাইদ সাহেবের সাথে কাজী আনিসুর রহমান সাহেবকে পরিচয় করিয়ে দিলাম এই বলে যে, ইনি সাইদ সাহেব ১৯৪৪ সনে ঢাকা কলেজে তাজউদ্দিন সাহেবের শিক্ষক ছিলেন, সাইদ সাহেবকে বললাম ইনি কাজী আনিসুর রহমান তাজউদ্দিন সাহেবের বন্ধু ছিলেন, আনিস সাহেব মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, বন্ধু না, উনি আমার সিনিয়র ছিলেন আমার সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল, আমি তার ভক্ত। আনিস সাহেব ১৯৪৮ সনের ম্যাট্রিক, তাজউদ্দিন ১৯৪৪ সনে, সাইদ সাহেব ১৯৩৭ সনে, আমি ১৯৭০ সনে। আনিস সাহেব সাইদ সাহেবকে স্যার বলে সম্বোধন করলেন, কিছু কথা দুজনে আলোচনা করলেন দুজনেই একমত হলেন।

সাইদ সাহেবের সাথে কথা বলে আমি আনিসুর রহমান সাহেব আবার হাটা শুরু করলাম। আমি আনিস সাহেবকে বললাম আমি বাড়ী থেকে বের হয়ে ৬০ মিনিট বা একঘন্টা হাঁটার পর বসে পড়ি। আমার ১ ঘন্টা হাঁটা হয়েছে তবুও চলেন আপনার সাথে হাঁটবো কষ্ট হলেও। দুজনে অনেক কথা হলো আনিস সাহেব সত্যনিষ্ঠ আদর্শবাদী একজন মানুষ। বাংলাদেশ ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ১৯৭২ সন থেকে অনেকদিন। পরিবার পরিকল্পনা সমিতির কোষাধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন অনেক দিন, আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দিন সাহেবের সাথে। ১৯৭০ সনের পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে কাপাসিয়া কালিগঞ্জ নির্বাচনী এলাকার এম,এন,এ পদে প্রার্থী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। আর এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তাজউদ্দিন সাহেবের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন এই কাজী আনিসুর রহমান সাহেব। ১৯৭২ সনে গাজীপুর জেলার সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের তাজউদ্দিন সাহেব ডেকে আনিস সাহেবের সাথে পরিচয় করে দিয়ে বলেছিলেন– "আমি মন্ত্রী, অনেক কাজে ব্যস্ত

www.pathagar.com

থাকতে হয়, আমাকে সহজে আপনারা পাবেন না– নিয়ম ও আইনমত নিরপেক্ষভাবে কাজ করে যাবেন, যেখানে খটকা লাগবে, প্রশ্নের সম্মুখীন হবেন সেখানে আনিসুর রহমান সাহেবের পরামর্শ মত কাজ করবেন, ওনার কথাই আমার সিদ্ধান্ত বলে মনে করবেন" এ থেকে পাঠকরা পরিচয় পাবেন কাজী আনিসুর রহমান কোন পর্যায়ের মানুষ। ১৯৭৪ সনে তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে এই আনিসুর রহমান সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

এই আনিসুর রহমান সাহেব আমাকে আবার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন– প্রখ্যাত ধনী প্রয়াত ঃ জহুরুল ইসলাম সাহেবের ছোট ভাই সফিউল ইসলাম কামাল সাহেব এর সাথে। আনিস সাহেব আমাকে সফিউল ইসলাম কামাল সাহেবের সাথে পরিচয় করে দেবার পর থেকে কামাল ভাই আমাকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখেন। ১৯৯২ সনে যখন আমি ভীষণ অর্থের কষ্টে পড়ে যাই, কালিয়াকৈরের চান্দুরাতে ষ্টেট ব্যাংকের ইন্ডিয়ার ৫ লাখ টাকার ঋণে জায়গা ক্রয় করে ডেয়ারী ফার্ম করার সময়। অনেক টাকার প্রয়োজন হয় বিনিয়োগের জন্য খুব কষ্টে দিন যাপন করতে হয়, সাপ্তাহিক পরিবর্তন ও ঠিকমত চলে না। বি,এন,পি ক্ষমতায় এসেছে পরিবর্তনে বিজ্ঞাপন দিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিকেরা ভয় পান ছাত্র দলের ক্যাডারদের অত্যাচারে, পরিবর্তনে বিজ্ঞাপন দিলে বিজ্ঞাপন দাতাদের অফিসে গিয়ে হামলা করতো পরিবর্তন আওয়ামী লীগ সমর্থক পত্রিকা সেখানে বিজ্ঞাপন দিবেন আর আমরা বি,এন,পির সমর্থক ছাত্রদলের কর্মী আমাদের কেন বিজ্ঞাপন দিবেন না।" সেই জন্য পরিবর্তন পরিচালনা খুব কষ্ট হয়ে যায়, সেখান থেকে আয় বন্ধ।

আবার ডেইরি ফার্মে বিনিয়োগের প্রয়োজনে খুব বিপদে পড়ে যাই– এমনকি ৮ জন ভাইবোন নিয়ে কোনদিন সারাদিন না খেয়ে থেকে রাতে হাতিরপুল আবেদের দোকান থেকে বাকী করে চাল, ডাউল এনে খেতে হয়েছে। ঠিকমত বাসা ভাড়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই, বাড়ীর মালিক অধৈর্য এক মাসের ভাড়া বাকী রাখতে রাজী নন, প্রচণ্ড চাপ, এই মহা দুঃখ কষ্টের দিনে শফিউল ইসলাম কামাল সাহেব আমাকে এক লাখ টাকা দিয়ে সাহায্য করেছেন। যার জন্য আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমি তাকে সম্মান করি। আমাকে কামাল সাহেব ১৯৯২ সনে এক লাখ টাকা দিয়ে বিরাট উপকার করেছেন এটা ছাড়াও আমি তাঁর অন্য আর একটি কাজের খুব পছন্দ করি– তা হচ্ছে কামাল সাহেব স্কুল ও কলেজে যাদের সাথে পড়ালেখা করেছেন– তাদের ভূলে যান নাই, তাদের সব সময় খোঁজ করেন, তাদের নিয়ে আড্ডা মারেন, প্রয়োজনে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেন বাংলাদেশের যেটা খুব বিরল ঘটনা, কেউ বড় হলে আর অতীতের কাউকে চিনে না, সব ভুলে যায়, কিন্তু কামাল ভাই এর ব্যতিক্রম তিনি অতীতের পরিচিতজনদের ভুলে যাননি। এছাড়াও কমাল সাহেব অনেক গরিব মানুষকে তার বড় ভাই জহুরুল ইসলাম সাহেবের মত সহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। সরকারী সিনিয়ার আমলারা কামাল ভাইকে খুবই সম্মান করতো, এর মধ্যে কামাল সাহেবের কাছ থেকে কোন সুযোগ সুবিধা পাননি এদের সংখ্যাও অনেক ছিল। নিরহংকার একজন সজ্জন ব্যক্তি সফিউল ইসলাম কামাল ভাই।

www.pathagar.com

১৯৮০ সন থেকে কামাল ভাইয়ের সাথে পরিচয় ১৯৯২ সনে এক লাখ টাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন, মাঝেমধ্যে ওনার মতিঝিল অফিসে গিয়ে দেখা করে আসতাম, অনেকদিন যাইনা। আজ ১০/১০/২০০৮ তারিখ রমনা পার্কে মর্নিংওয়াক করার সময়ে আনিস সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন– "কামাল মামুর সাথে তোমার দেখা সাক্ষাৎ হয় কিনা?"

জবাবে আমি বললাম অনেকদিন যাবৎ যাওয়া হয় না। কেননা ২০০২ সনে বি,এন,পি ক্ষমতায় আসবার পরে ওনার সাথে দেখা করতে গেলে দেখছি উনি বেশ সময় বাইরে বসিয়ে রাখেন। তারপরে ভিতরে ডেকে নিলে খুব অল্প সময় দেন, চা-বিস্কুট খাওয়ান না, মনে হয় আমার যাওয়াটা ভালো মনে করেন না এবং বি,এন,পির প্রতি কিছুটা অনুরাগীও হতে পারেন। জবাবে কাজী আনিসুর রহমান বলেন "বাজে কথা বলবে না, কামাল কোনদিন বি,এন,পির অনুরাগী হতে পারেনা তুমি ওনাদের সম্পর্কে কি জানো?"

জবাবে আমি বলি না, আমি তেমন কিছু জানিনা। আনিস সাহেব বললেন জানো বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য কামাল সাহেবের বাবার মৃত্যু হয়েছে। আমি এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে যাই, বলি না তা আমি জানিনা। আনিস সাহেব বলেন– ১৯৭১ সনে কমাল মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে কাজ করেছে যার জন্য পাকিস্তানী আর্মিরা তাঁকে মারধর করে, গ্রেপ্তার করে জেলে রাখে। কামাল সাহেবের গ্রেপ্তার হবার পর তার বাবা আফতাব উদ্দিন আহমেদ শোকে দুঃখে পাগলের মতো হয়ে যায়। এখানে সেখানে কামাল মামুকে মুক্ত করাবার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন এবং ঐ সময়ের পাকিস্তানপন্থী এক শীর্ষ নেতার কাছে ফোন করেন। ফোন করা অবস্থাতেই এক পর্যায়ে ঢলে পরে মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ চলার সময়ে। কাজেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অনেকের চেয়ে কামাল সাহেবদের অবদান কম না। এরা কোন সময় রাজাকার আলবদরদের দলের সমর্থক হতে পারেনা।"

শফিউল ইসলাম কামাল ভাই ১৯৭১ সনে পাকিস্তানী সেনাদের দ্বারা গ্রেপ্তার হয়ে জেলে ছিলেন, তাকে শারীরিক নির্যাতন করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থনে কাজ করার জন্য, আফতাব উদ্দিন আহম্মেদ সাহেব মৃত্যুবরণ করেছেন, আজ একথা প্রথম শুনলাম কাজী আনিসুর রহমান সাহেবের নিকট থেকে। অথচ কত লোক স্বাধীনতাযুদ্ধে তাদের অবদান আছে একথা বলে কত বিষয় টেনে বলে কত চিৎকার করেন পত্রিকায় কত সাক্ষাৎকার দেন, কত বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বেড়ান।

অথচ কমাল ভাই এর স্বাধীনতাযুদ্ধে এমন অবদানের কথা আগে কোথাও শুনি নাই পড়িও নাই।

শফিউল ইসলাম কামাল ভাই আপনার বিজয় যাত্রা অব্যাহত থাকুক, আল্লাহ যেন আপনাকে ভালোবাসেন এবং সাহায্য করেন।

১০/১০/২০০৮ শুক্রবার

www.pathagar.com

পুস্তক সমালোচনা

সময়ের মুখোমুখি লেখক হাসান শফি

সময়ের মুখোমুখি নামে হাসান শফির লিখিত একটি প্রবন্ধের বই বের হয়েছে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এ বইতে মোট ১১টি প্রবন্ধ রয়েছে। প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল পর্যন্ত সময়ে। '৯০ থেকে '৯৩ এই চার বছর সময়ে বর্তমান বিশ্বে এবং বাংলাদেশে যেসব স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে সেই সব বিষয় নিয়ে এই ১১টি প্রবন্ধ। হাসান শফির লেখার সাথে যাদের পরিচয় আছে তারা স্বীকার করবেন যে, হাসান শফির লেখার একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা হলো তার লেখার ভাষা অত্যন্ত মার্জিত, বক্তব্য অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ফলে হাসান শফির লেখা পড়ে তার লেখার প্রতি পাঠকদের একটি সমীহভাব আসে। সময়ের মুখোমুখি বইয়ের প্রথম লেখাটি হচ্ছে 'সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় : বিপ্লব ভাবনায় নয়া প্রেক্ষিত'। এই লেখাটি '৯০ সালের। এই সালে পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় এক অকল্পনীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়, পূর্ব জার্মানির সমাজবাদের পতন ঘটে, দুই জার্মানি এক হয়, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বদলে মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়। এই লেখায় সমাজতন্ত্রের মানব সভ্যতার প্রতি অবদান এবং সমাজতন্ত্রের ভেতরের সংকট নিয়ে নিরাসক্তভাবে হাসান শফি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

'উপসাগরীয় সংকট : তৃতীয় নেত্রপাত' বইয়ের ২য় লেখা। ইরাক কর্তৃক কুয়েত আক্রমণ এবং তাকে নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে যে ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে সেই ঘটনাকে নিয়ে হাসান শফি এই লেখায় তার বিজ্ঞানভিত্তিক মনদ্বারা ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে একটা সুন্দর লেখা তৈয়ার করেছেন।

আলোচ্য বইয়ের ৩য় লেখা হচ্ছে 'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম; করণীয় ও কৌশল' নামে। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের আগে বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখাটি লেখা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা ভারত-বাংলাদেশে এক মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বাংলাদেশ এবং ভারতের কোটি কোটি লোক যেভাবে নির্যাতিত-নিষ্পেষিত হচ্ছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সাম্প্রদায়িকতার পথরুদ্ধ করার জন্য হাসান শফি সাংবাদিক, লেখক ও রাজনীতিবিদদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য এই লেখার মাধ্যমে আহবান জানিয়েছেন। 'স্বৈরাচার, কবিতা, গণতন্ত্র, দ্বিতীয় বিজয় ইত্যাদি' নামে এ গ্রন্থের আর একটি লেখা। এ লেখাটি ১৯৯১ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পরে বাংলাদেশে বিরাজিত অবস্থা নিয়ে লেখা। এই লেখায় লেখক গণআন্দোলনের নামে বাড়াবাড়ি না করার, নতুন সুবিধাবাদী গোষ্ঠীর ব্যক্তিস্বার্থ শিকারের তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং গণতান্ত্রিক চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য আহবান জানিয়েছেন। ১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের সাথে বর্তমান ঘটনাকে যারা তুলনা করেন তাদের সাথে লেখক তীব্র দ্বিমত পোষণ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

'সময়ের মুখোমুখি' বইয়ের 'ইতিহাস চর্চার ভ্রষ্টাচার:- প্রসঙ্গ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' নামে একটি খুবই মূল্যবান লেখা রয়েছে। এ লেখার বিষয়বস্তু হচ্ছে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার এক জঘন্যহীন প্রয়াসের বিরুদ্ধে হাসান শফির বলিষ্ঠ বিবেকের এক জোরালো প্রতিবাদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ১৯৭১ সালে হয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহবানে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, মনসুর আলী, কামরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন মুজিবনগর সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত সরকারের সাহায্য-সহযোগিতায়। এরাই এদেশের এবং বিদেশের জনমত তৈরি করেছেন, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন সফলভাবে। অথচ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে এই সূর্যের আলোকের মতো সত্যকে পাশ কাটিয়ে তাদের অবদানকে অস্বীকার করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করার এক ঘৃণ্য প্রয়াস শুরু হয়েছে। এই ঘৃণ্য প্রয়াসের একটি উদ্যোগ শাহরিয়ার কবিরের সম্পাদনায় একটি বই 'সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন', যা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯২ সালে। হাসান শফি এই বইয়ের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে কলম ধরেছেন এবং সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন বইয়ের অন্তঃসারশূন্য বক্তব্যকে তুলে ধরে সত্যিকারের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন এবং সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন বইয়ের বক্তব্যকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন অত্যন্ত পরিশীলিত ও অকাট্য যুক্তি দ্বারা। হাসান শফি বলেছেন স্বাধীনতা যুদ্ধে সেক্টর কমান্ডারদের অবদান আছে, একথা সত্য, কিন্তু এই অবদানকে তুলে ধরার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, প্রবাসী মুজিবনগর সরকার, আওয়ামী লীগের অবদান ও ভারত সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার কারণ কি? সেক্টর কমান্ডাররা মুজিবনগর সরকারের অধীনে দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁদের মুজিবনগর সরকারই নিয়োগ প্রদান করেছেন, মুজিবনগর সরকারই তাদের বেতন, রেশন ও অস্ত্র সরবরাহ করেছেন, আর এখন তাদের ওপর সেক্টর কমান্ডারদের স্থান দেওয়া হচ্ছে। হাসান শফি এই অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে বিবেকের তাড়নায় কলম ধরেছেন।

'মৌলবাদী ভাষাতত্ত্ব' নামে বইতে ছোট একটি লেখা রয়েছে- বাংলাদেশের আরবি ও ফারসিকে কেন্দ্র করে। এ দুটি ভাষাই প্রধানত মুসলমানদের ভাষা, বাংলাদেশে বা বাংলা ভাষায় আরবির চেয়ে ফারসির প্রভাব বেশি, কিন্তু কিছু ব্যক্তির তা সহ্য হচ্ছে না, ফারসিকে উৎখাত করে তার স্থানে আরবিকে স্থান দিতে হবে- ফারসি নাকি খুব বেশি ইসলামসম্মত নয় এ নিয়ে একটি আলোচনা।

'সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নজরুল' নামে সময়ের মুখোমুখি বইয়ের আর একটি লেখা, যা লেখা হয়েছে কবি নজরুল ইসলামকে নিয়ে- তার অসাম্প্রদায়িক বক্তব্য ও চরিত্র নিয়ে, নজরুল ইসলামকে যারা শুধুমাত্র মুসলিম বানাতে চান বা মুসলিমদের কবি হিসেবে চিহ্নিত করতে চান তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে হাসান শফি দেখিয়েছেন নজরুল অসাম্প্রদায়িক বাউল কবি, তিনি হিন্দু মুসলিম তথা বিশ্বের সব মানুষের কবি।

'বামপন্থার ভবিষ্যৎ' নামে একটি লেখা যা দৈনিক সংবাদে ছাপা হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। এ লেখায় হাসান শফি বাংলাদেশের গরিব মেহনতি মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের এক হৃদয়বিদারক চিত্র এঁকেছেন বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তি

www.pathagar.com

হতে। লেখাটি পড়ে অনুভূতি বা সংবেদনশীল মানুষকে নাড়া দেয়, মানুষের দুঃখ-কষ্টের অমানবিক দৃশ্যাবলী কলমের মাধ্যমে তুলে ধরে হাসান শফি মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশে বামপন্থী রাজনীতির ভবিষ্যৎ আছে, এদের পার্শ্বে আন্তরিকতা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, এদের অমানবিক জীবনযাত্রা থেকে পরিত্রাণ দেবার জন্য।

'আপনার মুখ আপনি দেখুন' নামে আলোচ্য গ্রন্থের একটি খুবই মূল্যবান লেখা। এ লেখায় লেখক বর্তমানে যারা রাজাকার-আলবদর এবং শান্তি কমিটির লোকদের সাধারণ ক্ষমা করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করছেন বা গালাগালি করেছেন তাদের উদ্দেশ্যে লেখক প্রশ্ন তুলেছেন এর জন্য দায়ী কে? স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সহযোগিতা করেছিল তাদের বিচার না করার জন্য, তাদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এদেশে যারা সোচ্চারভাবে দাবি তুলে বক্তৃতা করেছেন, কলম দিয়ে লিখেছেন তাঁরা হচ্ছেন- মওলানা ভাসানী, আবুল মুনসুর আহমদ, আবুল ফজল, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা জাসদ, হলিউডের সম্পাদক এনায়েত উল্লাহ খান, চীনা বা মাওবাদী নেতা-কর্মীরা, আতাউর রহমান খান, তার দল জাতীয় লীগ, তখন একমাত্র ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ছাড়া এদেশের প্রায় সবদলই দালালদের বিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল। আজ যারা সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুর সমালোচনা করছেন তারাই বা তাদের নেতৃবৃন্দই বাংলাদেশে আন্দোলন করেছেন, জনমত সৃষ্টি করেছেন দালাল আইন বাতিল করার জন্য। অথচ আজ নতুন প্রজন্মের কাছে সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করার জন্য এরাই শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে এবং আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার জন্য। অন্যদিকে পাকিস্তানে ৫ লাখ বাঙালি আটকে ছিল। তাদের বাংলাদেশে ফিরে আনার জন্য। প্রচণ্ড চাপ ও প্রয়োজনও ছিল। ওদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যদি একজন পাকিস্তানিকে বাংলাদেশ সরকার শাস্তি দেয় (যুদ্ধবন্দি) তবে পাকিস্তানে এর প্রতিবাদে প্রকাশ্যে ফুটপাতে দাঁড় করিয়ে পাঁচজন বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করা হবে। এই অবস্থায় কিভাবে সম্ভব ছিল পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি সৈনিকদের বিচার করা? হাসান শফি 'আপনার মুখ আপনি দেখুন' প্রবন্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং তার পরবর্তী অবস্থা এবং যারা আজ শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে দালালদের মাফ করা নিয়ে কথা বলছেন তাদের স্বরূপ তুলে ধরছেন। এছাড়াও এ বইতে 'মোহ ভাঙাই ভালো' এবং 'গণতন্ত্র যা দাবি ক'রে নামে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের ওপর দু'টি লেখাসহ মোট ১১টি লেখা রয়েছে।

সময়ের মুখোমুখি বইটি মননশীল এবং রাজনীতি সচেতন পাঠক পাঠিকারা পড়লে তাদের চিন্তাধারা বা চেতনা বেগবান ও তীব্র হবে বলে আমার বিশ্বাস। বইটির বহুল প্রচার হওয়া দরকার। এমন একটি মূল্যবান বই প্রকাশ করার জন্য পাঠক সমাবেশকে ধন্যবাদ অবশ্যই জানাতে হয়।

দৈনিক সংবাদে সংবাদ সাময়িকী পাতা, ১৯ মে, বৃহস্পতিবার, ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত

www.pathagar.com

অভিমানের বদলে, মোরশেদ শফিউল হাসান

মোরশেদ শফিউল হাসানের এবার ১৯৯৪ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথম কবিতার বই 'অভিমানের বদলে' বের হয়েছে– এর আগে অবশ্য তাঁর একটি অনুবাদ কবিতার বই বের হয়েছে সেই ১৯৮৪ সনে, 'লোরকা: নির্বাচিত কবিতা' নামে।

'অভিমানের বদলে' কবিতার বইতে ৬১টি কবিতা রয়েছে। এই ৬১টি কবিতা লেখা বা ছাপা হয়েছে ১৯৭২ সন থেকে ১৯৯৩ সন পর্যন্ত। দীর্ঘ ২১ বছরে লিখিত ৬১টি কবিতা নিয়ে একটি কবিতার বই, ফলে 'অভিমানের বদলে' কাব্যগ্রন্থটি পড়তে নিয়ে পাঠক-পাঠিকারা ১৯৭২ সন থেকে ১৯৯৩ সনকে তাঁদের মনের পাতায় ধরতে পারবেন। গত ২১ বছরে কবির অনুভূতি, ভাবনা, অভিজ্ঞতা, চিন্তা, চেতনা, কল্পনা, দুঃখ, আনন্দ, বেদনা স্থান পেয়েছে আলোচ্য 'অভিমানের বদলে' বইতে। যার ফলে পাঠক-পাঠিকারা বইটি পড়তে নিয়ে অতীতে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার সাথে নিজের অনুভূতির মিল দেখতে পাবেন। মোরশেদ শফিউল হাসানের লেখা এ কবিতার বইটি পড়তে নিয়ে আমার আধুনিক কবিতার অন্যতম জনক ইংরেজ কবি টি,এস, এলিয়টের কবিতা এবং তাঁর কবিতার উপর লেখার কথা মনে পড়ছিল। টি,এস এলিয়ট যেমন ইনটেলেক্ট এবং বিউটির সংযোগ ঘটিয়ে কবিতা লিখেছেন মোরশেদ সাহেবের কবিতা পড়তে নিয়েও তেমনি মনে হয়েছে। মোরশেদের কবিতাতেও বুদ্ধি ও সুন্দরের চমৎকার মিশ্রণ আছে। যারা কবিতা পড়েন তাদের বইটি উল্লেখিত কারণে যথেষ্ট ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস।

'অভিমানের বদলে' বইয়ের ৬১টি কবিতার সব কবিতাই সবার ভালো লাগবে তা বলবো না, তবে যেসব কবিতা আমার বেশ ভালো লেগেছে এবং প্রাণে দাগ কেটেছে সে সব কবিতার নাম- 'অসময়', 'চিরন্তর আনন্দ', 'সুখী লোকেরা', 'অধরা-মাধুরী', 'তোমার মুখ', সেদিনের ছবি', একাকিত্ব বিষয়ক', 'উজানী মানুষ', 'আমার এমনিই যাবে', 'যাত্রা', 'জনৈকা আরোহিণীর প্রতি', 'অভিশাপ দিচ্ছি', এই কবিতাগুলো আমার মনে হয়েছে যেকোনও পাঠক-পাঠিকা ভালোবাসবেন এবং মনের পাতায় স্থায়ীভাবে স্থান দিতে চাইবেন। স্বল্প পরিসর, কাজেই উল্লেখিত কবিতাগুলোর উদ্ধৃতি এবং ব্যাখ্যা করার অবকাশ নেই, মাত্র একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করলাম, যাতে পাঠক-পাঠিকারা মোরশেদের কবিতা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন-

ভেবো না। আমার এমনিই যাবে- আমার তো আকাশ-আড়াল
অট্টালিকার স্বপ্ন নেই। এইযে কোনোদিন উড়োজাহাজে চড়লাম না,
তা বলে কোনো দুঃখবোধ আমাকে ছোঁয় না।
আসলে ওই দুঃখ-টুঃখ সম্পর্কে, আমার ধারণাই একটু যেন গোলমেলো,
আজ অবধি একটিও সুখী লোক দেখলাম না, যাকে সত্যিকার ঈর্ষা
করা যায়। মহত্তের প্রোফাইল দেখে ছুটে গেছি-
প্রতিবার জেনেছি সে শুধুই মুখোশ, কথার মুখোশ।

www.pathagar.com

এবং শেষ পর্যন্ত আমার ঘৃণাই আমাকে হারতে দেয়নি।
মোরশেদ শফিউল হাসানের কবিতায় মনে হয় আরও একটু বেশি উপমা প্রয়োগের প্রয়োজন আছে। তার কবিতায় উপমা প্রয়োগ একটু কম হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মোরশেদ একজন প্রতিভাবান কবি।
প্রকাশক, সহিদুল ইসলাম, 'পাঠক সমাবেশ' আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। মূল্য ত্রিশ টাকা।

- আবু মোহাম্মদ খান বাবলু

০৭/০৭/১৯৯৪ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত

www.pathagar.com

ভ্রমণ ঃ জুলাই-২০০৮
বগুড়া, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর এবং বরিশাল

বগুড়া

বগুড়ার বর্তমান জেলা প্রশাসক হুমায়ন কবীর একজন বিদ্যানুরাগী শিক্ষিত, মার্জিত স্বভাব চরিত্রের মানুষ। হুমায়ুন কবীর ১৯৭৬ সনে এস.এস.সি পাশ করেছে তারপর ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে অনার্স ভর্তি হন ১৯৭৮ সনে। ছাত্রজীবনে সূর্যসেন হলের ছাত্র। আমিও সূর্যসেন হলে থাকতাম ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট থেকে ১৯৮২ সন পর্যন্ত এবং ইংরেজী বিভাগের বছর দুই অনার্সের ছাত্র ছিলাম। সূর্যসেন হল থেকেই নাকি হুমায়ুন কবীর আমাকে চেনে। তবে আমার সাথে তার সম্পর্ক রেসকোর্স বা সোরওয়ার্দী ময়দানে মর্নিংওয়াক করার সময় প্রায় ২০ বছর যাবৎ।

হুমায়ুন লেখাপড়া জানা সৎ ও ভদ্রলোকদের ভালোবাসে এবং ভক্তি সম্মান করে, তাদের মধ্যে আমাকেও সে সম্মান করে এবং কিছুটা বই পুস্তক পড়ি বলে সে মনে করে। তবে আমাকে সে যাই মনে করুক আমি তাকে খুব উচু স্তরের একজন পড়ালেখা জানা লোক মনে করি। বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্য ও ভাষাতে।

প্রায় বিশ বছর একসাথে মর্নিংওয়াক করি। এর মধ্যে ১৯৯৬ সন থেকে ৫ বছর U.N.O হিসেবে ঢাকার বাইরে পোষ্টিং ছিল, তবুও মাঝে মধ্যে শুক্র শনি দুইদিন সপ্তাহে দেখা হতো।

২০০৭ সনে যখন হুমায়ূন বগুড়ার জেলা প্রশাসক বা ডি.সি হিসেবে নিয়োগ লাভ করে ঢাকা ত্যাগ করে তখন আমি খুব ভেঙ্গে পরি- এমনকি আমার চোখ দিয়ে ২/১ ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পরে। এই হুমায়ূন আমাকে বগুড়া যাবার জন্য তাগিদ দিতে থাকে বগুড়া দেখবার জন্য।

অবশেষে ৩.৭.২০০৮ তারিখে ঢাকা থেকে সকালে হানিফ পরিবহনের বাসে চরে স্ত্রীসহ বগুড়া দেখবার জন্য যাত্রা করি। ১.৩০ মি. বাস বগুড়ার চার মাথায় নামিয়ে দেয়, সেখান থেকে ৩০ টাকা সিএনজি ভাড়া দিয়ে সার্কিট হাউসে পৌঁছি। বগুড়া সার্কিট হাউসে তিন ধরনের মানুষের থাকার ব্যবস্থা - সুপার ভিআইপি, ভিআইপি ও সাধারণ। আমাকে N.D.C সাহেব ভিআইপির একটি ভালো রুম দেন। যেখানে A/C, T.V, কার্পেট সব আছে। আমি সে রুমে গিয়ে N.D.C সাহেবকে অনুরোধ করি, একটি সাধারণ রুম দেবার জন্য, তিনি আমার অনুরোধে একটি সাধারণ কক্ষ দেন এই রুমে ৩,৪,৫,৭ জুলাই অবস্থান করি ও বগুড়া শহর দেখি, থাকি এবং খাই। বগুড়া শহরে বগুড়ার জেলা স্কুল, বগুড়া সরকারি গার্লস হাই স্কুল, বগুড়ার এডওয়ার্ড পার্ক, সরকারি

www.pathagar.com

আজিজুল হক কলেজ, আলতাফুননেসা খেলার মাঠ, করতোয়া নদী বগুড়ার দেখবার বিষয় অনেক আগে থেকে। এখন বগুড়ার জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, হোটেল নাজ গার্ডেন, শাহনাজ গার্ডেন দেখবার মত এবং দেখে প্রাণ জুড়ায়, মহাস্থানগড় তো আছেই। আরও আছে বগুড়ায় প্রতিষ্ঠিত বাংলা ১১৫৫ ইংরেজী ১৭৪৯ সনে মা আনন্দময়ী কালী মন্দির, এবং এই কালী ঘর থেকে ৫ গজের মতো দুরে হযরত ফতেহ আলী অস্কালীর (রাঃ) মাজার যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে-১১৬৫ বাংলা, ১৭৫৯ ইংরেজী সনে। ১৯৭০ সনে খান আলম খান সাহেব বগুড়া জেলা প্রশাসক থাকার সময় সুন্দর বা উন্নত মানের মাজার ঘর নির্মাণ করেছেন। ১৭৫৯ সন থেকে একই জায়গায় পাশাপাশি কালি ঘর এবং ফতেহ আলী অস্ককালীর মাজার, অথচ আজ পর্যন্ত ২৪৯ বছরে কোন কলহ কোন্দল হয় নাই হিন্দু-মুসলিম ধর্ম পালন নিয়ে এই জায়গায়।

বগুড়া আকবরিয়া হোটেলের খাবার বেশ সু-স্বাদু। বগুড়ায় আমাদের তামাই গ্রামের বা আমাদের পাড়া-প্রতিবেশীদের প্রায় ১০ জন লোকের দোকান ছিল বা আছে প্রায় গত ১০০ বছর থেকে, যে জন্য বগুড়ার সাথে জন্মের পর থেকেই মনের পাতায় একটি সম্পর্ক ছিল, কিন্তু দেখা হয় নাই। জিলা প্রশাসক চাঁদপুরের ছেলে হুমায়ুনের জন্য বগুড়া দেখা হল।

বগুড়ায় অবস্থানকালে ৪-৭-২০০৮ তারিখে সকালে বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে গলফ্ কোর্সে ১০০টি গলফে্র বল মারি, ২৫টি ৯ নম্বর, ২৫টি ৭ নম্বর স্টিক দিয়ে ৫০টি ৩ নম্বর উডদিয়ে। ভালোই বল মারলাম, বেশ দুরে উঁচু দিয়ে বলগুলো গেল। বাংলাদেশের গলফ্ খেলার উজ্জ্বল রত্ন সিদ্দিকুর রহমানের বড় ভাই আ: রহমান বগুড়া গলফ্ কোর্সের মার্কার। তাকে বেশ ভাল মানুষ বলে মনে হল। ১০০টি বল মারার বলের জন্য ১০০ টাকা, বল বয়ের জন্য ১০০ টাকা, মার্কার আ: রহমান কে ৩০০ টাকা, মোট ৫০০ শত টাক খরচ হল। ঢাকা থেকে যাবার সময় গলফ্ সেটের ৪টি স্টিক ৩/৭/৯ এবং পাটার নিয়ে গিয়েছিলাম।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে সার্কিট হাউসে ফেরার পথে সকাল ১০টার দিকে বগুড়ার পর্যটন মটেলে ১ কাপ চা খেলাম, দাম ১২ টাকা। স্ত্রী ১টি স্যান্ডুইস খেল, দাম ৬০ টাকা। চায়ের কোয়ালিটি এবং স্বাদ দেখে ১২টাকা দাম যুক্তি সঙ্গত মনে হলেও ৬০ টাকা দামের স্যান্ডুইসের সাইজ খুবই ছোট।

এডোয়ার্ড পার্কে মর্নিংওয়াক এবং আকবরিয়া হোটেলের খাবারের কথা শাহানাজ গার্ডেনের ৭ আনি জমিদারদের বর্তমান পুরুষ শাহনাজ সাহেবের সৌজন্যবোধ ও তার মাধুর্যময় ব্যবহারের কথা অনেক দিন মনে থাকবে। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের পিএ এখন শাহনাজ সাহেবের শাহনাজ গার্ডেনের জি.এম। আরো মনে থাকবে হযরত ফতেহ আলী অস্কালীর (রা:) মাজার জিয়ারত এবং মাজারের পাশে অবস্থিত মা কালী মন্দিরের কথা। মাজার জিয়ারত করে ১০০ টাকা মাজারের দান বাক্সে এবং কালী মন্দিরের পুরোহিত পান্ডেজিকে ৫০ টাকা প্রণামী দিয়েছি।

খুবই দৃষ্টিনন্দন আধুনিক বিলাশ বহুল হোটেল নাজ গার্ডেনে বেরাতে গেলে স্ত্রী দুই

www.pathagar.com

হাজার টাকার কস্‌মেটিকস কিনে। এটাও মনে থাকবে।

৪ঠা জুলাই ২০০৮ শুক্রবার বগুড়ার ডি.সি অফিস চত্তরে ডি. সি হুমায়ন কবির কর্তৃক নব নির্মিত সুন্দর মসজিদের মুসল্লিদের সাথে প্রথম জুম'আর নামাজ আদায়ের কথা এবং ঐ দিন জুম'আর নামায পড়েই বগুড়ার সাইজাপাড়া ইস্কনের মন্দিরে রথ যাত্রার অনুষ্ঠানে ডি.সি হুমায়ুন কবির ও এস.পি আকরাম হোসেনের সাথে সস্ত্রীক মঞ্চে আসন গ্রহণ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও ইস্কনের গুণগান করে বক্তৃতা করি, তাও মনে থাকবে।

বর্তমান পৃথিবীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ জয় পতাকা মহারাজের পদার্পণ হয়েছে, ইস্কনের বগুড়ার সাইজাপাড়া মন্দিরে। আমার বিশ্বাস অল্প দিনের মধ্যে বগুড়ার জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজের মতোই আরেকটি সুন্দর প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে এই ইস্কনের মন্দির জয় পতাকা মহা রাজের বদৌলতে।

নাটোর

'বিল চলন, গ্রাম কলম, কাচাগোল্লার খ্যাতি
অর্ধ বঙ্গেশ্বরী রানী মা ভবানির স্মৃতি
উত্তরা গণভবন-রাজরাজন্যের ধাম
কাব্যে ইতিহাসে লেখা আছে নাটোরের নাম'

মা ভবানীর পদ স্পর্শে ধন্য পূণ্যভূমি নাটোরের সার্কিট হাউসে থাকি ৬ই জুলাই ২০০৮। মহারানী মা ভবানীর জন্ম ১৭১৫ সনে বগুড়ার শেরপুরে, ১৭৩০ সনে নাটোরের রামকান্ত নামক এক ছোট জমিদারের সাথে বিবাহ, ১৭৪৮ সনে স্বামীর মৃত্যু, তারা সুন্দরি নামে একমাত্র মেয়ে ছিলো।

স্বামীর মৃত্যুর আগে ও পরে রানী ভবানী বিশাল জমিদারীত্ব গড়ে তোলেন। বর্তমানে বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার প্রায় আট আনা জায়গার রানী ভবানীর একক জমিদারি প্রদান করেছিলেন নবাব মুর্শীদ কুলি খান। বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলায়, বিহার, উড়িষ্যার ভবানীপুর, ভবানীগঞ্জ, ভবানীর হাট, ভবানীর ঘাট নামে যত জায়গা আছে সব নাটোরের মহারানী মা ভবানীর নামে। বাংলাদেশ ও পশ্চিম বাংলায় যত বড় - বড় জলাশয় বা খাল-বিল আছে তার বেশীর ভাগ রানী ভবানীর করা। তিনি খুব দয়াবতী, প্রজার মঙ্গলকামী জমিদার ছিলেন। ১৭৫৭ সনে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পরাজয় হলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ২ কোটি টাকা রানী ভবানীর কাছে পলাশীর যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ দাবী করে, রানী ভবনী তা নাকচ করে দেন। পরে রানী ভবানীকে বাদ দিয়ে অন্যান্য জমিদারদের দিয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই ২ কোটি টাকা উঠানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রানী ভবানীর জমিদারী আবার ফেরৎ পান। ১৭৭১ সনে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী জবরদস্তি করে খাজনা আদায়ের জন্য বাংলা বিহার, উড়িষ্যার মহা দুর্ভিক্ষে অর্ধেকের বেশি লোকের মৃত্যু হয়। ১৭৮৪ সন থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী

www.pathagar.com

রানী ভবানীর জমিদারী নিলামে বিক্রি করা শুরু করে। ইংরেজরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা করেন। ফলে অনেক ছোট বড় জমিদারের জন্ম হয় এবং তা ১৯৫০ সন পর্যন্ত বহাল থাকে।

রানী ভবানী প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা নিতো প্রজারা খুশী হয়ে যা দিতো তাই। কিন্তু ইষ্ট ইন্ডিয়া কম্পানির গর্ভনর জেনারেলরা প্রজাকে নির্দিষ্ট হারে খাজনা বেধে দিতে বলেন- রানী ভবানী এর সাথে একমত না হয়ে তিনি জমিদারী ছেড়ে দিতেই রাজী হন। ১৮০২ সনে এই মহীয়শী নারী রানী ভবানীর মৃত্যু হয় কলকাতায়। ঢাকায় বা পূর্ব বাংলায় রানী ভবানীর স্মৃতি চিহ্নের তুলনায় কলকাতা শহরে ও পশ্চিম বাংলায় রানী ভবানীর কীর্তি স্মৃতি চিহ্ন অনেক বেশি। ৬-৭-২০০৮ইং রোববার সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত রানী ভবানীর বাড়ির মধ্যে থাকি ও দেখি। ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মহারানী মা ভবানীর বাড়ির পূর্ব দিকের গেটের সামনে এক ঘণ্টা বসে থাকি বিশাল পুকুরের ঘাটে। ৩২০ একর বাড়ির জায়গার চারিদিকেই বিশাল জলাশয়। পূর্বদিকে একটি শুধু রাস্তা বাড়িতে যাতায়াতের জন্য।

মহারানী মা ভবানীর বাড়ি-ঘরগুলো আজ ভেঙ্গে যাচ্ছে। দেখে খুব দুঃখ পেলাম, যিনি এক সময় বাংলা বিহার উড়িষ্যার কোটি কোটি মানুষের ভাল বাড়ি ঘর দেখার জন্য ব্যাকুল ছিলেন, হাজার হাজার মানুষের ঘর বানিয়ে দিয়েছেন। আজ তারই বাড়ির ঘর ভেঙ্গে যাচ্ছে, তা দেখবার মতো কেউ নেই।

এখান থেকে রাত ৮টায় (৬/৭/২০০৮) শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর বাড়িতে যাই। বাড়ি থেকে একটু দুরে কালি মন্দিরে নাম কীর্তন হচ্ছে। ৭ দিন ৭ রাত, এর জন্য প্রয়াত শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর বাসায় প্রতি দিন ও রাতে ১ হাজার করে লোক ভোজ খাচ্ছে দুই পদের তরকারী সব্জী ও ডাল দ্বারা। ৭ দিনে ৭ হাজার মানুষকে প্রতি বছর খাওয়ানো হয়। গত ১০০ শ' বছরের বেশি সময় ধরে নাকি এই ভোজ যজ্ঞ করে আসছেন শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর পরিবার। আমি এই ৭ হাজার লোকের ১ জন হয়ে রাতে খাবার খেয়ে নিলাম। স্ত্রী নূর নাহার খেলো না, এর জন্য মিসেস শংকর গোবিন্দ চৌধুরী বা অনিমা বৌদির মুখ বেশ মলিন হল।

শংকর গোবিন্দ চৌধুরী সে এক অসাধারণ ভাল মানুষ ছিলেন, আমার সাথে অসাধারণ ভাল সম্পর্ক ছিল। ১৯২৬ সনে নাটোরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯৯৫ সনের ১৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেছেন। বহুদিন নাটোর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং নাটোরের এম.পি ছিলেন।

নাটোরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অবিসংবাদিত নেতা শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর বাবার নাম জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী। জ্ঞানদা গোবিন্দ চৌধুরী নাটোরের একজন জমিদার ছিলেন এবং তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গত শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্যাজুয়েশন ডিগ্রি নিয়েছিলেন।

ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রী সভায় শিক্ষা মন্ত্রী

www.pathagar.com

১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলার সময়ে পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী, পাঞ্জাবের সাবেক গর্ভনর ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের শ্বশুর বাড়ি নাটোর জেলার বাসুদেবপুর গ্রামে। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের স্ত্রীর নাম ব্যারিস্টার মায়া ভট্টাচার্য। মায়া ভট্টাচার্যের বাবার নাম কিরণ ভট্টাচার্য, শংকর গোবিন্দ্র চৌধুরী স্ত্রীর নাম অনিমা ভট্টাচার্য। অনিমা ভট্টাচার্য বাবার নাম সুধীর ভট্টাচার্য, সুধীর ভট্টাচার্য, কিরণ ভট্টাচার্য আপন দুই ভাই, এরা মোট ৫ ভাই ছিলেন। সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের শ্বশুর ব্যারিস্টার মায়া রায়ের বাবা কিরণ ভট্টাচার্য গত শতাব্দীর প্রথম দিকে বিলেতে ডাক্তারী পড়তে গিয়ে সেই দেশে থেকে যান, এখানে আর ফিরে আসেননি। সিদ্ধার্থ শংকর রায় এবং নাটোরের শংকর গোবিন্দ্র চৌধুরী দুজনে ভায়রা ভাই। সৌরেন চক্রবর্তী নামে শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর এক মেয়ের কৃতি জামাই এর উপর এখন শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর খ্যাতি ও প্রভাব বইবার ভার পরেছে।

দেবতা শিব মানবরূপে
শংকর গোবিন্দ নাম ধরে
এসেছিলো নাটোরে
মানুষকে কোনোদিন ভাবে নাই পর
বেঁচে নেই তিনি আজ, আছে তাঁর স্মৃতি
নাটোরের চন্দ্র শংকর গোবিন্দ
রেখে গেছে ভালোবাসা, প্রেম আর প্রীতি– অনিল চন্দ্র পাল।

নাটোরের কাঁচা গোল্লা খাই, নাটোর জেলা প্রশাসকের অফিসের সামনে মাত্র এক একর জায়গার উপরে গড়া ২০০৬ সনের নাটোরের জেলা প্রশাসকের সুন্দর পার্কটি দেখেও মুগ্ধ হই। নাটোরের এক একর জায়গায় পার্ক দেখে অনুপ্রাণীত হয়েছি- বাংলাদেশ সরকারের পূর্ত মন্ত্রণালয় এর উচিৎ-দেশের প্রতি উপজেলা সদরে ৩ একর বা ৯/১০ বিঘা জমি নিয়ে এমনি পার্ক গড়ে তোলা, এতে দেশের মানুষের বিরাট উপকার হবে।

নাটোরে মহারানী মা ভবানীর বাড়ী ৩ শত ২০ একর বা ৯৬০ বিঘা জমির উপরে, দিঘাপতিয়ার জমিদার বাড়ি একশত একর বা ৩০০ বিঘা জায়গার উপরে, বর্তমানে যা উত্তরা গণভবন। ৭/৭/২০০৮ বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত দিঘাপতিয়ার জমিদার বাড়িতে অবস্থান করি এবং দেখি। এটি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়ি বা ভবন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ২ টি জমিদার বাড়ী দেখবার মতো, না দেখলে মানব জন্ম বৃথা।

বগুড়া থেকে নাটোর যাবার সময় শাহজাহানপুর, নন্দী গ্রাম, সিংড়া উপজেলা ও চলন বিল দেখা যায়।

নাটোরের শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর ভায়রা ভাই সিদ্ধার্থ শংকর রায় ১৯৩৬ সনে মেট্রিক পাস করেন। ১৯৩৮ সনের কলিকাতার বনেদীও বিত্তবানদের কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আইএ পাস করেন। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সনে মেট্রিক পাস প্রেসিডেন্সী কলেজের ঐ সময়ের কয়েকজন ছাত্রের সাথে আমার বেশ ভাল পরিচয় হয়। তারা আমাকে খুব স্নেহ করেন। এদের একজন প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সালাউদ্দিন

www.pathagar.com

আহমেদ। প্রখ্যাত লেখক আবু সাঈদ আইয়ূবের আপন ভাগ্নে এবং তার আপন ভাই কলিকাতার প্রখ্যাত ডা. গণির মেয়ের জামাই আবুল মাসুদ সাঈদ। এরা দু'জনই আমাকে খুব স্নেহ করেন। সাঈদ সাহেবের সাথে ১৯৭৯ সাল থেকে প্রতিদিন সকালে রমনা রেসকোর্সে ও রমনা পার্কে মর্নিংওয়াক করে আসছি। দেশবন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাশের নাতী নাটোরের শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর ভায়রা ভাই ব্যরিস্টার সিদ্ধার্থ রায়ের সহপাঠী সাঈদ সাহেব ১৯৪৪-৪৫ এই দুই বছর ঢাকা কলেজের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। এ কারণে তাজউদ্দিন আহমদ সহ অনেকেই তাঁর ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৩-১৯৫৭ সন পর্যন্ত সাঈদ সাহেব লাহোর সিএসপি একাডেমির ডাইরেক্টর ছিলেন, ব্রিটিশ নাগরিক বার্জেজ সাহেবের সাথে। ফলে ১৯৫৩ সন থেকে ১৯৫৭ সন পর্যন্ত যারা পাকিস্তানের লাহোর সিএসপি একাডেমির ছাত্র ছিলেন তারা সবাই সাঈদ সাহেবের ছাত্র। এদের মধ্যে একজন সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গরিমায় আচার ব্যবহারে সাঈদ সাহেব সুপার বা অসাধারণ ভাল মানুষ। কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার হচ্ছে তিনি কেন জানি হিন্দুদের উপর এলার্জিক। হিন্দু দেখে ও তাদের নাম শুনে খুব ভয় পান। এরপরেও সাঈদ সাহেব একজন অসাধারণ ভাল মানুষ। আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি, সম্মান করি। দীর্ঘদিন তার সাথে প্রতিদিন দু' এক ঘন্টা করে মিশার সুযোগ পেয়েছি, অনেক কিছু শিখেছি। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭ সনে মেট্রিক পাস ও প্রেসিডেন্সি কলেজে যারা ছাত্র ছিলেন তারা হলেন সত্যজিৎ রায়, বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রতি আবু সাঈদ চৌধুরী, আমার বন্ধু আহম্মদ জাফর ইমাম স্বপনের মামা আবুল হাসানাত সাহেব, প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক জহুর হোসেন চৌধুরী, কবি আবুল হোসেন, কলিকাতা হাই কোর্টের প্রখ্যাত আইনবিদ ৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পশ্চিম বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল সুব্রত রায় চৌধুরী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শহীদ শিক্ষক অধ্যাপক জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা, তাঁর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতার সাথে ১৯৮৭ সনে এম এন রায় জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন সমিতির যুগ্ম আহ্বায়ক হিসাবে আমি কাজ করি ও স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করি। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন শ্রদ্ধেয় সালাউদ্দিন আহমেদ সাহেব। তার ছোট ভাই প্রয়াত ফখরুদ্দিন আহমেদ স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন। ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের কয়েকদিন পর তাকে অপসারণ করে খন্দকার মোস্তাক আহমদ তোবারক হোসেন সাহেবকে পররাষ্ট্র সচিব নিয়োগ করেন। ওনার সঙ্গেও আমি অনেক দিন গলফ্ খেলেছি ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮ সনে, তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করেন।

রংপুর

৮ই জুলাই ২০০৮ তারিখ বিকালে রংপুর শহরে যাই। ১৯৭২ সনের ১২ই জানুয়ারি সর্বশেষ রংপুর ত্যাগ করেছিলাম। ১৯৪০ সন থেকে ১৯৭০ সন পর্যন্ত আমার বাবার রংপুরে কাপড়ের ব্যবসা করেছেন। ১৯৭১ সনের ১৭ই ডিসেম্বর আমি প্রথম মুক্তি সেনা যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে রংপুর শহরে প্রবেশ করি সেক্টর কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার

www.pathagar.com

জোশী সাহেবের গাড়ি বহরের সাথে। রংপুর মেডিকেল কলেজ ১৯৭১ সনে অসমাপ্ত নির্মাণাধীন ছিল। এখানে রংপুর জেলার প্রায় সমস্ত পরাজিত পাক সেনাদের বন্দী করে রাখা হয় এবং এখান থেকে পাক সেনাদের ভারতে নেওয়া হয়। এই মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে বন্দী পাক সেনাদের অনেক কান্না ও চোখের জল দেখেছি।

কাজেই রংপুর মেডিকেল কলেজ দেখার জন্য, রংপুর শহর দেখার জন্য প্রবল ইচ্ছা ছিল, বগুড়ায় যেহেতু এলাম তাই সস্ত্রীক রংপুর দেখার জন্য সিদ্ধান্ত নেই এবং ৮.৭.২০০৮ তারিখ রংপুর আসি এবং সার্কিট হাউজের ৩ নং কক্ষে অবস্থান করি। রংপুর সার্কিট হাউসে রুম পাবার জন্য ডি. সি হুমায়ুন, বগুড়ার ফেরদৌস সাহেব N.D.C এবং রংপুরের N.D.C সালাউদ্দিন সাহেব সাহায্য সহযোগীতা করেছেন। রংপুরের N.D.C সালাউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির ছাত্র একজন সজ্জন ভালো মানুষ।

রংপুর এসে আমার সবচেয়ে বড় আবিস্কার রংপুরের ক্ষত্রীয় সোসাইটি। ১৯১০ সনে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মন রংপুরের এই ক্ষত্রীয় সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। আমি জানতাম যে বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্ষত্রীয় সম্প্রদায় নেই, শুধু ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং নমশুদ্র আছে। বাঙ্গালীদের মধ্যে ক্ষত্রীয় আছে দেখে খুব খুশী হলাম। ক্ষত্রীয়দের কাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় কারণে যুদ্ধ করে প্রয়োজনে মৃত্যু বরণ করা। ক্ষত্রীয় ছাড়া সমাজে বসবাস করা এক সময়ে কল্পনার বাইরে ছিল। রংপুরের ক্ষত্রীয় সমাজের অফিস, হোস্টেল ও মন্দির আছে। এখানে ছাত্রাবাসে অবস্থানকারী মাষ্টার্স একাউনটেনসির ছাত্র সীমান্ত কুমার রায় বললো যে বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার শতকরা ৬০ ভাগ হিন্দু ক্ষত্রীয় সম্প্রদায়ের ছিল, এখনও ৪০% ক্ষত্রীয় হিন্দু আছে এই তিন জেলায়। ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের রায় সাহেব পঞ্চামন বর্মণের রংপুরের প্রতিষ্ঠিত এই ক্ষত্রীয় সোসাইটিতে ৫০% হারে কম মূল্যে এখানে ছাত্ররা থাকতে পারে।

জানিনা আমার এই লেখা রাষ্ট্রের বা বাংলাদেশের কোন কর্ণধার পড়বেন কি না, তবে বিশ্বাস আছে পড়বেন। সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনীর সব সদস্যের ক্ষত্রীয় সম্প্রদায়েরই হবার কঠোর বিধান ছিল। কিন্তু আমাদের বাংলাদেশ তা নেই, আমার অনুরোধ অন্তত ৫/১০ ভাগ সেনা সদস্য ও পুলিশ সদস্য রংপুর, বগুড়া ও দিনাজপুর জেলার ক্ষত্রীয় সম্পদ্রায়ের লোকদের থেকে চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া হোক। এতে বাংলাদেশের জনগণের অনেক উপকার পাবে।

রংপুর থাকার সময়ে বেসিক ব্যাংকের রংপুরের ম্যানেজার ডি.জি.এম আবুল হাশেম সাহেব একদিন দুপুরে আমার স্ত্রী ও আমাকে মিড নাইট সান চাইনিজ হোটেলে লাঞ্চ খাইয়েছেন, এবং ভিন্ন জগৎ দেখবার জন্য একটি মাইক্রোবাস ভাড়ার অর্ধেক ৬০০ টাকা দিয়েছেন এর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

আমাদের তামাই গ্রামের বাড়ীর পাশের বাড়ীর অধ্যাপক শেখ সাইদুল ইসলাম একরাতে ডিনার খাইয়েছেন। অনেক দিন রংপুর কলেজে অধ্যাপনা করার পর শেখ সাইদুল হক সাহেব ২/১ বছর আগে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং রংপুরের কেরানী

www.pathagar.com

পাড়ায় বাড়ী করেছেন। এই অধ্যাপক সাইদুল হক সাহেব এবং আমাদের গ্রামের মরহুম আব্দুস সালাম বি.এস সি এরা দুইজন আমাকে দিয়ে ১৯৭২ সনের এপ্রিল মে মাসে আমাদের গ্রামে তামাই গার্লস হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করান। তামাই গার্লস হাই স্কুল আমরা তিনজনে জন্ম দেই বা প্রতিষ্ঠা করি। কিন্তু এটাকে গড়ে তুলেছেন তামাই গ্রামের বেশ কয়েকজন বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি, এরা হলেন মরহুম হাজী হায়দার আলী খান, মরহুম সাহাবউদ্দিন তালুকদার, আমার ফুফাতো ভাই হাজী নুর নবী, মরহুম শেখ মহিউদ্দিন, মরহুম ওসমান গনি সরকার, আবু সাইদ সরকারসহ আরও কয়েকজন। রংপুর আমাদের গ্রামের আমার বন্ধু আঃ হাইয়ের ছেলে মোহাম্মদ আলীর বাসায় একরাত থাকি ও সকালে নাস্তা ও দুপুরে খাবার খাই। মোহাম্মদ আলী রংপুর শিক্ষক ট্রেনিং কলেজের শিক্ষক, বি,সি,এস শিক্ষা ক্যাডারের একজন সদস্য। মোহাম্মদ আলীর মা মনোয়ারা আমার ছোট বোন শাহিনুরের বান্ধবী, ও'র নানা শেখ মহিউদ্দিন আমার মুরব্বী ও আমার বাবার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিলেন।

রংপুরে অবস্থানের সময়ে আমার চাচাতো ভাইয়ের মেয়ে উষার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভিন্ন জগৎ দেখতে যাই এবং রংপুর কোতোয়ালী থানার সামনে ওদের বাসায় ৩ বার খাবার খাই। ভিন্নজগৎ রংপুর থেকে ১২ মাইল দূরে। খুবই দেখবার মত একটি জায়গা, তবে অতিরিক্ত গাছ লাগানোর জন্য যত সুন্দর হতো তা থেকে অনেকটা ব্যাহত হয়েছে বলে আমার মনে হয়েছে। কেরামতিয়া মসজিদে জুমার নামাজ পড়ার অনেক দিনের খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুক্রবার বেলা ১১.৩০ মিঃ থেকে ২টা পর্যন্ত প্রচণ্ড বৃষ্টি, ছাতা নিয়ে যাবার মত অবস্থাও ছিল না, তাই সে আশা পূর্ণ হয় নাই। অনেক দিন পরে রংপুর শহর দেখে প্রাণ জুরালাম। রংপুরে মুক্তিযোদ্ধা ওপেল ও মুঞ্জুরের সাথে দেখা করলাম, ওপেল প্রায় অন্ধ, আমাকে দেখে কেঁদে ফেলে। রংপুরে থাকতে এবার জেলখানা থেকে রেল স্টেশন পর্যন্ত তিনদিন রিক্সা যোগে ঘুরেছি। আর ১৯৬০ দশকের দেখা রংপুরকে স্মরণ করছি। রংপুরে হাড়িভাঙ্গা আম খেয়েছি, শালবনে আমার মায়ের চাচাতো বোনের মেয়ে লিলি আপার বাসায় একবার ডিনার খেয়েছি। তার এক ছেলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক মেজর সুমন এবং মেয়ের জামাই প্রখ্যাত লেখক, হারুণ-অর রশিদ আসকারী।

রংপুর মানে কেরামতিয়া মসজিদ, রংপুর কালিবাড়ী, জেলখানা থেকে রংপুর রেলস্টেশন, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর জেলা স্কুল, নতুন নির্মিত বাংলাদেশ ব্যাংক ভবন, মেডিকেল কলেজ ও মেডিকেলের মোড়, রংপুর মানে পায়রা চত্বর-শালবন, জাহাজ কোম্পানির মোড় থেকে কামালকাছনা-মাহিগঞ্জ। আমার স্মৃতিপটে সবসময় এসব উজ্জ্বল।

www.pathagar.com

দিনাজপুর

১৩ই জুলাই ২০০৮, বিকাল ৪-৩০ মিঃ-এ রংপুর মেডিকেলের মোড় থেকে বাসযোগে দিনাজপুর যাই, ৬-৩০ মিঃ-এ দিনাজপুর সার্কিট হাউসে পৌছি।

সার্কিট হাউসে পৌছেই স্ত্রীকে রেখে, লিয়াকত হোসেন লাবুর খোঁজে বের হই, চৌরঙ্গী সিনেমা হল এলাকায় লাবুর বাসা। ২০ টাকা রিক্সা ভাড়া, লাবুকে পেলাম, লাবু সম্পর্কে নানা আবার আমার ঘনিষ্ট বন্ধু। ঢাকা কালেজে আমরা এক সাথে পড়েছি, ও আই, কম, আমি আই, এ। ঢাকা কলেজে দক্ষিণ ছাত্রাবাসের ৩২২নং কক্ষে লাবু আমার রুমমেট ছিল, ১৯৭২ থেকে ৭৪ সনের জুন মাস পর্যন্ত। লাবুর বাবা নাসিম উদ্দিন সরকার আমার দাদার নিকট আত্মীয় এবং আমার বাবা ও মায়ের মরুব্বী ছিলেন। লাবুর বাবা খুব ধনী ও কাজের লোক ছিলেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী খুলনা, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুরে, জায়গা ও বাড়ি করেছেন। যা এখন তার ছেলেরা বিক্রি করছে এবং তা নিয়ে ভাই ভাই ছোট খাটো বিরোধ। লাবুর খুবই সুন্দর ২টি ছেলে আছে, শুভ ও শুভ্র নামে। যাই হোক লাবুর ভাগে দিনাজপুরের চৌরঙ্গী সিনেমা হলের কাছের বাড়ি পড়েছে। ৮০ দশকে লাবুরা ৫টি ট্রাকের মালিক ছিল, এখন সে সব ব্যবসা নেই। শুধু জায়গা ভাড়া থেকে যা আয় হয় তা দিয়ে লাবুর মোটামুটি ভাবে সম্মানের সাথে সংসার চলে যাচ্ছে। লাবুর স্ত্রী ফিরোজা খাতুন সিরাজগঞ্জ জেলার এনায়েতপুরের খুব ধনী মানুষ হাজী মুনসুর সাহেবের নিরহংকারী মেয়ে।

দিনাজপুরে সার্কিট হাউসে থেকেছি এবং লাবুর বাসায় ৩/৪ বার খেয়েছি। দিনাজপুরে ১৪/৭/২০০৮ তারিখে আই,জি,পি জনাব নূর মোহাম্মদ সাহেব আসেন, দুপুরে সার্কিট হাউসে দিনাজপুরের উর্দ্ধতম কর্মকর্তাদের সাথে লাঞ্চ খান। নূর মোহাম্মদ সাহেব আমার একজন ঘনিষ্ট বন্ধু, তিনি আমাকে খুব ভালোবাসেন, গত ৩৫ বছর থেকে। দিনাজপুর সার্কিট হাউসের ১৪/৭/২০০৮ তারিখ লাঞ্চে আমার স্ত্রীসহ আমাকে আই,জি,পি সাহেব নিমন্ত্রন করেন, আমরা তার সাথে লাঞ্চ খাই, তিনি দিনাজপুরের এস, পি ও সব উর্ধ্বতম কর্মকর্তার সামনে আমাকে তার ঘনিষ্ট বন্ধু বলে পরিচয় করিয়ে দেন এবং প্রয়োজনে আমাকে সব ধরনের সাহায্য করতে বলেন।

দিনাজপুরের স্বপ্নপুরী দেখার সখ। কিন্তু মঙ্গলবার প্রচুর বৃষ্টির জন্য বাইরে বের হওয়া যায় না। সার্কিট হাউসে থাকি, সার্কিট হাউসে লাবুর স্ত্রী প্রবল বৃষ্টির মধ্যে বাসা থেকে খিচুরী খাশির মাংশ, চিংড়ী মাছের বড়া, পটল ভাজি, সব্জী, রান্না করে নিয়ে আসেন, আমরা ২ জন লাবু ও তার স্ত্রী সন্তান শুভ্রসহ মোট ৫ জন খুব আনন্দ করে খেলাম।

মঙ্গলবার বিকালে লাবুর ছেলে শুভ্র কে সাথে নিয়ে রিক্সা যোগে রাম সাগর দেখবার জন্য গেলাম। ৭৫ একর জায়গা জুড়ে দিঘি। চারদিকে গাছ আর গাছ, দেখতে খুবই সুন্দর, ১৭৫০ সন থেকে ১৭৫৫ পাঁচ বছর ধরে এই পুকুর খনন করেছেন রাজা রামনাথ। বেশী মাত্রার বনজ গাছ, ফলের গাছ বেশী মাত্রায় থাকলে আরও ভালো হতো। বুধবার

www.pathagar.com

স্বপ্নপুরী দেখতে যাই, ফুলবাড়ী থানা দিনাজপুর থেকে অনেক দূরে, ভাগ্যিস আই, জি, পি নুর মোহাম্মদ সাহেব দিনাজপুর এসেছিলেন এবং মঙ্গলবার মশুল ধারে বৃষ্টি হয়েছিলো। মঙ্গলবারের মশুল ধারের বৃষ্টির জন্য এস,পি মোস্তফা কামাল সাহেবের কাছে সাহায্য চাই একটি গাড়ীর জন্য। যদি মশুল ধারে বৃষ্টি না হতো, যদি নুর মোহাম্মদ সাহেব দিনাজপুরে না আসতেন তবে আমার এস, পি সাহেবের কাছে গাড়ী চাওয়া হতো না। বাসেই ফুলবারিয়া যেতাম, আর দিনাজপুর থেকে বাসযোগে ফুলবাড়িয়ার স্বপ্নপুরী দেখতে গেলে আমি বেঁচে থাকতাম কিনা সন্দেহ। আল্লাহ আমাকে ভালোবাসেন তাই ১৪/৭/২০০৮ তারিখে আই.জি পি সাহেব দিনাজপুর আসেন, আর মঙ্গলবার বিরামহীন জোরে বৃষ্টি নামে যার জন্য এস, পি সাহেবের কাছে গাড়ী চাওয়ার অজুহাত পাই। গাড়ী দেবার জন্য এস, পি, মোস্তফা কামাল ও ইনপেক্টর আমিনুল হক সাহেবেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। দিনাজপুরের বড় মাঠ দেখবার মত সুন্দর, প্রাণ জুরায়ে যায় বড় মাঠ দেখে। যদিও মাঠ আজ নানা হুমকির সামনে, অনেকটাই একের পর এক দখল হয়ে যাচ্ছে। দিনাজপুরের বড় মাঠ দিনাজপুরের অলংকার এবং অহংকার। বুধবার স্বপ্নপুরী দেখে এসে বিরল থানার ১৫০ জন মুক্তি যোদ্ধার সম্পত্তি করাই বিল দেখতে যাই ১৬.৭.২০০৮ তারিখে।

১৫০জন মুক্তিযোদ্ধার মালিকানায় গড়ে উঠেছে কড়াই বিল, দিনাজপুরের বিরল থানায়। ১৬.৪.১৯৭৪ সনে ৫৬.১০ একর খাস জলাভূমি বিরল থানার ১৫০জন মুক্তিযোদ্ধাকে মালিকানা সত্ত্ব প্রদান করে সরকার লিজ দিয়েছে।

১৯৭৭ সনে সরকার দীঘি খনন করার জন্য বেশ ভালো পরিমাণের গম বরাদ্দ করেন, তা দিয়ে ১৮ একর বা ৫৬ বিঘা জায়গায় একটি দীঘি খনন করা হয়েছে, চারদিকে দীঘির পাড় উচু করে সেখানে প্রচুর বনজ গাছ লাগানো হয়েছে। এখন এই বিলের মুক্তিযোদ্ধারা বুঝতে পেরেছেন ফলের গাছ না লাগিয়ে বনজ গাছ লাগিয়ে বিরাট ভুল হয়েছে, তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বনজ গাছ কেটে ফলের গাছ লাগাবার।

১০ একর কৃষি জমি এবং ২৮.১০ একর নিচু ভূমি আছে যেখান থেকে মাটি কেটে দীঘির পার তৈরি করা হয়েছে। শীতকালে কড়াই বিলে প্রচুর বিদেশ থেকে পাখি বেড়াতে আসে। অনেকে পিকনিক করতে যায়।

২০০৮ সনের আগে প্রতি বছর ১৫০ জন মুক্তিযোদ্ধা প্রতি ঈদে এক হাজারকরে বছরে দুই হাজার টাকা পেয়েছে এই বিলের আয় থেকে। এবার তিন বছরের জন্য ২৩ লাখ টাকায় লিজ দিয়েছে, যার জন্য প্রতিজন মুক্তিযোদ্ধা চার হাজার টাকা করে পেয়েছে ছয় লাখ টাকা, বাকী ১৮ লাখ টাকা দিয়ে কড়াই বিলের অফিস কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। অক্ষয় কুমার রায় নামে একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্যের সাথে কথা বলে দেখলাম সে আসল বা জিনুইন মুক্তিযোদ্ধা, সে কড়াইবিলের সদস্য এবং দৈনিক ভিত্তিতে কামলার কাজ করছে, চেহারায় একজন দুঃস্থ মানুষের ছাপ, বৃষ্টি ও কাদার মধ্যে কাজ করছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আপনি তো আসল মুক্তিযোদ্ধা আপনার জন্য তো ১৯৭২ সনে সেনাবাহিনী, বি,ডি,আর, পুলিশ বাহিনীতে চাকুরি বাঁধা ছিল, সেখানে চাকুরিতে যোগ দান না করে আজ এই দুরাবস্থায় কেন?

www.pathagar.com

জবাবে ক্ষত্রিয় সন্তান একজন জিনুইন দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা অক্ষয় কুমার রায় জানালো “স্যার সে কথা আর বলবেন না, আমার আপন নানার ভাই, আমার এক নানার ৭৫ বিঘা জমি, ১৯৭২ সনে আমি সেনাবাহিনীতে চাকুরিতে যাব শুনে বলে আমার ৭৫ বিঘা জমি তুই দেখা শোনা কর, আর যত পারিস খা, কত খাবি।

আমি তার কথায় বিশ্বাস করে চাকরিতে যোগদান না করে নানার জমি দেখাশোনা করতে থাকি, এইভাবে ১০/১৫ বছর চলে যায় নানার ছেলেরা আস্তে আস্তে বড় হয়, তাদের কোলে পিঠে বড় করি, নানার ৭৫ বিঘা জমি রক্ষা করি, আমি মুক্তিবাহিনীর সদস্য কেউ জমি ক্ষতি করতে আসেনা।

আর নানার ছেলেরা বড় হয়ে আমার সাথে কারণে অকারনে খারাপ কথা বলে খারাপ ব্যবহার করতে থাকে, আমি নানাকে বলি নানা মামারা আমার সাথে এভাবে খারাপ ব্যবহার কেন করে? নানা দেখি চুপ থাকে কোন কথা বলে না।

অবশেষে একদিন নানার বাড়ি থেকে নিজের বাবার মাত্র ১৬ শতক জায়গার বাড়িতে চলে আসি। স্যার খুব বিপদে আছি, কষ্ট করে ছেলেকে বি.এ পাশ করায়ে আরও বড় ভুল করলাম। বি.এ পাশ ছেলে কোন চাকুরি পাচ্ছে না, আবার কামলার কাজও করাতে পারছিনা।”

অক্ষয় কুমার রায় আমার মত একজন আসল মুক্তিযোদ্ধা তার জায়গায় গিয়েছে অথচ বৃষ্টির জন্য রাস্তা খারাপ আমাকে সে এক কাপ চা খাওয়াতে পারলোনা এ দুঃখে চোখের জল ফেলে সে কেঁদে ফেলে। ১৬/৭/২০০৮ তারিখে বিরল থানার কড়াই বিল দেখার স্মৃতি মনের পাতায় গেঁথে থাকবে।

আমার এই লেখাটি যদি কোন সহৃদয় বিত্তবান মানুষ পড়েন তবে তকে অনুরোধ করবো যদি সাধ্য থাকে তবে কড়াই বিলের দুঃস্থ মুক্তিযোদ্ধা অক্ষয় কুমার রায়ের ছেলেকে একটি চাকুরি দিয়ে সাহায্য করতে, আর তাও সম্ভব না হলে অক্ষয় কুমার রায়কে ২০/৫০ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করতে, অক্ষয় কুমার রায় ৫৭ হাজার জিনুইন মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য।

১৯৭১ সনে পঞ্চগড় ও তেঁতুলিয়ার এম.এন.এ মোশাররফ হোসেন চৌধুরী সাহেবের সাথে দেখা করি ও তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। ১৯৭১ সনে তিনি মুক্তি বাহিনীতে ভর্তি হতে আমার নাম সুপারিস করেছিলেন, ভারতের রায়গঞ্জ ক্যাম্পে। দিনাজপুর রেল স্টেশনের কাছে তার বাড়ি। গ্রামের বাড়ি তেঁতুলিয়া থানার ময়নাগুড়ি গ্রামে।

১৯৪৮ সনে বোদা হাইস্কুলে থেকে মোশররফ সাহেব মেট্রিক পাশ করেন। পরে দিনাজপুর কলেজ থেকে আই.এ ও বি.এ পাশ করেন। এরপরে বি, এল ডিগ্রী নেন এবং একজন এ্যাডভোকেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগ থেকে এম, পি, নির্বাচনে নমিনেশন পান নাই, তখন থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ভাবে জড়িত নন। তবে একনিষ্ট আওয়ামী লীগের সমর্থক আছেন। মোশাররফ সাহেব একজন সজ্জন ব্যক্তি-যা পেয়েছেন তাতেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। তিন ছেলে

www.pathagar.com

মেয়ে সবাই প্রতিষ্ঠিত সবাই বিয়ে করেছে ছেলেরা মেয়ে জামাইরা ছোট খাটো চাকুরী করেন এতেই তিনি মহা খুশী। বাবার সম্পত্তি ৭০ বিঘার জমি বা সহায় সম্পত্তির মালিক তিনি, কিন্তু সে সবের প্রতি তার নজর নাই, ভাই ভাতিজারা ভোগ করেছেন, বললেন এতে আমার আপত্তি নেই, আমার তো অভাব নেই। মোশারফ সাহেবের সাথে দেখা করে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বিরাট দায়মুক্ত হলাম।

জগতে যেসব মানুষ কুকুর পছন্দ করে, কুকুরকে ভালো বাসে তাদের মধ্যে আমি একজন। আমি ধনী মানুষ নই। ফ্লাটে বসবাস করি তার জন্য কুকুর পালতে পারি না। তবে যেখানেই কুকুর দেখি কুকুরের প্রতি নজর দেই, ভালো ভাবে পর্যবেক্ষণ করি সাধ্যমত আদর সম্মান করার চেষ্টা করি। যার জন্য দিনাজপুর শহরের কুকুর গুলোও স্বাভাবিক ভাবেই আমার নজরে পড়েছে। দিনাজপুরের কুকুরগুলো দেখতে বেশ সুন্দর, উচু এবং লম্বা। মানুষের মধ্যে যেমন নায়ক নায়িকারা দেখতে সুন্দর, তেমনি দিনাজপুরের কুকুরদের দেখে মনে হয়েছে এরা বাংলাদেশের কুকুরদের নায়ক নায়িকা।

দিনাজপুরের কুকুর, দিনাজপুরের বড় মাঠ, দিনাজপুরের রামসাগর, দিনাজপুরের সূর্যপূরী আম হৃদয়ে অনেক দিন গেঁথে থাকবে।

দিনাজপুর শহর থেকে একটু দুরে বাঙ্গীর ঘাট নামক জায়গায় পুনর্ভবা নদীর উপরে বিরাট ব্রীজ হয়েছে। এখানে বিকালে ভ্রমণ করে খুব আনন্দ পেয়েছি। দিনাজপুরের কোন এক বিকৃতি মস্তিকের উম্মাদ জেলা প্রশাসক দিনাজপুরের রাজার বাড়িটিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা না করে রাজ বাড়িতে এতিমখানা নির্মাণ করেছেন। সেখানে এখন এতিমরা থাকে এবং রাজ বাড়িতে গরুর মাংস রান্না হচ্ছে দেখলাম, এতিমদের খাবারের জন্য। ডি. সি. সাহেবের এতিমখানা নির্মাণের জন্য দিনাজপুর জেলায় আর কোন জায়গা পান নাই। তার রাজবাড়ি পছন্দ হয়েছে। দিনাজপুরের রাজা শ্রী জগদীশনাথ রায় বাহাদুর দিনাজপুরের রামকৃষ্ণ মিশনকে ৪ বিঘা জমি দান করেছেন, ১৯২৫ সনে। সেখানে দৃষ্টি নন্দন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা দিনাজপুর শহরের একটি অলংকার এবং জমি দানকারীর রাজার নাম বাঁচিয়ে রেখেছে।

দিনাজপুরের রাজার যে গরুর রাখাল ছিল, রাজা ১৯৫০ সনের গোড়ার দিকে তাকে দিনাজপুর শহরের মধ্যে ৬০ বিঘা জমি দিয়ে গিয়েছেন। দিনাজপুরে রামকৃষ্ণ মিশনে গিয়েছি, সাধু সন্ন্যাসিদের সাথে ও সেখানে অবস্থানকারী ছাত্রদের সাথে কথা বলেছি। গরুর রাখালকে রাজার দেওয়া ৬০ বিঘা জমি ও তার উপরে এখন নির্মিত বাড়ি ঘরও দেখেছি।

দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক ছাত্রের সাথে কথা বলার সময় তার নামে রায় পদবী শুনে জিজ্ঞাস করেছিলাম- আপনি বৈশ্য না ক্ষত্রিয় ? সে তা জবাব না দিয়ে আমাকে জিজ্ঞাস করেন- 'আপনি তো মুসলিম' আপনি শিয়া না সুন্নী' ? জবাবে বলি আমি সুন্নী মুসলমান।

১৭/৭/২০০৮ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৮-৩০মি. ট্রেনযোগে ৪৭০ টাকা করে প্রথম শ্রেণীর ২টি টিকিট ৯৪০ টাকায় ক্রয় করে ঢাকার উদ্দেশ্য রওনা দিলাম। বিকালে

www.pathagar.com

৬ টায় ট্রেন বিমান বন্দর এলো কিন্তু বিমান বন্দর থেকে হাতিরপুল বাজারের কাছে আমার বাসায় আসতে রাত ৮.৩০ মি. বেজে গেল।

বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও নাটোর সার্কিট হাউসে আমাকে সস্ত্রীক থাকার জায়গা দেবার জন্য বগুড়ার ডি.সি হুমায়ন কবীর, এ,ডি,সি জেনারেল আইয়ূব হোসেন, বগুড়ার N.D.C এস,এম ফেরদৌস ও রংপুরের N.D.C সালাউদ্দিন আহমদকে আবার ধন্যবাদ জানাই।

বরিশাল

লিয়াকত আলী খান সাবেক ছাত্রলীগ নেতা, ঢাকা কলেজের ছাত্র-সংসদের সাবেক ভি,পি। একজন জাত ভদ্রলোক ও সজ্জন ব্যক্তি। ১৯৭০ সন থেকে পরিচয় ঢাকা কলেজের দক্ষিণ ছাত্রাবাস হতে। ছিমছাম টিপটপ মানুষ। এখন ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার। গত প্রায় ২ বছর বরিশাল অঞ্চলের আয়কর কমিশনার ছিলেন। এর আগে প্রায় ২ বছর রংপুরে অতিরিক্ত আয়কর কমিশনার ছিলেন। রংপুর ও বরিশালে যাবার জন্য অনেকবার জোড়াজুড়ি করেছেন, কিন্তু নানা প্রতিকূলতার জন্য যেতে পারি নাই। লিয়াকত ভাই যাতায়াত ভাড়াও দিতে চেয়েছেন, থাকা ও খাওয়াতো ফ্রি আছেই কিন্তু তবুও যাওয়া হয় নাই।

জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ ২০০৮, লিয়াকত আলী খানের বরিশাল থেকে ঢাকায় বদলী হয়। এবারে বরিশাল না গেলে আর কোনদিন যাওয়া হবে কিনা সন্দেহ, তাই বরিশালে যাই ২০ শে জুলাই ২০০৮, সুন্দরবন দুই লঞ্চযোগে ৫০০ টাকায় কেবিনের টিকিট কিনে।

২১/৭/২০০৮ সকালে বরিশাল লঞ্চ ঘাটে নামি, দেখি লিয়াকত ভাই গাড়ী পাঠিয়েছেন, ক্লাব রোডে আয়কর ভবনে এসে দেখি লিয়াকত ভাই ঘুমে, এত সকালে তার ঘুম ভাঙ্গালাম না। আমার মায়ের আপন চাচাতো বোন পিয়ারা খালার বাসায় গেলাম কাউনিয়া অঞ্চলে জানকি সিং রোডে। খালু হালিম সাহেব সোনালী ব্যাংকের এ,জি,এম হিসেবে চাকুরি থেকে রিটায়ার্ড করেছেন বেশ কয়েক বছর আগে।

দুই মেয়ে বিথি ও সাথী, দুই ছেলে বুলেট ও তুহিন। বুলেট অবসোনিন কোম্পানিতে মধ্যম মানের কর্মকর্তার চাকরি করে তুহিন চার্টার একাউন্টেড, বা সি.এ এখন লন্ডন প্রবাসী সস্ত্রীক। সাথী কলেজে অর্থনীতি পড়ায়, বিথী উপজেলা পরিবার-পরিকল্পনা অফিসার হিসাবে চাকরি করে। ভাই বোন সবারই বিয়ে হয়েছে। খালু হালিম সাহেব ও পিয়ারা খালার মেয়ে পরিবার-পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বিথীর স্বামী সোনালী ব্যাংকের প্রিন্সিপ্যাল অফিসার, গোপালগঞ্জের ছেলে জাহাঙ্গীরের সাথে দেখা হল। জাহাঙ্গীর একজন অতিথি বৎসল, হৃদয়বান, উদ্যমী মানুষ। সকালে নাস্তা খাবারের জন্য বললেন কিন্তু নাস্তা খেলাম না, দুপুরে লাঞ্চ খেলাম লিয়াকত ভাইসহ পিয়ারা খালার বাসায়।

www.pathagar.com

পরের দিন সকালে কির্তন খোলা নদীর ওপারে গেলাম ছোট পারাপারের নৌকা যোগে, প্রথমবার খুব ভয় পেলাম, ছোট নৌকায় ১৬ জন যাত্রী উঠায়, ২ টাকা ভাড়া প্রতিজন, নদীতে খুব স্রোত। চর কাওয়ায় নেমে রাসেল নামক এক রিক্সাওয়ালার বিক্সায় বেশ কিছু পথ গিয়ে আবার ঘাটে ফিরে এলাম।

বরিশাল অমৃত লাল-দে কলেজের প্রিন্সিপাল কবি তপংকর চক্রবর্তী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনের বন্ধু ছিল, ওকে দেখার জন্যও খুব ইচ্ছা ছিল। কলেজে ও'র সাথে দেখা করতে যাই, প্রথমে চিনতে পারলো না, পরিচয় দিলে চিনলো। এদিন কলেজের এক শিক্ষক মারা গিয়েছে, তাই তার লাশ দাফন করা নিয়ে তপংকর খুব ব্যস্ত, সময় দিতে পারলো না। বিকালে আসবে বললো কিন্তু এলো না, পরের দিন সকালে আমি ফোন করলাম বিকালে দেখা করতে আসবে বললো তাও এলো না ফোনও করলো না, যার জন্য আমি হাল ছেড়ে দিলাম, আর ফোন করি নাই দেখাও হয় নাই।

আমার বন্ধু পার্থ সারথী চট্টপাধ্যায় ও ইতিহাসের অনেক নায়ক এর বাড়ি বরিশাল। এরমধ্যে গত বছর প্রকাশিত তপন রায় চৌধুরীর বাঙ্গাল নামা বইটি পড়ে বরিশাল দেখার জন্য আরও উৎসাহিত হয়ে পরি। কিন্তু তপংকর চক্রবর্তীর ব্যবহারে বরিশালের প্রতি মনটা ভেঙ্গে গেলো। বি,এম, কলেজ দেখলাম, টিচার্স কমনরুমে একাই ১৫/২০ মিনিট বসে থাকলাম ও পত্রিকা দেখলাম, কলেজ চলছে, কমন রুমে একজন টিচারও দেখলাম না। মহাত্মা অশ্বিনী দত্তের ১৮৭৯ সনে প্রতিষ্ঠিত বি,এম কলেজ দেখে নয়ন জুড়ায়। ১৮৭৯ সনে মহাত্মা গান্ধী জী ১০ বছরের বালক মাত্র। বরিশালের উপ-কর কমিশনার আহসান উল্লাহ সাহেব একজন সাহিত্য অনুরাগী ব্যক্তি, তার মাধ্যমে তপংকর চক্রবর্তীর বড় ভাই কবি দীপংকর চক্রবর্তীর সাথে যোগাযোগ হল, তিনি আমার কথা শুনে ২০ মিনিটের মধ্যে আমার সাথে দেখা করতে এলেন। প্রায় ২ ঘন্টা কবি দীপংকর চক্রবর্তীর সাথে কথা বলে মনটা অনেক চাঙ্গা হলো, ইংরেজির অধ্যাপক, নিরহংকার ও জ্ঞানী মানুষ। ৩.৩০ মিনিটে দীপংকর চক্রবর্তী সাহেব চলে গেলে ভীষণ জ্বর এলো, খুব ভয় পেলাম। বারে বারে ১৯১১ সনে ভগিনি নিবেদিতার মৃত্যুর কথা মনে পড়ছিল, আর আরোও বেশি করে ভয় হচ্ছিল। ১৯১১ সনে ভগিনি নিবেদিতা বা ইংরেজ কন্যা মার্গারেট বরিশালে আসেন মানব সেবা বা ত্রাণ কাজে, এসে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন, কলকাতা ফিরে যান চিকিৎসা করান, রোগ ভালো হয় না, দার্জিলিং যান স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য সেখানে মৃত্যু বরণ করেন। বরিশালে ২৪শে জুলাই ২০০৮, দুই ঘন্টা একা একা খুব জ্বরে ভোগার সময় তাই ভগিনি নিবেদিতার মৃত্যুর কথা বারে বারে মনে হচ্ছিল।

২৪/৭/২০০৮ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে ৬ টার মধ্যে জ্বর ভালো হয়ে গেলো। ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ১ঘন্টা শিশু পার্কে এসে বসে থাকি ও পার্ক দেখি, প্রতিজনের জন্য ১৫ টাকা করে প্রবেশ মূল্য। ২৩শে জুলাই বুধবার রাতে লিয়াকত আলী খানসহ বরিশাল বগুড়া রোডে কবি জীবনান্দ দাশের বাড়িও দেখেছি।

আয়কর কমিশনার লিয়াকত আলী খান বরিশাল ত্যাগ করে ঢাকায় যোগ দান করার জন্য সুরভী লঞ্চে উঠলো রাত ৮ টায় সাথে আমিও। আর কি কোন দিন বরিশালে যাওয়া হবে?

www.pathagar.com

জেলার নাম সিরাজগঞ্জ

সিরাজগঞ্জ জেলার যে সব বিষয় নিয়ে গর্ব করার রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি বঙ্গবন্ধু যমুনা ব্রিজ, এই ব্রিজের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একবন্ধনে আবদ্ধ করেছে, হাজার বছরের বাংলাদেশের চেহারা বদলিয়ে এক আধুনিক বাংলাদেশে গড়ে তুলেছে এই ব্রিজ যা সিরাজগঞ্জ জেলায়।

সাহিত্যে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাহজাদপুরে অনেক কবিতা গল্প লিখেছেন, ছিন্নপত্রের অনেক চিঠিও এখান থেকে লিখেছেন যার জন্য শাহজাদপুর এক মর্যাদার আসনে বসে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের পাতায়।

কবি রজনী কান্ত সেন– সিরাজগঞ্জের বেলকুচি উপজেলার সেন ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, ১৯১০ সনে মৃত্যুবরণ করেন। অনেক বড় মাপের কবি, বাংলা ভাষার প্রধান পাঁচ কবির মধ্যে গান লেখার জন্য পণ্ডিতেরা তাকে ৩নং এ স্থান দিয়েছেন। প্রথম : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিতীয় : কাজী নজরুল ইসলাম, তৃতীয় : রজনী কান্ত সেন, চতুর্থ : দ্বিজেন্দ্র লাল রায়, পঞ্চম : অতুল প্রসাদ। আমি গর্বিত যে রজনী কান্ত সেনের জন্মস্থান সেন ভাঙ্গাবাড়ী থেকে মাত্র এক মাইল উত্তরে তামাই গ্রামে আমার জন্ম ১৯৫৪ সনে রজনী কান্ত সেনের ৮৯ বছর পর। যারা আল্লাহ ভক্ত, যারা স্রষ্টাকে ভালোবাসেন অথচ রজনী কান্ত সেনের গান শোনেন নাই- তাদের অনুরোধ করবো দয়া করে রজনী কান্ত সেনের গান শুধু একবার শুনুন, তা হলেই বুঝতে পারবেন রজনী কান্ত সেন এর গান কি।

অভিনেত্রী সূচিত্রা সেনের মা রজনী কান্ত সেনের চার ছেলের এক ছেলের মেয়ে। রজনী কান্ত সেনের বাবা গুরু প্রসাদ সেনও একজন কবি ছিলেন। তার লেখা বইয়ের নাম (১) পদ চিন্তা মনিমালা (কৃষ্ণ লিলা বিষয়) ২। সতি বিলাপ। গুরু প্রসাদ সেন বৃটিশ সরকারের একজন মুন্সেফ হিসেবে চাকরিতে যোগদান করে এডিশনাল জজ হয়ে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছিলেন।

রজনী কান্ত সেনও প্রথমে মুন্সেফের চাকরি নেন। কিন্তু চাকরি ভালো না লাগার জন্য অল্পদিনের মধ্যে চাকরি থেকে পদত্যাগ করে স্বাধীন ওকালতি পেশায় ফিরে আসেন।

রজনী কান্ত সেনের জীবনী পড়ে দেখলাম তিনি ম্যাট্রিক, আই.এ., বি.এ, পরীক্ষার আগের দিন বিকালে ফুটবল খেলতেন, রাতে দশটা পর্যন্ত তাস খেলতেন, পরীক্ষার দিন সকালে মাছ মারতে যেতেন, তারপরে গোসল করে ভাত খেয়ে পরীক্ষা দেবার জন্য যেতেন এবং তিনি এসব পরীক্ষায় ২য় শ্রেণী পেয়েছেন। তার শিক্ষকরা ও অনেক প্রবীণ লোকের নিষেধ উপেক্ষা করে তিনি এ কাজ করতেন। রজনী কান্ত সেনের বাড়ীর কাছে আমার বাড়ী আর সেজন্যই মনে হয় আমার এস.এস.সি; আই.এ; বি.এ; অনার্স; এম.এ কোন পরীক্ষার আগের রাতে পড়তে ইচ্ছা করে নাই, কোন পড়ালেখা করি নাই, রাত ৮টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছি।

www.pathagar.com

রজনী কান্ত সেনের বাবা গুরু প্রসাদ সেনের বড় ভাইয়ের নাম গোবিন্দ চন্দ্র সেন, তিনি পেশায় এডভোকেট ছিলেন। গুরু প্রসাদ সেন বড় ভাই গোবিন্দ চন্দ্র সেনকে খুব ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। রজনী কান্ত সেনের বাবা গুরু প্রসাদ সেন জীবনে কোনদিন বড় ভাই গোবিন্দ চন্দ্র সেনের সামনে চেয়ার, বেঞ্চ, টুল, খাট বা চৌকিতে আসন গ্রহণ করেন নাই, সব সময় তাঁর সামনে করজোড়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতেন নিজে একজন এডিশনাল জেলা জজ হওয়া সত্ত্বেও। (পড়ে দেখুন-বাংলা একাডেমী থেকে কবি আসাদ চৌধুরীর লেখা ও সম্পাদনায় প্রকাশিত কবি রজনী কান্ত সেন নামক বইয়ে রজনী কান্ত সেনের নিজের লেখা আত্মকথা)।

গোবিন্দ চন্দ্র সেনের দুই ছেলে তরুণ বয়সে এডভোকেট হিসেবে রাজশাহী জজ কোর্টে আইন পেশায় খুবই নাম করেন। কিন্তু বিয়ে করার আগেই গোবিন্দ চন্দ্র সেনের দুই এডভোকেট ছেলেই রাজশাহীতে একদিন আগে পরে কলেরা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। যার জন্য গোবিন্দ চন্দ্র সেনের কোন বংশ রেখে যেতে পারেন নাই।

১৯১০ সনের ১৩ই সেপ্টেম্বর ৪৫ বছর বয়সে কবি রজনী কান্ত সেন মৃত্যুবরণ করার সময়ে ৪ পুত্র এবং ৩ মেয়ে রেখে যান। রজনী কান্ত সেনের ছেলেদের নাম– (১) শচীন্দ্র নাথ সেন (২) জ্ঞানেন্দ্র নাথ সেন (৩) ক্ষিতিন্দ্র নাথ সেন (৪) শৈলেন্দ্র নাথ সেন। মেয়েদের নাম (১) শান্তি বালা সেন (২) প্রীতি বালা সেন (৩) তৃপ্তী বালা সেন।

সিরাজগঞ্জের অপর মহাপুরুষ-ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব। বাঙালী মুসলমানদের বাংলা, ইংরেজী, অংক, বিজ্ঞান শিক্ষা দেবার জন্য তিনি পবিত্র কোরআন ও হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে অনবরত লিখেছেন– এগুলো শিক্ষা করা ইসলাম ধর্ম বিরোধী নয়। মুসলিম মেয়েদের বিদ্যা শিক্ষা দেবার জন্য তিনি সংগ্রাম করেছেন। বাঙালী হিন্দু সমাজের কাছে যেমন রাজা রাম মোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তেমনি বাঙালী মুসলমানদের কাছে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর অবদান। ১৯০০ সনের আগে বদ্ধমূল ধারণা ছিল বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে, বাংলা, ইংরেজী, বিজ্ঞান পড়া হারাম, মুসলমানদের ভাষা আরবি ফার্সী। বহু সংগ্রাম করে এ চিন্তা থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বাঙালী মুসলমানদের মধ্য হতে এ ভ্রান্ত ধারণা অনেকটা দূর করেছেন। নারী শিক্ষা দেবার জন্য ইসমইল হোসেন সিরাজী যেসব লেখা লিখেছেন তা বেগম রোকেয়ার লেখার গুণগত মানের চাইতে অনেক বেশি ভালো বলে আমার মনে হয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের যে কোন পণ্ডিতের সাথে আমি তর্ক করতে রাজী আছি।

সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন সিরাজী কি ছিলেন দুটি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। প্রথম কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখিতভাবে স্বীকার করে গিয়েছেন– যদি ১৯২১ সনে সিরাজী সাহেব তার কবিতা পড়ে মানি অর্ডার করে যে ২টি টাকা পাঠিয়েছিলেন– তা না পাঠাতেন তবে তিনি (কাজী নজরুল) প্রতিষ্ঠিত কবি হতেন কিনা সন্দেহ। তিনি বলেছেন সিরাজী সাহেবের ২ টাকা পেয়ে উৎসাহিত অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতা লেখায় জোর দেই।

www.pathagar.com

সিরাজী সাহেব ২ টাকার মানি অর্ডার ফরমে লিখেছিলেন 'যদি সাধ্য থাকতো তবে সোনার মুকুট পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি গরীব মানুষ, খুব কষ্ট করে ২ টাকা পাঠালাম তোমার কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে।"

দ্বিতীয় : তিনি তুরস্কে গিয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধে অংশ নিতে সৈনিক হিসেবে। যুদ্ধ শেষে দেশে ফিরে আসবার সময় তুরস্কের সম্রাট সিরাজী সাহেবকে পুরস্কার হিসেবে একটি সোনার নির্মিত বড় ধরনের গুরগুরি হুক্কা দিতে নিয়েছিলেন– তখন জবাবে সিরাজী সাহেব সুলতানকে বলেন– কোন ভদ্রলোক, কোন মোসলমান হুক্কা বা তামাক খেতে পারেন না, এটা আমাকে উপহার দিতে চেয়ে আপনি অন্যায় করেছেন, এটা রেখে দিন।

সম্রাটের সামনে দাঁড়িয়ে এই ভাষায় কথা বলা, তার উপরে তিনি গরিব মানুষ, সোনার তৈরি গুরগুরি হুক্কা যদি ২ কেজি ওজন হয় তবে আজকের ১৩/১০/০৮ তারিখের টাকার দাম ৩৫ লাখ বিশ হাজার টাকা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী তা ঘৃণা ভরে প্রত্যাখান করেছেন। সিরাজগঞ্জ জেলার ইসমাইল হোসেন সিরাজী এমন লোক ছিলেন।

যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী গণিত শাস্ত্রের অসাধারণ বড় পণ্ডিত, গণিতের সাগর বলা হতো এক সময়ে তাকে। ১৯৬০ সনের আগে স্কুল কলেজের ছাত্র-শিক্ষকদের মুখে মুখে যাদব চন্দ্র চক্রবর্তীর নাম ছিল শ্রদ্ধা ও সমীহের সাথে সমস্ত ভারতবর্ষে, সেই যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলায়।

রাজনীতিতে ১৯২৪ সনে সারা ভারতের মধ্যে প্রথম প্রকাশ্যে জনসভা হয় সিরাজগঞ্জে। এর আগে সভা সমাবেশ করা নিষেধ ছিল। ঘরের মধ্যে সভার বক্তব্য কি তা জানিয়ে লিখিত অনুমোদন নিয়ে সভা করা যেতো। কিন্তু ১৯২৪ সনের আগে প্রকাশ্যে সভা করা যেতো না। সিরাজগঞ্জে প্রথম ১৯২৪ সনে প্রকাশ্যে লক্ষ লোকের জনসভা হয়েছে সারা ভারতের নেতারা সিরাজগঞ্জ আসেন। এটাও সিরাজগঞ্জবাসীর গৌরবের বিষয়। দ্রষ্টব্যঃ- আবুল মুনসুর আহমদের লেখা আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর বই। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর জন্ম ও বাড়ী সিরাজগঞ্জে, ১৯৪৯ সনে আওয়ামী লীগের জন্মের সময় থেকে ১৯৫৭ সন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৭ সন থেকে ১৯৬৬ সন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ। যতদিন জীবিত ছিলেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এদেশের সমস্ত প্রগতিশীল ও গণমুখী আন্দোলনের সাথে থেকেছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগিশ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলায়, তার বাড়ী সিরাজগঞ্জে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হয় মুজিবনগর সরকার দ্বারা পাঁচজন মাত্র মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী- ১। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২। তাজউদ্দিন আহমদ ৩। এম, মুনসুর আলী ৪। খন্দকার মোস্তাক আহমদ ৫। এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান। এই ৫ জনের এক জনের বাড়ী সিরাজগঞ্জে তিনি হলেন এম. মুনসুর আলী।

www.pathagar.com

লেখক আব্দুল্লাহ মতি শরফুদ্দিন, পারস্য প্রতিভার লেখক বরকত উল্লাহ, নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন, সৈয়দ শামসুল হক, কামাল লোহানী, সাইফুল ইসলাম, মকবুলা মঞ্জুর এর বাড়ী সিরাজগঞ্জ। এছাড়াও সিরাজগঞ্জের লোক আমার ৪ ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুসাহিত্যিক শহিদুল জহির, ইসহাক খান, ইখতিয়ার চৌধুরী এবং মোস্তাফিজ তালুকদার মন্নাফ। কবি মহাদেব সাহা, কবি সমুদ্র গুপ্ত, সিনেমা ব্যক্তিত্ব ফতেহ লোহানী, ইবনে মিজান পরলোকগত নায়ক জাফর ইকবাল, কণ্ঠ শিল্পী শাহনাজ রহমত উল্লাহ, নাট্য ব্যক্তিত্ব জাহিদ হাসান, তৌকির আহমেদ ও মান্নান হিরা, বাপ্পি লাহেড়ির মা-বাবার বাড়ি সিরাজগঞ্জ।

যমুনা, হুরা সাগর, ফুলজোর, করতোয়া সিরাজগঞ্জ জেলার নদী।

সিরাজগঞ্জের চলনবিল, জয় সাগরের দিঘী, এসব দেখবার মত, দেখলে নয়ন জুড়ায়।

সিরাজগঞ্জের আজ সবচেয়ে যেটা গর্বের সেটা হল মিল্ক ভিটার দুধ। শাহজাদপুর উপজেলায় গরুর বাথান আছে, বাথান হচ্ছে এক জায়গায় কয়েকশত গাভী বা গরু থাকে। এইসব বাথান থেকে দুধ আসে মিল্ক ভিটার বাঘাবাড়ীর কারখানায়। আজ মিল্ক ভিটা যদি প্রতিদিন এক লাখ পঞ্চাশ হাজার লিটার দুধ সংগ্রহ করে বাজারজাত করে থাকে তবে এই এক লাখ পঞ্চাশ হাজার লিটার দুধের সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া ও শাহজাদপুর থেকে সংগ্রহ করেন ১ লাখ ৪০ হাজার লিটার দুধ। বাকী দশ হাজার সারা বাংলাদেশ থেকে। কাজেই সারা বাংলাদেশের দুধের মত অতি প্রয়োজনীয় একটি খাবারের উৎপাদন হচ্ছে সিরাজগঞ্জ জেলায়।

দেখা যাচ্ছে সিরাজগঞ্জের নামের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গবন্ধু যমুনা ব্রিজ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, রজনী কান্ত সেন, সূচিত্রা সেন, যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী, সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম জনসভা ১৯২৪ সনে, আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিস, এম. মুনসুর আলী, মিল্ক ভিটার গাভীর দুধ এবং মহাত্মা মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী। ১৯২৮ সনে মহাত্মা গান্ধী সিরাজগঞ্জে জনসভা করতে আসেন, তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি, ভারতের জনসাধারণের জীবন উন্নয়নের কথা বলে বক্তৃতা করেন। মহাত্মা গান্ধীর ১৯২৮ সনের ঐ জনসভায় উপস্থিত মহিলারা তাদের শরীরের সমস্ত সোনার গহনা খুলে মহাত্মা গান্ধীকে দান করেছিলো, যার পরিমাণ ছিল ৫ সের আজকের ১৩/১০/২০০৮ তারিখে যার দাম ৮৮ লক্ষ টাকার বেশি। দ্রষ্টব্য "বাংলা ও বাঙালী প্রসঙ্গে মহাত্মাগান্ধী" নামক বই। যদিও এসব মহিলারা মনে হয় আমাদের মুসলিম সমাজের কেউ ছিলেন না, সবাই হিন্দু তবুও গর্বে আমার বুক ফুলে উঠে এসব মহিলারা সবাই আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার মানুষ।

১৩/১০/২০০৮

www.pathagar.com

মানুষ এক বয়সে যা করে গর্ব করে, পরবর্তী বয়সে গর্ব করা ঐ কাজের জন্য অনুশোচনা করে

মানুষের জীবনে একেক সময়ে চিন্তা চেতনার একেক ধরনের চিন্তা ভাবনা কাজ করে। আর মানুষের এসব চিন্তা ভাবনার বসবর্তী হয়ে সে এসব কাজ করে। কোন বাধা বিপত্তিকে সহজে মানতে চায় না। সেকস্‌পিয়ার মানুষের জীবনকে ৭টি স্তরে বিভক্ত করে তার লেখা নাটক এ্যাজ ইউ লাইক ইট এ জ্যাক নামক এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলায়েছেন– "সারা পৃথিবীটাই একটা রঙ্গমঞ্চ এবং পৃথিবীর সব নরনারীই এক একজন অভিনেতা। এই রঙ্গমঞ্চে তাদের প্রত্যেকেরই প্রবেশ এবং প্রস্থান আছে আপন আপন ভূমিকানুসারে। আবার একই মানুষ অনেক সময়ে অনেক ভূমিকা গ্রহণ করে। মানুষ জীবনে যেসব ভূমিকা গ্রহণ করে তার সাতটি ক্রমপর্যায় আছে।

প্রথম হচ্ছে তার শৈশব, শৈশব অবস্থায় সব মানুষই ধাত্রীর কোলে কান্নাকাটি করে। (২) তারপর শিক্ষা জীবনে তারা উজ্জ্বল হাসি-হাসি মুখ নিয়ে ধীরগতি শামুকের মত অনিচ্ছার সাথে শিক্ষালয়ে যায়। তারপরেই (৩) প্রেমিক গরম চুল্লির মত গরম দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে আর হা-হুতাশ করে, তার প্রিয়তমার লালিত ভ্রূণ ভঙ্গি নিয়ে কতশত করুণ কাব্য গাঁথা লেখে। (৪) তারপর শুরু হয় সৈনিক জীবন, এই সময়ে শুশ্রুপূর্ণ মুখে কথায় কথায় শপথ করে, সম্মানের লালসায় প্রায়ই ঈর্ষা কাতর হয়, খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় আর ঝগড়া শুরু করে দেয় যার তার সঙ্গে, সামান্য ক্ষণ ভঙ্গুর যশের জন্য কামানের গোলার সামনে বুক পেতে দেয়। (৫) তারপর সে অনেক জ্ঞানের কথা আর নীতি উপদেশ দেয়, (৬) এইভাবে সে অভিনয় করে তার জীবনের ষষ্ঠ স্তরের ভূমিকায়, (৭) সবশেষে শুরু হয় তার বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব, তার ঘটনাবহুল জীবনের সমস্ত বিস্ময়কর ইতিহাসবিলীন হয়ে যায় এক অর্থহীন বিস্মৃতির গর্তে। বিলুপ্ত হয়ে যায় তার সকল ইন্দ্রিয় শক্তি। চক্ষু দন্ত ও আস্বাদনশক্তি সবকিছু হারিয়ে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তার পরনের পোশাক ঢিলে হয়ে যায়, তার চোখের চশমা নাকের উপর এসে পড়ে। সারা পৃথিবীটাকে তার খুবই বড় বলে মনে হয়। তার গলার স্বরটা এই সময় বেশ গাঢ় হয়ে উঠলেও সে প্রায়ই শিশুর মত চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। এইভাবে কষ্টে তার জীবনের শেষ পর্যায়।" মানব জীবন সম্পর্কে সেকস্‌পিয়ার সাহেবের লেখা উপরে তুলেদিলাম এই জন্য যে আমার আপনার সবার জীবনেই এসব মনে হয় অতিক্রম করতে হয়েছে এবং হবে।

আমার বয়স যখন ২০ থেকে ৩০ বছর তখন চিন্তাভাবনার কি প্রভাব ফেলেছে কি করেছি তা ভেবে আজ ৫৪ বছর বয়সে বেশ অনুশোচনা হয়, অনেক দুঃখ করতে হয়, অনুতপ্ত হতে হয় ঐ সময়ের কিছুকিছু কাজের জন্য। অথচ ঐ বয়সে ঐ কাজ করে মনে হতো কত ভালো কাজ না করলাম। আজ ৩০ বছর পরে ৫৪ বছর বয়সে, ২০ বছর ২৫ বছর বয়সে করা ঐ সব কাজ করার জন্য আফসোস করতে হয়। ২০/২৫ বছর বয়সের

www.pathagar.com

ভুল কাজের একটি এখানে উল্লেখ করছি। সেটা হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় আমি সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র ছিলাম, দুই বছর ইংরেজি বিভাগে অনার্স পড়েছি, ঐ সময়ে বন্ধুত্ব হয় ইংরেজী বিভাগের ছাত্র আহমদ জাফর ইমাম স্বপনের সাথে। স্বপনের বাবা জনাব কাজী বদরুল আলম ১৯৭৫ সনে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইকোনোমিক এ্যাডভাইজার পরে অনেকদিন ডিপুটি গভর্ণর হিসেবে চাকরি করেন। আমি স্বপনদের বাসা মিন্টু রোডে নিয়মিত যাতায়াত করতাম, মাঝে মধ্যে স্বপনের সাথে রাত্রি যাপন করেছি, স্বপনও মাঝেমধ্যে সূর্যসেন হলে আমার রুমে থেকেছে। এইভাবে স্বপনের বাবা, মা, ওর ছোট ভাই সোহেল, বোন হেলেন সবাই আমাকে খুব ভালোবেসে ফেলে, স্বপনের মা বাবা বেঁচে থাকতে ১৯৯২ সন পর্যন্ত, আমি ওদের পরিবারের সদস্যের মতই হয়ে গিয়েছিলাম। স্বপনের বাবা কাজী বদরুল আলম বছরে ৩/৪ বার বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হয়ে সরকারি সফরে বিদেশ যেতেন। ঐ সময়ে সারা পৃথিবীর পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল আজকের থেকে ভিন্ন, মানুষের দয়া মায়া সৌজন্যবোধ ছিল অনেক বেশি। তাই কাজী বদরুল আলম সাহেব যখন বিদেশ থেকে দেশে আসতেন সাথে নিয়ে আসতেন– বিরাট গিফ্‌ট বক্স। এইসব গিফ্‌ট বক্সে থাকতো খুব উন্নত মানের কেক, চকলেট, বিস্কুট ইত্যাদি। এসব গিফ্‌ট বক্স উপহার দিতো, বৃটেন, জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, ইটালী, ফ্রান্স, ইত্যাদি দেশের অর্থ মন্ত্রণালয় অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে। কাজেই সব গিফ্‌ট বক্সে যেসব কেক, চকলেট থাকতো তার গুণগতমান অনেক উচু এবং পরিমাণেও অনেক বেশি। যেহেতু আমি কাজী বদরুল আলম বা স্বপনদের বাসায় একজন সদস্যের মত তাই আমাকে ওর বাবা মা এসব কেক চকলেটের ২/১ প্যাকেট স্বাভাবিকভাবেই দিতেন।

আমি তখন এসব কেক, চকলেট, বিস্কুট নিয়ে মিন্টু রোড থেকে পায়ে হেঁটে চলে যেতাম ধানমন্ডি আবাহনী ক্লাবের কাছের এক বাসায় এবং কাজী বদরুল আলম সাহেবের বাসা থেকে প্রাপ্ত ঐ কেক চকলেটগুলো ঐ বাসার ছোট ছেলেমেয়েদের দিতাম। তখন মনে হতো এদের বাবা এত বড় মানুষ ছিলেন, এরা শিশু এরা এতিম, এইসব উন্নতমানের কেক, চকলেট এদেরই প্রাপ্য অনেক দিন নিজে না খেয়ে বা অল্প খেয়ে ওদের দিয়েছি। তখন মনে করেছি না জানি কত মহৎ ভালো কাজ করলাম।

আজ ৫৪ বছর বয়সে অনুতপ্ত হই কি ভুল কাজ না করেছি এত কষ্ট করে মিন্টু রোড থেকে ধানমন্ডি আবাহনী ক্লাবের কাছে রিক্সা ভাড়ার অভাবে পায়ে হেঁটে গিয়ে ঐসব উন্নতমানের কেক, চকলেট ঐ ছেলেমেয়েদের খাইয়ে। যদি ঐসব কেক, চকলেটগুলো সূর্যসেন হলে নিয়ে এসে আমি যাদের সাথে সব সময় থাকতাম তাদের খাওয়াতাম তবে তারা কত না খুশি হতো। যাদের সাথে সূর্যসেন হলে খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো তারা হলেন আজকের ২৫/৯/০৮ শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান, আমিনুল ইসলাম ভূইয়া সচিব বৈদেশিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, স্বাস্থ্য সচিব জাফর আহমদ খান, এশিয়ান উন্নয়ণ ব্যাংকের উচ্চপদে কর্মরত জাহিদ হোসেন, সচিব ফিরোজ আহমদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপুটি গর্ভণর মুরশেদ কুলি খান প্রমুখ। এদের যদি ঐসব কেক, চকলেট খাওয়াতাম তবে আজ কত না এদের কাছ থেকে আদর সম্মান পেতাম।

www.pathagar.com

অবশ্য এখনও ওনারা আমাকে যথেষ্ট ভালোবাসেন সম্মান করেন। কিন্তু তবুও আমার বিশ্বাস কাজী বদরুল আলম সাহেবের বাসা থেকে পাওয়া কেক, চকলেটগুলো যদি উপরে বর্ণিত ব্যক্তিদের সূর্যসেন হলে এনে খাওয়াতাম তবে তারা আমার প্রতি আরও অনেক বেশি খুশি হতো, আমার ভাগ্য ঘুরে যেতে পারতো। কিন্তু আজ যদি আমি ধানমন্ডির ঐ ছেলেমেয়েদের বলি যে, আমি তোমাদের এক সময়ে বিদেশী উন্নত মানের কেক, চকলেট খাইয়েছি তারা কেউ তা স্বীকার করবে না বরং আমাকে মিথ্যাবাদী প্রতারক হিসেবে পুলিশ ডেকে গ্রেপ্তার করে দেবার চেষ্টা করবে, এবং ঐখানে যারা উপস্থিত থাকবে তারা সবাই ওদের পক্ষে স্বাক্ষী দেবে আমি একজন মিথ্যা বাদী বলে।

কিন্তু আমিই একমাত্র ভালো জানি। আমি কি করেছি। আর এসব করেছি বয়সের কারণে, ঐ সময়ে বুদ্ধি কম থাকে অথচ মনে হয় আমার বুদ্ধি অনেক বেশি।

২৫/১০/২০০৮

www.pathagar.com

সলিমুল্লাহ খান

সলিমুল্লাহ খান, কুমিল্লা বোর্ড ১৯৭৪ সনে এস.এস.সি ও ১৯৭৬ এইচ.এস.সিতে প্রথম স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসে ১৯৭৬ সনের জুলাই অথবা আগষ্ট মাসে, উঠে সূর্য সেন হলের কক্সবাজারের ছাত্র মুজিবর এর ৫০১ (ক) নং কক্ষে।

সেখানে মুজিবর এর সাথে বনিবনা না হওয়াতে সূর্য সেন হলের পাঁচ তলার করিডোরে কান্নাভেজারত অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলো। আমি তার মন খারাপ দেখে তার সাথে আগ বাড়িয়ে কথা বলি ও তার বিদ্যার প্রসারতা দেখে অনুরাগী হয়ে আমার ৫৪৮ নং সূর্য সেন হলের কক্ষে আশ্রয় দেই। এ সময়ে এই রুমে আমি খন্দকার আব্দুর রশিদ পুনু, ঝন্টু, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কানু ও সলিমুল্লাহ খান থাকি। ১৮ মাস সলিমুল্লাহ খান ৫৪৮ নং সূর্য সেন হলে আমার সাথে অবস্থান করে ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সনে। এরপরে আমি মহসিন হলের প্রভোষ্ট আতাউর রহমান খানের ছোট ভাই ওয়াদুদুর রহমানকে অনুরোধ করে মহসিন হলে সূর্য সেন হল থেকে বদলী করে সিট দেবার ব্যবস্থা করি।

অসাধারণ তুখোর ছাত্র সলিমুল্লাহ খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সিনিয়ার অধ্যাপকসহ অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি মন্তব্য করেছেন সলিমুল্লাহ খানের মত ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২১ সন থেকে আজ পর্যন্ত ২/১ জনের বেশি আসে নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে অনার্স ও এল.এল.এম ডিগ্রী নেবার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থা প্রশাসন ইনস্টিটিউট শিক্ষক হিসেবে ১৯৮০ দশকের বেশ কয়েক বছর চাকরি করে, এরপরে আমেরিকার নিউইয়ার্ক শহরের নাম করা ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী প্রফেসর হিসেবে সুইডেনের স্টেট ইউনিভার্সিটি এবং লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে অর্থনীতি শাস্ত্রের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে চাকরি করে আবার বাংলাদেশে ফিরে এসে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনির্ভাসিটি অব অল্টারনেট ডেভলপমেন্টে অধ্যাপক হিসেবে, ছাত্র পড়িয়ে এখন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত। তবে সলিমুল্লাহ এসব পরিচয় দিতে খুব অস্বস্তি বোধ করে, সে নিজেকে একজন লেখক বলে পরিচয় দিতে স্বস্তিবোধ করে।

সলিমুল্লাহর মত ভালো ছাত্র আমি আমার এই ৫৪ বছর বয়সের জীবনে দেখি নাই। ১৮ মাস সলিমুল্লাহ ও আমি সূর্য সেন হলের একরুমে থেকেছি, সেও আমাকে খুব ভালো জানে আমি কেমন মানুষ, আমিও তাকে খুব ভালো জানি সে কেমন মানুষ। সলি-মুল্লাহকে আমি খুব ভালোবাসি সেও আমাকে সম্মান ও সমীহ করে। এরপরেও তারমতো এত উচ্চস্তরের একজন পণ্ডিত ও লেখক আমার মতো নগন্য একজন লেখকের লেখা পড়েছে এ সম্পর্কে মন্তব্য লিখেছে এটা আমার জন্য বিরাট বিষয়, সে অনেক কারণ দেখিয়ে এ থেকে এড়িয়ে যেতে পারতো। তা না করে সে যে একজন ভালো মানুষ তার প্রমাণ রেখেছে। গত ৩১/১০/২০০৮ তারিখ শুক্রবার সলিমুল্লাহ খান যখন আমার বাসস্থানে তার লেখা মন্তব্যটি দিতে আসে তখন আমি তাকে বলি তুমি মনে

www.pathagar.com

হয় আমার লেখা পড় নাই, এমনি ভদ্রতার জন্য কিছু লেখা দরকার তাই লিখে নিয়ে এসেছো, তখন সে আমার দিকে আমার দেওয়া বইয়ের প্রুফ কপিটি এগিয়ে দেয় এবং বলে "আমি এ বই সব পড়েছি, আপনি কোন পাতায় কোন অধ্যায়ে কি আছে আমাকে প্রশ্ন করেন। আপনার বাংলা লেখার ধরন খুব সুন্দর সহজ ও প্রাণস্পর্শী, যা পাঠককে টেনে রাখে।"

সময় দিলেন না তাই বেশি লিখতে পারলাম না। বই বের হোক এ বই নিয়ে বড় রিভিউ লিখবো।"

আমি তার একথায় খুব লজ্জা পেলাম ও খুশি হলাম। সলিমুল্লাহ খানের এ মন্তব্য আমার জীবনের এক বিরাট প্রাপ্য।

৪/৫ বছর আগে বাংলাদেশ টেলিভিশনের এক আলোচনায় সলিমুল্লাহ খানের একটি বক্তব্য আমার জীবনের মোড় বদলিয়ে দিয়েছে। তিন-চারশত বছর আগে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি কৃষি উৎপাদনের দেশ ছিল বাংলাদেশ, খাদ্যে উদ্বৃত্ত, সারা ভারতে খাদ্য যোগাতো বাংলাদেশ কেন এখন নাই, কি করলে আবার তা হবে সলিমুল্লাহ খানের টেলিভিশনের সেই বক্তব্যে তা জানতে পেরে আমি নতুনভাবে উজ্জীবিত হই এবং সেটা যাতে বাস্তবে বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য চেষ্টায় আছি।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিটিভিতে প্রদত্ত সলিমুল্লাহ খানের ঐ বক্তব্য ও মন্তব্যের জন্যই বাংলাদেশের চেহারা বদলে যাবে, বাংলাদেশ আবার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে খাদ্য রপ্তানী করে কোটি কোটি ডলার-পাউন্ড আয় করবে। দেখা যাক কি হয়।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
৩১/১০/২০০৮

www.pathagar.com

অসীমের আহ্বান ঃ ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা

সলিমুল্লাহ খান

‘১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা’ একটি অসাধারণ বই এবং ইহার লেখক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) একজন অসাধারণ মানুষ। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ইংরেজি ১৯৭৬ সনে। তিনি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপকারটি করিয়াছিলেন, আহমদ ছফার সহিত পরিচয় করাইয়া, না করাইলে আমার জীবনের গতি সম্পূর্ণ অন্য রকম হইতে পারিতো। তাই বাবলু ভাইকে আমি অসাধারণ মানুষ বলিয়া মনে রাখিয়াছি।

বাবলু ভাই আমার আরও অনেক উপকার করিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্য সেন হলের একটি কক্ষে তিনি তখন আরও কয়েকজনা ছাত্রের সহিত শরিকানায় থাকিতেন। আমাকে তিনি নির্দ্বিধায় তাঁহার নিজ বিছানাটি ছাড়িয়া দিয়া নিজে মেঝেতে শয়ন করিতেন। ইহা তিনটিখানি কথা ছিল না। সেই সময় আরোও একখানি কথা তাঁহার মুখে ছুটিত। সেই কথার নাম এম. এন রায় ওরফে মানবেন্দ্রনাথ রায়। আহমদ ছফা মহাশয়ও তখন রায়ের অনুরাগী। তিনি একজন প্রতিভাবান ছাত্রের কাঁধে সওয়ার হইয়া রায়ের “ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন” নামক বই তর্জমা করাইতেছিলেন। অনুবাদ কর্তা বইয়ের নাম রাখেন যতদূর মনে পড়ে “পরিবর্তনের মুখে ভারত”। অনেকদিন পরে বাবলু ভাই তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকার নাম রাখেন “পরিবর্তন” এই মিলটা নেহায়েত কাকতালীয় নাও হইতে পারে। বিচিত্র মানুষের সহিত তাঁহার পরিচয়। আমাকে তাঁহার বইয়ের প্রুফ পড়িতে দিয়া তিনি সম্মান জানাইয়াছেন তাঁহারই আপন বিনয়কে। ইহাও আমার পুরস্কার।

এখন বলি এই বইটি কেন অসাধারণ। প্রয়াত সাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সম্পর্কে এখনও জীবিত লেখক সৈয়দ শামসুল হকের একটি কথার প্রতিবাদ করিয়া আবু মোহাম্মদ খান যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে সত্য প্রকাশের অসংকোচ আছে। তাই ইলিয়াস তাঁহাকে জানাইয়াছিলেন– “ভাই বাবলু তুমি ছাড়া এরকম একটি লেখা লেখবার মত আর কোন লোক ঢাকা শহরে আছে বলে আমার মনে হয় না।” আমিও বলি ইলিয়াস সত্যবাদী। তিনি যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার উদ্ধৃতি মূল্য এই বই। বাবলু খানের সহিত তুলনা দেওয়ার মত একজন লেখক আমিও খুঁজিয়া পাইয়াছি প্রখ্যাত জার্মান সমালোচক শহীদ বাল্টার বেনিয়ামিনের মধ্যে। তাঁহার “দাস পাসাগেনবের্কে” বা “দি আর্কেড্‌স্ প্রজেক্ট” এই রকম বই। “১৯৭১ ও অনেক অজানা কথাকে আবু মোহাম্মদ খানের আত্মজীবনী বলা যাইত। কিন্তু ইহা তাঁহার উপাদান সমষ্টি মাত্র। আত্মজীবনী তিনি হয়তো লিখিবেন কোন একদিন। ইহা তাহার উপক্রমনিকা স্বরূপ।”

এই বই পড়িয়া আমি আনন্দ পাইয়াছি। আশা করি আপনিও পাইবেন। কারণ বাবলু ভাইয়ের রাজনীতি আমি খরিদ করি নাই। তবুও ইহার গুন আমি গ্রহণ করিতে পারিয়াছি।

৩১/১০/২০০৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা
২য় মুদ্রণে সংযোজিত নতুন লেখা
এপ্রিল, ২০১০

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এপ্রিল ২০১০ সনে দ্বিতীয় মুদ্রণে সংযোজিত নতুন লেখা

১. আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন : আব্দুস সোবাহান গোলাপকে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাইভেট সেক্রেটারি বা অন্য কোন পদে নিয়োগ না করার জন্য আবেদন ৩৯৩

২. ২০১৪ সনে সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিজয়ের জন্য যা করা একান্ত প্রয়োজন ৩৯৬

৩. প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন ৪০০

৪. শেখ হাসিনার প্রতি আবেদন রমনা (রেস-কোর্স) ময়দান ধ্বংস না করার জন্য আবেদন ৪০১

৫. সিদ্ধার্থ শংকর রায় ৪০৫

৬. জেনারেল লছমন সিং ৪০৬

৭. জেনারেল বি. জোগিন্দার সিং ৪০৭

৮. জেনারেল পি. এন. কাতপালিয়া ৪০৮

৯. দেবী প্রসাদ মিশ্র ৪০৯

১০. সুশীল কুমার রায় ৪১০

১১. কুনাল চট্টপাধ্যায় ৪১৩

১২. ১৯৭১ এবং অজানা বাবলু কোষ : সাদাত উল্লাহ খান ৪১৫

১৩. জামিলুর রেজা চৌধুরী ৪১৮

১৪. ১৯৭৪ সনে গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে মেজর ডালিমের যা ঘটেছিল ৪১৯

১৫. জনাব খালেদ শাসম, সাবেক সিএসপি ৪২৪

www.pathagar.com

১৬. ভারত ভ্রমণ ০৭.০২.২০০৯ থেকে ২৮.০২.২০০৯ কলকাতা
দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কলকাতা,
নবদ্বীপ, কলকাতা, ঢাকা ৪২৫
১৭. ১৯৭৭ সন : প্রসঙ্গ আবুল ফজল উইল ডুরান্ড ও আহমদ ছফা ৪৫৪
১৮. ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পরে আওয়ামী লীগের
জন্মকথা : ১৯৮১ পর্যন্ত। ৪৫৬
১৯. দ্বিতীয় মুদ্রণে চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র
প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা ৪৬২
২০. এ. কে. খন্দকারের প্রতি আবেদন : মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে
ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের লিস্ট করা বন্ধ করুন ৪৬৮
২১. অর্থ মন্ত্রী সাইফুর রহমান ৪৭১
২২. কোথায় গেল বাংলার সেই আষাঢ়, শ্রাবণ,
ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাস? ৪৭৬
২৩. গণতন্ত্রের দুই মারাত্মক ব্যাধি : ২১ বছর বয়সের নীচে
এবং ক্ষুধায় কাতর গরীব মানুষের ভোটার লিস্টে নাম ৪৭৮
২৪. সে আমার আদরের ছোট বোন খাদিজা খানম তৌফা ৪৮০
২৫. ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা : প্রফেসর আনিসুজ্জামান ৪৮৫
২৬. ২০১৫ সনে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি ৪৯২
২৭. বাংলাদেশের বিবেকবান মুসলিম ভাই-বোনদের
প্রতি সবিনয় আবেদন : দয়া করে গোমাংস খাওয়া
থেকে বিরত থাকুন ৪৯৪
২৮. কবি নির্মলেন্দু গুণের পৃথিবী জোড়া গান,
কবিতার বই এবং ত্রিশালের আকাশ। ৪৯৮
২৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে-বাইরে এবং শরৎচন্দ্র চট্টপধ্যায়ের
পথের দাবী উপন্যাসে এম.এন.রায়। ৫০১

www.pathagar.com

৩০. রমনাকালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী ৫০৯
৩১. আধুনিক শক্তিশালী ভারত ও বাংলা গড়ার চার বিদেশী কন্যা : মার্গারেট নোবল, সিলভিয়াও, এলেন এবং এ্যানি বেসান্তের কথা ৫১৮
৩২. জামায়াতে ইসলাম এবং তাবলীগ জামায়াতের আমীরদের থেকে দূরে থাকুন– ৫২২
৩৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র রাজনীতি কমানোর উপায় ৫২৬
৩৪. যশোবন্ত সিংহ, জিন্নাহ ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা ১৯১৬ সনের হিন্দু-মুসলিম লখনৌ প্যাক্ট প্রেক্ষিত ২০১০, পাপমোচনের জন্য বাংলাদেশে হিন্দুদের ১৫ ভারতে মুসলমানদের ৩০ ভাগ সমস্ত চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণ করার দাবী। ৫২৮
৩৫. সরদার আবদুস সাত্তার, মহানগর দায়রা জজ বশিরউল্লাহ এবং মইনুস সুলতান ৫৩৪
৩৬. ১৯৭১ সনে আওয়ামীলীগের এমএনএ ও এম পি এ'রা নন, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং আজকের কিছু অপ্রিয় সত্য কথা ৫৪৩
৩৭. আওয়ামীলীগে ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক আট নেতা ও আজকের অপ্রিয় সত্য কথা ৫৪৯
৩৮. প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ সেপারেশন অব পাওয়ার: বাংলাদেশে সভ্য, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের জন্য যা জরুরী প্রয়োজন ৫৫৩
৩৯.তাজউদ্দিন আহমদ, ১৯৭৪ সনের আওয়ামীলীগের কাউন্সিল : প্রেক্ষিত ২০১০ এবং ২০১৪ সনের সংসদ নির্বাচন ৫৫৮
৪০. আল্লাহর শত্রু সীমান্ত রক্ষী ধ্বংস হোক নিপাত যাক ৫৬২
৪১. আবুল হাশিম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধ ও দালাল আইন ৫৬৬
৪২. যে কারণে মন্দিরে যেতাম। ৫৭১
৪৩. যে কারণে নামাজ পড়ি। ৫৭২
৪৪. দ্বিতীয় মুদ্রণে আমার শেষ কথা ৫৭৩

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মুদ্রণে আমার কিছু কথা

২০০৮ সনের অক্টোবর মাসে– '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই বের হওয়ার সময় ভূমিকাতে কৈফিয়ত ও ঘোষণাতে লিখেছি যে, বইতে অনেক বানান ও প্রুফ ভুল রয়ে গেল, এর বদলা নিবো' কলকাতা থেকে দ্বিতীয় মুদ্রণ নির্ভুলভাবে বের করে। আরও লিখেছি যে, আল্লাহ আমার এ সাধ পূরণ করবেন, কেননা আমার এ জীবনে যা চেয়েছি তার প্রায় সবই আল্লাহ পূরণ করেছেন।

আর হ্যাঁ, আল্লাহ আমাকে এক বছরের মধ্যে সামর্থ্য দিয়েছেন, গত বছরের চেয়ে আমি অর্থনৈতিকভাবে অনেক বেশি সচ্ছল হয়েছি, ইচ্ছা করলেই আমি এখন কলকাতা থেকে '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই ছাপতে পারি। তবে কলকাতা নয় ঢাকা থেকেই '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' দ্বিতীয় মুদ্রণ ৮ ফর্মা প্রায় ২০০ পৃষ্ঠা নতুন লেখা সংযোজনসহ প্রকাশ করলাম অনেক কম ভুল বানান ও কম প্রুফ ভুলসহ।

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বই যাদের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তাদের প্রথম আমার নানা এমদাদুল হক তালুকদার, তার সন্তান আমার বড় মামা আবদুল বাকী তালুকদার, বর্তমানে নারায়ণগঞ্জে থাকেন, সেখান থেকে ২৩/১২/২০০৯ তারিখে আমার বই পড়ে একটি চিঠি পাঠান যা নিচে মুদ্রণ করা হলো।

এ চিঠির সাথে বাকী মামা আমার বইয়ের বানান ও প্রুফ ভুলের বিরাট একটি তালিকাও পাঠান, যা পড়ে আমি লজ্জায় হতবিহ্বল হয়ে যাই, এই ভেবে যে এত বিশাল প্রুফ ও বানান ভুল নিয়ে '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই প্রথম মুদ্রণে বের হয়েছে। অথচ প্রথম মুদ্রণে নির্ভুল করে বই প্রকাশের জন্য বাংলা বাজার থেকে সবচেয়ে নামী এবং সবচেয়ে দামী প্রুফ রিডার নিয়োগ দিয়েছিলাম বহু হাজার টাকার বিনিময়ে।

আবার আনন্দিত হই এইজন্যে যে আমার আপন মামা বাংলা ভাষার এমন একজন বিদ্যান ও পণ্ডিত মানুষ সে কথা ভেবে। দ্বিতীয় মুদ্রণে বাকী মামার ধরে দেওয়া বিরাট সংখ্যার ভুল বানান ও ভুল প্রুফ মুক্ত হয়ে '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই বের হচ্ছে। ২৪/১২/২০০৯ সন্ধ্যায় মামার চিঠি ও ভুল বানানের তালিকা পাই। রাতে সব মিলিয়ে দেখি, ২৫/১২/২০০৯ শুক্রবারে বন্ধ। ২৬/১২/২০০৯ তারিখ শনিবার ৩৪১ নম্বর কাটাবনের এবিসি কম্পিউটারে স্নেহ ও প্রিয়ভাজন রিয়াজের কম্পিউটারে রিয়াজের সাহায্যে এসব ভুল বানান ঠিক করলাম। এরজন্য আমি বাকী মামা ও রিয়াজের কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আমি ঢাকা শহরে ১৯৮৭ সন থেকে অনেক কম্পিউটারে টাইপ ও মুদ্রণ কাজ করাচ্ছি, কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যের অন্যতম স্থপতি প্রমথ চৌধুরী ও বঙ্গীয় শব্দকোষের লেখক হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের বাপ-দাদার বাড়ির নিকট প্রতিবেশি ঈশ্বরদীর সন্তান এবিসি কম্পিউটার হাউজের রিয়াজের মতো এমন দক্ষতা ও দ্রুততার সাথে বাংলা কম্পিউটার চালাবার মতো লোক খুব কম দেখেছি। আর বাকী মামার মতো বাংলা শব্দের বানান ও বাক্য গঠন সম্পর্কে এমন মনোযোগী সুদক্ষ পাঠকও খুব

www.pathagar.com

বিরল।এর পরেও একেবারে ফাইনাল বা প্রিন্ট হওয়ার আগে প্রুফ দেখিয়েছি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে মার্স্টাসের ছাত্র আমাদের এক স্নেহভাজন আত্মীয় আবু সুফিয়ান চৌধুরীকে, সেও কিছু বানান ও কিছু প্রুফ দেখে দিয়েছে এবং তা সংশোধন করা হয়েছে। যার জন্য এই দুইজনের বদৌলতে '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই অনেক কম ভুল বানানে বের হচ্ছে।

বড় মামা আবদুল বাকী তালুকদারের চিঠি

২৩/১২/২০০৯ বুধবার, নারায়ণগঞ্জ

প্রীতি ও স্নেহাশীর্বাদ দিয়েই তোমায় লিখছি। সাথে সাথে তোমার সর্বাঙ্গীন মঙ্গলও কামনা করছি। তোমার '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' দীর্ঘদিন ধরে এবং কিঞ্চিৎ মনোযোগের সাথেই পড়েছি। পড়ে এ থেকে ত্রুটিবিচ্যুতি উদ্ধার, চিহ্নিতকরণ, এবং সংশোধন করার ক্ষীণ প্রয়াসও চালিয়েছি, জানিনা কতটুকু স্বার্থক হতে পেরেছি। তবে মন থেকে সন্দেহ নির্মুল করতে পারিনি। অর্থাৎ আমার প্রচেষ্টার পরেও অনেক বিচ্যুতি রয়ে গেল বলে আমি মনে করছি। তুমি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার প্রস্তুতি নিচ্ছ– জেনে আমি যুগোপৎ আনন্দিত আর আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি। বইটিতে বানান, বাক্যের গঠন, যতিচিহ্নের ব্যবহার, বাক্যের মধ্যে ক্রিয়াপদ, অব্যয়পদ, বিশেষণের অগোছালো ও কিছু শব্দে অপপ্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রে আমাকে ভাবিয়ে মেরেছে। এগুলোকে যথার্থ না করে দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দেওয়া কোনোক্রমে সমীচীন বলে আমি মনে করি না। আমি যে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো চিহ্নিত করেছি এবং তাদের যে দীর্ঘ তালিকাটি তৈরি করেছি– সেগুলো সংশোধন না করে নতুন কোনো পাণ্ডুলিপি কম্পিউটারের স্ক্রীনে উঠুক এমন পুনজন্মকে আমি কোনো নৈতিকতায় সায় দিতে পারি না। আমি বিচ্যুতিগুলো বইটিতে চিহ্নিত করেছি এবং তাদের যে দীর্ঘ তালিকা তৈরি করেছি সেগুলো সংশোধন করেই যেন পাণ্ডুলিপি কম্পিউটারাইজড করা হয়। অপরিশোধিত পাণ্ডুলিপি যদি কম্পিউটারাইজড হয়ে আমার হাতে ফিরে আসে– তবে সেটা আমার জন্য হবে ভীষণ বেদনাদায়ক আর মর্মান্তিক। আমি আশা করি সেরকম কিছু ঘটবে না। তারপরেও কিছু কিছু বিচ্যুতি থেকে যাবে, যেগুলো আমার পক্ষে একা সংশোধন করা সম্ভব নয়। যে ভুলত্রুটিগুলোকে আমি লাল আর কাল কালির খাড়া টানে বইতে চিহ্নিত করে রেখেছি, সেগুলো তুমি একা অথবা আমার সাহায্য নিয়ে যৌথভাবে নির্ভুল করা যেতে পারে। সেগুলো লেখক সংশোধন করে না দিলে প্রুফ রিডারের একক সংশোধন যথার্থ নাও হতে পারে। বিরাট বইয়ের সব ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষুদ্র পত্রে লিখে শেষ করা যাবে না বলে আজকের জন্যে এখানেই শেষ করছি।

তোমার শুভ কামনায়
একান্তই তোমার বড় মামা
আবদুল বাকী তালুকদার

www.pathagar.com

বড় মামা আবদুল বাকী তালুকদার ১৯৬৮ সনে এসএসসি পাস করে ১৯৬৮ সন থেকে ১৯৭৩ সন পর্যন্ত পাবনা এডওয়ার্ড গভর্নমেন্ট কলেজে পাঁচ বছর পড়ালেখা করেছেন এবং বি হোস্টেলের ৪ নম্বর কক্ষে আবাসিক ছাত্র হিসেবে থেকেছেন। ফুটবল যাদুকর সামাদের মেয়ের মেয়ে তোয়বা খাতুন সীমাকে বিয়ে করেছেন।

গত ২৪/০৭/২০০৯ তারিখে সুলেখক সাদাত উল্লাহ্ খান দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য পাতায় '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইয়ের একটি বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগময়, জ্ঞানগর্ভ ও ভালোবাসায় পরিপূর্ণ লেখা লিখেছে, যা এ বইয়ে মুদ্রণ করা হলো। ঐ লেখার এক জায়গায় সাদাত উল্লাহ্ খান লিখেছেন 'বাবলু খান সাহেব তার লেখা বিন্যাসে কোনো সুস্পষ্ট ধারাক্রম অনুসরণ করেন নাই। তাতে অনেক সময় পাঠক খানিকটা হোঁচট খাবেন, এটা একটা অগোছালোপনার বৈশিষ্ট্য'। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য হচ্ছে, লেখকের নিজের লেখা বাছাই করা খুব কঠিন কাজ। কোন লেখা ভালো, কোন লেখা খারাপ তা লেখক নিজে ঠিক করতে সাধারণত পারেন না, এটা পাঠকরা ঠিক করেন, কোন লেখা ভালো, কোন লেখা খারাপ বা হালকা-পাতলা। তাই লেখা বইতে সাজানো বা বিন্যাস করা খুবই কঠিন কাজ বলে আমার কাছে মনে হয়। বহু বড় বা প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধেয় লেখকও তাদের লেখা সম্পর্কে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠিত সত্য কথা থাকা সত্ত্বেও সাদাত উল্লাহ্ খান যেহেতু আমাকে এতো সম্মান দেয় ও ভালোবাসে সেজন্য সাদাতউল্লাহ খানের বক্তব্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমি দ্বিতীয় মুদ্রণে সংযোজিত নতুন লেখাগুলো লেখার গুণাগুণ দিয়ে নয়, তারিখ হিসেবে সাজালাম, যে লেখা আগে লেখা হয়েছে সেটা আগে, যে লেখা পরে লেখা হয়েছে সেটা পরে। ফলে লেখা বাছাই করার কঠিন কাজ থেকে রক্ষা পেলাম ও সাদাত উল্লাহ খানের বক্তব্যের প্রতি সম্মান জানালাম।

এখানে আমার লেখা প্রসঙ্গে আমি একটি কথা বলতে চাই তা হচ্ছে– আমি আমার কোনো লেখা লিখবার সময়ে চিন্তা ভাবনা করে ধীরে ধীরে লিখতে পারি না, আমার লেখার যখন তাড়না আসে তখন আমি কাগজ-কলম নিয়ে বসি এবং খুব দ্রুত লিখে যাই, যখন লিখি তখন আমি কি লিখি আমি তা জানিনা। লেখা শেষ হওয়ার পরে পড়ে দেখি একটি লেখা হয়েছে। '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইয়ে কয়েকটি লেখা আছে যা আমি আধো ঘুমের মধ্যে লিখেছি। কাজেই আমি আমার লেখায় যদি সত্য কথা লিখি তবে এ প্রশংসা তার, যিনি আমার ভিতর থেকে আমাকে দিয়ে সত্য লেখান। আর যদি মিথ্যা কথা লিখে থাকি এর জন্য দায়ী যিনি আমার ভিতর থেকে আমাকে দিয়ে মিথ্যা লেখান। যখন লেখা লিখবার ভিতর থেকে তাড়না আসে না, তখন যদি কোন কিছু লিখবার চেষ্টা করি কলম চলে না, বানান ভুল হয়, বাক্য গঠন হয় না, সব এলোমেলো হয়ে যায়, দুই এক লাইনও লিখতে পারি না। তাই মনে হয় আজ পর্যন্ত আমার কোনো লেখার বিরুদ্ধে কেউ মিথ্যা লিখেছি বলে মৌখিক বা লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ আনেননি।

মহাত্মা গান্ধীর কথায় আমার আস্থা অনেক বেশি, 'সত্যই ঈশ্বর, ঈশ্বরই সত্য, সত্যেই মানুষের ভালোভাবে শান্তিতে বেঁচে থাকার একমাত্র পথ'।

www.pathagar.com

প্রথম মুদ্রণে ছবিসহ বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৯২, দ্বিতীয় মুদ্রণে নতুন লেখা সংযোজন করার ফলে মোট ৫৯৩ পৃষ্ঠা হচ্ছে, কিন্তু দাম আগের মতো পাঁচশত টাকাই রাখা হলো।

প্রথম মুদ্রণের ছবি থেকে ১৪/১৫ টি ছবি বাদ দিয়ে নতুন ১৪/১৫টি ছবি ছাপা হলো।

বইটিতে যদি কোনো ভুলত্রুটি ও মিথ্যা তথ্য বা বক্তব্য থাকে দয়া করে চিঠি দিয়ে তা জানালে খুব খুশি হবো।

আমি পাঠক-পাঠিকাদের আন্তরিক দোয়া আশির্বাদ চাই, আমার জন্যে আপনারা দোয়া করবেন, আমি যেন সত্য ও ন্যায় কথা যতদিন বেঁচে থাকি ততদিন লিখে যেতে পারি, আমি যেন কোনো মিথ্যা কথা না লিখি।

বিনয়াবনত চিত্তে
আবু মুহাম্মদ খান (বাবলু)
১লা জানুয়ারি ২০১০, শুক্রবার
এ/১২ প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

www.pathagar.com

তারিখ : ২১.১১.২০০৮ইং

বরাবর,
শ্রদ্ধেয় শেখ হাসিনা আপা
সাবেক প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ও
সভানেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
সুধাসদন, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

বিষয় : আব্দুস সোবাহান গোলাপকে জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অন্য কোন পদে নিয়োগ না করার জন্য আবেদন।

মাননীয় নেত্রী,

সবিনয় বিনেদন এই যে, আব্দুস সোবাহান গোলাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের একজন আবাসিক ছাত্র ছিল এবং ঐ হলের ১৯৮১ সনের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে একবার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল, সহ-সভাপতি হয়েছিল আতাউর রহমান ডিউক। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের একজন আবাসিক ছাত্র ছিলাম, গোলাপের চেয়ে আমি দুই বছরের সিনিয়র ছাত্র।

ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আমি একমাত্র ছাত্রলীগ নেতা যে গোলাপকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন প্রদান করি। ঐ সময়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন জনাব ওবায়দুল কাদের। জনাব ওবায়দুল কাদেরসহ হলের সমস্ত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর পছন্দের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী ছিল নোয়াখালীর হেলাল। কিন্তু আমি ছিলাম একমাত্র ছাত্রলীগ নেতা যে গোলাপের পক্ষে। কারণ–

১. গোলাপ একদিন হলে আমাকে দুই টাকার বিনিময়ে একবার ভাত খাইয়েছিল।
২. হেলাল আমাকে খুব বেশী পাত্তা দিত না।
৩. গোলাপ একদিন সূর্যসেন হলে ৫৬৬ নং আমার কক্ষে এসে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরে অনুরোধ করে, আমি যেন তাকে সূর্যসেন হল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদকের পদে মনোনয়ন নিয়ে দিই। যতক্ষণ আমি রাজী না হই ততক্ষণ সে আমার পা জোর করে ধরে থাকে।

যাই হোক, আমি রাজী হই এই মনে করে যে, "একদিন যার নুন খাবে, চিরদিন তার গুণ গাবে", যেহেতু গোলাপের দুই টাকায় একবেলা ভাত খেয়েছি, তাই ওর গুণ গাওয়া উচিত। আমি গোলাপকে সূর্যসেন হলে সমস্ত ছাত্রলীগ নেতাকর্মীর মতামতের বিপক্ষে একা সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন প্রদান করি। এটা সম্ভব হয়েছিল এই জন্য যে–

www.pathagar.com

১. যেহেতু আমি শহীদ শেখ কামাল ভাইয়ের একজন স্নেহভাজন ও তার বিশ্বস্ত সাথী ছিলাম, তার গাড়ীতে আমি চড়তাম, তার সাথে ঘুরে বেড়াতাম, তিনি আমাকে খুবই ভালবাসতেন, সে-জন্য।

২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও তাজউদ্দিন সাহেব আমাকে খুব স্নেহ করতেন, তার জন্য।

৩. একজন সৎ ও ভাল মানুষ হিসেবে সূর্যসেন হলের সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে আমার একটা ইমেজ ছিল, সে-জন্য।

উল্লেখিত তিনটি কারণে সবার বিরোধিতা সত্ত্বেও আমি একাই গোলাপকে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দিতে সক্ষম হই এবং আমি যেহেতু ওর পক্ষে কাজ করি, তাই অনেক সাধারণ ছাত্র গোলাপকে ভোট প্রদান করে এবং ছাত্রলীগের প্যানেলের সাথে ভোটে সাধারণ সম্পাদক পদে পাশ করে।

এর পরের ঘটনা খুবই দুঃখজনক, সাধারণ সম্পাদক হয়ে সে নিজে ও তার সাঙ্গপাঙ্গ দ্বারা কাঁটাবন এলাকায় ১৯৮১ সনে নিয়মিত হাইজ্যাক, ডাকাতি ও চাঁদাবাজি শুরু করে। অগণিত গুরুতর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আসতে থাকে। এর মধ্যে এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় এসে পড়েন, মার্শাল 'ল হয়। গোলাপ হল ছেড়ে চলে যায়। আমিও তার আগেই হল ছাড়ি। এই গোলাপের জন্য আমার খুব গালি ও দুঃখজনক কথা শুনতে হয়। এর পরে আজ থেকে তিন বছর আগে পত্রিকায় দেখলাম গোলাপ আমেরিকায় এবং আপনার সাথে তার ভাল সম্পর্ক। বিষয়টি তখনই আপনাকে আমার জানানো উচিত ছিল। কিন্তু সৎ জীবনের সৎ চেতনা থেকে কিছুটা পিছিয়ে এসেছি আমি, আমি আর আগের মত অত সত্য কথা বলি না সব সময়, প্রায়ই চুপ থাকি। যার জন্য গোলাপের কথা আপনাকে কিছু বলি নাই।

কিন্তু গোলাপের কথা আপনাকে না জানানোর জন্য, সত্য থেকে দূরে থাকার জন্য এবং ১৯৮১ সনে গোলাপের মত একজন নিকৃষ্ট মানুষকে সূর্যসেন হল ছাত্র সংসদে নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনয়ন দেয়ার জন্য আল্লাহ আমাকে গত ২০.১১.২০০৮ ইং তারিখে শাস্তি দিয়েছেন। ২০.১১.২০০৮ইং তারিখে সুধাসদনের নীচতলায় আমি যখন আপনার সাথে কথা বলি, তখন ঐ গোলাপ আপনার কাছে আমাকে পাগল বলে পরিচয় দেয় এবং আজেবাজে কথা বলে, আমি দৃঢ়তার সাথে মনে করি, আল্লাহ আমাকে ঐ শাস্তি দিয়েছে সত্য থেকে দূরে থাকার জন্য। গোলাপের পরিচয় তুলে ধরে তিন বছর আগে আপনাকে কিছু না জানাবার এবং ১৯৮১ সালে সূর্যসেন হলে মনোনয়ন দেবার জন্য।

আমি এখন আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং আল্লাহর কাছে মাফ চেয়েছি। আমি গোলাপের কথা আপনার কাছে তুলে ধরলাম, আপনি যেন গোলাপকে আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারী বা অন্য কোন পদে না বসান আপনার এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সম্মানের স্বার্থে।

www.pathagar.com

আমি আমার বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুরোধ করছি, আমি জানি আমি এখানে সত্য উল্লেখ করছি, যেখানে সত্য সেখানে আল্লাহ এবং ঈশ্বরের অবস্থান। আপনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের কন্যা। মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ভাইয়ের বোন, আপনি সাবেক প্রধানমন্ত্রী। একজন রাস্তার সাবেক ডাকাত ও হাইজ্যাকার আপনার কোন পদে থাকুক, তা শুভবুদ্ধির কোন মানুষ চায় না, আমি তো আরও বেশী চাই না।

আমি আমার বক্তব্যের সত্যতা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য অনুরোধ করছি, আমি যদি এ বিষয়ে তদন্তে মিথ্যা প্রমাণিত হই তবে শাস্তি নিতে প্রস্তুত রইলাম।

আপনার বাধ্যানুগত

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা ও লেখক
সাবেক ছাত্রলীগ নেতা
শহীদ শেখ কামাল ভাইয়ের একান্ত বিশ্বস্ত সাথী
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫।

কপি :

প্রয়োজনীয় অবগতি ও তদন্ত করে দেখার অনুরোধ জানিয়ে–

১. জনাব ওবায়দুল কাদের, যুগ্ম সম্পাদক, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

২. মেজর জেনারেল (অবঃ) তারেক সিদ্দিকী, সুধাসদন, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

৩. সেলিমা খানম, একান্ত সচিব, জননেত্রী শেখ হাসিনা, সভানেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ।

৪. আওলাদ হোসেন, সুধাসদন, ঢাকা।

৫. আব্দুস সোবাহান (গোলাপ), সুধাসদন, ঢাকা।

বি. দ্র. : ২০০৯ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে আবদুস সোবহান গোলাপকে পূর্ণ সচিবের পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বিশেষ সহকারী নিয়োগ করেছেন।

www.pathagar.com

২০১৪ সনের সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার বিজয়ের জন্য যা করা একান্ত প্রয়োজন

২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন, ৩০০ আসনের মধ্যে মাত্র ৩০টি আসন বিএনপি বা চারদল পেয়েছেন। জনগণ খালেদা জিয়া, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলাম নামক রাজনৈতিক দল বা নেতৃত্বকে ব্যাপকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে আগামী ২০১৪ সনের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হবে। গণতন্ত্রের শাসনের নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছর পর আবার ২০১৪ সনের মার্চ মাসে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর গত ৩৯ বছরে মাত্র সাড়ে আট বছর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের শাসনভার পরিচালনার সুযোগ পেয়েছে, আর ৩২ বছরের বেশী সময় সাম্প্রদায়িক শক্তি রাষ্ট্রীয় টাকা বা সম্পদের লুটপাটকারী চোর-ডাকাতরা ক্ষমতায় থেকে বাংলাদেশের সর্বনাশ করেছে, মানুষের মানবিক চিন্তা-ভাবনা, মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম–সব কিছু ধুলায় লুণ্ঠন করেছে। সারা বাংলাদেশ এক দুর্বৃত্তের শাসনে পরিণত হয়েছে, যুবদল, ছাত্রদল, বিএনপির ক্যাডার, তারেক জিয়ার হাওয়া ভবনের সাঙ্গ-পাঙ্গদের অত্যাচারে অতিষ্ঠিত হয়ে বাংলাদেশের মানুষ ২৯শে ডিসেম্বর শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছে। ২০০৯ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত ৫ বছরে শেখ হাসিনার শাসনে যদি ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপির ক্যাডারদের মত অত্যাচার, অবিচার বাংলাদেশের মানুষ দেখে, তবে ২০১৪ সনের মার্চ মাসের সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্ব ও তাঁর দলকেও বাংলাদেশের মানুষ গত ২৯শে ডিসেম্বরের মতই প্রত্যাখ্যান করবে, যা হবে বাংলাদেশের জন্য একটি বিরাট ক্ষতিকর দিক। কেননা, আমি মনে করি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনে খুব বেশী হলে চার আনা খাদ, ১২ আনা সোনা, আর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার হলো ১২ আনা খাদ আর চার আনা সোনা। কাজেই মিসেস খালেদা জিয়ার শাসন বাংলাদেশের জন্য খুবই বিপদজনক। আমি আশা করব শেখ হাসিনার প্রতি গত ২৯শে ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ যে সম্মান ও ভালবাসা দেখিয়েছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে ২০০৯ সন থেকে ২০১৪ সনের শাসনকে ২ আনা খাদ এবং ১৪ আনা সোনার শাসনে পরিণত করবেন এবং ২০১৪ সনের মার্চ মার্চের সংসদ নির্বাচনে ২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বরের মত বিজয় অর্জন করবেন। যদি জননেত্রী শেখ হাসিনা তা করতে পারেন তবেই বাংলাদেশের সত্যিকারের সেবা করা হবে, সত্যিকারের বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের কল্যাণ করা হবে, দেশ-বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে, বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদলের প্রতিপত্তি কমে যাবে, রাষ্ট্রীয় লুটপাট বন্ধ হবে।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে ২৯শে ডিসেম্বর বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ কর্মীদের বিজয় মিছিল করতে না দিয়ে তিনি সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের কাছে একজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, দলমত নির্বিশেষে শেখ হাসিনার এ সিদ্ধান্তকে প্রতিটি মানুষ স্বাগত জানাচ্ছে। শক্তিশালী, সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ২০১৪ সনের মার্চ মাসে আবার ক্ষমতায় আসা দরকার। আর এটা সম্ভব যদি জননেত্রী শেখ হাসিনা নিম্নলিখিত কাজগুলো করেন তবেই।

১। সুন্দর প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদের না চটানো, এরা যখন যে ক্ষমতায় থাকে তার সেবা করে, ক্ষমতায় না থাকলে এরা কাউকে চেনে না, সবার এক স্বভাব। কাজেই সরকারী কর্মচারীদের নিরপেক্ষভাবে দেখতে হবে। চাকুরী থেকে অবসরে যাওয়া কোন কর্মচারীকে কোনক্রমেই চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নিয়ে পুনর্বহাল করা যাবে না। এটা করা হলে একজন চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়ে খুশী হবেন, কিন্তু ১০০ জন অখুশী হয়ে বলে বেড়াবে লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়ে অমুকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছে। আর হাজার হাজার চাকুরীরত অফিসার কর্মচারীরা ক্ষেপে যাবে তাদের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার জন্য। কাজেই সরকারী কর্মচারীদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে, তাদের দুই চারজনকে পুনরায় চাকুরী দিয়ে হাজার হাজার সরকারী কর্মচারীকে চটানো বা ক্ষেপানো যাবে না। চাকুরীর অবসরে বয়স ৬০ বছর করা উচিত। লিখিত কারণ না দেখিয়ে কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, কারণ না দেখিয়ে শাস্তি দেওয়া সভ্য শাসনের বিরুদ্ধে অসভ্য শাসনের দৃষ্টান্ত।

বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে মন্ত্রীসভা গঠন হতে চলছে, সে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী মহোদয়দের কোন একান্ত সচিব যেন মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের চাহিদা বা পছন্দ মোতাবেক নিয়োগ না দেয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী সাহেবরা সহকারী একান্ত সচিব পদে তাদের পছন্দ মত নিয়োগ দিতে পারেন। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের একান্ত সচিব সংস্থাপন সচিব সাহেবরা নিয়োগ দিয়ে এসেছেন বহু আগে থেকে ১৯৯১ সন পর্যন্ত। কিন্তু ১৯৯১ সনে মিসেস খালেদা জিয়ার শাসন থেকে এই খারাপ দৃষ্টান্তটি চালু হয়েছে যে, মন্ত্রীদের পছন্দ মত একান্ত সচিব নিয়োগ এবং তারা পুরা ৫ বছর এই পদে বহাল থাকে। ফলে একান্ত সচিবরা সীমা লংঘন করে আচরণ করে চলছেন, এটা সুশাসনের জন্য বিরাট অন্তরায়।

কাজেই জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে আবেদন তিনি যেন এই খারাপ দৃষ্টান্তের অবসান করে ১৯৯১ সনের আগের নিয়ম চালু করেন–সংস্থাপন সচিব সাহেব তার পছন্দ মত স্টাফদের মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের একান্ত সচিব পদে নিয়োগ দেবেন এবং ২ বছর ৬ মাস মেয়াদের জন্য, ২ বছর ৬ মাস পরে নতুন একান্ত সচিব নিয়োগ দেবেন। এটা চালু হলে একান্ত সচিব পদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, দুর্নীতি অনেক বন্ধ হবে, একান্ত সচিবরা দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে সংযত আচরণ করবেন, মন্ত্রী সাহেবদের আদেশ-নির্দেশ ভালভাবে পালিত হবে। আর মন্ত্রী সাহেবের পছন্দমত একান্ত সচিব হলে উপরে বর্ণিত

www.pathagar.com

বিষয়গুলোর একটিও বাস্তবায়িত হবে না। কোনক্রমেই যেন একান্ত সচিব সংস্থাপন সচিবের পছন্দের বাইরে নিয়োগ না পান তার জন্য অবশ্যই জননেত্রী শেখ হাসিনাকে কড়া নির্দেশ দিতে হবে।

২। জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন বক্তৃতায় যা বলেছেন তার একটি হ'ল এই যে, তিনি ১৪ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী, শুধুমাত্র কয়েক লাখ বা কয়েক হাজার দলীয় নেতাকর্মীদের প্রধানমন্ত্রী নন, সবার প্রতি সমান আচরণ দেখাবেন। তাহলেই যদি এটা মানা হয় দেশের মানুষ তাঁর প্রতি সম্মান ও ভালবাসা অক্ষুণ্ন রাখবে। নিয়ম ও আইন-কানুনের মধ্য থেকে সব কিছু করা উচিত। বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষ সবাই শেখ হাসিনার বাবা, মা, ভাই, বোন সবাই আপন, দুই চারজন সন্ত্রাসী ও চোর, ডাকাত বাদে।

৩। কোন ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতাকে প্রশ্রয় না দেয়া, কঠোরভাবে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, এটা করতে কোন টাকা-পয়সার দরকার হয় না, শুধু একটি মনের দরকার, তাহলে এটা করা যায়। শাসকের কাজ হচ্ছে তিনটি, (১) প্রতিটি মানুষের জীবন রক্ষা করা, (২) প্রতিটি মানুষের মান-সম্মান রক্ষা করা, (৩) প্রতিটি মানুষের আইনগতভাবে পাওয়া সম্পত্তি রক্ষা করা। এই তিনটি কাজ করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারের সৃষ্টি হয়েছে, এই কথাটি সবার ভালভাবে মনে রাখা উচিত। এই তিনটি কাজ সঠিকভাবে করতে পারলে যে কোন লোক ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন। মনে রাখতে হবে গত ৭ বছরে আওয়ামী লীগের সমর্থনে শেখ হাসিনার সমর্থনে কোন মাস্তান, ক্যাডার, সন্ত্রাসী একটি কথা বলতে সাহস পায় নাই, তারা মাথা নত করে পালিয়ে বেড়িয়েছে। আজ যেন তারা আবার শেখ হাসিনার আশপাশে এসে তার সুনাম নষ্ট না করে।

৪। 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। এই কথাটি মনে রেখে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে তাঁর আশপাশে ভাল লোকদের স্থান দিতে হবে, খারাপ লোকদের দূরে রাখতে হবে। কোনক্রমেই দুর্নীতি ও চুরিকে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না। বিএনপি-জামাতের শাসন-আমলে ১ কোটি টাকার সরকারী কাজে ২০-৩০ লাখ টাকার কাজ হয়েছে, ৭০-৮০ লাখ টাকা পকেটে গিয়েছে বলে অভিযোগ শোনা যায়। জননেত্রী শেখ হাসিনার শাসনামলে ২০০৯ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত কোন সরকারী কাজে যেন ১ কোটি টাকার কাজে ৮৫ লক্ষ টাকার নিচে কোন কাজ না হয় তার জন্য কঠোরভাবে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫। সরকারী নিয়মনীতি মেনে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সুযোগ-সুবিধা দেয়া দরকার, তা না হলে দলের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে যাবে।

৬। ২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বরের নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের জন্য সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেব ও জাতীয় পার্টির বিরাট অবদান আছে, এটাকে কোনক্রমেই অস্বীকার করা যাবে না। ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সনের নির্বাচনে ২০০০ ভোটের কম ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রায় ৬০টি করে আসন হারিয়েছে, যার জন্য আওয়ামী লীগের পরাজয় হয়েছে। এবারে জাতীয় পার্টির সাথে জোট করার জন্য তা হয়নি। কাজেই এরশাদ সাহেবকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে রাখতে হবে। আওয়ামী লীগের শত্রুরা জাতীয় পার্টির সাথে ঐক্যে ফাটল ধরাতে চেষ্টা করবে, সেটা মনে রেখে কাজ করতে

www.pathagar.com

হবে।

৭। বাংলাদেশের হিন্দুরা যাতে অবাধে তাদের ধর্মকর্ম, পূজাপার্বণ ভালভাবে করতে পারে তার প্রতি নজর দিতে হবে। মুসলমনারা যাতে তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে কোন আঘাত না পায় তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের প্রধান খতিবসহ ইসলামী আলেম, ওলামা ও ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে শেখ হাসিনার সুসম্পর্ক রাখতে হবে। তাদের মান-সম্মান দিতে হবে, তাদের সব সময় খুশী রাখতে হবে। সত্যিকারের আলেম-ওলামাদের সম্মান করা, তাদের খুশী করা আমাদের ইসলামধর্মের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। এবং হিন্দু বা সনাতনধর্মে ধর্মীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সেবা করা একান্ত প্রয়োজন।

৮। চাটুকার, স্তাবক, কমুনিস্টদের থেকে যতটা সম্ভব শেখ হাসিনাকে দূরে থাকতে হবে। কমুনিস্টরা সুবিধাবাদী, লুটেরা, ভণ্ড, প্রতারক। নির্লজ্জভাবে স্তাবকতা করে ব্যক্তিগত স্বার্থ আয় করাই এদের একমাত্র ধর্ম, অথচ মুখে বড় বড় আদর্শের বুলি আওড়ায়।

উপরে বর্ণিত ৮টি পয়েন্টে যা উল্লেখ করলাম তা যদি বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা মেনে চলেন তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ২০১৪ সনের মার্চ মাসের সংসদ নির্বাচনে আবার তিনি ২০০৮ সনের ২৯শে ডিসেম্বরের মত বিজয় অর্জন করে ৩য় বারের মত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন, ফলে বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের বিরাট উপকার হবে।

'মহাভারত' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে, ধনিক, বণিক ও সৈনিক এই তিনটি রাজশক্তির ভিত্তি। এদের চটানো বা ক্ষেপানো যাবে না, এদের সব সময় তুষ্ট রাখতে হবে, আবার এই তিন শক্তির দালালী বা তাঁবেদারীও করা যাবে না। এদের কথায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে না, শাসককে স্বাধীনভাবে বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্রের সব মানুষের স্বার্থে। সুশাসনের জন্য উপরের কথাটি একান্তভাবে মেনে চলা দরকার।

আমি আবার বলছি, খালেদা জিয়ার শাসনে ৪ আনা সোনা ১২ আনা খাদ, শেখ হাসিনার শাসনে ১২ আনা সোনা ৪ আনা খাদ ছিল। ২০০৯ সন থেকে ২০১৪ সন পর্যন্ত আমি চাই শেখ হাসিনার শাসনে ১৪ আনা সোনা ২ আনা খাদ। ১৬ আনা সোনা হলে খুব ভাল হতো, তবে সেটা সম্ভব নয়, অবাস্তব চিন্তা।

০১.০১.২০০৯
০৪.০১.২০০৯ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত।

www.pathagar.com

মাননীয়
প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আবেদন

শুধু জেনুইন মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বজায় রেখে গরিব-দুঃস্থদের দেয়া অন্য সব রাষ্ট্রীয় ভাতা, সুযোগ-সুবিধা বাদ দিয়ে নিম্নলিখিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন।

১. বাংলাদেশের প্রায় ৫০০০ ইউনিয়নে প্রতি ইউনিয়নে ১৫০০ জন সবচেয়ে গরিব মানুষকে প্রতি মাসে ৬০ কেজি চাল দেয়া হোক প্রতি কেজি ৫.০০ টাকা দরে।

২. ৫০০০ ইউনিয়নের প্রতি ইউনিয়নে তার চেয়ে কম গরিব ১৫০০ জনকে প্রতি মাসে ৬০ কেজি চাল দেয়া হোক প্রতি কেজি ১০.০০ টাকা দরে।

৩. তার চেয়ে কম গরিব প্রতি ইউনিয়নে ১৫০০ জনকে ৬০ কেজি চাল দেয়া হোক প্রতি কেজি ২০.০০ টাকা দরে।

এতে ২ কোটি ২৫ লাখ লোক মাসে ৬০ কেজি করে চাল পাবে। বাংলাদেশের মোট ভোটার সংখ্যা ৮ কোটি ১০ লাখ। প্রায় ২৫% গরিব মানুষ দু' বেলা খাবার পাবে।

চালের দাম নিয়ন্ত্রণে থাকবে। রেশন দোকানের মাধ্যমে এই চাল নিয়মিত সরবরাহ দিতে হবে। ৩ রংয়ের ৩ ধরনের রেশন কার্ড থাকবে।

এটা করলে আপনার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ন থাকবে ও অনেক বৃদ্ধি পাবে

নিবেদনে–

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও লেখক
তারিখ : ০৫/০১/২০০৯ইং

বিঃ দ্রঃ : উপরে বর্ণিত লেখাটি যখন লেখা হয় তখন বাংলাদেশে এক কেজি মোটা চাউলের দাম ছিল চল্লিশ টাকা।

উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সনের ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদের নির্বাচন হয়। ৫.১.২০০৯ তারিখে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ৬.১.২০০৯ তারিখে উপরের আবেদনটি অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত সাহেবের হাতে দেওয়া হয় সচিবালয়ে তাঁর প্রথম কর্মদিবসে তাঁর অফিসে।

www.pathagar.com

তারিখ : ১৬. ০১.২০০৯

মাননীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি

রমনা (রেস-কোর্স) ময়দান ধ্বংস না করার জন্য আবেদন

১৬ই জানুয়ারি দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত শামসুজ্জামান খানের লেখা সারোয়ার্দী উদ্যানে সাংস্কৃতিক বলয় নামে যে লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাই। সারোয়ার্দী উদ্যান রমনা রেসকোর্স ময়দানে নামে পরিচিত ছিল, এটা ঢাকা শহরের ইতিহাসে অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। এই রমনা ময়দান জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ঘটনাবলীর স্থান।

১. এই রমনা ময়দানে ১৯৬৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ২৩ তারিখে লক্ষ লক্ষ ছাত্র জনতা মিটিং করে শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু খেতাব প্রদান করেন।

২. এই রমনা ময়দানে ১৯৭১ সনের ৪ঠা জানুয়ারি আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত ১৬৭ জন এম.এন.এ ও ২৯২ জন এমপিএ কে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে বঙ্গবন্ধু শপথ করান তারা যেন বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজ না করে সে জন্য।

৩. এই রমনা ময়দানে ১৯৭১ সনের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, বাংলাদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্য।

৪. এই রমনা ময়দানে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে ৯৪,০০০ হাজার পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করেন।

৫. এই রমনা ময়দানে ১৯৭২ সনের ১০ই জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত জাতির জনক হিসাবে স্বাধীন বাংলাদেশের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে কান্নাভেজা কণ্ঠে প্রথম ভাষণ দেন।

৬. এই রমনা ময়দানে ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে ১০ লক্ষাধিক জনতার সামনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী ভাষণ প্রদান করেন।

বাংলাদেশ জন্মের এই ছয়টি ঘটনার তাৎপর্য অনেক সূদুর প্রসারী। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পরে রাজাকাররা ক্ষমতায় এসে এই ঐতিহাসিক রমনা ময়দানকে ধ্বংস করে প্রথমে ফুলের গাছ লাগিয়ে, পরে বড় বড় গাছ লাগিয়ে ময়দানকে উদ্যান বানায়। আসলে এই গাছ লাগানোর পিছনে ছিল ষড়যন্ত্র, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও ভারতীয়

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর অবদানকে মুছে দেওয়ার জন্য। ঐ সময়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ময়দান ধ্বংস করে গাছ লাগানো বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলন করেছেন। ১৯৭৭ সনে যখন রমনা ময়দানে গাছ লাগানো শুরু হয় তার বিরুদ্ধে কবি নির্মলেন্দু গুণ ঐ সময়ে ৭ই মার্চ নিয়ে একটি কবিতা লিখেন যা খুবই বিখ্যাত, স্বাধীনতা এই শব্দটি কেমন করে এল নামে। ঐ কবিতায় লেখা রয়েছে আজ ময়দানের বিরুদ্ধে ময়দান, পার্কের বিরুদ্ধে পার্ক, শিশুর বিরুদ্ধে শিশুকে লাগানো হচ্ছে, সেদিনের সেই ইতিহাসকে মুছে দেওয়ার জন্য।

অতীব দুঃখের বিষয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান রাজনৈতিক ঘটনার চিহ্ন মুছে দেওয়ার জন্য রমনা ময়দান ধ্বংস করা হয়েছে, এখান থেকে গাছ কেটে এটাকে ময়দান না করে সেখানে আবার শত শত কোটি টাকা ব্যয় করে সাংস্কৃতিক বলয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে, যাতে সম্পূর্ণভাবে রমনা ময়দান হারিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ঘটনার কোন অবদানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন যাতে না থাকে তার জন্য।

এই সব করা হয় আসলে রাষ্ট্রীয় শত শত কোটি টাকা লুটপাট করার জন্য। ধানের শীষ ভোটে জিতলে ৩০০ কোটি টাকা খরচ করে জিয়ার মাজার-করা হয়, আবার নৌকা জিতলে ঐতিহাসিক রমনা ময়দান ধ্বংস করে সাংস্কৃতিক বলয় সৃষ্টি করার চেষ্ট করা হয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করে। এর পিছনে থাকে গণপূর্ত অধিদপ্তরের এক ধরনের টাউট ইঞ্জিনিয়ার, এরা ধানের শীষের বুদ্ধিজীবিদের তুষ্ট করে জিয়ার মাজার করানোর জন্য জনমত সৃষ্টির জন্য লাগায়, নৌকা বিজয়ী হলে নৌকার বুদ্ধিজীবিদের কাজে লাগায় ২০০ কোটি টাকা খরচ করে সাংস্কৃতিক বলয় সৃষ্টি করার জন্য ঐতিহাসি রহমান ময়দান ধ্বংস করে। কোনক্রমেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধুর জীবনের সবচেয়ে বেশী রাজনৈতিক অবদানের মাঠ রমনা ময়দান ধ্বংস না করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একজন রাজনৈতিক সন্তান হিসাবে আকুল আবেদন জানাচ্ছি।

শুধুমাত্র স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ হবে রমনা ময়দানে, কোন সাংস্কৃতিক বলয় রমনা ময়দানে হবে না। যদি কেউ তার পিতাকে হত্যা করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে চিত্রশিল্পী দিয়ে তার বাবার ছবি আঁকায় সেটা যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমিন রমনা ময়দানকে ধ্বংস করে বঙ্গবন্ধুর মুরাল রাখাও একই কথা। আসলে দেশপ্রেম, ইতিহাস সচেতনতা, বঙ্গবন্ধুর প্রতি সামান্যতম ভালবাসা যাদের নেই তারাই ময়দানে সাংস্কৃতিক বলয় করার চেষ্টা করে রাষ্ট্রের শত শত কোটি টাকা নষ্ট করতে চায় এবং এ থেকে কিছুটা ভাগ ভাটোয়ারার জন্য।

সাবেক মস্কোপন্থী কমুনিস্ট যারা এখন আওয়ামী লীগে এসেছে তারাই এই সব সর্বনাশা কাজের সাথে জড়িত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যারা ৫০, ৬০, ৭০, ৮০ দশকে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী তারা রমনা ময়দান ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি ভালবাসার জন্য।

১. রমনা ময়দান হবে, ২। রমনা ময়দান ওয়াকওয়ে হবে, ৩। রমনা কালী মন্দির হবে, ৪। স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ হবে, ৫ ।রমনা গলফ কোর্স হবে,

www.pathagar.com

এছাড়া রমনা ময়দানে আর কোন কিছু নির্মাণ করা যাবে না। রমনা ময়দান ধ্বংস হলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কবরে শুয়ে থেকে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ও প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অভিশাপ দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

নিবেদনে,
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ও মুক্তিযোদ্ধা
১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইয়ের লেখক।

কপি :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে-

১. ডঃ আলাউদ্দিন আহম্মেদ, মাননীয় উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

২. ডাঃ মোদাচ্ছের আলী, মাননীয় উপদেষ্টা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

৩. জনাব আবুল কালাম আজাদ, প্রেস সেক্রেটারী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

৪. জনাব নজরুল ইসলাম, একান্ত সচিব-১, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

৫. মিসেস সেলিমা খানম, একান্ত সচিব-২, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

www.pathagar.com

তারিখ : ১৭.০১.২০০৯ইং

শ্রদ্ধেয় হাসিনা আপা,

প্রেরিত দরখাস্তের বিষয় নিয়ে আমি আপনার সাথে ১০ মিনিট কথা বলতে চাই। আমাকে ১০ মিনিট আপনার সাথে কথা বলার সুযোগ দেবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান জানবেন।

অনুরোধে

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইয়ের লেখক।

www.pathagar.com

তারিখ : ঢাকা ০৭.০৪.২০০৯
প্রতি,

শ্রদ্ধেয় সিদ্ধার্থশংকর রায়
২ নং বেলতলা রোড
কলকাতা-৭০০০২৬

পরম শ্রদ্ধেয় দাদাবাবু,

আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানবেন। আমি গত ০৯.০২.২০০৯ তারিখ সোমবার কলকাতার ২নং বেলতলা রোডে আপনার বাসায় আমার স্ত্রী ও বর্ধমানের দুজন ছেলেসহ আপনার সাথে দেখা করি এবং আমার লেখা '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি আপনাকে দেই। সম্মানিত ও গুণী মানুষদের সাথে পরিচয় হওয়া আমার একটি তীব্র নেশা, সে তাড়না থেকে আপনার সাথে দেখা করি এবং আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে আপনার বিরাট অবদানের জন্য আপনার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আমি মনে করি ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে অবদান ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পরেই আপনার অবদান। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আপনি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, ৮০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় ও খাবার দিয়েছেন আপনি, আমাদের মত মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং ক্যাম্পে ব্যবস্থা করে ট্রেনিং দেবার, যুদ্ধ করার যাবতীয় কাজ আপনার হাত দিয়ে হয়েছে। ০৯.০২.০৯ তারিখ আপনার সাথে দেখা করে আপনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিরাট ভারমুক্ত হয়েছি বলে আমার মনে হয়েছে। আপনি সেদিন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাদের গ্রহণ করেছিলেন। আমি এ জন্য আপনাকে আবার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

আপনার দিদি মিসেস অদিতি মুখার্জী গত ২০ বছর যাবৎ আমাকে নিজের ছেলের মত স্নেহ করেন। তিনি একজন সজ্জন মহীয়সী নারী, তিনি আপনাকেও খুব ভালবাসেন, আমার কাছে আপনার খুব প্রশংসা করেন। আল্লাহ বা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনি আরও অনেক বছর যেন সবল, সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বেঁচে থাকেন। আমি আপনার স্নেহ ও আশীর্বাদ কামনা করি।

আপনার স্নেহের
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
এ্যাপার্টমেন্ট নং-এ-১২
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

Dhaka
Date: 26-03-2009

To
Maj Gen Lachhman Singh
Somvihar, R. K. Puram
New Deilhi-110022
India

Respected Sir,

I visited your residence on 13.02.09 at Sombihar, Delhi.

We meet again 18.02.2009 at general Joginder Singh's residence. Both the day which affection you have shown on us is unique, unforgettable & ever rememberable. Your affection will remain us many days in my heart.

You have given some valuable presentation to my wife, which gratitude I could not express my limited language. Please convey my heartly respect to madam (your misses).

Please don't forget us. I am like your one of son. I don't know whether God will give any chance to meet with you again. But I hope for best. I pray to God for your best. Please bless for me. I am not well for my diabetes. That is why delay for this letter.

When we were in your residence on 13.02.2009 evening, that time madam wanted to give me a picture of you 18th December 1971 at Bogra, where on Pakistani General handovering his command under you. But she and we forget it when we left your house, we did not get it or she did not give it. If possible please send it through post, I may print it in my book coming edition.

With many respect.

Abu Mohammad Khan (Bablu)
Apartment No. A-12
Prince Tower
135/A Elephant Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

Dhaka
Date : 08.04.2009

To
Lt. Gen. B. Joginder Singh
Defense Colony
New Delhi-110024
India.

Respected Sir,

I visit your residence on 15.02.2009 defense colony at Delhi. Very heartily you have invited us for a lunch on 18.02.09 at your residence, where General Lakchhman Singh & General Kathpalia were present with their wife.

I am very much charm by your heartily behave, you are exceptionally very good man. On 18.02.09 after lunch you have given some valuable presentation to my wife, which gratitude I can not express my language. On 18.02.09 Wednesday at your house lunch was very good, very delicious, very good cooking it will remain many days in my heart.

Please convey my thanks and respect to madam (your wife).

Please remember sir, I am one of those freedom fighter who did not forget Indian army contribution on 1971 Bangladesh war.

Please bless for me
Yours sincerely

Abu Mohammad Khan (Bablu)
Apartment No. A-12
Prince Tower
135/A Elephant Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

Dhaka
Date : 08.04.2009

To
Lt. Gen. P. N. Kathpalia
Somvihar Apartment
R. K. Puram
New Delhi-110022
India

Respected Sir,

I meet with you at General Lakchhman Singh residence on 13.02.09 and again General Joginder Singh house on 18.02.09 both the day you have shown very affection on me. I am grateful you. After lunch on 18.02.2009 you have given some valuable presentation to my wife, which is highly praiseable.

Please take my respect from my heart and convey to madam also (your wife).

Remember sir, I am that freedom fighter, who did not forget Indian army contrbution on 1971 Bangladesh war. Sometime I tears for them

Please bless me.

Yurs Sincerely

Abu Mohammad Khan (Bablu)
Apartment No. A-12
Prince Tower
135/A Elephant Road
Dhaka-1205, Bangladesh

www.pathagar.com

ঢাকা
০৩.০৩.০৯, মঙ্গলবার
দেবী প্রসাদ মিশ্র,
ময়নাডাঙ্গা, চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী

দেবীবাবু

আমার প্রণাম জানবেন। গত ২৩.০২.০৯ তারিখ আপনি হুগলীর ত্রিবেণী থেকে বর্ধমানের চুপি এসে ২৪.০২.০৯ তারিখ আমাকে ত্রিবেণীতে নিয়ে যান। আমি আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ। আপনি আমাকে হংসেশ্বরী মন্দির দেখান এবং নারায়ণ সান্ন্যালের হংসেশ্বরী নামক বইয়ের খোঁজ দেন। আমি গত ২৫.০২.০৯ তারিখে চুপি থেকে কলকাতা এসে ২৬.০২.০৯ তারিখে কলকাতার কলেজ স্ট্রীট গিয়ে "হংসেশ্বরী" বইটি সংগ্রহ করি। ২৭.০২.০৯ তারিখে কলকাতায় ছিলাম। ২৮.০২.০৯ তারিখ শনিবার সকালে ট্রেনযোগে রওনা দিয়ে রাত ৯টায় ঢাকায় চলে আসি। গত দু'দিনে আমি "হংসেশ্বরী" বইটি পড়ে শেষ করলাম আজ ০৩.০৩.০৯ তারিখে।

রাজা নৃসিংহপ্রসাদ, তার মা হংসেশ্বরী দেবী, বড় বউ মহামায়া, ছোট বউ শংকরী, দেওয়ান দিলীপ দত্ত, দত্তকপুত্র কৈলাস, তাঁর পুত্র দেবেন্দ্র, শ্রীশংকর দেব কাব্যতীর্থ, রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্র ও মৃন্ময়ীর সন্তান পুর্ণেন্দুদেব রায়, এদের জীবনকথা। ১৭৪০ সন থেকে ১৮৫৬ সন পর্যন্ত একশত ষোল বছরের সময় যেন চোখের সামনে ভেসে উঠল নারায়ণ সান্নালের 'হংসেশ্বরী' বই পড়ার সময়। চোখ দিয়ে হংসেশ্বরী মন্দির দেখার সুযোগ পাবার জন্য বইটি পড়ার এক জীবন্ত আনন্দের স্বাদ পেলাম। আপনাকে আবার নমস্কার। হুগলীর হাজী মুহাম্মদ মহসিনের ইমামবারা, হাজী মহসীন কলেজ, হুগলী নদী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি, হুগলী জেল–এসব দেখেও আনন্দ পেয়েছি। এসবের স্মৃতি আমার মনের পাতায় গেঁথে রয়েছে। আর এসবের মূলে রয়েছে আপনার অবদান। আপনি না হলে এসব দেখা হত না।

আমার শরীর ভাল না, ডায়াবেটিস বেশ ছোবল মারছে, শরীর খুব দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, জানি না কী হয়। ২৪.০২.০৯ তারিখ আপনি আমার জন্য বেশ অনেকগুলো টাকা খরচ করেছেন, জানি না এ ঋণ কীভাবে কবে শোধ করতে পারব। তবে চেষ্টা করে যাব আপনাকে বাংলাদেশে আনার জন্য। আমি বেশ একটু অন্য ধরনের মানুষ, যেখানে যাই একটু বেশি সময় থাকি, প্রাণভরে সব দেখি, ত্রিবেণীর আপনার বাসস্থানের কোয়ার্টার এলাকা দেখে আমার প্রাণ ভরেনি, আমাকে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে আপনার কোয়ার্টার এলাকা, হৃদয়পটে খুব গেঁথে রয়েছে, আপনার বাসস্থান এলাকা হাতছানি দিয়ে ডাকলেও কি আর সহজে যাওয়া হবে? যাক এই তো জীবন–চাওয়া-পাওয়ার পূর্ণতা ও অপূর্ণতা।

আপনি আমার জন্য আশীর্বাদ করবেন। আপনার বাবা, স্ত্রী, ছেলেমেয়ে সবাইকে আমার প্রণাম জানাবেন।

আপনার গুণমুগ্ধ
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
ঢাকা

www.pathagar.com

তারিখ: ২০.০৩.২০০৯

সুশীল কুমার রায়

দুর্গাবাড়ী রোড, গোরাবাজার,

দমদম,

কলকাতা-৭০০২৮

শ্রদ্ধেয় ও সম্মানিত সুশীল রায় মহাশয়

আমার আন্তরিক প্রণাম জানবেন। গত ০৮.০২.২০০৯ তারিখ রোববার সন্ধ্যের সময় কলকাতার দমদমের গোড়াবাজারে আপনার বাসায় আমার স্ত্রীসহ আমি আপনার সাথে দেখা করি। আমি আমার লেখা '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি আপনাকে দেই, আপনি আপনার লেখা জন্মভিটের টানে 'বাংলাদেশ সেকাল ও একাল' বইটি আমাকে দিয়েছেন। আপনি তাতে লিখেছেন–স্নেহাপদ বাবলুকে, সুশীল রায় ০৮.০২.২০০৯।

আমাকে বাংলা ভাষার অনেক বিখ্যাত বা আকাশের সমান উঁচুস্তরের লেখক যেমন শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শওকত ওসমান, গৌরকিশোর ঘোষ, শিবনারায়ণ রায়, অশোক রুদ্র, বিমল মিত্রসহ অনেকে বই উপহার দিয়েছেন এবং তাদের মনোভাব লিখে দিয়েছেন আমার সম্পর্কে, কিন্তু কেহই স্নেহপদ বাবলুকে লিখেননি। তারা লিখেছেন–স্বজনেসু, প্রীতিভাজন, পরম সুহৃদ, উদার মুক্ত মনের মানুষ, শ্রদ্ধেয় ইত্যাদি বিশেষণ, আপনি একমাত্র লেখক যিনি স্নেহাপদ শব্দটি লিখেছেন। আমার মনে হয় এর পিছনে ২টি কারণ কাজ করেছে, প্রথমতঃ ১৯৭১ সনে আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে একজন সোলজার হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে মুক্তিবাহিনীতে যুদ্ধ করেছি, আপনি সেই সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন মেজর পদের অফিসার ছিলেন, ২য় কারণ হালিম সাহেবের রেফারেন্সে আপনার বাসায় যাই, হালিম সাহেব আমার মায়ের কাকাতো বোনের স্বামী সম্পর্কে আমার মেসো বা খালু, সেকারণে আপনি স্নেহের বাবলু শব্দটি লিখেছেন। এত কথা লিখলাম আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগছে স্নেহের শব্দটি লিখবার জন্য, এর মধ্যে একটি অতি আপনজনের ছায়া আছে।

জন্মভিটির টানে : বাংলাদেশ সেকাল ও একাল ৮ই ফেব্রুয়ারি রাতে কলকাতার মারকুইজ স্ট্রীটের হোটেল একুশেতে ৫০ পৃষ্ঠার মত পড়ি, ১৪ই ফ্রেব্রুয়ারি দিল্লীর পাহাড়গঞ্জে অবস্থিত হোটেল দিল্লী রিজেন্সীতে ৫০ পৃষ্ঠা পড়ি এবং গত দুদিনে ঢাকায় আমার প্রিন্স টাওয়ারের বাসাতে ৯২ পৃষ্ঠা পড়ে শেষ করলাম।

বইটি অসাধারণ একটি ভালো ব্যতিক্রমধর্মী বই। অনেক কিছু উল্লেখ করে এ বই সম্পর্কে অনেক কথা লিখা যায় কিন্তু তা লিখবার মত আমার শারীরিক অবস্থা নেই, গত কয়েক দিন অসুখে ভুগে আজ কিছুটা আরাম পাচ্ছি। তাই আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম। আপনার বইতে আপনি যে অনেক কথা লিখেছেন তার মাত্র ৩টি বিষয়ে আমি

www.pathagar.com

এখানে উল্লেখ করতে চাই তা হচ্ছে ১ম : বরিশালে জাব্বার সাহেবের বাসায় জামালের হিন্দু ও হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপনি হিন্দু বা সনাতনধর্মের শাশ্বত রূপ তুলে ধরে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা অসাধারণ। হিন্দু বা ভারতীয় দর্শনের উপর আমার প্রবল আগ্রহ আছে এবং আমি এ বিষয়ে কিছু পড়া-লেখা করেছি বা করে থাকি,–স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র রচনাবলী আমি পড়েছি, মহাভারত এবং রামায়ণের আমি মুগ্ধ পাঠক, চার বেদের অনেকটাই পড়েছি, আমার লেখার টেবিলে বেশ কয়েকটি বই রয়েছে তার মধ্যে একটি বইয়ের নাম 'হিন্দু ধর্মের রূপরেখা' লেখক ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, অনুবাদ নিখিল ভট্টাচার্য। এটি ১৯২৬ সনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানচেষ্টার কলেজের আমন্ত্রণে (UPTON) আপটন বক্তৃতা। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর উপরেও সামান্য পড়াশোনা আছে আমার। এসব পড়ে আমার ভালো লেগেছে। হিন্দুধর্মের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে, (আমি কিন্তু নিষ্ঠাবান মুসলমান, দিনে ৫বার নামাজ পড়ি না, তবে মন যখন চায় তখনে মাঝে-মধ্যে নামাজ পড়ি)। কিন্তু আপনার বইতে আপনি ১৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত জামালের বক্তব্যের জবাবে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম সম্পর্কে যা বলেছেন তা অসাধারণ। প্রতিটি হিন্দুর, অহিন্দুর সনাতন ধর্মের ভিত্তি বা জ্ঞান অর্জনের জন্য আপনার বইয়ের ১৫৭ পৃষ্ঠা থেকে ১৬০ পৃষ্ঠা পড়া একান্ত কর্তব্য।

২য়তঃ আপনার বইয়ের ১৮৬ পৃষ্ঠা থেকে ১৯০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিমলেন্দুর সাথে আপনার যে সংলাপ বা কথোকোপথন হয়েছে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে, সে প্রসঙ্গে আমার মতামত হচ্ছে–যদি বাংলাদেশে শতকরা ২০/৩০ ভাগ হিন্দু থাকতো তবে তাদের অবস্থাও ভারতের মুসলমানদের মত হোত, সব রাজনৈতিক দল তখন ভোটের জন্য ক্ষমতার জন্য হিন্দুদের তোয়াজ তোষণ করে চলতো। কিন্তু আজ বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্য শতকরা মাত্র দশ ভাগ যা খুবই নগণ্য, একশত জনের মধ্যে মাত্র দশ জন, সংখ্যায় খুব কম, এদের অবস্থা নড়বড়ে, শক্তিশালী নয়। ১৯৪৭ সনে আজকের বাংলাদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল শতকরা ৩০ ভাগ, ১৯৭০ সনে ছিল শতকরা ২০ ভাগ। ভারতে শতকরা ২০ ভাগ মুসলিম সম্প্রদায় আছে বলেই ভারতের রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিমদের তোয়াজ তোষণ করে চলেন। বাংলাদেশ থেকে ব্যাপকভাবে হিন্দুদের দেশত্যাগ করে ভারতে যাবার জন্যই আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের রাজনৈতিক দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তবে যা হবার তা হয়েছে, আজকের প্রবল সমস্যা পশ্চিম বাংলার ২ কোটিরও বেশী হিন্দুর বাংলাদেশে আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, বাংলাদেশের ৫০ লাখ মুসলমানের পশ্চিম বাংলা বা ভারতে আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। এদের সাথে রক্তের সম্পর্ক, দেখা-সাক্ষাৎ হওয়া খুবই জরুরী প্রয়োজন। অবাধে যাতায়াত থাকা দরকার। অথচ যাতায়াত করা খুব কঠিন কাজ, ভারত সরকার ভিসা দেবার ব্যাপারে আন্তরিক নয়। ভিসা পেতে খুব কষ্ট, সীমান্তে ভারতের নিরাপত্তারক্ষী, কাষ্টম ইমিগ্রেশনের লোকেরা খুব খারাপ ব্যবহার করে, বাংলাদেশের B.D.R. ডাকাতি করে ভারত থেকে যাত্রীরা এলে হিন্দু মুসলিম সবার মালপত্র মাঝে-মধ্যেই লুট করে নেয়। এসব নিয়ে পশ্চিম বাংলার রাজনৈতিক নেতাদের কথা বলা উচিত। বইয়ের কথা লিখতে গিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলে ধরলাম।

আপনার বইয়ের ৩য় বিষয় : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাড়ী দেখে ভিজিটার্স বুকে লিখেছেন, "হে বঙ্গবন্ধু তোমার স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন সফল করতে যে রক্তক্ষয়ী

www.pathagar.com

সংগ্রাম চলেছিল, এই ভারতীয় সামান্য সৈনিক সেই সংগ্রাম-সেতু বন্ধনের কাঠবিড়ালীর ন্যায় অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলো। সেই সৈনিকের জন্ম এই বাংলাদেশে, দুর্ভাগ্যের রূঢ় আঘাতে বাংলাদেশে এখন সে বিদেশী। বিদেশী হয়েও জন্মভূমির মুক্তিযুদ্ধে সামান্যতম অংশগ্রহণ করতে পারার জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তুমি আমার সালাম গ্রহণ করো।" এ বক্তব্য পড়ে আমার প্রাণে শিহরণ জাগে। জন্মভিটের টানে : বাংলাদেশ বইটি সুলিখিত প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবল আবেগ ও বুদ্ধি দিয়ে লেখা, একজন মানবদরদী লেখকের অনেক কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

এবারে বইটি প্রসঙ্গে বলতে চাই–বইটিতে সুখেন্দুর ভাষায় ঘটনা বর্ণনা না করে সুশীল রায়ের মুখ দিয়ে বর্ণনা করায়ে সন তারিখ বারের নাম উল্লেখ করে লিখলে মনে হয় আরও ভালো হতো, এতে বইয়ের বক্তব্যের স্বাক্ষী-প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার গ্রহণযোগ্যতা বেশী হতো। বাংলাদেশে যাদের বাড়ীতে থেকেছেন মিশেছেন মনে হয় তাদের আসল নাম ব্যবহার না করে অন্য নাম দিয়েছেন, যার ফলে বইটি পড়তে নিয়ে আমার বেশ সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

গত ১৩.০২.২০০৯ শুক্রবার দিল্লীতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল লছমন সিং-এর বাসায় দেখা করি সেখানে অবসর প্রাপ্ত লে. জেনারেল কাতপালিয়া সাহেব ছিলেন। ১৮.০২.২০০৯ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত লে. জেনারেল যোগিন্দার সিংহ বখশী সাহেবের বাসায় আমার ও আমার স্ত্রীর সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন, সেখানে জেনারেল লছমন সিং, জেনারেল কাতপালিয়া সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন। ওনারা আমার স্ত্রীকে ৩জনে প্রায় ৬০০০ টাকার মত উপহার প্রদান করেন (ড্রেস ও ক্রোকারিজ)। ১৯৭১ সনে জেনারেল লছমন সিংহ মেজর জেনারেল ছিলেন যোগিন্দার সিং ও কাতপালিয়া সাহেব ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। জেনারেল লছমন সিং রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, রাজশাহী ও বগুড়া জেলা মুক্ত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। আমি সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করি।

আমি গত ২৮.০২.২০০৯ তারিখে কলকাতা থেকে ট্রেনে ঢাকায় ফিরে আসি। ০৩.০৩.২০০৯ তারিখে ঢাকা থেকে আমার সিরাজগঞ্জ জেলার তামাই গ্রামের বাড়ীতে যাই। বৃন্দাবন থেকে কিছু প্রসাদ কিনে এনেছিলাম এবং কিছু বৃন্দাবনের মাটি এনেছিল আমার স্ত্রী, তা গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী হিন্দুদের দেবার জন্য। ১৫.০২.২০০৯ তারিখ তামাই থেকে ঢাকা আসি। জানি না আপনি এ চিঠি পাবেন কিনা। পেলেও জবাব দিবেন কিনা, কেন না নিজের চোখে দেখে এলাম আপনার লিখতে বেশ কষ্ট হয়। আপনি কি আমার বইয়ের ৩৭ পৃষ্ঠার শেখ হাসিনা সাইফুল হাদিস আজিজুল হক চুক্তি পড়েছেন? না পড়লে দয়া করে পড়বেন।

ইতি

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

ঢাকা

www.pathagar.com

তাং-০৭.০৪.২০০৯

কুনাল চট্টোপাধ্যায়

৪৬, রামলাল ব্যানার্জি রোড
কলকাতা

সম্মানিত কুনালবাবু,

আমার প্রণাম, নমস্কার ও ভালোবাসা জানবেন। গত ১০.০২.০৯ তারিখ মঙ্গলবার আপনার সাথে আমার কলকাতার বরাহনগরে "ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইন্সিটিটিউট"-এ দেখা হয় এবং আপনি কষ্ট করে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে আমাকে দুপুরের খাবার খাওয়ান।

আপনার সাথে দেখা করে ও কথা বলে আমার খুব ভলো লেগেছে, আপনার মত গুণবান মানুষের সান্নিধ্য পাওয়া আমার জন্য সৌভাগ্য। আপনার "একটুকরো ইউরোপ" প্রাণভরে বারে বারে পড়ছি আর মুগ্ধ হচ্ছি। অসাধারণ ভালো বই, অসাধারণ আপনার পাণ্ডিত্য ও আসাধারণ আপনার পড়ালেখা ও স্মৃতিশক্তি।

ভাই কুনাল, আপনি আমার '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই সম্পর্কে আপনার মতামত লিখে একটি লেখা দেবেন বলে আমাকে আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা কি আমি পাব? আপনার মত পণ্ডিত লোকের একটি লেখা পেলে এই অতীব ক্ষুদ্র লেখক খুব খুশী হবে। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায়, গৌরকিশোর ঘোষ, অশোক রুদ্র এনারা আর এ জগতে নেই, আমি অনেকটাই এতিম বা অনাথ, ওনাদের অবর্তমানে আপনিই আমার একমাত্র পশ্চিমবাংলার লেখক, যিনি আমার আশ্রয়। আমার ডায়াবেটিস রোগের অবস্থা ভাল নয়। বেশ কষ্ট দিচ্ছে, যার জন্য চিঠি দিতে দেরী হল। আপনাকে আবার আমার ভালোবাসা জানাই।

আপনার একান্ত আপনজন
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
এপ্যার্টমেন্ট নম্বর- এ/১২
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশে

www.pathagar.com

১১ মে ২০০৯

Dr. Kunal Chattopadhyay

Economic Research Unit
Indian statistical Institute
203 B T Road Kolkata

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

সুজনেষু,

আপনার সাত এপ্রিলে লেখা চিঠি যথাসময়ে আমার হাতে এসেছে। চিঠির আন্তরিক ভাষা আমাকে আপ্লুত করেছে। ডায়াবেটিস আপনাকে এতটা কাহিল করেছে জানতাম না। ঈশ্বরের কৃপায় অবশ্যই সুস্থ হবেন। আমার ঢাকা সফরে আপনার সঙ্গেঁ দেখা করতে না পারাটা অবশ্যই বিরাট অপ্রাপ্তি।

আপনার '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি আমি আদ্যন্ত পড়েছি এবং নিজের কলেজ জীবনের সেই ঝড়ো সময়কে খুঁজে পেয়েছি পরতে পরতে। মুক্তিযুদ্ধ-ইন্দিরা গান্ধির ভূমিকা; পশ্চিম বঙ্গের সিপিএম এর বাংলাদেশ যুদ্ধের বিরোধিতা । আপনার বই এর প্রতিটি লেখার মধ্যে দুটো বড় দিক প্রকাশ পেয়েছে। এক: গভীর দেশপ্রেম দুই: হিন্দু ধর্ম ও তার মহাকাব্য তথা সংস্কৃতি সাহিত্য সম্পর্কে এক নিবিড় শ্রদ্ধাবোধ, এই দুই গুণ আপনাকে একজন বাংলাদেশী বা বাঙালী নয় এই উপমহাদেশের মহান সন্তান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সিদ্ধার্থ শংকর রায় তথা মায়া দেবীর পূর্ব পুরুষের মুলুক সন্ধানে যত না আবেগ তার চেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মহার্ঘ সরলতা কম নেই ।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ থাকুন। ভবিষ্যতে দেখা হবে আশা রেখে শেষ করছি।

আন্তরিক শুভেচ্ছাসহ-

কুনাল চট্টোপাধ্যায়

www.pathagar.com

১৯৭১ এবং অজানা বাবলুকোষ

সাদাত উল্লাহ্ খান

(বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত আটটি গ্রন্থের লেখক)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কত ধরনের বই লেখা হয়েছে তার সঠিক কোনো ইতিহাস আমাদের সামনে নাই। তবে সম্প্রতি আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) রচিত '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা'; একটি ব্যতিক্রমধর্মী বই নিঃসন্দেহে। আমার জানা মতে, এমন ধরনের বই দ্বিতীয়টি কেউ আজ পর্যন্ত লেখার সাহস করেন নাই। এমন দৃষ্টান্ত বাংলা ভাষায় নাই। তবে কেউ যদি বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামার লেখা 'অডাসিটি অব হোপস-এর তুল্য বিচার করতে চান করতে পারেন−তবুও মনে হয় '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা'র যথার্থ মূল্যায়ন করা হবে কিনা আশংকা থেকেই যায়। কেমন করে এমন কথা একজন মানুষ লিখতে পারেন তাও নিশ্চিত গভীর ভাবনার বিষয়। বাবলু সাহেবকে অনেকে অদ্ভুত ধরনের লোক হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন, তবে তাঁর রচিত ব্যক্তিচরিত্র ও বাংলার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক ও সংলাপ অতীব হৃদয়গ্রাহী ও দার্শনিক মনোভাবসম্পন্ন। এমন বই আমি জীবনে আর পড়ার সুযোগ পাই নাই। বাবলু সাহেবের লেখায় যে একটা শিল্পীর দক্ষতা আছে, কথাশিল্পীর মুন্সিয়ানা আছে বাংলা গদ্যের যে কোনো চিন্তাশীল পাঠক চোখ খুললেই বুঝতে পারবেন। বাবলু সাহেব যদি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের পাহারাদার না হয়ে শুধু একজন গদ্য-লেখক হতেন তাতেও বিশেষ খ্যাতিমান হতেন−এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, পাঠক সমাজেরও সন্দেহ থাকবে না আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তাঁর এই বইটি পড়লে সহৃদয় পাঠক বুঝতে পারবেন বাবলু সাহেবের চেতনা ও ধারণা কত সংবেদনশীল ও দূরদর্শী। কত বাসনা ও স্বপ্ন থাকলে মানুষ এমন লেখা লিখতে পারেন, তাঁর এই বই পড়লেই অনুধাবণ করা যবে।

বাবলু সাহেব মহাত্মা গান্ধীর ভাবশিষ্য, তা তাঁর লেখাতে সহজেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তিনি যতসব খুঁটিনাটি কথা অবলীলায় লিখেছেন, তাতে গান্ধীজীর 'My experiment with truth' বইটির প্রভাব একশত ভাগ। যারা গান্ধীজীর এই বইটি পাঠ করেছেন তারা বিষয়টা তুল্য বিচার করে দেখতে পারবেন। তাঁর খোলামেলা বক্তব্য থেকে জীবিত অনেকে ব্রিবত হতে পারেন, মৃতরা তো মৃতই। জীবিতরা তো কেউ কেউ বলতে পারেন তাঁর এই বক্তব্য যথার্থ কিনা−হয়তো ইতিহাসই বলবে বাবলু খান কেমন করে এমন লেখা লিখতে পেরেছেন। নিজের মতো করে অপরকে বলার ক্ষমতা সবার থাকে না। কিন্তু সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে বলার সামর্থ ও যোগ্যতা তাঁর আছে। যে কোনো বিষয়কে প্রাসঙ্গিক করে তোলার একটা বিচক্ষণতা তাঁর আছে।

লেখক '১৯৭১ ও অনেজ অজানা কথা' বইটি পাঁচ ভাগে বিন্যস্ত করেছেন। যথা: প্রথম ভাগ : ১৯৭১, মুক্তিযুদ্ধ ও কয়েকটি প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগ : সেইসব বিরল ও অসাধারণ মানুষদের কথা, তৃতীয় ভাগ : চিঠিপত্র, চতুর্থ ভাগ : অভিমত, প্রতিবাদ ও

www.pathagar.com

দাবী এবং পঞ্চম ভাগ : ইংল্যান্ডের রাজা-রানী, ভারতের সম্রাট, গভর্নর জনারেলগণের নাম, ভ্রমণ ২০০৮ ও অন্যান্য রচনা। উল্লেখিত শিরোনাম থেকেই আমি বইটাকে '১৯৭১ ও অজানা বাবলুকোষ' আখ্যা দিয়েছি।

বইয়ের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ হলো এই বইয়ের মূল প্রাণ ও মূল বক্তব্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক হিসেবে তাজউদ্দিন আহমদ যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তা নানাভাবে বাবলু সাহেব বলার চেষ্টা করেছেন। তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রতি তাঁর যে একটা বিশেষ আকর্ষণবোধ কাজ করেছে তা এখানে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর লেখা থেকে দেখা যায় স্বাধীন বংলাদেশ তৈরিতে তাজউদ্দিনের অবদান যথার্থভাবে মূল্যায়ন করা হয় নাই–যতোটা তাঁর আন্তরিক মূল্যায়ন ইতিহাস দাবি করে। জনাব বাবলু সর্বদা ধর্ম বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করার পক্ষপাতী। তাঁর জীবনে হিন্দু-সংস্কৃতির একটা গভীর প্রভাব কাজ করে চলেছে–সেটা তাঁর বিভিন্ন লেখায় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বহুমুখী রাজনৈতিক বিবেচনাও গোপন থাকে নাই। তাই তিনি প্রকাশ্যে শেখ হাসিনা ও সাইখুল হাদিস আজিজুল হকের চুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন। বাবলু সাহেব তাঁর লেখা-বিন্যাসে কোনো সুস্পষ্ট ধারাক্রম অনুসরণ করেন নাই। তাতে অনেক সময় পাঠক খানিকটা হোঁচট খাবেন। এটা একটা অগোছালোপনার বৈশিষ্ট্য। বইটির প্রথম অধ্যায়ে বারবার ঘুরে-ফিরে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথা আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা সিনেমার কাহিনীর সাথে লেখক বাব-লুর একটা অসম্ভব সাদৃশ্য দেখা যায়। যেখানেই যাক বাবলু সাহেব একটা বিশেষ ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন। বাবলু সাহেবের জীবনের এটা এক বিশেষ দিক। তাই এই বইয়ের বিষয়বস্তুর অদ্ভুত সংমিশ্রণের মতো তার জীবনেও অদ্ভুত সব ঐতিহ্য রয়েছে। এটা সত্যিকার অর্থেই আকর্ষণীয় ব্যাপার। ইতিহাসের পাতায় পাতায় বাবলু সাহেবের বিচরণ–তাই মহান ব্যক্তিদের পাশে পাশে তাঁকে দেখা যায়। বইটির দ্বিতীয় ভাগে আছে খ্যাতিমানদের স্মৃতিকথা। এই ভাগে প্রথম লেখাটি হলো–'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাঁকে যেমন দেখেছি। দ্বিতীয় লেখাটি হলো–'স্মৃতির পাতায় মাওলানা ভাসানী' এবং পঞ্চম লেখাটি হলো– 'সব মানুষের প্রিয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী'। আর এই দ্বিতীয় ভাগের শেষ লেখা 'কবি আবুল হাসান'। যাক এই ভাগে দেখা যায়, বাবলুর যোগাযোগ কোথায় আছে আর কোথায় নাই। বঙ্গবন্ধুর সাথে তাঁর সংলাপ যে কোনো হৃদয়বান মানুষকে মুগ্ধ করবেই, এমনকি সাধারণ মানুষকেও নিশ্চিত বিমোহিত করবে। তাঁর বইয়ের প্রথম ভাগে একটি লেখার শিরোনাম 'বইয়ের নাম মহাভারত, প্লেটোর রিপাবলিক এবং আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ'। উক্ত তিনটি বইয়ের মাধ্যমে বাবলু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মর্মবাণীর সাথে নিজেকে গভীরভাবে পরিচিত করেছিলেন। এবং গান্ধীজীর সত্যের প্রয়োগ বাবলু খান নিজেও করেছেন। যেমন : বঙ্গবন্ধুর সাথে বাবলুর সংলাপ, মওলানা ভাসানীর সাথে সংলাপ, তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সংলাপ এবং কবি আবুল হাসানের সাথে সংলাপ। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় বইটির পঞ্চম ভাগের সর্বশেষ লেখা 'সলিমুল্লাহ খান বিষয়ক সংলাপ'। সিরাজগঞ্জের এক

www.pathagar.com

জনসভায় বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এখানে আমার বাবলু আছে-আপনাদের কোনো সময়ে কোনো অসুবিধা হলে ওর কাছে যাবেন, বাবলু আমাকে তা জানাবে, জয় বাংলা'। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব লেখাটি পড়লেই বোঝা যাবে বাবলুর সাথে বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কটা। আর কোথায় তাঁর এসব লেখার অদম্য সাহস। মওলানা ভাসানীর সাথে বাবলুর সংলাপ আরও গুরুতর। সেসব যেন এক অসম্ভব সম্ভব কর্মকাণ্ড। কারও কারও জীবনে এমন সুযোগ আসে বিশেষ বিশেষ সময়ে। আমাদের বাবলু খান হলেন বিশেষ সময়কার বিশেষ ব্যক্তি, যিনি বিরল ইতিহাসের নিরব পাহারাদার। নাকি ইতিহাসের বিশেষ অংশ? বাবলু খান সময়ের বয়ানদাতা বা চলমান ইতিহাসের অংশ, যে নামেই তাকে আখ্যায়িত করি না, কেন সে একজন স্বয়ং সাক্ষীকোষ।

মিজানুর রহমান চৌধুরীর সাথে বাবলু সাহেবের সংলাপ এই বইয়ের একটা শ্রেষ্ঠ সংলাপ। হয়তো বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক সংলাপ। একদিন ইতিহাস বিচার করবে। বাবলু সাহেব বলেছেন, 'মিজান ভাই আপনারা যাঁরা বড় মাপের মানুষ, তাঁরা খারাপ ও বদমায়েশ টাইপের লোকদের এত কাছে রাখেন, তাদের অনেক সুযোগ-সুবিধা দেন কেন?' এটা শুধু আপনার জন্য নয় স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব-সবার জন্যে প্রযোজ্য।

এবারে মিজান ভাই হাসলেন এবং বললেন, 'প্রথমে তোমার কথায় কিছুটা রাগ করেছিলাম, এখন তুমি যাঁদের নামের সাথে আমার নাম করলে তাতে খুব খুশি হলাম। শোনো যারা ভালো লোক তারা প্রখর অনুভূতিশীল হয়ে থাকে, তাদের দিকে কথা প্রসঙ্গে কোনোভাবে একটু খারাপভাবে তাকালেই তাদের ৬ মাস ১ বছর দেখা যায় না কিন্তু যারা খারাপ মানুষ, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যে আসে, তারা লেগে থাকে, গালি এমনকি লাথি মারলেও যায় না। তাই ভালো লোকেরা সুযোগ পায় না, খারাপ লোকেরা বড় নেতাদের কাছ থেকে সুযোগ পায়'। সুতরাং সাধু সাবধান।

২৪.০৭.২০০৯ দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

২৭.০৭.২০০৯

জনাব জামিলুর রেজা চৌধুরী

ভাইস চ্যান্সেলর, ব্রাক ইউনিভার্সিটি

শ্রদ্ধেয় জামিলুর রেজা চৌধুরী সাহেব

আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা জানবেন। আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, তবে আমার মনের পাতায় একজন সজ্জন মানুষ হিসেবে আপনি বিরাজিত রয়েছেন। বেশ কিছু সজ্জন ব্যক্তির কাছে শুনেছি যে, আপনার কাণ্ডজ্ঞান অনেক বেশী, ন্যায়বোধের দর্শন দ্বারা আপনি পরিচালিত ব্যক্তি। আর সে বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে আপনার কাছে আমি দুটি লেখা পাঠালাম, দয়া করে পড়ে দেখবেন এ বিশ্বাসে এবং লেখা দুটি পড়ে রমনা ময়দান সম্পর্কে আপনার স্বাধীন চিন্তা-ভাবনার মতামত দিয়ে কাজ করবেন সে আশা করে।

মহাপ্রভু ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের একটি বক্তব্য হচ্ছে যে, "পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে, মানবিক গুণ সম্পর্কে সত্যিকারের চেতনাবোধ সম্পর্কে মানুষ থাকে দুই-চার জন, আর দুই-চার মানবিক চেতনা বা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ কোটি কোটি মানুষকে পরিচালিত করে থাকেন।" বাংলাদেশের ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে যে দুই-চারজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ, তার মধ্যে আপনি মনে হয় একজন, তাই আপনার কাছে রমনা রেসকোর্স ময়দান নিয়ে আমার চিন্তা-ভাবনার দুটি লেখা পাঠালাম, দয়া করে লেখা দুটি পড়ে দেখবেন। পত্রিকায় দেখলাম স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের নামে ঢাকা শহরের প্রাণকন্দ্রে শত বছরের রমনা ময়না ধ্বংস করার কাজে আপনাকে প্রধান করে একটি কমিটি করা হয়েছে। আপনার নাম এ কমিটিতে দেখে সমুদ্রে দিকহারা নাবিক যেমন কোন সবুজ দ্বীপ দেখে খুশীতে আহ্লাদিত হয় আমিও তেমনি সেই দিকহারা নাবিকের মত আহ্লাদিত হয়েছি এই ভেবে যে, নিশ্চয়ই শুভবুদ্ধির জয় হবে সেই আশায়। এ চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ দয়া করে দিবেন কি?

আপনার গুণমুগ্ধ
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
এপ্যার্টমেন্ট নম্বর- এ/১২
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড
ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশে

www.pathagar.com

১৯৭৪ সনে গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে মেজর ডালিমের যা ঘটেছিল

মাহবুবউদ্দিন আহমেদ যাকে সবাই এসপি মাহবুব হিসেবে চেনেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের একজন বীর নায়ক, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৬৭ সনে পাকিস্তান সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের একজন অফিসার হন। ১৯৭১ সনের মার্চ মাসে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় এসডিপিও ছিলেন এবং তৌফিক এলাহী চৌধুরী মেহেরপুর-এর এসডিও বা মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। এসপি মাহবুব ও তৌফিক এলাহী চৌধুরী ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ তাজউদ্দিন আহমেদ ও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে ভারত সীমান্তে পৌঁছে দেন।

বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে ১৯৭১ সনের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার সময়ে মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে প্রথম গার্ড অব অনার প্রদান করেন এসপি মাহবুব-এর নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ ও আনসারের সদস্য। এদিক দিয়ে এসপি মাহবুব ভাগ্যবান ও ইতিহাসের এক শক্তিশালী স্থান দখন করে আছেন।

১৯৭২ সনে এসপি মাহবুব ঢাকা শহর পুলিশের এসপি, ১৯৭৪ সনে ঢাকা জেলা পুলিশের এসপি ছিলেন। ১৯৭৪ সনের ঢাকা জেলা মানে আজকের সম্পূর্ণ ঢাকা শহর, নারায়ণগঞ্জ জেলা, মুন্সীগঞ্জ জেলা, নরসিংদী জেলা, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ জেলা। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত এসপি মাহবুব ঢাকা শহর ও ঢাকা জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন অত্যন্ত শক্ত হাতে। ঐ সময়ে দুইজন পুলিশ অফিসারের অসাধারণ নাম ছিল একজন ই এ চৌধুরী অপরজন এসপি মাহবুব। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে ঘাতকরা এসপি মাহবুবকে গ্রেফতার করে জেলে রাখে অনেকদিন।

১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বাসা ও অফিসকক্ষে এবং বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম মনসুর আলী সাহেবের বাসা ও অফিসে মাহবুব ভাইয়ের সাথে আমার অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। আমি কোন সময়েই মাহবুব ভাইয়ের কাছে যাই নাই তার বাসা বা অফিসে, শুধুমাত্র একবার গিয়েছিলাম একটি অন্য ধরনের কাজে, তাও মনুসর আলী সাহেব ফোন করে দিয়েছিলেন সেই জন্য। আমাকে এসপি মাহবুব সাহেব খুব ভাল মানুষ মনে না করলেও কোনভাবেই খারাপ মানুষ মনে করেন এমন ধারণা পাই নাই।

আমার সাথে তার মোটামুটি বেশ ভাল সম্পর্ক। অনেকদিন পরে মাহবুব ভাইয়ের সাথে গত ০৯.০৮.২০০৯ইং তারিখ রোববার বাংলাদেশ সচিবালয়ে একজন অতিরিক্ত

www.pathagar.com

সচিব মোস্তফা মহিউদ্দিন ভাইয়ের রুমে হঠাৎ করেই দেখা হয়। যখন দেখা হয়, ঐ রুমে তখন আরও উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রপতির সাবেক সচিব ১৯৭৯ সন ব্যাচের বিসিএস অফিসার মোঃ সিরাজুল ইসলাম ও ইংরেজী পত্রিকার সাংবাদিক মনোয়ার ভাই এবং মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে অপর একজন।

০৯.০৮.২০০৯ ইং তারিখে আমি মাহবুব ভাইকে দেখে খুব খুশী হলাম এবং বললাম, মাহবুব ভাই অনেকদিন থেকে আপনার সাথে দেখা নাই, আমি খুব খোঁজ করছি আপনাকে, আগে আপনার বাসার ঠিকানা ও ফোন দেন। মাহবুব ভাই সাথে সাথে বাসার ঠিকানা ও ফোন নম্বর দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, " এবার বলো, তুমি কেন আমাকে খোঁজ করছ।" আমি বললাম, "ভাই আপনাকে একটা লেখা লিখতে হবে ইতিহাসের সত্য ঘটনার স্বার্থে, তা হচ্ছে ১৯৭৪ সনে গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে মেজর ডালিমের যে ঘটনা ঘটেছিল তা নিয়ে। কেননা, একমাত্র ঐ ঘটনার আপনিই সঠিক তথ্য জানেন, আমি যা জানি, তা ঐ রাতে আপনি বঙ্গবন্ধুকে যা বলেছিলেন তা থেকে শোনা, আমার স্মৃতিশক্তি এতোদিনে কমে যেতে পারে, তাছাড়া ঐ ঘটনা আপনি লিখলে যেভাবে মানুষ বিশ্বাস করবে, আমি লিখলে সেইভাবে বিশ্বাস করবে না, ভাই, ঐ ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশে নানা মিথ্যা মুখরোচক কথা প্রচারিত রয়েছে, দয়া করে সত্যের স্বার্থে আপনি একটি লেখা লেখেন।" জবাবে মাহবুব ভাই বললেন, "আমি লেখক না, তুমি লেখক, সাংবাদিক মানুষ, তুমিই এ বিষয়ে যা জান তা লেখ। আমি তোমার লেখায় কোন ভুল থাকলে তা ঠিক করে দেব, এবার তুমি বলো, তুমি ঐ ঘটনার কি জান?"

আমি বললাম, ১৯৭৪ সনে কোন এক রাতে বঙ্গবন্ধুর ৩২ নং ধানমণ্ডির বাসায় রাত দশটার পরে শেখ কামাল ভাইয়ের রুমে তিন তলায় ছাত্রলীগ নেতা মমতাজ হোসেন, সৈয়দ নুরুল ইসলাম, এবং আমি (আবু মোহাম্মদ খান বাবলু) বসে ঐ সময়ের রাজনীতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। এখানে উল্লেখ করতে চাই, প্রায় প্রতিরাতেই উপরে বর্ণিত আমরা কজন ছাত্রলীগ নেতা শেখ কামাল ভাইয়ের রুমে রাত দশটার পরে বসতাম। কামাল ভাই ছিলেন ঐ সময়ের ঢাকা নগর ছাত্রলীগের মূল নেপথ্য নেতা। এমন সময়ে হঠাৎ করে নিচে বেশ গোলমাল ও চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পাই, নীচে তাকিয়ে দেখলাম বেশ অনেকগুলো গাড়ী, এর মধ্যে পুলিশের গাড়ীও আছে, আমরা দ্রুত নীচে নেমে আসি, এসে দেখি আপনি (এসপি মাহবুব), গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেব এবং আরও বেশ অনেক লোক, এর মধ্যে মহিলাও অনেক এবং শুনলাম গাজী গোলাম মোস্তফার সাথে মেজর ডালিমের গোলমাল হয়েছে, রমনা থানা থেকে আপনি সাবইকে নিয়ে এসেছেন বঙ্গবন্ধুর কাছে।

তখন বঙ্গবন্ধু ঘুমিয়ে পড়েছেন, কেউ তাঁকে ডাকতে সাহস পাচ্ছে না। এদিকে পরিস্থিতি জটিল, তাঁকে ডাকতে হবে। অবশেষে কামাল ভাই বললেন, "বাবলুকে আব্বা খুব ভালবাসে, বাবলু তুই দরজায় শব্দ কর। আমি প্রথমে রাজী হই না, কামাল ভাই বলেন, "দেখ আমি দরজায় শব্দ করলে আব্বা রেগে গিয়ে দুই চারটা চড়-থাপ্পড় মারবে, কিন্তু তোকে শুধু গালাগালি করবে, চড়-থাপ্পড় মারবে না, তুই দরজায় শব্দ কর।"

www.pathagar.com

আমি বলি, "আপনি আমার সাথে থাকেন, যদি বঙ্গবন্ধু আপনাকে চড়-থাপ্পড় মারতে নেন আমি আপনার সামনে যাব, যাতে আমার গায়ে তা লাগে।" এরপর শেখ কামাল ভাই ও আমি দরজার সামনে গিয়ে দরজায় শব্দ করি, বঙ্গবন্ধুর ঘুম ভেঙ্গে যায়, তিনি খুব বিরক্তি প্রকাশ করে দরজায় কে জানতে চান, আমি বলি, লিডার কামাল ভাই আর আমি বাবলু। দরজা খুলে ভীষণ জোরে বঙ্গবন্ধু চিৎকার করে ওঠেন, "কি চাও?" দরজা খোলার সাথে সাথে কামাল ভাই আড়ালে সরে যান। দরজায় শব্দ করে তাঁর ঘুম ভেঙে দেবার জন্য খুব বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। এরপর বলেন, "কি হয়েছে?"

এবার আমি বলি, "গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেবের সাথে মেজর ডালিমের গোলমাল হয়েছে এসপি মাহবুব ভাই গাজী সাহেব ও মেজর ডালিমসহ অনেক লোক নিচে এসেছেন, আপনার সাথে দেখা করতে চায়।" বঙ্গবন্ধু সজোরে ঐ সময়ে যেসব কথা বলেছিলেন তার একটি হলো, "এরা যা শুরু করেছে তাতে আমাকে বেশিদিন বাঁচতে দেবে না। যাও নিচে গিয়ে পিএকে বলো, সফিউল্লাহ ও জিয়াউর রহমানকে খবর দিতে, এখনই যেন ওরা চলে আসে, ওরা এলে আমাকে খবর দিতে বলবা, আমি নিচে আসবো"। বেশ কিছুক্ষণ পর সফিউল্লাহ ও জিয়াউর রহমান সাহেব চলে আসেন, এবার বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে এলে ডালিমের বউ বঙ্গবন্ধুর পা ধরে কান্নাকাটি ও গালাগালি শুরু করে। বঙ্গবন্ধু তাকে থামান এবং আপনার কাছে জানতে চান মাহবুব কি হয়েছে? তখন আপনি (এসপি মাহবুব) বলেন, "ঢাকা ক্লাবে গাজী সাহেবের এক ভাইয়ের সাথে (আপন নয়) মেজর ডালিমের আপন ছোট বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছিল, সেখানে গাজী সাহেবের এক ছোট ছেলে ক্লাশ ফাইভ/সিক্সে পড়ে, সে ডালিমের এক শ্যালক কানাডা থেকে এসেছে, তার মাথার লম্বা চুল ধরে টান দিয়ে বলে যে, লম্বা চুল রাখছেন কেন? দেশে আর্মি নেমেছে, লম্বা চুল দেখলে চুল কেটে দেয়।" এতে ডালিমের শ্যালক খুব বিরক্ত হয়, গাজী সাহেবের ছেলেকে গালাগালি দেয় ও দৌড়ে গিয়ে ওর মা গাজী সাহেবের স্ত্রীর কাছে আশ্রয় নেয়। সেখানে ডালিম গিয়ে গাজী সাহেবের ছেলেকে বলে, হারামজাদা তুই আমাকে চিনিস, তোকে শায়েস্তা করে ছাড়ব, আমি তোর জন্মদাতা বাপ।" এ কথা শুনে গাজী সাহেবের স্ত্রী বিরক্ত হন এবং বলেন, "তুমি এমন বেয়াদব, আমার সামনে আমার ছেলেকে তুমি তার জন্মদাতা বাপ হিসেবে পরিচয় দাও।" এ কথা বলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে চলে গিয়ে গাজী সাহেবের কাছে নালিশ করেন। গাজী সাহেব আওয়ামী লীগ অফিসে ছিলেন, সেখান থেকে তিনি কয়েকজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে সাথে নিয়ে ঢাকা ক্লাবে বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে মেজর ডালিমের হাত ধরে টেনে গাড়িতে তোলেন, ডালিমের স্ত্রী বাধা দিলে তাকেও গাড়ীতে টেনে তুলে রমনা থানায় নিয়ে গিয়ে ওসিকে বলেছেন, ৩০৭ ধারায় (এটেম টু মার্ডার) মামলা নিতে। রমনা থানার ওসি আনোয়ার আমাকে খবর দেয়, আমি রমনা থানায় এসে ডালিমকে গালাগালি করি এবং গাজী সাহেবকে অনুরোধ করি মামলা না দেবার জন্য, কিন্তু গাজী সাহেব মামলা দায়ের করার জন্য অটল থাকেন, সেই জন্য আপনার কাছে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি, আপনি যা বলেন, তাই হবে।"

www.pathagar.com

তখন বঙ্গবন্ধু প্রথমে গাজী গোলাম মোস্তফাকে পরে মেজর ডালিমকে খুব কড়া ভাষায় গালাগালি করেন এবং মেজর ডালিমের মাকে বলেন, "ভাবী একটি শুভ কাজের মধ্যে অশুভ ঘটনা ঘটে গেল যা খুবই দুঃখজনক। আমার প্রচণ্ড মাথাব্যথা ও ঘুমের ওষুধ খেয়েছি, তা না হলে আমি অবশ্যই যেতাম, আমি যেতে পারছি না, আমার পক্ষ থেকে সফিউল্লাহ ও জিয়া বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছে, ওদের ভালভাবে খাইয়ে দিবেন। এতো রাতে বিয়ের খাবার তো মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, আর তা থাকলেও তা নষ্ট হবার কথা, যদি খাবার না থাকে পাশেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল. ওখান থেকে খাবার এনে সফিউল্লাহ ও জিয়াকে খাওয়াবেন।"এই বলে বঙ্গবন্ধু দোতলায় যান। আপনি (এসপি মাহবুব) সবাইকে নিয়ে আবার চলে যান।"

মাহবুব ভাই এবার আপনি বলেন, "আমি যা বললাম তার মধ্যে কোন মিথ্যা কথা আছে কিনা, আমার স্মৃতিশক্তি ঠিক আছে না নষ্ট হয়েছে?" এবারে মাহবুব ভাই বললেন, "বাবলু তুমি যা বললে এর মধ্যে কোন মিথ্যা বা সামান্য ভুল নাই, তোমার স্মৃতিশক্তি সম্পূর্ণ ঠিক আছে।" তারপরেও আমি তাকে বললাম, "আমার চেয়ে বিষয়টি যদি আপনি লেখেন তা হলে ভাল হয়।" মাহবুব ভাই জবাবে বললেন, "তুমি যা বললে তা লিখে আমার কাছে নিয়ে আস, আমি সার্টিফিকেট দিয়ে দেব যে, বাবলু যা লিখেছে তার মধ্যে কোন ভুল বা মিথ্যা কথা নাই।" এবার মাহবুব ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তৌফিক এলাহী চৌধুরী তো আপনার জানি দোস, এখন তিনি পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, সম্পর্ক কি আগের মতোই আছে?" মাহবুব ভাই বললেন, "অবশ্যই আছে।"

কিছুক্ষণ পর মাহবুব ভাই অতিরিক্ত সচিব সাহেবের রুম থেকে চলে গেলেন, এবার ইংরেজী ভাষার সাংবাদিক মনোয়ার ভাই বললেন, "বাবলু আপনি অসাধারণ একটি ঘটনা শোনালেন, খুব মনোযোগ দিয়ে আমি আপনার কথা শুনছিলাম। এবারে বঙ্গবন্ধুর বাসার ঐ রাতের আরও কিছু ঘটনার কথা এখানে সংযোজন করতে চাই শেখ জামালকে নিয়ে। শেখ জামাল ১৯৭৪ সালে ঢাকা কলেজের আইএ ক্লাশের ছাত্র, আমার জুনিয়র, আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা কলেজের ফুটবল টিমের ম্যানেজার। শেখ জামাল ঢাকা কলেজ ফুটবল টিমের একজন শক্তিশালী খেলোয়াড়। আমি প্রায় প্রতিদিন কামাল ভাইয়ের সাথে ৪/৫ ঘণ্টা সময় কাটাই, তাছাড়া মমতাজ ভাই, সৈয়দ নূরুল ইসলাম এই কয়জন শেখ কামাল ভাইয়ের প্রিয় ও বিশ্বস্ত ছিলাম। জামাল আমাদের সবাইকে খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। কিন্তু ঐ রাতে জামাল আমাদের সবার সাথে খুব তর্ক করলো, মেজর ডালিমের পক্ষ নিয়ে, আমরা সবাই কামাল ভাইসহ গাজী গোলাম মোস্তফা সাহেবের পক্ষে, কিন্তু জামাল মেজর ডালিমের পক্ষে, সে বললো, ডালিম আমার জীবন বাঁচিয়েছে লন্ডনে সিনেমা হলে, পাকিস্তানীরা আমাকে মারতে আসে, ডালিম জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আমাকে রক্ষা করে, ডালিম আহত মুক্তিযোদ্ধা ইত্যাদি অনেক কথা। জামাল ঐ রাতে আমাদের বলে, গাজী গোলাম মোস্তফা রিলিফের কিছু মালামাল মনে হয় আপনাদের দেয়, যার জন্য আপনারা এতো

www.pathagar.com

গাজী গোলাম মোস্তফার পক্ষে। এ কথা স্মরণ করে আমি অবাক ও বিহ্বল হয়ে যাই যে, যে জামাল মেজর ডালিমের পক্ষে আমাদের কাছে এতো কথা বললো বা ডালিমের পক্ষ নিয়ে ঝগড়া করলো, সেই ডালিম কি করে শেখ জামাল ও তার মা-বাবা-ভাইকে হত্যা করতে পারলো? মেজর ডালিম মানুষ নামে এক ঘৃণ্য জীব।

এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পরে ডালিমের ছয়জন মেজর বন্ধু গাজী গোলাম মোস্তফা ও এসপি মাহবুবের বাসা আক্রমণ করে তছনছ করে, যার জন্য ঐ ছয় মেজরের চাকরী যায়। তবে এটা আমার নিজের দেখা কথা নয়, শোনা কথা। আর ১৯৭৫ সনের ১৪ই আগস্ট রাতে একজন ব্রিগেডিয়ার ঐ ছয়জন চাকরিচ্যুত মেজরের গায়ে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে আবার সামরিক পোশাক পরিয়ে দেন বলে পড়েছি কর্নেল রশিদ ও কর্নেল ফারুকের দেওয়া জবানবন্দিমূলক কয়েকটি লেখায়।

এখানে আরও একটি কথা যোগ করতে চাই তা হচ্ছে ০৯.০৮.২০০৯ রোববার সচিবালয়ে অতিরিক্ত সচিবের কক্ষে মাহবুব ভাইকে বলি যে, আমি জেঃ সফিউল্লাহ সাহেবকে বলি যে, ১৯৭৪ সনের বঙ্গবন্ধু বাসায় ঐ রাতে আপনাকে দেখেছি, আপনি ও জিয়া সাহেব খবর পেয়ে এসেছিলেন। জবাবে সফিউল্লাহ সাহেব বলেন, না আমি ছিলাম না, বঙ্গবন্ধু আমাকে ডাকেন নাই, জিয়াকে ডেকেছিলেন।

জবাবে মাহবুব ভাই বললেন, "যেহেতু সফিউল্লাহ সাহেব সেনাবাহিনীপ্রধান ছিলেন, তার কমান্ডের ফৌজ মেজর ডালিম এই ধরনের আচরণ করে, যা অপ্রত্যাশিত, কাজেই সফিউল্লাহ সাহেব এ বিষয় এড়িয়ে চলতে চান। ঐ রাতে অবশ্যই সফিউল্লাহ সাহেব বঙ্গবন্ধুর বাসায় ছিলেন। আমি, সফিউল্লাহ ও জিয়া ঐ বাসা থেকে ঢাকা ক্লাবে গিয়েছি।

১০.০৮.২০০৯ইং
প্রিন্স টাওয়ার, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা

সময় : ৬-৩০ মিঃ বিকাল

www.pathagar.com

জনাব খালেদ শামস্, সাবেক সিএসপি

জনাব খালেদ শামস্ ১৯৬২-৬৩ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সনে পাকিস্তানের সুপিরিয়ার সার্ভিস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সিএসপি অফিসার হন। বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে চাকরী করে স্বেচ্ছায় চাকুরী ছেড়ে ১৯৯৪ সনে গ্রামীণ ব্যাংকে ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। তিনি গ্রামীণ ফোনেরও চেয়ারম্যান ছিলেন। ২০০৮ সনে গ্রামীণ ফোন ও গ্রামীণ ব্যাংক ত্যাগ করে বর্তমানে পূর্ণ অবসরে আছেন। ১৮. ৮. ২০০৯ তারিখে মঙ্গলবার সকালে রমনা পার্কে মর্নিং ওয়াক করার সময়ে আমার সাথে দেখা হলে জনাব খালেদ শামস্ বলেন, "বাবলু আপনার লেখা '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি, খুব ভালো লেগেছে, অনেক কথা অনেক বিষয়ে লিখেছেন। আমি মনে করি এ বইটি অনেক লোকের পড়া দরকার, তাই আপনার বইটি আমি গ্রামীণ ব্যাংকের লাইব্রেরীতে দিয়েছি, যাতে আরও অনেক মানুষ আপনার লেখা বইটি পড়তে পারে। গ্রামীণ ব্যাংকের কয়েকজন কর্মকর্তাকেও আপনার বইটি পড়তে বলেছি।"

১৮.৮.২০০৯, মঙ্গলবার

www.pathagar.com

ভারত ভ্রমণ ০৭.০২.০৯ থেকে ২৮.০২.০৯
কলকাতা, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, কলকাতা নবদ্বীপ, কলকাতা, ঢাকা

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইটি চারজন ব্যক্তির নামে উৎসর্গ করেছি। এই চারজনের একজন হচ্ছেন সুখময় দত্ত । তিনি এখন কলকাতার সল্ট লেকে বসবাস করেন। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চীফ জেনালের ম্যানেজার হিসেবে চাকরী করে রিটায়ার করেছেন। এই সুখময় দত্ত সাহেব ঢাকায় ছিলেন ১৯৯০ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঢাকা শাখার প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকতা হিসেবে। সুখময় দত্ত সাহেব যখন ঢাকায় ছিলেন আমাকে খুব স্নেহ করতেন, খুব ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে ১৯৯১ সনে ৫ লাখ টাকার লোন দেন গাজীপুরের চান্দুরাতে জায়গা কিনে গোদুগ্ধ খামার বা ডেয়ারী ফার্ম করার জন্য। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ায় আমার কোন ব্যাংক একাউন্ট ছিল না, আমি মৌখিক বা লিখিতভাবে সুখময় দত্ত সাহেবের কাছে কোনো লোন চাইনি, অথচ তিনি আমাকে পাঁচ লাখ টাকার লোন দিলেন। এই টাকা দিয়ে গাজীপুর জেলার চান্দুরাতে ৯০ শতক জায়গা ক্রয় করে ১৯৯১ সন থেকে গরুর খামার করি, তারপর ১৯৯৮ সন থেকে ২০০৩ সন পর্যন্ত পোল্ট্রি ফার্ম করি। এখন সেখানে ঘর করে দিয়েছি, অনেক মানুষ ভাড়া থাকে। এই আয় দিয়ে আমি ঢাকায় বাসা ভাড়া করে মান-সম্মান নিয়ে বেঁচে আছি। মোটকথা সুখময় দত্ত সাহেব আমার জীবনে এক বিশাল উপকার করেছেন, তাকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি। সুখময় দত্ত সাহেবকে দেখার জন্য তাড়না বোধ করি, মাঝে মধ্যে ছটফট করি। আর সুখময় দত্তকে দেখতে হলে কলকাতায় যেতে হয়। এছাড়া কলকাতা শহরের একটি তীব্র টান তো আছেই।

২০০৮ সনে ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস স্মরণে ঐ সময়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন উ আহমদ একটি বড় ধরনের ভালো কাজ করেছেন, তাহলো ১৯৭১ সনের আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দশজন ভারতীয় সেনা সদস্যকে ঢাকায় আমন্ত্রণ করেন। লে. জেনারেল জ্যাকবের নেতৃত্বে দশজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্য ঢাকা বা বাংলাদেশে আসেন। এর মধ্যে মেজর জেনারেল লছমন সিং, লে. জেনারেল যোগিন্দার সিং বকশি, লে. জেনারেল কাত পালিয়া, মেজর জেনারেল আর কে খান্না, মেজর জেনারেল অশোক ভারমা, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আর কে এস পানোয়ার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পি এন বেকার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল অমরিত কাপুর। ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে হঠাৎ করেই আমার সাথে তাদের দেখা হয়। মেজর জেনারেল লছমন সিং আমাকে দিল্লীতে তার বাসার ফোন নম্বর দেন। ১৯৭১ সনে আমি

www.pathagar.com

নীলফামারীর সীমান্তে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে যুদ্ধ করেছি। জেনারেল লছমন সিং রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা জেলার সমস্ত ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর প্রধান বা জেনারেল কমান্ডিং অফিসার ছিলেন। আমার পরিচয় পেয়ে জেনারেল লছমন সিং, জেনারেল যোগিন্দার সিং খুব খুশী হলেন। তারা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে আমাকে সাথে নেন ১৯৭১ সনে রমনা রেসকোর্স ময়দান, আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে, যেখানে জেনারেল অরোরা, জেনারেল জ্যাকবসহ ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকসেনা বাহিনীর কমান্ডার জেনালের নিয়াজী সারেন্ডার করেছিলো, সে জায়গাটি দেখিয়ে দেবার জন্য। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের দ্বারা তারা সুরক্ষিত ছিলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সদস্যরা কেউ তাদের সাথে কথা বলতে আপত্তি করেনি। কিন্তু ভূঁইফোর বা ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধা আক্কু চৌধুরী আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে তাদের সাথে কথা বলার জন্য। যাক যেখানে সারেন্ডার করেছিল সে চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে প্রথমে শিশু পার্ক করে পরে গাছ লাগিয়ে, তারপরে স্বাধীনতা স্মৃতিস্তম্ভ করার নামে স্থাপনা সৃষ্টি করে। আমি জেনারেল জ্যাকবকে দেখিয়ে দিলাম এইখানে চেয়ার-টেবিল দেয়া হয়েছিল সারেন্ডার অনুষ্ঠানের জন্য। জেনারেল জ্যাকব বিশ্বাস করলেন না। তিনি বললেন, যেখানে সারেন্ডার অনুষ্ঠান হয় সেখানে বিশাল খোলা জায়গা ছিল, আমাকে গার্ড অব অনার দেয়া হয়। এটা সে জায়গা নয়। আমি জেনারেল লছমন সিং স্যারকে বললাম উদ্দেশ্যমূলকভাবে এখানে শিশুপার্ক এবং গাছ লাগানো হয়েছে স্বাধীনতাযুদ্ধের এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কৃতিত্বকে মুছে দেবার জন্য। তিনি আমার কথা শুনে কপালে জোড়ে আঘাত করলেন এবং একটু পরে জেনারেল জ্যাকবকে ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন, "জেনারেল কোথায় তোমার সারেন্ডারের জায়গা, যা নিয়ে তুমি গর্ব করো?" জেনারেল জ্যাকব খুব লজ্জিতভাবে বললেন, মালুম নেহি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, জেনারেল অরোরা, জেনারেল জ্যাকব, জেনারেল লছমন সিং ১৯৪১ সনে একসাথে বৃটিশ সেনাবাহিনীর অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। আমি তাদের সাথে পরিচিত হয়ে ধন্য হই এবং তাদের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হবার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়ি। কিন্তু তারা থাকেন দিল্লীতে, দিল্লী অনেক দূরে, দেখা করা খুব কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার।

যাক, অবশেষে ২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসে সিদ্ধান্ত নিই কলকাতা ও দিল্লী যাবো। সুখময় দত্ত সাহেব, সৌবির ভট্টাচার্যের সাথে কলকাতায় দেখা করবো। কলকাতা শহরের গড়ের মাঠ, হাওড়া ব্রিজ, মেট্রোরেল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, পার্ক স্ট্রীট এলাকা আবার দেখবো, দিল্লীতে যাবো, জেনারেল লছমন সিং, জেনারেল যোগিন্দার সিং, জেনারেল কাতপালিয়া, ভবানী সেনগুপ্ত, আই. কে. গুজরাল সাহেবের সাথে কথা বলবো, দিল্লির হুমায়ন টম্ব, ইন্ডিয়া গেট, কুতুব মিনার দেখবো, খাজা নিজামউদ্দিনের মাজার ও জামে মসজিদে নামাজ আদায় করবো। এছাড়াও এক বছর হলো ঢাকা-কলকাতা ট্রেন সার্ভিস চালু হয়েছে। এর আগে ৫/৬ বার কলকাতায় গিয়েছি বিমানযোগে, একবার ২০০৪ সনে বাসযোগে, ট্রেনে কলকাতা যাবার প্রবল

www.pathagar.com

ইচ্ছে।

অবশেষে শনিবার ৭ই ফেব্রুয়ারি ০৯ ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন কেবিন বা বাথ ক্লাশে চড়ে রওনা দিলাম সকাল ৮.৩০ মিনিটে। এর আগে আমার পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ ছিল, স্ত্রীর নতুন পাসপোর্ট করা, ডলার কেনা, ভারতীয় হাইকমিশন থেকে ভিসা করা এবং কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে দুইজনের জন্য ১৯২০ টাকা দামের দুটো টিকিট ৩৮৪০ টাকায় কিনেছি। আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার খুকনী ও রূপনাই থেকে ২০টি ভালো তাঁতের শাড়ী কিনেছি পরিচিতজনদের দেবার জন্য, ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইয়ের ৩০ কপিও সাথে নিলাম, পরিচিতজনদের দেবার জন্য। ৭. ২. ২০০৯ শনিবার ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে মৈত্রী ট্রেন ছাড়লো। বেলা ১২টায় কিছুক্ষণ ঈশ্বরদীতে বিরতি ২.৩০ মিনিটে দর্শনা, দর্শনাতে কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন চেক, ৩০ মিনিটের মতো সময় লাগলো, বাকী সময় বসে থাকো।

৪.৩০ মিনিটে দর্শনা থেকে ট্রেন ছেড়ে ৪.৩৫ মিনিটে ভারতের সীমান্ত স্টেশন গেদেতে পৌঁছালো। গেদেতে ভীষণ কষ্ট। প্রথম হচ্ছে ট্রেন থেকে অনেক নীচে কাস্টমস এবং ইমিগ্রেশনের ব্যবস্থা, সমস্ত বোঝা নিয়ে সেখানে যেতে হয়, কোন কুলি নেই। নিজেই বোঝা বহন করতে হয়। ইমিগ্রেশন এবং কাস্টমস চেক খুব কড়া। খারাপ ব্যবহার করে দুই একজন কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন কর্মী। কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন ফর্মালিটি শেষ হবার পরে একটি বড় খাঁচার মতো ঘরে যাত্রীদের বিনা কারণে আবদ্ধ করে রাখে, যা খুবই বিরক্তিকর। শত শত বিএসএফ পুলিশ দেখে ভয় হয় এবং ৭-৩০ মি. পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ৭.৩০ মিনিটে ট্রেন গেদে ছেড়ে শনিবার রাত ৯-৩০ মিনিটে কলকাতার চিৎপুর রেল স্টেশনে পৌঁছি।

চিৎপুর থেকে ১৫০ রুপিতে একটি ট্যাক্সি নিয়ে মারকুইজ স্ট্রীট-এ খাবার হোটেল দাওয়াতে এসে ব্যাগ এবং স্ত্রীকে রেখে হোটেল দেখতে গেলাম, হোটেল ২১শে রুম নিলাম ৪৫০ রুপিতে, পুরোনো বাড়ী যার জন্য রুম বেশ বড়। হোটেলে গিয়ে সব রেখে হাত-মুখ ধুয়ে হোটেল দাওয়াতে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম ৭.২.২০০৯ শনিবার রাতে।

৮.২.২০০৯ রোববার ঘুম থেকে উঠে আমার প্রিয় গড়ের মাঠ এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মর্নিং ওয়াক করে হোটেলে ফিরে এসে গোসল করে স্বামী-স্ত্রী হোটেল দাওয়াতে নাস্তা খেয়ে চললাম সল্ট লেকে সুখময় দত্ত সাহেবের বাসার উদ্দেশে ১৫০ রুপি ট্রাক্সি ভাড়া দিয়ে। ইচ্ছে করেই ফোন করে যাইনি, আমাকে স্ত্রীসহ দেখে অবাক হয়ে গেলেন, এই প্রথম স্ত্রীকে দেখলেন, ২০০৪ সনে আমি অবিবাহিত ছিলাম। তখন একা কলকাতা গিয়েছিলাম। বললেন, "এইভাবে ফোন না করে আসতে হয়?" আমি বললাম, "আমি এভাবে আসতেই মজা পাই, তাই ফোন করে আসি নাই। ঘণ্টা দুয়েক থেকে বেলা ১২টার দিকে গেলাম গোলক মুজমদার সাহেবের বাসায়, দত্ত সাহেবের সল্টলেকের বাসার খুব কাছে। গোলক মুজমদার ১৯৭১ সনে ভারতের বিএসএফ-এর

www.pathagar.com

পূর্বাঞ্চল জোনের (বাংলা, আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম ইত্যাদি প্রদেশ) আইজিপি ছিলেন। ১৯৭১ সনের ৩০শে মার্চ তাজউদ্দিন আহদ ও ব্যরিস্টার আমিরুল ইসলামকে কুষ্টিয়া সীমান্ত থেকে গ্রহণ করে কলকাতায় নিয়ে যান, বিএসএফ-এর ডিজি, ইন্ধিরা গান্ধীর স্বামী ফিরোজ গান্ধীর নিকট আত্মীয় খুসরো রুস্তমজীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। ১৯৭১ সনের এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খুসরো রুস্তমজী, গোলক মুজমদার, তাজউদ্দিন আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর মালামাল-বহনকারী একটি বিমানে দিল্লীতে গিয়েছিলেন। মিসেস ইন্ধিরা গান্ধীর সাথে খুসরো রুস্তমজী দেখা করার ব্যবস্থা করে দেন। তাজউদ্দিন সাহেবের কাছ থেকেই ইন্ধিরা গান্ধী পূর্ব-বাংলা বা বাংলাদেশের এত ঘটনা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সম্পর্কে প্রথম জানতে পারেন বলে মিসেস গান্ধী ভারতীয় পার্লামেন্টে ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের ভাষণে উল্লেখ করেন। (পড়ে দেখুন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্ট ২য় খণ্ড)।

কাজেই গোলক মুজমদার সাহেবের বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিরাট অবদান আছে, উনি মানুষ হিসেবে খুব ভাল। ১৯৮৭ সন থেকে ওনার সাথে পরিচয়, কলকাতায় গেলে গোলক মুজমদার সাহেবের সাথে দেখা করি, ওনার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করি। গোলক মুজমদার সাহেবের সাথে কথা বলে বেলা দেড়টায় সুখময় দত্ত সাহেবের বাসায় এসে দুপুরের খাবার খাই। সেখান থেকে যাই লাবণীতে সৌবীর ভট্টাচার্য সাহেবের বাসায়, সৌবীর ভট্টাচার্য ১৯৯০ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঢাকা শাখার ম্যানেজার (ক্রেডিট) ছিলেন। খুব ভালো মানুষ, ২০০৭ সন পর্যন্ত স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে চাকরী করে রিটায়ার করেছেন। খুবই প্রাণবন্ত মানুষ, তিন ভাই সবাই ৭০০ বর্গফুটের একটি ফ্ল্যাটে বসবাস করেন, কি সাত্ত্বিক মানুষ সৌবীর বাবু, ভাবতেই শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়। ৩ ভায়ের স্ত্রী অসুখে মৃত্যুবরণ করেছেন। এদের সবচেয়ে বড় ভাইয়ের বয়স ৬২ বছর, খুব দুঃখজনক ব্যাপার তিন ভায়ের মাত্র একটি ছোট ছেলে এবং একটি মেয়ে, দুজনেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী। সৌবীর বাবুর কলকাতা শহরতলীতে ৪ কাঠা জায়গা ছিল, তাও ২০০৮ সনে বিক্রী করে দিয়েছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের সব অনুষ্ঠানে যান। আমাকে স্ত্রীসহ দেখে খুব খুশী হলেন। এই সুখময় দত্ত ও সৌবীর ভট্টাচার্য নিটল টাটা মটরস-এর মতলুব সাহেবকে সাধারণ একজন ব্যবসায়ী থেকে শত শত কোটি টাকার মানুষ বানিয়ে গিয়েছেন, টাটা কোম্পানীর বাস, মিনিবাস ঢাকায় প্রবেশ করিয়ে গিয়েছেন। মতলুব সাহেব ছাড়া আরও ২০/২৫ জন মানুষকে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার ঢাকা শাখার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার মানুষ বানিয়ে গিয়েছে, সৌবীর ভট্টাচার্য, সুখময় দত্ত।

সৌবীর সাহেবের বাসা লাবণীতে ৫টা পর্যন্ত থেকে সেখান থেকে গেলাম দমদমের গোরা বাজার দুর্গাবাড়ী রোডে আমার মায়ের চাচাতো বোন পেয়ারা খালার স্বামী আমার খালু হালিম সাহেবের বাল্য ও স্কুল জীবনের বন্ধু লেঃ কর্নেল সুশীল রায়ের বাসায়। সুশীল রায় এবং হালিম সাহেব দুজনেই বরিশালের ভাণ্ডারিয়া থানার দক্ষিণ ভাণ্ডারিয়া

www.pathagar.com

গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত একসাথে পড়েছেন। ১৯৫১ সনে ভাণ্ডারিয়া বিহারী লাল ইনস্টিটিউট থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন। সুশীল রায় কলকাতায় চলে যান, ১৯৫৩ সনে আইএ পাশ করে সুশীল রায় ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অফিসার হিসেবে যোগদান করেন, ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন, ঢাকা থেকে বন্দী পাকসেনাদের ভারতে নিয়ে যাবার কাজের দায়িত্ব পালন করেন।

সুশীল রায়ের বাসাতে সন্ধ্যের সময় উপস্থিত হলাম, অসুস্থ মানুষ, হাত কাঁপে। আমাকে দেখে খুশী হলেন। টেলিফোনেই বলেছিলাম বরিশালের আপনার বন্ধু হালিম সাহেব আমার মেসো বা খালু হন। আমি সুশীল রায় সাহেবকে আমার লেখা '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটা দিই। তিনি তার লেখা "জন্মভিটের টানে বাংলাদেশ সেকাল ও একাল" নামে বইটি আমাকে দেন।

সুশীল রায়ের বাড়ী থেকে দমদমে দক্ষিণপাড়া সত্যজিৎ গাঙ্গুলীর বাসায় যাই, দু'জনের বাড়ী দমদম হলেও সুশীল রায়ের দমদমের বাসা থেকে সত্যজিৎ গাঙ্গুলীর দমদমের দক্ষিণ পাড়ার বাসার দূরত্ব অনেক। ১৫০ রুপি টেক্সী ভাড়া, যেতে সময়ও লাগে, ছোট-খাটো জ্যামসহ দেড় ঘণ্টার মত। সত্যজিৎ গাঙ্গুলীর এখন বয়স ৩৫ বছরের মত, সে ঢাকার বঙ্গবন্ধু নভোথিয়েটারের পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব পালন করেছে জাপানের গোটো অপটিক্যাল ম্যানুফাকচারিং কোম্পানীর পক্ষে। ঢাকার নভোথিয়েটার চালুর আগে থেকে সে ঢাকায় আসে, যেদিন চালু হয় তার পরেও ঢাকায় ছিল ২ বছর। মোটকথা সত্যজিৎ গাঙ্গুলীই ঢাকার নভোথিয়েটার দু বছর চালায় বাংলাদেশের লোকজনকে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছে, এর পরেও কয়েকবার এসেছে নভোথিয়েটার সার্ভিসিং করার কাজে। সত্যজিৎ খুব ভালো মানুষ, অসাম্প্রদিয়ক এবং অনেক জানা-শোনা। সত্যজিৎ-এর বাসায় উপস্থিত হলাম প্রায় রাত সাড়ে আটটায়। সত্যজিতের বাবা মৃত, তিনি এ্যাডভোকেট ছিলেন, মা ইতিহাসে এমএ। সত্যজিত গাঙ্গুলির বাসায় পরিচয় হলো দেশবন্ধু ভট্টাচার্যের সাথে, সে সত্যজিতের শ্যালক, একটি প্রতিষ্ঠিত প্রাইভেট ব্যাংকের তরুণ অফিসার। তুখোড় ছেলে, ভীষণ তেজী, অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান, সত্যজিতের বাসায় রাত ১১.৩০ মিঃ পর্যন্ত থাকলাম, ডিনার খেলাম, আমি শুধু ডাল-ভাত খেলাম, ওরা খুব হতাশ হলো, অনেক কিছুর ব্যবস্থা করেছে। এবার টেক্সীতে সত্যজিতের শ্যালক দেশবন্ধু আমাদের সাথে হোটেল পর্যন্ত এলো, দেশবন্ধু হিন্দু জাতীয়তাবাদের প্রচণ্ড সমর্থক এবং খুব প্রাণবন্ত মানুষ। আমাকে অবাক করে সে মারকুইজ স্ট্রিট হোটেলে এসে ২৫০ রুপি ট্যাক্সী ভাড়া দিলো। প্রচণ্ড বাধা দিলাম কিন্তু কোনক্রমেই সে ভাড়া না দিয়ে ছাড়বে না। কলকাতার বাঙালীদের যারা কিছুটা জানেন, তারা তো জানেন তারা টাকা-পয়সা খরচের ব্যাপার কত হিসেবি, চার আনা পয়সার জন্য প্রয়োজনে দুঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকে ভাংতি পেলে তবে যাবে। সেই কলকাতার হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক দেশবন্ধু ভট্টাচার্য আমাদের স্বামী-স্ত্রী দুজন মুসলমানের ট্যাক্সী ভাড়া ২৫০ রুপি জোর করে দিলো। এটা আমার কাছে বেশ বিস্ময়ের ব্যাপার।

www.pathagar.com

ভারত গমণ

ভারতে বিদেশীদের জন্য ঐতিহাসিক স্থান যেমন আগ্রার তাজমহল, কুতুব মিনার, ফতেপুর সিক্রি, সেকেন্দ্রা, হুমায়ুন টম্ব দেখার জন্য ভারতীয়দের দিতে হয় ১০ রুপি আর বাংলাদেশি-পাকিস্তানীদের দিতে হয় ৫৫০ রুপি, ২০০/৩০০ রুপি। মার্কসবাদ বা সিপিএম এর সমর্থক সত্যজিৎ গাঙ্গুলী এই অন্যায় নিয়ম সমর্থন করে এর পক্ষে বক্তব্য দেয়, কিন্তু বিজেপির বা হিন্দু জাতিয়তাবাদের একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক তরুণ যুবক দেশবন্ধু ভট্টাচার্য সত্যজিতের শ্যালক এই নিয়মকে হিংসুটে ও অসভ্য নিয়ম বলে উল্লেখ করে বিদেশী অতিথিদের সাথে হিন্দু ঐতিহ্য মতো ভালো এবং সদাচরণ করার পক্ষে বলে এবং ভারতের লোকদের চেয়ে বিদেশীদের কাছ থেকে পঞ্চাশ ভাগ কম ফি নেওয়া উচিৎ বলে মন্তব্য করে।

দেশবন্ধু ভট্টাচার্য চলে গেলো, আমরা মারকুইজ স্ট্রীটের হোটেল ২১শেতে রুমে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, ৮.২.২০০৯ রোববার।

৯.২.২০০৯ সোমবার বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলি থানার চুপি থেকে সকাল ১০টার মধ্যে শম্ভু, ওর ফুপাতো ভাই বাবাইসহ চলে আসে আমাদের কাছে, ফোন করেছিলাম যে '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' দুটি বই নিয়ে যাবার জন্য, একটি শম্ভুর বাবা দিলীপ মৈত্র, অন্যটি চুপির লেখক সাংবাদিক ডাক্তার দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য।

ওরা এসে বলে, কাকু স্নান না করলে চলবে না, খুব অসুবিধা হচ্ছে। ওরা আমাদের হোটেলের রুমে স্নান করলো, আমি বললাম, আমি যাচ্ছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নাতনী (ছেলের মেয়ে) মিসেস অদিতি মুখার্জী ও তাঁর ভাই পশ্চিম বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায় মহাশয়ের সাথে দেখা করতে। একথা শুনে ওরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো এবং প্রবলভাবে অনুরোধ করলো ওদের দুজনকে সাথে নিয়ে যাবার জন্য। ট্যাক্সী চেপে মারকুইজ স্ট্রীট থেকে চললাম ভবানীপুর এলাকায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নফর কুণ্ডু রোডের বাড়ীতে মিসেস অদিতি মুখার্জীর সাথে দেখা করার জন্য। মিসেস্ অদিতি মুখার্জীর ছেলে টেনিস খেলোয়াড় জয়দেব মুখার্জী, মেয়ের জামাই ঢাকায় ১৯৯০ সন থেকে ১৯৯৪ সন পর্যন্ত ভারতের হাইকমিশনার ছিলেন, কৃষ্ণান শ্রীনিবাসন, তামিলনাডুর লোক। অসাধারণ ভালো মানুষ। ১৯৯০ সনে ঢাকায় আমাকে কোটিপতি বানাবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আমার গাফিলতি ও ভুলের জন্য তার সে সৎ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শ্রীনিবাসনের বাবার বাড়ী তামিলনাডু বা মাদ্রাজে, নিজে বাড়ী করেছেন দিল্লীতে এবং লন্ডনে; কিন্তু তিনি থাকেন কলকাতায়। কলকাতা নাকি দুনিয়ার সবচেয়ে ভালো শহর তাঁর মতে। লন্ডন, দিল্লী, মাদ্রাজ যখন দরকার পড়ে তখন যান, বিনা প্রয়োজনে এবং অবসরের জন্য থাকেন কলকাতায়। কৃষ্ণান শ্রীনিবাসন সাহেব ভারতের পররাষ্ট্র সচিব ও কমনওয়েলথের ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন।

মিসেস অদিতি মুখার্জীর সাথে দেখা করে আলাপ করলাম। আমার বই দিলাম, তার কাছে শুনলাম শ্রীনিবাসন সাহেব তার পাশের ফ্ল্যাটেই থাকেন, তাঁর কাছ থেকে তার

www.pathagar.com

ফোন নম্বর নিলাম, তখন তিনি বাসায় ছিলেন না। অদিতি মুখার্জীর বাসা থেকে খুব কাছে বেলতলা রোডে গেলাম পশ্চিম বাংলার সাবেক মুখ্যমন্ত্রী, ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী (৬০-এর দশকে) পাঞ্জাবের সাবেক সফল গভর্নর সিদ্ধার্থশংকর রায়ের সাথে দেখা করার জন্য। নীচে থেকে খবর দিলে, জানালেন শেভ করছেন। বাংলাদেশের মানুষ, সেজন্য মাত্র ২ মিনিট সময় দিলেন। উপরে চারজন গেলাম, সালাম করলাম, মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে পরিচয় দিলাম, ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালাম। বাবাই ও শম্ভুকে পরিচয় করিয়ে দিলাম। বর্ধমানের খুব উঁচুবংশের ব্রাহ্মণসন্তান, আপনাকে দেখার জন্য প্রবাল আগ্রহ দেখালো, তাই নিয়ে এসেছি। উনি জোক কর বললেন, "ব্রাহ্মণরা কিন্তু ভারতের অনেক ক্ষতি করেছে"। আমি বললাম স্যার ভারতবর্ষ আজ যেখানে এসেছে, যত উন্নতি হয়েছে তাতে সবচেয়ে বেশী অবদান ব্রাহ্মণদের। তিনি আমার কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন, হ্যাঁ এটাও ঠিক, আপনি সত্য কথা বলেছেন। '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটা তাকে দিলাম। মিসেস মায়া রায় বসে ছিলেন, পার্শ্বে সিদ্ধার্থশংকর বাবুর ছোট ভায়ের স্ত্রীও বসে ছিলেন। মায়া রায় তার স্ত্রী এবং ব্যারিস্টার তার বাবার কথা নাটোর অধ্যায়ে লেখা আছে তা দেখলাম, তিনি পড়ে আমার উপরে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলেন, "কি আজেবাজে লিখেছেন, সব মিথ্যা কথা লিখেছেন" ইত্যাদি মন্তব্য করলেন। আমি কঠিন ও দৃঢ়ভাবে বললাম আমি আপনাদের বিষয়ে একবিন্দু মিথ্যা কথা লিখি নাই, যা লিখেছি একশত ভাগ সত্য। ব্যারিস্টার মায়া রায় তার ছোট বোন ব্যারিস্টার ছায়া রায়কে ডাকলেন তাড়াতাড়ি চলে আসবার জন্য, তিনি আমার বইয়ে নাটোরে, তাদের পরিবারের কথা যেখানে লেখা রয়েছে, সেটা দেখালেন, তিনিও তার বড় বোনের মতোই মন্তব্য করে উঠে গিয়ে ঘর থেকে একটি হাতের লেখা পুরানো কাগজ নিয়ে এসে আমার লেখার সাথে মিলিয়ে দেখে চীৎকার করে বলে ওঠেন, "একেবারে ঠিক লিখেছেন, কারেক্ট লিখেছেন, ধন্যবাদ।"

নাটোরের প্রয়াত রাজনীতিবিদ মানবতাবাদী মানুষ শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরীর স্ত্রী আর মায়া রায়, ছায়া রায় আপন চাচাতো বোন। একথা আমার কাছে শুনে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাহেব খুব দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "৫ বার যে লোক বাংলাদেশের এমপি হয়েছিলেন তার এত নিকট আত্মীয় অথচ তার সাথে দেখা হয় নাই, শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরীর জন্য তিনি কয়েকবার খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। ২ মিনিটের সময় দিয়েছিলেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সাহেব। জমকালো আলোচনায় এক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে, দাড়ি অর্ধেক কামানো রয়েছে। এবার আমরা চলে এলাম। টেক্সী ধরে নিউমার্কেটের কাছে হোটেল আমিনিয়ায়, বিখ্যাত হোটেল আমিনিয়ায় চারজনে লাঞ্চ খেলাম আমরা, স্বামী-স্ত্রী, শম্ভু ও বাবাই।

লাঞ্চ খেয়ে ছবি প্রিন্ট করার জন্য স্টুডিওতে যাই। জিডিটাল ক্যামেরায় তোলা ছবি। সিদ্ধার্থশঙ্কর ও তার দিদি অদিতি মুখার্জীর ছবি ভালো এসেছে, আর সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শম্ভু ও বাবাই বর্ধমান চলে গেলো। আমরা হোটেলে এসে আবার সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের বেলতলার বাসায় গেলাম সন্ধ্যায়। কেননা ২.৯.০৯ তারিখে ব্যারিস্টার মায়া রায়ের ৮২তম জন্মদিন, তার জন্মদিনে তাকে একটি সিরাজগঞ্জের তাঁতের শাড়ী উপহার

www.pathagar.com

দিয়ে আসি। সেখান থেকে ফিরে রাতের খাবার খেয়ে হোটেলে ঘুমিয়ে পড়ি। সোমবার ৯.২.২০০৯ তারিখে।

১০.২.২০০৯ মঙ্গলবার। কৃষ্ণান শ্রীনিবাসন সাহেব সময় দিয়েছেন ১০.২.২০০৯ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ১০টা থেকে ১১টা। ১০টায় শ্রীনিবাসন সাহেবের সাথে দেখা হয়। ১৯৯৪ সনের পরে প্রথম দেখা হলো, উনি চিনতে পারলেন এবং খুশী হলেন। আমার সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, "১৯৯৮ সন থেকে পরিবর্তন বের হয় না।" উনি বললেন, "আমি বাংলা পড়তে পারি না, কিন্তু তোমার পরিবর্তন আমার স্ত্রী এবং স্ত্রীর অনেক আত্মীয় খুব আগ্রহ নিয়ে পড়তো। হাই কমিশনের সব বাঙালী অফিসারও তোমার পত্রিকার প্রশংসা করতো, তুমি আবার তোমার পত্রিকা বের করো।" আমি বললাম, "স্যার পত্রিকা বের করতে শরীরে অনেক তেজ থাকা দরকার। আমার বয়স এখন ৫৫, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত, পত্রিকা করার মত অর্থ এবং শারীরিক ও মানসিক জোর আর আমার নাই, আর ১৬ বছর পত্রিকা চালিয়েছি, আমি ক্লান্ত। শ্রীনিবাসন সাহেবের সাথে ১১টা পর্যন্ত কথা বললাম। তিনি তার ইংরেজীতে লেখা বৃহৎ সাইজের সুন্দর বই Jamdani Revulation আমাকে দিলেন এবং বললেন, "তুমি ও বেলাল চৌধুরী যৌথভাবে বইটি পড়বে এবং বেলাল চৌধুরীকে অবশ্যই দেবে।" আমি জামদানী রেভুলেশন পড়ে মুগ্ধ হয়েছি, বইটি অনুবাদ করে ছাপাবার আমার ইচ্ছে আছে, যাতে বাংলাশের পাঠকরা বইটি পড়তে পারে। বইটি ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীনিবাসন সাহেবের ঢাকার ডাইরী। অনেক ঘটনা ও কথা যেখানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ, সেই সব জায়গার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

১১টা পর্যন্ত শ্রীনিবাসন সাহেবের সাথে দেখা ও কথা বলে তার শাশুড়ী মা মিসেস অদিতি মুখার্জীর সাথে আজ আবার দেখা করলাম। গতকালের তোলা ছবি দেখালাম, একটি ছবি তিনি রেখে দিলেন। ১২টার দিকে সেখান থেকে ভবানীপুর মেট্রো স্টেশন থেকে রেল-যোগে যাই দমদম, সেখান থেকে ইন্ডিয়ান স্টাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউশনে লেখক কুনাল কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাথে দেখা করতে। তাকে আমার বই দিলাম, তিনি তার একটি বই 'একটুকরো ইউরোপ' আমাকে দিলেন। দুপুরে তিনি হোটেলে লাঞ্চ খাওয়ালেন। সেখান থেকে ফিরে এসে হোটেলে বিশ্রাম নিলাম বেলা ৪টায় ১০.২.২০০৯ মঙ্গলবার।

১১.২.০৯ বুধবার। শিপ্রা আদিত্য দত্তের খোঁজে বের হলাম সকালের নাস্তা খেয়ে ১৯৮৫ সনে দেওয়া তার ঠিকানা অনুযায়ী ৩২নং গণেশ এভিনিউতে। গণেশ এভিনিউ ব্যবসায়িক বা কমার্শিয়াল এলাকা। এত উন্নত ও এত বড় গণেশ এভিনিউ এলাকা আগে ৬/৭ বার কলকাতা এসে না দেখার জন্য বেশ আফসোস হলো। অনেক খোঁজ করার পর ৩২ গণেশ এভিনিউ পেলাম কিন্তু এড এইড নামক কোন বিজ্ঞাপনী সংস্থার খবর পেলাম না, মেজাজ খারাপ হলো। চললাম শিপ্রাদির দেওয়া (১৯৮৫ সনে) প্লট নং ১১, ব্লক-ই, এলআইজি হাউজিং স্টেট, মুরারী পুকুর ঠিকানায়। গণেশ এভিনিউ থেকে

www.pathagar.com

অনেক দূরে, ২০০ রুপী ট্যাক্সী ভাড়া। সেখানে গিয়ে শুনলাম শিপ্রা আদিত্য দত্ত এখানে থাকেন না। অনেকদিন হলো থাকেন গড়িয়ার স্বামী বিবেকান্দ পার্কের কাছে। সেখান থেকে তার ফোন নম্বর নিয়ে ফোনে কথা বলে চললাম, গড়িয়া অঞ্চলে স্বামী বিবেকানন্দ পার্কের কাছে শিপ্রাদির বাসায়। অনেক খুঁজে, অনেক কষ্ট করে ৫০০ রুপির ট্যাক্সি ভাড়া খরচ করে তার বাসায় উপস্থিত হলাম। কিন্তু আমার কাছে ৫০০ রুপির নোট, ট্যাক্সি ভাড়া ২০০ রুপি মুরারী পুকুর থেকে, ভাড়া দিতে পারি না, ভাংতি নেই, খুব খুঁজছি, এমন সময় এক ফ্লাটের চার তলা থেকে পঙ্গু এক তরুণী মেয়ে বলল, "আপনি অপেক্ষা করুন, আমি ওপর থেকে ভাংতি দিচ্ছি।" পঙ্গু মেয়েটি চার তলা থেকে রশি দিয়ে ছোট একটি ডালা বেঁধে ১০০ রুপির ৫টি নোট নামিয়ে দিলো, আমি ডালাতে ৫০০ রুপির একটি নোট দিলাম, কৃতজ্ঞতায় মনটি ভরে গেল। শিপ্রাদির বাসায় গিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলাম তাকে খোঁজার জন্য গণেশ এভিনিউ এবং মুরারী পুকুর থেকে এখানে আসা এবং মোট ৫০০ রুপির ট্যাক্সি ভাড়া দেয়াসহ সব কথা বলি। তিনি আমার ৫০০ রুপি ট্যাক্সি ভাড়ার কথা শুনে বললেন, "তুমি এত কষ্ট করে আমাকে ৫০০ রুপি ট্যাক্সিভাড়া দিয়ে দেখতে এসেছো, আমি তোমাকে ১০০০ রুপি দিচ্ছি। এক হাজার রুপি দেবার জন্য শিপ্রাদি খুব জোড়াজুড়ি করলেন, আমি নিলাম না। শিপ্রাদির এমন ব্যবহার পেয়ে সব কষ্ট দূর হয়ে গেলো, আনন্দে মন ভরে গেলো। তিনি বললেন, "১৯৮৫ সনের পরে তিনি ১০ বছর লন্ডন ছিলেন। বছর ৫ আগে লন্ডন থেকে কলকাতায় এসেছেন এবং এই ফ্ল্যাট কিনেছেন। শিপ্রাদিকে ২০০৭ সনের ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন থেকে প্রকাশিত ভারত বিচিত্রার একটি সংখ্যা দিলাম। ঐ সংখ্যায় শিপ্রাদির কথার উল্লেখ ছিল। যেসব চিত্রশিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে শিপ্রা আদিত্যের প্রশংসার সাথে নাম। ২০০৭ সনের সংখ্যা যত্ন করে রেখে দিয়েছিলাম। ভারত বিচিত্রার সংখ্যাটি পেয়ে শিপ্রাদি খুব খুশী হলেন। আমার বই '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' দিলাম। বইয়ে তার প্রকাশিত চিঠি দেখালাম। তিনি খুব খুশী হলেন। শিপ্রাদি আমার চেয়ে ৭ বছরের বড়। তিনি খাবার জন্য জোড়াজুড়ি করলেন। আমি বললাম, "আমাকে এক্ষুনি যেতে হবে, আজই বিকালে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে দিল্লী যাচ্ছি।" শিপ্রাদি বললেন, দিল্লী থেকে এসে অবশ্যই যেন তার সাথে যোগাযোগ করি এবং বাসায় ১/২ বার লাঞ্চ ডিনার খাই। শিপ্রাদির বাসা থেকে মারকুইজ স্ট্রীট হোটেলে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে ৩:৩০-এ হোটেল ছেড়ে শিয়ালদহ রেল স্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরার জন্য চললাম ১১. ২.০৯ বুধবার।

(এই পর্যন্ত লেখার তারিখ ২১.৮.০৯ শুক্রবার।)

১২.০২.২০০৯ বৃহস্পতিবার রাজধানী এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে সকাল ১১.৩০ মিনিটে নতুন দিল্লীর রেল স্টেশনে পৌঁছি। দিল্লী রেল স্টেশনের কাছে পাহাড়গঞ্জে হোটেল ড্রীমল্যান্ডে উঠি। দুপুরের খাবার খেয়ে বেলা তিনটার দিকে হুমায়নের সমাধি দেখতে যাই। এর আগে কয়েকবার দিল্লী গিয়েছি কিন্তু হুমায়নের সমাধি দেখা হয় নাই। এবারে হুমায়নের সমাধি দেখে মুগ্ধ হলাম এবং আগে না দেখার জন্য আফসোস করলাম।

www.pathagar.com

ক্যাটরিনা নামে একজন বিশ বছর বয়সের খুব সুন্দরী জার্মান মেয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম বর্ষে পড়ালেখা করে জার্মানীতে, সে হুমায়নের মাজার দেখতে এসেছে একা, দিল্লীতে তার বন্ধু চাকরী করে, তার ওখানে উঠেছে। তার সাথে কথা বললাম। হুমায়নের মাজার দেখে পায়ে হাঁটার পথ অতিক্রম করে দিল্লীতে খাজা বাবা নিজামউদ্দিনের মাজারে যাই, মাজার জিয়ারত করি, মাজারের মসজিদে আসরের নামাজ পড়ি, আসরের নামাজ পড়ে কাওয়ালী শুনি, এক ফাঁকে কাশ্মীরের কয়েকজন মুসলিম মহিলা এসেছে মাজার জিয়ারত করতে, তাদের একজন সুন্দরী যুবতী মেয়ের সাথে কথা বলি। সে দিল্লীতে আইনের ২য় বছরের ছাত্রী। কথা প্রসঙ্গে বললাম, আমার ছোট দু ভাই এবং এক বোন ঢাকায় এ্যাডভোকেট। এক ফাঁকে কাশ্মীরের সুন্দরী ২য় বছরের আইনের ছাত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম কাশ্মীরের স্বাধীনতা আন্দোলন সে সমর্থন করে কিনা। সে বললো, শুধু আমি না কাশ্মীরের প্রায় সব মুসলমানই কাশ্মীরের স্বাধীনতা চায়। আমি বল্লাম, যদি কাশ্মীর স্বাধীন হয় তখন কিন্তু দিল্লীতে এবং এই খাজা নিজামউদ্দিনের মাজারে সহজে আসতে পারবে না, আমাদের মত অনেক কষ্ট করে আসতে হবে, পাসপোর্ট ভিসা ডলার ক্রয়–অনেক কষ্ট ও অনেক ঝামেলা। এসব না থাকলে বাংলাদেশ থেকে আরও অনেক মুসলমান খাজা নিজামউদ্দিনের মাজার দেখতে আসতো। আমার একথা শুনে সে চিন্তা করলো কিন্তু কোন জবাব দিলো না।

মাগরিবের নামাজ খাজা নিজামউদ্দিনের মসজিদে পড়ে, পার্শ্বে মির্জা গালিব একাডেমী দেখলাম। প্রচণ্ড প্রস্রাবের চাপে এসেছিলো। মির্জা গালিব একাডেমীর টয়লেটে প্রস্রাব করে হোটেলে ফিরে এলাম, ডিনার খেয়ে হোটেলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৩.২.২০০৯ শুক্রবার। সকালে সস্ত্রীক নাস্তা খেয়ে দিল্লীর মেট্রো রেলে ভ্রমণ করার জন্য বের হয়ে পড়লাম। হোটেল থেকে আজমেরী গেট পর্যন্ত রিক্সায় এসে আজমেরী গেট স্টেশনে নিচে নেমে পড়লাম। সেখান থেকে টিকেট কেটে রাজীব চক স্টেশন পর্যন্ত। এখানে নেমে রাজীব চক স্টেশন থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেশনে নেমে পড়লাম। একজন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইন্দ্রপ্রস্থে দেখবার মত কি আছে? সে জবাব দিলো, ইন্দ্রপ্রস্থে কিছুই দেখবার মত নাই, কর্মাশিয়াল এলাকা, অফিস এবং শিল্পকারখানা। তার একথা শুনে তবু লিফট দিয়ে সবার সাথে নিচে নেমে স্টেশনের বাইরে চলে এলাম। এলাকাটা ভালই মনে হলো। স্ত্রী ফুচকা খেলো রাস্তার ধারে গাছতলার এক দোকানে। ফুচকা খাওয়া শেষ হলে আবার ইন্দ্রপ্রস্থ মেট্রো রেলের স্টেশনে এসে লিফট দিয়ে উপরে উঠে কাউন্টারে টিকিট বিক্রেতাকে বললাম ৩০ মিঃ যাওয়া ও ৩০ মিঃ আসা মোট ১ ঘণ্টা যাতে মেট্রোতে থাকতে পারি এবং আজমেরী গেট স্টেশনে ফিরে আসতে পারি, এমনভাবে আমাকে টিকিট দেন ২টি। সে হিসেব করে ১০টাকা ১০ টাকা ২০ টাকা, দুজনের ৪০ রুপির টিকিট দিলো এবং বললো ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে জানকীপুরী স্টেশনে নেমে সেখান থেকে ফিরতি ট্রেনে উঠে রাজীবচকে নেমে আজমেরীগঞ্জ ট্রেনে ওঠার জন্য তার কথামত ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে ১৩.২.২০০৯ শুক্রবার জানকীপুরী স্টেশন পর্যন্ত গেলাম, জানকীপুরী নেমে ফিরতি মেট্রো ট্রেনে উঠলাম, প্লাটফরম বদল করে রাজীবচক স্টেশন

www.pathagar.com

নেমে আজমেরীগঞ্জ আসবার জন্য। ট্রেনে এক ভদ্রলোক হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলেন কোথায় যাব? পাহাড়গঞ্জ আরকানসাস রোডে হোটেলে যাব শুনে বললেন, রাজীবচক আজমেরী গেটে যাবার দরকার নেই, রামকৃষ্ণ স্টেশনে নেমে যাবেন। সেখান থেকে আপনার হোটেল খুব কাছে, আশপাশের আরও কয়েকজন তার কথা সমর্থন করলো। সে অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মেট্রো রেল স্টেশনে নেমে পড়লাম। আসলেই দেখলাম এখানে নেমে অনেক পথ সহজ হলো। দিল্লীর মেট্রো রেল অসাধারণ সুন্দর। দৈনিক লক্ষ লক্ষ মানুষ ভ্রমণ করছে দিল্লী মেট্রো রেলে, খুব আরামদায়ক, দেখতে খুব সুন্দর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। স্বামী-স্ত্রী খুব মজা পেলাম দিল্লীর মেট্রো রেলে ভ্রমণ করে। রামকৃষ্ণ স্টেশনে নেমে লাভ হলো। দিল্লীর রামকৃষ্ণ মিশন, বেশ সুন্দর দিল্লীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন এলাকা, ভিতরে যাইনি, বাইরে থেকে যা দেখলাম তাই ভালো লাগলো। রামকৃষ্ণ মিশন থেকে খুব অল্প দূরে পাহাড়গঞ্জে আমাদের হোটেল, রিক্সায় চলে এলাম, ১০ রুপি ভাড়া নিলো, যেটা ৫ রুপির বেশী হওয়া উচিত নয়।

হোটেলে এসে স্ত্রীকে হোটেলে রেখে দিল্লীর জামে মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য রওনা হলাম। অটোরিক্সা বা সিএনজি যোগে। নামাযে যাবার সময় খুব ভয় পেলাম। আমি পেছনে পিঠ হেলান না দিয়ে বসতে পারি না, এমন জায়গা পাব কিনা, না পেলে কি হবে। দিল্লীর জামে মসজিদ খুব বড় না, মাত্র ৫টি কাতার হয় মসজিদের ভিতরে, কিন্তু মসজিদের সামনে অনেক জায়গা, প্রায় ৬ হাজার লোক নাকি নামাজ পড়ে, আমি মসজিদের বাইরে সুন্নাত চার রাকাত পড়লাম, এরপর সামনে দেখলাম মাঝে মধ্যে ২/৪টি খুটি রয়েছে বিদ্যুৎ ও সামিয়ানা টানাবার জন্য। আমি একটি খুটির কাছে গিয়ে যিনি খুটি হেলান দিয়ে রয়েছে তাকে বললাম ভাই আমার পায়ে ব্যথা, আমি হেলান না দিয়ে বসতে পারি না, দয়া করে আমাকে খুটির জায়গাটা দিলে খুব খুশী হই। আমার চেয়ে কম বয়সী ও আমার মতই মোটা ভদ্রলোক সাথে সাথে তার জায়গা ছেড়ে দিলেন, আমি খুটির সামনে বসে খুটির সাথে পিঠ লাগিয়ে আজান ও খুতবা শুনে দিল্লীর জামে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়লাম ১৩.২.২০০৯ তারিখ শুক্রবারে। খুশীতে প্রাণ ভরে গেলো। নামাজ শেষে মসজিদের ভিতরে গিয়ে কিছু সময় বসে থাকলাম এবং ঘুরে মসজিদ ভালোভাবে দেখলাম।

নামাজে যাবার সময়ে দেখলাম হাতের ডান পাশে মওলানা মহিউদ্দিন আহমদ আবুল কালাম আজাদের মাজার। সাথে সাথে নীচ থেকে উপরে উঠে গেলাম। মাজার জিয়ারত করলাম। মওলানা আজাদের মাজার জিয়ারত করার সুযোগ পেয়ে যারপর নাই খুশী হলাম। মাজার জিয়ারত করে মসজিদে যাই জুম্মার নামাজ আদায় করার জন্য। জুম্মার নামাজ শেষে ফেরার পথে ১৫০ রুপি দিয়ে একটি কেটস্ জুতা ক্রয় করি ফুটপাত থেকে। শরীর বেশ খারাপ, খাবারে খুব অরুচি, বমি বমি ভাব। এর মধ্যে দেখলাম রাস্তার পাশে মসজিদের সামনে বিরানী বিক্রী করছে। অনেক লোকের কাছে শুনেছি দিল্লীর জামে মসজিদের আশ পাশের বিরানী খুব স্বাদের, দিল্লীর জামে মসজিদের আশপাশের এলাকার বিরানী না খেলে নাকি জীবন বৃথা। সেকথা মনে করে অসুখ

www.pathagar.com

শরীরেও ২০ রুপির এক প্লেট বিরানী খেলাম মহিষের মাংশের। আমার কাছে মোটেই ভালো মনে হলো না, অতিরিক্ত তেলের ছড়াছড়ি।

হোটেলে ফিরে এসে স্বামী-স্ত্রী দুপুরের খাবার খেয়ে কিছু বিশ্রাম নিলাম এবং ৪টার সময়ে রওনা দিলাম জেনারেল লছমন সিং-এর বাসার উদ্দেশ্যে সোমবিহার আবাসিক এলাকায়। ১৩.২.০৯ তারিখ ৫টার সময় লছমন সিং সাহেব আমাদের সময় দিয়েছেন তার বাসায় যাবার জন্য। জেনারেল লছমন সিং ১৯৪৩ সনে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে কমিশন পান। ১৯৭১ সনে আমাদের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি মেজর জেনারেল ছিলেন এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর ২০ মাউনটেন ডিভিশনের জেনারেল কোর-কমান্ডার ছিলেন। মেজর জেনারেল লছমন সিং রাজশাহী বিভাগ মুক্ত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। মোটকথা রাজশাহী বিভাগের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর জেলায় যত ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনী ছিলো সবার কমান্ডার ছিলেন লছমন সিং। আমি রংপুর জেলার নীলফামারী সীমান্তের একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিলাম। সেকশন ও প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছি পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। আমাদের ৬নং সেক্টর কমান্ডার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জোশী সাহেব, সেই ব্রিগেডিয়ার জোশী সাহেবেরও মেজর জেনারেল লছমন সিং কমান্ডার ছিলেন। ১৩.২.২০০৯ তারিখ শুক্রবার বিকাল ৫টায় দিল্লীর সোমবিহার আবাসিক এলাকায় তাঁর বাসভবনে আমাকে সময় দিয়েছেন। বেলা চারটায় রওনা দিলাম, ঠিক পাঁচটায় তার বাসভবনে উপস্থিত হলাম, ঘড়িতে ঠিক ৫টা দেখে খুব খুশী হলাম ঠিক সময় আসবার জন্য। তার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলাম। ড্রয়িং রুমে সোফায় বসলাম, সেখানে উপস্থিত ছিলেন লছমন সিং-এর অধীনে ১৯৭১ সনে ব্রিগেডিয়ার হিসেবে যুদ্ধ করেছে জেনারেল কাতপালিয়া, পরে লেঃ জেনারেল হন, ১৯৮৯ সনে রিটায়ার করেছেন। জেনারেল লছমন সিং রিটায়ার করেছেন ১৯৭৮ সনে মেজর জেনারেল হিসেবে। খুব দুঃখজনক তিনি লেঃ বা পূর্ণ জেনারেল হন নাই। ৭টা পর্যন্ত দু ঘণ্টা জেনারেল লছমন সিং, জেনারেল কাতপালিয়া ও মিসেস লছমন সিং-এর সাথে কথা বললাম। স্ত্রী মিসেস লছমন সিং-এর সাথে খুব ভাব করে ফেলে। মুখ দিয়ে যেই বলেছে, ঠাণ্ডা লাগছে, সাথে সাথে ভিতরে গিয়ে একটি কাশ্মীরী লেডিস শাল দিয়ে দিলেন মিসেস লছমন সিং।

জেনারেল লছমন সিং ফোনে পাশের ফ্ল্যাট থেকে জেনারেল জেকব সাহেবকে ডাকলেন, আরে জেনারেল জলদি আ যাও, ওয়ান ফ্রিডম ফাইটার ইন মাই রুম You will not never get such chance meet like this type good freedom fighter and good man , He is a poltical man and writer come and meet with him. কিন্তু জেনালের জেকব সাহেব ওদিক থেকে বললেন খুব ভিআইপি গেস্ট এসেছে, আসা সম্ভব নয়। ফোনে আমার সাথে কথা বললেন এবং না আসার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। জেনারেল লছমন সিং সাহেব জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের সঙ্গে ফোনে কথা বললেন। আমার প্রসঙ্গে বললেন, দুদিন যাবৎ এত ফোন করছি অথচ পেলাম না ব্যাপার কি? যোগিন্দার সিং সাহেব জবাব দিলেন, পরিবারের সবাই দিল্লীর

www.pathagar.com

বাইরে, সেজন্য। লছমন সিং সাহেব আমার কথা বললেন, ৭১ সনের একজন ফ্রিডম ফাইটার এসেছে তার নাম বাবলু। সে একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স, লেখক, রাজনীতিবিদ, তার জন্য তোমাক ফোন করেছিলাম, এখানে কাতপালিয়া সাহেব আ,ছে তুমি থাকলে ভালো হতো। যোগিদার সিং আমার সাথে ফোনে কথা বলতে চাইলেন। ফোনে এখানে না থাকার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে খুব আন্তরিকতার সাথে তার বাসায় যাবার জন্য আহ্বান জানালেন। আমি বললাম, আমি আগামী ১৫.২.২০০৯ সন্ধ্যে ৭টা থেকে ৮ টার মধ্যে আমি আপনার বাসায় আসতে পারি। তিনি রাজী হলেন। যোগিন্দার সিং ও ১৯৭১ সনে একজন ব্রিগেডিয়ার হিসেবে জেনারেল লছমন সিং-এর অধীনে যুদ্ধ করেছেন। ঠিক সন্ধ্যে ৭টার সময় লছমন সিং সাহেবের বাসা থেকে বেরিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম রাত আটটায়। রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৪.২.২০০৯ শনিবার। সকাল ৯.৩০ মিঃ-এ দিল্লী থেকে ১০ কিলোমিটার দূর স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির দেখার জন্য রওনা দিলাম সিএনজি যোগে, ১০-৩০ মি: এসে গেলাম। বিস্ময়কর মন্দির, দেখে বিস্মিত হতে হয়, মানুষের সৃষ্টিক্ষমতা কি বিশাল, কি বিস্ময়কর, তা স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আরও আশ্চর্য, মাত্র ৫ বছরে এই বিস্ময়কর মন্দির নির্মাণ করে শেষ করেছেন। যারা এই মন্দির নির্মাণ করেছেন তারা বলেন, একমাত্র ভগবানের করুণা ও আশীর্বাদে এই মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে ৫ বছরে। ৮৫০ জন কর্মচারী এই মন্দিরের সেবায় নিয়োজিত রয়েছে। মন্দিরের গায়ে অনেক স্মরণীয় বরণীর বাণী লেখা রয়েছে। তার মধ্য থেকে একটি লিখে এনেছি ভিজিটিং কার্ডের পিছনে Where art is ageless, culture is Boarderless and values are Timeless. মন্দিরে জুতা, ক্যামেরা, নোট বই, হাতব্যাগ, মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করতে দেয় না। হাতব্যাগ না হয় না নিতে দিলো, ক্যামেরা এবং নোটবই নিয়ে ভিতরে কেন প্রবেশ করতে দেয় না বুঝতে পারি না। এত সুন্দর দৃশ্য অথচ ছবি তোলা যাবে না, এত সুন্দর বাণী, অথচ লিখে আনা যাবে না। যাক এর পরে দিল্লী গেলে যদি একটি মাত্র স্থান দেখার সুযোগ পাই, তবে স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির দেখবো, যদি দুটি দেখার সুযোগ পাই তবে ১নং স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির, ২নং হুমায়নের সমাধি ও খাজা নিজামুদ্দিনের মাজার জিয়ারত ও নামাজ আদায়। (হুমায়নের সমাধি ও খাজা নিজামুদ্দিনের মাজার পাশাপাশি)।

বেলা তিনটায় U. Like হোটেলে দুপুরের খাবার খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। বেলা চারটায় চিত্তরঞ্জন পার্কের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম, প্রখ্যাত লেখক ভবানী সেন গুপ্ত ওরফে চানক্য সেনের বাসায় যাবার জন্য। ইংরেজী ভাষায় ভবানী সেনগুপ্ত নামে লেখেন এবং বাংলা ভাষায় লেখেন চাণক্য সেন নামে। অনেক বড় মাপের লেখক, ১৯২০ সনে জন্ম শরিয়তপুর বা সাবেক মাদারীপুর জেলার কার্তিকপুরে। কার্তিকপুরে হাই স্কুল থেকে ১৯৩৫ সনে ভবানী সেনগুপ্ত মেট্রিক পাশ করেন, ১৯৩৭ সনে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে আইএ পাশ করে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইংরেজী অনার্সসহ এমএ পাশ করেন ১৯৪১ সনে। স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন।

www.pathagar.com

বাবা মাসে ৩০ টাকা বেতনে খুলনাতে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, ১৯২০-৩০ সনের দশকে। ভবানী সেন স্বপ্ন দেখতেন মাসে ৬০ টাকা রোজগার করার। স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসেবে চাকরীর ইন্টারভিউ দেবার সময় প্রশ্ন করা হয়েছিলো, কত বেতন চাও? উত্তরে ভবানী সেনগুপ্ত ৬০ টাকা মাসে বেতন চেয়েছিলেন। জবাব শুনে কর্তৃপক্ষ বলেছিলেন স্টেটসম্যান পত্রিকায় ১৫০ টাকার নীচে পিয়ন-দারোয়ানদেরও বেতন নাই, তোমার বেতন ১৭৫ টাকা করা হলো। ১৯৪১ সনে ১৭৫ টাকা বেতনের কথা শুনে ভবানী সেনগুপ্ত অবাক হয়ে গিয়েছেন।

সেই ভবানী সেনগুপ্তের সাথে ২০০৯ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি বিকালে ৫.৩০ মি:-এ দেখা করতে যাচ্ছি। ১৯৪১ সন থেকে ২০০৯ সন মাঝে ৬৮ বছরে ভবানী সেনগুপ্ত অনেক কিছু করেছেন, তিনি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই কে গুজরাল সাহেবের একজন ঘনিষ্ঠতম বন্ধু। চাণক্য সেন নামে বাংলা ভাষায় অনেক ভালো ভালো উপন্যাস লিখেছেন, ইংরেজী ভাষায় অনেক প্রবন্ধের বই লিখেছেন, রাজনীতি ও সমাজনীতি বিচার-বিশ্লেষণ করে। ভারতের অনেক নামকরা ইংরেজী পত্রিকাতে সম্পাদক ও সাংবাদিক ছিলেন। ১৯৪১ সন থেকে ২০০৯ সন ৬৮ বছর, বছর দশেক মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালে এবং বছর পাঁচেক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করেছেন, বাকী সময় দিল্লীতে। ৫.৩০ মি: থেকে ৭টা পর্যন্ত ভবানী সেনগুপ্তের সাথে কথা বলে চলে এলাম হোটেলের উদ্দেশ্যে। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

১৫.০২.২০০৯, রোববার : সকালে ঘুম থেকে উঠে নাস্তা খেয়ে ১৫০ রুপি করে ২ জনে ৩০০ রুপিতে টিকিটে গাইড ট্যুরে দিল্লী শহর দেখার জন্য বাসে উঠলাম সনি সিনেমা হলের সামনে থেকে। প্রথমে দিল্লীর বিড়লা মন্দির দেখাতে নিয়ে গেলো, এ মন্দির আমি আগে দেখেছি। বেশ ভালো, দেখবার মত, অনেক সোনা আছে, ভিতরে লক্ষীনারায়ণের প্রতিমা সোনা দিয়ে বানানো। কিন্তু জুতা খোলা, সিকিউরিটির বাড়াবাড়ী, ক্যামেরা নেওয়া যাবে না, লম্বা লাইন একবার ধরেছি, ক্যামেরা রাখার জন্য গেট থেকে ফিরে গিয়ে লম্বা লাইনের পিছনে দাঁড়ানো, মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, বিড়লা মন্দির দেখবো না। স্ত্রীকে বললাম, "তুমি দেখে আসো।" ও গেলো না, আমার সাথেই থাকলো। দিল্লীর বিড়লা মন্দির দেখা হলো না। স্ত্রী মন্দিরের বাইরে থেকে ৫ রুপি, ১০ রুপিতে, টুকটাক কিছু জিনিস ক্রয় করলো। পরের দেশে এসে স্ত্রী যখন বিড়লা মন্দিরের সামনে থেকে ঐ সব টুকটাক জিনিস ওর বাবার বাড়ীর ছোটদের উপহার দিলো, দেখলাম ছোটরা খুব খুশী, তখন মনে হলো আসলে বিড়লা মন্দির দেখার জন্য ভিতরে না গিয়ে ভালই হয়েছে, এতগুলো ছোট বাচ্চার মুখের হাসি দেখা গেলো।

বিড়লা মন্দির থেকে ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়াম ৩০ মিনিটের পথ। ইন্দিরা গান্ধী মিউজিয়াম থেকে বিজয় চোয়াক, এখান থেকে প্রেসিডেন্ট হাউস, ভারতের পার্লামেন্ট হাউস, বিশাল রেলভবন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের ভবন দেখা যায়। খুব সুন্দর এলাকা, দেখে প্রাণ জুড়ায়, আমার মতে দিল্লীর ৩য়তম স্থান যা দেখা দরকার, বিজয় চোয়াক থেকে ইন্ডিয়া গেট ৩০ মি:, ইন্ডিয়া গেট থেকে কতুব মিনার, কুতুব মিনারে প্রবেশের আগে

www.pathagar.com

লাঞ্চের জন্য এক হোটেলে নিয়ে যাওয়া হলো, ৫০ রুপির লাঞ্চের থালা একজনের জন্য।

লাঞ্চের পর কুতুব মিনারের টিকিট কাটতে হয়। ভারতীয়দের জন্য ১০ টাকা বাংলাদেশের জন্য ২০০ টাকা করে। বাসের কাউন্টারে এক ভারতীয়কে অনুরোধ করলাম আমাদের ২জনের জন্য ২টি টিকিট নিয়ে আসবার জন্য। তাকে ২০ রুপী দিলাম। কুতুব মিনার দেখলাম। ভারতে প্রথম মুসলমান সম্রাট কুতুবউদ্দিন আইবেক ভারত দখল করে ১১৯১ সনে, ১২১০ সন পর্যন্ত কুতুবউদ্দিন ভারতের সম্রাট ছিলেন। তিনি এই উচ্চ মিনার তৈরির করেছেছিলেন। কুতুব মিনার চত্বরের গেটে লাগানো ফলক থেকে নোট বইতে টুকে নিয়ে এসেছি–

১। কুতুবউদ্দিন আইবেক, ১১৯১ থেকে ১২১০ সন

২। ইলতুতমিস ১২১০ থেকে ১২৩৫ সন

৩। আলাউদ্দিন খিলজি ১২৯৫ থেকে ১৩১৫ সন পর্যন্ত।

এই লেখাটি লেখার সময় কুতুব মিনার থেকে নোট বইতে টুকে আনা লেখার সাথে সম্রাটদের নাম মিলিয়ে দেখার জন্য হাতের সামনে রাখা অতুল চন্দ্র রায় এবং প্রণব কুমার চট্টপাধ্যায়ের লেখা 'ভারতের ইতিহাস' বইটির মিলিয়ে দেখলাম, তাতে মিল নেই। আলাউদ্দিন খিলজির আগে ইলতুতমিসের পরে ইতিহাসের বইতে যাদের নাম রয়েছে তারা হলেন–সুলতানা রাজিয়া ১২৩৬ থেকে ১২৪৬ সন, নাসির উদ্দিন মাহমুদ ১২৪৬ থেকে ১২৬৫, গিয়াস উদ্দিন বলবন ১২৬৫ থেকে ১২৮৭, জালাল ফিরোজ খলজী ১২৯০ থেকে ১২৯৬, এরপর আলাউদ্দিন খিলজী ১২৯৬ থেকে ১৩১৬ সন। তবে কুতুব মিনারের গেটে কুতুবউদ্দিন আইবেক, ইলতুতমিস ও আলাউদ্দিন খিলজীর নাম রয়েছে।

১৫.০২.২০০৯ রোববার কুতুব মিনার থেকে বাহাই টেম্পল। বাহাই ধর্মীয় মতের অনুসারীরা সব ধর্মের মানুষের শান্তি কামনা করে বিরাট শাপলাফুলের আকৃতিতে নির্মাণ করেছে বিরাট আকারের বাহাই টেম্পল, ৫৫একর জায়গার ওপরে। এরই মধ্যে শুক্রবার জামে মসজিদের সামনে থেকে ১৫০ রুপিতে কেনা কেডস পায়ে দেবার ফলে ডান পায়ে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলাম। কোনক্রমেই জুতা পায়ে রাখা যায় না, আবার খালি পায়ে হাঁটা প্রায় অসম্ভব। একথাটা লিখলাম এই জন্য যে, যারা এই লেখাটা পড়বেন তারা কেউ কোনদিন লম্বা সফরে বাইরে গেলে কোন সময় দয়া করে নতুন জুতা প'রে যাবেন না, খুব বিপদে ও কষ্টে জীবন অতিষ্ঠ হতে পারে।

বাহাই টেম্পল থেকে রাজঘাটে মাহাত্মা গান্ধীর সমাধি দেখার জন্য নিয়ে এলো। মহামানবের মহাপ্রয়াণের মহাস্থানে এলে প্রাণে বিরাট প্রশান্তি বয়ে আনে। রাজঘাট থেকে সোনি সিনেমা হলের সামনে বাস নিয়ে এলো। আসার পথে লালকেল্লা বা রেড ফোর্ড দেখানো হলো। চলার পথে আমি এর আগে কয়েকবার রেডফোর্ট বা লালকেল্লা দেখেছি।

১৫.০২.২০০৯ রোববার দিল্লী সাইটসিন করে হোটেলে এসে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে স্ত্রীসহ চললাম দিল্লীর ডিফেন্স কলোনীর উদ্দেশে লেঃ জেনারেল যোগিন্দর সিং-

www.pathagar.com

এর বাসায়। ঠিক ৭টায় জেনারেল যোগিন্দর সিং-এর বাসায় উপস্থিত হলাম। খুব হৃদয়বান মানবতাবাদী মানুষ মনে হলো, আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করলেন এবং বললেন, একদিন অবশ্যই আমাকে তার বাসায় লাঞ্চ অথবা ডিনার খেতে হবে। আমি বললাম, আমি ডায়াবেটিসের রোগী, বর্তমানে আমি শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেতে পারি, অন্য কিছু দিয়ে ভাত খেতে খুব কষ্ট হয় এবং মাঝে-মধ্যে বমি পর্যন্ত হয়। এই অবস্থায় আপনাদের মত মানুষের বাসায় নিমন্ত্রণ খাওয়া খুব রিস্কি। কিন্তু তিনি এর পরেও এত আন্তরিকতার সাথে নিমন্ত্রণ করলেন যে, তা শুনে আমার চোখ দিয়ে প্রায় পানি এসে যায়। অগত্যা রাজী হলাম এই বলে যে, ১৮.২.২০০৯ বুধবার দুপুরে লাঞ্চ হলে ভালো হয়। তিনি রাজী হলেন। নাস্তা করে রাত ৮টা পর্যন্ত কথা বলে রওনা দিলাম ডিফেন্স কলোনী থেকে হোটেলের উদ্দেশে, হোটেলে এসে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। যোগিন্দর সিং লেঃ জেনারেল হিসেবে ভারতীয় সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ার করেছেন ১৯৮৯ সনে।

১৬.০২.২০০৯ সোমবার সকালে নাস্তা খেয়ে ডলার ভাঙিয়ে ভারতীয় মুদ্রা করে বের হলাম করোল বাগ আজমল খান মার্কেটে স্ত্রীসহ। মেট্রোরেলযোগে, করালবাগ মেট্রো রেল স্টেশন থেকে করালবাগ মার্কেট প্রায় ১ মাইল দূরে অবস্থিত। এক মাইল হেঁটে মার্কেটে গিয়ে শুনি আজ সোমবার, কোরলবাগ মার্কেট-এর সাপ্তাহিক ছুটি। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। সেখান থেকে আবার ১ মাইল পায়ে হেঁটে মেট্রো রেলে চেপে রাজীবচক স্টেশনে বদলি হয়ে চাঁদনীচক মার্কেটের উদ্দেশে রওনা হলাম। চাঁদনীচক মার্কেটে এসে আরও খারাপ অভিজ্ঞতা হলো, আমারা থ্রি পিছ বা মেয়েদের সালোয়ার-কামিজ ক্রয় করবো, যাকে জিজ্ঞেস করি সেই বলে আগে যাও বা আগে বারো। এইভাবে উত্তরদিক থেকে দক্ষিণের শেষ মাথায় পৌঁছলাম, আবার দক্ষিণ থেকে জিজ্ঞেস করে সেলোয়ার-কামিজ বা থ্রি পিচের দোকান কোথায় জিজ্ঞেস করলে আগে বাড়তে বলে। এইভাবে এক ঘণ্টা একবার এপাশ, একবার ওপাশ করে হাল ছেড়ে জামে মসজিদ এলাকার উদ্দেশে রওনা দিলাম কোন কেনাকাটা না করে।

আমি আগে অনেক লোকের কাছে শুনেছি যে দিল্লীর সবচেয়ে ধনী লোকদের কেনাকাটার মার্কেট কনট প্লেস, মধ্যবিত্তদের মার্কেট করোলবাগ, গরিব বা সাধারণ মানুষের মার্কেট চাদনীচক। আমি নিজেকে বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের একজন মনে করি, তাই প্রথমে করোলবাগ মার্কেটে গেলাম। সোমবার মার্কেট বন্ধ, তাই চাদনীচকে এলাম কিন্তু এখানে ব্যর্থ হলাম, চাদনীচক মার্কেটে থ্রি পিচ বা সালোয়ার-কামিজ কিনতে ব্যর্থ হলাম ভাষাসমস্যার জন্য। আমরা বাংলাদেশীরা যাকে সালোয়ার কামিজ বা থ্রি পিচ বলে থাকি, দিল্লীতে তার নাম লেডিস সুট। আমি যদি লেডিস সুট বলতাম তা হলে মনে হয় দিল্লীর চাদনীচক মার্কেট থেকে খালি হাতে ফিরে আসতাম না। সেখান থেকে জামে মসজিদ এলাকায় এসে মহরমের চল্লিশার মিছিল বা তাজিয়া দেখলাম শিয়া মুসলিমদের। জিজ্ঞাসা করে জানলাম ইমাম হোসেন শহীদ হবার পর মহররম মাসের ১০ তারিখ থেকে আজ ৪০তম দিন, এদিন শিয়া মুসলমানেরা দিল্লীতে প্রত্যেক বছর চল্লিশা উদযাপন করে। আমরা যেমন মৃত্যুর ৪০ দিনের মধ্যে একবার বড়

www.pathagar.com

ধরনের খাবার ব্যবস্থা করি, শিয়া মুসলমানেরা প্রত্যেক বছর চল্লিশা করে খাবারের আয়োজন, মিছিল ও দোয়া করে থাকে।

জামে মসজিদের সামনে এসে আবার মওলানা মহিউদ্দিন আহমেদ আবুল কালাম আজাদ এর মাজার জিয়ারত করলাম। স্ত্রীকে বললাম ভালোভাবে ছবি তুলতে, বারে বারে বললাম, মওলানা আবুল কালাম আজাদের মাজার জিয়ারত করার সুযোগ পাওয়া বিরাট কিছু। সে কয়েকটি ছবি তুললো, কিন্তু ঢাকায় এসে দেখি শুধুমাত্র ২৩.০২.২০০৯ তারিখে নবদ্বীপের ইস্কনের প্রধান কার্যালয় মায়াপুরের কয়েকটি ছবি ছাড়া সব ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে চীনের ডিজিটাল ক্যামেরার বদৌলতে। এখনও দুঃখে খুব কাতর হয়ে পড়ি মওলানা আবুল কালাম আজাদের মাজার জিয়ারতের কোন ছবি না থাকার জন্য। এই বইতে একটি মওলানা আবুল কালাম আজাদের মাজার জিয়ারতের ছবি দিতে পারলে তা না কতই ভালো হতো। মওলানা আজাদের মাজারের নীচে ফুটপাতের মার্কেট থেকে স্ত্রী বেশ কিছু টুকটাক জিনিসপত্র ক্রয় করে।

সেখান থেকে হোটেলে ফিরে এসে দুপুরের খাবার খেয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে ১৬.০২.২০০৯ সোমবার বেলা ৪টায় রওনা দিলাম ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আই. কে. গুজরাল সাহেবের বাসার উদ্দেশে। তিনি বিকাল ৫টা থেকে ৫.৩০ মি: পর্যন্ত আমাকে সময় দিয়েছেন। মিনিট দশেক বসে থাকবার পরে আমাকে তার রুমে ৫টার সময় ডাকা হলো, আমি গুজরাল সাহেবের পা ছুঁয়ে সালাম করলাম, স্ত্রীও পায়ে হাত দিয়ে সালাম করলো। কফি, চানাচুর, বিস্কুট, পেস্তা বাদাম ও কেক দিয়ে নাস্তা করালেন।

১ ঘণ্টা কথা বললাম অনেক বিষয় নিয়ে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ১ম খুব কাতর ও আন্তরিকতার সাথে জিজ্ঞেস করলেন, "বাবলু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘাতকদের বিচার কি হবে না?" আমি বললাম, "এখন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, আশা করি এখন সুপ্রীম কোর্ট স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে এবং খুনীদের শাস্তি হবে।"

২য়টি হচ্ছে–আই. কে. গুজরাল আধুনিক দিল্লী শহর নির্মাণের পুরোধা ব্যক্তি। ১৯৪৮ সন থেকে দশ বছর দিল্লী শহরের মেয়র ছিলেন, প্রায় দশ বছর ভারতের পূর্তমন্ত্রী ছিলেন, ১৯৭১ সনে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ভারতের তথ্যমন্ত্রী ছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তাঁর বয়স এখন ৯০-এর কাছাকাছি। জীবনে কত ছবি, কত নামী-দামী পত্রিকায় ও বইতে ছাপা হয়েছে। কত প্রচার পেয়েছেন ভারতের এই সাবেক প্রধানমন্ত্রী। অথচ আমার '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইয়ে তার পাশে আমার ছবিটি দেখে খুব খুশী হলেন। কয়েকবার মুখ উজ্জ্বল করে ছবিটি দেখলেন, কয়েকবার আমাকে আমার বইতে তাঁর ছবি ছাপাবার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। উনি বললেন You deserve another cup of caffee. এক পর্যায়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "স্যার আপনার ছবি হাজার হাজার পত্রিকা ও বইতে ছাপা হয়েছে, আমার এই ক্ষুদ্র বইতে ছবি ছাপার জন্য আপনি এত খুশী কেন?" গুজরাল সাহেব জবাব দিলেন, পত্রিকায় ছবি ছাপা এক জিনিস আর বইতে ছবি ছাপা অন্য জিনিস,

www.pathagar.com

তোমার এ বই শত বছর বেঁচে থাকবে, সাথে তোমার ও আমার ছবিও শত বছর বেঁচে থাকবে। আমি তুমি কেউ থাকবো না, তাই বইতে ছবি দেখলে আমি খুব খুশী হই।

তৃতীয়ত : রাজনীতি নিয়ে কথা প্রসঙ্গে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে মন্তব্য করলেন এবং প্রতিবেশী দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার পক্ষে বললেন। আমি তখন ভিজিটিং কার্ডের পিছনে স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির থেকে শনিবারের লিখে আনা কোটেশনটি পড়ে শোনালাম-Where art is ageless,culture is bourderless and values are timeless; কোটেশনটির সাথে তিনি একমত হলেন, এমন সুন্দর একটি কোটেশন লিখে আনার জন্য আমার প্রশংসা করলেন। তিনি তার নোট বইতে কোটেশনটি লিখে রাখলেন। ভিন্নদেশ বা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক দলের নেতারা যখন জেলে থাকেন, জনগণ যখন রাজনৈতিক সমস্যায় ভারী বিপদে থাকেন, তখন সবল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাহায্য চায় বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য, তখন তা আর নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয় থাকে না। যখন বিপদ বা সমস্যা শেষ হয়ে যায়, তখন সবল প্রতিবেশী সামান্য ন্যায় কারণে অনুরোধ করলে, দুর্বল প্রতিবেশীরা বলে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সবল প্রতিবেশী হস্তক্ষেপ করছে। এ বিষয়ে আমরা উভয়ে একমত হলাম। গুজরাল সাহেবের সাথে আলোচনার এক পর্যায়ে ধর্ম নিয়ে কথা উঠলে তিনি আমার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানতে চান। জবাবে বলি, "আমি একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম, কিন্তু দিনে পাঁচবার নামাজ পড়ি না, মাঝে-মধ্যে নামাজ পড়ি, মন যখন চায়। আমার ধর্মবিশ্বাস শুনে তিনি খুশী হয়ে বললেন, "আমিও একজন নিষ্ঠাবান ধার্মিক, তবে নিয়ম বেঁধে প্রর্থনা করি না, মন যখন চায়, তখন প্রার্থনা করি তোমার মতোই। ৩০ মিনিট সময় দিয়েছিলেন, ১ ঘণ্টা চলে গিয়েছে। মনে হলো মাত্র ৫ মিনিট হলো এসেছি। আই. কে. গুজরাল সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। আমি আবার তাঁর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে চলে এলাম।

গুজরাল সাহেবের জনপদ রোডের বাসার কাছেই কনট প্লেস এবং সেন্ট্রাল পার্কের নীচে বিশাল মার্কেট পালিকা বাজার। পালিকা বাজার থেকে কয়েকটি সেলোয়ার কামিজ ক্রয় করে অসাধারণ সুন্দর সেন্ট্রাল পার্কে রাত আটটা পর্যন্ত বসে থেকে হোটেলে ফিরে এসে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম।

১৭.০২.২০০৯ মঙ্গলবার : আগ্রার তাজমহল ও আগ্রাফোর্ট, মথুরা ও বৃন্দাবন দেখার জন্য বাসযোগে দিল্লী থেকে যাত্রা, গাইড টুর, দু'জনের জন্য ৩৫০ রুপি করে ৭০০ রুপি দিয়ে ২টি টিকিট ক্রয় করেছি হোটেল থেকে আগের রাতে। রহস্যজনকভাবে এদিন ঘুম ভাঙতে দেরী হলো। সাধারণত আমার সকাল ৫টার মধ্যে ঘুম ভাঙে। তাড়াতাড়ি গোসল সেরে দ্রুত বাসের জন্য ছুটে গেলাম, বাস অপেক্ষা করছে আমাদের দু'জনের জন্য। এক ঘণ্টা যাত্রায় দেরী হলো।

সকাল ন'টার দিকে পলওল জেলার জেলাসদর পলওলে রাস্তার ধারে নাস্তা খাবার বিরতি, স্ত্রী নাস্তা খেলো না, আমি একাই নাস্তা খেলাম। বাসের প্রায় সব যাত্রীই

www.pathagar.com

মাদ্রাজের, মাদ্রাজীদের কমন খাদ্য পিরলী, তিন চারটা ভাপাপিঠা, ডাল, আর আলুর ঝোল দিয়ে যা খায় তার নাম পিরলী। আমি একটি ধোসা খেলাম, চাসহ দাম ১১৬ রুপি। রাস্তায় স্ত্রী বমি করে নিজের জামা-কাপড় ও ভ্যানিটি ব্যাগ ও বাস নষ্ট করে ফেলে, দিল্লী থেকে আগ্রা ৩০০ কিলোমিটার।

বাস বেলা ১টায় আগ্রায় পৌঁছলে একটি নির্ধারিত হোটেলে দুপুরের খাবারের জন্য নেয়া হলো। ৫০ টাকার একথালি নিলাম। মোটামুটি খাওয়া চলে, ভালো বলা যায় না, খারাপও বলা যায় না। এর আগে ৩বার আগ্রা দেখেছি, স্ত্রী এই প্রথম। এবার যা দেখলাম, যমুনা নদী সম্পূর্ণ মরে গিয়েছে, মৃত যমুনার জন্য দুঃখ পেলাম। এবারে বাসের গাইড বুঝতে পেরেছে আমি বাংলাদেশী, সে তাজমহলের ১০টাকা টিকিট কিনতে আমাদের কাছ থেকে টাকা নেবে না ব'লে পাসপোর্ট দেখিয়ে প্রতিজনের ৫০০ রুপি করে টিকিট আমাকে কাটতে হবে। এত টাকা সাথে নেইনি, তাছাড়া আমি তাজমহল এর আগে ৩বার দেখেছি, আমার স্ত্রীর টিভিনাটক ও সিনেমা, সিরিয়াল ছাড়া কোন জিনিস দেখার জন্য কোন আগ্রহ নেই, কাজেই সিদ্ধান্ত নিই যদি ১০ টাকার টিকিট কিনতে না পারি, তাহলে তাজমহল দেখবো না। বাসের বদমাশ টুর গাইড চিৎকার করে ও অশালীন ভাষায় গালাগালি করেই চলেছে। এরমধ্যে একজন এসে প্রস্তাব দেয় ৩০০ করে ৬০০ রুপি গাইডকে দিলে সে তাজমহল দেখার সুযোগ করে দেবে। আমি রাজী হই না, গাইড আরও ক্ষেপে যায়। অকথ্য ভাষায় গালাগালির মাত্রাও বেড়ে যায়। আমি অটল থাকি। বলি, আমি তাজমহল দেখবো না। বাস থেকে মিনিবাসে ৫টাকা ভাড়ায় তাজমহল গেটের চত্বরে যেতে হয়। আমাদের বাসের যাত্রীদের সাথে আমাকে সে বাসে উঠতে দেয় না, প্রায় জোর করে উঠে গেটের সামনে আমি একজন গাইড পাই। তাকে বললাম, তোমাকে ১০০ রুপি দেব, ১০ টাকার টিকেটে যদি আমাদের তাজমহল দেখাতে পারো। সে রাজী হলো, ২০ রুপি দিয়ে ২টি টিকিট কিনে আনলো। এর মধ্যে স্ত্রীকে আর খুঁজে পাই না। ভয় পেয়ে গেলাম। অনেকক্ষণ পর দেখি, সে ভিতর থেকে গেটের দিকে আসছে, জিজ্ঞেস করায় বললো, "ভিড়ের মধ্যে গেট দিয়ে ঢুকে পড়েছি, টিকিট চায় নাই।" যাক হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। গাইড গেটে বললো, আমার লোক দূর থেকে এসেছে, গেটের লোকজন আর কোন কথা বললো না, ভিতরে চলে গেলাম। তাজমহল স্বামী স্ত্রীসহ দেখলাম। ১ঘণ্টা সময় ৫টা থেকে ৬টা, ৬টার মধ্যে তাজমহল দেখে বাসে এসে উঠলাম। তাজমহল যখন প্রথম দেখি ১৯৮৯ সনে, তখন দেখেছি ৮০ ভাগ বিদেশী মানুষ, সাদা চামড়া, ২০ ভাগ ভারতীয়, এবার দেখলাম ৮০ ভাগ ভারতীয় ২০ ভাগের মত বিদেশী। তার মানে ভারতের লোক ধনী হচ্ছে, পয়সা খরচ করে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ তাজমহল দেখবার জন্য, দিল্লীর কুতুব মিনার দেখার জন্য আসছে।

আর একটি বিষয় হলো, ভারত সরকার গত কয়েক বছর যাবৎ মহাভারত বইয়ের মহান শিক্ষা থেকে দূরে সরে গিয়েছে, মহাভারত গ্রন্থে অতিথি আপ্যায়নকে খুব বড় গুরুত্ব দিতে বলেছেন। আগে হিন্দুরা অতিথিকে সাক্ষাৎ নারায়ণ ও লক্ষ্মী বলে মনে করতেন। শরণাগত মানুষকে সাহায্য না করে ফিরিয়ে দিলে, অতিথির সাথে খারাপ

www.pathagar.com

ব্যবহার করলে একজন সজ্জন ব্রাহ্মণকে হত্যা করায় যে পাপ হবে, তার চেয়ে বেশী পাপ হবে বলে মহাভারত গ্রন্থে অনেকবার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু কয়েক বছর যাবৎ ভারত সরকারের কিছু অর্বাচীন আমলার বুদ্ধিতে মনে হয়, মহান ভারত আজ সে শিক্ষা থেকে অনেক দূরে অবস্থান নিয়েছে। নইলে তাজমহল দেখতে বিদেশীদের জন্য ৭৫০ রুপি, সার্ক দেশের লোকদের জন্য ৫০০ রুপি আর ভারতের লোকদের জন্য ১০ রুপি কেন? মহাভারত এবং হিন্দুধর্মের শিক্ষা অনুযায়ী বিদেশীদের কম হওয়া উচিত ভারতীয়দের চেয়ে। খুব দুঃখজনক বিষয়, ছোট আত্মার পরিচয় দিচ্ছে ভারত সরকার।

ভারতের লোক পৃথিবীর সব দেশে আছে–আমেরিকা, ইউরোপে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় আছে, কিন্তু ভারতীয়দের জন্য কোন বেশী রেট বা দাম ধরা নাই। অথচ এমন একটি জঘন্য বৈষম্যমূলক ভারতের আচরণের বিরুদ্ধে কেউ কোন কথাটি বলে না। ভারতে তো সবচেয়ে বেশী বিবেকবান ও ধার্মিক লোক বসবাস করেন বলে আমার বিশ্বাস, তাদের এ বিষয়টি নিয়ে কথা বলা উচিত। ১৭.০২.২০০৯ বিকাল ৭টায় বাস ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান মথুরায় এলো, শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দেখার জন্য ১ ঘণ্টা বিরতি। ডায়াবেটিসের রোগী, ইনসুলিন নেই, এরপরেও মথুরায় বেশ কয়েকটি পিরা খেলাম। আমাদের দেশের গুড়ের সন্দেশের মত খেতে খুব স্বাদ মথুরায় পিরা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখলাম, মন্দির দেখলাম, এর আগেও তিনবার দেখেছি। কিছু প্রাসাদ কিনলাম আমার গ্রামের পাড়া-প্রতিবেশী হিন্দুদের জন্য। বাস মথুরা থেকে বৃন্দাবন এলো রাত ৯টায়। বৃন্দাবনের প্রধান মন্দিরে গাইড পাপ্পু সবাইকে নিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণ বা পূজারির সাথে সবাই মন্ত্র উচ্চারণ করলাম। ১৫০ রুপি দিয়ে প্রসাদ কিনতে হবে, কিন্তু আমার কাছে ভারতীয় রুপি নেই, মানিব্যাগ থেকে বের করলাম সেই ১৯৮৭ সনের নভেম্বর মাসে কলকাতায় এসে ১৫০ রুপি বেচেছিলো, তা মানিব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম, এর মধ্যে অনেকবার কলকাতা-দিল্লী এসেছি, কিন্তু ঐ ১৫০ রুপি খরচ করি নাই। ঢাকাতেও অনেকে ঐ ১৫০ রুপি চেয়েছে, কিন্তু দেই নাই। আর সেই ১৯৮৭ সনে রেখে দেওয়া ১৫০ রুপি দিয়ে ২০০৯ সনের ১৭ই ফেব্রুয়ারি রাতে বৃন্দাবনের মন্দিরের প্রসাদ কিনলাম, জীবনে প্রথম বৃন্দাবন এসে। বিষয়টি আমার কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হয়। রাত প্রায় ১টার সময় বাস দিল্লীতে ফিরে এলো, হোটেলে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

১৯.০৮.২০০৯।

১৮.২.২০০৯ বুধবার : সকালে পাহাড়গঞ্জ আর কানসাস রোডের হোটেল থেকে বের হয়ে ডলার ভাঙিয়ে চললাম করোলবার্গ মার্কেটে সিএনজি যোগে মেয়েদের সেলোয়ার-কামিজ কেনার জন্য। বেলা ১১.৩০ মিনিটেও দেখি দোকান বন্ধ, সবে ২/১টি করে খুলছে। এর মধ্যে এক দোকান থেকে ৪টি থ্রি পিছ বা সেলোয়ার-কামিজ ক্রয় করলাম। ৪টির দাম চাইলো ১২ হাজার রুপি, ৩০০০ রুপি করে একটি। আমি চারটির দাম ২৮০০ রুপি বলাতে রাজী হয়ে গেল। করোলবার্গ থেকে হোটেলে এসে চললাম লেঃ জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের বাসায় দুপুরের খাওয়ার দাওয়াতে। ঠিক ১টায় কাঁটায় কাঁটায় ডিফেন্স কলোনীতে জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের বাসায় পৌঁছলাম।

www.pathagar.com

ঘড়ি দেখে এবারও খুব খুশী হলাম, ঠিক সময়ে আসার জন্য। জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের বাসায় পৌঁছে দেখি জেনারেল লছমন সিং সস্ত্রীক ও জেনারেল কাতপালিয়া সাহেব সস্ত্রীক উপস্থিত রয়েছেন। তাদের দেখে খুব খুশী হলাম। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলাম, আমার মত একজন সাধারণ মানুষের সম্মানে লাঞ্চের দাওয়াতে তারা এসেছেন। ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত তাদের সাথে কথা বললাম, ২টায় খাবার দিলেন। আমি যোগিন্দার সিং সাহেবকে বলেছিলাম শুধু ডাল আর ভাতের কথা, তিনি বলেছিলেন, সাথে একটি মাছের ঝোল থাকবে। ডাইনিং টেবিলে গিয়ে দেখি ডাল, ভাত, মাছের ঝোল তো আছে, সাথে বেগুন দিয়ে চিংড়ীভুনা, পনির দিয়ে বেগুনের ভুনা, আরও দুই এক পদ, এবং গত তিন মাসে প্রথম আমি প্রচুর খেতে পারলাম। এর আগে গত তিন মাস ভাত-তরকারী দিয়ে খেতে নিলে বমি হতো। ১৮.০২.২০০৯-এর আগে প্রায় তিন মাস শুধু ডাল দিয়ে ভাত খেয়েছি–জেনারেল যোগিন্দার সিং-এর ডিফেন্স কলোনীর বাসায় খাবারের পর থেকে মোটামুটি স্বাভাবিক খেতে পারছি। খুব ভয়ে ছিলাম, এত প্রবীণ, এত উচ্চস্তরের মানুষের সাথে খেতে বসে যদি বমি করি, তাহলে কি সীমাহীন কেলেংকারীই না হবে। আল্লাহ আমার সহায় হলেন, মান-সম্মান রক্ষা করলেন। খাবার পরে পায়েস পরিবেশন করা হলো আমাদের বাঙালী কালচারের মতই।

আমি বললাম, "স্যার আমাদের বাংলাদেশের বাঙালী কালচার তো এইরকম, খাবারের পরে পায়েস, এটা কি আমি বাঙালী বলে আমার সম্মানে করা হলো, না এটাই স্বাভাবিক পাঞ্জাবী কালচার, তারা বললেন, না শুধু তোমার সম্মানে পায়েস করা হয় নাই, এটা পাঞ্জবীদের সাধারণ কালচার। আসলে সব এক। আমরা নিজেরা নিজেদের স্বার্থে অপর জাতি বা সম্প্রদায় সম্পর্কে না জেনে মনগড়া অনেক কথা বলে থাকি। আমি জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের বাসায় যে স্বাদের তরকারী খেলাম, এই ৫৫ বছর বয়সে এত স্বাদের খুব কম তরকারী দিয়ে ভাত খেয়েছি। খাবার পরে স্ত্রী বেশ কিছু ছবি তোলে কিন্তু সব ছবি নষ্টা হয়েছে একটাও নেই। এরপর জেনারেল লছমন সিং জেনারেল যোগিন্দার সিং, জেনারেল কাতপালিয়া সাহেব আমার স্ত্রীকে বেশ কিছু উপহার দিলেন সুন্দর প্যাকেটে, তিনজনে প্রায় ৬ হাজার রুপির মত দামের ক্রোকারিজ ও ড্রেস উপহার দিলেন।

১৮.০২.২০০৯ বুধবার ঠিক ৩টায় জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের বাড়ী থেকে বের হলাম। সিএনজি ধরার জন্য রাস্তা পার হবার সময় ভাঙা ইটের ওপর পা পিছলে যায়, অল্প ব্যথা পেয়েছি, ভাগ্যিস পা ভাঙেনি। কিন্তু আজ ২০.০৮.২০০৯ তারিখেও পায়ে অল্প অল্প ব্যথা পাই। জেনারেল যোগিন্দার সিং সাহেবের বাসায় যেসব কথাবার্তা হয়েছে, তার মধ্যে ২টি কথা এই বইয়ের পাঠক-পাঠিকাদের জানানো উচিত বলে মনে করি। ১নং তারা তিনজনে বলিষ্ঠভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর খুব প্রশংসা করে বললেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করে আমরা জানি না কিন্তু তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীকে খুবই সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। ২নং হচ্ছে, জেনারেল কাতপালিয়া সাহেব তিন বছর ভারতীয় সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

ইনটেলিজেন্স বা গোয়েন্দাবাহিনীর প্রধান থাকা অবস্থায় অফিসে বসে একজন সিভিলিয়ান ব্যক্তির নাম কলম দিয়ে লেখেন নাই, একজন সিভিলিয়ান বা বেসামরিক ব্যক্তির সাথে কথা বলেন নাই। সম্পূর্ণ সেনা সদস্যের মধ্যে তিনি তার কাজ সীমাবদ্ধ রেখেছেন। জেনারেল যোগিন্দার সিং-এর ডিফেন্স কলোনীর বাসা থেকে হোটেলে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার গেলাম সেন্ট্রাল পার্কের নীচতলার বিশাল মার্কেট পালিকাবাজারে। ৭টা পর্যন্ত কেনা-কাটা করে ৭টা থেকে ৮.৩০ মি: পর্যন্ত সেন্ট্রাল পার্কে বসে থাকি। অসাধারণ সুন্দর এলাকা। পাশেই কনট প্লেসের বিশাল সুন্দর বড়লোকদের মার্কেট, অনেক খোলামেলা জায়গা, পরিমিত গাছ আছে, অতিরিক্ত গাছ লাগিয়ে জংগল বানান হয় নাই, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পার্ক বলতে যা বোঝায়, তাই। দেড় ঘণ্টা সেন্ট্রাল পার্কে বসে সুন্দর উপভোগ করে হোটেলে ফিরে এসে ডিনার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। ১৮.০২.২০০৯ বুধবার রাতে।

১৯.০২.২০০৯ বৃহস্পতিবার। গত বৃহস্পতিবার ১২.০২.২০০৯ দিল্লী এসেছি কলকাতা থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস যোগে, আজ আবার রাজধানী এক্সপ্রেস যোগে ৫.৩০ মি: এ কলকাতায় রওনা দিবো হাওড়া স্টেশনে। আসার সময় শিয়ালদহ রেলস্টেশনে রাজধানী এক্সপ্রেসযোগে দিল্লী এসেছিলাম। মিসেস সোনিয়া গান্ধীকে একটি বাংলাদেশের তাঁতের শাড়ী উপহার দেবো বলে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু টেলিফোনে কোন সুযোগ বা সাড়া পাচ্ছিলাম না, সোনিয়া গান্ধীর ফোন থেকে বলা হয়, মিসেস অর্চনা ডালমিয়ার সাথে যোগাযোগ করতে, কিন্তু তার ফোনে যোগাযোগ করে ব্যর্থ হই। অবশেষে ঠিক করলাম এক ঘণ্টা সেন্ট্রাল পার্কে ও পালিকাবাজারে ঘুরে বেলা ১১টায় কংগ্রেস অফিসে হাজির হবো। সেই মতো স্ত্রীসহ কংগ্রেস অফিসে গিয়ে উপস্থিত হলাম। মিসেস অর্চনা ডালমিয়ার অফিসের সামনে লম্বা লাইন, অল্পবয়সী সুন্দরী স্ত্রী সাথে থাকায় ভাল সুযোগ পেলাম, বলা হলো লেডিস লাইন সামনে, মাত্র ২/৩ জন, সেখানে গেলাম ৪/৫ মিনিটেই অর্চনা ডালমিয়ার রুমে প্রবেশ করলাম, বললাম, ঢাকা থেকে এসেছি, ১৯৭১ সনে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে যুদ্ধ করেছি। মিসেস সোনিয়া গান্ধীকে একটি বাংলাদেশের তাঁতের শাড়ী দিতে চাই। অর্চনা ডালমিয়া প্রশ্ন করলো, "কেন সোনিয়া গান্ধীকে শাড়ী, দেবে, এতে তোমার লাভ কি?" আমি জবাবে বললাম, "আমরা ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীর সৃষ্টি, মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর ভক্ত, ১৯৭১ সনে তিনি আমাকে ৯ মাস খাইয়েছেন এবং আশ্রয় দিয়েছেন, তিনি বেঁচে থাকলে তাকেই দিতাম, তার কাছে যেতাম। তিনি নেই, সোনিয়া গান্ধী এখন তার প্রতিনিধি, তাই তাকে শাড়ী দিতে চাই। বললাম আজ বেলা তিনটের মধ্যে আমাকে রেলস্টেশনে যেতে হবে তার আগে লাঞ্চ খেতে হবে; এর আগে যদি তাঁর সাথে দেখা করা সম্ভব হয় তো ভালো, না হয় আপনার কাছে রেখে যাই, আপনি ম্যাডাম সোনিয়া গান্ধীকে দিয়ে দেবেন। এবারে মিসেস অর্চনা ডালমিয়া উঠে বাইরে গেলেন আমাকে অপেক্ষা করতে বলে তার রুমে। আমরা কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম, মিসেস অর্চনা ডালমিয়া ফিরে এসে বললেন, "উনি মিটিং-এ আছেন, তোমাকে মাত্র দু'মিনিট সময় দিয়েছেন, মিটিং

www.pathagar.com

থেকে পাশের রুমে এসেছেন। অর্চনা ডালমিয়ার সাথে আমি স্ত্রীসহ রুমের ভিতরে প্রবেশ করলাম। মিসেস সোনিয়া গান্ধীকে দেখলাম, শাড়ী দিলাম, তিনি ২/৩ দিন অপেক্ষা করতে বললেন, আমাকে তাহলে ১/২ ঘণ্টা সময় দেবেন বলে জানালেন। আমি বললাম, “আমার ট্রেনের টিকিট আজকের, আজ বিকাল ৫টায় দিল্লী ছেড়ে যাচ্ছি, আবার যদি কোনদিন আসি তখন সময় দিতে চেষ্টা করবেন। আমার বায়োডাটাটা দয়া করে পড়ে দেখবেন। নমস্কার।” মিসেস সোনিয়া গান্ধীকে কংগ্রেস অফিসে শাড়ী দিয়ে হোটেলে এসে লাঞ্চ খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে বেলা চারটায় হোটেল ত্যাগ করে রেলস্টেশনে চলে এলাম। ৫.৩০ মিঃ এ দিল্লী রেলস্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেস যাত্রা করলো কলকাতার হাওড়া রেলস্টেশনের উদ্দেশ্যে। ১৯.০২.২০০৯ বৃহস্পতিবার। বেলা ১১টায় হাওড়ায় অবতরণ করলাম ২০.০২.২০০৯ বৃহস্পতিবার।

২০.০২.২০০৯, শুক্রবার রাজধানী এক্সপ্রেস বেলা ১১.৩০ মিঃ এ হাওড়া রেলস্টেশনে পৌঁছে। ট্যাক্সি-যোগে হাওড়া থেকে মারকুইজ স্ট্রীটে আসি। হোটেল ২১শের নীচতলায় একটি রুম পেলাম। গোসল করে মারকুইজ স্ট্রীট জামে মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করলাম, দুপুরের খাবার খেয়ে কিছু সময় বিশ্রাম নিয়ে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কলকাতার বিড়লা মন্দির দেখতে যাই স্ত্রীসহ, একঘণ্টা বিড়লা মন্দির দেখে সেখান থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে যাই, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনে হর্স রিডিং (ঘোড়ায় চড়া) করলাম আমার প্রিয় গড়ের মাঠে। সেখান থেকে গড়িয়ার বিবেকানন্দ পার্কের কাছে শ্রিপ্রা আদিত্য দত্তের ফ্ল্যাটে গেলাম, তিনি যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করলেন। নিজের হাতে কেক বানিয়েছেন, তা খাওয়ালেন, এরপর চাইনিজ হোটেলে ফোন করলেন শিপ্রাদি, রাত নটার দিকে চাইনিজ হোটেল থেকে খাবার দিয়ে গেলো, থাইসুপ ফ্রাইড রাইস, ভেজিটেবিল এন্ড চিকেন। সুস্বাদু চাইনিজ খাবার খেয়ে রাত দশটায় ট্যাক্সি-যোগে হোটেলে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

২১.০২.২০০৯ শনিবার। মারকুইজ স্ট্রীটের হোটেল থেকে চললাম সকাল ৮.৩০ মিঃ-এর ট্রেনে ধরে বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপি গ্রামে। বেলা সাড়ে দশটায় পূর্বস্থলী রেলস্টেশনে ট্রেন থামে, সেখান থেকে চুপি, পূর্বস্থলী, কাষ্টস্থালী, তিনটি গ্রাম পাশাপাশি, চুপি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রখ্যাত লেখক বিজ্ঞানী অক্ষয় কুমার দত্ত ১৮২০ সনে, অকিঞ্চিৎ রঘুনাথ রায় (১৭৫০ সন থেকে ১৮৩৭)। রঘুনাথ রায় বিরাট জমিদার ছিলেন, পরে সব ত্যাগ করে এক বস্ত্রে থাকতেন, মা কালীর সাধক হিসেবে জীবন-যাপন করেছেন এবং মা কালীর প্রশংসা করে গান লিখেছেন, মন্দিরে মাকালীর সামান্য কিছু প্রসাদ খেয়ে নাকি জীবন-ধারণ করেন। এই চুপি গ্রামে বসবাস করেন, লেখক, সাংবাদিক, বাংলাদেশপ্রেমিক ডাক্তার দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দিলীপ মৈত্র। ২০০৩ সনের ডিসেম্বর মাসে প্রথম চুপিতে দীপালোকদের বাসাতে যাই, ভালো লাগে, ছয়দিন থাকি। এবারে দিলীপ মৈত্রের বাড়ীতে উঠি, ২১ থেকে ২৪ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত থাকি, ২৫শে ফেব্রুয়ারি বুধবার সকাল ৮টার ট্রেনে কলকাতায় চলে আসি।

২১শে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে চুপি অকিঞ্চিৎ রঘুনাথ রায় পাঠাগারে অনুষ্ঠান

www.pathagar.com

এবং পূর্বস্থলীতে কৃষ্ণনাথ লাইব্রেরীতে আলোচনা অনুষ্ঠান হয়। কৃষ্ণনাথ লাইব্রেরীতে খুব ভাবগম্ভীর ভাবে আলোচনাসভা হলো, শ্রোতা বেশী নয়, জনা ত্রিশের মত হবে, তবে সবাই শিক্ষিত, দুই চারজন নবীন; বেশীর ভাগ প্রবীণ জীবনযুদ্ধে অভিজ্ঞ শিক্ষিত ও সজ্জন ব্যক্তি। আমার বক্তৃতা সবাই ধৈর্য ধরে শুনলেন, অনেকই খুব প্রশংসা করলেন, বক্তৃতার পরে সবাই আমার সাথে হাত মেলাতে চাইলেন। বক্তৃতা শুরু করলাম ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর একটি বাণী দিয়ে। বললাম, একুশের এই আলোচনাসভায় উপস্থিতি বেশ কম, তবুও আমি মহাপ্রভু ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের একটি কথা স্মরণ করে বলতে চাই, পৃথিবীর কোটি কোটি সাধারণ মানুষ একদিকে আর কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সত্যিকারের মানবিক চেতনা-বোধসম্পন্ন শিক্ষিত সজ্জন ব্যক্তি ২/৪ জন, অন্যদিকে, যেদিকে ২/৪ জন সজ্জন ব্যক্তি সে পাল্লা ভারি হবে, তারাই কোটি কোটি মানুষেকে পরিচালিত করবে। আমি মনে করি এখানে আপনারা যে কয়জন উপস্থিত আছেন মহান ২১-এর স্মরণের এই অনুষ্ঠানে, তাদের এক পাল্লায় আর বাকী সমস্ত পূর্বস্থলীর জনগণকে আর এক পাল্লায় তুললে আপনাদের পাল্লা ভারী হবে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন, মুক্তিযুদ্ধ, আধুনিক বাঙালী মুসলমান সবকিছুর মূলে প্রেরণা অনুপ্রেরণা দিয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি বলে উল্লেখ করে মিনিট ১০-এর মত বক্তৃতা করি পূর্বস্থলী কৃষ্ণনাথ লাইব্রেরীর ২১শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে চুপি অকিঞ্চিৎ লাইব্রেরীতে এলাম, পূর্বে দিলীপ মৈত্রের বাড়ী পশ্চিমে দীপলোকদের বাড়ী মাঝ দিয়ে রাস্তা, রাস্তার পশ্চিম পাড়ে অকিঞ্চৎ লাইব্রেরী। পূর্বস্থলী থেকে এসে অকিঞ্চিৎ লাইব্রেরীতে বক্তৃতা করলাম ২১শে স্মরণের অনুষ্ঠানে। মোটামুটি একই বক্তৃতা দেই। তবে অকিঞ্চিৎ লাইব্রেরীর অনুষ্ঠান একটু হালকা-পাতলা ছিল। ২১শের ভাবগম্ভীর্যের অভাব আমার তেমন ভালো লাগেনি। তারপরেও ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বিষয়, তারা যে ২১শে পালন করছে তাই যথেষ্ট। চুপি অকিঞ্চিৎ লাইব্রেরীর উদ্যোক্তারা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। সবচেয়ে লজ্জা পেলাম বেশ কিছু তরুণ কবি, যাদের বাড়ী পূর্বস্থলী থানায় পারুলিয়া, পূর্বস্থলী, চুপি এসব গ্রামে, তারা আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে আমার 'আশীর্বাদ চায়, আমি খুব অস্বস্তিবোধ করি, আমার মত কম পড়ালেখা জানা অগুণী একজন মানুষের পায়ে হাত দিয়ে তরুণ শিক্ষিত কবিরা দোয়া ও আশীর্বাদ কামনা করায়। রাতে ডিনার খেয়ে শুয়ে পড়ি ২১শে ফেব্রুয়ারী দিলীপ মৈত্রের বাড়ীতে।

২২শে ফেব্রুয়ারী রোববার পারুলিয়া বাজারে যাই সকালে, চুপি থেকে পারুলিয়া বাজার ২০ রুপি রিক্সাভাড়া, বাজারে গিয়ে ২টি কাতল মাছ ক্রয় করি, একটির ওজন ৩ কেজি করে, দাম প্রতি কেজি ৯০ রুপি, ২টি ৫৪০ রুপি, দুটি দুজনের বাসায় দিলাম। বিকালে আবার পারুলিয়া যাই পারুলিয়ার তরুণ কবিদের আন্তরিক আমন্ত্রণে। সেখানে কবিতা পাঠ হয় স্বরচিত ও প্রকাশিত। দুই বাংলার কবিদের কবিতাই পাঠ হয়। রাত ৯টায় চুপি ফিরে এসে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ি।

২৩শে ফেব্রুয়ারি সোমবার বিকাল ৩.৩০ মি: একটি গাড়ী ভাড়া করে দিলীপদার দু'ছেলে চঞ্চল, শম্ভু ও ওদের দু' স্ত্রীসহ আমরা দু'জন চললাম নবদ্বীপের মায়াপুরে,

www.pathagar.com

ইস্কনের প্রধান কার্যালয় ও মায়াপুর মন্দির দেখতে। ছটার সময় আমরা মায়াপুরে পৌঁছি। এর আগে আমি দু'বার মায়াপুরের মন্দির দেখেছি। এবার দেখে হতাশ হলাম মন্দিরের ভিতরে মন্দির কর্তৃপক্ষর উদ্যোগে সাধু সন্ন্যাসীদের দ্বারা অনেক দোকানপাট চালু করেছে দেখে, বিভিন্ন জিনিস বিক্রি করছে, আগে এটা ছিল না। তার মানে শ্রীশীল প্রভুপাদের থিয়োরী মিথ্যা প্রমাণিত হলো? শ্রীশীল স্বামী প্রভুপাদ বলেছেন যে, "মানুষের সব সমস্যার সমাধান হবে সকালে সূর্য ওঠার সময়, বিকালে সূর্য ডোবার সময় একনিষ্ঠ মনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ১ ঘণ্টা করে ডাকলে।" তিনি ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ বক্তব্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণীকে গাজা ও আফিম খাওয়া থেকে সুস্থ জীবনে ফিরে আনতে সক্ষম হন। আমেরিকা ও ইউরোপের বহু ধনাঢ্য ব্যক্তি শ্রীশীল প্রভুপাদের ইস্কনে কোটি কোটি ডলার পাউন্ড আর্থিক সাহায্য করেছেন, তার এ কাজে সন্তুষ্ট হয়ে। কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীশীল অভয় চরণার বিন্দু ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ-এর ১৯৭৭ সনের ১৪ই নভেম্বর মহাপ্রয়াণ হয়। আজ ইস্কনের প্রধান জয়পতাকা মহারাজ, ২০০৭ সনের ঢাকার স্বামীবাগে ইস্কনের কার্যালয়ে তাঁর একটি বক্তৃতা শুনেছিলাম গোবর্ধন পূজা উপলক্ষে। জয়পতাকা মহারাজ বলেছিলেন ঐ বক্তৃতায়, যেখানে ইস্কনের কার্যালয় আছে তার কয়েক কিলোমিটার এলাকার মধ্যে যত ক্ষুধার্ত মানুষ আছে, যত ক্ষুধার্ত পশুপাখী আছে সবাইকে উন্নত মানের পেট ভরে খাবার দিতে হবে গোবর্ধন পূজার দিনে এর জন্য যত অর্থের প্রয়োজন হয়, তা যদি আপনারা ব্যবস্থা করতে না পারেন তবে আমি দেব। কত বড় কথা। অথচ সেই ইস্কনের মায়াপুরে এখন দেখছি মন্দিরের ভিতরে সাধু-সন্ন্যাসীদের দ্বারা দোকান-পাট পরিচালিত হচ্ছে। তার মানে স্বামী প্রভুপাদের থিয়োরী পুরো সত্য নয়–সকালে-সন্ধ্যায় কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না। এর আগে দু'বার শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়েছি, তখন মায়াপুরের মন্দিরের ভিতরে শুধু গান ও বইয়ের দোকান দেখেছি, এখন দেখলাম অনেক পণ্যসামগ্রী, খাদ্য, পোশাক আইটেমসহ অনেক কিছু। ঈশ্বর ভগবান আল্লাহকে ডাকলেই সব সমস্যার সমাধান হবে না, তার প্রমাণ ইস্কনের মায়পুরের প্রধান কার্যালয়ে সাধুদের দ্বারা দোকান পরিচালনা করা। রাত দশটায় মায়াপুর থেকে চুপিতে ফিরে এলাম, খুব খারাপ রাস্তা, কষ্ট হলো। তবে দেবালয় দেখতে কষ্ট পেতেই হয় সেটা মেনে নিয়ে ফিরে এলাম।

মায়াপুরে থাকতেই দীপালোকের ফোন, "বাবলুদা, হুগলীর ত্রিবেণী থেকে আমার সম্বন্ধি এসেছে আপনাকে দেখতে এবং নিয়ে যেতে। তাড়াতাড়ি চলে আসেন। আমি বললাম, "তোমার স্ত্রীর বড় ভাই এসেছেন এত দূর থেকে আমাকে দেখতে, আমাকে নিয়ে যেতে অপেক্ষা করতে বলো–তার জন্য আমি মায়াপুর মন্দির থেকে কেক নিয়ে আসছি।"

২৪.০২.২০০৯ মঙ্গলবার সকাল ৮টার ট্রেন ধরে দীপালোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধী বিখ্যাত তবলাবাদক দেবীপ্রসাদ মিশ্রের সাথে চললাম তার বাসভবন ত্রিবেণীতে। দেবীপ্রসাদ খুবই উন্নতমানের তবলাশিল্পী, পশ্চিম বাংলার ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের অধীনে ত্রিবেণীর পাওয়ার হাউসে চাকরী করেন, বয়স ৪৯ বছরের মত হবে। ত্রিবেণীতে তার

www.pathagar.com

সরকারী বাসায় এসে তার বাবা সন্তোষকুমার দেবশর্মার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে খুব ভারমুক্ত হলাম। তারা বাবা সন্তোষ কুমার দেবশর্মা 'পঞ্চতন্ত্র' নামে একটি বই অনুবাদ করছেন। বইটি খুবই প্রয়োজনীয়, উন্নত এবং অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে লেখা কবিতার মাধ্যমে সংস্কৃতি ভাষায়, ধর্ম, মা, শিক্ষক, হরি ও বিবেক ৫টি বিষয়ের গুণগান করে ও তা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলার জন্য। ২০০৪ সনে বইটি পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার বাবার কাছে চিঠি লিখি, তিনি খুশী হয়ে চিঠির জবাব দেন যা এই বইতে চিঠিপত্র পরিচ্ছেদে ছাপা আছে। দেবীবাবুর বাসায় সকালে নাস্তা খেয়ে চললাম ত্রিবেণীর ও বাঁশবেড়িয়ার মন্দির দেখতে। অসাধারণ কারুকার্যময় পুরানো মন্দির। ১৭০০ সনের শেষ দিকে তৈরী করেছেন রাজা নৃসিংহ দেবের মা হংসেশ্বরী দেবীর নামে। হংসেশ্বরী মন্দির প্রাণ ভরে দেখলাম, শান্ত ছায়াময় মায়াময় পরিবেশ, সহজে প্রাণ জুড়ায় না, আরও থাকতে ইচ্ছে করে; কিন্তু এক ঘণ্টার বেশী থাকা সম্ভব নয়, অন্য জায়গায় যেতে হবে সেজন্য। সেখান থেকে গাঙ্গার ধারে রাজা মনীন্দ্র দেব পার্কে, রাজা মনীন্দ্র দেব, রাজা নৃসিংহ দেবের পালিত পুত্র কৈলাশের পুত্র দেবেন্দ্রনাথের পুত্র। গঙ্গাঘাটের সুন্দর পরিচ্ছন্ন বাঁশবেড়িয়ার রাজা মনীন্দ্র দেব পার্কে ৩০ মি: বসে সেখান থেকে আবার ত্রিবেণীর দেবীপ্রসাদবাবুর বাসায় দুপুরের খাবার খেয়ে হুগলি হাজী মহসিন কলেজ, ইমামবাড়া দেখবার জন্য ৩টায় বেরিয়ে পড়লাম। আসলে হুগলির জেলা সদর দপ্তর চুঁচুড়ায়, বর্ধমানের বিভাগীয় সদর দপ্তর চুঁচুড়ায় না দেখলে এসব অজানাই থেকে যেতো। হুগলি জেলার সদর দপ্তর চুঁচুড়ায় হাজী মো: মহসিনের ইমামবাড়া দেখলাম, ইমামবাড়ায় পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম ঘড়ি দেখলাম, নদীর ঘাটে মনীষী বা ঋষি-লেখক বঙ্গিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যে বাড়ীতে থেকে বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন সে বাড়ী দেখলাম, বাড়ীটি পুরোনো হয়ে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তা আবার ঐ মডেল ঠিক রেখে নতুনভাবে বানাচ্ছেন। হুগলির চুঁচুড়ায় যে জেলে কবি নজরুল ইসলাম বন্দি ছিলেন এবং 'কারার ঐ লোহ কপাট' বলে যে গান লিখেছেন, সেই জেল দেখলাম এবং ঐ জেলের সামনে নদীর ধারে ছনের ঘরে একটি চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম। সেখান থেকে এসে বর্ধমানের বিভাগীয় সদর দপ্তর দেখলাম। সেখান থেকে চুঁচুড়ায় প্রধান চৌমাথার রেস্টুরেন্টে বসে ফিস কাটলেট ও কফি খেলাম। সেখান থেকে ট্রেনে ধরে চলে এলাম পূর্বস্থলী হয়ে চুপিতে রাত দশটায়।

২৫.০২.২০০৯ বুধবার সকাল আটটার ট্রেন ধরে চুপি থেকে হাওড়া চলে এলাম ১০.৩০ মি:। সেখান থেকে মারকুইজ স্ট্রীট হোটেলে, হোটেল ২১শে-তে রুম পেলাম না, রুম নিলাম হেটেল ওরিয়েন্টালে দাওয়াত হোটেলের উপরে। ২৫শে ফেব্রুয়ারী খুব বেশী দূরে যাইনি, হোটেলের আশপাশ ঘুরে সময় কাটাই।

২৬শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, স্ত্রী কলকাতার মেট্রো রেলে চড়েনি, তাকে মেট্রো রেলে চড়াবার জন্য পার্ক স্ট্রীট স্টেশন থেকে দমদম পর্যন্ত গেলাম, সকালের মেট্রো, অফিস-টাইম, খুব ভীড়। আবার দমদম থেকে ফিরে মহাত্মা গান্ধী স্টেশনে নেমে বেশ অনেকটা দূরে কলেজ স্ট্রীট গেলাম বই কেনার জন্য, নারায়ণ সান্যালের হংসেশ্বরী

www.pathagar.com

মন্দির নিয়ে লেখা হংসেশ্বরী উপন্যাস রামকৃষ্ণ কথামৃত, ভারত-সাধক-সাধিকা ও সেভেন ইন্ডিয়ান ক্লাসিকসহ কয়েকটি বই কিনলাম। সেখান থেকে সৈয়দ আমীর আলি রোডে এলাম গোটো ইন্ডিয়া অফিসে, যারা ঢাকার নভোথিয়েটার করেছে, সে অফিসে, সেখান থেকে সল্ট লেকে সুখময় দত্ত সাহেবের বাসা, দুপুরে এখানে খাবার খেয়ে দত্ত সাহেবের বাসাতেই থাকি, বৃহৎ সাইজের পাবদা মাছসহ রাতের ডিনার এ বাসাতেই খেয়ে রাত নটায় মারকুইজ স্ট্রীটে হোটেল ওরিয়েন্টালের উদ্দেশে রওনা দিই, হোটেলে এসে ঘুমিয়ে পড়ি।

২৭.০২.২০০৯ শুক্রবার, আমাদের বাড়ি সিরাজগঞ্জ জেলার জামতৈল রেলস্টেশনের কাছে তামাই গ্রামে। ১৯১৫ সন থেকে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত নিয়মিত দৈনিক সিরাজগঞ্জ-কলকাতা ট্রেন যাতায়াত করেছে, আমাদের তামাই গ্রামের আমার বাবা-চাচারাসহ বহু লোক অনেকবার কলকাতা গিয়েছে ১৯৬৫ সন পর্যন্ত। ছোটবেলায় আমাদের গ্রামের যারা কলকাতায় গিয়েছেন তাদের কাছে কলকাতার গড়ের মাঠ, হাওড়া ব্রিজ, নাখোদা মসজিদ, বৌবাজার, নিউমার্কেট ও নিউমার্কেট মসজিদের কথা অনেক শুনেছি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সকালে হোটেল থেকে প্রায় ১ মাইল পথ হেঁটে গিয়ে নিউমার্কেট মসজিদে ফজরের নামাজ পড়লাম। ইচ্ছা ছিল শুক্রবার ছোটবেলা থেকে শোনা কলকাতার নাখোদা মসজিদে জুমার নামায পড়ব, কিন্তু শুক্রবারে শরীরে বেশ জ্বর থাকায় সে ইচছা ত্যাগ করি, ছোটবেলার শখ, নাখোদা মসজিদে নামায পড়া হল না। মার্কুইজ স্ট্রীটের জামে মসজিদে জুমার নামাজ পড়লাম। ২৫শে তারিখ বুধবার বর্ধমানের চুপি থেকে বিকালে ফোন করে দীপালোক বলে, “বাবলু ভাই, ঢাকায় আপনার বাসা এলিফ্যান্ট রোডের সাথে পিলখানায় খুব গোলমাল হচ্ছে, গোলাগুলি হচ্ছে বি,ডি,আর সদর দপ্তরে। আমি তেমন আমলে নেই না, ২৬ তারিখ বিকাল এবং সন্ধ্যেয় দত্ত সাহেবের বাসায় বসে টেলিভিশনে ঢাকার পিলখানার ঘটনাটা দেখলাম। ২৭ তারিখে কলকাতার মানুষের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। আমি সান্ত্বনা দিই, দাদা সব ঠিক হয়ে যাবে। আমরা মুসলমান, এসব রক্তপাত মুসলমানদের দেশে অহরহ হয়, ভয়ের কিছু নেই। আমি মুখে এসব কথা বললেও আসলে ভিতরে ভিতরে খুব ভয় পেয়ে যাই, না জানি কি হয়। ২৭ তারিখের খবরের কাগজ দেখলাম, বর্ডারে ইমিগ্রেশনে প্রচণ্ড ভীড়, সহজে ইমিগ্রেশন দিচ্ছে না। ইচ্ছা ছিল হায়দারবাদ যাব। তখনও কাছে ৪০০ ডলারের মতো, ২০,০০০ রুপি হাতে আছে। কিন্তু ঢাকার গোলমালের কথা শুনে হায়দারাবাদ ভ্রমণ বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ২৭ তারিখে ডলার ভাঙিয়ে স্ত্রী মনের সুখে কলকাতার নিউমার্কেটে অনেকগুলো থ্রি পিছ ক্রয় করলো আমার দু'বোন ও তিন ভাইয়ের স্ত্রীর জন্য ও নিজের জন্য। ২৭শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাতে পার্ক স্ট্রীটে খুব নামী হোটেল বারবিকিউএ- রাতের ডিনার খেতে যাই একা, স্ত্রী সাথে গেলো না। চাইনিজ খাবার খেলাম। বারবিকিউ-এর খৃস্টান ওয়েটারদের সাথে কথা বললাম, আমি ঢাকার লোক একথা শুনে তিনজন ওয়েটার কথা বলার জন্য বেশ আগ্রহ দেখালো। ওদের সাথে কথা বলে জানলাম পশ্চিমবাংলায় ছয় কোটি ভোটারের মধ্যে মুসলিম এক

www.pathagar.com

কোটি বিশ লাখ এবং খৃস্টান ভোটার ৪০ লাখ। পশ্চিমবাংলায় ৪০ লাখ খৃস্টান ভোটার একথা শুনে আশ্চর্য হলাম। আবার কলকাতা গেলে কমপক্ষে চারবার বারবিকিউ হোটেলে লাঞ্চ ও ডিনার করবো। পার্ক স্ট্রীটের বারবিকিউ হোটেলের খাবার খুব ভালো লেগেছে আমার। আমাদের ঢাকার লোকদের মুখে হোটেল আমিনিয়া ও হোটেল নিজামিয়ার খুব প্রশংসা। এখানে ভালো বিরিয়ানী পাওয়া যায়। তবে বারবিকিউ-এর খাবারের কাছে এসব কিছু না। আমিনিয়া, নিজামিয়ার একজন ১৫০ রুপিতে খাবার খেতে পারবে বারবিকিউতে চার জনের ৬০০ রুপিতে অনেক ভালো খাবার হবে। পার্ক স্ট্রীটের বারবিকিউ হোটেলের সামনে মিউজিক ওয়ার্ল্ডের গানের ক্যাসেট ও রেকর্ডের দোকান, ভিতরে গেলে গানের ক্যাসেট ও রেকর্ড দেখে আশ্চর্য হতে হয়! কি বিশাল দোকান আর কত হাজার হাজার ক্যাসেট ও রেকর্ড।

২৮.০২.২০০৯ শনিবার মৈত্রী এক্সপ্রেস-এ উঠলাম। সকাল ৭.৩০ মিনিটে ট্রেন চিৎপুর ছাড়ে, ব্যারাকপুর, নৈহাটি, রানাঘাট হয়ে ৯.৩০ মিনিটে গেদেতে আসে। গেদেতে কাস্টমস আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে, খুব দুঃখজনকভাবে। আমাদের কাছে এত লেডিস ড্রেস দেখে কাস্টম আপত্তি জানায়, আমি শুধু বলেছি যে, আমি জানি যে একজনে ২০০ ডলারের জিনিসপত্র বিনা শুল্কে নিতে পারে, আমাদের দু'জনের মালামাল ২০০ ডলারের মধ্যেই আছে। ব্যাস শুরু হয়ে গেল, অফিসারকে ডাকলো, আমার বিরুদ্ধে নালিশ করলো, কেন আমি আইন দেখালাম, আমার মালের ক্যাশমেমো কই, এটা কই, সেটা কই, প্রচণ্ড গালাগালি–কেন আমি এত মালামাল নিচ্ছি, ভীষণ খারাপ ব্যবহার, অনেক ভুগিয়ে অবশেষে মাল ছাড়ে। ৯.৩০ মিঃ ট্রেন গেদেতে আসে ১১.৩০ মিঃ ট্রেন ছেড়ে দেয়। দর্শনা ট্রেনে এসে নেমেই দেখি বেশ অনেক বি.ডি.আর সাহেব রাইফেল নিয়ে আমাদের রিসিফ করার জন্য প্লাটফর্মে রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ঢাকায় গোলমাল হয়েছে, এখানে কিছু হয় নাই।

মৈত্রী এক্সপ্রেসের জার্নির কথা বলতে গেলে বলতে হয়, গেদের কাস্টম ইমিগ্রেশনের দুই একজন কর্মচারীর মাত্রাতিরিক্ত খারাপ ব্যবহার এবং দর্শনা ও গেদেতে মোট পাঁচ ঘণ্টা বিনা কারণে বসিয়ে রাখা, এটা খুবই বিরক্তিকর। এটা বাদ দিলে আমি বাথ বা কেবিনের টিকিট করেছি, যা সর্বোচ্চ শ্রেণীর, ফলে আমার মৈত্রীতে ট্রেন জার্নি মহাসুখের হয়েছে।

আর এই ২.৮.০৯ থেকে ২৮.২.০৯ ভারত সফর করলাম, এতজনের সাথে মিশলাম, এত জায়গায় গেলাম, অনেক লেডিস ড্রেস ক্রয়, ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৯ শনিবার থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০৯ শনিবার পর্যন্ত কলকাতার এবং দিল্লীর অনেক সুন্দর জায়গা, নতুন পুরান অনেক স্থাপনা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, খুব ভালো লেগেছে, প্রাণ ভরে গিয়েছে, কিন্তু এর পরেও বলতে চাই ২৮.২.০৯ তারিখ শনিবার মৈত্রী ট্রেন যখন দর্শনা থেকে ছেড়ে ঈশ্বরদীর দিকে রওনা দিলো, ট্রেনের জানালা দিয়ে দু'ধারের বাংলাদেশের মাঠ-ঘাট, খাল-বিল-গ্রাম ও ধানের মাঠের যে সৌন্দর্য আমার চোখে ফুটে উঠলো, তা দেখেও মন খুশীতে মুগ্ধ হয়ে গেল। আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম। জননী জন্মভূমি

www.pathagar.com

স্বর্গাদপি গরিয়াসী। যাবার সময় ২০টি তাঁতের শাড়ী কিনেছিলাম ৩০,০০০ টাকায়। এসব মিলে আমাদের দু'জনের ভারত ভ্রমণে খরচ হয়েছে একলাখ দশ হাজার টাকার।

২৮.০২.০৯ শনিবার রাত ৮.৩০ মি:-এ ঢাকার ক্যান্টনমেন্ট অবতরণ করে বেঙ্গল এয়ার লিফ্‌টের মাইক্রোবাস-যোগে বাসায় ফিরে আসি।

২২.০৮.২০০৯

শনিবার, প্রিন্স টাওয়ার

এলিফ্যান্ট রোড

www.pathagar.com

১৯৭৭ সন : প্রসঙ্গ আবুল ফজল উইল ডুরান্ড ও আহমদ ছফা

১৯৭৫ সনের নভেম্বর মাসে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম সাহেব বাংলদেশের ক্ষমতায় বসেন সামরিক আইনের আওতায়। সায়েম সাহেব হন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, জিয়াউর রহমান হন সেনাবাহিনী প্রধান ও উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, পদবীর সঙ্গে অর্থমন্ত্রণালয়সহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সায়েম-জিয়া সরকারে কয়েকজন মন্ত্রী মর্যাদায় উপদেষ্টা নিয়োগ পায়, এদের একজন হলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক জনাব আবুল ফজল। আবুল ফজল সাহেব কয়েক মাস উপদেষ্টা থাকেন, তারপরে তাকে সরিয়ে দিয়ে সৈয়দ আলী আহসান সাহেবকে উপদেষ্টা করা হয়। দুজনেই শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ছিলেন। আবুল ফজল সাহেব চট্টগ্রামের মানুষ, মাঝে-মধ্যে কাজ থাকলে ঢাকায় আসতেন। আমাদের বড় ভাই গুরু ঘনিষ্ঠ আপনজন সাহিত্যিক ও কবি আহমদ ছফার বাড়ীও চট্টগ্রামে। ১৯৭৭ সনে থাকতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে ১০৭ নং কক্ষে। ১৯৭৭ সনে আমি থাকি সূর্য সেন হলে। ১৯৭৭ সনে একদিন ছফা ভাই বললেন, "বাবলু আবুল ফজল সাহেব ঢাকায় এসেছেন, আজিমপুরে ওনার আত্মীয়র বাসায় আছেন, চলো ওনার সাথে দেখা করে আসি।" দুজনে এক রিক্সায় আজিমপুর যে বাসায় ছিলেন সেই বাসায় যাই। আবুল ফজল সাহেবের সাথে ছফা ভাই কথা বললেন, এক পর্যায় আমাকে আবুল ফজল সাহেবের সাথে পরিচয় করে দিলেন, সিরাজগঞ্জে বাড়ী বলে ছফা ভাই উল্লেখ করলেন। আবুল ফজল সাহেব বললেন, "বাংলাদেশের বাঙালী মুসলমানদের আধুনিক ও ইংরেজী শিক্ষা লাভের জন্য দুজন ব্যক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন, এদের একজনের বাড়ী সিরাজগঞ্জ। আর তিনি হলেন ইসমাইল হোসেন সিরাজী, অন্য জনের বাড়ী চট্টগ্রামে মওলানা মনিরুজ্জামানর ইসলামাবাদী। কাজেই তোমার বাড়ী যেহেতু সিরাজগঞ্জে আর আমাদের বাড়ী চট্টগ্রাম তোমার সাথে আমাদের একটা বিশেষ সম্পর্ক আছে।" আমি আবুল ফজল সাহেবের মুখ থেকে একথা শোনার পরে বললাম, আমার নানা এমদাদুল হক তালুকদার ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবর খুব ঘনিষ্ঠ ও ভক্ত ছিলেন। তার কাছে রাখা ১৯২০ সন থেকে ১৯৩০ সন পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত অর্ধ সাপ্তাহিক সোলতান পত্রিকা আমি ১৯৬৭-৬৮ সনে পড়েছি। আমি যখন আমাদের গ্রামের স্কুলে ৭ম ও অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন। ১৯৬৭-৬৮ সনে স্কুলে পড়ার সময় সাপ্তাহিক সোলতান পত্রিকা পড়েছি শুনে আবুল ফজল সাহেব খুব খুশী হলেন। তখন থেকেই তার সাথে আমার ভালো পরিচয়। কথা প্রসঙ্গে আবুল ফজল সাহেব মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উপদেষ্টা হিসেবে যোগদান করার অভিজ্ঞতা বললেন–"কোন ভালো কাজ করা যায় না, বাধা আসে সরকার প্রধানদের কাছ থেকে, মিছেমিছি সামরিক সরকারের অধীনে উপদেষ্টা হলাম। মান সম্মান গেলো, অথচ কিছুই করতে পারলাম না।"

এবার ছফা ভাই বললেন, "স্যার, আর কিছু হোক বা না হোক উপদেষ্টা হবার

www.pathagar.com

জন্যই বাংলা একাডেমী আপনার অনুবাদ উইল ডুরান্ডের 'হিস্ট্রি অব ফিলোসফি' বইটি ছেপেছে। উপদেষ্টা না হলে এ বই বাংলা একাডেমী ছাপতো না, এই একটি বই বাংলা ভাষায় প্রকাশ হবার কারণে আপনার কাছে অনেকদিন কৃতজ্ঞ থাকবে এদেশের মানুষ।" আবুল ফজল সাহেব হেসে বললেন, "প্রায় দশ বছর আগে বইটির অনুবাদ করে বাংলা একাডেমীতে পাণ্ডুলিপি জমা দিয়েছিলাম। কিন্তু কোন সাড়া পাইনি, উপদেষ্টা হবার একমাসের মধ্যে বইটি বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে।" উইল ডুরান্ডের হিস্ট্রি অব ফিলোসফি" বইটির নাম তখন প্রথম শুনি, এর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ালেখা করার সময় বহুবার এ বইয়ের নাম শুনি, জগদ্বিখ্যাত দর্শনচর্চার বই।

সেই ১৯৭৭ সনে বইটির নাম শুনলেও বইটি প্রথম ক্রয় করি গত ১৬ .৬. ২০০৮ তারিখে। আবুল ফজল সাহেবের অনূদিত উইল ডুরান্টের এ বইটি পড়ে আমি খুবই লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই, দর্শনশাস্ত্রের এমন একটি প্রয়োজনীয় এবং এত উন্নত ও গুণগতমানের বইটি আগে না কিনে পড়ার জন্য। বইটি অবশ্যই আমার অনেক আগেই পড়া উচিত ছিল। উইল ডুরান্ড হিস্ট্রি অব ফিলোসফি বইতে প্লেটো, এরিস্টটল, ফ্রান্সিস বেকন, স্পিনোজা, ভল্টেয়ার, ইমানুয়েল কান্ট, হার্বার্ট স্পেন্সার, ফ্রেড্রিক এঙ্গেলস, সমকালীন ও আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিক হেনরী বার্গস, বেনে দেত্তো ক্রোচে, বার্টান্ড রাসেল, আমেরিকার আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ জর্জ সান্তায়ানা, উইলিয়াম জেমস, জন ডিউই, এই ১৫জন রাষ্ট্র ও সমাজদর্শনের জগৎ কাঁপানো দার্শনিকের দর্শনের বিষয়বস্তু পাঠক-পাঠিকাদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছেন।

এই বইয়ের তৃতীয় অধ্যায়ে ফ্রাসিস বেকনকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনা করেছেন ফ্রান্সিস বেকনের লেখা, তার দর্শন ও জীবনী নিয়ে। ফ্রান্সিস বেকনের লেখা ও দর্শন আলোচনা করতে গিয়ে উইল ডুরান্ড সাহেব চার শ' বছর আগের রানী প্রথম এলিজাবেথের সময়ে লেখা কবি রজার এ্যাসেমের একটি কবিতা এ বইয়ের ১৩৩ পৃষ্ঠায় তুলে দিয়েছেন। তা হচ্ছে "সুন্দর চেহারা, চাটুকার, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, জুলুমবাজ, এ পাঁচ বৈশিষ্ট্য যার নেই তাকে কোন সময় কোন রাজা, রানী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তি কাছে রাখে না। যার এই পাঁচ বৈশিষ্ট্য যত বেশী তাকে তত বেশী কাছে রাখে রাজা রানী বা ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা। কি বাস্তব কথা, চার শ' বছর আগে রানী এলিজাবেথের আমলে কবি রজার এ্যাসেম এই কবিতা লিখে থাকলেও আজো এ কথা ধ্রুব সত্য। মিথ্যাবাদী, প্রতারক, জুলুমবাজ, চাটুকার ও সুন্দর চেহারা এই পাঁচ বৈশিষ্ট যার যত বেশী তারাই আজও ততবেশী প্রেসিডেন্ট, প্রধান মন্ত্রীদের প্রিয়ভাজন হয়ে আসছে। এরাই প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের কাছে থাকার সুযোগ পায়। উইল ডুরান্ডের হিস্ট্রি অব ফিলোজফির আবুল ফজলকৃত অনুবাদ পড়ে আমার সেই ১৯৭৭ সনের আহমদ ছফা ভায়ের কথা খুব মনে পড়ে। আর যাই হোক, উইল ডুরান্ডের অনুবাদ বই প্রকাশ করার জন্য আবুল ফজল সাহেব অনেক দিন ধরে বাংলাভাষার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে শ্রদ্ধার আসনে বিরাজিত থাকবেন। অন্তত রজার এ্যাসেমের কবিতাটির জন্য।

২৮. ৮. ২০০৯, শুক্রবার

www.pathagar.com

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের পরে আওয়ামী লীগের জন্মকথা : ১৯৮১ পর্যন্ত

১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। নতুন অবৈধ রাষ্ট্রপতি হন খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ। ১৯৭৫ সনের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাকসাল বা একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। ১৯৭৫ সনে ১৫ই আগস্ট খোন্দকার মোশতাক প্রেসিডেন্ট হয়ে ঘোষণা দেন তিনি সব রাজনৈতিক দল আবার চালু করবেন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন।

১৯৭৫ সনের ৩রা নভেম্বর সেনাবাহিনীর পাল্টা-পাল্টি ক্যুর মাধ্যমে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফ নতুন সেনাবাহিনী প্রধান হন, মেজর জেনারেল পদে উন্নীত হন, অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাক তাকে এই পদে প্রমোশন দেন। নভেম্বর ৫ তারিখ মোশতাককে সরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদত মোঃ সায়মকে সেনাবাহিনীর লোকজন রাষ্ট্রপতি বানান।

৬ই নভেম্বর সেনাবাহিনীতে আবার বিদ্রোহ হয় খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে জেনারেল জিয়ার পক্ষে, জেনারেল জিয়া আবার সেনাবাহিনী প্রধান এবং উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হন ৭ই নভেম্বর । ৩রা নভেম্বর ভোরে ১৫ই আগস্টের ঘাতকরা জেলখানায় বন্দী চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে জেলের ভিতরে প্রবেশ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। সেনাবাহিনীর প্রধান হবার জন্য খালেদ মোশারফ এই কু না করলে এই চার জাতীয় নেতা হয়তো বা নিহত হতেন না। ৭ই নভেম্বর ভোরে জোয়ানরা শ্লোগান দেয় 'সিপাহী জনতা ভাই-ভাই অফিসারদের কাল্লা চাই', 'সিপাহী জনতা ভাই ভাই অফিসারদের রক্ত চাই'। এ শ্লোগান দিয়ে বেশ কয়েকজন সেনাবাহিনীর অফিসারকে তারা হত্যা করে। ঐদিন আরও শ্লোগান দেয় সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য "সিপাহী জনতা ভাই ভাই, বাকশালীদের রক্ত চাই, রুশ-ভারতের দালালদের হত্যা কর, জবাই কর", "নারায় তকবীর আল্লাহু আকবর।"

সকালে রেডিওতে জিয়াউর রহমান ভাষণ দেন, সেনা-সদস্যদের ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন। তার এই ভাষণে জনমনে ভীষণ স্বস্তি ফিরে আসে। জিয়াউর রহমান আবার নতুন করে জনতার মাঝে হিরো হন। যেসব সেনা সদস্য জিয়ার ঘোষণা অমান্য করে ক্যান্টনমেন্টের ব্যারাকে ফিরে যায়নি তাদের ধরে ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। ১৯৭৬ সনের ১লা আগস্ট থেকে সায়েম-জিয়া সরকার দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য শুধুমাত্র ঘরের মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের 'ঘরোয়া রাজনীতি' নামে সমাবেশ চালু করার ঘোষণা দেন এবং পি.পি.আর Political Party Regulation ১৯৭৬ ঘোষণা করেন।

www.pathagar.com

সে-অনুযায়ী ১৯৭৬ সনের ১লা আগস্ট ধানমণ্ডি ২৭ নং রোডে মতিউর রহমান সাহেবের বাসায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা নতুনভাবে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রথম সমাবেশে বসেন। এখানে দুই ধরনের মতবাদ প্রকাশ করা হয় তীব্রভাবে, একভাগ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে বঙ্গবন্ধু যেখানে শেষ হয়েছেন সেখান থেকে শুরু করতে হবে অর্থাৎ বাকশাল এবং একদল। বাকশাল এবং একদলের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দেন ন্যাপের মহিউদ্দিন আহমদ, চট্টগ্রামের সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন, ১৯৭৩ সনের এমপি কক্সবাজারের জহিরুল হক। তরুণ আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে রাজিউদ্দিন আহমদ, খালেদ মোঃ আলী, অধ্যাপক আলী আশরাফ বাকশাল মতবাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ গঠন করার জন্য মোল্লা জালাল, মিজান চৌধুরী, মালেক উকিল, আব্দুল মান্নান, মোমিন সাহেবদের পক্ষে নেন। এই বৈঠক বা সভা চলার সময় মতিউর রহমান সাহেবের বেডরুমে মোল্লা জালাল, আব্দুল মালেক উকিল, মিজান চৌধুরী, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মোমেন বৈঠক থেকে উঠে এসে বসেন আলাপ-আলোচনা করার জন্য। আমি নিজেও মতিউর রহমানের বেডরুমে এই নেতাদের সাথে প্রবেশ করি। আমি প্রস্তাব দিই প্রথমে একজনকে আহ্বায়ক করে ছোট একটি কমিটি করা হোক এবং সাবেক সংসদের স্পীকার আব্দুল মালেক উকিলকে আহ্বায়ক করার হোক। সাথে নয় সদস্যের নাম লিখে দিই আমার নিজের হাতে । তাঁরা হলেন :

আহ্বায়ক : আব্দুল মালেক উকিল

আহবায়ক কমিটির সদস্য

১। মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমেদ

২। মিজানুর রহমান চৌধুরী

৩। আব্দুল মোমিন

৪। আব্দুল মান্নান

৫। ফণিভূষণ মজুমদার

৬। সোহরাব আলী

৭। প্রফেসর ইউসুফ আলী

৮। মতিউর রহমান

৯। ময়েজউদ্দিন আহমেদ

মতিউর রহমানের বেডরুমে উপস্থিত নেতারা সবাই আমার এই প্রস্তাব এবং নাম সমর্থন করলেন। নেতৃবৃন্দ বাইরে এসে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করলে উপস্থিত নেতা-কর্মীদের বেশীর ভাগ এই ঘোষণায় খুশী হয়ে মেনে নিলেন। মহিউদ্দিন আহমদের সমর্থকরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেননি। (পড়ে দেখুন ১৯৭৬ সনের ২রা আগস্ট ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক বাংলা, বাংলাদেশ অবজারভার, বাংলাদেশ টাইমস)। মালেক উকিল সাহেব আহ্বায়ক এবং উক্ত নয়জন আহ্বায়ক

www.pathagar.com

কমিটির সদস্য নিয়ে কাজ শুরু হয়। এতে আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ ও প্রেরণা আসে। যখন এক দুই মাস এই কমিটি কাজ করেছেন, তখন আহ্বায়ক কমিটির এক মিটিংয়ে মালেক উকিল সাহেব পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "আমি আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে চাই না, আমার অসুবিধা আছে"। মিজান চৌধুরী ও আব্দুল মান্নান সাহেবের কাছে পরে শুনেছি অজ্ঞাত টেলিফোনে হুমকি দেবার ফলে মালেক উকিল সাহেব এই সিদ্ধান্ত নেন। যাই হোক, ঐ বৈঠকে উপস্থিত মহিউদ্দিন আহমদ সাহেব ঘোষণা করেন যেহেতু কমিটির আহ্বায়ক পদত্যাগ করেছেন, কাজেই ঐ কমিটির অস্তিত্ব আর নেই। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে সাবেক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট কামরুজ্জামান সাহেব নিহত হয়েছেন, আমি ১নং ভাইস প্রেসিডেন্ট, অতএব আমিই আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট এবং মোস্তফা সারওয়ার সেক্রেটারীদের মধ্যে আছেন, অতএব সে সেক্রেটারী, আর যেহেতু অন্যরা জেলে, কাজেই এভাবেই আওয়ামী লীগ চলবে। মোস্তফা সারওয়ার সেক্রেটারী হতে রাজী না হওয়ায় মিসেস সাজেদা চৌধুরী সেক্রেটারী হন। এখানে উল্লেখ্য যে, যদিও আহ্বায়কসহ ১০ সদস্য নিয়ে আহ্বায়ক কমিটি কিন্তু সব আহ্বায়ক কমিটির সব বৈঠকেই ১৫/২০ জন নেতা উপস্থিত থাকতেন, সেজন্য মহিউদ্দিন সাহেব থাকতেন। মহিউদ্দিন-সাজেদা চৌধুরী প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী হয়ে দু'এক মাস কাজ করেন, কিন্তু এরা দল গঠন করতে প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ হন। পিপিআর অমান্য করে বক্তৃতা দেন, একদল বাকশাল কায়েম করার জন্য শপথ নেন। দলের সিনিয়র নেতাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অশালীন ভাষায় বক্তব্য দেন। যার পরিণতিতে কিছু দিন পরে আর মহিউদ্দিন ও সাজেদা চৌধুরীর খবর পাওয়া যায় না। তারা আত্মগোপন করে বা পালিয়ে থাকতে বাধ্য হন, অনেকে গ্রেফতার হন। মতিউর রহমানের বাড়ীতে গঠিত উল্লিখিত আহ্বায়ক কমিটির নেতারা আবার বৈঠকে বসে এবারে বড় আকারের কমিটি গঠন করেন। মোল্লা জালাল এবং মিজানুর রহমান চৌধুরী–এইদুজনকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৪৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি প্রায় ৬/৭ মাস কাজ করেন। সারা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা সদরে মিটিং ও কমিটি গঠন করেন, মিজান চৌধুরীর জ্বালাময়ী উদ্দীপনামূলক বক্তব্য সারা দেশে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে নতুন জোয়ারের সৃষ্টি করে।

১৯৭৭ সনে ইডেনে আহ্বায়ক কমিটির বদলে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের জন্য কাউন্সিল অধিবেশন ডাকা হয়। কাউসিলে ছাত্রলীগের ছেলেরা মাথায় লাল পট্টি বেঁধে শ্লোগান দেয় রাজ্জাক, তোফায়েলকে জেলে রেখে কোন কমিটি করা চলবে না, নেতাদের জেলে রেখে কমিটি করা যাবে না। যাক, নেতারা পূর্ণাঙ্গ কমিটি না করে আহ্বায়ক কমিটি দিয়ে কাজ চালিয়ে যাবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু এইখানে আমার প্রিয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের মারাত্মক এক ভুল করেন, যার পরিণতি আজকের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব, তিনি আওয়ামী লীগের ক্লাসিকাল রাজনৈতিক নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটান। মিজান চৌধুরী বলেন, "আমি মোল্লা জালাল ভাইয়ের সাথে আহ্বায়ক হয়ে কাজ করবো না, হয় আমাকে একা আহ্বায়ক করতে হবে, না হয়

www.pathagar.com

অন্য কিছু করতে হবে। মোল্লা জালাল ভাই মহিউদ্দিন ও খোন্দকার ইলিয়াসের বাকশালের নেতাকর্মীদের মিটিংয়ে নেয়। তারা আমার পয়সায় টিকিট করে যায়, মিটিংয়ে গিয়ে আমার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেয়।”

আসলে মোল্লা জালাল সাহেব খুব ভদ্রলোক এবং নরম মেজাজের মানুষ ছিলেন। তিনি নিজে বাকশালের বিরুদ্ধে কিন্তু বাকশালপন্থী মহিউদ্দিন ও খোন্দকার ইলিয়াসের লোকজন তার কাছে গিয়ে তাদের পক্ষে কাজ করতেন, তিনি না করতে পারতেন না। মোল্লা জালালের ঘাড়ে পা দিয়েই রাজ্জাক, তোফায়েল ও মহিউদ্দিন সাহেবরা নতুন আওয়ামী লীগে নিজেদের অবস্থান শক্ত করে নেন। । যাই হোক, আসলে মিজানুর রহমান চৌধুরীর উচিত ছিল মোল্লা জালালের সাথে যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে আরও ১ বছর কাজ করা, ঐ কমিটি বহাল রাখা। তাহলে আওয়ামী লীগের ঐ ক্লাসিকাল বা ভদ্রলোকদের আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের পতন হতো না। মিজান চৌধুরী মোল্লা জালালের সাথে যৌথভাবে আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করতে রাজী না হওয়ায় জহিরুল কাইয়ুম, ফণিভূষণ মজুমদার, মতিউর রহমান এই তিন নেতা আওয়ামী লীগের খারাপ লোকদের উস্কানি ও প্ররোচনায় জহুরা তাজউদ্দিনকে দলের একক কনভেনার বানান।

জহুরা তাজউদ্দিন কনভেনার হয়ে আওয়ামী লীগের ভালো লোকদের উৎখাত করে আওয়ামী লীগের খারাপ লোকদের দলের মধ্যে বসাতে উঠে-পড়ে লাগেন। এবং এ কাজে তিনি বিরাটভাবে সফল হন। যারা বলেন জহুরা তাজউদ্দিন আওয়ামী লীগের হাল ধরেছেন, তারা ভুলে যান যে তার আগে মোল্লা জালাল, মিজান চৌধুরীরা আহ্বায়ক হয়ে ৭/৮ মাস দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৬ সনের ১লা আগস্টের পর তার আগে ২/১ মাস মালেক উকিল আহ্বায়ক হয়ে কাজ করেছেন। সামরিক আইনের ধার ছিলো ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৭৬ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত। এই সময়ে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতার হয়েছে। ১৯৭৬ সনের ১লা আগস্ট এর পরে খুব কম নেতা কর্মী গ্রেফতার হয়েছে। ১৯৭৭ সনে জহুরা তাজউদ্দিন যখন কনভেনার, ততদিনে সামরিক আইনের ধার অনেকটা ভোঁতা হয়ে গিয়েছে। জহুরা তাজউদ্দিন কনভেনার হতে পেরেছিলেন মিজান চৌধুরীর ভুলের জন্য। সেদিন মিজান চৌধুরী মোল্লা জালালের সাথে যৌথভাবে আহ্বায়ক হলে আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের সর্বনাশ হতো না। শক্তিশালী আওয়ামী লীগ দেখলে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল করতে সাহস পেতেন না বলে বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মনে করেন। আমি তাদের সাথে একমত। স্বয়ং জিয়াউর রহমানও এ কথাটা তার ঘনিষ্ঠ লোকদের কাছে বলেছেন বলে শুনেছি। ১৯৭১ সন থেকে ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্টের আগ পর্যন্ত যারা তাজউদ্দিন আহমেদের বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা কথা বলেছে, অন্যায়ভাবে তাঁর সমালোচনা করেছেন–আশ্চর্যজনকভাবে জহুরা তাজউদ্দিন তাদের সাথে আট-ঘাট বাঁধেন ও দলে তাদের স্থান দেন। যারা তাজ উদ্দিন সাহেবের সমর্থক ও বন্ধু ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে জোহরা তাজউদ্দিন অবস্থান নেন এবং এদের কোন কথাই শুনতে চান নাই কনভেনার থাকার সময়ে। এরপরে ১৯৭৮ সনে আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

কাউন্সিল হয়। ঐ কাউন্সিলে আব্দুল মালেক উকিল সভাপতি, আব্দুর রাজ্জাক জেনারেল সেক্রেটারী, তোফায়েল আহমেদ সাংগঠনিক সম্পাদক হন।

আওয়ামী লীগের মধ্যে দুই মতবাদ চলতেই থাকে, মহিউদ্দিন আহমদ, আব্দুস সামাদ আজাদ, আব্দুর রাজ্জাক বাকশাল করবেন, মিজান চৌধুরী, মালেক উকিল, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মোমিন, দেওয়ান ফরিদ গাজী, সুধাংশু শেখর হালদার, আমির হোসেন আমু মযেজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ বহুদলভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে। এক সময়ে মিজান চৌধুরী বিরক্ত হয়ে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে পাল্টা আওয়ামী লীগ গঠন করেন, সাথে নিয়ে যান অনেক ত্যাগী সজ্জন ভদ্রলোক, আওয়ামী লীগের নেতাদের। ব্যাপক সংখ্যক আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ কর্মী আব্দুল মালেক উকিল, আব্দুল মান্নান, আব্দুল মোমিন, রাজ্জাকের সাথে থেকে যান। অপর প্রভাবশালী নেতা তোফায়েল আহমদ দিনে আব্দুর রাজ্জাকের সাথে বাকশাল, রাতে বাকশালের বিরুদ্ধে মালেক উকিল, মান্নান গ্রুপে। আওয়ামী লীগ ও বাকশালের ব্যাপারে মতাদর্শগত বিরোধ থেকেই যায়। অবশেষে ১৯৮১ সনের আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে এই মতাদর্শগত বিরোধজনিত কারণে বিদেশে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনাকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট পদে আনা হয়। দ্বিতীয়ত ১৯৮১ সনের কাউন্সিলে প্রেসিডেন্ট কে হবেন তা নিয়েও বিরোধ ছিলো। রাজ্জাক সাহেব, কোরবান আলী, সামাদ আজাদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, মালেক উকিলসহ আরও দুই একজনকে কথা দিয়েছেন ১৯৮১ সনের কাউন্সিলে তাদের সভাপতি করার জন্য, কিন্তু সভাপতির পদ একটাই। কাকে বাদ দিয়ে কাকে করবেন? বিপদে পড়ে যান জনাব আব্দুর রাজ্জাক, ফলে বাধ্য হয়ে শেখ হাসিনাকে নেত্রী বানাতে সবাই সম্মত হন।

শেখ হাসিনা সভানেত্রী হয়ে ধর্মহীন রাজনৈতিক বক্তব্য ও সমাজতন্ত্রের কথা উৎখাত করে মিজান চৌধুরীদের যে বক্তব্য ছিল তাই গ্রহণ করে আওয়ামী লীগ ও দেশ পরিচালনা করছেন। তবে তিনিও দলে জহুরা তাজউদ্দিনের মতই বেশ কিছু বাজে লোককে, অনেক বাকশাল, ছাত্র ইউনিয়ন, কম্যুনিস্ট পার্টির লোকদের নেতা-মন্ত্রী বানিয়েছেন। আবার অনেক ভালো লোককে দলে আশ্রয় দিয়ে মন্ত্রী বানিয়েছেন, দুই চার জন খুব ভালো মানুষকে দলে বা সরকারে রাখেননি। তবে তিনি আওয়ামী লীগের মতাদর্শগত বিরোধ মিটিয়ে সঠিক আওয়ামী লীগের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

কিন্তু তার পায়ে ধরে যে কম্যুনিস্টরা এসেছে এদের সর্বনাশা কথাবার্তা মাঝে-মধ্যে শোনা যায় এবং তা শুনে আঁতকে উঠতে হয়। দ্বিতীয়ত এরা ভণ্ড এবং মোনাফেক। মুখে এক কথা কাজে তার বিপরীত। ছোটবেলায় মদনমোহন তর্কালংকারের প্রথম ভাগ বইতে পড়েছি, নির্দয় লোক পশুর সমান। এই ছাত্র ইউনিয়ন ও কম্যুনিস্ট পার্টির লোকেরা নির্দয়, দয়ামায়া এদের মধ্যে নেই, এরা জানে শুধু রণকৌশল। আর তা হলো যার পায়ে ধরে আশ্রয় নেবে, তাকে লাথি মেরে তার জায়গা দখল করবে। বার্টান্ড রাসেল, মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং শিবনারায়ণ রায় এদের সম্পর্কে শত শত পৃষ্ঠা লিখে গিয়েছেন যে, এই কম্যুনিস্টরা হিংস্র পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। বার্টান্ড রাসেল, মনেবেন্দ্রনাথ

www.pathagar.com

রায় ও শিবনারায়ণ রায়ের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে কেউ বক্তব্য দিয়ে দু'চার পৃষ্ঠা লিখেছেন বলে আমি জানি না। যদি কেউ জানেন দয়া করে আমাকে জানালে তা পড়ে দেখবো। কম্যুনিস্ট নেতা মনিসিং ও মোজ্জাফর আহমদ বঙ্গবন্ধুকে উস্কানি দিয়ে একদল বাকশাল গঠন করিয়েছিলো। অনেকে বিশ্বাস করেন, বঙ্গবন্ধু একদল বাকশাল না করলে ঘাতকরা তাকে আঘাত করতে সাহস পেত না, আমিও এ বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করি।

তবে জননেত্রী শেখ হাসিনার জন্যই আওয়ামী লীগ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, একথা সম্পূর্ণ সত্য। তিনি সঠিক রাজনীতি বা আদর্শ আওয়ামী লীগে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এর জন্য শেখ হাসিনাকে শত সহস্রবার ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রাণঢালা সম্মান জানাই। জয় শেখ হাসিনা।

২৪. ০৮. ২০০৯

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মুদ্রণে চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা

চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র নামের লেখাটি ২০০৮ সনের অক্টোবর মাসে যখন ১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা বইতে বের হয় তখন আর নতুন করে এ বিষয়ে কিছু লেখার সুযোগ পাইনি, বই প্রকাশের কাজের চাপে। ফলে ২০০২ সনের সেপ্টেম্বর মাসে 'চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র'নামে যে লেখা প্রকাশ করেছিলাম তাই এ বইয়ের ১ম মুদ্রণে প্রকাশিত হয়। 'চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র', যা এ বইয়ের ১০৬ পৃষ্ঠা থেকে প্রকাশিত হয়েছে তা আমি লিখি ১১. ৮. ২০০২, ৩৩৮/২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের ঢাকার বাসায়। চাই ভেজাল মুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র ১১. ৮. ২০০২ তারিখে যখন আমি লিখি তখনও আমি বর্তমান পৃথিবীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটনের জীবনী, ইংলিশ বিল অব রাইটস এবং ২৫. ৭. ১৯৮৭ তারিখ থেকে ২৫. ৭. ১৯৯২ তারিখ পর্যন্ত ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রী ভেংকটরমনের লেখা 'মাই প্রেসিডেনসিয়াল ইয়ারস' বইটি পড়িনি। স্যার আইজাক নিউটনের জীবনী পড়ি ২০০৩ সনে, ইংলিশ বিল অব রাইটস ও মাই প্রেসিডেনসিয়াল ইয়ারস বইটি পড়ি ২০০৫ সনে।

স্যার আইজাক নিউটন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৬৪২ সনে, আর মৃত্যুবরণ করেন ১৭২৭ সনে। গ্রেট বৃটেনে ১২১২ সনে রাজা জনের আমলে ম্যাগনা কার্টার সনদ স্বাক্ষর হয়, তখন থেকে শুরু হয় প্রচণ্ড গোলযোগ। রাজার ক্ষমতা নিয়ে ১২১২ সন থেকে ১৬৮৮ সন পর্যন্ত ৪৭৬ বছর, রাজার ক্ষমতা বেশী না পার্লান্টের ক্ষমতা বেশী এই নিয়ে গ্রেট বৃটেনে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেঁধে থাকে। হাজার হাজার লোক নিহত হয়, বয়ে যায় রক্তের গঙ্গা। ১৬০৩ সনে রানী প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যুর পর রাজা প্রথম জেমস ১৬০৩-১৬২৫-এর সময় থেকে ১৬৮৮ সন পর্যন্ত পরিস্থিতি মারাত্মক আকার ধারণ করে, প্রচুর রক্তপাত হয়।

১৬৪৯ সনে গণতন্ত্রপন্থী বা পার্লামেন্টের পক্ষে ক্ষমতা বেশী বলে যারা আন্দোলন করেন, ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে তারা রাজা ১ম চার্লসকে তার হাজার হাজার সমর্থকসহ শিরোচ্ছেদ করে হত্যা করে। ১৬৪৯ সনে রাজা ১ম চার্লসকে হাজার হাজার সমর্থকসহ হত্যা করার পর বৃটেনে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগ দেখা দেয়। এতে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়। কয়েক বছর এই দুর্ভিক্ষ ও প্লেগ রোগ স্থায়ী হয়। বৃটেনের জনগণের মধ্যে ধারণার সৃষ্টি হয়, রাজা ১ম চার্লসকে হত্যা করার জন্য ঈশ্বরের গজব হিসেবে এই প্লেগ রোগ ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এই কারণে জনতা ক্ষেপে উঠে এর বদলা বা প্রতিশোধ নেবার জন্য যে ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজা ১ম চার্লসকে শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিলো ১৬৪৯ সনে এবং বৃটেনের প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিলো ক্রমওয়েলকে, ১৬৫৮ সনে রাজার পক্ষের জনগণ সেই ক্রমওয়েলকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে, সাথে তার

www.pathagar.com

হাজার হাজার সমর্থকসহ এবং রাজা ২য় চার্লসকে আবার বৃটেনের রাজা বানান ।

গ্রেট বৃটেনের মানুষের রক্তের এই গঙ্গা প্রবাহিত হতে দেখে বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তিনি পার্লামেন্টারী ফরম অব গর্ভমেন্টের শান্তিপূর্ণ সমাধান দিয়ে ১৬৮৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলিশ বিল অব রাইটস লিখে দেন, যা বৃটেনের মানুষের জন্য বয়ে নিয়ে আসে চির শান্তি, অবসান হয় রক্তপাতের। ১৬৮৮ সনে বৃটেনের পার্লামেন্টে এই বিলের ব্যাপারে আলোচনা হয়, রাজা ২য় জেমস পার্লামেন্ট-এর ক্ষমতা বৃদ্ধির দাবী বা গণতন্ত্রের দাবী মেনে নেন, পার্লামেন্টে স্যার আইজ্যাক নিউটনসহ অনেকে যুক্তিপূর্ণ ভাষণে রাজা ২য় জেমসকে পার্লামেন্ট বা মন্ত্রী পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দাবী জানান। ১৬৮৮ সনের পার্লামেন্টের নিকট রাজা ২য় জেমস ক্ষমতা প্রদানের যে ঘোষণা করেন ইতিহাসে তাকেই গে-ারিয়াস ভিক্টোরী অব ডেমোক্রেসী হিসেবে বা গ্লোরিয়াস রিভুলেশন অব ডেমোক্রেসী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। ১৬৮৮ সনের পার্লামেন্টের ঐ ঘোষণা বা সিদ্ধান্ত ১৬৮৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের ২য় সপ্তাহে ইংলিশ বিল অব রাইটস হিসেবে লিখিতভাবে গৃহীত হয়। এটাই পৃথিবীর মানুষের গণতন্ত্রের শাসনের সভ্যতা বা সিভিলাইজেশন-এর শক্তিশালী ভিত্তি।

গ্রেট বৃটেনে আজও রাজা-রানীরা যে সম্মান ও প্রভাব-প্রতিপত্তি নিয়ে বহাল রয়েছেন, তার ভিত্তিভূমি স্থাপন করে গিয়েছেন রাজা ২য় জেমস ১৬৮৮ সনে পার্লামেন্টে গণতন্ত্র বা পার্লামেন্টের ক্ষমতা প্রদান করে এবং ১৬৮৯ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে ইংলিশ বিল অব রাইটসে স্বাক্ষর করে। রাজা ২য় জেমস-এর পরে আজ ২০০৯ সনে রানী ২য় এলিজাবেথ-এর সময় পর্যন্ত বৃটেনে ১৪ জন (১০ জন রাজা ৪জন রানী) রাজা-রানী হয়েছেন, এরা সবাই ইংলিশ বিল অব রাইটস-এর প্রতি সম্মান দেখিয়ে চলছেন, এটা মেনে চলছেন, যার জন্য বৃটেনের রাজা-রানী বহাল আছেন মান-সম্মানের সাথে। যদি রাশিয়া, জার্মানী, ইটালি ও ফ্রান্সের রাজা রাণীগণ ইংলিশ বিল অব রাইটস এর প্রতি সম্মান দেখায়ে সেটা মেনে নিতেন তবে আজও রাশিয়া জার্মানী, ইটালী, ফ্রান্সের রাজা-রাণীরা বহাল থাকতেন, স্ববংশে তাদের নির্মমভাবে নিহত হতে হতো না। ইংলিশ বিল অব রাইটস বা গণতন্ত্রের শাসনের মূল কথা হচ্ছে, ১ম এই ইংলিশ বিল অব রাইটস যেদিন থেকে স্বাক্ষর হলো তখন থেকে রাজা বা রানী ঈশ্বর প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে আর বিবেচিত হবেন না।

২য় : তবে রাজা বা রানী দেশের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হবেন। রাজা বা রানী দেশের জনগণ, পার্লামেন্ট ও সরকারের অভিভাবক বা প্রধান রক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। তাদের ভরণ-পোষণ করার জন্য রাষ্ট্র বিরাট অংকের অর্থের যোগান দেবে। রাজা-রানী নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে কোন কাজ সাধারণত করবেন না, যা করা দরকার সব কাজ করবেন জনগণের নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যগণ মন্ত্রী পরিষদের মাধ্যমে।

৩য় : মন্ত্রী পরিষদ বা পার্লামেন্ট যে কাজ বা আইন করবেন, তা অবশ্যই রাজা বা

www.pathagar.com

রানীর স্বাক্ষর নিয়ে করতে হবে, রাজা বা রানী যদি মনে করেন পার্লামেন্টে গৃহীত বিলে জনগণের স্বার্থ নেই, এ বিল গৃহীত হলে জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাহলে রাজা-রানী সে বিলে স্বাক্ষর করবেন না এবং এ নিয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। রাজা বা রানী পার্লামেন্টে গৃহীত কোন বিলে স্বাক্ষর না করলে তা বাতিল হয়ে যাবে। যদি রাজা বা রানী মনে করেন, বিরাজিত পার্লামেন্টের সদস্যরা জনগণের পক্ষে কাজ করছে না, তবে রাজা বা রানী মেয়াদ শেষ হবার আগেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেবেন এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার নতুন নির্বাচন দেবেন। যদি রাজা-রানী মেয়াদ শেষের আগে পার্লামেন্ট ভেঙে দেন, তবে এ নিয়ে কেউ কোন কথা বলতে পারবে না। উপরে ইংলিশ বিল অব রাইটস-এর যে সারসংক্ষেপ উল্লেখিত হয়েছে তার স্রষ্টা বা রচিয়তা স্যার আইজাক নিউটন। ইংলিশ বিল অব রাইটস লেখার জন্য একটি কমিটি ছিল। এই কমিটির সদস্য ছিলেন মহাবিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন। মূল কথা পার্লামেন্টারী ফর্ম অব গভর্মেন্টের জনক স্যার আইজাক নিউটন। অত্যন্ত সুন্দর একটি ফর্মুলা তিনি দিয়ে গিয়েছেন। গ্রেট বৃটেনে ১৬৮৯ সনের যে ইংলিশ বিল অব রাইটস-এর আলোকে পার্লামেন্টারি ফর্ম অব গর্ভমেন্ট চলছে, তা থেকে তারা এক চুলও সরে আসেনি। ইংল্যান্ডের রাজা-রাণী কোন ক্ষমতা সাধারণত প্রয়োগ করেন না। তবে পার্লামেন্টের পাশ হওয়া বিলে রাজা-রানী স্বাক্ষর না করলে সে বিল পাশ হয় না।

বৃটেনের রাজা-রাণীর সামনে কোন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী বা অন্য কেউ চেয়ারে বসেন না। সামনে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমাদের বা ভারতসহ অনেক দেশে রাজা-রানী নেই, তাই আমাদের আছে প্রেসিডেন্ট। পার্লামেন্টারী ফর্ম অব গর্ভমেন্টে ইংল্যান্ডে রাজা-রাণীদের যে ক্ষমতা, ভারতের রাষ্ট্রপতির যে ক্ষমতা, আমাদের রাষ্ট্রপতিরও সেই ক্ষমতা থাকা একান্ত উচিত। ১৯৭২ সনের বাংলাদেশের সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ভারতের রাষ্ট্রপতি বা ইংল্যান্ডের রাজা-রানীদের মত অনেকটা ক্ষমতা ছিল। ১৯৭২ সনের সংবিধানের ৭২ ধারা ও ৮০ ধারায়, যাতে স্বাক্ষর করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, মনোরঞ্জন ধর, ডক্টর কামাল হোসেন সাহেবসহ আওয়ামী লীগের ১৬৭ জন এমএনএ ও তিনশত জন এমপি।

১৯৩৫ সনে গর্ভমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট বা ভারত শাসন আইনে ভারতের গভর্নর জেনারেলদের যে ক্ষমতা ইংলিশ বিল অব রাইটস-এর আলোকে বৃটিশ সরকার প্রদান করেছিলেন স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রপতিগণ সেই ক্ষমতা আজও ভোগ করে আসছেন। ভারত ১৯৪৭ সনে স্বাধীন হবার পরে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, লালবাহাদুর শাস্ত্রী, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী, মোরারজী দেসাই, রাজীব গান্ধী, নরসিমা রাও, আই কে গুজরাল, অটলবিহারী বাজপেয়ী, মনোমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সেই ১৯৪৭ সন থেকে আজ ২০০৯ সন পর্যন্ত একজন প্রধানমন্ত্রীও ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা হ্রাস করার জন্য কোনদিন কোন কথা বলেছেন বলে কেউ জানেন না। রাষ্ট্রপতি শ্রী ভেংকটরমন তার মাই প্রেসিডেনসিয়াল ইয়ারস বইয়ে এক জায়গায়

www.pathagar.com

লিখেছেন, "একদিন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর দপ্তর থেকে ভারতের বিভিন্ন হাই কোর্টে বিচারক নিয়োগের জন্য ১৮০ জন ব্যক্তির নাম সুপারিশ করে একটি ফাইল পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য। রাষ্ট্রপতি ভেংকটরমন ফাইলে রিগ্রেটস বা দুঃখিত লিখে অনুমোদন না দিয়ে বিচারক নিয়োগের ফাইল আবার ফেরৎ পাঠিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে। ফেরৎ ফাইল পেয়ে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী রাষ্ট্রপতি ভেংকটরমনের সাথে বিচারক নিয়োগের ফাইলসহ দেখা করে বলেন, "স্যার আপনার আগে ভারতের কোন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর করা বিচারক নিয়োগের ফাইল অনুমোদন না দিয়ে ফেরৎ পাঠাননি, আপনিই প্রথম একাজটি করেছেন।" জবাবে রাষ্ট্রপতি ভেংকটরমন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে বলেছেন, এর আগে ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী হাই কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে যে নামগুলো পাঠিয়েছেন তাদের নামের পেছনে কোন মার্কা ছিল না, তারা ছিলেন দলনিরপেক্ষ যোগ্য ব্যক্তি। আপনিই একমাত্র প্রধানমন্ত্রী যিনি ১৮০ জনের নাম পাঠিয়েছেন হাই কোর্টের বিচারক নিয়োগের জন্য, যাদের নামের পেছনে কংগ্রেস (ইন্দিরা)-র মার্কা আছে। ভারতের উচ্চ আদালতের বিচারকদের নিরপেক্ষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম আছে। আপনি কি করে আশা করলেন যে, আমার হাত দিয়ে ভারতের উচ্চ আদালতের বিচারকদের যে সুনাম আছে তা ধ্বংস (টারনিশ) করে দেবো? রাষ্ট্রপতি ভেংকটরমনের এ বক্তব্য শুনে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মন খারাপ করে বসে থাকেন, কোন কথা বলেন না।

তখন শ্রী ভেংকটরমন বলেন, "দেখুন পৃথিবীর কোন মানুষের মনকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। মানুষের মন পরিবর্তনশীল, আজ যারা আপনার পক্ষে আছেন আগামীকাল তারা আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে, আজ যারা আপনার বিরুদ্ধে আছে তারা আগামীকাল আপনার পক্ষে আসতে পারে। এটাই চির সত্য কথা। আর যাদের আজ আপনি কোন পদে পছন্দ করে বসাবেন তারা যদি আগামীতে আপনার বিরুদ্ধে যায় তখন খুব দুঃখ পাবেন। সে দুঃখ ও ব্যথায় স্বাস্থ্য-শরীর খারাপ হবে। আর যদি নিরপেক্ষ লোকদের কোন পদে বসান তারা যদি আপনার বিরুদ্ধে যান, তবে খুব বেশী দুঃখ পাবেন না। আর নিরপেক্ষ যোগ্য লোককে কোন পদে বসালে সাধারণত তারা যে নিয়োগ দেন তাদের বিরুদ্ধে খুব কম যান, তাদের মধ্যে একটা কৃতজ্ঞতাবোধ থাকে, অযোগ্য লোক পদ ঠিক রাখার জন্য যখন যে কথা বলা দরকার তাই বলে পদের লোভে। রাষ্ট্রপতি ভেংকটরমন তাঁর এ বইয়ে লিখেছেন, "একথা শুনে রাজীব গান্ধী হেসে ওঠেন এবং খুব খুশী হন, তিনি বলেন, "স্যার আপনিই সঠিক, আমার প্রস্তাব ভুল ছিল, আমি দলনিরপেক্ষ লোকদের নাম প্রস্তাব করে আবার বিচারক নিয়োগের জন্য পাঠাবো। রাজীব গান্ধী যে যুক্তিবাদী ও ভালমানুষ ছিলেন তা এখানে তুলে ধরেছেন এবং সংসদীয় গণতন্ত্রে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা যে অনেক বেশি বা চূড়ান্ত তা প্রেসিডেন্ট ভেংকটরমনের মাই প্রেসিডেনসিয়াল ইয়ারস বই পড়ে জানা যায়।

বাংলাদেশের মানুষের রাজনীতি-সচেতনতার লড়াই ও সংগ্রামের ইতিহাস খুবই বেশী। মোগল শাসকরা ভারতে সবচেয়ে পরে বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে

www.pathagar.com

সক্ষম হয়। প্রায় একশ' বছর মোগল শাসন এ দেশের মানুষ যুদ্ধ করে ঠেকিয়ে রেখেছিলো। ইংরেজ আমলে ইংরেজরা সবচেয়ে বেশী সংগ্রাম ও আন্দোলনের সামনে পড়েছে এই বাংলাদেশে। নীলচাষের বিরুদ্ধে লড়াই, ফকির বিদ্রোহ, যুগান্তর, অনুশীলন গোষ্ঠী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দিনেশের সংগ্রাম ও জীবন দান এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যারা এই সংগ্রামের প্রতীক তারা এই বাঙালীর সন্তান, এই বাংলার সন্তান। যার জন্য ইংরেজদের রাজধানী ১৯১১ সনে কলকাতা থেকে দিল্লীতে সরিয়ে নিতে হয়। পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে এই বাংলার মানুষ প্রচণ্ড সংগ্রাম করেছে, ১৯৫২, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ সর্বোপরি ১৯৭১ সনের মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ। প্রত্যেকটি সংগ্রাম ও যুদ্ধে এই বাংলাদেশের মানুষ বিজয়ী হয়েছে। এদেশের মানুষের রাজনৈতিক সংগ্রাম-আন্দোলনে পরাজয়ের কোন রেকর্ড আছে বলে কেউ জানে না। আছে শুধু বিজয় অর্জনের ইতিহাস। আর সে ইতিহাসের শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধ থেকে বলে যাচ্ছি, ১৯৯১ সনের ৬ই আগস্ট বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে যে সব সংসদ সদস্য সংসদীয় গণতন্ত্র উদ্ধারের নাম করে ১৯৭২ সনের সংবিধানের ৭২ ও ৮০ ধারা সংশোধন করে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন, রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর সেবাদাসে পরিণত করেছেন, সংবিধানের চেক এন্ড ব্যালান্স নষ্ট করেছেন, তাদের এদেশের গণতন্ত্র ও সংগ্রামপ্রিয় মানুষ ক্ষমা করবে না, ৫০ বছরের মধ্যে এ নিয়ে কথা উঠবে (এর মধ্যে ১৮ বছর চলে গিয়েছে)। যে সব সংসদ সদস্য ১৯৯১ সনের ৬ই আগস্ট সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ৭২ ও ৮০ ধারা সংশোধন করেছেন, তারা এ পৃথিবী থেকে চলে যাবেন, কিন্তু তাদের এ কলংকজনক কর্মের খেসারত দিতে হবে তাদের বংশধর ও নিকট আত্মীয়দের, অত্যন্ত মার্মান্তিক ও হৃদয়বিদারকভাবে। আমি তখন থাকবো না (আমার বয়স এখন ৫৫), তবে আমার এই লেখা থাকবে। তখন এ বইয়ের পাঠক-পাঠিকারা আমাকে স্মরণ করবেন বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি মানুষের একবিন্দু রক্তপাত চাই না, প্রতিটি মানুষের মঙ্গল চাই। কিন্তু আমি না চাইলেও অনেক লোক এমন কিছু কাজ সজ্ঞান বা অজ্ঞানভাবে করে যার খেসারত হিসেবে রক্তপাত বয়ে নিয়ে আসে। মহান দার্শনিক প্লেটো তার গুরু মহান দার্শনিক সক্রোটিসের বয়ান থেকে তুলে ধরে তার (প্লেটোর) অমর গ্রন্থ রিপাবলিকে বলছেন, "যে রাষ্ট্রে একনায়কের শাসন থাকবে সেই রাষ্ট্রের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকদের অতি নিকটজন হবে সেই শাসক আর সবচেয়ে উৎকৃষ্ট লোকরা হবে সবচেয়ে বেশী অবহেলিত ও অত্যাচারিত।" ১৯৭৫ সন থেকে বাংলাদেশ একনায়ক বা ডিক্টেটরের শাসন চলছে, ১৯৭৫ সনের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৯০ সন পর্যন্ত মোশতাক, জিয়া, এরশাদ-এর ডিক্টেটরের শাসন, ১৯৯১ থেকে আজ ২০০৯ সন পর্যন্ত খালেদা ও শেখ হাসিনার একনায়কতন্ত্র। দার্শনিক প্লেটোর লেখা রিপাবলিক বইয়ে অনেক কথা তিনি বলেছেন, তার অনেক কথার সাথে অনেক দার্শনিক একমত হননি। কিন্তু সক্রেটিস প্লেটোর একনায়কের শাসন সম্পর্কে যা বলেছেন তার বিরুদ্ধে গত আড়াই হাজার বছরে পৃথিবীর কোন দার্শনিক দ্বিমত পোষণ করে কোন কথা বলেননি। সংসদীয় গণতন্ত্রে সবচেয়ে বেশী ক্ষমতাধর ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট, এরপরে

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার বিরোধীদলের নেতা, যে দল ক্ষমতায় থাকে সেদলের দলীয় প্রধান বা সভাপতি, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি–এই ৫ জনের ক্ষমতা প্রায় সমান থাকে। উদাহরণ, ভারতের কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সোনিয়া গান্ধী, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, ভারতের সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির ক্ষমতা প্রায় সমান। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বাড়ীর চাকরের যে ক্ষমতা, এদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেবিনেট সচিবদের ক্ষমতা তার চেয়ে অনেক অনেক কম। অন্যদের অবস্থা কি তা এ থেকে অনুমান করা যায়। কাজেই এই মারাত্মক অসুস্থ রাজনৈতিক অবস্থা কোনক্রমেই খুব বেশীদিন টিকে থাকতে পারে না, এর পতন হবেই। আর এই অসুস্থ রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করেছে ১৯৯১ সনের ৬ই আগস্ট-এর জাতীয় সংসদের যে সব এমপি, দ্বাদশ সংশোধনীতে ভোট দিয়েছে তারা।

আবার উল্লেখ করছি ১৯৭১ সনে লক্ষ লক্ষ বাঙালীর তাজা রক্তে যে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষ বহুদলভিত্তিক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। বর্তমানে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র নেই আছে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কের শাসন। স্যার আইজাক নিউটনের মতো মহাবিজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত যে নিয়ম করে গিয়েছেন, মুহূর্তের মধ্যে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনাকে তুষ্ট করার জন্য ১৯৯১ সনে ১৯৭২ সনের সংবিধানের ৭২ ধারা ও ৮০ ধারা সংশোধন করে সে আইনকে ১২তম সংশোধনীর মাধ্যমে হত্যা করা হয়েছে। ১৬৮৫ সন থেকে ১৬৯৫ সন পর্যন্ত স্যার আইজাক নিউটন বৃটেনের পার্লামেন্টে সদস্য ছিলেন। এরপরে তিনি আবার বিজ্ঞানচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

৩০. ৮. ২০০৯ রোববার

বিঃ দ্রঃ : ১৯৭৯ সনের বি.সি.এস. এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বা প্রশাসন ক্যাডারের অফিসার সাবেক বৈদেশিক সম্পদ বিভাগের (ইআরডি) সচিব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী বিভাগে আমার দু'বছরের সিনিয়র ছাত্র প্রখ্যাত লেখক, অনুবাদক ও পণ্ডিত আমিনুল ইসলাম ভূঁইয়া ভাইকে বলেছিলাম, ভূঁইয়া ভাই, রাজনীতি নিয়ে কথা বলি, লেখালেখি করি অথচ ইংলিশ 'বিল অব রাইটস' পড়ার সুযোগ পাইনি। দয়া করে আমাকে ইংলিশ বিল অব রাইটস পড়ার সুযোগ করে দেবেন। আমার অনুরোধে তিনি আমাকে তার কম্পিউটার থেকে অনেক কষ্ট করে 'ইংলিশ বিল অব রাইটস' বের করে পড়ার জন্য দেন। তার জন্য আমি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

০৯.০৯.০৯
এ/১২ প্রিন্স টাওয়ার

১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

তারিখ : ০৩.০৯.২০০৯

শ্রদ্ধেয়
এ. কে. খন্দকার সাহেব
মাননীয় পকিল্পনা মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শেরে বাংলানগর, ঢাকা
এবং
সাবেক
সশস্ত্র বাহিনী উপ-প্রধান
১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়।

বিষয় : মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে ভূয়া মুক্তিযোদ্ধাদের লিস্ট করা বন্ধ করুন।

শ্রদ্ধেয় স্যার,

আমার শ্রদ্ধা জানবেন, অত্যন্ত বেদনা-বিধুর মনে আজ আমি আপনাকে এই পত্র লিখছি। ১৯৭১ সনে আমি মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্য হিসেবে সেকশন কমান্ডার ও প্লাটুন কমান্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছি, ৬ নং সেক্টরের দেওয়ানগঞ্জ/হেমকুমারী সাব-সেক্টরে নীলফামারী জেলার সাথে। একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য তাদেরকেই যুদ্ধের সময় বলা হতো, যারা ট্রেনিং নিয়েছে এবং অস্ত্র হাতে পাক সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। মুক্তিবাহিনীর একজন সদস্যকে ট্রেনিং সেন্টারে কি কঠোর পরিশ্রম করে ট্রেনিং নিতে হতো, তা আপনি ভালভাবে অবহিত আছেন। ট্রেনিং-এর পরে মুক্তিবাহিনীকে শপথ নিতে হতো, শপথ নেবার পরেই মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের নামে অস্ত্র বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। একজন মুক্তিযোদ্ধা রিক্রুট করার সময় একেবারে দুর্বল, একেবারে বেশী বয়স, একেবারে কম বয়স এদের নেওয়া হতো না। এরপরেও লাগতো একজন এম.এন.এ. অথবা এম.পি.-এর সুপারিশ। এইভাবে আমি যা এখানে উল্লেখ করছি, সেভাবে ৫৭ হাজার মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধে অংশ নেয়। ১৯৭৫ সালের আগে আমরা এটাই জানতাম মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ৬০ হাজারের মত।

১৯৭১ সনে ১১টি সেক্টর-এর মধ্যে ৯টি বাস্তবে ছিল, বাকি ২টি সম্পর্কে কম জানা যায়। ৯টি সেক্টরে কোনক্রমেই প্রতিটি সেক্টরে ৬ থেকে ৮ হাজারের বেশী মুক্তিযোদ্ধা ছিল না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এর মধ্যে বাংলাদেশের ভিতরে কাদের সিদ্দিকী বঙ্গবন্ধুর কাছে ১ হাজার সদস্য নিয়ে ১ হাজার অস্ত্র জমা দিয়েছে, এর প্রমাণ আমার কাছে আছে।

কিন্তু ১৯৭৫ সনে বঙ্গবন্ধু মর্মান্তিকভাবে নিহত হওয়ার পরে জেনারেল জিয়া

www.pathagar.com

ক্ষমতায় এলে তার দলের লোকজন বলে শুধু আওয়ামী লীগের লোকজন ও ভারতের সেনাবাহিনী যুদ্ধ করে নাই, আমরাও যুদ্ধ করেছি, এই বলে ২০ হাজার ভূঁয়া মুক্তিযেদ্ধার জন্ম দেয়, সংখ্যা হয় ৯০ হাজার। ১৯৮২ সনে এরশাদ সাহেব ক্ষমতায় এলে তার দলের লোকজন বলে আমরাও যুদ্ধ করেছি, অনেক মুক্তিযোদ্ধার নাম বাদ পড়েছে–এই বলে তারা ৪০ হাজার ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দেয়, সংখ্যা হয় ১ লাখ ৩০ হাজার।

১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতা আহাদ চৌধুরী ও তার সমর্থকরা দাবী করেন, আসল মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে অনেক বেশী মুক্তিযোদ্ধা লিস্টেড হয়েছে, নতুনভাবে লিস্ট করতে হবে, লিস্টে মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা কমাতে হবে–এই বলে আওয়ামী লীগ সরকারের কাছ থেকে (১৯৯৬-২০০১) অনুমতি নিয়ে নতুনভাবে তারা আবার লিস্ট করে আরও ৮০ হাজার ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দেয়, তালিকা হয় প্রায় ২ লাখ। এদের দেখাদেখি ২০০১ সনে খালেদা জিয়া ক্ষমতায় এলে তার বিএনপির চেলা-চামুন্ডারা আবার ২৫ হাজার ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধার নাম অন্তর্ভুক্ত করে ২০০৬ সন পর্যন্ত, সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ ২৫ হাজার।

এবারে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ২০০৯ সনে আবার নতুনভাবে লিস্ট করা শুরু করেছে। মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা নাকি দাঁড়াবে সাড়ে চার লাখ। কি ভয়ংকর এবং নিষ্ঠুর ব্যাপার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামন, জেনারেল ওসমানী সাহেব আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছে, তাঁদের সাথে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছেন আপনি। আপনি ১৯৭১ সনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের খুব বিশ্বস্ত লোক ছিলেন আপনি, আপনাকে দিয়ে তাজউদ্দিন সাহেব অনেক কাজ ১৯৭১ সনে করিয়েছেন বলে তিনি আমাকে বলেছেন। তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবই ১৯৭৪ সনে আপনার সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। ১৯৭১ সনের ৫৭ হাজার মুক্তিবাহিনীর আপনি একমাত্র নেতা বা অভিভাবক, যিনি আজও আমাদের মাঝে জীবিত রয়েছেন।

তাই আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, এই বিষয়ে এগিয়ে এসে ন্যায় ও সত্যকে রক্ষা করুন। মুক্তিযোদ্ধাদের লিস্ট করা বন্ধ করুন। যারা অস্ত্র-হাতে যুদ্ধ করেছে, তারাই মুক্তিযোদ্ধা, অন্যরা নয়। মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা ৫৭ হাজার+অন্যরা ১০ হাজার মোট ৬৭ হাজারের বেশী কোনক্রমেই নয়। আপনি মুখ খুলে এগিয়ে এলে যারা মুক্তিবাহিনীর সংখ্যা সাড়ে চার লাখ করার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে, তারা পথের কুকুরের মত দৌড়ে পালাবে। এ বিষয়ে আপনি আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার সাথে কথা বলতে পারেন, নিশ্চয় তিনি ন্যায় ও সত্যের পক্ষে অবস্থান নেবেন।

সবচেয়ে মজার ও দুঃখজনক হলো, ৬৭ হাজার ছাড়া যেসব ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধা নাম লিস্ট হয়েছে এরা দিনে রাতে সমানে ভারত, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী, ভারতের সেনাবাহি-নী, বঙ্গন্ধু শেখ মুজিব, শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগকে জঘন্য ভাষায় গালাগালি করে, তাদের নিজেদের অপরাধ ঢেকে রাখার জন্য। তারা বলে "ভারতের সেনাবাহিনী যুদ্ধ

www.pathagar.com

করে নাই, আমরাই যুদ্ধ করেছি, শেখ মুজিব পাকিস্তানের জেলে আরামে বন্দি ছিল, শেখ হাসিনা পাকিস্তানের রেশন খেয়েছে, ইন্দিরা গান্ধী শরণার্থীদের নামে সাহায্য এনে নিজে চুরি করেছে, আমরা যুদ্ধ করে বাংলাদেশ বানিয়েছি।"

শতকরা ৯৯ জন ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধারা এসব বলে বেড়ায়, অথচ আওয়ামী লীগ যখন এই ভূঁয়া মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তখন তা দেখে দুঃখে কাতর হয়ে যাই। জগদ্বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট নাটকের সেই সংলাপ মনে পড়ে, "হোরা শিও স্বর্গে ও মর্ত্যে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, পৃথিবীর কোন দর্শনশাস্ত্রেই যার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না" (Horatio there are more things in heaven and earth, than are dreamt of in our philosophy).

দয়া করে ৫৭ হাজাারের বেশী মুক্তিবাহিনীর যে লিস্ট তৈরী হয়েছে তা বাতিল করার জন্য আপনি এগিয়ে আসুন, এটাই মুক্তিবাহিনীর একজন অভিভাবক হিসেবে আপনার কাছে আমার একান্ত দাবী। ভুলে যাবেন না, সত্যিকারের ৬৭ হাজার মুক্তিবাহিনীর সদস্য আপনার সন্তানতুল্য। পরিশেষে উল্লেখ করতে চাই, অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে উভয়েই সমান অপরাধী। আল্লাহর কাছে কায়মনে প্রার্থনা করি আপনি সবল ও সুস্থ থাকুন।

অশেষ শ্রদ্ধোন্তে,
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)
মুক্তিযোদ্ধা ৬ নং সেক্টর
এ/১২, প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫।

www.pathagar.com

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান

গত ৫ই সেপ্টেম্বর ২০০৯ শনিবার ৭৭ বছর বয়সে সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব সাইফুর রহমান সিলেট থেকে ঢাকা আসবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের নিকটে একটি জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। ১৯৭৬ সন থেকে ২০০৯ সনে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি খুবই দাপটের সাথে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সৃষ্টিশীল মানুষ বা কর্মী, বিএনপির রাজনীতির তিনি ছিলেন বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদ।

১৯৯২ সনের আগে ঢাকা শহরে দুপুরবেলার পরে এক কেজি গরুর তরল দুধ পাওয়া যেত না। আজ যে কোন পাড়া বা রাস্তা থেকে বিকাল বা রাতে এক মণ গরুর তরল দুধ সংগ্রহ করা যায়। ঢাকা শহর ও আজকের বাংলাদেশে গরুর তরল দুধ উৎপাদন এবং এর বাজারজাতকরণে সাইফুর রহমান সাহেব যে বিরাট অবদান রেখেছেন, তা লিখে শেষ করা যাবে না। ১৯৯১ সনে তিনি অর্থমন্ত্রী হয়ে বিদেশী গুঁড়ো দুধ আমদানির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে দেশে গরুর তরল দুধ উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম শুরু করে দেন। দেশের মানুষকে গরু পালনের ও ছোট বড় ডেয়ারী ফার্ম করার জন্য আহ্বান জানান। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে গরু পালন বা ডেয়ারী ফার্ম সেক্টরে সহজ শর্তে ঋণ দেবার নির্দেশ দেন। শুধু লিখিত বা মৌখিক নির্দেশ নয়, রীতিমত ব্যাংক কর্মকর্তাদের ধমকিয়েছেন ডেয়ারী খাতে লোন দেবার জন্য। সাইফুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা ডেয়ারী ফার্ম করেছে, ১৯৯৩ সনে তাদের উন্নতজাতের গাভীপ্রতি ৬২৫০ টাকা করে অনুদান দিয়েছেন। শুধু অনুদান নয় ২০০১ সনে অর্থমন্ত্রী হয়ে তিনি যারা দুধ উৎপাদনের জন্য ডেয়ারী ফার্ম করেছিলেন এবং ব্যাংক ঋণ নিয়েছিলেন, তাদের ব্যাংক ঋণের ১০০% ভাগ সুদ মওকুফ করে দিয়েছিলেন। ২০০৪ সনে ১০০% ঋণের সুদ মাফ করে অর্থমন্ত্রণালয় থেকে সুদের ৫০% ব্যাংকগুলোকে ভর্তুকি দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৯৯১ সনের আগে প্রতি দিন মিল্ক ভিটার দুধের উৎপাদন ছিল ১০০০০ (দশ হাজার লিটার) আর আজ ২০০৯ সনে বাঘাবাড়ীতে মিল্ক ভিটা দুধের উৎপাদন দৈনিক প্রায় এক লাখ সত্তর হাজার লিটার। মিল্ক ভিটা পাকিস্তানের সময় প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু লোকসানে চলতো, মিল্ক ভিটা এখন লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এর মূলে রয়েছে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের অবদান। শুধু মিল্ক ভিটা নয় আজ গরুর দুধের জন্য জন্ম হয়েছে আফতাব, আড়ং, রংপুর ডেয়ারী ফার্ম, বিক্রমপুর ডেয়ারী ফার্মসহ অনেক বড় ডেয়ারী ফার্ম। মোট কথা আজ বাংলাদেশে গরুর তরল দুধের যে বিশাল উৎপাদন বেড়েছে, তার মূলে সাইফুর রহমানের রয়েছে একক ভূমিকা। সাইফুর রহমান নিজেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, জিয়াউর রহমানের মত গরু পালন করতেন, মৌলভীবাজারে তার বাড়ীতে তিনি অনেকগুলো গরু পালন করেন বলে শুনেছি। অর্থমন্ত্রী থাকার সময় প্রতি শুক্র-শনিবার

www.pathagar.com

মৌলভীবাজারে যেতেন পালের গরুগুলোকে দেখতে ও তাদের নিজ হাতে খাবার খাওয়াতে। গরুগুলো সাইফুর রহমানকে দেখে খুশীতে হাম্বা হাম্বা রব তুলে আনন্দে আহ্লাদিত হতো। বাংলাদেশে আজ যে ২ লক্ষের বেশী ছোট বড় পোল্ট্রি ফার্ম গড়ে উঠেছে, এটার পিছনেও সাইফুর রহমানের অবদান সবচেয়ে বেশী। পোল্ট্রি সেক্টরে ঋণ দেবার জন্য তিনি ব্যাংকগুলোকে নিয়মিত চাপ দিতেন এবং পোল্ট্রি ফার্মগুলোর ব্যাংক লোনের ৫০% ভাগ সুদ মাফ করে দিয়ে এবং মাফকৃত সুদের ৫০% ভাগ অর্থমন্ত্রণালয় থেকে সাবসিডিয়ারী দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। আজ গরুর মাংশের চেয়ে মুরগীর মাংশের দাম কম। এই অবদানও সাইফুর রহমানের। প্রচুর পোল্ট্রী ফার্মের জন্য বাজারে এখন পর্যাপ্ত ডিম ও মুরগী পাওয়া যায়। প্রায় ৫ লাখ মানুষ এই শিল্পের সাথে সংযুক্ত থেকে সংসার চালাচ্ছে, এটা একটা বিরাট ব্যাপার।

পুকুর জলাশয়ে ব্যাংক ঋণ দেবার জন্য সাইফুর রহমান নির্দেশ প্রদান করেন, যাতে পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায়, মাছে-ভাতে বাঙালী এ প্রবাদবাক্যটিকে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ব্যাংকগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন, তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশে আজ হাজার হাজার পুকুর-জলাশয়ে মাছচাষ হচ্ছে। এরপরে আসে সাইফুর রহমান সাহেবের তাঁতের লোনের ১০০% সুদ মাফ। জেনারেল এরশাদ সাহেবের সময়ে ১৯৮৪-১৯৮৫ সনে তাঁতীদের তাঁতপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা করে লোন দেয়া হয়েছিল। কেউ পঁচিশ হাজার, কেউ পঞ্চাশ হাজার আবার কেউ লাখ টাকা বা তার কম-বেশী লোন নিয়েছিলো ব্যাংক থেকে। ১৯৮৮ সনের বন্যায় অন্যান্য সেক্টরের মত তাঁতশিল্পেরও ব্যাপক ক্ষতি হয়, সুদসহ ঋণের বোঝা নিয়ে তাঁতীরা দিশেহারা হয়ে যায়। সিরাজগঞ্জ নির্বাচনী এলাকা-৫-এর বিএনপির সংসদ সদস্য প্রয়াত শহীদুল্লাহ খান বিষয়টি সাইফুর রহমান সাহেবের কাছে তুলে ধরেন এবং আবেদন জানান তাঁতশিল্পে প্রদত্ত সুদের ১০০% মাফ করে দেবার জন্য। সংসদ সদস্য প্রয়াত শহীদুল্লাহ খানের বক্তব্য জনাব সাইফুর রহমান গভীর সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করে ১৯৯৩ সনে ১০০% ব্যাংক ঋণের সুদ মাফ করে দেন। তাঁতশিল্পের ১০০% সুদ মাফ করে দিয়ে তিনি এই ব্যবসার সাথে জড়িত কয়েক হাজার মানুষের বিরাট উপকার করেন। তাঁতশিল্পের ঐ ১০০% ঋণের সুদ মাফ না করলে কয়েক হাজার মানুষ তাদের ভিটাবাড়ী থেকে উৎখাত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে যেতো। মানুষের এত বড় উপকার যিনি করেছেন তার নাম অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। ১৯৯১ সন থেকে ১৯৯৬ সন মেয়াদে অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করার সময়ে যে ৭টি প্রাইভেট ব্যাংক অনুমোদন পায় তা হচ্ছে প্রাইম ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, সাউথ ইস্ট ব্যাংক, আল আরাফা ইসলামিক ব্যাংক, সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, বেসিক ব্যাংক। এই ৭টি ব্যাংকে আজ কয়েক হাজার কর্মচারী চাকরী করে সংসার চালাচ্ছেন। কয়েক লাখ লোক ঋণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন, কয়েক লাখ লোক শেয়ার কিনে ডিভিডেন্ট পাচ্ছেন। এর মূলেও রয়েছেন জনাব সাইফুর রহমানের অবদান।

জনাব সাইফুর রহমান তাজউদ্দিন আহমদের প্রশংসায় সবসময় উচ্চকণ্ঠ ছিলেন।

www.pathagar.com

তিনি বিএনপির নেতা হয়েও একটু সুযোগ পেলেই আওয়ামী লীগের নেতা তাজউদ্দিন আহমদের প্রশংসা করতেন। তার আগে যত অর্থমন্ত্রী হয়েছেন তাদের মধ্যে একমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ সঠিক কাজ করেছেন বলে উল্লেখ করে বলেছেন–তাজউদ্দিনের লেখা ফাইল পড়ে আমি অনেক কিছু শিখি। এবারে একটু স্মৃতিচারণে ফিরে আসি–১৯৭৫ সনের পরে ১৯৭৭ সনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সিলেট ও হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের প্রথম কাউন্সিল। আওয়ামী লীগের ঐ কাউন্সিলে উপস্থিত হবার জন্য ঢাকা থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নান ও ময়েজউদ্দিন আহমদ যোগদান করেন, আমি ঐ দুই নেতার সাথে যাই সাপ্তাহিক অগ্নিবীণা পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে কাউন্সিলের নিউজ করার জন্য। ঢাকা থেকে যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে জনাব আলী আজম সাহেবের বাসায় রাত্রি যাপন করে, পরের দিন আলী আজম সাহেবসহ সিলেটে উপস্থিত হই। সিলেটের কাউন্সিল সভা শেষ করে পরের দিন হবিগঞ্জ। সিলেটে ঢাকার নেতাদের যিনি দেখাশুনা ও আপ্যায়ন করেছিলেন তাদের অন্যতম একজন এবার ২০০৯ সনে সুনামগঞ্জ থেকে উপনির্বাচনে এমপি হয়েছেন, সেই মতিউর রহমান। মতিউর রহমান তখন তরুণ আওয়ামী লীগ নেতা।

১৯৭৭ সনের ঐ সময়ে সাইফুর রহমান ছিলেন জিয়াউর রহমান সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা। ঐ সময়ে চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার সিএসপি অফিসার আব্দুল আওয়ালসহ তিনিও একই দিন হবিগঞ্জ যান। সিলেট থেকে হবিগঞ্জ ৩৭ মাইল পথ। এই ৩৭ মাইল পথ বাণিজ্য উপদেষ্টা ও বিভাগীয় কমিশনারসহ আমরা যে গাড়ীতে ছিলাম, তার পেছনে পেছনে আসেন। ঐ সময়ে আজকের মত রাস্তা এত সুন্দর ছিল না, গাড়ীতে এসি সিস্টেম ছিল না। জানালা খুলে গাড়ীতে থাকতে হতো। জনাব সাইফুর রহমান, ফরিদ গাজী, মান্নান সাহেব, ময়েজউদ্দিন আহমদ এদের সম্মানে কোনক্রমেই গাড়ী আগে যেতে দেননি, পথে দুই একবার গাড়ী থামিয়ে মান্নান সাহেব সাইফুর রহমানকে আগে যেতে বললেন, "আপনি উপদেষ্টা মন্ত্রী পদ মর্যাদায়, এভাবে আমরা আপনাকে রাস্তার ধুলো খাওয়াচ্ছি, খুব খারাপ লাগছে। আপনি সামনে যান।" জবাবে সাইফুর রহমান বলেন, "আপনি আমার সিনিয়র, বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গাজী সাহেব আমাদের সিলেটের সব মানুষের নেতা, আপনাদের আগে গাড়ীতে যাওয়া আমার কোন ক্রমেই উচিত নয়।" হবিগঞ্জে আমরা একসাথে সার্কিট হাউসে ছিলাম। আব্দুল মান্নান, দেওয়ান ফরিদ গাজী, ময়েজউদ্দিন আহমদ, আলী আজম ও আমি। আমরা দু'বার খাবার খাই ও সকালের নাস্তা করি, ঐ সময়ের এসডিও সাহেব আমাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরের দিন নাস্তা খেয়ে ফিরে আসবার সময় এসডিও বা মহকুমা হাকিম সাহেবকে মান্নান সাহেব যখন বিল দিতে চাইলেন তখন এসডিও সাহেব বল্লেন, "স্যার, এ্যাডভাইজার সাইফুর রহমান সাহেব আপনাদের খাবারের সমস্ত বিল দিয়ে গিয়েছেন এবং তিনি যে টাকা দিয়েছেন তা দিয়ে আপনাদের আরও ২ দিন খাওয়ানো যাবে। কাজেই আরও দুই দিন থেকে যান। সাইফুর রহমান সাহেবের ১৯৭৭ সনের ঐ ব্যবহার দেখে তখন থেকেই আমি সাইফুর রহমান সাহেবকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি

www.pathagar.com

করে এসেছি।

একজন সৃষ্টিশীল ও গতিশীল মানুষ ছিলেন সাইফুর রহমান। লাখ লাখ মানুষের তিনি উপকার করে গিয়েছেন। ২০০১ সনে অর্থমন্ত্রী হয়ে তিনি তার পিএস নূরুন্নবী ও এপিএস কাইয়ুম চৌধুরীর খপ্পড়ে পড়ে যান। এ'দুজনের প্রভাব ছিল তার উপরে অনেক, যা খুবই দুঃখজনক। ১৯৯৬ সন থেকে তার পিএস ছিলেন আব্দুল্লাহ, ফারুক, নাজিমউদ্দিন আহমদ এবং ১৯৭৩ সন ব্যাচের অচ্যুতপদ গোস্বামী। আব্দুল্লাহ ফারুক ভাই ছিলেন আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার একনিষ্ঠ সমর্থক। সাইফুর রহমানের সাথে এদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে প্রায়ই তর্ক করেছেন। কিন্তু সাইফুর রহমান সাহেব আব্দুল্লাহ ফারুককে সরিয়ে দেননি। অসাধারণ ভালো মানুষ ছিলেন আব্দুল্লাহ ফারুক। আব্দুল্লাহ ফারুক ক্যান্সার রোগে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী আওয়ামী লীগ সমর্থক আব্দুল্লাহ ফারুকের মৃত্যুতে সাইফুর রহমান চিৎকার করে অনেক সময় কান্নাকাটি করেছেন।

১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় এসে ১৯৯৮ সন থেকে জননেত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ও নির্দেশে গরিব মুক্তিযোদ্ধাদের মাসে তিনশত টাকা করে ভাতা দেবার ব্যবস্থা করেন, ২০০১ সন পর্যন্ত তা বহাল থাকে। ২০০১ সনে বিএনপি ক্ষমতায় এলে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা প্রথমে ছয়শত, পরে ২০০৬ সনে নয়শত টাকা করেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। সাইফুর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা নয়শত টাকা করে গিয়েছিলেন বলেই আওয়ামী লীগ ২০০৯ সনে ক্ষমতায় এসে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা ১৫০০ টাকা করেছেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত। সাইফুর রাহমান যদি ছয়শত, নয়শত টাকা করে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা না বৃদ্ধি করতেন তবে ২০০৯ সনে মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা মাসে ১৫০০ টাকা হতো না। তিনশত টাকা ভাতা বহাল থাকলে আজ ২০০৯ সনে আওয়ামী লীগ জনমতের কথা চিন্তা করে ৬০০ টাকার বেশী ভাতা করতে সাহস পেত না। কাজেই মুক্তিযোদ্ধাদের বিরাট উপকার করে গিয়েছেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান।

১৯৯১ সনের আগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের একটি বিরাট দাবী ছিল বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজগুলো সরকারীকরণ করার জন্য। এ দাবীর বিরুদ্ধে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ১৯৯১ সনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সারসংক্ষেপ বা পত্র দ্বারা জানান, বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজগুলো সরকারীকরণ করলে ২/৩ লাখ শিক্ষক লাভবান হবে, এর জন্য রাষ্ট্রের বিশাল অংকের অর্থ খরচ হবে। তাই বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজ সরকারীকরণ না করে শিক্ষক-অধ্যাপকদের যে ৫০% বেতন সরকারী তহবিল থেকে দেয়া হয় তা ৭৫% ভাগ বৃদ্ধি করা যায় এবং সমস্ত বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজগুলোকে পাকা দালানে পরিণত করা যায়। এতে সারা দেশের উন্নয়নে একটি আধুনিকতার ছাপ পড়বে। সুন্দর সুন্দর দালান কোঠায় শহর ও গ্রামাঞ্চলের রূপ বদলে যাবে। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান সাহেবের ঐ প্রস্তাব প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া অনুমোদন করেন এবং সাইফুর রহমান সাহেবের ঐ সিদ্ধান্তও এখনো বহাল আছে। অবশ্য শেখ

www.pathagar.com

হাসিনা ক্ষমতায় এসে শিক্ষকদের বেতন আরও ২৫% ভাগ বৃদ্ধি করে শতভাগ অনুদান দেবার ব্যবস্থা করেন। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন ৭৫% দেবার ব্যবস্থা করে শিক্ষকদের বিরাট উপকার করে গিয়েছেন। সারা বাংলাদেশের বেসরকারী হাই স্কুল ও কলেজগুলো সুন্দর সুন্দর পাকা দালানে পরিণত হয়েছে এবং হচ্ছে। এর মূলে অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান। শিক্ষকদের বেতন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান ৭৫% করেছিলেন বলেই শেখ হাসিনা ১০০% করেছেন, একথাটা স্মরণ রাখা উচিত।

অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের মৃত্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনোমহন সিং এর বক্তব্য–সাবেক অর্থমন্ত্রী ও বিএনপি নেতা এম সাইফুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং। গত শনিবার প্রয়াত এ নেতার ছেলে নাসের রহমানের কাছে পাঠানো এক শোকবার্তায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সাইফুর রহমানের মর্মান্তিক এ মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে শোকাহত ও দুঃখিত। আমি আমার একজন পুরনো বন্ধুকে হারালাম।" তিনি সাইফুর রহমানের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। গতকাল (৬. ৯. ২০০৯) ভারতীয় হাইকমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। মনমোহন সিংহ সাইফুর রহমানকে বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক উল্লেখ করে বলেন, "তিনি শুধু একজন দক্ষ অর্থনৈতিক প্রশাসকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাঁর দেশের একজন জ্যেষ্ঠ মুখপাত্র। বাংলাদেশের অর্থনীতির আধুনিকীকরণে তিনি আমৃত্যু কাজ করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক ও চিন্তাশীল নেতা এবং জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী একজন সেবককে হারালো বাংলাদেশ। তিনি আরো বলেন, "দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও উন্নয়নে আমাদের লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আমি সব সময়ই তাঁর উপদেশকে গুরুত্ব দিয়েছি। তার মৃত্যুতে একজন যোগ্য নেতাকে হারালো দক্ষিণ এশিয়া।" (সোমবার দৈনিক ইত্তেফাক, তারিখ:৭.৯.২০০৯)

০৭.০৯.২০০৯

প্রিন্স টাওয়ার

www.pathagar.com

কোথায় গেল বাংলার সেই আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাস?

সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে ১৯৫৪ সনে আমার জন্ম। ১৯৭০ সন পর্যন্ত তামাই থাকি। ১৯৭০ থেকে মাঝে-মধ্যে ঢাকায় আসি-যাই। ১৯৭১ সনের মে-মাস থেকে মুক্তিবাহিনীর সদস্য হিসেবে ভারতে আড়াই মাস ট্রেনিং নিয়ে যুদ্ধ করি নীলফামারী জেলার সীমান্তে ডোমার ডিমলা কিশোরগঞ্জ থানায়। ১৯৭২ সন থেকে ঢাকা শহরে আছি। ১৯৫৪ থেকে ১৯৭০ সন এই ১৭ বছর প্রত্যেক বছর আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক এই ৫ মাস বর্ষা ও বৃষ্টির পানির মাঝে ছিল আমাদের বসবাস। প্রত্যেক বার আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহেই বানের পানি এসে খাল বিল নদী নালা গ্রামের পুকুর ডোবা, পাগার সব ভরে যেতো। নৌকা ছাড়া কোন বাড়ীতে যাওয়া যেত না, শুধু প্রতিবেশীদের বাড়ী ছাড়া।

আষাঢ় মাসে “নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল আর ঠাই নাহিরে”। কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যেত। প্রচুর বৃষ্টিতে মানুষ ঘরে বন্দি হয়ে বসে থেকে বিভিন্ন গল্প ও শোলক বলতো, একে ব্যঙ্গ করে বলা হতো ‘আষাঢ়ে গল্প’। আষাঢ় মাসে বাড়ীর মধ্যে বর্ষা বা বানের পানি আসতো না–বাহির বাড়ীর নীচু জায়গাতে থাকতো, তবে নৌকা ছাড়া কোথাও যাওয়া যেত না।

শ্রাবণের শুরুতেই পানি বৃদ্ধি পেয়ে বাড়ীর ভিতরে ও ঘরে প্রবেশ করতো, চৌকির ওপর চৌকি তুলে বসবাস-রান্না-বান্না, খাওয়া-খাদ্য, বৃষ্টি আর বৃষ্টি, নৌকা ছাড়া কোথায় যাবার উপায় নেই। শ্রাবণ মাসে প্রতিদিনই বৃষ্টি। ১০/১৫ দিন বিরতিহীন বৃষ্টি আর বৃষ্টি। বাড়ীর ভিতরে কোমর পর্যন্ত পানি। ভাদ্র মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত পানি বৃদ্ধি পেতো। বাড়ীর মধ্যে কোমর বা বুক পানি থাকতো। ১৩ই ভাদ্র হতে পানি কমা শুরু হতো, সবাই তালের পিঠে খেতো, পানির বিদায়ের জন্য। ১লা আশ্বিনে আবার আষাঢ় মাসের মতো হয়ে যেতো। বাড়ীর ঘরের নীচে পানি কিন্তু নৌকা ছাড়া হাট-বাজার করার উপায় নেই। নিকট প্রতিবেশীদের বাড়ী ছাড়া কোথাও নৌকা ছাড়া যাবার উপায় নেই। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে পাটের জাগ দেওয়া থেকে তুলে পাট বাছার কাজ চলতো। বাড়ী বাড়ী পাট পঁচা ও পাট শুকানোর গন্ধ।

কার্তিক মাস ছিল সব চেয়ে কষ্টের, পানি কমে যেতো, কিন্তু নৌকা চলতো না, ফলে মানুষকে গামছা প’রে, লুঙ্গি হাঁটুর উপরে তুলে হেঁটে যাতায়াত করতে হতো, অনেক জায়গায় হাঁটতে গিয়ে পিছল মাটি ও গর্তে পা পড়ে বহু মানুষ আঘাত পেতো ও ভিজে যেতো। কার্তিক মাস ছিল মানুষের দুঃখের মাস, সবচেয়ে বেশী অসুবিধা হতো যারা বোঝা মাথায় চলাচল করতো তাদের। কার্তিক মাসে হাঁটু ও কোমর পর্যন্ত পানি ভেঙে চলতে হতো। সে যে কি কষ্ট।

www.pathagar.com

এই ছিল ১৯৭০ সন পর্যন্ত আমাদের সিরাজগঞ্জ জেলার আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক মাসের চেহারা। আমার মনে হয় ১৯৭০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশে যে পরিমাণ বন্যা ও বৃষ্টির পানি হতো তার ১০ ভাগের এক ভাগ পানি এখন হয় না। আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র মাস পানি, পানি, পানি আর পানিতে সমস্ত ফসলের মাঠ তলিয়ে যেত ৮/১০ ফুট পানির নিচে।

বন্যার সময় সিরাজগঞ্জ জেলার সবচেয়ে বড় হাট সোহাগপুরের হাটে মানুষ যেত প্রতি বুধবার। এই হাটে মানুষ পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করতো। ধান-চাল-ডাল-পাট-সুতা-রং-কাপড়-কাঠ-টিনসহ আরও অনেক পণ্য বিক্রি করতো। কেউ কেউ ঐ সব জিনিস হাট থেকে ক্রয় করে বাড়ীতে নিয়ে আসতো। সবাই নৌকায় যেতো, নৌকায় আসতো, আষাঢ়-শ্রাবণ, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে অন্য মাসে মানুষের মাথায় ঘোড়ায় ও গরুর গাড়ীতে।

বন্যার সময় শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে নৌকা বাইচ হতো, ভীষণ আনন্দ উৎসবের ব্যাপার ছিল। মানুষ আনন্দে-উৎসবে নৌকা বাইচে ফেটে পড়তো। কোথায় গেল সেই আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক মাসের রূপ? কোথায় গেল সেই বন্যা ও বৃষ্টির পানি, কোথায় গেল সেই স্রোতে উত্তাল নদী-নালা, খাল-বিল, ছোট-বড় বিভিন্ন সাইজের হাজার হাজার নৌকা? প্রতি গ্রামে নৌকার মাঝি বা নৌকাচালক সম্প্রদায়ের কয়েকজন মানুষ ছিলো। তাদের সারা বছরের সংসার চলতো চার মাসের নৌকা চালানোর রোজগারে। বাংলাদেশের মানুষের প্রধান পরিচয় ছিল, হাইলা, জাইলা নাইয়া হিসেবে। হাইলারা মাঠে হাল বাইতো, ফসল উৎপাদন করতো; জাইলারা পানিতে জাল দিয়ে মাছ মারতো আর নাইয়ারা নৌকা বাইতো বা নৌকা চালাতো। তবে একথা সত্যি, আজ সেই পানি নেই বলে যতই দুঃখ করি না কেন, সেই পানির মধ্যে বসবাস আজকের চেয়ে অনেক বেশী কষ্টের ছিল।

১৭. ০৯. ২০০৯

www.pathagar.com

গণতন্ত্রের দুই মারাত্মক ব্যাধি : ২১ বছর বয়সের নীচে এবং ক্ষুধায় কাতর গরিব মানুষের ভোটার লিস্টে নাম

২১ বছর বয়সের নীচের কোন ব্যক্তির ভোটার লিস্টে নাম উঠানো উচিত নয়। যাদের বয়স ২১ বছরের উপরে তাদেরই শুধুমাত্র ভোট দেবার অধিকার থাকা উচিত।

২১ বছর বয়স হয়েছে অথচ রাষ্ট্রকে কোন খাজনা বা ট্যাক্স প্রদান করে না, তাদেরও ভোট দেবার অধিকার থাকা উচিত নয়। যারা খুব গরিব, রিলিফ খায়, যাকাত খায়, ভিক্ষা করে, খাজনা ট্যাক্স দেবার সামর্থ নেই তাদের ভোটার করা উচিত নয়। যে লোকের পেটে ক্ষুধা আছে সে কোন সময় সঠিক চিন্তা করতে সক্ষম নয়। ২১ বছরের উপরে যে ব্যক্তি খাজনা ট্যাক্স প্রদান করেন, তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ের বয়স ২১ বছর বয়স হলে তারা ভোট দিতে পারবে। গণতন্ত্রের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির ওপর স্থাপন করার জন্য উপরের বর্ণিত বিষয়টি যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন গণতন্ত্রের শাসনের সুফল পাওয়া যাবে না। উদাহরণ, আজ যদি মিসেস খালেদা জিয়া ও মিসেস শেখ হাসি-না তাদের বাড়ীর একটি কুকুরকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়োগ দেন তা সবার আগে সমর্থন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদলের ও ছাত্রলীগের গরিবের সন্তান ও যাদের বয়স ২১-এর নীচে বয়স তারা। ধনী মানুষের সন্তান ও ২১ বছর বয়সের ওপরের বয়সের ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের খুব কম সংখ্যক ছেলে-মেয়ে তা সমর্থন করবে। মনে রাখা দরকার, ১৮ বছরের বয়সের কোন ব্যক্তি যদি মানুষ হত্যা করে তবে আদালতে তার মৃত্যুদন্ড হয় না প্রমাণ পাওয়া গেলেও। কেননা ধরে নেওয়া হয় ১৮ বছর বয়সে মানুষের চিন্তার পরিপক্কতা আসে না। কাজেই ১৮ বছরের মানুষকে ভোটার করা উচিত নয়। যারা রিলিফ খায়, যাকাত খায়, ভিক্ষা করে দুঃস্থদের জন্য প্রদত্ত কার্ডে খাবার খায়, তাদের ভোটের লিস্টে নাম তোলা খুবই অন্যায়। ১৯৫৪ সনেও যারা পাঁচ শিকা ইউনিয়ন পরিষদের চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান করেনি তারা ভোট দিতে পারেনি। যারা ইউনিয়নে বসবাস করেন এবং ইউনিয়ন পরিষদে চৌকিদারী ট্যাক্স প্রদান করেন এবং যারা শহরে বসবাস করেন এবং পৌর কর বা ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করেন তারাই শুধুমাত্র ভোটার লিস্টে ভোটার হবেন এবং ভোট দেবেন।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য-সদস্যাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, শক্তিশালী বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য আপনারা এই মর্মে আইন পাশ করে যান যে, যাদের বয়স ২১-এর উপরে, যারা ইউনিয়ন পরিষদে চৌকিদারী ট্যাক্স দেয়, পৌরসভায় যারা বসবাস করেন এবং তাদের মধ্যে যারা পৌরকর অথবা ইনকাম ট্যাক্স প্রদান করেন তারাই শুধুমাত্র ভোটার হতে

www.pathagar.com

এবং ভোট দিতে পারবেন। যে ট্যাক্স প্রদান করেন তার ২১ বছর বয়সের উপরের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েও ভোটার হতে পারবেন। সংসদ সদস্য ভাই ও বোনেরা, আপনারা এবারে ৫ বছর মেয়াদে নির্বাচিত হয়েছেন। আপনাদের মধ্যে অনেকেই এর আগে একাধিকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। আগামীবার অনেকে নির্বাচিত হবেন, অনেকে হতে পারবেন না, কেউ নমিনেশন পাবেন, কেউ পাবেন না, নমিনেশন পেয়েও কেউ জিতবেন, কেউ হারবেন এটাই চির সত্য কথা, কিন্তু যদি এমন কিছু করে ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতে পারা যায়, তবে সেটাই হবে অতি উত্তম কাজ। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সদস্য ভাই ও বোনেরা, আপনারা ইতিহাসে অমর হয়ে থাকার জন্য শক্তিশালী বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য, সুস্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে একমত হয়ে উপরে বর্ণিত বক্তব্যের পক্ষে পার্লামেন্টে আইন পাশ করুন। যদি উক্ত আইন আপনারা পাশ করে যান তবে আগামী শত বছর বাংলাদেশের বিবেকবান মানুষের প্রশংসা ও দোয়া পাবেন।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, ২৫ বছর বয়স না হলে কেউ জাতীয় সংসদের সদস্য হতে পারেন না। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ২৫ বছর বয়স না হলে মানুষের সঠিক চিন্তা-ভাবনা করার বয়স হয় না। গণতান্ত্রিক শাসনের সুফল পাওয়ার জন্য যতদিন ২১ বছর বয়সের ও যারা ট্যাক্স প্রদান করেন তারাই শুধুমাত্র ভোটার হবেন, এ দুটো দাবী যতদিন মানা না হবে ততদিন অসুস্থ গণতন্ত্র থাকায় সুস্থ ও সুখী, সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে না। এখনও পিয়ন, সেনাবাহিনী ও পুলিশের জোয়ান ছাড়া ২১ বছর পূর্ণ কিংবা ২২ বছর বয়স না হলে কেউ সরকারী চাকরীতে নিয়োগ পান না। বাংলাদেশের কোন আদালত যদি বাংলাদেশের কোন নাগরিককে দেউলিয়া ঘোষণা করেন, তবে সে নাগরিক ভোট দিতে ও ভোটে দাঁড়াতে পারে না। দেউলিয়া মানে সে গরিব, তার কোন সহায়-সম্পত্তি নেই। যে লোক নিজেই সারাদিন ঘোষণা করে বেড়ায়, "আমি গরিব, আমার কোন সহায়-সম্পত্তি নেই, আমি ক্ষুধার্ত, আমাকে ভিক্ষা বা সাহায্য দিন", তাহলে সে কেন ভোটার হতে পারবে? গরিবের প্রতি দয়া দেখানোর উৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে যাদের সামর্থ আছে তারা তাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজন, চাচাতো ভাই-মামাতো ভাই, খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই অনেক ক্ষেত্রে নিজের ভাইদের অর্থ সাহায্য করে প্রতিষ্ঠিত করুন, তারা যেন ভিক্ষা বা সাহায্য না খায়। তা হলেই সত্যিকারের গরিবের সেবা করা হবে, তাদের প্রতি যথার্ত সহানুভূতি দেখানো হবে। গরিবের ভোটার লিস্টে নাম তোলার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে গণতন্ত্র ও দেশের সর্বনাশ না করে কেউ যদি সামনে এসে বলে ভাই পেটে ক্ষুধা কিছু সাহায্য দিন, সাথে সাথে তাকে খাবার কিনে দিন, তাহলেই ধর্মের অনুশাসন মোতাবেক সত্যিকারের গরিবের প্রতি দয়া-মায়া দেখানো হবে এবং প্রচুর ছোয়াব বা পুণ্য অর্জন করতে পারবেন।

১৯.১০.২০০৯ সোমবার

www.pathagar.com

সে আমার আদরের ছোট বোন খাদিজা খানম তৌফা

১৯৭২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে গ্রামের বাড়ি তামাই থেকে ট্রেনযোগে ঢাকায় এসে কমলাপুরে নামি। মুক্তিবাহিনীতে থাকার সময় মাসে ৫০ রুপির যে বেতন পেয়েছি তার ৯৯ ভারতীয় টাকা নিয়ে। ১০০ রুপির ১ টাকার নোট ছিল। বাড়ি ত্যাগ করার সময় ছোট বোন নুরজাহান খান উজ্জলাকে এক টাকা দিয়ে আসি চকলেট কেনার জন্য। উজ্জলার তখন বয়স ছিল ৭-৮ বছর। নুরজাহান খান উজ্জলা এখন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের একজন সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর বা এডভোকেট। এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে ভারতীয় মুদ্রা ও বাংলাদেশী মুদ্রা দুটোই স্বাভাবিকভাবে চলেছে।

১৯৭২ সন থেকে ১৯৮২ সন এই দশ বছর ছিল আমার ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন। ইন্টারমিডেয়েট ২ বছর, স্নাতক অনার্স ৩ বছর, মাস্টার্স এক বছর, মোট ৬ বছর লাগার কথা, কিন্তু আমার লেগেছে ১০ বছর, এর মধ্যে আমার ব্যর্থতার জন্য ২ বছর, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধজনিত কারণে অন্যসব ছাত্র-ছাত্রীর মতো আমার আরও ২ বছর, মোট ৪ বছর বেশী লাগে। অন্যসব ছাত্রের ৬ বছরের কোর্স ৮ বছর লেগেছে। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, আমি আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় ভালো কর্মী বা নেতা ছিলাম। বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, শেখ কামালসহ অনেকেই আমাকে খুব ভালো চিনতেন, জানতেন। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সভা-সমাবেশ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কাজ করার সাথে জড়িত থেকেছি, ছাত্রজীবনে ঢাকা কলেজ হোস্টেলে থাকার সময় খাবার টাকা জুটে গিয়েছে নানাভাবে। দুই একবার ঐ সময়ের ২/৪ হাজার টাকাও এসেছে, কিন্তু জমাইনি। ২/৪ শ' টাকা বাড়ীতে পাঠিয়েছি, বই কিনেছি, সাধারণ ছাত্রদের খাইয়ে শেষ করেছি; ফলে সাধারণ ছাত্ররা আমাকে বেশ ভালোবেসেছে। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগস্ট এ জীবনের সমাপ্তি হয়ে গেল।

১৯৭৬ সনের জানুয়ারি মাসে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন সাহেব দুই হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন, বিরাট উপকার হলো। প্রায় এক বছর কড়া সামরিক শাসনের সময়ে সূর্য সেন হলে থেকে মান-সম্মান নিয়ে লেখাপড়া করি মাসে ২০০ টাকা খরচ করে। ১৯৭৭ সনের প্রথম দিকে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মান্নানের মাধ্যমে পরিচয় হলো সাংবাদিক সৈয়দ শাহজাহান সাহেবের সাথে, জড়িয়ে গেলাম বা যোগদান করলাম সাপ্তাহিক অগ্নিবীণা পত্রিকায়। ঐ পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করি, প্রচুর লিখি, লেখা সংগ্রহ করি। আওয়ামী লীগ নেতা মোল্লা জালাল, আব্দুল মান্নান, মিজান চৌধুরী, মালেক উকিল সাহেবদের গাড়ীতে চড়ে ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটা শহরে অগ্নিবীণা পত্রিকার সাংবাদিক হিসেবে আমিও যাই। ১৯৭৭, ১৯৭৮, ১৯৭৯ এই তিন

www.pathagar.com

বছর আওয়ামী লীগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য পত্রিকা ছিল সাপ্তাহিক অগ্নিবীণা। এই তিন বছর অগ্নিবীণা পত্রিকা থেকে অল্পবিস্তর যে টাকা পেয়েছি তা দিয়ে সূর্য সেন হলে থেকেছি, খেয়েছি ও পড়ালেখা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

১৯৮০, ১৯৮১–এ দু'বছরও সূর্য সেন হলে ছিলাম। তবে নিয়মিত আয় ছিল না, টানাটানির মধ্যে থেকেছি। যার জন্য সূর্যসেন হলের দুই তিনজন সহপাঠী বন্ধুর কাছ থেকে এই সময়ে মাঝেমধ্যে দুই এক টাকা সাহায্য নিয়ে ভাত খেয়েছি, যা ভেবে আজও খুব দুঃখ ও লজ্জা পাই এবং সে কথা মনে করে এখন গরীব মানুষদের সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করার চেষ্টা করি। দুই একজন ব্যবসায়ীর কাজে সাহায্য করে কিছু টাকা রোজগার করেছি, তাই দিয়ে খুব কষ্টে দিন চলেছে। এই সময়ে আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষা এসে যায়। আগে গা'ছাড়া ছাত্র হলেও এ দুবছর ৮০/৮১ সনের পরীক্ষার জন্য সময় দিতে হয়। ১৯৮১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু ও জেনারেল জিয়াউর রহমান সাহেব আমার সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকার ডিক্লারেশন দেন। তখন সব পত্রিকার ডিক্লারেশনরই অনুমোদন দিতেন প্রেসিডেন্ট। আমি খুবই কৃতজ্ঞ, জেনারেল জিয়াউর রহমান ও নূরুল ইসলাম শিশু ভায়ের প্রতি। আমি একজন আওয়ামী লীগের তরুণ সক্রিয় নেতা, পুলিশ রিপোর্টে এরকম থাকা সত্ত্বেও জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু আমাকে সাপ্তাহিক পরিবর্তনের ডিক্লারেশন দিয়েছেন। জেনারেল জিয়া ও জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নেতা ছিলেন। তারা তাজউদ্দিন সাহেবের ভক্ত। আমিও তাজউদ্দিন সাহেবের ভক্ত এবং একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য, যার জন্য এ দু'জন আমাকে খুব ভালোবাসতেন। এখনও ভালো সম্পর্ক নূরুল ইসলাম শিশু ভায়ের সাথে। জেনারেল নূরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের মিলিটারী সেক্রেটারী ছিলেন। তাজউদ্দিন সাহেব ১৯৭১ সনে কলকাতায় জিয়াউর রহমান সাহেবের কাছে একজন ভালো সেনা অফিসার চেয়েছিলেন তার সামরিক সচিব করার জন্য, জিয়াউর রহমান সাহেব জেনারেল শিশুকে নিয়ে কলকাতায় তাজউদ্দিন সাহেবের কাছে যান, তাকে সামরিক সচিব করার জন্য। এ কথা আমি তাজউদ্দিন সাহেব, জিয়াউর রহমান, জেনারেল নূরুল ইসলাম সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি।

১৯৮২ সন থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেছি ঢাকা শহরে। ২০০৫ সন থেকে একটি আধুনিক ফ্লাটের ১৩ তলায় বসবাস করি নিয়মিত মাসে মাসে ভাড়া দিয়ে, দামী চালের ভাত খাই, মান-সম্মান নিয়ে জীবন যাপন করি। এর মূলে সাপ্তাহিক পরিবর্তনের অবদান। সাপ্তাহিক পরিবর্তনের অনুমোদন বা ডিক্লারেশন দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান সাহেব, কিন্তু সাপ্তাহিক পরিবর্তনে জিয়াউর রহমানের সাহেবের স্বপক্ষে কোন লেখা কোনদিন প্রকাশিত হয়নি। বরং জিয়াউর রহমান ও তার বিএনপির রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচুর লেখা ছাপা হয়েছে। পরিবর্তন ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালী জাতীয়তাবাদ সমর্থক এবং অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের পত্রিকা ছিল। এর জন্য আমি যথেষ্ট অনুশোচনা করি, বিশেষত জিয়াউর রহমান সাহেবের জন্য। কিন্তু পৃথিবীর

www.pathagar.com

বাস্তবতা খুবই কঠিন। এই বাস্তবতাকে মেনে নিয়েই আমাদের সবার বেঁচে থাকতে হয়। ১৬ বছর পরিবর্তন বের হয়েছে–১৯৮২ থেকে ১৯৯৮। এই ১৬ বছরে পরিবর্তন পত্রিকা খুব কম সময়েই নিয়মিত বের হতে পেরেছে। ২/৪ মাসে নিয়মিত বের হয়েই আবার অনিয়মিত হয়েছে। তবুও ১৬ বছরে সাপ্তাহিক পরিবর্তন আয় করেছে ১ কোটি ২৫ লাখ টাকা। (প্রতি বছর ৭ লাখ ৮১ হাজার, সপ্তাহে ১৫ হাজার গড়ে) ব্যয় করেছে ১ কোটি ৩০ লাখ টাকা, খুব কষ্ট করে টানাটানি করে। ৫ লাখ টাকা লস বা ঋণ, সাথে আমার হয়েছে হাইপার টেনশন এবং ডায়াবেটিস রোগ। সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন– ইসমাইল মোহাম্মদ (উদয়ন চৌধুরী), রাজিয়া খান আমিন, ন্যাপের নেতা সিরাজগঞ্জের সাইফুল ইসলাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত ওসমান, আবু কায়সার, আবু রুশদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর সৈয়দ আলী কবীর ও মাহমুদ আলম বেগসহ অনেকে। এ সব লেখকের লেখা সাপ্তাহিক পরিবর্তনে প্রকাশিত হবার জন্য পরিবর্তন গর্ব করার মত কাগজ ছিল।

১৯৮৩ সন থেকে ৫ ভাই ৪ বোন নিয়ে ঢাকায় বাসা নিয়ে বসত শুরু করি। আমি সবার বড়। ২০০৫ সন পর্যন্ত অভাব-অনটন নিয়ে সংসার চালিয়ে এসেছি। ২০০৫ সন পর্যন্ত নিয়মিত ঠিক তারিখে বাসা ভাড়া দিতে পারিনি। কোন কোন সময় ২/৩ মাসও বাকী পড়েছে। এই অভাবজনিত কারণে লজ্জায় বিয়ে করতে সাহস পাইনি। তবে এটি ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত। ১৯৮৫ সনের আগেই আমার বিয়ে করা উচিত ছিল।

১৯৯১ সনে ঢাকার স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার চীফ ম্যানেজার সুখময় দত্ত আশ্চর্যজনকভাবে আমাকে ৫ লাখ টাকা ঋণ দেন। তা দিয়ে কালিয়াকৈরের চান্দুরাতে ৯০ শতক জায়গা কিনে গাভী পালন করে দুধ বিক্রি শুরু করি ভাইদের নিয়ে। লাভ হয় না, অথচ প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়, ফলে সেটা বন্ধহয়ে যায়। ১৯৯৯ সন থেকে মুরগীর খামার করি, তাও অলাভজনক হয়, ২০০২ সনে বন্ধ হয়। ২০০৪ সনে ৯০ শতক জায়গার ২৬ শতক বিক্রি করে জনতা ব্যাংকের লোন পরিশোধ করে দিই। ১৯৯৫ সনে জনতা ব্যাংক থেকে ৭.৫০ লাখ টাকা নিয়ে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার লোন শোধ করে দিই। কিছু টাকা দিয়ে সেখানে ঘর নির্মাণ করি, শ্রমিক বা কম আয়ের মানুষেরা ভাড়ায় থাকে। ২০০৮ সনে বেসিক ব্যাংক থেকে আবার ২৫ লাখ টাকা ঋণ নিয়ে আরও ঘর নির্মাণ করে ভাড়া দিই। ভাড়ার আয় থেকে ব্যাংক ঋণের কিস্তি শোধ করে যা পাই তা দিয়ে ঢাকায় বাসা ভাড়া করে মোটামুটি স্বস্তি ও সম্মানের সাথে বসবাস করছি। এ পর্যায় আসতে অনেক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে আসতে হয়েছে।

১৯৮৩ সন থেকে ২০০৫, ২২ বছর অভাব-অনটন-দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ২০০৫ সন থেকে শঙ্কামুক্ত স্বস্তির জীবনে বসবাস করছি ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্ত চাপ রোগ নিয়ে। যতদিন সাপ্তাহিক পরিবর্তন বের করেছি তা ছিল খুব কষ্টের জীবন, পুঁজি ছাড়া পত্রিকার ব্যবসায় নেমে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে পত্রিকা বের করা, সে এক কঠিন কাজ। বিজ্ঞাপনের জন্য গিয়ে মানুষকে তোয়াজ-তোষণ করা, পত্রিকা ছাপার জন্য কাগজ, প্রেস বিল, অফিস ভাড়া, কর্মচারীদের বেতন সংগ্রহ করা, অন্যদিকে বাসা ভাড়া এবং সংসারের

www.pathagar.com

চাল-ডাল-তেলের খরচ জোগাড় করা কঠিন কাজ। আর এই কষ্ট করেছি বলেই হয়তো আজ ৫০ বছর বয়সের পর থেকে বেশ আরামে আছি, ঐ সময় ঐ কষ্ট না করলে এখন হয়তো অনেক কষ্ট করতে হতো।

১৯৮৩ সন থেকে সব ভাইবোনকে নিয়ে ঢাকায় আমার সংসার-জীবনের শুরু। আমরা পাঁচ ভাই, চার বোনের মধ্যে দ্বিতীয় ভাইবোন মিলে চতুর্থ বোন তৌফা, যার বয়স আজ ২৬. ১০. ২০০৯ তারিখে হবে ৪৭-এর মত। গতকাল ২৫. ১০. ২০০৯ ঢাকার পি.জি হাসপাতাল থেকে ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা খরচ করে তিন মাস চিকিৎসার পর তাকে বাসায় ফেরৎ পাঠিয়েছে, তার আর কোন চিকিৎসা নেই। পিজি হাসপাতালে ৩ মাস চিকিৎসার সময় যে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ হলো, তা সম্পূর্ণভাবে বহন করেছে ছোট বোন এডভোকেট নূরজাহান খান উজ্জলা। ৩ বছর সরকারী উকিল হিসেবে কাজ করে সর্বমোট ৩ লাখ টাকার যেদিন বিল পায়, তার ২/১ দিন পরেই তৌফা পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয় রোগ নিয়ে। ডাক্তার আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, হাসপাতালে রেখে কোন লাভ নেই, পৃথিবীর কোথায় কোন চিকিৎসা করে কিছু হবে না।, বাসায় নিয়ে যান। তাই গতকাল ২৫. ১০. ২০০৯ থেকে তার জন্য এই লেখার শুরু। আমার ঢাকার এই ২৪ বছরের সংসারের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট সব যে সহ্য করেছে, । বাড়ীর মালিকদের সময়মত বাসা ভাড়া না দেবার তাগাদা সে সহ্য করেছে তাদেরকে অনুরোধ করে, বাসায় খরচের সংকট থাকলে হাতিরপুলের আবেদ-এর দোকান থেকে বাকীতে কিনে সে চালিয়ে নিয়েছে। প্রচুর গরীব মানুষকে ৫০ টাকা থেকে শুরু করে ১০০, ২০০, ৫০০, ১০০০ টাকা পর্যন্ত ধার দিয়েছে। ১৯৯৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর যখন ৩২৩/২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের বাসায় ভাড়া থাকতাম, আমাদের প্রয়োজনে মাঝেমধ্যে সে টাকাও ধার করে এনেছে, আবার তা পরিশোধও করেছে। ২৪ বছরে মাঝে-মধ্যে আমাদের কাছে বেশী টাকাও এসেছে। এখন আমাদের সংসারে অভাব-অনটন নেই, বেশ সচ্ছল অবস্থাতেই আছি। যখন পঁচিশ হাজার টাকা বাসা ভাড়া দিচ্ছি, তখনই আমাদের এই বোনকে কঠিন ব্যাধি আক্রমন করেছে।

১৯৮৮ সনে এই বোনের যখন ২৪ বছর বয়স তখন একটি কোম্পানীতে চাকরী দিয়ে টাংগাইলের এক গরিব বি.এ. পাশ ছেলের সাথে তার বিয়ে দিই। বিয়ের ৬ মাস টেকেনি, ছেলে অন্য জায়গায় বিয়ে করে, যার জন্য এই বোন আমাদের সাথেই থাকে। এমন কর্ম-পাগল মানুষ জগৎ সংসারে খুব কম দেখা যায়, আহ্ তার মাধুর্যময় ব্যবহার ও ব্যক্তিত্বের জোরে মানুষকে আমার এই বোন কত সহজে যে আপন করে নিতে পারতো, সেটা বলে বোঝানো মুশকিল। যে কোন বিপদগ্রস্ত মানুষের সেবার জন্য সে ছিলো সদা তৎপর। যাক, নিয়তি ও বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে। কিন্তু বাস্তব খুবই কঠিন। পি.জি. হাসপাতালের কাছে হাতিরপুল বাজারের নিকট আমার বসবাস বা বাসা ১৯৮৩ সন থেকে। আমাদের গ্রাম সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার তামাই গ্রামে। ১৯৯৮ সনে যমুনা নদীর ব্রিজ চালু হবার আগে সিরাজগঞ্জ বেশ দূরে ছিল। মানুষ এখনকার মত এত ধনী বা সচ্ছল ছিল না। ঢাকায় এত মানুষের বাসাবাড়ী ছিল না।

www.pathagar.com

ফলে গ্রামের অনেক আত্মীয় এবং স্বজনরা ঢাকায় এসে আমাদের বাসায় এসেছে, থেকেছে, এর মধ্যে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য রোগীরাই বেশী। এই রোগীদের পি.জি. হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে হাসপালে ভর্তি ও চিকিৎসা করানোর কাজে আমার এই বোন তৌফা অতুলনীয়। গত ২৭ বছরে কত রোগীকে যে আশ্রয় দিয়েছে আমাদের বাসায়, কত রোগীর যে সেবা করেছে তা বলে শেষ করা যাবে না। আমাদের সংসারে যে অভাব-অনটন আছে, চিকিৎসার জন্য আগত রোগী এবং অতিথিরা আমার আদরের এই ছোট বোন তৌফা খানের জন্য জীবনেও কোনদিন তা বুঝতে পারেনি। আমার এই বোনের কোনদিন রাস্তায় আস্তে হাঁটার স্বভাব ছিল না, সে সজোরে পা চালিয়ে হাঁটার অভ্যাস গড়ে তুলেছে। এই কথাগুলো যখন লিখছি ২৭. ১০. ২০০৯ ভোরে আমার প্রিন্স টাওয়ারের বাসায় তখন চারিদিকের মসজিদ থেকে মাইকে ফজরের নামাজের আযান শোনা যাচ্ছে। ঘুম থেকে প্রার্থনা করা উত্তম, সালাত বা প্রার্থনার জন্য এসো, কল্যাণের জন্য এসো, আল্লাহ মহান, মুহম্মদ (সঃ) তার প্রেরিত পুরুষ। কিন্তু আমার এই বোন যে নিয়মিত ছোটবেলা থেকে পাঁচবার নামাজ পড়েছে, প্রার্থনা করেছে, তার নামাজ পড়ার আর কোন শক্তি নেই, স্রষ্টার প্রশংসা করার কোন পথ নেই, গতকাল ২৬. ১০. ০৯ সে বলল, মিলাদ পড়ালে সে ভালো হবে। দুপুরে ঘরের মধ্যে হুজুরকে দিয়ে আমরা ভাইবোনরা মিলিত হয়ে মিলাদ পড়ালাম, বোন তৌফাও পাশের সোফায় বসে কষ্ট করে মিলাদে অংশ নিলো, তা দেখে আমার চোখে পানি ঝরছে।

এখানে আরেকটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সকল লেখার কাটিং আমার এই বোন তৌফা খান সংক্ষরণ করে রেখেছে, আমি পত্রিকায় প্রকাশিত আমার কোনো লেখার কাটিং বা পত্রিকা সংক্ষরণ করি নাই। ২০০৮ সনের জুলাই মাসে আমি প্রথম জানতে পারি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত আমার লেখার কাটিং আছে, আমার ছোট বোন তৌফা খানের কাছে। এই প্রকাশিত লেখার কাটিং পেয়েই বই বের করার উদ্যোগ নেই। তারই ফলশ্রুতি '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই। আমার জীবনের কত বড় উপকার করেছে আমার এই বোন তা ভেবে আবেগে বিহ্বল হয়ে পড়ি। '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বই আমার জীবনের এক বিরাট সম্পদ।

২৭. ১০. ২০০৯

www.pathagar.com

১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা

প্রফেসর আনিসুজ্জামান

বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা এবং একজন মানবতাবাদী ভাবুক ও লেখক স্নেহভাজন আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) লিখিত '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি পড়লাম। বাবলুকে আমি অনেক দিন ধরে চিনি–গত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে। সে ঢাকা কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হয়। বছর দুই পরে বিভাগ পরিবর্তন করে সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স নেয় এবং অনুষঙ্গী বিষয় হিসেবে রাখে দর্শন ও সাধারণ ইতিহাস। আওয়ামী ঘরানার বিশিষ্ট আইনজীবী সৈয়দ রেজাউর রহমানের স্ত্রী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মমতাজ বেগম ১৯৭৩ সনে আওয়ামী লীগ থেকে সাংসদ মনোনীত হন। ১৯৭৪ সনে আমি তাঁর স্থলে সোহরাওয়ার্দী কলেজে কিছুদিন পড়াই। ১৯৭৬ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে গবেষক হিসেবে যোগদান করি। ১৯৭৭ সনে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে যোগ দিই। ১৯৮০ সনে আমি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ফিরে আসি। এ সময় আমার সাথে বাবলুর প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো। সে মিশুক প্রকৃতির ও খোলা মনের মানুষ, ভাল সংগঠক এবং একজন সমাজ-সচেতন সাংবাদিক হিসেবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৮২ সন থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত দীর্ঘ ১৬ বছর সে সাপ্তাহিক পরিবর্তন নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতো। মাঝে মাঝে তাঁর পত্রিকার কপি পেতাম। সে সময় আমি বাবলুকে ছোট ভাই হিসেবে দেখতাম, আজ বলতে সংকোচ নেই, সে কারণে আমি অনেক সময় তার সব কথা ও লেখাকে ততটা গুরুত্ব দেইনি। মাস কয়েক আগে তার এ বইটি পেয়ে আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ি। বইটি পড়ার পর আমি বাবলুকে নতুনরূপে আবিষ্কার করি। বাবলুকে একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ, একজন সত্যভাষী ও সহানুভূতিশীল লেখক হিসেবে দেখতে পাই। বাবলু এ বইতে অকপটভাবে, কোনরকম বুদ্ধিজীবীসুলভ রাখঢাক না রেখে, নিঃশঙ্ক চিত্তে অনেক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছে। এ বইয়ে তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি সর্বত্র যে সমমানের হয়েছে, এমন নয়, কিন্তু তার সহজ-সরল বিবরণের মধ্য দিয়ে তার গভীর দেশপ্রেম, প্রকৃত আধ্যাত্মিক অনুভূতি, অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চেতনা, সাধারণ মানুষের প্রতি আস্থা ও মমত্ববোধ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা, সর্বোপরি একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার অঙ্গীকার যে কোন সংবেদনশীল পাঠকের হৃদয় যে ছুঁয়ে যাবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনশত ৯২ পৃষ্ঠার এই বইতে আটচল্লিশ পৃষ্ঠার এলবাম যুক্ত হয়েছে। এলবামে বাবলুর কিশোর বয়সের ছবি থেকে শুরু করে তার পরিণত বয়সের অনেক ছবি আছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ও ঘটনা এবং ঐতিহাসিক স্থানের সাথে সম্পর্কিত এসব ছবি থেকে বাবলুর পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতার ব্যাপ্তি সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

বইটিতে পাঁচটি পরিচ্ছেদ রয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের শিরোনাম : ১৯৭১ : মুক্তিযুদ্ধ ও কয়েকটি প্রবন্ধ। এ পরিচ্ছেদে ষোলটি লেখা স্থান পেয়েছে। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ এক বা একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা এবং দীর্ঘ পর্যালোচনার দাবী রাখে। স্থানাভাবে আমি কেবল প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম এখানে উল্লেখ করবো এবং কোন কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে দু'একটি মন্তব্য করবো। আলোচনার এ পদ্ধতি আমি অন্যান্য পরিচ্ছেদের প্রবন্ধগুলোর ক্ষেত্রেও অনুসরণ করবো।

প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম প্রবন্ধের শিরোনাম : মুক্তিবাহিনী থেকে বাড়ী ফেরা। ছয় পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটি ২২.১২.১৯৯৪ সনের দৈনিক সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত। এ প্রবন্ধে সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ বাবলুর গভীর দেশপ্রেম, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ, নৈতিক অঙ্গীকার ও উচ্চশিক্ষা লাভ করে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম : দ্বিজাতিতত্ত্বের ভূত : রাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীন বাংলাদেশ টিকে থাকবে কি? সাড়ে চার পৃষ্ঠার এ লেখাটি ১১.৩.১৯৯১ তারিখে দৈনিক বাংলার বাণীতে প্রকাশিত। এ প্রবন্ধে বিখ্যাত ভারতীয় লেখক অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি চিঠির পূর্ণ উল্লেখ আছে এবং ঐ সময়ের কিছু রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাবলুর উৎকণ্ঠা ব্যক্ত হয়েছে।

তৃতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম : জনাব ফখরুদ্দীন আহমদের কাছে বিনীত আবেদন : শেখ হাসিনারে দুঃখ দিয়ে নিজে সুখ নিও না, সত্য ও ন্যায়ধর্মকে করো না বিমুখ তা তব প্রাসাদ হতে। সাত পৃষ্ঠার এ লেখাটি ২২.৬.২০০৭ তারিখে লিখিত, সম্ভবত পূর্বে অন্যত্র প্রকাশিত হয়নি। জনাব ফখরুদ্দীন আহমদ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা থাকাকালে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও বাংলাদেরে ভবিষ্যৎ নিয়ে বাবলুর আন্তরিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে এ লেখাটিতে। চতুর্থ প্রবন্ধের শিরোনাম : শেখ হাসিনা ও শাইখুল হাদিস আজিজুল হক চুক্তি বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তিকে অনেক শক্তিশালী করবে। সাড়ে সাত পৃষ্ঠার এ লেখাটির রচনাকাল ১৬.৭.২০০৭; পরে ৩০.৮.২০০৮ তারিখে অর্ধ পৃষ্ঠার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য পাদটীকায় সংযোজিত হয়েছে। এ লেখাটিতে বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মের স্থান, শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলের প্রতি বাবলুর দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত হয়েছে। বাবলুর কিছু বিশ্লেষণের সাথে ভিন্নমতের অবকাশ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তার অনেকগুলো মন্তব্য খুবই বাস্তবিক তাও বোধকরি অস্বীকার করা যায় না।

পঞ্চম প্রবন্ধটির শিরোনাম : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশ ও মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার নেপথ্য কথা। প্রায় দশ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটি ৬.৫.১৯৯২ ও ৯.৫.১৯৯২ এই দু'তারিখে দৈনিক আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিতে প্রবাসী সরকার গঠন ও পরিচালনা বিষয়ে অনেক সাধারণ্যে অজানা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ষষ্ঠ লেখাটির শিরোনাম : বইয়ের নাম মহাভারত, প্লেটোর রিপাবলিক এবং আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ। প্লেটোর রিপাবলিক ও মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ অংশটির রচনাকাল ১৯৯৪; মহাভারত সম্পর্কীয় অংশটির রচনার সময় ২৬.৮.২০০৮, আলোচ্য গ্রন্থ তিনটি পাঠে বাবলুর মনে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা ব্যক্ত হয়েছে এ লেখায়।

www.pathagar.com

সপ্তম প্রবন্ধের শিরোনাম : ১৯৭১ সনে তাজউদ্দিনের প্রাইভেট সেক্রেটারী ডক্টর ফারুক আজিজ খানের লেখা স্প্রিং ১৯৭১ : স্বাধীনতাযুদ্ধের এক শক্তিশালী দলিল। এ লেখাটি ২৫শে কার্তিক, ১৪০০ (১৯৯৪ইং) তারিখের দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত। অষ্টম প্রবন্ধের শিরোনাম : ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের নেপথ্যকথা ও তাজউদ্দিনের ভূমিকা। সাড়ে তিন পৃষ্ঠার একটু বেশী এ প্রবন্ধটি ২০.৩.১৯৯২ তারিখে দৈনিক আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিতে লেখক বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের কিছু প্রেক্ষাপট ও এ ভাষণ রচনায় জনাব তাজউদ্দিনের অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। নবম প্রবন্ধের শিরোনাম : ২৬শে মার্চের গণআদালত কাছে থেকে দেখা। সোয়া তিন পৃষ্ঠার এ লেখাটি ২৭.৩.১৯৯২ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত। লেখাটি স্বব্যাখ্যাত। দশম প্রবন্ধটির শিরোনাম : চলমান জীবনের চালচিত্র। পাঁচ পৃষ্ঠার এ লেখাটি ২৬.৩.১৯৯২ তারিখে সাপ্তাহিক প্রত্যয়ন পত্রিকায় প্রকাশিত। এ লেখাটিতে লেখক অকপটে তার জীবন ও জীবিকাসংক্রান্ত কিছু তথ্য তুলে ধরেছেন। একাদশ প্রবন্ধটির শিরোনাম : ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা রাজাকার আলবদরের চেয়েও বেশি ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট–আসল মুক্তিযোদ্ধা কারা? ছয় পৃষ্ঠার এ লেখাটি ১৯৯৪ ও ২০০৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে লেখা। এ প্রবন্ধে তিনি প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অঙ্গীকারের পাশাপাশি কিছু নামধারী মুক্তিযোদ্ধার কর্মকাণ্ড তুলে ধরেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, এ সব অপকর্মের সাথে যারা যুক্ত তারা রাজাকার-আলবদরের মত, এমন কি, তাদের থেকেও অধিক ঘৃণিত। দ্বাদশ প্রবন্ধের শিরোনাম : মুজিব সরকারের তিন স্তম্ভ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান। সাত পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধ ১৮.৬.১৯৯২ তারিখে আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত। এ প্রবন্ধটিতে মুক্তিযুদ্ধের, বিশেষ করে প্রবাসী সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এ তিন জাতীয় নেতার অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবদান সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রয়োদশ প্রবন্ধের শিরোনাম : স্মৃতির পাতায় ৩রা নভেম্বরের জেল হত্যাকাণ্ড। ছয় পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটি ৩.১১.২০০২ তারিখের দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধটিতে তাজউদ্দিন আহমদের হত্যাকাণ্ড, তাঁর লাশসংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও বাবলুর সাহসী ভূমিকার উল্লেখ আছে। চতুর্দশ প্রবন্ধটির শিরোনাম : স্মৃতির পাতায় ৩রা নভেম্বর ১৯৭৫ (২)। সোয়া পাঁচ পৃষ্ঠার এ প্রবন্ধটি ২৪.১০.২০০২ তারিখে রচিত। এ লেখাটিতে লেখকের কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতি ও অনুভূতি ধৃত হয়েছে। ১৯৭৫-এর সেই দুঃসময়ের সাথে যুক্ত এসব তথ্য নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চদশ প্রবন্ধটির শিরোনাম : ১৯৯৫ সন : আজকের বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে কয়েকটি কথা। ২৪শে মাঘ, ১৪০১ (১৯৯৫) তারিখে লেখাটি দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত হয়। তিন পৃষ্ঠার এ লেখাটিতে সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত মুল্যায়ন আছে।

এ পরিচ্ছেদের শেষ লেখাটির শিরোনাম : চাই ভেজালমুক্ত সংসদীয় গণতন্ত্র। ছয় পৃষ্ঠার এ ক্ষুদ্র কিন্তু বক্তব্য বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূল প্রবন্ধটি লিখিত হয় ২০০২ সনের আগস্ট মাসে। এটাকে কেন্দ্র করে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার সর্বজনাব রাহাত খান, জিয়াউল হক, সৈয়দ তোশাররফ আলী, সৌরভ জাহাঙ্গীর, দৈনিক নিউ নেশন-এর

www.pathagar.com

জনাব আলমগীর মহিউদ্দিন প্রমুখের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাবলুর কথা লিখিত হয় ২০.৯.২০০২ তারিখে। সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও প্রধান উপদেষ্টা জনাব হাবীবুর রহমান, অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান, ডক্টর মিজানুর রহমান শেলী প্রমুখের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত সংযোজিত হয়েছে। আমি মনে করি, আলোচ্য বিষয়ে বাবলুর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম : সেই সব বিরল ও অসাধারণ মানুষদের কথা। এ পরিচ্ছেদে স্থান পেয়েছে এগারটি প্রবন্ধ; ক্রমানুসারে প্রবন্ধগুলোর নাম নিম্নরূপ : জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব : তাঁকে যেমন দেখেছি; স্মৃতির পাতায় শ্রদ্ধেয় জননেতা মাওলানা ভাসানী; ২৩শে জুলাই তাজউদ্দিন আহমদের ৬৭তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি; আওয়ামী লীগের একজন সাত্ত্বিক নেতা আব্দুল মোমিন; সব মানুষের প্রিয় নেতা মিজানুর রহমান চৌধুরী; মহান নেতা শামসুল হক; ইসমাইল মোহাম্মদ (উদয়ন চৌধুরী) এবং বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি; মানবতাবাদী মানুষ জনাব রশীদ আহমদ আর নেই; অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব : রিচার্ড নিক্সন; আমার ভাই আমার বন্ধু জুলফিকার আলী ভূট্টো; কবি আবুল হাসান।

এ প্রবন্ধগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৭.১১.২০০২ তারিখের দৈনিক বাংলা বাজার পত্রিকায় ও অষ্টম প্রবন্ধটি ১৯৮৮ সনের ২৩শে সেপ্টেম্বরের সাপ্তাহিক পরিবর্তন পত্রিকায় ও নবম প্রবন্ধটি ২৯.৫.১৯৯৪ তারিখের সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকায়, দশম প্রবন্ধটি ১৫.৬.২০০০ তারিখের দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। বাকী প্রবন্ধগুলো ১৯৭৫ সন থেকে ২০০৮ সনের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। বলা বাহুল্য এসব লেখাগুলো প্রধানত স্মৃতিচারণমুলক; তবে এসব স্মৃতিচারণ থেকে জাতি গঠনের জন্য অনেক অনুপ্রেরণামূলক কথা ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বেরিয়ে এসেছে। বঙ্গবন্ধুর উপরে লিখিত প্রথম প্রবন্ধটি বঙ্গবন্ধুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি দিকের উপর লিখিত একটি অনবদ্য দলিল। একজন দরদী মানুষ হিসেবে তাঁর জুড়ি নেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম : চিঠিপত্র। এ পরিচ্ছেদে পঞ্চাশটির অধিক চিঠি রয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছাড়াও এসব চিঠিতে লেখকের সমাজভাবনা সংস্কৃতি ও চেতনা। আধ্যাত্মিক অনুভুতি, সৌন্দর্য বোধ, বাঙালির ভবিষ্যৎচিন্তা প্রভৃতি বিষয়ে একটি প্রতিরূপ সহজ সরল ও অনাড়ম্বর ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। চিঠিপত্রে মানুষের একান্ত অনুভূতি ব্যক্ত হয়, আর মানুষ প্রিয় ঘনিষ্ঠজনদের কাছেই সাধারণত এসব ঐকান্তিক বোধ প্রকাশ করে। যাদের কাছে বাবলু এসব চিঠি লিখেছে বা যে সব ব্যক্তি তার কাছে চিঠিপত্র দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়, শিবনারায়ণ রায় ও গীতা রায়, ভবানী সেনগুপ্ত (চাণক্য সেনগুপ্ত), অধ্যক্ষ আবদুল হামিদ, কুনাল চট্টোপাধ্যায়, পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়, দীলিপ মৈত্র, জীবন চন্দ্র চক্রবর্তী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্দিকুর রহমান, সন্তোষ কুমার মিশ্র দেবশর্মা, পিনাকরঞ্জন চক্রবর্তী,

www.pathagar.com

রাজিব প্রাসাদ সাহা, সরদার আবদুস সাত্তার, সদরুদ্দিন, দেবীপ্রসাদ মিত্র, শিপ্রা আদিত্য, চন্দনা খান, তাজউদ্দিন আহমদের মেয়ে সিমি হোসেন রিমি ও শারমিন আহমদ রিপি ও তার বন্ধু পুনু (রশিদ খন্দকার)। এসব চিঠিপত্রের সময় কাল ১৯৭৭ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত বিস্তৃত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোনাম : অভিমত, প্রতিবাদ ও দাবী। এ পরিচ্ছেদে পনেরটি লেখা রয়েছে। সেগুলোর শিরোনাম যথাক্রমে : বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধনী ও সংযোজনী প্রয়োজন প্রসঙ্গে (রচনাকাল : ০২.০৮.২০০২); বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সৈয়দ শামসুল হকের কথা : দুটি প্রতিবাদ (রচনাকাল ১৬.২.১৯৯২); প্রসঙ্গ : মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা (১৯৯২ সনের দৈনিক আজকের কাগজ-এ প্রকাশিত লেখক নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেনি); তাজউদ্দিন আহমদ, দৈনিক সংবাদ একটি ভিন্নমত (২৩.৭.১৯৯৩ তারিখের দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত); প্রসঙ্গ রেসকোর্স ময়দান (রচনাকাল ২৩.৯.২০০৬), বিটিভি-তে প্রচারিত বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ (৯.১০.২০০৬ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত); হাবিবুল আওয়ালকে আইন সচিব নিয়োগ সরকারের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত (৮.৭.২০০৭) তারিখের দৈনিক প্রথম আলো-তে প্রকাশিত); রবিউল আলম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীর উপর কয়েকজন দুষ্কৃতিকারী পুলিশের এ বর্বর আচরণের বিচার চাই (রচনাকাল ৬-৮-২০০৮); রমনা পার্ক, সরোয়ার্দী ময়দান, স্বাধীনতার স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ এবং এ বিষয়ে দু'একটি কথা (২০.৮.২০০২ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত); কামারখন্দ থানার প্রিয় ভাই ও বোনেরা (রচনাকাল ২০.৯.২০০২); বিষয় : আর্মি গলফ ক্লাবে (নিকুঞ্জ) মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে সেনাবাহিনীর সদস্য বা সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ফি-তে মেম্বারশিপ পাওয়ার জন্য আবেদন (রচনাকাল ২৬.৩.২০০৪); বিষয় : রমনা (সোহরাওয়ার্দী) ময়দানে একজন গণপূর্ত অধিদপ্তর থেকে সহকারী প্রকৌশলকে পোস্টিং দেবার জন্য আবেদন (রচনাকাল ৩.৬.২০০৭); ১৯৯৫ সনে বেসরকারি শিক্ষকদের ধর্মঘট (২৭শে বৈশাখ, ১৪০১ তারিখের দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত); বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান এবং বার্মার নাগরিকদের মধ্যে অবাধ চলাফেরা ও পণ্যদ্রব্য বিক্রীর সুযোগ দেওয়া একান্ত দরকার (রচনাকাল ৩.১০.২০০৮ ও ১৪.১০.২০০৮); বাংলাদেশের কোন মহিলা বা নারীকে ৩টি সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেপ্তার না করার আইন করার জন্য মাননীয় আইন সচিব ও আইজিপি সাহেবের প্রতি আবেদন (রচনাকাল ১.১০.২০০৮)।

এ সব প্রবন্ধের সব বক্তব্যের সাথে সবাই যে একমত হবেন, এমন নয়; কিন্তু লেখাগুলোতে যে লেখকের সামাজিক সচেতনতা, রাজনৈতিক দায়িত্ববোধ, ব্যক্তিগত মূল্যবোধ ও এক ধরনের বিশ্বনাগরিক বোধের প্রকাশ ঘটেছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না।

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদের শিরোনাম : ইংল্যান্ডের রাজা রাণী, ভারতের সম্রাট, গভর্নর জেনারেলদের নাম, ভ্রমণ ২০০৮ ও অন্যান্য রচনা। এ পরিচ্ছেদে হাজার বছরের অধিককাল ধরে বিস্তৃত সময়সীমায় গ্রেট বৃটেনের রাজা ও রাণীদের নামের ধারাবাহিক তালিকা, ভারতবর্ষের সম্রাট বা শাসকদের নামের, কতগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপঞ্জিসহ, ১৩৯৮ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত ভারতের শাসকদের নামের তালিকা যুক্ত হয়েছে। লেখকের অনুরোধে এ গুরুত্বপূর্ণ তালিকা করেছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক সরকারী কর্মকর্তা জনাব শামসুজ্জামান। এসব তালিকার পর রয়েছে একটি স্মৃতিধর্মী রচনা, শিরোনাম : আমার একজন শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় মানুষ মোহাম্মদ সিরাজউদ্দিন, সাবেক সিএসপি (রচনাকাল ২৯.৭.২০০৮); এর পরের লেখাটির শিরোনাম : কাজী আনিসুর রহমান ও শফিউল ইসলাম কামাল (রচনাকাল ১০.১০.২০০৮)। এর পরের লেখাটির শিরোনাম : সময়ের মুখোমুখি, এটি হাসান শফি লিখিত উক্ত নামের বইটির সমালোচনা, যা ১৯.৫.১৯৯৪ তারিখের দৈনিক সংবাদ সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। এর পরের লেখাটিও একটি পুস্তক সমালোচনা। লেখক মোরশেদ শফিউল হাসান; এটি একটি কবিতা বই, নাম অভিমানের বদলে, বাবলুর এ পুস্তক সমালোচনাটি ৭.৭.১৯৯৪ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাক-এ প্রকাশিত।

এর পরের লেখাটি বগুড়া, নাটোর, রংপুর, দিনাজপুর ও বরিশালে লেখকের সস্ত্রীক ভ্রমণের একটি ব্যক্তিগত আনন্দঘন বর্ণনা। বগুড়া ভ্রমণের তারিখ ৩.৪.২০০৮; নাটোর ভ্রমণের তারিখ ৬-৭.৭.২০০৮; রংপুর ভ্রমণের তারিখ ৮-১৩.৭.২০০৮; দিনাজপুর ভ্রমণের তারিখ ১৩-১৭.৭.২০০৮; বরিশাল ভ্রমণের তারিখ ২০-২৪.৭.২০০৮। এসব ভ্রমণকাহিনীতে লেখকের একটি ভিন্নতর মনোযোগীর সাথে পাঠক পরিচিত হয়। সৌন্দর্যপিপাসু, বন্ধুবৎসল, সামাজিক অনুষ্ঠানে সবার প্রিয় বাবলু এখানে আমাদের কাছে নতুনরূপে ধরা দেয়। এর পরের লেখাটির শিরোনাম : জেলার নাম সিরাজগঞ্জ (রচনাকাল ১৩.১০.২০০৮)। এ লেখাটি পাঠ করলে পাঠক সহজেই সিরাজগঞ্জ জেলার অনেক বিস্মৃতপ্রায় কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তি সম্পর্কে, সংক্ষিপ্ত পরিসরে হলেও, কিছুটা জানতে পারবেন। এর পরের লেখাটির শিরোনাম : মানুষ এক বয়সে যা করে গর্ব করে, পরবর্তী বয়সে গর্ব করা ঐ কাজের জন্য অনুশোচনা করে (রচনাকাল ২৫.১০.২০০৮)। আড়াই পৃষ্ঠার এ ক্ষুদ্র লেখাটি পাঠককে এক ভিন্ন অনুভূতির জগতে নিয়ে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রেই পাঠকের মধ্যেও অভিন্ন অনুভূতি ও এক ধরনের বেদনাবোধের সৃষ্টি হয়। এর পরের লেখাটি বিশিষ্ট লেখক সলিমুল্লাহ খান-এর সাথে লেখকের পরিচয়কে কেন্দ্র করে। শেষ লেখাটি বাবলুর আলোচ্য বইটির পাণ্ডুলপি সম্পর্কে সলিমুল্লাহ্ খানের এক ধরনের অভিমতবিশেষ।

'১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি প্রকাশক করেছে পরিবর্তন প্রকাশনী সংস্থা, স্থান এ/১২। প্রিন্স টাওয়ার, ১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫। প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০০৮। ৩৬০ পৃষ্ঠার (৪৮ পৃষ্ঠা এ্যালবামসহ) বোর্ড বাঁধাই অফসেট কাগজে ছাপা বইটির দাম রাখা হয়েছে পাঁচশত টাকা। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে লেখকের নানা

www.pathagar.com

মরহুম এমদাদুল হক তালুকদার, মহাজোট সরকারের বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত, গ্রীন ডেল্টা ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাসির আহমদ চৌধুরী ও বিশিষ্ট ভারতীয় ব্যাংকার সুখময় দত্ত-এর নামে। বইতে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী, মুক্তিযুদ্ধকালীন তাঁর সাব সেক্টর কমান্ডার ইকবাল রশিদের একটি প্রশংসাপত্র, বইটি সম্বন্ধে তার ভূমিকাস্বরূপ কয়েকটি কথা, কৈফিয়ৎ ও ঘোষণা এবং সূচীপত্র সংযোজিত হয়েছে।

লেখাগুলো সর্বত্র সমভাবে শ্রেণীবদ্ধ না হলেও একটি সমাজসচেতন ও আত্মত্যাগী মুক্তিযোদ্ধার জীবনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন ঘটনা ও তার পরিচিতিজনদের সাথে তার সম্পর্কের একটি নিবিড় ও অন্তরঙ্গ দলিল হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির জীবনে গত চার দশক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশ ও জাতির ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ নির্মাণে লেখকের দেয়া অনেক তথ্য, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সাহসী উচ্চারণ অনেক কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি স্নেহভাজন বাবলুকে সেজন্য আন্তরিক দুআ করি ও অভিনন্দন জানাই। সম্ভব হলে আর একটু সতর্ক সম্পাদনার পর এটি পুনঃপ্রকাশের জন্য আমি বাবলুকে অনুরোধ করবো। আমি গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও গ্রন্থকারের সুস্থ-সবল কর্মময় দীর্ঘ জীবন কামনা করছি।

১৫ নভেম্বর, ২০০৯

ড. আনিসুজ্জামান
বিএ (অনার্স), এমএ, এমফিল (ঢাকা), পিএইচডি (ওয়েলস্, ইউকে)
পোস্ট-ডক্টরাল (এন্ড্রুস, ইউএসএ; কিংগস কলেজ, লন্ডন, ইংল্যান্ড)
প্রফেসর (সিলেকশন গ্রেড), দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন উপাচার্য, বাংলাদেশ ইসলামী ইউনিভার্সিটি, ঢাকা
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাক্তন পরিচলাক (ড. জিসি দেব সেন্টার)

www.pathagar.com

২০১৫ সনে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি

৫৫১২৬ বর্গ মাইল আয়তন নিয়ে আমাদের যে বাংলাদেশ তার আজ ১০. ১১. ২০০৯ তারিখে ভোটার সংখ্যা ৮.৩০ কোটি ১৮ বছরের নীচে ২ কোটি যদি ধরা হয়, তবে জনসংখ্যা হয় ১০.৩০ কোটি। ১৯৪৭ সনে ভোটার ছিল ২ কোটি। আজ এই ৮.৩০ কোটি ভোটার ও ১৮ বছরের নীচে ২ কোটি মোট ১০.৩০ কোটি লোকের মধ্যে প্রায় ৮ কোটি লোক নিয়মিত (তিন বেলা খাবার পায়। এই ৮ কোটি লোকের মধ্যে ২ কোটি লোক খুব ধনী, ২ কোটি লোক মোটামুটি ধনী, ৪ কোটি লোক ধনী না হলেও এদের তেমন অভাব অনটন নেই, বাকী ২ কোটি ৩০ লাখ লোক গরীব, এদের মধ্যে ১ কোটি ১৫ লাখ লোক গরীব, ১ কোটি ১৫ লাখ লোক চরম গরীব বলে আমার ধারণা। মোট কথা আজ বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৭৫ ভাগ লোক তিন বেলা নিয়মিত খাবার পাচ্ছে, ২৫ ভাগ লোক ২ কোটি ৩০ লাখ তিন বেলা খাবার পাচ্ছে না।

এই বাংলাদেশে ১৯৯০ সনের আগ পর্যন্ত ৭৫ ভাগ লোক ৩ বার নিয়মিত খাবার পায় নাই, ২৫ ভাগ লোক নিয়মিত ৩ বার খাবার পেয়েছে। যুগ যুগ ধরে পেটের ক্ষুধার জন্যে এই বাংলাদেশের মানুষ ভয়াবহ দুঃখ-কষ্টে জীবন-যাপন করেছে। ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারিতে বাংলার আকাশ-বাতাস মুখরিত ছিল। মানুষের ভালো ঘর-বাড়ী ছিল না। জীর্ণ-শীর্ণ কুঁড়েঘরে বসত, রোদে-বৃষ্টিতে অবর্ণনীয় কষ্ট, মাইলের পর মাইল মানুষের কুঁড়েঘরে ছনের ঘরে বসতি, আজ বাংলাদেশ থেকে সেই জীর্ণ-শীর্ণ কুঁড়েঘর বিদায় নিয়েছে, মানুষ সুন্দর ঘর-বাড়ীতে বসবাস করছে। মাইলের পর মাইল মানুষ রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে বোঝা মাথায় পায়ে হেঁটে হাটে-বাজারে যাতায়াত করেছে। আজ মানুষ বাসে, রিক্সায় ভ্যানগাড়ীতে যাতায়াত করছে।

মানুষের গায়ে জামা কাপড় ছিল না, কোটি কোটি মানুষ খালি গায়ে থেকেছে, ছেঁড়া গেঞ্জি ছেঁড়া জামা পরেছে। আজ এ-দেশে খালি গায়ের মানুষ খুব কম চোখে পড়ে, সবার পরনে জামা-কাপড় আছে। এক সময়ে এই বাংলাদেশের ৪ ভাগের তিন ভাগ মানুষ ২৪ ঘণ্টায় ৩ বার খাবার পায় নাই, পরনে কাপড় পায় নাই। আজ ৪ ভাগের তিন ভাগ লোক ২৪ ঘণ্টায় ৩বার নিয়মিত খাবার পাচ্ছে, পরনে কাপড় পাচ্ছে, এটা কিভাবে সম্ভব হলো? এটা সম্ভব হয়েছে নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য :

প্রথম কারণ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় কারণ : ইরিধানের চাষ, বাংলাদেশের ব্যাপক গরীব মানুষের জন্য বিরাট আশীর্বাদ নিয়ে এসেছে। প্রতি বিঘায় ৩০ মণের মত ইরিধানের চাষ হয় এক মৌসুমে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি হয়েছে, অথচ আগে যুগ যুগ ধরে জমিতে আউশ ধানের চাষ হয়েছে যা প্রতি বিঘায় ৬/৭ মণ উৎপাতি হতো, তাও আবার মাঝে-মধ্যেই আউস ধান কাটার

www.pathagar.com

আগেই বর্ষার পানি এসে ডুবিয়ে দিতো, কোন ধানই পাওয়া যায় নাই। আজ ইরিধান চাষের জন্য কোটি কোটি কৃষক বিরাট উপকৃত হয়েছে।

তৃতীয় কারণ : বিদেশে কর্মসংস্থান, প্রায় ৮০ লাখ লোক বিদেশে কাজ করে, বাংলাদেশের লোক, যার জন্য ৮০ লাখ পরিবারের আজ অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে, ৮০ লাখ লোকের পাঠানো অর্থে।

চতুর্থ কারণ : গ্রামে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর শাখা খোলার জন্য মানুষ বিরাট উপকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের ৪৮০ থানায় জনতা, সোনালী, অগ্রণী, কৃষি ব্যাংকের শাখা থেকে ১০ লাখ লোক ঋণ পেয়েছে কম করে হলেও ২৫ হাজার টাকার উর্ধ্বে, ফলে এই ১০ লাখ লোক দারিদ্র্য, থেকে অনাহার থেকে রক্ষা পেয়ে উন্নত জীবন-যাপন করছে। এর বাইরে রয়েছে স্বনির্ভর বাংলাদেশ, গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা–এসব এনজিওর ঋণকার্যক্রম। এরা ৫ হাজার, ১০ হাজার, ২০ হাজার টাকা করে কয়েক কোটি মানুষকে ঋণ দিয়েছে, এদের কাছ থেকে যদি দুই কোটি লোক ঋণ নিয়ে থাকে, তবে ঋণগ্রহীতা এই ২ কোটি লোকের ১ কোটি লোক অতি গরীব থেকে অনেকটা সচ্ছল হয়েছে, বাকী ১ কোটি লোক আরও গরীব হয়েছে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে, তবুও তো ১ কোটি লোক অতি দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করে অনেকটা সচ্ছল যদি হয়ে থাকে তাও বিরাট সাফল্যের ব্যাপার।

পঞ্চম কারণ বাংলাদেশে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, প্রায় ৫ হাজার গার্মেন্টসের প্রতিটিতে ৫ জন করে পরিচালক বা মালিক ধরলে ২৫ হাজার জন মালিক, এরা বিরাট ধনী, ২৫ হাজার বিরাট ধনী মানুষ এদেশে তাদের অর্থ খরচ করছে বিভিন্নভাবে, স্বাভাবিকভাবেই সমাজে তার প্রভাব পড়ছে। এছাড়া তো প্রায় ১০ লাখ গার্মেন্টস শ্রমিক রয়েছে।

উল্লিখিত ৫টি কারণে আজ বাংলাদেশের চার ভাগের ৩ ভাগ মানুষ নিয়মিত দিনে ৩ বার খাবার পাচ্ছে, ৪ ভাগের ১ ভাগ মানুষ নিয়মিত দিনে ৩ বার খাবার পাচ্ছে না। আশা করা যায় আগামী ৫ বছর পর ২০১৫ সনের মধ্যে এই খাবার না পাবার সংখ্যা কমে যাবে আরও ৪ ভাগের ৩ ভাগ। তার মানে ২০১৫ সনে যদি বাংলাদেশের ভোটার হয় ১১ কোটি, তবে নিয়মিত দিনে ৩ বার খাবার পাবে ১৩ কোটি মানুষ, ১৪ কোটি মানুষের মধ্যে ১৩ কোটি মানুষ দিনে ৩ বার নিয়মিত পেট ভরে খাবার পাবে। অবশ্য এমনও হতে পারে এই ১৩ কোটি লোক সাহায্য-সহযোগিতা করে ১ কোটি গরীব মানুষকে ৩ বেলা নিয়মিত খাবার পাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। পেটের ক্ষুধার কষ্ট খুব অসহ্য, মানুষকে পেটের ক্ষুধা অমানুষে পরিণত করে, পেটে নিয়মিত খাদ্য পেলে মানুষ অমানুষ হওয়া থেকে রক্ষা পায়। পেটের ক্ষুধায় মানুষ চুরি-ডাকাতি করে, পেটের ক্ষুধায় মানুষ ভিক্ষা করতে বাধ্য হয়, পেটের ক্ষুধায় মেয়েরা দেহ-ব্যবসা করে থাকে। ২০১৫ সনে বাংলাদেশের কোন মানুষ না খেয়ে থাকবে না, প্রতিটি মানুষ পেট ভরে খাবার পাবে, আমি আন্তরিকভাবে এই কামনা করি বা স্বপ্ন দেখি।

২০. ১১. ২০০৯
প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

www.pathagar.com

বাংলাদেশের বিবেকবান মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি সবিনয় আবেদন : দয়া করে গোমাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকুন

১৯২০ এবং ১৯৩০-এর দশকে ভারতবর্ষে গোরক্ষা সমিতি নামে একটি সংগঠনের জন্ম হয়েছিল আচার্য বিনোবাভাবের নেতৃত্বে। আচার্য বিনোবাভাবের নেতৃত্বে এই গোরক্ষা সমিতির অন্যতম সদস্য ও নেতা ছিলেন অধ্যাপক রাশেদ সোহরাওয়ার্দী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বাবা ব্যারিস্টার জাহিদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা মাজহারুল হক, বিহারের কংগ্রেস নেতা সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, ভারতের সাবেক রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনসহ আরও বেশ কয়েকজন বিদগ্ধ মুসলিম। ভারতের অর্থনেতিক সমৃদ্ধির জন্য হিন্দু-মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য এবং গরুর মত একটি অবলা, নিরীহ, উপকারী প্রাণীকে হত্যা না করার জন্য গোরক্ষা সমিতির সদস্য ও নেতারা আহ্বান জানিয়েছিলেন।

মওলানা মাজহারুল হক ভারতে তার সময়ে জওহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মওলানা আবুল কালাম আজাদের চেয়ে বড় নেতা ছিলেন, জাহিদ সোরওয়ার্দী, ডক্টর জাকির হোসেন, মওলানা মাজহারুল হক অনেক উঁচু স্তরের মুসলিম ও আলেম ছিলেন, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিদ্যা, ইসলামিক মূল্যবোধ আমাদের চেয়ে অনেক বেশী, তারা ভারতের মুসলমানদের কল্যাণের জন্য গরুর মত নিরীহ প্রাণী হত্যা ও গোমাংস খাবার বন্ধের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। আমাদের সাধারণ মুসলমানদের কি উচিত নয় তাঁদের মত আলেম ও জ্ঞানীদের ডাকে সাড়া দিয়ে গোমাংস খাওয়া বন্ধ করা? ডক্টর জাকির হোসেন, মওলানা মাজহারুল হক, সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, জাহেদ সারওয়ার্দী-র মত ব্যক্তিকে সম্মান দেখানো? ইসলাম ধর্মের মূল স্তম্ভ মদিনা সনদ পবিত্র কোরআনের বাণী ও আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বিদায় হজ্বের বাণী। প্রতিটি মুসলমানের এই তিনটি জিনিস অবশ্যই পালন করতে হবে। এর মধ্যে মদিনা সনদের কোন শর্ত যদি কোন মুসলমান অমান্য করে, তবে সে মুসলমান সমাজ থেকে আপনা-আপনি বিতাড়িত বলে পরিগণিত হবে বলে মদিনা সনদে স্পষ্টভাবে লেখা আছে। এই ৩টি বিধানের মদিনা সনদ, পবিত্র কোরআন এবং বিদায় হজ্বের বাণীর কোথায় উল্লেখ নেই যে, হে মুসলমান তোমরা গরুর মাংস ভক্ষণ করিও। তাহলে কেন আমরা মুসলমানগণ গরুর মাংস খাই, গরুর মাংস খাওয়া আমাদের ইসলাম ধর্মের উক্ত ৩টি মূল স্তম্ভের নির্দেশনায় নেই। গরুর মাংস খাওয়ার সাথে ধর্মের সম্পর্ক নেই, এটা একটা খারাপ কালচার। গরুর মাংস বেশী খেলে শরীরে নানা রোগ হয়, নিজের রোগমুক্তির জন্য গোরুর মাংস না খাওয়া উচিত।

www.pathagar.com

এর পরে রয়েছে ইসলাম ধর্মের অন্যতম বিধান মানুষের মনে দুঃখ দেওয়া মহাপাপ, মসজিদ ভাঙার সমান পাপ। তাই যদি হয় তবে আমরা যেখানে সেখানে গরু জবাই করে গরুর মাংস ভক্ষণ করে আমাদের নিকট পাড়া-প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে কেন দুঃখ দেই? হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ গরুকে প্রায় মায়ের সমপর্যায়ে স্থান দেয়। জন্মের পরে শিশুকালে গরুর দুধ খেয়ে মানুষ বড় হয়, গায়ে শক্তি পায়, আর সেই অবলা প্রাণীকে নির্মমভাবে জবাই করে খাই। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মনে দুঃখ-কষ্ট না দিয়ে তাদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য, তাদের ভালোবাসা লাভের জন্য গরুর মাংস না খাওয়া উচিত।

অবশ্য প্রতি বছর কোরবানীর মধ্যে কয়েক হাজার কোটি টাকার বেশী ধনী বা সচ্ছল লোকদের হাত থেকে গরীব মানুষ, যারা গরু পালে, তাদের হাতে যায়, এটা একটা বিরাট বিষয়। এটা নিয়ে আমি মাঝে-মধ্যে ভাবি। কাজেই এই ভাবনার ফলে বলতে চাই, গরুর বদলে খাসি, ভেড়া বা মহিষ হতে পারে, গরীব মানুষ খাসি, ভেড়া, মহিষ পালবে। ধনী মানুষ একটি ষাঁড়ের বদলে ৫/১০টা ছাগল, ভেড়া বা মহিষ কোরবানীতে দেবেন সউদি আরবের মত, এতে কোরবানীর বিধান সম্পূর্ণভাবে পালন হবে, গরীবের হাতেও টাকা যাবে। কোরআন শরীফে দুম্বা কোরবানীর কথা আছে, আমাদের নবী (সাঃ) দুম্বা কোরবানী দিয়েছেন, গরু নয়। যিনি ৫০ হাজার টাকার ষাঁড় কোরবানী দিচ্ছেন তিনি ১০টি খাসি বা ভেড়া দেবেন। তাহলেই কোরবানীর ঈদের মাধ্যমে যে লক্ষ লোকের কাছে হাজার হাজার কোটি টাকার ওপরে যায়, সেটা বহাল থাকবে। সব প্রাণীহত্যাই হৃদয়বিদারক। ছাগল, দুম্বা, মহিষ অবলা নিরীহ প্রাণী, তবুও লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের অর্থনৈতিক আয়-বৃদ্ধির কথা চিন্তা করে দুঃখ-বেদনার সাথে ছাগল-মহিষ হত্যা মেনে নেয়া যায়। তবে গরু যেভাবে সরাসরি উপকার করে ছাগল তা করে না।

মীর মশাররফ হোসেন সাহেব ১৮৮৯ সনে গোহত্যা বন্ধ করবার আবেদন জানিয়ে একটি হৃদয়গ্রাহী লেখা লিখেছিলেন 'গোজীবন' নামে। ঐ লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেব অপর একটি লেখা লেখেন। 'মীর মশাররফ হোসেনের লেখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেব লিখেছেনে-কোন মুসলমান গাই-গরুর মাংস খায় না, বকনা ও গাই-গরু জবাই করা মুসলমানদের ধর্মবিরুদ্ধ কাজ, মুসলমানরা সবল সুস্থ গরুও জবাই করে না, যে গরু আর কোন কাজে লাগে না, বৃদ্ধ হয়ে যায়, সেই গরু জবাই করে খায়। কাজেই গোজীবনের লেখক অযথা বলেছেন যে, গো বধ করার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক কাজকর্মে বাধার সৃষ্টি করছেন মুসলিমরা। মুসলিমরা অকেজো গরু জবাই করে খায়, প্রকাশ্যে নয়, লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনে।'

আমাদের ছোটবেলায় মুন্সী মেহেরুল্লা সাহেবের কথার সততা অনেকটা দেখেছি। বকনা বা গাই-গরু জবাই হতো না, বৃদ্ধ বলদ বা দুর্বল ষাঁড় জবাই হতো। গোপনে, প্রকাশ্যে নয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর থেকে পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। বকনা গরু, গাই গরু, সবল সুস্থ ষাঁড় গরু সবই প্রকাশ্যে যেখানে-সেখানে জবাই করে তার মাংস ভক্ষণ করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

প্রিয় মুসলমান ভাই ও বোনেরা, দয়া করে সদয় হোন, পাড়া-প্রতিবেশী হিন্দু ভাইদের কথা স্মরণ করে, নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে, নিরীহ অবলা পশু যে দুধ দিয়ে আমাকে-আপনাকে বাঁচিয়েছে, সবল সুস্থ করেছে, তার কথা চিন্তা করে গোমাংস ভক্ষণ বন্ধ করুন। ডঃ জাকির হোসেন, ব্যারিস্টার জাহিদ সারওয়ার্দী, সৈয়দ মাহমুদ হোসেন, মওলানা মাজহারুল হক অনেক উচ্চ স্তরের মুসলমান ছিলেন, তারা নিজেরা গোমাংস খান নাই, এবং অন্য মুসলমানদের গোমাংশ খেতে নিষেধ করেছেন। ভারতের কোন পণ্ডিত, জ্ঞানী, গুণী মুসলিম নেতা গরুর মাংস খাওয়ার পক্ষে যুক্তি-তর্ক দিয়ে কোন লেখা আজ পর্যন্ত লিখেছেন বলে আমার জানা নেই, যদি কেউ জানেন দয়া করে জানাবেন, পড়ে দেখবো।

বিহারের কংগ্রেস নেতা সৈয়দ মাহমুদ হোসেন প্রসঙ্গে মওলানা আজাদ ইন্ডিয়া উইনস্ ফর ফ্রিডম বইয়ের সেই বিখ্যাত ৩০ পৃষ্ঠায়, যা তার মৃত্যুর ৩০ বছর পরে প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে লিখেছেন ১৯৩৭ সনের নির্বাচনের পরে বিহারে যদি কংগ্রেস নেতারা সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে এবং মহারাষ্ট্রে নরিম্যানকে প্রধানমন্ত্রী বানাতেন, তবে আর দেশভাগ হতো না। পাকিস্তানের সৃষ্টি হতো না। ১৯৩৭ সনে কংগ্রেস নেতা সৈয়দ মাহমুদ হোসেনের নায্য পাওনা ছিল বিহারের প্রধানমন্ত্রীর পদ। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা সম্প্রদায়িক শক্তির কাছে পরাজিত হয়ে সিনিয়র যোগ্য ও ত্যাগী নেতা সৈয়দ মাহমুদ হোসেনকে ও নরিম্যানকে প্রধানমন্ত্রী না বানিয়ে তাদের চেয়ে জুনিয়র অযোগ্য লোককে প্রধানমন্ত্রী বানান, যারা হিন্দু। এই ঘটনায় সারা ভারতের মুসলমানরা দুঃখ পান এবং তারা সাম্প্রদায়িক দল মুসলিম লীগে দলে দলে যোগদান করেন। মাহমুদ হোসেনকে ১৯৩৭ সনে কংগ্রেস নেতারা বিহারের এবং নরিম্যানকে প্রধানমন্ত্রী বানালে ভারতের মুসলমানরা দলে দলে মুসলিম লীগে যোগ দিতো না। পাকিস্তান হতো না। সেই সৈয়দ মাহমুদ হোসেনও গোমাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। উপরে যাদের নাম উল্লেখ করা হলো তাদের মধ্যে মওলানা মাজহারুল হক সাহেব মনে হয় সবচেয়ে বয়সে বড় বা সিনিয়র হবেন, কেননা মহাত্মা গান্ধী, মাজহারুল হককে তার লেখায় তাঁর প্রিয় বন্ধু বলে উল্লেখ করেছেন।

বাংলাদেশ ও ভারতের কোটি কোটি মুসলমান গরুর মাংস ভক্ষণ করেন, আবার লক্ষ লক্ষ রোগে কাতর মুসলমান রুগী এবং স্বাস্থ্যসচেতন বিবেকবান লক্ষ লক্ষ মুসলমান গরুর মাংস খান না। আবার বাংলাদেশ ও ভারতের কোটি কোটি হিন্দু গরুর মাংস খাওয়াকে বিবেকহীন অন্যায় ও পাপ কাজ বলে মনে করে গোমাংস ভক্ষণ করেন না। আবার লক্ষ লক্ষ বিবেকহীন ও হৃদয়হীন অমানুষ কমুনিস্ট, নাস্তিক হিন্দু গরুর মাংস ভক্ষণ করে থাকে।

ভারতের গুজরাট, মহারাষ্ট্র প্রদেশে ও দিল্লী প্রেসিডেন্সি এলাকায় মনে হয় ৮ কোটির মত মুসলিম জনসাধারণের বসবাস। কিন্তু ১৯৯১ সন থেকে গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিল্লী প্রেসিডেন্সিতে গরু জবাই, মাংস বিক্রী ও মাংস খাওয়া আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, কেউ গরু জবাই ও মাংস বিক্রী ও মাংস ভক্ষণ করলে ৬ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত সশ্রম

www.pathagar.com

কারাদণ্ড। ফলে ১৯৯১ সন থেকে প্রায় ২০ বছর যাবৎ গুজরাট, মহারাষ্ট্র দিল্লীর প্রায় ৮ কোটি মুসলমান গরুর মাংস খেতে পারছে না। ছাগল, ভেড়া, মহিষ, উট কোরবানী দিচ্ছে। এই ২০ বছর যাবৎ ৮ কোটি মুসলমানের গরুর মাংস না খাবার জন্য তাদের কোন সমস্যা হয় নাই, তারা বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছে। প্রথম প্রথম গরুর মাংস না খাওয়া নিয়ে কিছুটা বিক্ষোভ ছিল, কিন্তু এখন আর কোন বিক্ষোভ নাই, স্বাভাবিক বলে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, দিল্লীর ৮ কোটির মত মুসলমান মেনে নিয়েছে হিন্দু মুসলমান শান্তিপূর্ণসহ অবস্থানের স্বার্থে। আর ২০ বছর গরুর মাংস না খাবার ফলে গোমাংসের প্রতি আকর্ষণ সম্পূর্ণ উবেই গিয়েছে ঐ ৮ কোটি মুসলমানের।

গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিল্লী প্রেসিডেন্সির ৮ কোটি মুসলমানের মধ্যে হাজার হাজার কোরআনে হাফেজ, মওলানা ও আলেম আছেন, এই লক্ষ লক্ষ হাফেজ, মওলানা ও আলেম সমাজ গোমাংস নিষিদ্ধ হবার জন্য কোন আন্দোলন বা বক্তব্য-বিবৃতি দিয়েছেন বলে জানি না যে, গোমাংস না খাবার জন্য ইসলাম ধর্মচর্চার অসুবিধা হচ্ছে। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও দিল্লী প্রেসিডেন্সির লক্ষ লক্ষ কোরআনে হাফেজ, মাওলানা ও আলেম সমাজ গোমাংস না খাওয়াকে স্বাভাবিকভাবে মেনে নিয়েছেন, তারা গোমাংস খান না এবং না খাওয়ার জন্য তাদের মনে কোন রাগ-বিদ্বেষ নেই অন্তত প্রকাশ্যে, গোপনে থাকতে পারে।

আমি পীর সাহেবদের শ্রদ্ধাভক্তি ও সম্মান করি। ২ বার পবিত্র আজমীর শরীফে গিয়েছি, আজমীর শরীফের পীর সাহেব খাজা বাবা মইনুদ্দিন চিশতী সাহেব মাছ-মাংস খেতেন না, নিরামিশ-আহারী ছিলেন। তার ভক্তদেরও তিনি গোমাংস তো দূরের কথা, মাছ এবং সব ধরনের মাংস না খেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আজমীর শরীফ দরবারে শুধু পায়েস এবং খিচুড়ী রান্না হয়। কোন মাছ-মাংস আজমীর শরীফ দরবারে প্রবেশ করতে পারে না। আবার আজমীর শরীফে যাবার ইচ্ছা আছে, আজমীরে মাজার জিয়ারত করে নফল নামাজ পড়ে প্রাণে অনাবিল শান্তি পাই। এ থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় গোমাংস না খেলে সামান্যও ইসলাম ধর্ম-বিরোধী কোন কাজ করা হবে না। তাই বিবেক ও হৃদয়বান দয়ালু মুসলমান ভাই-বোনদের কাছে আকুল আবেদন, দয়া করে গোমাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকুন।

আল্লাহ আমাদের বাংলার মুসলমানদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন, বাংলার মুসলমানরা যেন গোমাংস ভক্ষণ না করে। হে আল্লাহ, আমাদের এই বর্বরতা থেকে একমাত্র তুমিই শুভ বুদ্ধি দিয়ে রক্ষা করতে পারো, তোমার সাহায্য চাই।

বিঃ দ্রঃ : স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদের লেখা সাহিত্য একাডেমী কতৃক প্রকাশিত অটোবায়োগ্রাফী বা আত্মকথা নামক বই থেকে গো-রক্ষা সমিতির মুসলিম সদস্যদের নাম ও তথ্য নেওয়া হয়েছে।

২৮.১১.২০০৯ রোববার, কোরবানী ঈদ।

www.pathagar.com

কবি নির্মলেন্দু গুণের পৃথিবী জোড়া গান, কবিতার বই এবং ত্রিশালের আকাশ

১লা ডিসেম্বর ২০০৯, মঙ্গলবার, অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী আমার মায়ের মামা সাহাবুদ্দিন তালুকদারের ছেলে ইঞ্জিনিয়ার আলী কায়সার তালুকদারের সাথে দেখা অনেক দিন পর। ২০০৭ সনের ১০ই জানুয়ারি রাতে সে বাংলাদেশে ছুটি কাটাতে এসে প্লেনে ঢাকা ত্যাগ করে। সে রাতেই বিএনপি অনুগত ইয়াজউদ্দিনের পতন হয়, ১১ জানুয়ারি ফকরুদ্দীন সাহেব প্রধান উপদেষ্টা হন। ইঞ্জিনিয়ার কায়সার তালুকদার ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশ ত্যাগ করে চলে যায় প্রথমে নিউজিল্যান্ড, পরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। ১৯৯৬ সনের পর দুই বার দেখা হলো কায়সার মামার সাথে ২০০৬-এর ডিসেম্বর মাসে, আর ২০০৯-এর ১লা ডিসেম্বরে ৩ বছর পর। এর আগে সে যখন ঢাকায় আসে আমি তখন ভারত ভ্রমণে যাই ২০০৪ সনে, যার জন্য দেখা হয় নাই। ১৯৯৬ সনে কায়সার মামা বাংলাদেশ ত্যাগ করার আগে আমার সাথে বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল, সে মোটামুটি আমার ভক্ত। আমার ৬ বছর পর রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ থেকে এসএসসি পাশ করে ১৯৭৬ সনে, এইচএসসি ১৯৭৮ সনে। তারপর চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে সহকারী ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চাকুরীতে প্রবেশ করে ১৯৮৭ সনে। ১৯৯৬ সনে বাংলাদেশ ত্যাগ করার আগে ১৯৮৭ সন থেকে ১৯৯৬ সন পর্যন্ত সপ্তাহে ৪/৫ দিন আমার সাথে কয়েক ঘণ্টা করে সময় কাটাতো। কায়সার তালুকদার আমার মামা হবার জন্য, পিডিবি বা বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আরও অনেক ইঞ্জিনিয়ার আমাকে মামা ডেকে থাকেন।

যাক, ২০০৯ সনের ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার মতিঝিলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইন বিভাগে যেখানে কায়সার কাজ করতো, সে অফিসে তার সাথে দেখা করে সেখান থেকে আমার আর এক ভক্ত আশরাফুজ্জামান তিতুর কাছ থেকে নিশান পেট্রল জীপগাড়ি নিয়ে উত্তরায় কায়সার মামাদের বাড়ীতে যাই, দুপুরে খাবার খাই, অস্ট্রেলিয়া থেকে আমার জন্য একটি সুন্দর টাই এনেছে, নেকটাইটি গলায় বাঁধলাম। কায়সার মামার বাড়ীতে তার অসাধারন সুন্দরী বোন আমার খালা বিউটি, ডলি, কল্প, জলি, ডলির স্বামী এসপি কায়সার মামার সুন্দরী স্ত্রী, এবং তার মা সুদর্শনা বেলী নানীর সাথে কথা বলে বেলা তিনটার দিকে ঢাকায় রওনা দিয়ে অসুস্থ মাসুদুল কবীরকে জিগাতলার বাসায় দেখে আমি বাসায় ফিরি ছয়টার সময়ে অন্ধকারে। এর আগে সকালে বন্ধু আনোয়ার কামাল, যে ১৯৯৮ সনে বাংলাদেশ ত্যাগ করে আমেরিকায় বা নিউইয়র্ক গিয়েছিলেন সে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে ৭ মাস আগে মে ২০০৯-এ। আমার বাসার পিছনে সেন্ট্রাল রোডে তার বাসা থেকে তাকে নিয়ে মঙ্গলবার সকালে ধানমন্ডি লেকে মর্নিং ওয়াক করার জন্য যাই; সেখানে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের চাচার ছেলে মুনিম সাহেবের

www.pathagar.com

সাথে দেখা, মুনিম সাহেব বললেন, মাসুদ সাহেব অসুস্থ, অপারেশন করে বাসায় এসেছেন, দেখতে যাবেন। মাসুদ সাহেবের বাবা তাজউদ্দিন সাহেবের বন্ধু, বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভার সদস্য জনাব সামসুল হক।

যাক ১.১২.২০০৯ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাসায় এসে ড্রয়িং রুমে বইয়ের আলমারীতে পুরানো বই নাড়াচাড়া করার সময় কবি নির্মলেন্দু গুণের 'পৃথিবী জোড়া গান' কবিতার বইটি আমার হাতে পড়ে। বইটির প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২। প্রকাশক সন্ধানী প্রকাশনী। প্রচ্ছদ কাইয়ুম চৌধুরী, দাম দশ টাকা। বইটি হাতে নিয়ে যেটা দেখে আশ্চর্য হলাম, তা হচ্ছে কবি নির্মলেন্দু গুণ ১৮.২.১৯৮২ তারিখে বইটি তার নিজের হাতে স্বাক্ষর করে আমাকে পড়তে দিয়েছেন মোটা নিবের কালো কালির কলমে, খুব মোটা নিব, যে নিববিশিষ্ট কলম সাধারণত চিত্রশিল্পীরা ব্যবহার করে থাকেন। তুলির মত কাজ করে, সেই তুলির কালো কলম দিয়ে খুব সুন্দর শিল্পসম্মতভাবে পৃথিবী জোড়া গান বইতে লিখে দিয়েছেন শ্রীমান বাবলুকে প্রীতিসহ নির্মলেন্দু গুণ ১৮.২.১৯৮২, নির্মলেন্দু গুণ'দার এত শিল্পসম্মত লেখাটি এর আগে এত ভালো করে দেখি নাই, দেখে খুব বিস্মিত এবং খুশী হলাম, এত সুন্দর কারুকার্যময় লেখা।

বইটি ড্রয়িং রুমের আলমারী থেকে এনে বিছানায় রেখে রাতের খাবার খেয়ে ৭টার আগেই অভ্যাসমত ঘুমিয়ে পরি, যথারীতি রাত ৩টায় ঘুম ভেঙে গেলে পৃথিবী জোড়া গান কবিতা বইয়ের কবিতাগুলো পড়তে নিয়ে চমকে উঠি, কি সুন্দর সুন্দর কবিতা, পড়ে প্রাণ আনন্দে নেচে ওঠে, হৃদয়ে দোলা দেয়। ১৯৮২ সনের ফেব্রুয়ারি বইমেলায় আজ থেকে ২৮ বছর আগে প্রকাশিত পৃথিবী জোড়া গান কবিতার বইয়ে রয়েছে জগন্নাথ হল : ১৯৭১, নিছক কুকুরের গল্প, গাধার দেশ, একটি নিরব মৃত্যু (কমরেড জ্যোতিষ বসু স্মরণে), আমার জন্ম, ময়মনসিংহে নজরুল, একতা এক্সপ্রেস-এর মত কবিতা।

পৃথিবী জোড়া গানে মোট ২২টি কবিতা রয়েছে। তবে উপরে লেখা ৭টি কবিতা, পড়ে আমি আনন্দে আহ্লাদিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, এই ৭টি কবিতা পড়ে এতই মুগ্ধ হলাম যে, মনে হলো পৃথিবী জোড়া গান কবিতা বইয়ের এই ভালোলাগার কবিতাগুলোর কথা যদি আমি লিখে প্রকাশ না করি, তবে লেখক হিসেবে আমার অনেকটা অসাধুতার পরিচয় থেকে যাবে, তাই এই লেখা। আরও একটি কারণে এই লেখাটি লেখার জন্য তাড়না বোধ করলাম, তা হলো ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের আকাশ নিয়ে কিছু বলার জন্য। ১৯৯২ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের বাৎসরিক সম্মেলন হয়, ঐ সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য বাংলাদেশের প্রথম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের ১৯৫০-৫২ সনের অধ্যাপক জনাব আব্দুল মান্নান সাহেবের সাথে ঢাকা থেকে আমিও যাচ্ছিলাম তার গাড়ীতে। ঐ দিন ১১ই জ্যৈষ্ঠ উপলক্ষে কবি নজরুলের জন্মজয়ন্তী পালন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মিসেস খালেদা জিয়া ত্রিশালে গিয়েছিলেন হেলিক্যাপ্টারযোগে। ঐ দিন ১৯৯২ সনের অল্প বয়সী সুন্দরী মহিলা খালেদা জিয়া, হেলিক্যাপ্টার ও প্রধানমন্ত্রীকে দেখবার জন্য হাজার হাজার সাধারণ মানুষের ঢল, ঢাকা-ময়মনসিংহ রাস্তা মানুষের ভীড়ে, যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ

www.pathagar.com

বন্ধ। বাধ্য হয়ে আমাদের গাড়ী ত্রিশালে প্রায় ২ঘণ্টা থেমে থাকে, ঐ দিন ত্রিশালের ফসলের মাঠ ও দিগন্তবিস্তৃত আকাশ দেখেছিলাম, যা প্রাণে এখনও খুব স্পষ্টভাবে গেঁথে রয়েছে। সেই ১৯৯২ সন থেকে আমার হৃদয়ে গেঁথে থাকা দিগন্তবিস্তৃত ত্রিশালের আকাশের কথা দেখতে পেলাম নির্মলদার পৃথিবী জোড়া গান কবিতা বইয়ের ২৭ পৃষ্ঠায়। ময়মনসিংহে নজরুল নামে কবিতায়, নির্মলেন্দু গুণ এই কবিতায় নজরুল ইসলামের ত্রিশাল ত্যাগ করা নিয়ে লিখেছেন–ভালোই হয়েছে, আমাদের ক্ষতি হয়নি কিছুই, আমরা পেয়েছি উচ্ছন্ন আবীর-ঢাকা অগ্নিদগ্ধ কালবৈশাখীর রুদ্র আকাশের মতো প্রসারিত, এক সাম্যবাদী কবি, আর হতভাগ্য, আপনি পেয়েও হারালেন কবিবৎসল ত্রিশালের এই উন্মুক্ত আকাশ।

আসলেই ত্রিশালের আকাশ কবি বৎসল উন্মুক্ত আকাশ। আমি কবি নই, তবুও ত্রিশালের উন্মুক্ত আকাশ ১৯৯২ সনে ভালোবাসার হাতছানি দিয়ে আমাকে ২ঘণ্টা বেঁধে রেখেছিলো। ত্রিশালে গাড়ি থেকে নেমে ২ঘণ্টা ত্রিশালের আকাশ দেখে আনন্দে সময় কাটিয়ে দিই, একটুও বিরক্ত হই না।

২.১২.২০০৯, সকাল ৫টা।

www.pathagar.com

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী উপন্যাসের দুটি চরিত্রে এম.এন. রায়

এম.এন.রায়কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরেবাইরে' উপন্যাসে অমূল্য চরিত্রে এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসে সব্যসাচী চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ঘরেবাইরে উপন্যাস লেখা হয় ১৯০২ সনে বাংলায় যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতির সদস্যরা যখন অস্ত্র হাতে বৃটিশ শাসকের লোকদের হত্যা করা শুরু করেছে সে পটভূমিতে। ১৯০২ সনে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের বয়স ছিল ১৫ বছর, ১৮৮৭ সনের ২১শে মার্চ জন্ম ২৪ পরগণা জেলার উলুবেড়িয়া গ্রামে। পরবর্তীতে ১৯২০ সনে এম.এন রায় বা মানবেন্দ্রনাথ রায় নাম ধারণ। স্কুলের ছাত্র থাকার সময়ে অনুশীলন সমিতিতে অস্ত্র হাতে বৃটিশ কর্মচারীদের হত্যা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন অরবিন্দ ঘোষ, বারিন ঘোষ-এর সহযোগী এক নিকট আত্মীয় অবিনাশ চন্দ্র ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। ১৯০৬ সনে চোংড়ি পোতা রেলস্টেশনে (বর্তমান নাম সুভাষ গ্রাম) ভারতের সর্বপ্রথম স্বদেশী রাজনৈতিক ডাকাতি সংঘটিত করেন ১৭ বছর বয়সের কিশোর বিপ্লবী নরেন ভট্টাচার্য, ঘরেবাইরে উপন্যাসে অমূল্যের চরিত্রের চিত্র এঁকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নরেন ভট্টাচার্য বা এম.এন. রায়কে তুলে ধরেছেন তার বাংলা সাহিত্যের অমর উপন্যাসে। যারা ঘরেবাইরে উপন্যাস পড়েছেন তারা জানেন, বিমলা ৩০ হাজার টাকার হীরের গহনা অমূল্যকে দেয় বিক্রী করে ৬ হাজার টাকা পাবার জন্য। কিন্তু কিশোর বিপ্লবী অমূল্য বিমলার দেওয়া ৩০ হাজার টাকার হীরের গহনা বিক্রি না করে জমিদারীর কাচারী থেকে ডাকাতি করে ছয় হাজার টাকা এনে বিমলাকে দেয় তার হীরের গহনাসহ। ঘরেবাইরে উপন্যাসে কিশোর বিপ্লবী অমূল্যর কথা স্মরণ করে জমিদার নিখিলেশের স্ত্রী বিমলার মনে হয়েছে, "কিন্তু অমূল্যের সেই আত্মোৎসর্গের দীপ্তিতে সুন্দর বালকের মুখখানিকে কিছুতে ভুলতে পারছি না। সে তো চুপ করে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করেনি, সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি, সে আমার বালক দেবতা, সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেছে, সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমায় বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে, বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম। ভাই আমার তোমাকে প্রণাম। নির্মল তুমি, সুন্দর তুমি বীর তুমি, তোমাকে প্রণাম। জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে, আমার হয়ে আমার কোলে এসো, এই বর আমি কামনা করি।' কিশোর বিপ্লবী নরেন ভট্টাচার্য যিনি পরে এম.এন. রায় নামে পৃথিবী বিখ্যাত তার কথাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অমূল্য নামে ঘরে বাইরে উপন্যাসে এভাবে তুলে ধরেছেন।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যের অপর মানবতাবাদী কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার কালজয়ী বাংলাদেশ ও বৃটিশরাজ কাঁপানো উপন্যাস ‘পথের দাবী’ বইতে সব্যসাচী চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এম.এন. রায়কে। ১৯২৬ সনে পথের দাবী উপন্যাস প্রকাশ পায়। তার আগে ১৯২৪ সনের ২১শে মে কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় ১নং আসামী হিসেবে তার ১২ বছর জেল হয়। ঐ মামলায় যারা আসামী ছিলেন তারা হলেন–

১। মানবেন্দ্রনাথ রায়

২। মওলা বখশ ওরফে শওকত ওসমানী

৩। মুজাফফর আহমদ

৪। গুলাম হোসেন

৫। নলিনী দাশগুপ্ত

৬। রামচরণ লাল শর্মা

৭। শ্রীপাট অমৃত ডাঙ্গে

৮। মায়লাপুরম সিঙ্গার ভেলু চেট্টিয়ার।

পরে এদের মধ্য হতে গুলাম হোসেন, রামচরণ শর্মা, মায়লাপুরম সিঙ্গার ভেলু চেট্টিয়ারের নাম প্রত্যাহার করা হয়। আসামীদের মধ্যে সবাই গ্রেপ্তার হয়েছিল একমাত্র ১নং আসামী এম.এন. রায় ছাড়া। তিনি ১৯২৭ সন পর্যন্ত মস্কো, পরে ১৯৩০ সন পর্যন্ত জার্মানীতে ছিলেন।

এ মামলায় অভিযোগ ছিল মামলার অভিযুক্ত ব্যক্তিরা মস্কোয় অবস্থানরত এম.এন. রায়ের সাথে যোগাযোগ করে ভারতে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সংগঠন করে ভারত সরকারকে উৎখাত করে কম্যুনিস্ট শাসন কায়েম করার জন্য কাজ করছিলো।

[তথ্যসূত্র : আমার জীবন ও ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টি, লেখক : কমরেড মোজাফফর আহমেদ]

ইন্ডিয়ান পেলান কোডের ১২১/এ ধারায় মামলা করা হয়। সম্ভবত ১৯০ বছরের বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষে এই একটি মামলাই মাত্র ১২১/এ ধারায় করা হয়েছে। বৃটিশ সরকার-এর পুলিশের খাতায় পলাতক হিসেবে কিশোর বয়স থেকেই নরেন ভট্টাচার্য বা এম.এন. রায়ের নাম ছিল। ১৯২১ সনে ১২১-এ ধারায় রাষ্ট্রবিরোধী মামলা দায়ের ও ১৯২৪ সনে মামলার রায়ে ১২ বছর জেল হবার পর বৃটিশ সরকার তাকে হন্য হয়ে পাগলের মত খুঁজে বেড়ায়, আর সে পটভূমির চরিত্র পথের দাবী উপন্যাসের সব্যসাচী ও গিরিশচন্দ্র। এখানে ১৯২৬ সনে প্রকাশিত পথের দাবী উপন্যাসের ৬ পরিচ্ছদের কিছু সংলাপ তুলে ধরা হলো–

পরদিন সকালে কি ভাবিয়া যে অপূর্ব পুলিশ থানার দিকে পা বাড়াইয়া দিল তাহা বলা শক্ত। চুরির ব্যাপার পুলিশের গোচর করিয়া যে কোন ফল নাই তাহা সে জানিত। টাকা আদায় হইবে না, সম্ভবতঃ চোর ধরা পড়িবে না, –এ বিশ্বাসটুকু পুলিশের উপরে তাহার ছিল। কিন্তু ওই ক্রীশ্চান স্পে-চ্ছ মেয়েটার প্রতি তাহার ক্রোধ ও বিদ্বেষের আর সীমা

www.pathagar.com

ছিল না। ভারতী নিজে চুরি করিয়াছে, কিংবা চুরি করিতে সাহায্য করিয়াছে এ বিষয়ে তেওয়ারীর মত নিঃসংশয় হইতে সে এখনও পারে নাই, কিন্তু তাহার শঠতা ও ছলনা তাহাকে একেবারে ক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিল। জোসেফ সাহেবকে আর যে-কোন দোষই দেওয়া যাক, আপনাকে সুস্পষ্ট করিবার পক্ষে শুরু হইতে কোন ক্রটি তাঁহার ঘটিয়াছে এ অপবাদ দেওয়া চলে না। তাঁহার শয়তানী নিরতিশয় ব্যক্ত, তাঁহার চাবুকের আস্ফালন দ্বিধাহীন, জড়িমাবর্জিত, প্রতিবেশীর প্রতি তাঁহার মনোভাবে কোথাও কোন হেঁয়ালি নাই, তাঁহার কণ্ঠ নিঃসংকোচ, বক্তব্য সরল ও প্রাঞ্জল, তাহার মদমত্ত পদক্ষেপ অনুভব করিতে কানখাড়া করিয়া রাখিতে হয় না—এক কথায়, তাঁহাকে বুঝা যায়। কিন্তু, এই মেয়েটির কথা ও কাজের যেন কোন উদ্দেশ খুঁজিয়া মিলে না। ক্ষতি সে যত করিয়াছে সেজন্যও তত নয়, কিন্তু গোড়া হইতে তাহার বিচিত্র আচরণ যেন অনুক্ষণ কেবল অপূর্বর বুদ্ধিকেই উপহাস করিয়া আসিয়াছে। রাগের মাথায় থানায় ঢুকিয়া সে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী পুলিশের কাছে বিবৃত করিতে পারিত কিনা সন্দেহ, কিন্তু ততদূর গড়াইল না। পিছন হইতে ডাক শুনিল, "এ কি অপূর্ব নাকি। এখানে যে!"

অপূর্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোশাকে দাঁড়াইয়া তাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাঙলাদেশের একজন বড় পুলিশ-কর্মচারী। অপূর্বর পিতা ইহার চাকরি করিয়া দেন, তিনিই ছিলেন ইহার মুরব্বি। স্বদেশীযুগে অপূর্ব যে ধরা পড়িয়া শাস্তি ভোগ করে নাই, সে অনেকটা ইহারই প্রসাদে। পথের মধ্যেই অপূর্ব তাহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরির সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু আপনি যে এদেশে?"

নিমাইবাবু আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘরদোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েছে, আর আমাকে হতে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত অফিসে যাবার এখন ঢের দেরি আছে। চল না বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব প্রশ্ন করিল, "আপনি এখন কোথায় যাবেন?"

"জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।"

"চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?"

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে। যে মহাপুরুষকে সংবর্ধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এতদূর আসতে হয়েছে, তাঁর মর্জির উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানে পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবচি।

অপূর্ব মহাপুরুষের ইঙ্গিত বুঝিল। কৌতূহলী হইয়া কহিল, "মহাপুরুষটি কে কাকাবাবু? যখন আপনি এসেছেন, তখন বাঙালী সন্দেহ নাই, খুনী আসামী, না?"

নিমাইবাবু কহিলেন, "ঐটি বলতে পারব না বাবা। তিনি যে কি, এবং কি নয়—এ কথা ঠিক কেউ জানে না। এঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোন চার্জও নেই, অথচ যে চার্জ আছে তা

www.pathagar.com

আমাদের পিনাল কোডের কোহিনুর। এঁকে চোখে চোখে রাখতে এতবড় গভর্নমেন্ট যেন হিমশিম খেয়ে গেল। অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?"

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদের একসময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু!"

"হ্যাঁ শত্রু বলবার লোক বটে! বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবলপ্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ-ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক-পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না, – সম্প্রতি অনুমান এই যে, চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বর্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যান্ডেলে থেকে নদীপথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন, কিংবা, রেলপথে ট্রেনে সওয়ার হয়ে শুভাগমন করছেন, সঠিক সংবাদ নেই, – তবে তিনি যে রওনা হয়েছেন সে কথা ঠিক। তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে কোন সন্দেহ, কোন তর্ক নেই, শত্রুমিত্র সকলের মনেই তার স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে আছে, এবং নশ্বর দেহটি তাঁর পঞ্চভূতের জিম্মায় না দিতে পারা পর্যন্ত এ জন্মে যে এর আর পরিবর্তন নেই তাও সকলে জানি, শুধু এদেশে এসে কোন পথে যে তিনি পা বাড়াবেন সেইটি কেবল আমরা জানিনে। কিন্তু দেখো বাবা, এ-সব কথা যেন কোথাও প্রকাশ করো না। তা হলে এই বৃদ্ধ বয়সে সাতাশ বছরের পেন্সনটি তো মারা যাবেই, হয়ত বা কিছু উপরি পাওনাও ভাগ্যে জুটতে পারে।

অপূর্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি? সব্যসাচী নাম ত কখনো শুনেছি মনে হচ্ছে না।

নিমাইবাবু সহাস্যে কহিলেন, "ওরে বাবা, এই-সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই হয়ত এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারছো না। আর, কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক ওয়াকিবহাল নই। রাজশত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনায় একদফা তিন মাস, এবং সিঙ্গাপুরে আর একদফা তিন বছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ-বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে, বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাস করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারী পাস করেছে, বিলেতে আইন পাস করেছে, আমেরিকায় ডাক্তারি পাস করেছে জানিনে তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে, –এ সব বোধকরি এর তাস-পাশা খেলার সামিল, রিক্রিয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্বাঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও, ঐ যে বললুম পঞ্চভূম ছাড়া আর আমাদের শান্তি-স্বস্তি নেই! এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম-কর্ম, না আছে কোন ঘরদোর, –বাপ রে

www.pathagar.com

বাপ! আমরাও ত এদেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব সহসা কহিতে পারিল না, –শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, "এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?" নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আগে ত পাই।" অপূর্ব কহিল, "ধরুন পেলেন।" "না বাবা, অত সহজ বস্তু নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস সে শেষমুহূর্তে আর কোন পথ দিয়ে আর কোথাও সরে গেছে।" "আর যদি তিনি এসেই পড়েন তা হলে?"

নিমাইবাবু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন, "তাঁকে চোখে চোখে রাখবারই হুকম আছে। দু'দিন দেখি। ধরার চেয়ে ওয়াচ্ করার মূল্য বেশি, –এই ত সম্প্রতি গভর্নমেন্টের ধারণা। কথাটা অপূর্ব ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ তিনিই যাই হোন তবুও পুলিশ। তথাপি, তাহার মুখ দিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িল। কহিল, এঁর বয়স কত? নিমাইবাবু কহিলেন, "বেশি নয়। বোধহয় ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে।' "কি রকম দেখতে?" "এইটিই ভারী আশ্চর্য বাবা। এতবড় একটা ভয়ঙ্কর লোকের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নেই, নিতান্তই সাধারণ মানুষ। তাই চেনাও শক্ত, ধরাও শক্ত। আমাদের রিপোর্টের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে উল্লেখ করা আছে।"

অপূর্ব কহিল, "কিন্তু ধরা পড়ার ভয়েই ত এঁর হাঁটা-পথে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে আসা?" নিমাইবাবু বলিলেন, "নাও হতে পারে। হয়ত কি একটা মতলব আছে, হয়ত পথটা একবার চিনে রাখতে চায়–কিছুই বলা যায় না অপূর্ব। এরা যে পথের পথিক, তাতে সহজ মানুষের সোজা হিসেবের সঙ্গে এদের হিসেব মেলে না,–আজ এরই ভুল কি আমাদেরই ভুল তার একটা পরীক্ষা হবে। এমনও হতে পারে সমস্ত ছুটোছুটিই আমাদের বৃথা।" অপূর্ব এবার হাসিয়া কহিল, "তাই যেন হয়, আমি ভগবানের কাছে সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি কাকাবাবু!"

নিমাইবাবু নিজেও হাসিলেন, বলিলেন, "বোকা ছেলে, পুলিশের কাছে এ কথা কি বলতে আছে? তোমার বাসার নম্বরটা কত বললে? তিরিশ? কাল সকালে পারি ত একবার গিয়ে দেখে আসবো। এই সামনের জেটিতেই বোধহয় এদের স্টিমার লাগে–, আচ্ছা, তোমার আবার অফিসের সময় হয়ে এল, –নতুন চাকরি, দেরি হওয়া ভাল নয়।" এই বলিয়া তিনি পাশ কাটাইয়া একটু দ্রুতপদে চলিবার উপক্রম করিতেই অপূর্ব কহিল, "শুধু দেরি কেন, আজ অফিস কামাই হয়ে গেলেও আপনাকে ছাড়চি না। আমি চাইনে যে তিনি এসে আপনার হাতে পড়েন, কিন্তু সে দুর্ঘটনা যদি ঘটেই তবুও ত একবার চোখে দেখতে পাবো। চলুন।"

ইচ্ছা না থাকিলেও নিমাইবাবু বিশেষ আপত্তি করিলেন না, শুধু একটু সতর্ক করিয়া দিয়া কহিলেন, "দেখবার লোভ যে হয় তা অস্বীকার করিনে, কিন্তু এ-সকল লোকের সঙ্গে কোনরকম আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছে করাও বিপজ্জনক তা তোমাকে বলে রাখি অপূর্ব।

www.pathagar.com

এখন আর তুমি ছেলেমানুষ নও, বাঁচাও বেঁচে নেই,–ভবিষ্যৎ ভেবে কাজ করার দায়িত্ব এখন একা তোমারই।" অপূর্ব হাসিয়া কহিল, "আলাপ-পরিচয়ের সুযোগই কি আপনারা কাউকে কখনো দেন কাকাবাবু? দোষ করেন নি, কোন অভিযোগও নেই, তবু ত তাঁকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টায় এতদূরে ছুটে এসেছেন।" ইহার উত্তরে নিমাইবাবু শুধু একটু মুচকিয়া হাসিলেন। তাহার অর্থ অতীব গভীর। মুখে কহিলেন, "কর্তব্য।"

কর্তব্য! এই ছোট্ট একটি কথার আড়ালে পৃথিবীর কত ভাল, এবং কত মন্দই না সঞ্চিত হইয়া আছে। এই কথা মনে করিয়া অপূর্ব আর কোন প্রশ্ন করিল না। উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন যেইমাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড স্টিমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ-সাতজন পুলিশ-কর্মচারী সাদা পোশাকে পূর্ব হইতেই দাঁড়াইয়া ছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের একপ্রকার চোখের ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়, – ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায়। বিদ্রোহী-শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে-চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইতেই অকস্মাৎ একমুহূর্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন এক অদৃষ্টপূর্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া পড়িয়া তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিং ধরিয়া তাহাই উদগ্রীব হইয়া দেখিতেছে,–ডেকের উপরে ব্যগ্রতা, কলরব ও ছুটাছুটির অবধি নাই,–হয়ত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুকচক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাঁপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে, স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল সুখ, সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হ্যাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ জেটির পায়ে আসিয়া ভিড়িল, কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু'ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াইয়া একান্ত মনে বলিতে লাগিল, "মুহূর্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না তাহাদের জন্য তুমি স্বর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল, এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমি তো আমাদের মত সোজা মানুষ নও–, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাই ত দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়; তাই ত দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়; কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য ত প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার ত শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত

www.pathagar.com

হইয়াছিল,-সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে ত কেবল তোমারই জন্য! দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই ত ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তিপথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শতকোটি নমস্কার!" এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের চোখের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,-নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সেদিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবু কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, "যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

কি করে পালালো?"

নিমাইবাবু কহিলেন, "তাই যদি জানবো ত সে কি পালায়? শ'তিনেক যাত্রী, বিশ-পঁচিশটা সাহেব ফিরিঙ্গী, উড়ে মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী তাও শ'দেড়েক হবে, বাকী বর্মা-সে যে কার পোশাক আর কার ভাষা বলতে বলতে বেরিয়ে গেল তা দেবা না জানন্তি-বুঝলে না বাবাজী-আমরা ত পুলিশ, চেনবার জো নেই তিনি বিলতের কি বাঙলার! কেবল জগদীশবাবু সন্দেহ করে জন-ছয়েক বাঙালী থানায় টেনে নিয়ে গেছেন, একটা লোকের সঙ্গে চেহারার মিলও আছে মনে হয়, কিন্তু ওই মনে হওয়া পর্যন্ত,-সে নয়। যাবে না কি বাবা, একবার লোকটাকে চোখে দেখবে?"

অপূর্বর বুকের মধ্যে ধড়াস করিয়া উঠিল, কহিল, "তাদের যদি মারধর করেন ত আমি যেতে চাইনে।" নিমাইবাবু একটু হাসিয়া কহিলেন, "এতগুলো লোককে নিঃশব্দে ছেড়ে দিলাম আর এ বেচারারা বাঙালী বলেই শুধু বাঙালী হয়ে এদের প্রতি অত্যাচার করব? ওরে বাবা, বাইরে থেকে তোরা পুলিশকে যত মন্দ মনে করিস, সবাই তা নয়। ভাল-মন্দ সকলের মধ্যেই আছে, কিন্তু মুখ বুজে যত দুঃখ আমাদের পোহাতে হয় তা যদি জানতে ত তোমার এই দারোগা কাকাবাবুটিকে অত ঘৃণা করতে পারবে না অপূর্ব!"

পথের দাবী উপন্যাসে ১৫ পরিচ্ছেদে আর এক জায়গায় এম.এন. রায়কে সব্যসাচীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন এই ভাবে-

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, "বাঙালী ভিন্ন আর জাতের মধ্যে আপনারা কাজ করেন না?"

ভারতী বলিল, 'করি। সকলকেই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ছাড়া আর তো কেউ সকলের ভাষা জানে না, তিনি সুস্থ থাকলে এ কাজ তাঁরই, আমার নয়,

তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষা জানেন।'

আর ডাক্তার বাবু?

ভারতী হাসিয়া বলিল, "ডাক্তারবাবুর সম্বন্ধে আপনার ভারী কৌতূহল। একথা আপনি

www.pathagar.com

বিশ্বাস করতে পারেন না কেন যে, এ পৃথিবীতে যা কিছু জানা যায় তিনি জানেন, যা কিছু পারা যায় তিনি পারেন। কে তাঁর সব্যসাচী নাম রেখেছিল আমরা কেউ জানিনে, কিন্তু তার অসাধ্য তাঁর অজ্ঞাত এ জগৎ সংসারে কিছু নেই।"

এছাড়াও পথের দাবী উপন্যাসে আরও অনেক হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা রয়েছে সব্যসাচী ও ড. গিরিশ মহাপাত্রের, যার মাধ্যমে এম.এন. রায়কে তুলে ধরেছেন বাংলা সাহিত্যের অমর কথাশিল্পী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অবশ্য এম.এন. রায় শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসটির খুব উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, পথের দাবী উপন্যাসের প্রশংসা করে কিছু লিখেছেন বলে আমার চোখে পড়ে নাই। এম.এন. রায় সাহেব জেল থেকে তার হবু স্ত্রী এলেন রায়কে ১৯৩৩ সনে চিঠি লিখে গৃহদাহ উপন্যাসটি ইংরেজীতে অনুবাদ করতে বলেছেন। এম.এন. রায় এলেন রায়কে চিঠিতে লিখেছেন গৃহদাহ ইংরেজীতে অনুবাদ হলে এ বই নোবেল প্রাইজ পাবে, গৃহদাহর চেয়ে নীচু মানের বই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে।

২৯.১১.২০০৯

www.pathagar.com

রমনাকালী মন্দির ও মা আনন্দময়ী

"১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা" ২য় মুদ্রণ ছেপে বইটি বের হওয়ার কথা ২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ। লেখা কম্পোজ প্রুফ সব দেখা শেষ হয়, ২য় মুদ্রণ ছাপতে মোট খরচ হবে প্রায় দুই লাখ টাকা। এর মধ্যে এক লাখ ৫০ হাজার টাকা আমার কাছে ছিল, ৫০ হাজার টাকার ঘাটতি, এই ৫০ হাজার টাকা আমি সহজে সংগ্রহ করে বই ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই বের করতে পারতাম, কিন্তু আমি একটু ঢিলে দেই, টাকা যেখান থেকে আসবার কথা সেখান থেকেই আসুক, সেই টাকা দিয়েই ২য় মুদ্রণ ছাপি। এভাবে ডিসেম্বর ২০০৯ চলে যায়। শুরু হয় নতুন বছর জানুয়ারি ২০১০, জানুয়ারি ২৩, ২৪ ও ৩০ তারিখে তিনটি নতুন লেখা লিখি। আজ ৩১, ১,২০১০ তারিখ ভোর রাতে রমনাকালী মন্দিরের আনন্দময়ী মায়ের উপরের লেখা পড়ে আমি ভীষণ আবেগতারিত হয়ে পড়ি, এই ভেবে যে, আমার লেখা '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইতে কত মানুষের নাম যশ, কীর্তি নিয়ে লিখেছি, অথচ আমার বইতে আমি যার ঘরের মানুষ বা আমার ঘরের কাছের মাকে নিয়ে কোন লেখা থাকবে না তা হবে না, এটা অন্যায়। রমনাকালী মন্দিরের আনন্দময়ী মাকে নিয়ে অবশ্যই লেখা থাকতে হবে। আমি যে রমনাকালী মন্দির ও মা আনন্দয়ীর আশ্রমের অতি আপন একজন, আর এ সূত্র ধরেই এই লেখা।

১৬১০ সনে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে যখন সুবেদার ইসলাম খা বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী বর্ধমান জেলা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন, তখন তাদের বা মুঘল সেনাবাহি-নীর সদস্যের প্রার্থনার জন্য রমনা ময়দানে প্রতিষ্ঠা করেন তিন ধর্মশালা। মুসলিম সৈনিকদের জন্য একটি মসজিদ, হিন্দু সৈনিকদের জন্য একটি কালীমন্দির ও শিখ সৈন্যদের একটি গুরুদুয়ারা, যা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন চত্বরে। ১৭১০ সনে নবাব মুর্শিদকুলী খান ঢাকা থেকে মুঘল রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। এখানে উল্লেখ্য যে নীলক্ষেত এলকার যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে স্থাপনা তা এসেছে ১৯৬০ সনের দিকে। তার আগে জগন্নাথ হল, সলিমুল্লাহ হল, কার্জন হল ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ এই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে কলা, বাণিজ্য ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, টিএসসি, সূর্যসেন হল, মহসীন হল, রেজিস্ট্রার বিল্ডিং এলাকা ১৯৬০ সনের আগে জঙ্গল ছিল। ১৯১১ সন থেকে ঢাকা ক্লাব, রমনা পার্ক ও রমনা ময়দানে ঘোড় দৌড় ও গলফ খেলা চালু করে। ১৯৪২ সনে বেঙ্গল সরকার ঢাকা ক্লাবের কাছথেকে রমনা পার্ক পরিচালনার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে নেন। ১৯৭২ সন পর্যন্ত রমনা রেসর্কোস ময়দান সম্পূর্ণ ঢাকা ক্লাবের নিয়ন্ত্রণে ছিল। এখন গণপূর্ত দপ্তর ও ঢাকা ক্লাব দুজনের নিয়ন্ত্রনে চলছে। দেশের একমাত্র পুরাতন গলফ খেলার কোর্সে ১৯৮৬, ১৯৮৭, ১৯৮৮ আমি সনে গলফ খেলেছি, আবার ২০০২-২০০৫ সনে চার বছর গলফ খেলেছি। এখন আবার ২০০৯ সন থেকে নিয়মিত প্রতিদিন সকাল থেকে বেলা ১১ টা পর্যন্ত গলফ

www.pathagar.com

খেলি। গলফ খেলার কারণ হচ্ছে প্রথমত, পৃথিবীর সেরা বা ক্ষমতাবান লোকেরা গলফ খেলে, দ্বিতীয়ত এটা খুব আনন্দদায়ক ও উন্নতমানের খেলা, তৃতীয় এটি প্রচণ্ড নেশার খেলা, ৪র্থ বয়স্কলোকদের একমাত্র খেলা যা খোলা মাঠে খেলা যায়। এছাড়াও আমি যে বিশেষ কারণে গলফ খেলি তা হচ্ছে সময় কাটানো, এই গলফ খেলার মাধ্যমে আমার ভোর থেকে বেলা ১১-১২টা পর্যন্ত সময় নিরবে চলে যায়। আমি যে চিন্তাভাবনা ও চেতনার মানুষ সে চেতনা ও জীবন দর্শন নিয়ে আজ বাংলাদেশে বসবাস করা খুবই কষ্টসাধ্য। সমগ্র জাতি আজ দুই নেত্রীর প্রশংসা, পূজা ও নিন্দা করা নিয়ে ব্যস্ত। সত্য ও সত্যকথার দাম আজ বাংলাদেশে খুব কম, মিথ্যা ও মিথ্যাস্তুতি না করে কোন জায়গায় বসা যায় না, কোন জায়গায় বসলে আমাকে অনেক নিগ্রহ শুনতে হয় সত্য কথা বলার জন্য ও মিথ্যা কথার প্রতিবাদের জন্য। শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চাকর-বাকর ও বন্ধুবান্ধব না হলে যে কোন মানুষের কাছ থেকে আজ যে কোন মানুষ অপমানিত হয়। যার জন্য খুব কম জায়গায় যাতায়ত করা হয়। দ্বিতীয়ত বিকাল বা সন্ধ্যায় ঘরের বাইরে যাতায়ত করতে হলে কমপক্ষে দেড় দুইশত টাকা খরচ হবে রিকসা ভাড়া ও চা নাস্তা খাবারের জন্য।

উপরে উল্লেখিত কারণে আমি বিকালে কোন জায়গায় না গিয়ে ঘরের মধ্যেই থাকি। সাধারণত সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি রাত দুইটায় ঘুম থেকে উঠি, ২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত ৩ ঘণ্টা বই পুস্তক পড়ি এবং যদি কিছু লেখার তাড়না আসে তা লিখি। ৫টার পরে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যালের পাশে আমার ফ্লাটের সামনে মসজিদে ফজরের নামাজ পরে রমনা ময়দানে উপস্থিত হই। এর মধ্যে কয়েক বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ দুবছর ইংরেজী বিভাগে অনার্স পড়ার সময় আমার ক্লাসমেট ১৯৮১ সনের বিসিএস ইনকাম ট্যাক্স ক্যাডারের অফিসার বর্তমানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সদস্যা প্রতিভাবান ছাত্রী আলেম নারী মিসেস পারশা বেগম রমনা পার্কে মর্নিং ওয়াক করার সময় বলেন বা বুদ্ধি দেন 'বাবলু ভাই হাঁটার সময় তজবিহসহ আল্লাহকে যদি ডাকতে ডাকতে হাঁটেন তবে দেখবেন হাঁটতে অনেক সুবিধা হবে'। আমি ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবতী জ্ঞানী নারী পারশার কথা মতো পারশার দেওয়া তজবিহ হাতে মসজিদ থেকে ফজরের নামায পড়ে ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাহমানু, ইয়া রহিমু জপ করতে করতে রমনা পার্কে ময়দানে উপস্থিত হই। এতে আসলেই হাঁটার সময় খুব কম বেগ বা কষ্ট পাই। এর জন্য প্রায়ই মনে মনে পারশাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

রমনা কালিমন্দিরের মা আনন্দময়ীকে নিয়ে লিখবার বসে এ পর্যন্ত যা লিখলাম তা বর্তমানে বা গত পাঁচ-ছয় বছরের কথা। আমি ১৯৭২ সন থেকে ঢাকা কলেজ সাউথ হোস্টেলের ছাত্র। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলের আবাসিক ছাত্র, ১৯৮৩ সন হতে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত ১০০ নং সেন্ট্রাল রোডে, ১৯৮৬ সন থেকে ১৯৯৫ সন পর্যন্ত ৬১ নম্বর নর্থ সার্কুলার রোডে, ১৯৯৫ সন থেকে ২০০৫ সন পর্যন্ত ৩৮৩/২ ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে ভাড়া বাসায় থাকি। বর্তমানে ১৩৫ এলিফ্যান্ট রোড প্রিন্স

www.pathagar.com

টাওয়ারে, উপরে বর্ণিত সব বাসা হাতিরপুল বাজার এলাকায়। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, হাতিরপুল বাজার এলাকা, রমনা ময়দান ও রমনা পার্কের কাছে ১০-১৫ মিনিট সময় লাগে পায়ে হাঁটার পথে। ১৯৭২ সন থেকে দুই-চারদিন ব্যতিক্রম ছাড়া নিয়মিত সকালে মর্নিং ওয়াক করে আসছি। যার জন্য প্রচুর লোকের সাথে আমার পরিচয় হয়েছে, জীবনযুদ্ধে চলার পথে যা কিছুটা সহায় হয়েছে।

এই মর্নিং ওয়াকে ও গলফ খেলায় প্রতিদিন এসে রমনা ময়দানের রমনা কালীবাড়ির সাথে আমার একটি নিবীড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছে সেই ১৯৭২ সন থেকে। রমনা ময়দানে প্রচুর সংখ্যক অমুসলিম বা হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক মর্নিং ওয়াক করে থাকেন, আর এরা সবাই উচ্চশিক্ষিত সরকারি আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, এ্যাডভোকেট, বিচারপতি। এরা রমনা ময়দানে হাঁটার সময় সেই ১৯৭২ সন থেকে রমনা কালীমন্দিরের কথা, রমনা কালিমন্দির ভাঙার কথা, রমনা কালীমন্দির পুননির্মাণের কথা বলতেন। একজন সামান্য সভ্য মানুষ হিসেবে আমি তাঁদের বক্তব্যের সাথে একমত পোষণ করে এসেছি, রমনা কালীমন্দির পুনর্মিাণের পক্ষে জোরালো বক্তব্য দিয়ে জনমত সৃষ্টিতে অবদান রেখেছি। ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ বর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী রমনা কালিমন্দির ট্যাংক দিয়ে গুলি করে ভেঙে দেয় এবং মন্দিরের শতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করে। এই মন্দির পুনর্মিাণের জন্য আমি সবসময় একজন সোচ্চার ছিলাম।

২০০৯ সনের দূর্গাপূজার সময়ে বর্তমান রমনা কালীমন্দিরের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এর আগে ২০০১ সনের আওয়ামিলীগ সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ২০০১ সনের ২৭ মার্চ আওয়ামিলীগ নেতা ড. এস. এ মালেক রমনা ময়দানের খালি জায়গায় প্রথম দূর্গা প্রতীমা স্থাপন করেন এবং পাঁচ-ছয়টি টিনের বেড়াবিহীন ছাপড়া ঘর নির্মাণ কাজে সাহায্য করেন। এর আগে আজ যেখানে মন্দির এখানে গাছে ভর্তি জঙ্গলময় জায়গা ছিল। ১৬১০ সনে মোঘল শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালিমন্দির ১৯৭১ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী গুলি করে ভেঙে দেয়, ১৯৭৩ সনে ভাঙা ইট ও ভাঙা স্থাপনা পরিষ্কার করে খালি জায়গা বানানো হয়। ২০০১ সনের আগে অনেকবার হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদের সাথে জিয়াউর রহমান, এরশাদ, খালেদা জিয়ার পুলিশের সাথে বাংলা একাডেমীর সামনে সংঘর্ষ হয়েছে মন্দির নির্মাণ নিয়ে, তাও চোখ দিয়ে দেখেছি। আজ যে রমনা কালিমন্দির ও মা আনন্দময়ীর আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারজন্য সবচেয়ে বেশি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা পাবেন ডা. এস এ মালেক ও তাঁকে এনে যেসব হিন্দু সম্প্রদায়ের তরুণ ছাত্র-যুবকরা ভুমিকা পালন করেছেন ২০০১ সনের ২৭ মার্চ তারা। ২০০২ সন থেকে ২০১০ সন এই ৮ বছরে এখানে অনেককিছু ঘটেছে। এই মন্দির নির্মাণে অনেকেই অনেক ভুমিকা রেখেছে, তবে খালেদা জিয়া বা বিএনপি'র পাঁচ বছরে এখানে উন্নয়নের কাজ হয়েছে খুবই কম। তবে এদের সময়ে বেশ ধুমধামের সাথে দূর্গাপূজা হয়েছে। বিএনপি'র সমর্থক হিন্দুকর্মীদের দ্বারা দখলে ছিল রমনা কালিমন্দির ২০০২ সন থেকে ২০০৭ সন পর্যন্ত। ২০০২ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিএনপি

www.pathagar.com

সমর্থক হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা আমিরাবাদ সল্ট ফ্যাক্টরির মালিক প্রয়াত রনবীর সাহা এই সময় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছেন, বেশ বড় মনের উদার এবং কাজপাগল অসাধারণ ভালো মানুষ ছিলেন রনবির সাহা। নারায়ণ চক্রবর্তী নামক একজন মা দূর্গা ও কালীভক্ত, ধার্মিক ব্যবসায়ী সর্বপ্রথম অনেক অর্থ ব্যয় করেন রমনা মন্দিরে প্রথম টাইলস লাগানোর কাজে, জলখাবারের মালিক নিতাই ঘোষ অনেক অবদান রেখেছে এই সময়ে। বর্তমান রমনা মন্দির স্থাপন হওয়ার পিছনে আমারও বেশ বড় একটা ভুমিকা রয়েছে। তা মা আনন্দময়ীকে নিয়ে লিখবার জন্য সুযোগ পেয়ে এখানে প্রকাশ করছি। ২০০১ সনে রমনা কালিমন্দিরে চার-পাঁচটি টিনের একটি চালা বা ছাপড়া ঘর নির্মাণের পরে সরকার ৫জন পুলিশ মোতায়েন করে যাতে এই চালাঘর কেউ ভাঙতে না পারে এবং এখানে কেউ কোনো ধরনের আর অতিরিক্ত কাজ করতে না পারে তা দেখবার জন্য। প্রবীণ গান্ধী চক্রবর্তী, অশিত দে, উজ্জ্বল ঠাকুর, সুভাষ, বিপুলসহ তিন-চারজন এই চালাঘরের পাশে বন-জঙ্গলের মধ্যেই থাকে। আমি প্রায় প্রতিদিনই গলফ খেলি ১০-১১টার দিকে এসে এদের সাথে বসে নির্জন শান্ত-স্নিগ্ধ মায়াময়-ছায়াময় পরিবেশে গল্প করি, হিন্দু বা সনাতন ধর্ম বিষয় নিয়ে এদের সাথে বেশ সম্পর্ক জমে যায় আমার। ওরা আমার বেশ ভক্ত হয়ে যায় আমিও ওদের ভালোবাসি। মন্দির করা নিয়ে ওরা আমার কাছে খুব দুঃখ প্রকাশ করে, পুলিশ পাহারায় থাকে, থাকার ঘর তুলতে দেয় না, টয়লেট করতে দেয় না, জঙ্গল কাটতে দেয় না, মশার অত্যাচারে জীবন অতিষ্ট ইত্যাদি। এসব শুনতে শুনতে আমার মন গলে যায়, একদিন আমি পুলিশদের প্রথম এক হাজার টাকা বখশিস দিয়ে অনুরোধ করি, ভাই আপনারা এখানে থাকেন ওরাও থাকে, একটি পায়খানা হলে সবার ভালো। ওরা পায়খানা দিবে, দয়া করে বাধা দিবেন না, এইভাবে প্রথম পায়খানা নির্মাণ করা হয়। তারপরে ধীরে ধীরে অন্য নির্মাণ কাজ শুরু হয়। বর্তমান রমনা কালিমন্দির নির্মাণের জন্য আমি ২০০২ সন থেকে ২০০৫ সন পর্যন্ত আমার নিজের দুঃখ-কষ্টের ১০ হাজার টাকা রমনা মন্দিরে ডিউটিতে আসা পুলিশ ভাইদের বখশিস দিয়েছি, যাতে তারা এখানে কাজ করতে বাধা না দেয়, রণবীর সাহা বলতেন, বাবলু সাহেবের দেবত্ব গুণ অনেক বেশি। কে কি বলবে জানি না, রমনা কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পিছনে আমার এক বিরাট অবদান রয়েছে, যদি আমি রমনা কালীমন্দিরের যে পুলিশরা ডিউটিতে এসেছে যাতে এখানে কিছু না হয় তার জন্য, আর আমি তাদের তুষ্ট করেছি তারা যেন এখানে নির্মাণ কাজে বাধা না দেন সেজন্যে, এবং এইসব পুলিশরাও বেশ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তারা যে এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা দেন নাই সেজন্য। এসব পুলিশদের সবাই মুসলমান, এদের নীরবতা মৌনসম্মতির জন্যই আজকে রমনা কালিমন্দির এ পর্যায়ে নির্বিঘ্নে নির্মিত হতে পেরেছে, আজ এখানে সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দুর্গাপূজা ও নামযজ্ঞে হাজার হাজার মানুষ এসে ভগবানকে ডাকে, হাজার হাজার মানুষ প্রসাদ বা খিচুরী খায় তা দেখে আমার প্রাণ ভরে যায়, কি জায়গা ছিল আজ কি হয়েছে। আজ এই মন্দিরে আমার নিজের প্রবেশ করতে ভয় হয়, নতুন আগত কর্মকর্তা ও লোকজনদের আস্ফালন ও আচরণ দেখে।

www.pathagar.com

এই রমনা কালিমন্দিরের নাম রমনা কালিমন্দির ও মা আনন্দময়ী আশ্রম। কে এই মা আনন্দময়ী তা আজ ৩১-০১-২০১০ রোববার ভোর রাতে পড়ে আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে যাই। আমার মনে হয় আমি পৃথিবীর সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের একজন যে মা আনন্দময়ী যে স্থানে ছিলেন সেই স্থানে ১৯৭২ সন থেকে পা রাখার সুযোগ পাচ্ছি। সেই জায়গায় প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করি। আমি মা আনন্দময়ীর ঘরের মানুষ, আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান কে আছে, আমার মতো একজন ক্ষুদ্র মানুষ মা আনন্দময়ী আশ্রম নির্মাণে ভুমিকা রাখতে পেরেছে এর চেয়ে আনন্দ আর কি আছে? 'বন্দে মাতরাম ভারত কাঁপানো গান ভারতের জাতীয় সঙ্গীতে যে বিন্দা হিমাচলের কথা উল্লেখ রয়েছে সেই বিন্দাহিমাচলে মা আনন্দময়ীর আশ্রম রয়েছে, বেনারশে, আগরপাড়ায় মা আনন্দময়ীর আশ্রম রয়েছে। আমি বিন্দা হিমাচলে ও বেনারশে মা আনন্দময়ীর আশ্রমে গিয়ে যদি বলি, আমি ঢাকার মা আনন্দময়ী আশ্রমে প্রায় প্রতিদিন যাতায়াত করি সেই ১৯৭২ সন থেকে, এই মন্দির ও আশ্রম পুনর্নির্মাণে আমি সাহায্য করেছি। তাহলে বিন্দা হিমাচল বেনারশের মা আনন্দময়ী আশ্রমের লোকেরা কতই না আমাকে আদর-সম্মান করবে। আমি তাদের অতি আপন একজন হয়ে যাব। কতবড় স্বাত্ত্বিক ছিলেন মা নির্মলা ভট্টাচার্য ওরফে মা আনন্দময়ী তা পড়ে আবেগে-বিহ্বল হয়ে যাই। ১৮৯৭ সনে ত্রিপুরা জেলার খেউড়া গ্রামে বিপীন বিহারী ভট্টাচার্যের ও মা মক্ষদা সুন্দরীর মেয়ে নির্মলা ভট্টাচার্যের জন্ম হয়, ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আটপাড়া গ্রামের বিখ্যাত ভরতদাজ বংশের সন্তান রমনী চক্রবর্তীর সাথে নির্মলা ভট্টাচার্যের বিয়ে হয়। ক্রমে ক্রমে মা নির্মলা সাধন-ভোজন করতে করতে চরম আধ্যাত্মিক জগতে পৌঁছে যান, ঢাকার শাহবাগে চলে আসেন সিদ্ধেশ্বরী কালিমন্দিরে পুজা করেন। ভক্তরা ধরেন মা একটি আশ্রম করেন, তিনি রমনা কালিমন্দির দেখিয়ে বলেন এই জঙ্গলে যে মন্দির ধ্বংস হয়ে পড়ে আছে এখানেই আশ্রম কর, জঙ্গলের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত কালিমন্দির নতুনভাবে প্রাণ পায় মা আনন্দময়ীর জন্য।

কবি বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'আমার যৌবন' বইয়ে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতি লেখাতে প্রতিভা বসুর জীবনের জলছবি বইতে রমনা কালীমন্দিরের মা আনন্দময়ীর কথা শ্রদ্ধার সাথে লিখেছেন।

কবি নজরুল ইসলাম তাঁর কাব্য সংগ্রহ সঞ্চিতা বই উৎসর্গ করেছেন মা আনন্দময়ীকে, আনন্দময়ী মাকে বন্দনা করে লেখা কবিতার জন্য তাঁর বিচারে দুই বছরের জেল হয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস কবি নজরুর ইসলামের আনন্দময়ী রমনা কালিমন্দিরের আনন্দময়ী মা, মা দুর্গাকে আনন্দময়ী হিসেবে নজরুল বন্দনা করে লেখেননি। যদিও কবি নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছিলেন ১৯২৫ সনে। ঢাকায় তিনি এসেছিলেন বর্তমানে বাংলা একাডেমী বর্ধমান হাউসে তাঁর বন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেনের বাসায় এক মাস ছিলেন। এখন আর আমার প্রতিভা বসুর লেখা বিশ্বাস হয় না যে কবি নজরুল ইসলাম ঢাকায় এসেছিলেন তাঁর বন্ধু ডিএল রায়ের ছেলে মন্টু বা দিলীপ রায়ের কথা মতো প্রতিভা বসুর কণ্ঠে গান শোনার জন্য। সত্যমিথ্যা জানি না, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কবি নজরুল ঢাকায় এসেছিলেন রমনা কালীমন্দিরের মা

www.pathagar.com

আনন্দময়ীকে দেখবার জন্য। রমনা কালিমন্দির ও বর্ধমান হাউস একেবারেই কাছে। ১৯৮০ সনের আগে দেয়াল বা একটি গাছও ছিল না, পাশাপাশি দুটি প্রতিষ্ঠান। অবশ্যই আনন্দময়ী মার সাথে কবি নজরুল ইসলামের দেখা হয়েছে। যদিও নজরুল ইসলাম মা আনন্দময়ীর আগমনী কবিতা লিখে জেলে যান ১৯২২ সনে। তিনি ঢাকায় এসে একমাস থাকেন ১৯২৫ সনে। আমার বিশ্বাস মা আনন্দময়ীর বিভিন্ন সাধন-ভোজন ও লিলাখেলার কথা পত্রিকায় পড়ে মুগ্ধ হয়ে তিনি মা আনন্দময়ীর বন্দনা করে কবিতা লিখেছেন। কবি নজরুলের মা আনন্দময়ী রমনা কালিমন্দিরের মা নির্মলা ভট্টাচার্য মা আনন্দময়ী, মা দুর্গা বা কালি নন। মা আনন্দময়ীর বিভিন্ন রোগের অলৌকিক চিকিৎসা করে রোগ সারাতেন। মানুষের সেবা-যত্ন করতেন। স্কুল কলেজে পড়েন নাই তবুও ইংরেজি ও সংস্কৃত ভাষা বুঝতেন ও বলতেন। রমনা কালিমন্দিরের দক্ষিণে যে মসজিদ ও মাজার রয়েছে মুসলিম ভক্তদের নিয়ে মাঝে-মধ্যে মাজারে গিয়ে নামাজ পড়তেন, নামাজ শেষে মুসলিম ভক্তদের বলতেন– 'তোরা তোদের বিপদের কথা ঈশ্বর বা আল্লাকে প্রাণ খুলে বল, তা থেকে যেন তোরা মুক্তি পাস। এভাবে নাকি অনেকেই তার সুফল পেয়েছে। আশ্রম বা মন্দিরে প্রসাদ এলে সে প্রসাদ ঐ মসজিদ-মাজারের নামাজিদের তিনি মাঝে-মধ্যেই দিতেন। একবার নাকি ধ্যান থেকে উঠে রাস্তায় এসে দাঁড়ান, একটি ঘোড়ার গাড়ি এলে তাকে থামতে বলেন, মা গাড়িতে ওঠেন, গাড়োয়ান জানতে চান কোথায় যাবেন, মা বলেন তোর বাড়িতে। মুসলমান গাড়োয়ান তাঁকে তার বাড়িতে নিয়ে যান। গিয়ে দেখেন গাড়োয়ানের বাবা অনেকদিন হলো গুরুতর রোগে শয্যাশায়ী, মা আনন্দময়ী তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করে অল্প সময়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন। এমনি বহু কথা মা আনন্দময়ী সম্পর্কে জানা যায়।আর এই মা আনন্দময়ী সম্পর্কে কোনো কথা না লিখে আমি আমার বই প্রকাশ করি তারচেয়ে লজ্জা আর কি হতে পারে? আমার বিশ্বাস এই মা আনন্দময়ী সম্পর্কে এই লেখা '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইয়ে স্থান পাওয়ার জন্যই দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০০৯ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার পরেও বের হয় নাই।

এবারে মা আনন্দময়ীর উচ্চ জ্ঞান ও উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক সাধনার কিছু কথা এখানে বর্ণনা করছি– একবার হরিতদারে এক ব্রাহ্মণ মা'র স্মরণাপন্ন হন, তিনি জীবনে বহু জপ-তপ-সাধন-ভোজন করেছেন, কিন্তু মোক্ষ্য লাভ হয়নি তাই তিনি প্রাণ ত্যাগ করতে চান। মা আনন্দময়ী তার কথা শুনে গম্ভীরভাবে বললেন যদি কোনো মানুষ কোনো পবিত্র জায়গায় সৎভাবে ও সৎসঙ্গে থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করে গিয়েও তার ফল না পায় তাহলে বুঝতে হবে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে একাগ্রতা বা পবিত্রতা নেই। মনে রাখতে হবে সৎ পরিবেশ, সৎসঙ্গের একটা প্রভাব আছে, তবে অবশ্যই পারদ্য কর্মের প্রতিফল ভোগ করতেই হবে। কলিযুগে সাধারণভাবে পাপ অনেক বেড়ে গেছে। পাপ তিন প্রকার- কায়িক, মানসিক ও বাচিক। কলিযুগে পাপের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া মানসিক ও বাচিক পাপকে পাপ বলে ধরাই হয় না, কেবলমাত্র কায়িক পাপ অর্থাৎ দৈহিক কর্মের মধ্যে দিয়ে যে পাপ করে তারই জন্য তাকে শাস্তি পেতে হয়। অবশেষে মা ব্রাহ্মণটিকে আশ্বাস দিয়ে

www.pathagar.com

বললেন আশা ছাড়লে চলবে না, সংকল্পে অটল থেকে সাধন করে যেতে হবে। সিদ্ধির দিকে তাকালে চলবে না। মা'র উপদেশবাণী শুনে ব্রাহ্মণটি প্রচুর আত্মশক্তি লাভ করেছিলেন। মাকে একদিন প্রশ্ন করা হয়, কেউ যদি নাস্তিক হয়ে এবং নাস্তিকতার মধ্যেও নীতিবোধ মেনে চলে তাহলে তার নীতি কি আস্তিক ভক্তের চেয়ে নীচু স্তরের? মা উত্তর দেন নৈতিক জীবন চিত্তশুদ্ধির জন্য। ভগবানে বিশ্বাস না করেও একটা কোনো কিছুর শক্তি বা আদর্শকে বিশ্বাস করে গেলে কাজ হয়। তবে নৈতিক জীবন ক্রমশ মানুষকে ভগবান বিশ্বাসের দিকেই নিয়ে যায়।

আর একদিন মাকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা খুব কঠিন। মা উত্তরে বলেন বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তাতে পরম সত্যের জিজ্ঞাসা জাগবে। দেব-দেবী ও ভগবানকে বাদ দিয়ে যে সত্য তা একদেশীয় আংশিক, সমগ্র দৃষ্টি নয়। পূর্ণ দৃষ্টি হলো বিজ্ঞানের দৃষ্টির সঙ্গে ঈশ্বর বিশ্বাসের দৃষ্টিকে যুক্ত করে দেখা।

১৯৬১ সনের ১ এপ্রিল মা যখন পুজার ঘরে ছিলেন তখন একদিন একজন জার্মান মহিলা ও একজন সুইস বালিকা মাকে দর্শন করতে আসে, মা'র কাছে তখন রাজপুতনার মহারানী বসে ছিলেন। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর জার্মান মহিলাটি মাকে প্রশ্ন করলো মনের কি কোনো সীমা আছে? যদি তা থাকে তবে কোথায় সে সীমা? বিদেশীনিদের কথাগুলো সাধারণত মাকে অনুবাদ করে শোনানো হতো, অনেকসময় অনুবাদ করার আগেই মা আনন্দময়ী তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে সঠিক উত্তর দিয়ে দিতেন। মা যখন ঢাকার শাহবাগে ছিলেন তখন একদিন এক ইটালীয় প্রফেসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাকে আশ্রমে দর্শন করতে এসেছিলেন তিনি এসে ইংরেজিতে একটি বিষয়ে প্রশ্ন করেন। কিন্তু মা তা অনুবাদ করে দেবার আগেই সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্নটির উত্তর দিয়েছিলেন। অথচ মা শৈশবে অতি অল্প লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেদিন জার্মান মহিলার প্রশ্নের উত্তরে মা বললেন– মনের সীমা হচ্ছে আত্মার সন্ধান। এই মন যখন আত্মার বাহিরে থাকে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, তাই মনকে ভিতরের দিকে ঘুরিয়ে আত্মার অনুসন্ধানকে নিযুক্ত করতে হয়, আত্মাকে জানতে পারলেই মনের কাজ যাবে শেষ হয়ে। এরপর জার্মান মহিলা মাকে প্রশ্ন করলেন কেমন করে ধ্যানে মনকে নিবিষ্ট করতে হয়? ধ্যান করার সময় মন কি কোনো বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে থাকবে না শূন্যে থাকবে? এ কথা শুনে রাজপুত্নার মহারানীর মুখখানি খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনিও এ প্রশ্নটি মাকে অনেকদিন থেকেই করবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু এতদিন করা হয়ে ওঠেনি। আর তার সেই প্রশ্নটি শুনে আরও বেশি খুশি হলেন। মা উত্তরে বললেন, দুভাবেই করা যায়, যারা কোনো দেব-দেবীর ভক্ত তারা কোনো না কোনো দেবতার মুর্তিকে কল্পনা করতে পারে ধ্যানের সময়। আবার মনকে শূন্য রেখেও কিংবা চুপচাপ থেকেও তা দেখা যেতে পারে, তবে এটা খুবই কঠিন কাজ। তাই এ অবস্থায় মানুষ অন্তর্নিহিত জ্যোতির ধ্যান করতে পারে। এই জ্যোতিতে অন্তরের মধ্যেই বাহিরের যে কোনো বস্তুকে দেখা যেতে পারে। একদিন একজন ভক্ত তার শরীর রক্ষা সম্বন্ধে মার কাছ থেকে কিছু উপদেশ চায়। মা তখন বলেন, শরীরটাকে কর্মক্ষণ রাখবার জন্য যা কিছু করা দরকার,

www.pathagar.com

অবশ্যই তা করবে, তবে মনকে নিবিষ্ট রাখবে একমাত্র ঈশ্বরের চিন্তায়। মনে রাখবে এই ক্ষণ ভঙ্গুর অহং বা আমিত্বকে সেই নিত্য মহান আমিত্বে অর্পণ করার মধ্যেই আছে প্রকৃত কল্যাণ। একেই বলে পরমার্থ, এই পরমার্থ চিন্তায় মনকে স্থির রাখবার জন্য সৎ কাজ সৎ গ্রন্থ পাঠ, সৎসঙ্গ করা একান্ত প্রয়োজন। মনে রেখো তুমিও যা আমিও তা, তিনি আছেন বলেই তো তুমি আমি সব আছি।

সিদ্ধেশ্বরী ও শাহবাগে মা যখন ছিলেন তখনই মা উর্মিলা ভট্টাচার্যের সাধন-ভোজনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হয়। রমনা কালিমন্দিরে তার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। তারপর তিনি বৃন্দাচল পর্বত, বেনারশ, আগরপাড়া ও বৃন্দাবনে থেকেছেন। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত মনে হয় রমনা মন্দিরেই তার প্রধান স্থান ছিল।

সব সাধকেরই গুরু থাকে। গুরু নির্দিষ্ট পথে সাধনা করেই সব সাধক সিদ্ধি লাভ করে থাকেন, কিন্তু মা নির্মলা ভট্টাচার্যের কখনোই গুরুকরণ হয়নি। তার আধ্যাত্ম সাধনার বিকাশ স্বতস্ফূর্ত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। এই সাধনার বিকাশের জন্য বাহিরের কোনো সাহায্যের দরকার হয়নি। ঈশ্বর ভক্তিই যেন তার অন্তরের একটি সহজাত বৃত্তি। মাকে দীক্ষা ও গুরুকরণ সম্বন্ধে একদিন প্রশ্ন করা হলে মা বলেন, শৈশবে বাবা-মা, সংসার জীবনে স্বামী এবং সকল অবস্থায় জগৎ পিতাই আমার গুরু।

লৌকিক জীবনে যেমন মা কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, মাতৃরূপে আদর্শ স্থাপন করেছেন আধ্যাত্ম জগতেও তেমনি সাধনার বিচিত্র পথ ও পদ্ধতিতে সিদ্ধি লাভ করে মা এক পরম বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের সবকিছুই বিস্ময়কর। সাধারণ কার্যকরণ নিয়মের সুতো দিয়ে তা বিশ্লেষণ করা যায় না। কেউ কেউ বলেন মা আনন্দময়ী সাক্ষাৎ ভগবতী অবতার। ভক্তির উচ্ছ্বাসজনিত অত্যুক্তি বলে এক ডাকে এ কথাকে উড়িয়ে দিতে পারা যায় না। দেবী ভগবতি অবতারের মধ্যেও ত্রিবিধ জীবনের বিকাশ। প্রথম গিরিরাজ কন্যা উমারূপে, দ্বিতীয় হরভোলানাথ শিব ও মহাদেব পত্নী, পার্বতীরূপে, তৃতীয়ত– মূর্তিমতী আদ্যাশক্তি জগৎ জননীরূপে কালী ও দুর্গা হিসেবে। মা আনন্দময়ীও এই তিনটি জীবনের প্রত্যেকটি স্তরের এক আশ্চর্য স্বার্থকতা ও পরিপূর্ণতার পরিচয় দেন। প্রথম– আদর্শ কন্যারূপে তিনি বাবা মায়ের কখনও অবাধ্য হননি। তাঁর শান্ত-শিষ্ট, মধুর স্বভাবের জন্য ছেলেবেলায় সবাই তাঁকে ভালোবেসেছেন। দ্বিতীয়ত– স্ত্রীরূপেও তিনি আদর্শ, স্বামীসেবায় নিষ্ঠাবতী, অনন্ত শক্তির অধিকারী হয়েও তিনি স্বামীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশে কোনোদিন ত্রুটি করেননি। তৃতীয়ত– জগৎ জননীরূপে অখিল বিশ্বের মা হিসেবে প্রতিটি জীবের প্রতি সর্বব্যপি স্বতস্ফূর্ত মমতা ও করুণার জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে ঘটে তার পরম প্রকাশ। ধর্ম জীবনেও তার সাধনার বিকাশ ঘটে বিচিত্র পথে। কখনও দ্বৈত কখনও অদ্বৈত, আবার কখনও দ্বৈতাদ্বৈত মতের উপাসীকা। কখনও তিনি বৈষ্ণব, কখনও শাক্ত, আবার কখনো বৈদান্তিক। কীর্ত্তনের সময় তাঁর দিব্যোম্মাদ অবস্থা এবং অষ্টসাত্ত্বিক ভাব বিকারের লক্ষণ দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় তিনি বৈষ্ণবীয় রাগানুরাগ ভক্ত সাধনায় চরম সিদ্ধি লাভ করেছেন।

www.pathagar.com

শাহবাগ ও রমনায় কালী পূজার সময় তার ভক্তি নিষ্ঠা এবং অলৌকিক ভাবের বিকাশ দেখে মনে হতো তিনি শুধু শক্তি মতের স্বার্থক উপাসিকা নন তিনি নিজেই যেন তন্ত্রের শক্তি। আবার একদিকে তিনি পরম বৈদান্তিক। মর্ত্য চরাচরে সর্বভূতে সর্ব জীবে আনন্দময় ব্রহ্মস্বরূপের এমন অখণ্ড উপলব্ধি এবং সেই উপলব্ধির সহজ সরল প্রকাশ খুব কম বেদান্ত সাধকের মধ্যেই পাওয়া যায়। বেদান্তের বিশিষ্ট অদ্বৈত মতকে জীবনের প্রতি মুহূর্তে মূর্ত করে চলেছেন মা আনন্দময়ী, তাঁর মত পরম বৈদান্তিক কজন আছেন? মা আনন্দময়ীর হাসি যেন হাসি নয়, যেন অমৃত। পরম আনন্দের এক অফুরন্ত অমৃত ধারা ঝরে পড়েছে মার হাসিতে সে হাসির দিব্য ছটায় জগত হতে নিঃশেষ অদৃশ্য হয়ে যায়, যত অশান্তি আর পাপের অন্ধকার। মার সাদাবসন বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতার প্রতীক। মা আনন্দময়ী পরিধিও বসনের এই শুভ্রতা উপহাস করছে যেন পৃথিবীর সমস্ত রকমের মলিনতাকে। মা আনন্দময়ীর আলুলায়িত কুন্তলা, তাঁর মুক্ত কেশ পাশ যেন অখণ্ড মুক্তির প্রতীক। মা আনন্দময়ী ভাব বন্ধন অর্থাৎ লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, মোহ, দ্বেষ, শঙ্কা, চৈতন্য ও জগুপসা এই অষ্টপাস হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছেন বলে এক জগতব্যাপী সত্তায় ছড়িয়ে পড়তে পেরেছেন সব জীবের অন্তরে, মোক্ষ বা চূড়ান্ত শান্তি দিতে পেরেছে মানব আত্মাকে। এই ছিলেন রমনাকালী মন্দিরের আমাদের মা আনন্দময়ী। ১৯৮২ সালে অগাস্ট মাসে মা আনন্দময়ী হাজার হাজার মানুষকে সত্য ও সুন্দরের পথে দীক্ষা দিয়ে বৃন্দাবন ধামে ৮৫ বছর বয়সে এ ধরাধাম ত্যাগ করে স্বর্গালোকে গমন করেন।

৩১.০১.২০১০
রোববার, বেলা ৩টা ৩০মিনিট।

www.pathagar.com

আধুনিক শক্তিশালী ভারত ও বাংলা গড়ার চার বিদেশী কন্যা : মার্গারেট নোবল, সিলভিয়াও, এলেন এবং এ্যানি বেসান্তের কথা

অবিভক্ত বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রী অরবিন্দ এবং এম এন রায় এই তিন মনীষি বিরাট বড় ভূমিকা পালন করেছেন ভারতের মানুষের চিন্তা-চেতনা সমৃদ্ধি করতে তথা আধুনিক ভারতবর্ষ বা আধুনিক বাংলা গড়ার কাজে।

আর এই তিন মনীষির প্রথম বা কিশোর বয়সেই যার অনুপ্রেরণা ও চিন্তা চেতনা কাজ করেছে তিনি হলেন সাহিত্য সম্রাট বা ঋষি লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২৬ জুন ১৮৩৮ সনে, মৃত্যুবরণ করেন ৮ এপ্রিল ১৮৯৪ সনে। ১৮৮২ সনে তার প্রকাশিত বাংলা উপন্যাস আনন্দমঠ পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ গড়ে তোলেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবনের ব্রত নিয়ে মানবসেবা দেশসেবা। স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৬৩ সনে কলকাতা শহরের সিমলায়। মৃত্যুবরণ করেন ১৯০২ সনে, মাত্র ৪০ বছরের জীবন অথচ করেছেন বিস্ময়কর অনেক কিছু। ১৮৯৫ সনে লণ্ডনের লেডি ইসাবেলার গৃহে স্বামী বিবেকানন্দের একটি বক্তৃতা শুনে তরুণী ইংরেজ কন্যা মার্গারেট নোবল স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে যায়। ১৮৯৮ সনের ২৮ জানুয়ারি বৃটেন ত্যাগ করে কলকাতায় একা চলে আসেন ৩০ বছর বয়সের মার্গারেট নোবল, স্বামী বিবেকানন্দের হাতে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে নাম রাখেন নিবেদিতা, সেই থেকে ভগ্নি নিবেদিতা। ১৯১১ সনে ভগ্নি নিবেদিতার মৃত্যু হয় অথচ এই অল্প ১৩ বছরে অনেক স্মরণীয় কিছু করে গিয়েছেন। ১৮৯৮ সন থেকে ১৯১১ সন পর্যন্ত ইংল্যান্ড আমেরিকার তার বান্ধবীদের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন তাই দিয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় বেলুর মঠের জায়গা ক্রয় ও ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ভগ্নি নিবেদিতা কলকাতায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আজ কলকাতার সবচেয়ে বড় মেয়েদের স্কুলের একটি, কলকাতার লক্ষাধিক মেয়ে ভগ্নি নিবেদিতার স্কুল থেকে গত একশত বছরে ম্যাট্রিক পাস করেছে। আর এই স্কুল খুবই উন্নতমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ভগ্নি নিবেদিতা ইংরেজদের ভারত শাসনের খুবই বিরোধী ছিলেন। কোনো সাদা চামড়ার সাহেবকে ভারতের কোনো জায়গায় কোনো ভারতীয়র সাথে খারাপ ব্যবহার করা দেখলে সাথে সাথে ভগ্নি নিবেদিতা ঐ সাদা চামড়ার সাহেবকে লাথি ও কিল-ঘুষি মারতেন। সভ্য মানুষ মেয়েদের গায়ে হাত দিয়ে আঘাত করে না, তাই ইংরেজ সাহেবরা তাকে পাল্টা আঘাত করতেন না। কথা-তর্কে ভগ্নি নিবেদিতার সাথে তারা পরাজয় বরণ করে যেতেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন গড়ে তোলার জন্য বিদেশী ইংরেজ কন্যা মার্গারেট নোবলের অবদান সীমাহীন। মার্গারেটকে শক্তি-সাহস-প্রেরণা

www.pathagar.com

জুগিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দ। আর স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য কাজ করেছেন মার্গারেট নোবল।

১৮৭৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন শ্রী অরবিন্দ ঘোষ, ১৯৫০ সনে মৃত্যুবরণ করেন। ১৮৮৫ সনে মায়ের সাথে বিলেত বা লণ্ডন গমন করেন। ১৮৯৮ সনে আইসিএসের লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, চুড়ান্ত শারীরিক পরীক্ষার দিনে ঘোড়ায় চড়া থেকে অনুপস্থিত থেকে তাস খেলে সময় কাটান। এর কারণ জানতে চাইলে শ্রী অরবিন্দ জবাব দেন 'আইসিএস অফিসার হয়ে বৃটিশ শাসকদের সেবাদাস হয়ে কাজ করার চাইতে তাস খেলে সময় কাটানো অনেক ভাল'। ১৮৯৯ সনে বম্বের ক্রনিকল পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিনটি প্রবন্ধ লেখেন ইংরেজিতে, যে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য বৃটিশ বা ইংল্যান্ডের ধারার রাজনীতি কোনো সমাধান নয়, সমাধান আছে ফ্রান্সের ফরাসী বিপ্লবের ধারার রাজনীতিতে, রক্তপাতের মাধ্যমে কল্লাকাটার মাধ্যমে। শ্রী অরবিন্দের বম্বে ক্রনিকল পত্রিকার ঐ লেখা পড়ে বাংলা ও ভারতে জন্ম নেয় যুগান্তর ও অনুশীলন সমিতি। যতিন মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতিন), ব্যারিস্টার পি মিত্রসহ অন্যদের নেতৃত্বে সারা বাংলা ভারত তথা বৃটিশ সাম্রাজ্য কেঁপে ওঠে, হিন্দু-কিশোরেরা অস্ত্র ধরে, বহু ইংরেজ রাজ কর্মচারী বোমা-গুলির আঘাতে নিহত হন, ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, বিনয়, বাদল, দীনেশ, এম.এন রায় এই সময়ের সৃষ্টি।

এই শ্রী অরবিন্দ পরবর্তী পর্যায়ে গীতার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে হত্যার রাজনীতি পরিহ-ার করে ধ্যান ও যোগের মাধ্যমে মানুষের মুক্তি এই ধারণা নিয়ে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম গড়ে তোলে। পণ্ডিচেরীর এই আশ্রমের পরিধি অনেক বড়। এই আশ্রম গড়ে তোলার জন্য বিরাট অবদান রেখেছেন শ্রী মা। এই শ্রী মা ১৮৭৮ সনের ২১ ফেব্রুয়ারীতে প্যারিস শহরে জন্মগ্রহণ করে, নাম সিলভিয়াও। ১৯১৪ সনে স্বামীর সাথে তিনি ভারতে আসেন এবং শ্রী অরবিন্দের সাথে সাক্ষাৎ করেন। শ্রী অরবিন্দের সাথে সাক্ষাৎ লাভের পর তিনি বলেন 'এই মহাপুরুষকে আমি প্যারিসে থাকতে স্বপ্ন ও ধ্যানের মাধ্যমে দেখে আসছি অনেক বছর ধরে'। শ্রী মা পণ্ডিচেরীর অরুভিলা আশ্রমের মাধ্যমে ভারতের হাজার হাজার শিক্ষিত সৎ মানুষের জন্ম দিয়েছেন, আধ্যাত্মিক সাধনার অসাধারণ যোগী নারী। শক্তিশালী ভারত গড়ার জন্য ফ্রান্সের কন্যা শ্রী মা ওরফে সিলভিয়াও এর অবদান অসীম।

মানবেন্দ্রনাথ রায় অসাধারণ প্রতিভাবান মানুষ। ১৮৮৭ সনের ২১ মার্চ চব্বিশ পরগনার আরবেলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, ১৯৫৪ সনে ভারতের দেরাদুনে মৃত্যুবরণ করেন। প্রখ্যাত লেখক শিব নারায়ণ রায় ১৯৮৭ সনের দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত এক লেখায় লিখেছেন সক্রেটিস থেকে যত প্রতিভাবান বা পণ্ডিত মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন এদের মধ্যে এম. এন রায়ের প্রতিভা সর্বশ্রেষ্ঠ। এম. এন রায় যখন ভারতের জেলে বন্দী ১৯৩১ সন থেকে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত, তখন বিজ্ঞানী আইনস্টাইন ইংল্যান্ডের রাজার কাছে চিঠি লিখেছেন– 'পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী আপনার বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের জেলে বন্দী। এটা পৃথিবীর পদার্থবিজ্ঞান চর্চার জন্য বিরাট ক্ষতি এবং বৃটিশ

www.pathagar.com

শাসনের সম্মানের জন্য লজ্জার বিষয় যে বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী আপনার শাসনে আপনাদের জেলে বন্দী। অনুগ্রহ করে পদার্থবিজ্ঞান ও আপনার মানসম্মানের স্বার্থে এম. এন রায়কে অবিলম্বে মুক্তি দিন। (পড়ে দেখুন ১৯৮৭ সনে আবু মুহাম্মদ খান বাবলু কর্তৃক পরিবর্তন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত ও বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সম্পাদিত এম.এন রায় স্মারকগ্রন্থে এ এস এম আজিজুল হক সাজাহানের লেখা)। এম এন রায় ১৯১৭ সনে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত বিপ্লবের পাঁচজন নায়কদের একজন, মেক্সিকোর সংবিধান বা শাসনতন্ত্র এম এন রায়ের লেখা, ইংরেজি, জার্মান, ফরাসী, রাশিয়ান, স্প্যানিস ও চীনা ভাষায় হাজার হাজার পৃষ্ঠার বই লিখেছেন। এই এম এন রায়ের জীবনে তার স্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্যা এলেন বিরাট ভুমিকা রেখেছেন। এম এন রায় মুখে ডিক্টেশন দিতেন এলেন তা কাগজে কলম দিয়ে লিখতেন। জার্মানিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের মেয়ে ১৯২০ সনের দশকে শেষের দিকে জার্মানিতে এম. এন রায়ের সাথে পরিচিত হয়ে তার প্রেমে পড়ে যান। ১৯৩১ সনে এম এন রায় ভারতবর্ষে চলে আসেন জার্মান থেকে। ভারতবর্ষে এসে তিনি ১৯৩১ সনে গ্রেফতার হন এবং ১৯২৪ সনের মিরাঠ বা কানপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে গ্রেফতার হন। ১৯৩৭ সনে কারাদণ্ড ভোগ করে জেল থেকে মুক্তি পান। ১৯৩১ সনে এলেন ভারতে চলে আসেন। ১৯৩১ সন থেকে ১৯৩৭ সন পর্যন্ত এম এন রায়ের সাথে এলেন নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলেন, অনেক লেখা লিখেছেন এম এন রায় এই সময়। লেটারস ফ্রম জেল নামে বড় ধরনের একটি বই আছে, যার সব চিঠি এলেনকে লেখা। তখনও এম এন রায়ের সাথে তার বিয়ে হয়নি অথচ এই বইয়ের বেশ কয়েকটি চিঠি এলেনকে বেশ ভৎর্সনা বা রাগারাগি করে লেখা যা পড়ে আমার হাসি পেয়েছে এবং অবাক হয়েছি, এলেনের ধৈর্য্য দেখে। অসাধারণ সুন্দরী এবং বড় বা ধনী মেয়ে এলেন। ১৯৩৭ সনে এম এন রায় জেল থেকে ছাড়া পেলে দুজন বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৫৪ সনে এম এন রায় মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৬৪ সনে দেরাদুনে এলেন রায় মৃত্যুবরণ করেন। বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে রাতে এলেন রায়কে হত্যা করে ডাকাতরা। এলেন রায়ের বাগান বা গার্ডেন করার উপরে অনেক জ্ঞান ছিল, তিনি ভারতের আরবারি কালচারের অফিসারদের গার্ডেন করা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন এবং তা থেকে রোজগার করতেন। বেশ কয়েকটি চিন্তাশীল রাজনীতির উপরে বই লিখেছেন এলেন রায়। আমাদের বাংলাদেশের অধ্যাপক সালাউদ্দিন আহমেদ, মরহুম রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আলী আহসান, জ্যোতির্ময় গুহ ও বাসন্তী গুহ ঠাকুরতাসহ আরও অনেকের এলেন রায় ও এম এন রায়ের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাংলা ও ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে এম এন রায়ের বিস্ময়কর প্রতিভা, আর এম এন রায়ের পাশে থেকে তাকে সাহায্য ও সহযোগিতা অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর মেয়ে এলেন।

এছাড়াও মহাত্মা মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধীর প্রভাবে এ্যানিবেসান্তে ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বিরাট অবদান রেখেছেন, অনেক জনসেবা করেছেন, ভারতের রাজনীতিতে এ্যানিবাসেন্ত একটি শ্রদ্ধেয় স্মরণীয় নাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি এ্যানিবেসান্তের উপর

www.pathagar.com

আজ ৩০-০১-২০১০ তারিখ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট বই পড়ার সুযোগ পাইনি। তাই এই মহীয়সীর শ্রদ্ধেয় নারী সম্পর্কে আমার জ্ঞান বেশ কম। যার জন্য এই মহীয়সী নারী ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একসময়ের সভানেত্রী এনিবাসেন্ত সম্পর্কে বেশিকিছু লিখতে পারছি না।

মোট কথা আধুনিক উন্নত শক্তিশালী বাংলাদেশ ও ভারত গড়ে তোলার জন্য বিদেশী বৃটিশ কন্যা মার্গারেট নোবল, ফরাসী কন্যা সিলভিয়াও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কন্যা এলেন এবং বৃটিশ কন্যা এ্যানিবেসান্তে বিরাট অবদান রেখেছেন। এই শ্রদ্ধেয় নারীদের জানাই আমার অসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি।

৩০-০১-২০১০ শনিবার বিকাল ৫টা।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলাম এবং তাবলীগ জামায়াতের আমীরদের থেকে দূরে থাকুন–

ওয়ালা তাকুনূ কাল্লাযীনা তাফাররাকু ওয়াখতালাফ মিম বা-দি মা জ্বা আহমূল বাইয়্যিনা তু ওয়াউলা-ইকা লাহুম আযাবুন আজিম।

–তোমরা তাদের সাথে যেও না যারা সুস্পষ্ট নির্দেশ আসার পরেও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করে এদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।
পবিত্র কোরআনের সূরা আল এমরান, আয়াত-১০৫।

বাংলাদেশের বর্তমানে জামায়াত ইসলাম নামক রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থক এবং তাবলীগ জামায়াতের কিছু নেতা-কর্মী (তাবলীগের সবাই না) মুসলমানদের কবর জিয়ারত ও মিলাদ না পড়ার জন্য প্রচার করে থাকেন এবং তারা নিজেরাও কবর জিয়ারত ও মিলাদ পড়ে না। তাদের কবর জিয়ারত ও মিলাদ পড়া প্রসঙ্গে যে মতবাদ তা ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও চর্চার মারাত্মক বিরোধী। জামায়াতে ইসলাম ও তাবলিগ জামায়াতের ঐসব নেতা-কর্মীরা বর্তমানে সৌদি আরবের ক্ষমতাসীন সরকারের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য লাভ করে নিজেরা বিভিন্নভাবে লাভবান হয়ে মিলাদ, দরুদ পাঠ ও কবর জিয়ারতের বিরুদ্ধে যে বক্তব্য দিচ্ছেন তার ভিত্তি ১৭০৩ সনে আরব দেশের নজত প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী মোহাম্মদ বীন আবদুল ওহাব নজদী নামক এক ইসলামী চিন্তাবিদের বক্তব্য অনুযায়ী, মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ১৭৭৮ সনে মৃত্যুবরণ করেন। এই আবদুল ওহাব নজদীর বক্তব্যকে সামনে নিয়ে এসে ১৯২০-এর দশকে সউদ আবদুল আজিজ নামক একজন দস্যু সরদার তার দলবল দ্বারা যারা আরব বা মক্কা মদিনার শাসন ক্ষমতায় ছিলেন তাদের নির্মমভাবে হত্যা করেন, মক্কা মদীনার সমস্ত ধনী ব্যক্তিদের মালামাল লুট করে এবং মক্কা মদিনার অবলা নারীদের দাসী-বান্দী হিসেবে ভোগ করেন। আরবদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে দেশের নাম উক্ত ডাকাত সর্দার সউদের নামে রাখা হয় সৌদি আরব। বর্তমানে ঐ ডাকাত সর্দার সউদের ছেলে ও নাতীর বংশধরেরা ক্ষমতায় রয়েছে।

১৯২০ এর দশকের আগে যারা প্রায় ১৩০০ বছর আরব দেশে শাসন করেছেন হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর সময় থেকে তাঁরা নিয়মিত দরুদ মিলাদ এবং কবর জিয়ারত করেছেন। সউদ আবদুল আজিজ এর ডাকাত বাহিনী আবদুল ওহাব নজদীর বক্তব্য সামনে নিয়ে এসে বলে 'এরা কবর জিয়ারত করে, মিলাদ পড়ে, এরা ভ্রান্ত মুসলমান, এদের হত্যা করা এদের মালামাল লুট করা এবং এদের নারীদের ভোগ করা ইসলামসম্মত'। এই সউদ ডাকাতবাহিনী যাদের হত্যা করল আরবে তাদের মধ্যে

www.pathagar.com

অনেকেই আমাদের প্রিয় নবী (সাঃ) নিজ রক্তের বংশধর ছিলেন। অথচ বিনা বিচারে কোনো মানুষকে হত্যায় ইসলামধর্ম সমর্থন করে না। ১৭০৩ সনে নজদ প্রদেশে জন্মগ্রহণকারী আবদুল ওহাব প্রথম কিতাব লিখে আবিষ্কার করে ইসলামে কবর জিয়ারত ও মিলাদ পড়া শিরক গুনাহ। তার আগে ইসলাম ধর্মের অনেক পণ্ডিত জ্ঞানী ইসলামিক চিন্তাবিদ চার খলিফা চার ইমাম হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) সহ কত আল্লাহর ওলী ছিলেন তারা বই লিখেছেন, তারা সবাই দরুদ মিলাদ এবং কবর জিয়ারত করেছেন ও এর পক্ষে বক্তব্য দিয়ে বলেছেন 'কবর জিয়ারত ও মিলাদ পড়ানোর মধ্যে অনেক সওয়াব হয়'। ইসলাম ধর্মের একটি শক্তিশালী বিধান হচ্ছে কবর জিয়ারত, মিলাদ ও দরুদ পাঠ। এ মত সমর্থন করে আবদুল ওহাব নজদীর মতবাদ ভুল বা ভ্রান্ত বলে বর্ণনা করে যারা কিতাব লিখেছেন তারা হচ্ছেন–

১. আব্দুল ওহাব নজদীর ওস্তাদ শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল লতিফ শাফী (রাঃ) এর লেখা কিতাব– সাইফুল জিহাদী লিমুদ্দায়ীল ইজতিহাদ।

২. আল্লামা আফীফুদ্দিন আব্দুল্লাহ হাম্বলী (রাঃ) এর কিতাবের নাম– আসওায়িক ওয়ার রউদ।

৩. আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান হাম্বলী (রাঃ) এর বই এর নাম– 'তাহকুমুল মুকলা দীনা বিমান ইদ্দিয়া তেজদাদিন।

৪. দামেস্কের শায়খ হাসান হাম্বলী (রাঃ) এর লেখা বই, আনলাতুস শরিয়াতু ফিররদ্দি আনাল ওহাবিয়াত।

৫. শায়খ জাজায়েরী আল মালেকী (রাঃ) এর লেখা বই এর নাম, ইজহারুল উক্কুক আন মানিয়াত তাওয়াসসুলি বিন নাবিয়াত (সাঃ) ওয়ালাউ লিস ছুদুক।

৬. দাউদ বীন সুলাইমান বাগদাদী হানাফী (রাঃ) এর লেখা বই– আল মানহাতুল ওয়াহাবিয়্যাৎ।

৭. মক্কার শায়খ আতামক্কীর কিতাব 'আসসারিমুল হিনদীয়ী ফামারবা উলুক্কুন নজদী'।

৮. বাগদাদের জামিল সিদ্দিকীর লেখা কিতাব– আলফাজরু সাদিকু।

৯. মিশরের শায়খ মুস্তাফা হাম্মুলীর লেখা– গাউসুল ইবাদ বি বায়ানি ররাশাদ।

১০. মক্কা শরীফের মুফতি সৈয়দ শায়খ আহমেদ দাহলান শাফীর লেখা বই, খোলা সাহতুল বি বায়ানে উলামাইল বেলাদিল মোরাম।

উপরে বর্ণিত দশজন বিশ্ববরেণ্য আলেম আরব বিশ্বের। আরবি ভাষায় উল্লেখিত কিতাব লিখেছেন আবদুল ওহাব নজদীর মতবাদের বিরুদ্ধে, মিলাদ, দরুদ, কবর ও মাজার জিয়ারত করার পক্ষে।

এছাড়াও ভারতবর্ষের যেসব শ্রদ্ধেয় ও বুজুর্গ আলেমগণ কবর, মাজার জিয়ারত মিলাদ ও দরুদ শরীফ পড়া ও শবেবরাত পালন করার পক্ষে কিতাব বা বই লিখেছেন এবং

www.pathagar.com

বিভিন্নভাবে মতামত দিয়েছেন তারা হলেন–

১. হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রা:),

২. আল্লাম্মা আজিজুর রহমান দেওবন্দী (রা:)

৩. সৈয়দ আহম্মদ হাসান আমরুহী আল্লাম্মা (রা:)

৪. হাবিবুর রহমান আল্লামা সাবরীর আহম্মদ ওসমানী (রা:)

এই চারজন আলেম সর্বজন শ্রদ্ধেয় আবু দাউদ শরীফের সারা বজলুল মযহুদ প্রণেতা আল্লামা খলিল আহমেদ অম্বিটবীর লেখা সমর্থন করে বলেছেন–

'আবদুল ওহাব নজদীর শিষ্যরা অত্যাচারি খারিজী দল। এরা ইসলামের এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যারা আহলে সুন্নত জামায়াতের মানুষের জানমাল হালাল ও তাদের স্ত্রী কন্যাদের দাসী-বান্দী মনে করে। এদের প্রতিহত করতে হবে। এদের থেকে দূরে থাকতে হবে, নিয়মিত দরুদ মিলাদ ও কবর জিয়ারত করতে হবে।

গত দুইশত বছরে ভারত উপমহাদেশে আবদুল ওহাব নজদীর মতবাদের বিরুদ্ধে এবং কবর জিয়ারত, মিলাদ ও দরুদ পড়ার পক্ষে উল্লেখযোগ্য যেসব কিতাব লেখা হয়েছে তার নাম :

১. আহসানুল মাকলীফি শরহি হাদিসিল লাতাশদ্দুর রিহাল, লেখক শায়খ মুফতী সদরুদ্দিন দেহলবী (রাঃ)

২. তাহাকিকুল ফাতাওয়া ফি রদ্দি আহলিত তাগওয়া, লেখক আল্লাম্মা ফজলে হক খায়রাবাদী

৩. কাওসুল সাবিত : লেখক হযরত কিরামত আলী জৈনপুরী (রাঃ)

৪. শিহাবুস সাকিব, লেখক আল্লাম্মা সৈয়দ হোসেন আহমেদ মাদানী (রাঃ)

৫. আনওয়ার সিদ্দীকাতি ফি দাফয়ি জুলুমাতিল ওহাবিয়া, লেখক আল্লাম্মা হযরত আব্দুল মাবুদ মেদেনীপুরী (রাঃ)

৬. জুলমাতিল ওহাবিয়াহ- লেখক মুজাদ্দেদে জামান, ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)

৭. বুরহানুল মুকাল্লদীন নাসরুল মুজতাহিদি দাফিউল মুফসেদিন, লেখক আল্লাম্মা হযরত মওলানা রহুল আমিন (রাঃ)

৮. উসুলুল আর রায়াতি ফি তারদীদীল ওহাবিয়াহ, লেখক, পাঞ্জাব প্রদেশের পীর সাহেব শীরহীন শরীফের খাজা হাসান জান মুজাদ্দেদী (রাঃ)

৯. তায়ারিখে নজদী ওয়াহাজাজ, লেখক মুফতী মুহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম আজমগড়।

১০. তারগিমুল ওহাবিয়া, লেখক মুফতি মুহাম্মদ আবজালুর রহমান মুরাদাবাদী।

www.pathagar.com

১১. তুহাফাতুল ওহাবিয়া, লেখক মুফতি আবদুল হাফিজ আগরা।

১২. সাইফুল জাব্বার, লেখক মওলানা ফজলে রাসুল বাদাউনী।

উপরে উল্লেখিত শ্রদ্ধেয় আলেমগণ কবর জিয়ারত, দরুদ পড়া, মিলাদ পড়ার স্বপক্ষে জোড়ালোভাবে বলেছেন উপরে উল্লেখিত বইয়ে। কাজেই আমাদের উচিৎ এইসব শ্রদ্ধেয় আলেমদের কথা অনুস্মরণ করে কবর জিয়ারত মিলাদ পড়া দরুদ পড়া। জামায়াত ইসলাম এবং তাবলিগের নেতা কর্মীদের কথা না শোনা ও তাদের থেকে সবসময় দূরে থাকা। জামায়াতে ইসলামের ও তাবলিগ জামায়াতের নেতাকর্মীদের চেয়ে উপরে উল্লেখিত শ্রদ্ধেয় আলেমগণের বিদ্যা-বুদ্ধি ত্যাগ, নাম যশ লক্ষ কোটিগুণ বেশি। হে আল্লাহ সউদ ডাকাতের বংশধরদের অর্থের বিনিময়ে পরিচালিত জামায়াত ইসলামের লোকদের থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর। ন্যায় এবং সৎ পথে পরিচালিত কর। তবে একথা সত্য যে হাজার হাজার মুসলমান যারা তাবলিগ জামায়াতে যান তারা কবর জিয়ারত মিলাদ দরুদ পাঠ করেন। তাবলিগের আমির ও কিছু নেতা কবর জিয়ারত ও মিলাদ পড়ার বিরুদ্ধে।

২৩-০১-২০১০ শনিবার ভোর ৪টা।

www.pathagar.com

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্র রাজনীতি কমানোর উপায়

১. প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে ক্লাস শুরু হয়ে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস হবে, সপ্তাহে ছয়দিন, মাঝে এক ঘণ্টা লাঞ্চ ব্রেক।

প্রতিটি ক্লাসে রোল কল হবে, কোনো ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত হলে তাকে কমপক্ষে পাঁচশত টাকা জরিমানা করা হবে প্রতি ক্লাসে হাজিরা না থাকার জন্য। কোনো মাসে চারবার ক্লাসে অনুপস্থিত হলে ভর্তি বাতিল। শুধু অসুস্থ হলে ব্যতিক্রম।

২. বিকাল পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত একঘন্টা সপ্তাহে ছয়দিন ক্যাডেট কোরের সদস্য হিসেবে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে প্যারেডে অংশ নিতে হবে। কোনোক্রমে প্যারেডে অংশগ্রহণ করা থেকে রেহাই নেই। প্যারেডে অংশ না নিলে কঠোর শাস্তি ভর্তি বাতিল। সক্রেটিস থেকে আজ পর্যন্ত যত দার্শনিক শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন, সবাই শারীরিক শিক্ষার প্রতি জোড় দিতে বলেছেন। জুনিয়র ছাত্র/ছাত্রীগণ অবশ্যই সিনিয়র ছাত্রছাত্রীদের সম্মান দেখাবে বিদ্যা শিক্ষার এটা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৩. রাত ৮টায় প্রতিটি হলের গেট বন্ধ হবে, কোনোক্রমে রাত ৮টার পরে হলের গেট খোলা হবে না। রাত ৯টায় হলের হাউজ টিউটর সাহেবরা প্রতি রুমে গিয়ে ছাত্রদের রোল কল করবে। রাত ৯টায় কোনো ছাত্রছাত্রীকে অনুপস্থিত পাওয়া গেলে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. প্রতি সপ্তাহে দুইটি টিউটোরিয়াল পরীক্ষা শিক্ষকগণ নিবেন। প্রতি মাসে একটি ক্লাস ফাইনাল পরীক্ষা হবে। এসব পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। এসব পরীক্ষায় অনুপস্থিত হলে কঠোর দণ্ড বা ভর্তি বাতিল।

উপরে যা বলা হলো তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মে প্রচলিত ছিল বা আছে। নতুন কিছুই নাই। তবে হাল্কা-পাতলাভাবে সব নিয়ম চালু ছিল। কঠোরভাবে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো পালন করলে ছাত্র রাজনীতি অনেক নিয়ন্ত্রণে আসবে।

প্রথম বর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময়ে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে পৃথক অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর নিতে হবে তারা উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে মেনে চলবে, যারা এই অঙ্গীকারনামা মেনে চলতে অস্বীকার করবে তাদের ভর্তি করা হবে না।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বেতনের হার বৃদ্ধি করতে হবে। ১৯২১ সনে মাসে ১০ টাকা বেতন এখনও মাসে ১০ টাকা বেতন। এটা হাস্যকর এবং অযৌক্তিক। প্রতি মাসে কমপক্ষে ২০০০ টাকা মাসিক বেতন হওয়া উচিৎ। বিদ্যা শিক্ষার একটি দাম বা মূল্য আছে। বিনামূল্যে বিদ্যাশিক্ষা হয় না। উপরে যা বলা হলো তা বাধ্যতামূলক। অবশ্যই

www.pathagar.com

কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। এর বাইরে যারা অন্য বিষয়ে বিনোদন চর্চায় অংশ নিবে যেমন, সঙ্গীতচর্চা, ফুটবল, হকি, বাস্কেটবল, টেনিস খেলা, পত্রিকা পড়া এসব সকাল ৫টা থেকে নয়টার মধ্যে করতে হবে। জোহরের নামাজ লাঞ্চের সময় একঘণ্টার মধ্যে সেরে নিতে হবে, আসরের নামাজের সময় ৫ মিনিটের বিরতির। যাদের ইচ্ছা হয় এই ৫মিনিটের বিরতির মধ্যেই নামাজ সেরে নিবে। ১৯৭৪ সন থেকে ১৯৮১ সন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র হিসেবে আমি জানি যে, উপরে যা বলা হয়েছে তার সমস্ত অবকাঠামো তৈরি করা আছে। শুধু আন্তরিকতার সাথে কঠোর ও কড়াকড়িভাবে বর্ণিত নিয়মগুলো মেনে চললেই পরিস্থিতির অনেক উন্নতি হবে, ছাত্র রাজনীতি কমে যাবে। শুধুমাত্র সৎ ইচ্ছার প্রয়োজন, এরজন্য সৎ চিন্তার শিক্ষক ও সৎ মানুষের দরকার। ২৪-০১-২০১০, রবিবার ভোর ৪টা।

www.pathagar.com

যশোবন্ত সিংহ, জিন্নাহ ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা ১৯১৬ সনের হিন্দু-মুসলিম লখনৌ প্যাক্ট প্রেক্ষিত ২০১০, পাপমোচনের জন্য বাংলাদেশে হিন্দুদের ১৫ ভারতে মুসলমানদের ৩০ ভাগ সমস্ত চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণ করার দাবী।

২০০৫ সনে ভারতের বিজেপি সভাপতি ত্যাগী ও আদর্শবাদী শ্রদ্ধেয় নেতা লাল কৃষ্ণ আদভানী পাকিস্তানের করাচীতে বেড়াতে গিয়ে জন্মভুমি ও কিশোরকালের স্মৃতিময় করাচী শহর দেখে অভিভুত হয়ে যান এবং মুসলমান সম্প্রদায়, জিন্নাহ সাহেব দেশভাগ নিয়ে কিছু আবেগ বিহ্বল মন্তব্য করেন ফলে তাকে অনেক কথা শুনতে হয়েছে, অনেক সমালোচনা হয়েছে আদভানিজির ঐ মন্তব্যে, বিজেপির সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছে।

সম্প্রতি ২০০৯ সনে ভারতের সাবেক প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় যশবন্ত সিংহ সাহেবের লেখা জিন্নাহ ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা নামে একটি বই বাজারে এসে উপমহাদেশে আলোচনার ঝড় তুলেছে। ১৯৬৪ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে মাস্টার্স পাস করেছেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাবেক আবাসিক ছাত্র, নীলফামারী জেলার ডোমার থানার মানুষ, বাংলাদেশ সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব, সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামীলীগ নেতা মহিউদ্দিন খান আলমগীর ও সাবেক উপদেষ্টা হাফিজ উদ্দিন খানসহ অনেক সজ্জন মানুষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, প্রাণখোলা হৃদয়বান মানুষ আজিজুর রহমান সাহেব ৬-২-২০০৯ তারিখ শনিবার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাবেক ছাত্রদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আমাকে বলেন 'বাবলু যশবন্ত সিংহের বইটি পড়িও, মাত্র দুইশত টাকা দিয়ে বইটি কিনেছি অনেক কিছু জানতে পেরেছি খুব প্রয়োজনীয় বই।' ৬-২-২০১০ শনিবার বাংলা একাডেমীর বইমেলা থেকে বহু দিনের পুরনো বন্ধু কামাল আনোয়ারসহ রাতে বাসায় ফেরার পথে এটোমিক এনার্জি সেন্টার ও টিএসসির মাঝের ফুটপাথ থেকে যশবন্ত সিংহের বাংলা অনুবাদ বইটি কিনে নিয়ে আসি।

বইটি পড়ে দেখলাম ১৯৯৯ সনের ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর সাথে বিদেশ মন্ত্রী হিসেবে ভারত-পাকিস্তান সরাসরি বাস সার্ভিস চালু করা উপলক্ষে তিনি লাহোড় গিয়েছিলেন। লাহোরে অবস্থিত ৬০ মিটার উঁচু (১৩০ ফুট) মিনারে পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজির পাশে দাঁড়িয়ে যশবন্ত সিংহের মাথায় ভাবনা আসে এই মিনারে পাকিস্তান চত্বরে ১৯৪০ সনের ২৩ মার্চ অল ইন্ডিয়া মুসলিমলীগ সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে দেশভাগ বা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক আবাসভুমি

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করার কথা ঘোষণা করেন। আর সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যশবন্তসিংহজী এতটাই আবেগ বিহ্বল হয়ে যান যে তার ফলে তিনি অনেক পরিশ্রম করে এই বৃদ্ধ ও পরিণত বয়সে বিরাট একটি গ্রন্থ রচনা করে ফেলেন, আর যা নিয়ে আলোচনার তুফান বয়ে যায় সারাবিশ্বে এবং যশবন্ত সিংহ তার প্রিয় রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে বহিষ্কার হন, যা খুবই দুঃখজনক। মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মেনে নেওয়া উচিৎ, পরমতকে সম্মান দেখানো উচিৎ, সামান্য সভ্য মানুষের বহু পুরনো এসব সত্য কথা প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে সম্মানিত ব্যাক্তি যশবন্ত সিংহকে কিভাবে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো তা ভেবে পাওয়া যায় না, বিশেষ করে বিজেপির মত দল থেকে, যারা সবসময় ধর্ম ও নীতির কথা বলে থাকেন।

যাক, শ্রদ্ধেয় লাল কৃষ্ণ আদভানিজি যখন করাচীতে বেড়াতে গিয়ে জিন্নাহ ও মুসলমানদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে প্রচণ্ড সমালোচনার সম্মুখীন হন, হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক নেতা দ্বারা, তখন মুম্বাইয়ের ইঞ্জিনিয়ার আজগর আলী শাহ্ যিনি একজন মানবাধিকার কর্মী ও প্রতিষ্ঠিত লেখক, তিনি তার ধারালো কলম দ্বারা আদভানি ও জিন্নাহ সাহেবের প্রচণ্ড সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন যা ভারতের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের ইংরেজি ডেইলি স্টার পত্রিকায় ইঞ্জিনিয়ার আজগর আলী শাহের ঐ লেখাটি ছাপা হয় যা আমি পড়ি। ডেইলি স্টারের ঐ সংখ্যাটি আমার বিছানার নিচে রেখে দিয়েছিলাম এখন এই লেখাটি ৭-২-২০১০ রোববার ভোররাতে লিখবার সময় আর খুঁজে পাচ্ছি না, যার জন্য একেবারে হুবহু তথ্য তুলে দিতে পারছি না, স্মৃতি থেকে ওই লেখার মূল কথা উল্লেখ করছি। আমার স্মৃতিশক্তি এখনও আমার সাথে বিশ্বাসের সাথেই কাজ করছে বলে আমি মনে করি। আজগর আলী শাহ্ সাহেব ঐ লেখায় আদভানি ও জিন্নাহর সমালোচনা করে লিখেছিলেন– 'আদভানি সাহেব জিন্নাহকে ননকমিউনাল নেতা বা মানুষ হিসেবে উল্লেখ করতে পারেন, কিন্তু জিন্নাহ এক নাম্বার ক্রিমিনাল ভারতে বসবাসকারী ২৫ কোটি মুসলমানদের সর্বশান্ত করে পথে বসাবার জন্য। তিনি সংখ্যা ও তথ্য দিয়েছিলেন ঐ লেখায় ভারতে ১৯৪৭ সালের আগে সরকারি কর্মচারি উচ্চ ও নিম্ন আদালতে বিচারক, সংসদ বা লেজিসলেটিভ সভার সদস্য, রাজনৈতিক দলের নেতা ছিল গড়ে চল্লিশ ভাগ। আর ২০০৬ সনে এসে দেশবিভাগের ফলে ভারতে মুসলমানদের সরকারি চাকুরি বিচার বিভাগ, সংসদ সদস্য রাজনৈতিক নেতার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা মাত্র ৪ ভাগ, অথচ জনসংখ্যা ভারতে মুসলিমরা ১৯৪৭ সনের আগেও ২৫ ভাগ ছিল এখনও ২০০৬ সনেও ২৫ ভাগ, আর ভারতের মুসলমানদের এ সর্বনাশের মুল নায়ক জিন্নাহ'।

আমি ইঞ্জিনিয়ার আজগর আলী শাহের বক্তব্য সমর্থন করি। ভারতের ২৫ কোটি মুসলমানদের প্রতি সবার নজর দেয়া উচিৎ। সব মানুষ সবার ভাই-বোন। বিশেষ করে একজন মুসলমান অপর মুসলমানের সমস্যা দূর করার জন্য এগিয়ে আসবেন এটাই স্বাভাবিক। ভারতে যা হয়েছে তা খুব দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক, তেমনি বাংলাদেশে হিন্দুদের জন্য যা হয়েছে তাও হৃদয়বিদারক। বাংলাদেশে ১৯৪৭ সনের আগে হিন্দুদের

www.pathagar.com

সরকারি চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে যে একচেটিয়া প্রভাব ছিল তা আজ কমে ৪-৫ ভাগে এসেছে। ১৯৫৪ সনে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানে ৩০০জন এমএল-এর মধ্যে ৫৪জন হিন্দু এমএলএ ছিলেন, মন্ত্রীসভার ১০জনের মধ্যে ৪জন হিন্দু মন্ত্রী ছিলেন। এখন ভারতে ২৫ কোটি মুসলমানের স্বার্থে আমাদের ১৯৪৭ সালের আগে ১৯১৬ সনে হিন্দু-মুসলিম লখনৌ প্যাক্ট-এ চাকরিতে নিয়োগের জন্য যে কোটা ছিল তা বহাল করতে হবে। ভারতে সরকারি-আধা সরকারি, সেনাবাহিনী, পুলিশ, শিক্ষক, উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগে ৩০ ভাগ মুসলমানদের জন্য কোটা রাখতে হবে। বাংলাদেশেও হিন্দুদের জন্য সমস্ত সরকারি আধা-সরকারি সেনাবাহিনী, পুলিশ, শিক্ষক, নিম্ন ও উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগে হিন্দুদের জন্য ১৫ ভাগ কোঠা রাখতে হবে, তবেই বাংলাদেশের হিন্দুরা এদেশে বসবাস করতে উৎসাহিত হবে। মুসলমান বা সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা নির্যাতিত বা অবহেলিত হচ্ছে এমন কথা বলার সুযোগ পাবে না। আর বাংলাদেশে হিন্দুদের পক্ষে চাকরিতে এই নিয়োগ কোটা প্রতিষ্ঠিত হলে এটা দেখে ভারতের হিন্দুরাও উৎসাহিত হবেন এবং সেদেশের মুসলমানদের জন্য ৩০ ভাগ চাকরি ও বিচারপতি নিয়োগসহ সেদেশে মুসলমানদের জন্য ৩০ ভাগ চাকরির কোঠা নিয়োগসহ সব কোটা পূরণ করার জন্য এগিয়ে আসবেন।

মনে রাখা দরকার ১৯৪৭ এবং ১৯৭১ সন দ্বারা ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছি আমরা বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানরা। কাজেই উদারতা দেখাবার জন্য প্রথমেই এগিয়ে আসতে হবে আমাদের, বাংলাদেশের মুসলমানদের। আমরা বাংলাদেশের মুসলমানরা যদি বাংলাদেশের হিন্দু ভাইদের জন্য এই সামান্য ত্যাগ স্বীকার করে হিন্দুদের ১৫ ভাগ সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিসিএসসহ সব সরকারি আধা-সরকারি চাকুরির কোটা সংরক্ষণ করে দেই তবে ভারতের ২৫ কোটি আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা সীমাহীন উপকৃত হবেন, তারা ভারতকে আপন মাতৃভুমি জ্ঞানে সম্মান ও ভক্তি করবেন, ভারতের হিন্দু ভাইদেরকে আপন বলে ভালবাসবেন।

বাংলাদেশের এগার কোটি ও ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমানদের স্বার্থে উল্লেখিত বিষয়ে বাস্তব রূপ দেবার জন্য শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের এগিয়ে আসা উচিৎ। ভারতে পঁচিশ ভাগ মুসলমান, বাংলাদেশে ১০ ভাগ হিন্দু। যেহেতু ভারতে মুসলমান ও বাংলাদেশে হিন্দুরা নির্মমভাবে বঞ্চিত হয়েছেন সেজন্য অতিরিক্ত বোনাস বা উৎসাহ হিসেবে ৫ ভাগ বাড়িয়ে চাকরি দিতে হবে আগামী ষাট বছরের জন্য।

কয়েকদিন আগে ২৪.১.২০১০ তারিখে আজিজ সুপার মার্কেটের পাঠক সমাবেশ বই এর দোকান থেকে মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী সাহেবের লেখা 'আত্মজীবন' বইটি কিনে এনে পড়ি। ওই বই পড়ে জানলাম মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী সাহেব ১৮৭৫ সনে চট্টগ্রাম শহর থেকে ১৫-১৬ মাইল দূরে পটিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সনে চট্টগ্রাম শহরে মৃত্যুবরণ করেন। আমরা জানি মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সিরাজগঞ্জের মওলানা ইসমাইল হোসেন সিরাজী বাংলার মুসলমান সমাজের গর্ব, অনেক বড় ইসলামী চিন্তাবিদ ও আলেম ছিলেন। এ দুইজনই

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে বাংলার মুসলমানদের আধুনিক বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য ভিত্তি স্থাপন করেন স্যার সৈয়দ আহম্মেদের পথ ধরে। এই দুইজন আলেমই কোরআন-হাদিসের ব্যাখ্যা দিয়ে বাংলাদেশে জনমত সৃষ্টি করেন এই বলে যে মুসলমানদের ইংরেজি পড়া, বাংলা ভাষা পড়া, বিজ্ঞান পড়া ও চর্চা করা হারাম বা ইসলামবিরোধী নয়। এর আগে এদেশের মুসলমানদের ধারণা ছিল, (এখনও অনেকে) ইংরেজি পড়া, বাংলা পড়া, বিজ্ঞান পড়া হারাম বা ইসলামবিরোধী। আমার মতে মওলানা ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ও মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার মূল বা প্রকৃত নায়ক। এই মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী সাহেবের আত্মকথা বই পড়ে জানলাম কেন তিনি ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ করার বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, যুক্তবঙ্গ রাখার পক্ষে ছিলেন। তিনি আত্মকথা বইতে লিখেছেন 'একজন মুসলমান এমন কোনো কাজ করতে পারে না যে কাজের দ্বারা সে লাভবান হবে, আর ওই কাজের দ্বারা অপর একজন মুসলমান ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন কাজ করা কোনোক্রমেই আমাদের ইসলাম ধর্ম সমর্থন করে না। কাজেই ১৯০৫ সনে যে বঙ্গভঙ্গ করা হয়েছিল তার দ্বারা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ এক কোটি মুসলমান লাভবান হলেও পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ লাখ মুসলমান খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতো, যে কাজের দ্বারা পঞ্চাশ লাখ মুসলমান সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে নির্যাতনের মধ্যে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, একজন সচেতন মুসলমান হিসেবে কি করে আমি তা সমর্থন করি'।

মওলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী সাহেবের বক্তব্যে সত্যিকারের ইসলাম ধর্মের আসল সত্য রয়েছে। একজন বিপদগ্রস্ত মুসলমানের বিপদে অন্য মুসলমানদের স্বার্থ দেখা উচিৎ। ভারতের পঁচিশ কোটি মুসলমানদের স্বার্থে আমাদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করা একান্ত উচিত। আর তা হচ্ছে বাংলাদেশে বর্তমানে ১০ ভাগ হিন্দুর জন্য আগামী ষাট বছরের জন্য ১৫ ভাগ সর্বস্তরের চাকুরির কোটা সংরক্ষন এবং কঠোরভাবে তা মেনে চলা। আর এই কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশভাগ করে যে পাপ করা হয়েছে তা থেকে অনেকটা মুক্ত হতে পারা যাবে।

যশবন্ত সিংহের বইয়ে লক্ষ্য ও নির্দিষ্ট পথও সীমিত হয়ে আসছে' পড়ে জানলাম ১৯১৬ সনে লখনৌতে ভারতের কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের সাথে মুসলিম নেতাদের একটি চুক্তি হয়। মুসলমানদের পক্ষে ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং মওলানা মোহাম্মদ আলী হিন্দু বা কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে ঐ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, ভারত সিংহ বাল গঙ্গাধর তিলক, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, গোপালকৃষ্ণ গোখলে। ১৯১৬ সনের এই লখনৌ চুক্তিতে বিধান করা হয় যে, ভারতের মুসলমানদের সংখ্যা ২৫ভাগ হলেও আইনসভার সদস্য ও প্রশাসনে নিয়োগের সংখ্যা হবে ৩০ ভাগ। ভারতের মুসলমানরা পিছিয়ে পড়ার জন্য অতিরিক্ত ৫ ভাগ ওয়েটেজ বা ক্ষতিপূরণ হিসেবে বেশি পাবে। ১৯২৮ সন পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম সর্ম্পক ভারতে বেশ ভালোভাবেই চলছিল লখনৌ চুক্তির ফলে।

কিন্তু ১৯২৮ সনে নেহেরু রির্পোট ঘোষণার পরে পরিস্থিতি দ্রুত বদলে যায়। নেহেরু রির্পোটে লখনৌ চুক্তিকে উপেক্ষা করা হয়। মুসলিমদের জন্য আইন সভার ও প্রশাসন

www.pathagar.com

সদস্য নিয়োগের কৌটা উপেক্ষিত হয়, জিন্না সাহেব সহ মুসলিম নেতাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ এলে মতিলাল নেহেরু ও পণ্ডিত জহর লাল নেহেরু জনসংখ্যা অনুপাতে মুসলমানদের পাপ্য ২৫ ভাগ পৃথক সদস্য মেনে নিতে চান, কিন্তু অতিরিক্ত পিছিয়ে পড়ার জন্য যে ৫ ভাগ দেওয়া হয়েছে লখনৌ চুক্তিতে তা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু জিন্না ও অনেক মুসলমান নেতারা অতিরিক্ত ৫ ভাগ ওয়েটেজ কোটা সহ ৩০ ভাগ মুসলিমদের পৃথক আইন সভার সদস্য ও প্রশাসনের কর্মচারী নিয়োগের দাবীতে অটল থাকেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে জিন্না সাহেবের ১৪ দফা আসে। মুসলমানেরা ধীরে ধীরে জিন্না সাহেব এবং তার ১৪ দফার প্রতি সমর্থক হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে সংখ্যা গরিষ্ট হিন্দুরা নেহেরু রিপোর্টের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তা সমর্থন করেন। যার ফলশ্রুতিতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হয় হাজার হাজার নিরীহ মানুষের রক্তপাত ও ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হয়। অমানবিক হৃদয় বিদারক অনেক কিছু ঘটে। ১৯১৬ সনের হিন্দু মুসলিম নেতাদের করা লখনৌ চুক্তিতে অটল বা বহাল থাকলে সাম্প্রদায়িক সংঘাত হতো কিনা সন্দেহ বলে মত প্রকাশ করেছেন ভারতের সাবেক প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রি মানবতাবাদী রাজনৈতিক জশবন্ত সিংহ।

গতকাল ০৬.০২.২০১০ তারিখ শনিবার সন্ধ্যায় বাংলায় অনুবাদ আনন্দ পাবলিশার্সের প্রকাশ করা, নকল বা পাইরেসি কপি ফুটপাত থেকে কিনে এনে আগ রাত ৮টা থেকে ১০টা দু ঘন্টা শেষ রাতে ২টা থেকে ৪টা দুঘন্টা মোট চার ঘন্টায় অনেকটাই এক নিশ্বাসে পড়ে ফেললাম যশবন্ত সিংহের লেখা এবই। কিন্তু এই ৪ ঘন্টা বইয়ের বেশ কয়েকটি অধ্যায় পড়ে কোথায় জিন্না সাহেবের প্রতি আবেগ বা অন্ধ সমর্থনে কোন কথা দেখলাম না, বরং অনেক অধ্যায়ে শক্ত ভাষায় জিন্নার রাজনীতি ও বক্তব্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন, (একটি খণ্ডিত স্বাধীনতা, লক্ষ্য নির্দিষ্ট হচ্ছে পথ ও সীমিত হয়ে আসছে, দেশ ভাগ আমাদের শান্তি হরণ করল, দেশ ভাগ তার জের যবনিকা? ইত্যাদি অধ্যায়ে)। এর পরেও যশবন্ত সিংহকে বিজিপি থেকে কেন বহিস্কার করা হলো তা বুঝে উঠতে পারছি না। আসলে ভারতের বিজিপি নেতারা জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা বইটি না পড়ে বইয়ের নাম দেখে ও বইয়ে প্রকাশিত জিন্না সাহেবের বেশ কিছু ছবি দেখে ক্ষেপে উত্তেজিত হয়ে যশবন্ত সিংহকে দল থেকে বহিস্কারের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বলেই বইটি পড়ে আমার মনে হয়েছে।

যশবন্ত সিংহের বইটি পড়ে দেখলাম যশবন্ত সিংহ একজন অসম্প্রাদায়িক হৃদয়বান দয়ালু মানুষ, হিন্দু মুসলমান সবারপ্রতি তার একনিষ্ঠ সমান ভালবাসা। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশ, ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, আফ্রিকা সহ সমস্ত দেশে ঘটে যাওয়া সমস্ত রাজনীতির সামাজিক ও ধর্মীয় ঘটনার যাবতীয় তথ্য প্রমাণ সহ তুলে ধরেছেন শ্রদ্বেয় যশবন্ত সিংহ এই বইয়ে। মহাকবি মাইকেল মধুসদন দত্ত মেঘনাদবধ কাব্যে রাজা রাবনের পুত্র যুদ্ধে মেঘনাদের মৃত্যু সংবাদ শুনে যে বিলাপ, রোদন, শোক প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি বিলাপ রোদন ও শোক প্রকাশ করেছেন শ্রদ্ধেয় যশবন্ত সিংহ তার লেখা বইয়ে দেশ ভাগ করার জন্য।

www.pathagar.com

হাজার বছরের জীবন্ত প্রাণবন্ত ভারত বর্ষকে বিভক্ত করার জন্য হিন্দু মুসলিম ভেদাভেদ ও দেশ ভাগ নিয়ে এমন শোক দুঃখ প্রকাশ করে বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তানের আর কোন ব্যক্তি এমন বই গত ৬০ বছরে লিখেছেন আমি তা পড়িও নাই ও শুনিও নাই। যশবন্ত সিংহের জিন্না ভারত দেশভাগ স্বাধীনতা বই পড়ার সময় মাঝে মধ্যেই ভক্তিতে তার পায়ের বা জুতার ধুলো কপালে ঘষতে খুব ইচ্ছা করে। কি দয়ালু, কি মানবতাবাদী মানুষ। তিনি হিন্দু মুসলিম সব মানুষের আপন ভাই। তিনি হিন্দু মুসলিম সব মানুষের দয়ালু হৃদয়বান পিতা, বাংলাদেশ ভারত পাকিস্তান বার্মা আফগানিস্তান সহ সব দেশের সব মানুষের একান্ত আপন মানুষ, তাঁর লেখা পড়ে আমার তাই মনে হয়েছে। মহাভারতে মা গান্ধারীর যে সমদর্শি ব্যবহার দেখতে পাই কৌরব ও পাণ্ডবদের প্রতি সেই মা গান্ধারীর সমদর্শি ব্যবহারের চেয়েও বেশি সমদর্শি ব্যবহার বা আচরণের দরদী মনের পরশ পাই যশবন্ত সিংহের হিন্দু মুসলিম সম্পর্কে। শ্রদ্ধেয় যশবন্ত সিংহ তার এই বই লিখে তিনি প্রমাণ করেছেন তিনি এ সময়ের মহাভারত গ্রন্থের সেই সঞ্জয় ও বিদুর।

মানবতাবাদী নেতা পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, ভারত সিংহ লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, রাষ্ট্র গুরু সুরেন্দনাথ ব্যানার্জীর দয়া ও সমর্থনে লখনৌতে ১৯১৬ সনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সাথে লখনৌ চুক্তি স্বাক্ষর হয় এই চুক্তিতে প্রশাসন এবং আইন সভায় মুসলীমদের জন্য ৩০ ভাগ আসন সংরক্ষণ করা হয় যদিও ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা ২৫ভাগ, কিন্তু যেহেতু মুসলিমরা পিছিয়ে আছে সেজন্য অতিরিক্ত ৫ভাগ ওয়েটেজ বা ক্ষতিপূরণ কোটা দেওয়া হয়।

আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের সংখ্যা ১০ ভাগ ভারতে মুসলমানদের সংখ্যা ২৫ ভাগ, কিন্তু যেহেতু দেশ বিভাগের জন্য বাংলাদেশের হিন্দুরা এবং ভারতের মুসলমানেরা অনেক পিছিয়ে পড়েছে সেজন্য ভারতে ৫ভাগ অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ কোটা সহ ৩০ ভাগ সমস্ত চাকুরী যেমন সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিচারক নিয়োগ শিক্ষক নিয়োগ সর্বক্ষেত্রে চাকুরীর কৌটা সংরক্ষন করা একান্ত উচিত।

অনুরূপভাবে বাংলাদেশে পিছিয়ে পড়া হিন্দুদের জন্য জনসংখ্যায় তারা দশ ভাগ হলেও ৫ভাগ অতিরিক্তসহ ১৫ ভাগ সর্বস্তরের সেনাবাহিনী পুলিশ বাহিনী পাবলিক সার্ভিস কমিশন বিচারক নিয়োগ শিক্ষক নিয়োগ সর্বক্ষেত্রে চাকুরীর কৌটা সংরক্ষন করা একান্ত উচিত। তবেই ১৯১৬ সাল থেকে ১৯২৮ পর্যন্ত ভারত বর্ষে হিন্দু মুসলিম যে সুসম্পর্ক বজায় ছিল তা থাকবে। কয়েকদিন আগ পর্যন্ত আমি হিন্দু মুসলিমদের পৃথক নির্বাচনের পক্ষে ছিলাম, কিন্তু কয়েকদিন আগে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায়ের একটি লেখা পড়ে আমি সে চিন্তা থেকে দূরে চলে এসেছি বা তা সমর্থন করিনা। শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন "যদি পৃথক নির্বাচন থাকে হিন্দুরা হিন্দুদের ভোট দেয় মুসলমানরা মুসলমাদের ভোট দেয় তাহলে হিন্দু হিন্দুই থাকবে, মুসলমান মুসলমানই থাকবে, কোনদিন আধুনিক সভ্য মানুষ হতে পারবে না।" অন্নদাশঙ্কর রায়ের এ লেখা পড়ার পরে আমি আর পৃথক নির্বাচন চাই না।
৭.২.২০১০, রবিবার ভোর ৬টা

www.pathagar.com

সরদার আবদুস সাত্তার, মহানগর দায়রা জজ বশিরউল্লাহ এবং মইনুস সুলতান

সরদার আবদুস সাত্তারের সাথে আমার পরিচয় হয় ১৯৮০ দশকের ৮৬/৮৭ সনের কোন একদিন আহমদ ছফা ভাইয়ের ঢাকার হাতিরপুল বাজারের কাছে পরিবাগের নাহার প্লাজার পিছনের বাসায়। ছফা ভাই পরিবাগের ওই বাসায় ভাড়া থাকতেন, আমার বাসাও হাতিরপুল বাজারের পাশেই। মাঝে মধ্যে ছফা ভাইয়ের বাসায় যেতাম পাড়া-পড়শি, গুরু শিষ্য হিসেবে দেখা করতে। একদিন আমি গিয়ে সরদার আবদুস সাত্তার সাহেবকে দেখতে পাই। ছফা ভাই পরিচয় করিয়ে দেন "সরদার আবদুস সাত্তার, জ্ঞানী মানুষ, ঢাকার আলিয়া মাদ্রাসার বাংলার অধ্যাপক।" ওই দিনের ওই প্রথম পরিচয় সাত্তার ভাই স্মরণে রেখেছেন যে কারণে তা হচ্ছে আমরা তিনজনে ছফা ভাই, সাত্তার সাহেব আমি বাসার ভেতরে ছিলাম, কে যেন বাসার প্রবেশ দরজার বাইরে থেকে তালা লাগাবার ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে যায়। আমরা বাসার ভিতর থেকে বের হতে পারি না, ছফা ভাই, কবি শিল্পী লেখক, সাত্তার ভাই সাহিত্যিক দুই জনে খুব ভয় পেয়ে যান, খুবই নার্ভাস হয়ে যান। আমি এদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা– আমি বলি ছফা ভাই ভয় পাবেন না আমি আছি সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দুজনেই খুব ভয় পেয়ে যান। তখন নাহার প্লাজা ও ইস্টার্ন প্লাজার রাস্তায় এত যানবাহন ও মানুষের ভিড় ছিলো না। খুব অল্প লোকজন চলাফেরা করত, নাহার প্লাজা হয় নাই, ইস্টার্ন প্লাজাও চালু হয় নাই।

যাক আমি রাস্তায় চলাচলকারী একজনকে জানালা দিয়ে জোরে ডাকা শুরু করি ভাই এদিকে একটু আসেন, আমরা বিপদে আছি। আমার চিৎকার ও ডাক শুনে একভদ্রলোক কাছে আসেন, তাকে বলি আমাদের বাসার প্রবেশ দরজায় কে যেন তালা লাগাবার ছিটকিনি বাহির থেকে বন্ধ করে দিয়েছে। দয়া করে উপরে ২য় তলায় এসে ছিটকিনি খুলে দেন। ভদ্রলোক দোতলায় এসে ছিটিকিনি খুলে দেন। আমরা সস্তির নিশ্বাস ফেলি। ছফা ভাই সাত্তার সাহেব দুজনেই ভেবে পান না আমার মাথায় এমন বুদ্ধি কিভাবে এলো, আর ঐ লোকই বা কেন এত দূর থেকে দোতলায় এসে ছিটকিনি খুলে দিয়ে গেল। আমি বলি জগতের বেশির ভাগ সাধারণ মানুষই ভাল খারাপ আধুনিক কবি, সাহিত্যিক সাংবাদিক, প্রফেসর, আমলা এরা। এই লোকটি যদি কবি, সাহিত্যিক, আমলা হতো তাহলে আমার ডাকে আসতো না বরং বিরক্ত হতো। ঐ দিন সরদার আবদুস সাত্তার ভাইয়ের সাথে পরিচয় হবার সময় তাকে দেখে আমি বলি আপনাকে দেখে রবীন্দ্রনাথের চেহারার কথা মনে হয়। আর মনে হয় মহাত্মা গান্ধীর কথা "গুরু দেবের পায়ের কাছে বসে থেকে যে শান্তি সুখ পাই তা অন্য কোথায়ও পাইনা।" আমারও আপনার পায়ের কাছে বসার ইচ্ছা করছে। ছফা ভাই আমার কথা সমর্থন করেন, সাত্তার ভাই আমার কথা বাচালতা বা উপহাস বলে উড়িয়ে দেন।

www.pathagar.com

সরদার আবদুস সাত্তারের সাথে পরিচয় হবার পর বিশ বছরের বেশি সময় পার হয়েছে। এর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনায় অনেক পানি প্রবাহিত হয়েছে, সূর্যদেব বা রবি মামা তার তাপে সাগরের অনেক পানি সিদ্ধ করেছেন তা থেকে অনেক বাষ্প ও মেঘ সৃষ্টি হয়ে পাহাড় পর্বতে অনেক পানি বর্ষিত হয়েছে সে পানি পদ্মা, মেঘনা, যমুনা দিয়ে আবার সাগরে পড়েছে। সাত্তার ভাইয়ের সাথে পরিচয় হবার পরে ২০০১ সনের ২৮ জুলাই আমাদের গুরু আহমদ ছফা ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন, সরদার আবদুস সাত্তার ঢাকার ঐতিহাসিক আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপনা থেকে ময়মনসিংহ আনন্দ মোহন কলেজ, মানিক গঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজে চাকরী করে নারায়নগঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যক্ষগীরি করে শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক পদে চাকরি করে অবসরে গিয়েছেন ২০০৯ সনের অক্টোবর মাসে। গত ২০ বছরে সরদার সাত্তারের যে সব লেখা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার অনেকটা পড়েছি, পরে ফোন করেছি কথা বলেছি লেখা নিয়ে সাথে অন্য বিষয়েও। এর মধ্যে দুটি বই রবীন্দ্রনাথ আমাদের লোক ও ধূপছায়া" থেকে পড়ি। রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই লোক বইয়ে ২৮০ পৃষ্ঠায় ২৮টি প্রবন্ধ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের উপরে, যা সরদার আবদুস সাত্তার ভাই অনেক দরদী মন ও প্রাণ দিয়ে লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার, লেখকদের জীবন দেবতা, কতকিছু রবীন্দ্রনাথের লেখা ও জীবন সম্পর্কে তুলে ধরেছেন আমাদের প্রিয় সাত্তার ভাই তার লেখায়, তা পড়ে আমি মুগ্ধ ও অভিভুত হয়ে পড়ি। ময়মনসিংহের 'ধূপছায়া থেকে' লেখা বিভিন্ন চিঠি নিয়ে তার বই, একশ ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার এই ধূপছায়া থেকে যাদের চিঠি লিখেছেন তারা হলেন- চন্দ্রাবতী, মোপাসা, জীবনানন্দ দাশ, রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সখিনা, শবনম, বিজয়া, পুঁথি গবেষক খন্দকার মোজাম্মেল হক, সৈয়দ আলী আহসান, হুমায়ুন আহমেদ, বিটোফেন, আবু তাহের মজুমদার, চক্রবাঁকের কবি, সুচিত্রা সেন, কোনো এক বীরাঙ্গনার কাছে, সতেরজনের কাছে সতেরটি লম্বা হৃদয়গ্রাহী, প্রাণগ্রাহী, মন উতালা করা আবেগ ও বুদ্ধিদীপ্ত এবং অনেক অজানা অথচ খুবই প্রয়োজনীয় তথ্যে ভরপুর চিঠি। যে চিঠিগুলো আমাদের বাংলা সাহিত্যে এক নতুন প্রাণ ও জোয়ারের সৃষ্টি করেছে।

সৈয়দ আলী আহসান সাহেব ও বর্তমান বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হুমায়ুন আহমদ তাদের রচনাবলীর ভুমিকা লিখিয়েছেন সর্দার আবদুস সাত্তার সাহেবকে দিয়ে। এ থেকে প্রমাণ পাওয়া সর্দার আবদুস সাত্তার কত উঁচুস্তরের একজন পণ্ডিত।

৫.০২.২০১০ তারিখ শুক্রবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আ ন ম বসিরুল্লাহর ধানম-ণ্ডি ৫ নম্বর রোডের বাসায় যাই বিকেলে। ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের এ্যাডভোকেট আমার ছোট বোন নূরজাহান খান উজ্জল এর কথামতো আটমাস যাবৎ অস্ত্র মামলায় জেল হাজতে আছে এমন এক ব্যক্তির জামিনের তদবিরে, বসিরুল্লাহ না করে বলেন "আমি কোনো অস্ত্র মামলার আসামীকে জামিন দেই না, এটাও দেয়া সম্ভব নয়।" জবাবে আমি বলি তোমার কথা বাংলাদেশের সংবিধান বিরুদ্ধ, সংবিধানের প্রথমেই রয়েছে বিনাবিচারে বাংলাদেশের কোনো লোককে জেল-হাজতে রাখা যাবে না,

www.pathagar.com

এছাড়াও আমাদের পাশে পশ্চিম বাংলায় আটকোটি মানুষ, সেদেশের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের একটি বক্তৃতা দৈনিক ইত্তেফাকে পড়লাম, তিনি বলেছেন ১৯৭৭ সন থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিম বাংলায় ক্ষমতায় এসে একজন লোককে বিনা-বিচারে জেল হাজতে আমরা রাখি নাই, পুলিশ যেদিন কাউকে গ্রেফতার করে পরেরদিনই কোর্ট থেকে জামিন পায়। প্রয়াত জ্যোতি বসু যেদিন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন সেদিনই প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে তিনি বলেছেন- "আমি নিজে বিনা-বিচারে জেল-হাজতে বন্দী ছিলাম, আমি এবং আমার দল যতদিন পশ্চিম বাংলার ক্ষমতায় থাকবে, একজন লোক একদিনও যেন বিনা-বিচারে জেল-হাজতে না থাকে", আমরা জ্যোতি বসুর সে নির্দেশ আজও মেনে চলছি, মহানগর দায়রা জজ বসিরুল্লাহকে আরও বলি- অভিযুক্তের শরীর বা নিকট থেকে অস্ত্র উদ্ধার করা হয় নাই, একটি হাইস্কুলের বিদ্যুতের খুটির নিচ থেকে অস্ত্র বের করে র‍্যাব বলছে অভিযুক্তের কথা অনুযায়ী অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে, এ বক্তব্য কতটুকু সত্য তা বিচার-বিশ্লেষণ করার দাবি রাখে। বিশেষ করে র‍্যাব সম্পর্কে অনেক কথা উঠেছে যে, এরা প্রায় এক হাজার মানুষ গত সাত বছরে মেরেছে। এর মধ্যে নাকি মাত্র একশজনের মতো মৃত্যুদণ্ড পাবার মতো অপরাধি, বাকিদের নামে নাকি তেমন কোনো অভিযোগ নেই, বিত্তবান বা শত্রুপক্ষের লোকদের কাছ থেকে র‍্যাব অর্থ নিয়ে ক্রস ফায়ারের নামে বিনা-বিচারে মানুষ হত্যা করে, জানি না এ বক্তব্য সত্য না মিথ্যা তবে কথা যেহেতু উঠেছে কাজেই র‍্যাবের কার্যকলাপ সতর্কতার সাথে দেখা উচিৎ। পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে জনগণের মধ্যে অনেক বিরূপ কথা থাকলেও আজ পর্যন্ত র‍্যাব সম্পর্কে যে কথা উঠেছে এমন ভয়ঙ্কর কথা ওঠে নাই। কয়েকদিন আগে র‍্যাবের ডিজি সাংবাদিকদের বলেছেন যে, গত সাত বছরে ১২শত র‍্যাবের সদস্য ডাকাতি, রাহাজানি ও বেআইনী কাজে জড়িত হয়ে শাস্তি পেয়েছে। এছাড়াও যে কোন মানুষকে হত্যা মামলা ছাড়া প্রথম একটি মামলা বা অন্যায় সহানুভুতির সাথে বিবেচনা করে দেখা উচিৎ। কাজেই আমি যার জন্য সুপারিশ করছি সে র‍্যাব কর্তৃক আটক। কাজেই এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অভিযুক্তকে জামিন দেয়া উচিৎ। জবাবে মহানগর দায়রা জজ বসিরুল্লাহ বলেন 'এ বিষয়ে আমি আপনার কোনো যুক্তি-তর্ক শুনতে চাই না, আমি যুক্তি দ্বারা চলি না, বিশ্বাস দ্বারা চলি।' মহানগর দায়রা জজ আ ন ম বসিরুল্লাহ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জীবনে অযৌক্তিক গোঁড়া আবেগ সর্বস্ব কাল্পনিক হৃদয়হীন মার্কসবাদী ছাত্র ইউনিয়ন বা মস্কো কমিউনিস্ট রাজনীতির একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক ছিল। আজও তার মুখ থেকে শুনলাম সে যুক্তির কথা শুনতে চায় না, সে বিশ্বাস দ্বারা চলে, আর যে মানুষ রেশনাল চিন্তাভাবনা বা যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয় না তাকে উন্নত মানের মানুষ বলা যায় না, সে যেই হোক।

বসিরুল্লাহ আমাকে আন্তরিকতার সাথে চা-নাস্তা করান। দেখলাম বসিরুল্লাহর চিন্তা-চেতনায় অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন সে মৌলভী রেখেছে তার মেয়েকে কোরআন পড়া শেখানোর জন্য। সে নিয়মিত পাঁচবার নামায পড়ে। ড্রইং রুমে অনেক ইসলামি ধর্মীয় বই। বশিরুল্লাহ আর আমি সূর্যসেন হলে একসময়ে অবস্থান করি। বশিরুল্লাহ

www.pathagar.com

ছিল বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। আমি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা বা নেতৃস্থানীয় কর্মী। বশিরুল্লাহ সূর্যসেন হল ছাত্র সংদের ভিপির পদে এবং শত কোটি টাকার মানুষ নূর আলী বশিরুল্লাহর সাথে সাধারণ সম্পাদকের পদে নির্বাচন করে এবং ছাত্রলীগের কাছে হেরে যায়। ১৯৭৫ সনের ৭ নভেম্বর তথাকথিত সিপাহী জনতার বিপ্লবের দিন সূর্যসেন হলের ৫২৬/ক রুমে বশিরুল্লাহসহ ছাত্র ইউনিয়নের ২০-২৫ জন ছাত্র এক রুমে থাকতো (এসব রুম এখন হাউজ টিউটরদের কোয়ার্টার)। সকালে জাতীয় ছাত্রদল (ভাসানীপন্থী, জিয়াপন্থী নয়) বিপ্লবী ছাত্রইউনিয়ন এবং জাসদ ছাত্রলীগের সূর্যসেন হলের নেতাকর্মীরা দা-কুড়ালসহ অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে এসে ওই রুমের সামনে দাঁড়ায়। বশিরুল্লাহসহ ছাত্র ইউনিয়নের ওই রুমের ২০-২৫জনকে হত্যা করবে। আমি আক্রমণকারী নেতাকর্মীদের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানাই এটা করা ঠিক হবে না, তারা বলে "সবখানে সেনাবাহিনী রুশ-ভারতের দালালদের হত্যা করছে," জবাবে আমি বলি সেনাবাহিনীর সদস্যরা আসুক যদি হত্যা করে তারাই এদের হত্যা করুক, আপনারা কেন একজন ছাত্র হয়ে আরেকজন সহপাঠী ছাত্রকে হত্যা করে কলঙ্কিত হবেন। আর যদি এদের মারেন আগে আমাকে মারেন, আর আপনারা সবাই জানেন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, আমি বাকশাল বিরোধী, আমি তাজউদ্দিনের ভক্ত বা শিষ্য। সবাই আমার কথা মেনে নিয়ে অস্ত্র নিচু করে ফিরে যায়। এসব কথা বশিরুল্লাহর সামনে হয়, আসন্ন মৃত্যুর ভয়ে বশিরুল্লাহসহ সবাই কাঁপছিল। আমার সাহস ও কথা শুনে ওই রুমে ২০-২৫জন অবস্থিত ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা আমার খুব ভক্ত হয়ে পড়ে, এদের মধ্যে এনায়েত উল্লাহ একজন, এখন সে গার্মেন্টস এর ব্যবসা করে শত কোটি টাকার মানুষ। এই এনায়েত উল্লাহ এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই বলে, আমি আর ছাত্র ইউনিয়ন করবো না, যে দলে বাবলু ভাইয়ের মতো নেতা আছে সেই দল ছাত্রলীগ করবো, সে ছাত্রলীগে যোগ দেয় এবং ছাত্রলীগ থেকে ডাকসুর সদস্য হয়, এখন শত কোটি টাকার মানুষ হবার পরে আমার সাথে দেখা হলে এই এনায়েত উল্লাহ আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও উপহাস করে। কিন্তু বশিরুল্লাহসহ ওইদিন ওই রুমে অবস্থানকারী ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা আমাকে সম্মান ও সমীহ করে। ঢাকা মহানগরের দায়রা জজ বশিরুল্লাহকে সূর্যসেন হলের সবাই ভালোবাসতো। সে সহজ-সরল একজন সৎ ভাল মানুষ ছিল। পটুয়াখালী জেলার অনেক বড় জোদ্দার পরিবারের সন্তান বশিরুউল্লাহ, সূর্যসেন হলের ছাত্র জীবনে (১৯৭৪ থেকে ১৯৮০) বশিরুউল্লার কাছ থেকে যখন শুনতাম তাদের বাড়িতে ৪০০ মহিষ ও ১০০ গাভী আছে তা শুনে আশ্চর্য হয়ে যেতাম, ল'অনার্সের ছাত্র ছিল, সূর্যসেন হলে থাকা অবস্থায় প্রথম শ্রেণীর মার্কসবাদী বা নাস্তিক ছিল, এখন ৫.০২.২০১০ তারিখ সে প্রথম শ্রেণীর নামাযী ও ইসলামীক মূল্যবোধের একনিষ্ঠ ভক্ত। সে আমাকে দিনে পাঁচবার নামায পড়ার জন্য বলে, জবাবে আমি বলি আমি প্রাইমারী ও হাইস্কুলে পড়ার সময় নিয়মিত পাঁচবার নামায পড়েছি কিন্তু কলেজ বা যুবককাল থেকে মাঝেমধ্যে মন যখন চায় তখন নামায পড়ে আসছি এবং এখনও তাই করি, মন যখন চায় নামায পড়ি, কিশোরকাল থেকেই মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র বিরোধী এখনও মার্কসবাদ ও

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্রবিরোধী। বশিরুল্লাহ কিশোর ও যুবক বয়সে ঘৃনিত মার্কসবাদী রাজনীতি করলেও সে তার বাসায় আমাকে আদর-আপ্যয়ন করে চা নাস্তা খাওয়ায় এবং রাস্তা পর্যন্ত এসে বিদায় দেয়। তার সৌজন্যবোধে খুশি হলাম, অন্য সাবেক ও বর্তমান অনেক মার্কসবাদীদের মতো ইতর বা অসভ্য নয় বশিরুল্লাহ।

সরদার আবদুস সাত্তারের কথা লেখা লিখতে গিয়ে কেন এতক্ষণ বশিরুল্লাহর কথা লিখলাম তার কারণ হচ্ছে, ৫.০২.২০১০ শুক্রবার সন্ধ্যায় বশিরুল্লাহর পাঁচ নম্বর ধানমণ্ডি রোডের বাসা থেকে মন খারাপ করে বের হয়ে হাটতে হাটতে ধানমণ্ডি ৪ নম্বর রোডের মাথায় মিরপুর রোডে জ্ঞানকোষ নামক বইয়ের দোকানে প্রবেশ করি। খুব উন্নতমানের বইয়ের দোকান জ্ঞানকোষ, অনেক সুন্দর সুন্দর বইয়ের সমাবেশ। এই জ্ঞানকোষের মালিক শাহেদ আমার মায়ের চাচার মেয়ের মেয়ের জামাই, মানে আমার খালাত বোনের জামাই, তেমন পরিচয় নাই শাহেদের সাথে। একদিন আমাদের তামাই গ্রামে শাহেদ গেলে স্নেহভাজন মোয়াজ্জেম হাফেজ তার বাড়িতে শাহেদসহ আমাকে দাওয়াত খাওয়ায়। এরপর জ্ঞানকোষ বইয়ের দোকানের মালিক শাহেদের সাথে আর কোনো দেখা হয় নাই। ৪ নম্বর রোডে এই জ্ঞানকোষ দোকানে ৫.০২.২০১০ তারিখে বশিরুল্লাহর ৫ নম্বর রোডের বাসা থেকে প্রবেশ করে যে সুন্দর সুন্দর বই রয়েছে তার মধ্যে দুটিবইয়ের প্রতি আমার নজর পড়ে, একটি সরদার আবদুস সাত্তারের ‘কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে’, অপরটি মইনুস সুলতানের ‘সংসার ভাসে জলে’। এই বই দুটির গেটআপ-মেকআপ প্রকাশনার ছাপা ও বাধাইয়ের কোয়ালিটি দেখে মুগ্ধ হয়ে আবেগ বিহ্বল হয়ে পড়ি। এমন সুন্দর বই আমাদের বাংলাদেশ ঢাকা থেকে বের হয়? অসাধারণ সুন্দর দুটি বই। সাথে সাথে আবেগতাড়িত হয়ে মোবাইল থেকে সরদার আবদুস সাত্তারকে ফোন করে তার ‘কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে’ বইয়ের কথা বলি। তিনি বলেন “বাবলু ভাই আমার কাছে বই নেই, প্রকাশক বই দিয়ে গেলে আপনাকে ফোন করবো, বই নিয়ে যাবেন অথবা পাঠিয়ে দেব।”

পরেরদিন ৬.০২.২০১০ শনিবার অনেকদিনের পুরনো বন্ধু কামাল আনোয়ার ফোন করে বলে “ওস্তাদ বইমেলায় এসেছি তুমি নেই, খুব খারাপ লাগছে, বসে রইলাম তাড়াতাড়ি চলে এসো।” সকালে ফজরের নামায পড়ে বের হয়ে বেলা ১১টা পর্যন্ত গলফ খেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রাক্তন ছাত্রদের অনুষ্ঠানে (আমি সূর্যসেন হলের ছাত্র সলিমুল্লাহ হলের নই) যোগদান করে দুপুরের লাঞ্চ খেয়ে বিকাল ৫টায় বাসায় আসি। এমন সময় বন্ধু কামাল আনোয়ারের ফোন, কামাল একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ, তাকে আমি সম্মান করি, সেও আমাকে খুব ভালোবাসে, বাধ্য হয়ে গোসল করে বাংলা একাডেমীর বইমেলায় যাই। বইমেলায় গিয়ে কামালের সাথে এবং কামালের গ্রামের মানুষ সোনারগাঁয়ের ইতিহাসের লেখক শামসুদ্দোহা চৌধুরীর সাথে দেখা হয়। শামসুদ্দোহা চৌধুরীর বই সোনারগাঁয়ের ইতিহাস কামাল আমাকে দেয়, ইতিহাস আমার অন্যতম প্রিয় বিষয়। ইতিহাসের বই বা লেখা পড়ে আনন্দ পাই, শামসুদ্দোহা চৌধুরীর বইয়ের দুইচার পৃষ্ঠা সাথে সাথে তার সামনেই পড়ি, দুইএকটি

www.pathagar.com

তথ্য শামসুদ্দোহাকে জিজ্ঞাস করলে সে দেখলাম, আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে বললেন "আমার কাজ আছে আমি চললাম।"

যাক, শামসুদ্দোহা চৌধুরী চলে যাবার পরেই অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হলো লেখক সিলেটের ঐতিহাসিক পৃত্তিমপাশার জমিদার বংশের সন্তান মঈনুস সুলতানের সাথে, প্রায় ২৫ বছর পরে। মঈনুস সুলতানের সাথে তার বন্ধু খালেদ মঈনুদ্দিন আরব-বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিএমডি রয়েছে। আমি মঈনুস সুলতানকে দেখে অভিভুত হয়ে পড়ি এবং বলি কি আশ্চর্য গতকাল ধানমণ্ডির জ্ঞানকোষ বইয়ের দোকানে তোমার 'সংসার ভাসে জলে' বই দেখলাম। আর আজ তোমার সাথে পঁচিশ বছর পরে দেখা হলো, মঈনুস সুলতানও খুব খুশি হলো। মঈনুস ছাত্র হিসেবে আমার তিন-চার বছরের জুনিয়র। ১৯৭৭ সনে যখন আমি সাপ্তাহিক অগ্নিবীণায় কাজ করি তখন মঈনুস সুলতান ও তার সমবয়সের অনেকের গল্প ও কবিতা অগ্নিবীণা পত্রিকায় ছাপি। জাফর ওয়াজেদ, কামাল চৌধুরী, সলিমুল্লাহ খান, আওলাদ হোসেন, আলমগীর রেজা চৌধুরী খালেদ মঈনুদ্দীনসহ অনেকের। মঈনুস আমার বেশ ভক্ত ছিলো। সে সূর্যসেন হলে আমার রুমেও মাঝেমধ্যে থেকেছে। আমার সাথে ঢাকা শহরের দু'চারটি বাড়িতে গিয়েছে। এতদিন পরে দেখা হবার পর বললাম, তোমাকেতো একজন ভালমানুষ হিসেবে জানতাম, তুমি কি সেই আগের মতো ভালো মানুষই আছো?, নাকি বদলে গিয়ে খারাপ মানুষ হয়েছো? সে বলল– "না বাবলু ভাই আমি আগের মতো ভালো মানুষই আছি।" তখন আমি মঈনুসকে বললাম তাহলে চলো তোমাকে চা-নাস্তা খাওয়াবো, কামাল, আমি, মঈনুস সুলতান এবং এবি ব্যাংকের ডিএমডি খালেদ মঈনুদ্দিন বাংলা একাডেমীর ক্যান্টিনে বসে খুবই খারাপ স্বাদের চা ও ভেজিটেবল রোল খেলাম। মঈনুস বলে "বাব-লু ভাই, কাল সকালে আমেরিকা চলে যাচ্ছি, আপনি আমার বই দেখেছেন আমি দেখি নাই, চলেন অবসর প্রকাশনীতে আমার বই আসবার কথা আছে দেখি আছে কি-না।" আমরা চারজনে বাংলা একাডেমীর বইমেলায় অবসর পাবলিকেশনের বইয়ের দোকানে যাই। মঈনুস সুলতান তার বই দেখে। আমি মঈনুস সুলতানকে বলি তুমি বিদেশে থাকো, ধনী মানুষ, তোমার বই আমি টাকা দিয়ে কিনবো না, তুমি কিনে দাও। মঈনুস বলে "আমি ধনি মানুষ না, তারপরেও আপনাকে আমি বই কিনে দিচ্ছি," মঈনুস সুলতানের পাবলিশার অবসর প্রকাশনা থেকে বই কিনে আমাকে দেয়, বইয়ে লিখে দেয়, 'অনেকদিন পর বাবলু ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, এটা আসলেই এক্সাইটিং', মঈনুস সুলতান, ৬.০২.২০১০। মঈনুস সুলতানের লেখা 'সংসার ভাসে জলে' তার ভিয়েতনামে কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় এবং ভিয়েতনামের নানা ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, যা খুবই জীবন্ত ও আকর্ষণীয় ভাষায় মঈনুস সুলতান আমাদের বা পাঠক-পাঠিকাদের জন্য তুলে ধরেছে বলে বইটি পড়ে আমার মনে হলো। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে ভিয়েতনামে গিয়ে ভিয়েতনাম সম্পর্কে যে তথ্য ও জ্ঞান পাবেন ৩০০ টাকায় মঈনুস সুলতানের লেখা 'সংসার ভাসে জলে' বইটি ক্রয় করে পড়ে তার চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞান পাবেন বলে আমার ধারণা।

www.pathagar.com

৯.০২.২০১০ তারিখ মঙ্গলবার সকালে সরদার আবদুস সাত্তার ভাই টেলিফোন করে বলেন "বাবলু ভাই গতকাল রাতে পাবলিশার বই দিয়ে গিয়েছে, আপনি এসে বই নিয়ে যান।" আমি বলি আমি আজই বেলা ১২টা নাগাদ আপনার বাসায় আসবো। বেলা ১২টায় ৯৪ নম্বর কাকরাইল লিফটের ৫ তলায় সাত্তার ভাইয়ের বাসায় উপস্থিত হই। তিনি আমাকে তার অসাধারণ সুন্দর 'কথাসাহিত্যের আঙিনায়' দাঁড়িয়ে বইটি উপহার দেন, লিখে দেন প্রিয় বাবলু ভাইকে শুভেচ্ছাসহ, সরদার সাত্তার, ৯.০২.২০১০। সাত্তার ভাইয়ের বাসায় গিয়ে তার কাছে যে কথাটি শুনে দুঃখে বুকের মধ্যে হুহু করে উঠলো এবং কান্নাভেজা চোখের জলে যে কথাটি লিখছি তা হচ্ছে তিনি নাকি অন্ধ হয়ে যাচ্ছেন, চোখের পঁচাত্তর ভাগ পাওয়ার কমে গেছে পঁচিশ ভাগ বাকি আছে এটাও অল্পদিনের মধ্যে নষ্ট হবে। আমার চেয়ে মাত্র তিন বছরের সিনিয়র এত অল্প বয়সে মাত্র ৫৭ বছর আর উনি আজ অন্ধ হবেন গ্লুকোমিয়া রোগে। আমি সান্তনা দেবার জন্য বলি সাত্তার ভাই আবুল হাশিম, ইংরেজ কবি মিল্টন, গ্রীক কবি হোমার অন্ধ হয়ে বেঁচে ছিলেন, অন্ধ হয়েই বেশি লিখেছেন, মঙ্গলবার নিয়ে এসে কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে বই আমি সম্পূর্ণ পড়ি নাই। ছাব্বিশটি অধ্যায়ে ছাব্বিশটি বিষয় ও ব্যাক্তির লেখা মূল্যায়ন করে বিচার-বিশ্লেষণ করে ৩৮৪ পৃষ্ঠার উন্নত কাগজের উন্নত বাঁধাই উন্নত ছাপার বই।

কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে বইতে যাদের নিয়ে লেখা রয়েছে– ফারাক্কা বাঁধ, জলবতি প্রান্তরের জীবন, জলরাক্ষস, জল ছুঁয়ে চলা জীবনের গান, পথ ও অরণ্যের কথাকার, গ্রাম-বাংলার জনজীবন, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, সরদার জয়েনউদ্দিন, আহমদ ছফা, সমরেশ বসু, অসীম রায়, অমিয় ভূষণ মজুমদার, শওকত ওসমান, শহীদুল্লাহ কায়সার, পূর্নেন্দু পুত্রী, হাসান হাফিজুর রহমান, হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, হুমায়ুন আহমেদ, খায়রুল আলম সবুজ, সৈয়দ মোস্তফা সিরাজ, আতা সরকার, আবু ইসহাক, রশিদ করিম, শামসুদ্দিন আবুল কালাম, শেষ লেখাটি সবচেয়ে বড় একপঞ্চাশ পৃষ্ঠার লেখার নাম 'উৎস ও অর্জনের দিকে ফিরে তাকানো'। গত মঙ্গলবার কথাসাহিত্যের আঙিনায় দাড়িয়ে বই পাওয়ার পরে গতকাল বুধবার এ বইয়ের ৫-৬টি লেখা পড়েছি, ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়া সাহিত্যে স্থান, আহমদ ছফার উপন্যাস, নিলু দাসের সাহিত্য, সমরেশ বসু তাঁর শিল্প ও সংগ্রাম, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়সহ কয়েকজনের।

আজ বৃহস্পতিবার, ১১.০২.২০১০ তারিখ ভোররাতে ঘুম ভাঙে, গতকাল আমার বাসার সামনে কাঁটাবন মসজিদের পিছনে রিক্সার ধাক্কার আঘাতে পড়ে যাই, বড়ধরনের আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা পেলেও হাতে চোট পেয়েছি, অল্প রক্ত পড়েছে। সকালে গলফ খেলা ও মসজিদে গিয়ে ফজরের নামায পড়ার উৎসাহ পেলাম না। বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে সরদার আবদুস সাত্তারের লেখা ও তার কথা মনে ভাবনা এসে পড়ে বারে বারে। আমার মনে হতে থাকে গতকাল রিক্সা থেকে পড়ে গিয়ে যে আঘাত পেয়েছি তা সরদার আবদুস সাত্তারকে নিয়ে লিখার সময়ের জন্য। যদি আঘাত না পেতাম মসজিদে ফজরের নামায ও মাঠে গলফ খেলতে যেতাম, এই যে আজ বিছানায় রয়েছি, বাহিরে যাই নাই

www.pathagar.com

তার কারণ সরদার আবদুস সাত্তারের জন্য কিছু লেখার জন্য। মাথার মধ্যে বিচিত্র এসব কথা-বার্তা ঘুরতে থাকে, যে লোক এত লোকের লেখা ও সৃষ্টি নিয়ে এত লিখে যাচ্ছেন নিরবে-নিভৃতে তাকে নিয়ে কি কেউ কিছু লিখেছেন? সরদার আবদুস সাত্তার সাহেব এমন অনেক লেখকদের লেখা আলোচনা করেছেন, যাদের লেখা সম্পর্কে সরদার আবদুস সাত্তারের লেখা পড়ে নিলে বুঝতে খুব সহজ হয়। বাংলা ভাষার লেখকদের এমন দরদী মন নিয়ে কে বিচার-বিশ্লেষণ করেছে সরদার আবদুস সাত্তার ছাড়া। রবীন্দ্রনাথের বিচার-বিশ্লেষণ করে অনেক বই আছে, কিন্তু 'রবীন্দ্রনাথ আমাদেরই লোক' এ বইয়ের সমমানের বই কি আর আছে? সরদার আবদুস সাত্তারের মুখের সাথে রবীন্দ্রনাথের মুখের মিল, আমার সবসময় ইচ্ছা করে সরদার সাত্তার ভাইয়ের পায়ের কাছে বসতে। কিন্তু আমি মোটা মানুষ ফ্লোরে নিচে বসতে পারি না, তাই সে আশা পূরণ হয় নাই। প্রায়ই মনে হয় সাত্তার ভাইয়ের পায়ের কাছে বসতে পারলে কত না সুখ-শান্তি পাওয়া যাবে। আজ ১১.০২.২০১০ তারিখ বৃহস্পতিবার ভোর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে আমার প্রিয় সরদার আবদুস সাত্তার ভাইকে নিয়ে তার কথা সাহিত্যের আঙিনায় দাঁড়িয়ে বই পড়ে যে চিন্তা চেতনার উদয় হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখা।

বাংলা ভাষার সমালোচনা সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের মধ্যে দক্ষিণ বাংলা চট্টগ্রামের সন্তান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শশাঙ্ক মোহন সেন, আর বাঙালি মুসলমানদের সন্তান আমাদের প্রিয় সাত্তার ভাই উত্তরবঙ্গের সন্তান, এ দুজনের কোনো তুলনা নেই। বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে শশাঙ্ক মোহন সেন এবং সরদার আবদুস সাত্তার সবার শীর্ষে এ দু'জনের ধারে কাছেও কেউ নেই, যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকুন আমাদের সাত্তার ভাই সবল-সুস্থ দেহ মনে, আমরা তাই চাই। বাংলাদেশের দক্ষিণের শেষপ্রান্তে বিশাল সমুদ্র। আর এই সমুদ্রের পাড়ের শহর চট্টগ্রাম, এই চট্টগ্রামের সন্তান শশাঙ্ক মোহন সেন ১৯২০-৩০-৪০ এর দশক ত্রিশ বছর বাংলা ভাষার কবি সাহিত্যিকদের লেখা বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন, সমুদ্রপাড়ের চট্টগ্রামের সন্তান শমাঙ্ক মোহন সেনের বিদ্যা-বুদ্ধির বিস্তৃতি সমুদ্রের মতই বিশাল, যার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। ১৯২৫ সনে বাংলার সিংহ পুরুষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জি চট্টগ্রাম বারের এ্যাডভোকেট শশাঙ্ক মোহন সেনকে ডেকে নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে চাকরিতে যোগদান করার কথা বলেন। জবাবে শশাঙ্ক মোহন সেন বলেছেন, স্যার ওকালতি করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চেয়ে মাসে অনেক বেশি অর্থ রোজগার করি, কাজেই আমি এ্যাডভোকেট হিসেবেই থাকতে চাই। এ জবাব শুনে সিংহ পুরুষ আশুতোষ মুখার্জি শশাঙ্ক বাবুকে ধমক দেন এবং তিরস্কার করে বলেন জীবনে টাকা-কড়ি অর্থের চেয়েও মূল্যবান জিনিস আছে সেটা হলো মানবেসবা, দেশসেবা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে কাজ করে আপনি ছাত্র পড়িয়ে দেশের সেবা করতে পারবেন, মানুষের উপকার করতে পারবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোশ এর কথা মতো তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে ১৯২৫ সনে

www.pathagar.com

চাকরিতে যোগদান করেন, বাংলার সমুদ্রপাড়ের চট্টগ্রামের শশাঙ্ক মোহন সেন।

আর বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তে হিমালয় পর্বত যার উচ্চতা পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি সাতাইশ হাজার ফুট, তার বিস্তৃতি হাজার হাজার মাইল। সেই বিশাল হিমালয়ের কোল ঘেঁষে উত্তরবঙ্গের ডোমার উপজেলার সন্তান সরদার আবদুস সাত্তার এর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান হিমালয় পর্বতের মতই বিশাল, যার সীমা পরিসীমা করা বেশ কঠিন। বিশাল হিমালয় পর্বতের ন্যায় উঁচু ও বিশাল বাংলা সাহিত্যের জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে সরদার আবদুস সাত্তার ১৯৮০-৯০-২০০০-২০১০ এই ত্রিশ বছর বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের লেখা আলোচনা করে আমাদের ধন্য ও কৃতজ্ঞ করে চলেছেন। জয় সরদার আবদুস সাত্তারের, জয় বাংলা সাহিত্যের।

সাত্তার ভাই বাংলা ভাষার সাহিত্যের পাঠক আমরা আপনার কাছে অনেক ঋণী। আপনি আমাদের প্রণতি গ্রহণ করুন। আপনি বাংলা সাহিত্যের ডক্টর স্যামুয়েল জনসন।
১১.০২.২০১০ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা

www.pathagar.com

১৯৭১ সনে আওয়ামীলীগের এমএনএ ও এম পি এ'রা নন তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল এবং আজকের কিছু অপ্রিয় সত্য কথা

১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের ৫৭ হাজার তরুণ, কিশোর, ছাত্র-যুবক মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখে ভারতের সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সামরিক বিদ্যার ট্রেনিংপ্রাপ্ত হয়ে পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এই ৬০ হাজার মুক্তিবাহিনীর প্রায় সবাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের সমর্থক ও ভক্ত ছিল। এছাড়াও ন্যাপ ও মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি মুক্তিযুদ্ধের সার্থক ছিল। এই মস্কোপন্থি কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সমর্থক ছাত্র ইউনিয়ন অনেক বড় ছাত্র সংগঠন ছিল। এরাও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সনে এই ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ও নেতাকর্মীরা মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্র হাতে ট্রেনিং নেবার ও যুদ্ধ করার সুযোগ পায় নাই। এরজন্য ১৯৭২ সন থেকে শুনে আসছিলাম যে আওয়ামীলীগের তখনকার এমএনএ ও এমপিএ'রা ছাত্রলীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমর্থক ছাড়া কাউকে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করতে দেন নাই ষড়যন্ত্র করে। এককভাবে তারা ১৯৭২ সন থেকে এসব কথা বলে আসছেন, ফলে আমারও বিশ্বাস জন্মেছিল যে একথা মনে হয় সত্যই, আওয়ামীলীগের এমএমনএ এমপিএরা বিরোধীতা করে আওয়ামীলীগ, বঙ্গবন্ধুর সমর্থক ছাড়া কাউকে মুক্তিবাহিনীতে নাম লেখাতে বা যোগদান করতে দেন নাই।

কিন্তু সম্প্রতি সাভারে অবস্থিত লোকপ্রশাসন ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরীর একজন কর্মী বই পড়াতে যার প্রচুর আগ্রহ ও সজ্জন মানুষ শামসুল আলম সাহেব প্রদত্ত ১৯৭১ সনের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও নেতৃত্ব প্রদানকারী কয়েকজন ভারতীয় জেনারেলের লেখা বই পড়ে জানলাম আওয়ামীলীগের এমএনএ এমপি এরা নন, তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল, তারা ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সমর্থক ছাড়া অন্য কাউকে মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে দেন নাই, তারা বাধা দিয়েছেন।

তারা মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট সমর্থকদের প্রসঙ্গে বলেছে কোন সুস্থ সভ্য লোক কমিউনিস্টদের হাতে অস্ত্র দিতে পারে না, আমরা দেব না। ১৯৭১ সনের ম্যাডাম ইন্দিরা গান্ধীর একজন উপদেষ্টা, যিনি ওই সময়ে খুব প্রভাবশালী ছিলেন বলে শোনা যায় মি. ডি.পি ধর কয়েকবার কলকাতায় এসে গ্র্যান্ড হোটেল ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের ভিআইপি স্যুটে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের ওই সময়ের প্রধান ও উপ-পধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং মেজর জেনারেল জ্যাকবকে কয়েকবার তাগিদ দিয়েছেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট সমর্থকদের মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য। কিন্তু শিখ ধর্মের অনুসারী জেনারেল অরোরা এবং ইহুদী ধর্মের অনুসারী

www.pathagar.com

জেনারেল জ্যাকব প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'স্যার এটা সম্ভব নয়, কমিউনিস্টদের হাতে কোন সুস্থ মানুষ অস্ত্র দিতে পারে না, তাদের সাথে চলাফেরা করতে পারে না'। জবাবে ডি.পি ধর সাহেব বলেছেন– 'এটা উচ্চতম পর্যায়ের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, আপনারা সৈনিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।' জবাবে জেনারেল অরোরা ও জেনারেল জ্যাকব বলেছেন– 'তাই যদি হয় তাহলে উচ্চতম রাজনৈতিক নেতৃত্বকে বলেন আমাদের বাদ দিয়ে দিতে, অন্য কাউকে নিয়োগ দিতে, কমিউনিস্টদের হাতে অস্ত্র দেয়ার মতো গুরুতর পাপ কাজে আমরা অংশ নিতে পারব না।' এ কথা বলার পরে আর কোন চাপ আসে নাই। ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পারে নাই।

✓ ছাত্র ইউনিয়নের অনেক নেতাদের হাতে শহীদ মিনারে যে রাইফেল হাতে জমায়েত দেখা যায় তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইওটিসির নকল রাইফেল বলে অনেকে বলে থাকেন, ১৯৭১ সনে ১৬ ডিসেম্বরের পরে অস্ত্র হাতে কোন মুক্তিযোদ্ধা বা ব্যাক্তিকে ভারতীয় সেনা সদস্যরা সামনে পেলে অস্ত্র কেড়ে নিত এবং অস্ত্রধারীদের ভারতের সেনা সদস্যরা ভালভাবে পিটুনি দিত, যাতে কয়েকদিন হাসপাতালে থাকতে হয়। সেই অবস্থায় ১৬ ডিসেম্বরের পরে অস্ত্র নিয়ে শহীদ মিনারে জমায়েত বিস্ময়ের বিষয়। যে সময়ে হাজার হাজার ভারতীয় সেনাসদস্য ঢাকা শহরে ভর্তি। তাই অনেকেই বিশ্বাস করে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের হাতে যে অস্ত্র শহীদ মিনারে যে অস্ত্র নিয়ে জমায়েত তা নকল অস্ত্র, তারা ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা।

কমিউনিস্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীদের সম্পর্কে ১৯৭১ সনে ভারতীয় সেনা অফিসারদের মূল্যায়ন একশতভাগ সঠিক। কোন সুস্থ ও সামান্য ভদ্রলোক কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না। উদাহরণ ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা লাভের পরে ৭২ সনের জানুয়ারি মাস থেকে এই ছাত্র ইউনিয়নের নেতা নূরুল ইসলাম নাহিদ, মতিয়া চৌধুরী, নূহ-উল-আলম লেনিন, আবদুল মান্নান খান, আসাদুজ্জামান নূর আজ যারা আওয়ামীলীগের বড় নেতা এরাসহ এদের সব নেতাকর্মীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে দাবি তোলে ১৯৭১ সনে যা হবার হয়ে গিয়েছে এবারে সবাই মিলেমিশে দেশ গড়তে হবে। স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারী কোন লোককে কোন ধরনের শাস্তি বা তিরস্কার করা যাবে না জাতীয় ঐক্যের স্বার্থে। তারা দেশ গড়ার স্লোগান দেয়, আমরা তাদের দেশ গড়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ থেকে স্লোগান দিতাম 'আঁচলে আঁচল ধরি এসো এবার দেশ গড়ি', 'এসো এবার প্রেম করি, আঁচলে আঁচল ধরি'। ছাত্র ইউনিয়নের ১৯৭২ সনের এ বক্তব্য বাংলাদেশের ওই সময়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র সমাজ দ্বারা ব্যাপকভাবে সমর্থন লাভ করে এবং তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় সমস্ত ছোট-বড় কলেজে এককভাবে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জেতে। ১৯৭১ সনে যারা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল-কলেজে ক্লাস করেছে, মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে তাদের তোয়াজ-তোষণ করে ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

ছাত্র ইউনিয়ন ভোটে জেতে। যারা এই লেখা পড়বেন তাদের অনুরোধ করছি, দয়া করে পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে ১৯৭২ সনের দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়ে দেখুন, তাহলে আমার এ বক্তব্যের একশভাগ সততা পাবেন। ১৯৭২-৭৩ সনে আমি ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক। ১৯৭৩-৭৪ সনে ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক। ছাত্র ইউনিয়ন ও মস্কো কমিউনিস্ট পার্টির সাথে কয়েকবার বড় ধরনের রাজনৈতিক সংঘাতে ছাত্রলীগের পক্ষে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে নিয়েছে এবং তাদের পিটুনি দিয়েছে তার মধ্যে আমি অন্যতম একজন। পরে ১৯৭৪ সন থেকে এই মস্কো কমিউনিস্ট ও ছাত্র ইউনিয়ন পরাজয় স্বীকার করে মাপ চেয়ে আওয়ামীলীগ ও বঙ্গবন্ধুর নির্লজ্জ তাবেদারী শুরু করে, এরাই উস্কানি দিয়ে গণতন্ত্রের নেতা বঙ্গবন্ধুকে দিয়ে একদল বাকশাল করায়। যার পরিণতিতে দুঃখজনক মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক হত্যাকাণ্ড। যে হত্যাকাণ্ড দ্বারা রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে বেশি ব্যক্তিগতভাবে এতিম হয়েছি আমি নিজে, বঙ্গবন্ধু, শেখ কামাল বেঁচে থাকলে আমার রাজনৈতিক অবস্থান ১৯৭৫ সনের আগের মতোই অনেক উঁচুতে থাকতো আজকের আওয়ামীলীগ নেতৃত্বে।

এই মস্কো কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা আবার তাদের অতীত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সামরিক শাসক জিয়াউর রহমানের কাছে মাপ চেয়ে জিয়াউর রহমানের খাল কাটা বিপ্লবকে সমর্থন দিয়ে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মীরা জিয়ার চিড়া-মুড়ি খেয়ে শত শত সুন্দরী মেয়েসহ খাল কাটায় অংশগ্রহণ করে। আওয়ামীলীগের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমানের পক্ষে একটি কথা বলে নাই, তারা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কঠোর নির্যাতনের স্বীকার হন। জিয়াউর রহমানের খালকাটা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে ন্যাপ ছাত্রইউনিয়নের অনেক নেতা-কর্মী অনেকে কোটিপতি হয়েছে। এই ন্যাপ কমিউনিস্ট ছাত্র ইউনিয়নের নেতাকর্মী জেনারেল এরশাদের সামরিক শাসনের সব কীর্তিকলাপ সপ্তম সংশোধনীর মাধ্যমে সমর্থন দিয়েছে। আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা জেনারেল এরশাদের সপ্তম সংশোধনীর বিরোধীতা করেছে।

১৯৯২ সনের বাবরি মসজিদ ভাঙার সময় ঢাকা ও চট্টগ্রামে যে হিন্দু-মুসলমান রায়ট হয়, এই রায়টে সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন ও মস্কোপন্থী ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী আওয়ামীলীগের হিন্দু-মুসলমান রায়ট নিয়ে কিছু অপ্রত্যাশিত মতামত জানিয়ে আওয়ামীলীগের মধ্যে বক্তব্য দেন। তাতে নাকি দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটারদের ধারণা হবে যে আওয়ামীলীগ হিন্দুদের দালাল নয়।

মতিয়া চৌধুরীর এই বক্তব্যের পরে ঢাকার ভারতের হাই কমিশন থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সাথে যোগাযোগ করা হয়। জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামীলীগ নেতা আমির হোসেন আমুকে ভারতীয় হাইকমিশনে পাঠিয়ে মতিয়া চৌধুরীর এমন বক্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে মাপ চেয়ে আসেন। কিন্তু ভারতের হাইকমিশন বিষয়টিকে এত সহজে না নিয়ে মতিয়া চৌধুরীর এলাকার তার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বি বিএনপির সাবেক হুইপ জাহেদ চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করে

www.pathagar.com

পাবনার নগরবাড়ী ঈশ্বরদীর দুইশত কোটি টাকার রোডের কাজ জাহেদ চৌধুরীকে কন্ট্রাক্ট দেন ভারতের সরকারী প্রতিষ্ঠান ইরকনের মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, বিএনপি নেতা মতিয়া চৌধুরী বিরোধী জাহেদ চৌধুরীকে ঢাকার স্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া দুইশ কোটি টাকা ওই কাজের জন্য ব্যাংক গ্যারান্টি বা ঋণ দেন। জননেত্রী শেখ হাসিনার উচিৎ ছিল ভারতীয় হাইকমিশনের অনুরোধের সম্মান দেওয়া। শেখ হাসিনা ও মতিয়া চৌধুরী দুইজনেই মহিলা কিন্তু শেখ হাসিনার কাছে ব্যক্তিগত সাহায্য চেয়ে কেউ ফিরে এসেছে এমন দৃশ্য কেউ দেখেছেন বলে মনে হয় না, আর মতিয়া চৌধুরী কোন অসহায় মানুষকে সাহায্য দিয়েছে এমন দৃশ্য কেউ দেখেছেন বলে জানা যায় না। ছোটবেলায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের প্রথমভাগ বইতে পড়েছি 'নির্দয় লোক পশুর সমান'। শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুর মুখ সদা হাস্যময়, কিন্তু মতিয়া চৌধুরীর মুখ সদা মলিন।

১৯৯২ সনের মতিয়া চৌধুরীর ও ভারতীয় হাইকমিশন সম্পর্কে যা লিখলাম সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন, এরপরেও আমি এই লেখা লিখবার আগে আওয়ামীলীগের নেতা যাকে আমি এখনও সম্মান ও শ্রদ্ধা করি ২০০৭ সনের আগে আওয়ামীলীগের ও শেখ হাসিনার সেবা করার জন্য সেই আমির হোসেন আমু ভাইয়ের কাছ থেকে ২৪.১২.২০০৯ সাতাশ নম্বর রোডের একটি চায়নিজ হোটেলে তপন রায় চৌধুরীর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করে পুনঃনিশ্চিত হয়ে এখানে লিখলাম।

যাক আজ আমাদের আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের দৃষ্টি থাকা উচিৎ ২০১৪ সনের সাধারণ নির্বাচনের দিকে। ২০১৪ সনে আওয়ামীলীগ বা শেখ হাসিনা নির্বাচনে যাতে বিজয়ী হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা, তারজন্য প্রয়োজন সুশাসনের, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, মারামারি হানাহানি বন্ধ রাখা। ১৯৭২-৭৩ সনে যে মতিয়া চৌধুরীর, নুরুল ইসলাম নাহিদ, নূহ-উল-আলম লেনিন, আবদুল মান্নান খানরা রাজাকার-আলবদর ও স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধীতাকারীদের তোয়াজ-তোষণ করেছে তারাই আজ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের নামে আওয়ামীলীগের আশ্রয়ে এসে দেশের মধ্যে এক নতুন আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য ২০০৮ সনের ২৯ ডিসেম্বরে নির্বাচনে আওয়ামীলীগের ব্যপক বিজয় হয় নাই।

আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা নিশ্চয় জানেন ২০০৮ সনের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে তাঁর বিজয় হয়েছে এক. খালেদা-তারেক জিয়ার অপশাসনের জন্য, ব্যাপক জনমত তাদের বিরুদ্ধে যায়। দুই. শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনের দুইটি সেরা সিদ্ধান্ত একটি আওয়ামীলীগ থেকে সমাজতন্ত্র বিতারণ অন্যটি আল্লাম্মা শায়খুল হাদিস আজিজুল হকের সাথে চুক্তি তিন. সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের সাথে জোট বেধে নির্বাচন। চার. নির্বাচনে বিজয়ী হলে দলমত নির্বিশেষে সব মানুষের প্রতি সম আচরণের আশ্বাস। ২০০৮ সনের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনে জননেত্রী শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের ব্যপক বিজয় হয়েছে উল্লেখিত চারটি কারণে অন্য কারণে নয়।

এবারে আসা যাক, আমি বা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক নেতাকর্মী আওয়ামীলীগের

www.pathagar.com

নেতাকর্মী সবাই চাই রাজাকার-আলবদররা শাস্তি পাক। তারা খারাপ অবস্থায় থাক। কিন্তু সব জিনিস চাইলেই পাওয়া যায় না। আমার বউ নেই, তাই বলে নিউইয়র্ক শহরের গভর্নরের অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে পঁচিশ বছর বয়সের জর্জি যে হর্স রাইডিং-এ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন বা ভারতের টেনিস খেলোয়াড় সানিয়া মির্জাকে বউ হিসেবে পেতে খুব ইচ্ছা করে, কিন্তু এটা ইচ্ছা হলেও অবাস্তব চিন্তা। কোনদিন বাস্তবে সম্ভব নয়। তেমনি রাজাকার আলবদরদের বিচার করাও অবাস্তব চিন্তা, চল্লিশ বছর পর রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে বিচারে সাক্ষী পাওয়া খুব কষ্ট হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান সাহেবরা যা পারেন নাই তা অন্য কারো পক্ষে পারা সম্ভব নয়। আর হ্যাঁ যদি সত্যিকারের বিচার হয়, যদি সত্যিকারের রাজাকার-আলবদরদের শাস্তি হয় আমি খুবই খুশি হবো, তবে সেটা হবে আমাদের মতো কোনো লোক যদি বিশ্ব হর্স রাইডিং চ্যাম্পিয়ন নিউইয়র্কের গভর্নরের পঁচিশ বছর বয়সের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে জর্জি বা ভারতের টেনিস তারকা সানিয়া মির্জাকে বউ হিসেবে পাওয়ার মত। কমিউনিস্টরা কল্পনার রথে চড়ে বেড়ায়। অবাস্তব চিন্তা ও দালালি তাবেদারি করে পায়ে ধরে ব্যক্তিগত সহায়-সম্পত্তি বৃদ্ধি করা তাদের একমাত্র ব্রত বা ধর্ম। অথচ মুখে বড় বড় কথা। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা বাস্তববাদী, সাধারণ মানুষের সাথে এরা মিশে থাকে। সাধারণ মানুষের সমর্থন ও ভালবাসায় আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের একমাত্র রাজনৈতিক পুঁজি ও সম্বল। শেখ হাসিনা ও আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীদের যদি পাশ কাটিয়ে মতিয়া চৌধুরীদের মতো সাবেক কমিউনিস্টদের পাশে রাখেন তবে এর পরিণাম স্বাভাবিকভাবেই খারাপ হতে বাধ্য। পরিশেষে আমাদের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে ১৯৭১ সনের ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল যারা বাংলাদেশ যুদ্ধ করে মুক্ত করেছেন, তাদের মূল্যবোধ ও কথার প্রতি সম্মান জানিয়ে কমিউনিস্টদের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ জানাই। মনে রাখা উচিৎ 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ!'

১৯৭১ সনে আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছি পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে, একথা এ বইয়ে বেশ কয়েক জায়গায় উল্লেখ আছে। এরপরেও যেহেতু এই লেখাটিতে বেশ কিছু বড় বড় কথা লিখলাম তার জন্য আমার পরিচয়টা আবার ভালভাবে দেয়া উচিৎ। ১৯৭১ সনের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত রাজগঞ্জে মুক্তিবাহিনীর রিক্রুটিং ক্যাম্পে মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে পনেরদিন দৈহিক ট্রেনিং করি, এরপরে ভারত ও ভুটানের বর্ডার এলাকায় আট হাজার ফুট উঁচু হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত মুর্তি পাহাড়ে মুজিব ক্যাম্পে সাত সপ্তাহের এফএফ হিসেবে উচ্চতর সামরিক ট্রেনিং নেই, সাত সপ্তাহের ট্রেনিং-এর তিনশজনের কোম্পানিতে আমি সেকশন কমান্ডার হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দুই সপ্তাহ ওই সময়ে মুজিব ক্যাম্পে বা মুর্তি পাহাড়ে ট্রেনিংরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা প্রথম ব্যাচের শেখ কামাল ভাইসহ যে সত্তরজন অফিসার ট্রেনিং নেন তাদের সাথে জুনিয়র লিডার হিসেবে (জে. এল) ট্রেনিং নেবার সুযোগ পাই। সেই হিসেবে বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী তাজুউল

www.pathagar.com

ইসলাম সাহেব এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান মঈন উ আহমদের আমি সিনিয়র। আমাদের পরে দ্বিতীয় ব্যাচে তাজুল ইসলাম সাহেব অফিসার হিসেবে ট্রেনিং নেন এবং ট্রেনিং শেষ হবার আগেই যুদ্ধ শেষ। ট্রেনিং শেষে আমাকে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ৬ নম্বর সেক্টরের দেওয়ানগঞ্জ হেমকুমারী সাব-সেক্টরে পোস্টিং দেন। এইখানে আমি প্রায় ছয় মাস দিনে রাতে পাকসেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেকশন ও প্লাটুন কমাণ্ডার হিসেবে যুদ্ধ করেছি। যারা যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল তারা জানেন একটি যুদ্ধে দুশমনের সবচেয়ে সামনে থাকে সেকশন কমাণ্ডার। যারজন্য যুদ্ধে সেকশন কমাণ্ডার হিসেবে যারা অংশ নেয় সমস্ত সেনাবাহিনী অফিসার ও জওয়ানরা তাকে খুব সম্মান ও ভালবাসে। আমিও গত ৪০ বছরে বাংলাদেশ ও ভারতের সেনাবাহিনীর অফিসার ও জওয়ানদের দ্বারা খুবই সম্মান ও ভালবাসা পেয়ে আসছি। সর্বশেষে ১৯৭১ সনে জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা মেজর জেনারেল লসমন সিং, জেনারেল জ্যাকব সাহেব যা করেছেন তার জন্য আবার তাঁদের প্রণাম ভক্তি ও সম্মান জানাই। আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর একনিষ্ঠ ভক্ত, আমি আটমাস পঞ্চাশ রুপি করে বেতন পেয়েছি, আটমাস পূর্ণ রেশন খেয়েছি ভারতীয় সেনাবাহিনীর। একদিন যার নূন খাবে চিরদিন তার গুণ গাবে, আমি এটাকে মেনে চলতে চেষ্টা করি বা এ বক্তব্যকে সম্মান করি।
১২.০২.২০১০ শুক্রবার, রাত ৮টা।

১৯৭১ সনে দু-এক জন ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক বা কর্মী ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সাহায্য সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনীতে নাম লিখিয়ে ট্রের্নিং নিয়ে যুদ্ধ করেছেন, তবে এদের সংখ্যা খুবই কম। আমি যে কোম্পানী ও প্লাটুনের যুদ্ধ করেছি যেখানে বগুড়া জেলা আব্দুল বারী নামে একজন ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক একজন মুক্তিযুদ্ধা ছিল, তবে ৩০০ জনের কোম্পানীতে ছাত্র ইউনিয়নে বারী একা, আর কেউ না।

www.pathagar.com

আওয়ামীলীগের ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক আট নেতা ও আজকের অপ্রিয় সত্য কথা

"ভারতবর্ষের লোকেরা তাদের বাসা বাড়ীর গৃহ ভৃত্যদের সাথে যে ব্যবহার করে থাকেন, তার চেয়েও খারাপ ব্যবহার আমার সাথে করেছেন গত কয়েক বছর জোটভূক্ত বাম পন্থী কমিউনিস্ট সদস্যরা।" ভারতের প্রধান মন্ত্রী, মনোমোহন সিং। ১ম মেয়াদে লোক সভায় তার বিরুদ্ধে আনা অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে বিতর্ক বক্তিতায় প্রদত্ত ভাষন।

১. মিসেস মতিয়া চৌধুরী (কৃষিমন্ত্রী)
২. নূরুল ইসলাম নাহিদ (শিক্ষামন্ত্রী)
৩. আবদুল মান্নান খান (পূর্ত প্রতিমন্ত্রী)
৪. ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ (আইনমন্ত্রী)
৫. মাহবুবে আলম (এটর্নি জেনারেল বাংলাদেশ)
৬. নূহ-উল আলম লেনিন (প্রচার সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)
৭. ইয়াফেস ওসমান (তথ্য প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান মন্ত্রী)
৮. আসাদুজ্জামান নূর (এমপি ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ)

জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ও আওয়ামী লীগ দলে উক্ত ৮ জন সাবেক ছাত্র ইউনিয়ন ও মস্কো পন্থি কমিউনিস্টদের আজ বিরাট প্রভাব। এর মধ্যে মিসেস মতিয়া চৌধুরী তো প্রায় সর্বক্ষন নেত্রী শেখ হাসিনাকে অক্টোপাসের মতো ঘিরে রাখে, মতিয়া চৌধুরীর জন্য আজ শেখ হাসিনার কাছে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা একান্তভাবে প্রাণ খুলে দু-চারটি কথা বলতে পারে না। কাজে ও অকাজে প্রায় সব সময় শেখ হাসিনার পাশে মতিয়া চৌধুরী আছে যা দেখতেও খুব দৃষ্টিকটু দেখায়। যাহোক উপরের ৮জন নেতার প্রভাব আজ আওয়ামী লীগ দলে ও সরকারে অনেক বেশি। অনেক প্রবীন ও একনিষ্ঠ সাবেক ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, বঙ্গবন্ধু শেখ হাসিনার ও শেখ কামালের ভক্তরা এদের দাপটে অসহায়। অথচ এই ৮ জন আওয়ামী লীগে আগত সাবেক ছাত্র ইউনিয়নে ও ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা অতীতে যা করেছেন:-

১. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে গালাগালি করে বক্তব্য দিয়েছে সেই ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত, শেখ মুজিব সিআই এর দালাল, আমেরিকার দালাল, ৬ দফায় বাংলার শ্রমিকের কথা নাই কৃষকের কথা নাই।

২. ১৯৭২-৭৩ সনে রাজাকার আলবদর স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরুদ্ধকারী দালালদের স্বপক্ষে বক্তব্য দিয়ে এদের দল ভারী করে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় (একমাত্র ময়মনসিংহের বাকসু ছাড়া) ও কলেজের এরা ভোটে জেতে। এদের ছাত্র জনসভায় অনেক লোক সমাগম হয়, এর জন্য মাথা খারাপ হয়ে যায় বঙ্গবন্ধু সরকারের বিরুদ্ধে ও ব্যক্তি বঙ্গবন্ধু বিরুদ্ধে অশালিন ভাষায় গালাগালি শুরু করে। যার জন্য বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা

www.pathagar.com

এদের কে ১৯৭৩ সনে ১ম সপ্তাহে শায়েস্তা করে এবং ঢাকা শহর থেকে বিতাড়িত করে। এরা পরে শেখ শহিদুল ইসলামের পায়ে ধরে মাফ চেয়ে আবার ঢাকা শহরে ফিরে আসতে চায়, কিন্তু ছাত্রলীগের কোন কোন নেতা বলে শেখ শহিদুলের পায়ে ধরে মাফ চাইলে হবে না, বঙ্গবন্ধুর কাছে গিয়ে তার পায়ে ধরে মাফ চাইতে হবে এবং পত্রিকায় বিবৃতি দিতে হবে যে তারা অন্যায় কাজ করেছে। ১৯৭৩ সনে ছাত্র ইউনিয়ন ও মস্কো পন্থি কমিউনস্টি নেতারা তাই করে। তখন ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ভাই বলেছিলেন 'তাদের রক্ষিতা করে রাখতে হবে। স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়া যাবে না'।

৩. এই মস্কো পন্থি, ন্যাপ কমিউনিস্ট নেতারা ১৯৭৩ সনের শেষ থেকে ১৯৭৫ সনের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত নির্লজ্জভাবে বঙ্গবন্ধুর স্তাবকতা করে অনেক সহায়সম্পত্তির মালিক হয়েছে, উদাহরণ পুরানা পল্টনে এদের অফিস, মতিঝিলে মনিসিংহের নামে জায়গা, এমনি অনেক, কিন্তু আওয়ামী লীগের এমন সহায় সম্পত্তি ১৯৭৫ আগে ছিল না। এরা গণতন্ত্রের নেতা বঙ্গবন্ধুকে উসকানি দিয়ে একদল বাকশাল বানান। ঐসময়ের আওয়ামী লীগের ৯৯% বেশি নেতা কর্মী এমপি সংসদীয় গণতন্ত্রের পক্ষে বাকশালের বিরুদ্ধে ছিল।

৪. ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্টের মর্মান্তিক হৃদয় বিদারক হত্যা কাণ্ডের পরে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে ১৯৭৬ সনে উপরে বর্ণিত ৮ জন নেতাদের দল ছাত্র ইউনিয়ন ও ন্যাপ কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীরা জিয়াউর রহমানের সাথে দেখা করে তাদের অতীতের রাজনীতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ছাত্র ইউনিয়নের শত শত সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে জিয়াউর রহমানের খাল কাটা বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন এবং অনেকে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ভাবে বিরাট লাভবান হয়। আর এই সময়ে ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের কর্মীদের উপর চলছে নির্যাতন, রাজনীতিতে জিয়াউর রহমানের পৃষ্ঠপোষকতা রাজাকারদের উত্থান।

৫. জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এলে তার সামরিক শাসনের বৈধতা দিয়ে যে ৭ম সংশধোনি বিল পাশ করা হয় তার বৈধ দেবার স্বপক্ষে কাজ করে এই ৮ জন নেতাদের দলের নেতাকর্মীরা, প্রমাণ আহমাদুল কবির।

৬. এরা আওয়ামী লীগের প্রবীণ ত্যাগী, সৎ বঙ্গবন্ধুর সরাসরি সাথী নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা গীবত গেয়েছে, আর দুর্বল চিত্তের নেতা রাজ্জাক সাহেব ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথা বলে আওয়ামী লীগকে দুর্বল করেছে। এই ৮ জন আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাদের মধ্যে মতিয়া চৌধুরী ১৯৮০ দশকে প্রথমে আওয়ামী লীগে এসেছে আর বাকি সাতজন এসেছে ১৯৯১ সনের পরে, যখন বুঝেছে বাংলাদেশের দল দুটি একটি আওয়ামী লীগ অপরটি বিএনপি। এই সময়ে এদের বেশ কয়েকজন বিএনপিতে যোগ দিয়েছে এবং এমপি হয়েছে।

এখন উপরে লিখিত ৮জন আওয়ামী লীগের বিরাট নেতা ও নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসি-

www.pathagar.com

নার খুব আপন সাথীরা উপরে ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট সম্পর্কে যা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে এই আট নেতা বলতে পারে যে 'এসব দল করেছে আমি করি নাই'। কিন্তু যখন দল এসব করেছে বলেছে তখন কি আপনাদের বয়স ১৮ হয় নাই অবুঝ শিশু ছিলেন? তখন কেন দলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে আওয়ামী লীগে আসেন নাই? আসলে আপনারা দালাল তাবেদার ব্যক্তিত্বহীণ স্তাবক। আপনাদের যে ৮ জনের নাম উপরে লেখা হয়েছে আপনাদের মত কুলসিত রাজনীতির অতীত মানুষকে যিনি কাছে রাখবেন তিনি বিরাট ভুল করবেন। আজ দেশের শিক্ষামন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী, পূর্ত মন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সুপ্রিমকোর্ট বারে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা কোনঠাসা, আওয়ামী লীগ অফিসে আওয়ামী লীগের নেতারা কোনঠাসা লেলিন নূরের বিরাট প্রভাব যা খুবই দু:খজনক, হৃদয়বিদারক। মোফাজ্জল হোসেন মায়াও সাবেক ছাত্র ইউনিয়নের নেতা।

আমি চাই শেখ হাসিনার নেতৃত্ব শক্তিশালী হোক, তিনি সফলভাবে দেশ পরিচালনা করুন, ২০১৪ সনের সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনা আবার ব্যাপকভাবে ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসুন। তবে তার জন্য ভাল কাজ দরকার, মতিয়া চৌধুরী, নাহিদ মান্নান, লেনিন, নূর, মাহবুবে আলমদের মত সুবিধাবাদী স্তাবকদের দ্বারা কোন ভাল কাজ কোন সুস্থ্য মানুষ আশা করবেনা তাদের এত উপরে উল্লেখিত কদর্যময় কুলষিত রাজনীতির অতীতের জন্য। ১৯৭১ সনের স্বাধীনতা যুদ্ধের ভারতীয় সেনাবাহিনী নেতা জেনারেল জগজিত সিংহ অররা ও জেনারেল জ্যাকব যেমন বলেছেন, কোন সুস্থ্ ও সভ্য লোক কমিউনিস্টদের সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না। এরা বলবে 'আমরা এখন কমিউনিস্ট নই আগে ছিলাম', এর জবাবে বলতে চাই অনেক সুন্দরী মেয়ে যৌবনকালে বাবা মায়ের কথা শোনে না, স্বামীর কথা শোনে না তারা নিজেদের অনেক কিছু মনে করে, ফলে তাদের একসময় স্থান হয় পতিতালয়ে, কিন্তু যখন যৌবন শেষ তখন আর পতিতালয়েও স্থান হয় না, পরে হাতে তসবি বা মালা হাতে মসজিদ বা মন্দিরের সামনে দাড়িয়ে যপতপ করে ভিক্ষা করে খায়। তেমনি মতিয়া চৌধুরী, নাহিদদের শরীরে যখন বল ছিল জীবন যৌবন শক্তিশালি ছিল তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগকে গালাগালি করেছে, ৭২ সালে রাজাকার আলবদরদের পক্ষে কথা বলেছে, ১৯৭৭ সনে শত শত সুন্দরী মেয়ে নিয়ে জিয়াউর রহমানের কাছ থেকে চিড়া মুড়ি গম নিয়ে খাল কেটেছে, জিয়া এরশাদ সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কথা না বলে চুপ থেকেছে আজ যখন বয়সের ভাড়ে ক্লান্ত শরীরে বল নেই রোগে শোকে আক্রান্ত, তখন মসজিদে এসেছে বা শেখ হাসিনার কাছে এসেছে। আপনারা চাটুকার, স্তাবক, ধর্মহীন হিংস্র পশুর সমান। বঙ্কিম চট্ট্যপধ্যায়ের রাজসিংহ উপন্যাসে লিখেছেন "ধর্মহীন লোক হিংস্র পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট" আপনারা তাই।

তবে একথা সত্য যে ২০০৭ ও ২০০৮ সনে যখন শেখ হাসিনা অন্যায় ভাবে জেলে বন্দি ছিলেন সেই সময়ে উক্ত ৮ জনের একজন আব্দুল মান্নান খান বেশ পরিশ্রম করেছেন শেখ হাসিনার মামলা নিয়ে, তবে তিনি একা ছিলেন না। শেখ ফজলে নূর তাপস, এ্যাডভোকেট রেজাউর রহমান, কামরুল ইসলামসহ আরও বেশ কয়েকজন

www.pathagar.com

এ্যাডভোকেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সাবেক মার্কসবাদী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা আব্দুল মান্নান খান এখন গণ পূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রি। তিনি সম্প্রতি রাজউকের পূর্বাচল আবাসিক এলাকায় ৬ হাজার প্লট বিতরণ করেছেন এমপি ও সরকারী কর্মচারী ছাড়া লটারির মাধ্যমে। এর আগে রাজউকের যত প্লট বিতরণ হয়েছে তা যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে, ফলে রাজউক যে প্লট বরাদ্দ আগে দিয়েছে তাতে শতকরা ৯০ ভাগ যোগ্য ব্যক্তিরা প্লট পেয়েছে শতকরা ১০ ভাগ তদবিরের মাধ্যমে কম যোগ্য লোক প্লট পেয়েছে, কিন্তু দেউলিয়া কমিউনস্টি চিন্তার মান্নান খান সাহেব যে লটারির মাধ্যমে প্লট দিয়েছেন তার ফলে শতকরা ৯০ভাগ অযোগ্য ১০ ভাগ যোগ্য লোকেরা প্লট পেয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা কে বা কাড়া প্লট পেল তা জননেত্রী ও মন্ত্রী মান্নান খান জানতে পারলেন না অতীতে যারা জিয়া এরশাদ মিসেস খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিন-ার শাসনআমলে রাজউকে প্লট পেয়েছেন তারা মনে মনে তাদের কৃতজ্ঞতা জানায়, কিন্তু এবারে ছয় হাজার প্লট যারা পেলেন তারা শেখ হাসিনার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবেন না, কেননা তারা লটারির মাধ্যমেই প্লট পেল বলে। সুপ্রিম কোর্টের একজন এ্যাডভোকেটের কাছে শুনলাম লটারির মাধ্যমে যারা এবারে (২০০৯) সনে প্লট পেয়েছেন সেসব এ্যাডভোকেট দের শতকরা ৯০ জন নাকি বিএনপি জামাতের সমর্থক। এছাড়াও রাজউকের এই প্লট বিতরণের কাজে অতীতে তদবির করে বিএনপি জাতীয় পার্টির কয়েক হাজার নেতা কর্মী অনেকটা স্বচ্ছল হবার সুযোগ পেয়েছে এবারের আওয়ামী লীগের বাইরের লোক কমিউনিস্ট চিন্তার মানুষ মান্নান খান সাহেব পূর্ত মন্ত্রি হয়ে প্লট দেওয়াতে কয়েক হাজার আওয়ামী লীগ ছাত্র লীগের নেতা কর্মী কিছু সেবা দিয়ে টাকা কামাই থেকে বঞ্চিত হলো, অথচ এই ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সরকারের বাইরে থাকে তারা কি নির্যাতনের শিকার হয়। এই মান্নান খানের সচিব মাহবুবুর রহমানকে অনেকে বলে সে নাকি ছাত্র জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা ছিল এক জন অসভ্য লোক (আমি জানি না ঠিক না বেঠিক) অথচ এই কমিউনিস্ট নেতা মান্নান খান তাকে শুধু বহালই রাখেন নাই তার মন্ত্রনালায়ের এই সচিবের বেশ প্রভাব।

এই ছাত্র ইউনিয়নের সাবেক নেতারা আওয়ামী লীগে এসে ব্যক্তিগত অর্থের পাহাড় গড়ে তার প্রমাণ আসাদুজ্জামান নূর, সাবেক অর্থ মন্ত্রী প্রয়াত কিবরিয়া সাহেব যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখন আমাকে একদিন বলেছেন- "বাবলু সাহেব আসাদুজ্জামান নূরের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবেন অর্থনৈতিক সুবিধা পাবেন, বাংলাদেশে হংকং সাংহাই ব্যাংক আসাদুজ্জামান নূরের তদবিরে দিয়েছি" জবাবে কিবরিয়া সাহেবকে বলেছিলাম, কোন কমিউনিস্ট কোন দিন অন্য লোককে সাহায্য সহযোগিতা করে না। এরা নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু করে না।

১৪.০২.২০১০ রবিবার, রাত ৮টা

www.pathagar.com

প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ সেপারেশন অব পাওয়ারঃ বাংলাদেশে সভ্য, ন্যায় বিচার ও সুশাসনের জন্য যা জরুরী প্রয়োজন

আধুনিক সভ্য রাষ্ট্র বা সমাজের ভিত্তি হচ্ছে– ১মঃ 'সিভিল পাওয়ার কন্ট্রোল অভার আর্মস ফোর্সেস', অর্থাৎ যার হাতে অস্ত্র থাকবে সে অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারবে না। অস্ত্র প্রয়োগের ক্ষমতা থাকবে যার হাতে অস্ত্র নেই। ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ন্ত্রণ করবেন কখন বন্দুকের গুলি হবে, কখন হবে না। যেখানে এই সিস্টেম নাই সেখানে সভ্য শাসন নাই বর্বর শাসন আছে বলে ধরে নিতে হবে। ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যার হাতে অস্ত্র থাকে তার মাথায় বুদ্ধি থাকে না সে শারীরিক পরিশ্রম করে, বুদ্ধি থাকে তার মাথায় যে শারীরিক পরিশ্রম করে না।

২য় : কোন লোককে কোন ধরনের শাস্তি প্রদানের আগে তাকে জানাতে হবে বলতে হবে তোমার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আছে, এ বিষয়ে তোমার বক্তব্য কি? ফাসির আসামীকে ফাঁসী দেবার সময় ফাঁসীর মঞ্চে জেলার সাহেব জজ সাহেবের রায় তাকে পড়ে শোনান। অভিযুক্তের জবাব পাওয়ার পড়ে আসামী অভিযোগ এবং জবাব পরীক্ষা-নিরিক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সে শাস্তি পাবে কিনা। অভিযুক্তকে কারণ না দেখিয়ে শাস্তি দেওয়া অসভ্য বা কাপুরুষের শাসন। সভ্য শাসনের ভিত্তি হচ্ছে কারণ দেখিয়ে অভিযুক্তের জবাব শুনে তাকে শাস্তি দেওয়া।

৩য় : সভ্য বা আধুনিক শাসনের অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে ক্ষমতা বা শাসন ব্যবস্থার পৃথিকীকরণ 'সেপারেশন অব পাওয়ার', প্রথম যারা আইন তৈরি করবেন, ২য় যারা আইন প্রয়োগ করবেন, ৩য় যারা ব্যবসা বাণিজ্য করবেন, ৪র্থ যারা শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা উৎপাদন ও সেবামূলক কাজ করবে।

যারা আইন তৈরি করবেন সেই সংসদ সদস্যরা কোন ক্রমেই আইন প্রয়োগ করা ব্যবসা বাণিজ্য করা ও উৎপাদন বা সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত থাকতে পারবেন না। যদি থাকেন তবে রাষ্ট্র বা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হবে। যারা ২য় শ্রেনীর আইন প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত তারা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে না, তাদের অসুবিধা হবে। ২য় শ্রেনীর আইন প্রয়োগ করার কাজে নিয়োজিত তারা ঠিক মত আইন প্রয়োগ করছেন কিনা এটা দেখার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রির ও ২য় শ্রেনীর অপর একটি শ্রেণীর তারা হচ্ছেন বিচার বিভাগের সাথে আছেন যারা, বিচার বিভাগের কাজে যারা আছেন তারাই দেখবেন রাষ্ট্রের আইন ঠিকমত প্রয়োগ হচ্ছে কিনা এবং না হলে তাদের কি শাস্তি হবে।

www.pathagar.com

কিন্তু যারা আইন বানাবেন তারা কোন সময়ই আইন প্রয়োগ করার কাজে যারা আছেন তাদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না তাদের সাথে মেলামেশা করবেন না, যারা আইন বানাবেন রাষ্ট্রে তাদের স্থান ১ম শ্রেণীর, তারা কোন সময়ই ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদার সরকারী কর্মচারী ও ৩য় পদমর্যাদারার ব্যবসায়ীদের সাথে মেলামেশা করবেন না, যদি করেন তবে তাদের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হবে। রাষ্ট্র যারা আইন বানায় তাদের ভরনপোষনের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ যোগান দিয়ে থাকে। এক সময়ে জন্মসূত্রে এই আইন প্রণেতা যারা হতেন তারা ব্রাহ্মন বা পুরোহিত শ্রেণী হতে আসতেন, রাজা তাদের বুদ্ধি নিয়ে দেশ চালাতেন, দার্শনিক সক্রেটিস বা প্লেটো সুপারিশ করলেন না জন্মসূত্রে আইন প্রণেতা হবে না যোগ্যতার মাধ্যমে হতে হবে কালে এই আইন প্রণেতা শ্রেনীর জন্মসূত্রে যোগ্যতা অর্জন নেই, নির্বাচনের মাধ্যমে ১ম শ্রেণীর পদ মর্যদার মানুষ আইন প্রণেতা নির্বাচন হচ্ছেন। তবে আজ পর্যন্ত সমস্ত দার্শনিক বা রাষ্ট্র চিন্তাবিদ গণ এক বাক্যে বলে আসছেন যে যদি প্রথম শ্রেণীর পদমর্যাদার আইন প্রণেতাগণ ২য় শ্রেণীর আমলা বা সরকারি কর্মচারী ও ৩য় শ্রেণীর পদমর্যাদের ব্যবসায়ীদের সথে মেলামেশা করেন তবে রাষ্ট্রের সর্বনাশ হতে বাধ্য সেখানে আর সভ্য বা সুশাসন থাকবেনা, যেখানে আইন প্রণেতাগণ আইন প্রয়োগকারী ২য় শ্রেণী ও ৩য় শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সাথে মেলামেশা ও দেনদরবার করবেন সেখানে সর্বনাশ হবে। কঠোরভাবে শ্রেণী সচেতনা বজায় রাখা আধুনিক বা সভ্য রাষ্ট্রে অন্যতম বৈশিষ্ট হচ্ছে সেপারেশন অব ওয়ার্ক, সেপরেশন অব পাওয়ার।

২য় শ্রেণীর হচ্ছে রাষ্ট্রের যারা আইন প্রয়োগকরার কাজে নিয়োজিত আছেন তারা, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারক, এরা কোন ক্রমেই ১ম শ্রেণীর আইনপ্রণেতা ও ৩য় পদমর্যাদা ব্যবসায়ী সমাজের সাথে মিশতে পারবে না, যদি এদের সাথে মেলামেশা করেন তবে এদের স্বভাবচরিত্র নষ্ট হবে, সরকারী বেতনভূক্ত কর্মচারী এরা রাষ্ট্রের ২য় পদমর্যাদার পদভূক্ত কোন ক্রমেই এরা ১ম শ্রেণীর আইন প্রণেতা ও ৩য় শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সাথে উঠাবসা চলাফেরা ও লেনদেন করতে পারবে না। যদি করে তবে ২য় শ্রেণীর পদমর্যদা আইন প্রয়োগকারী কর্মচারী বা আমলাদের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হবে। তারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারবে না বলে সমস্ত আধুনিক রাষ্ট্র চিন্তাবিদ গণ মতামত দিয়েছেন। তাই আধুনিক ও সভ্য শাসনের অন্যতম অপর একটি ভিত্তি রাষ্ট্র প্রশাসন বা আইন প্রয়োগকারী ম্যাজিস্ট্রেট অফিসার বিচার বিভাগের সদস্যরা তাদের ২য় শ্রেণীর শ্রেণী সচেতনতা বজায় রেখে চলবে, কোন ক্রমেই কোন সংসদ সদস্য কোন ব্যবসায়ীর সাথে সর্ম্পক রাখতে পারবেন না।

আধুনিক রাষ্ট্রে ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকদের এইসব তরিয়ত বা নিয়মআচার শিক্ষা দিয়ে থাকেন।

৩য়ত : রাষ্ট্রের ব্যবসায়ী শ্রেণীর, রাষ্ট্রে এদের পদমর্যদা ৩য় শ্রেণীর, এই ৩য় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা কোন ক্রমেই ১ম ও ২য় শ্রেণীর পদমর্যদার ধারে কাছে যেতে পারবে না, আইন প্রয়োগ করে কঠোর ভাবে বিধি-নিষেধ জারি করতে হবে, ব্যবসায়ীরা রাজনীতি ও প্রশাসনের কোন কাজে কোন কথা বলতে পারবে না, এরা সংসদ সদস্য, ম্যাজিস্ট্রেট

www.pathagar.com

ও বিচারকদের সাথে চলাফেরা করতে পারবে না। এদের সাথে সংসদ সদস্য, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকরা চলাফেরা করলে তাদের স্বভাব চরিত্র নষ্ট হবে। ঋকবেদের একটি লেখা থেকে নিরোদ সি চৌধুরী তার এক লেখা তুলে দিয়েছেন সেখানে বলা হয়েছে 'ফনা ধরা বিষাক্ত গোখরা সাপের সাথে বন্ধুত্ব করিও, কিন্তু কায়েথ বা বৈশ্যের সাথে বন্ধুত্ব করিও না, সদা তাদের থেকে সহস্র গজ দুরে থেকো'। মহাভারতের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মনরা মৃত্যুবরণ করেন, বেচে থাকে শুধু বৈশ্য ও শূদ্ররা, ৩৬ বছর বৈশ্যদের শাসন থাকে তারপর নিজেরা নিজেরা মারামারি করে রাষ্ট্রের সব মানুষ মরে যদু ও ভরত বংশ শেষ হয়ে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যেখানে বাহ্মনের চিন্তার ভিত্তিতে ক্ষত্রিদের শাসন থাকবে না, বৈশ্য আর নম শুদ্রের শাসন থাকবে সেখানে ন্যায় বিচার এবং শান্তি থাকবে না, শুধু চোখ দেখানো পাচুর্য্য থাকবে, কিন্তু ভিতরে থাকবে মারাত্বক অশান্তি আর অন্যায়'। কাজেই রাষ্ট্রে ব্যবসায়ী বা ৩য় শ্রেণীর পদমর্যদার লোকেরা যাতে আইন বানাবার কাজে আইন প্রয়োগ করার কাজে না আসতে পারে তার জন্য কঠোর দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু দূর্ভাগ্য বাংলাদেশে ১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট থেকে বাংলাদেশের ২য় পদমর্যাদার সরকারী কর্মচারী ও ৩য় পদমর্যদার ব্যবসায়ী লোকদের ১ম শ্রেণীর আইন প্রণেতা বা রাজনীতির অঙ্গনে বিচরণের অবাধ সুযোগ হয়েছে, এটা সুশাসন সভ্য শাসনের মারাত্মক বিরোধী। ডিভিশন অব লেবার, যার যে কাজ সেই কাজ ভাল পারে, এটাই চূড়ান্ত শেষ কথা। এর বাইরে কোন কথা নেই। বৈশ্য কায়েদ ব্যবসায়ী এরা কোন ক্রমেই আইন প্রণেতার কাজ ভালভাবে করতে পারবে না, কঠোরভাবে এটা দমন করতে হবে, আইন প্রণেতা সংসদ সদস্যরা যদি ব্যবসা করে তবে রাষ্ট্রে যারা ব্যবসা করে তারা কাজ পাবে না তারা কোথায় যাবে বিষয়টি ভালোভাবে চিন্তা করে দেখতে হবে।

আজ ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদার আইন প্রণেতা সংসদ সদস্যগণ ২য় শ্রেণীর প্রশাসন ও ৩য় শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের কাতারে নেমে এসে কাজ করে চলছে এটা খুব অন্যায় এবং সু শাসনের জন্য যা মারত্মক ক্ষতিকর। এটা বন্ধ করতে হবে। ২য় শ্রেণীর পদমর্যাদার সরকারী কর্মচারীগণ ১ম শ্রেণীর আইন প্রণেতা হবার জন্য এবং ৩য় শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের কাতারে নেমে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য নিয়োজিত, শেয়ার কেনা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ, যা মারাত্মক অপরাধ এটা কঠোরভাবে দমন করতে হবে।

৩য় শ্রেণীর পদমর্যাদার ব্যবসায়ী ২য় পদমর্যাদার সরকারী কর্মচারীদের সাথে চলাফেরা করেন, লেনদেন করেন কয়েকদিন পড়ে ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদা আইনপ্রণেতা শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছেন, যা সুশানের জন্য খুবই খারাপ। ব্যবসায়ীরা ন্যায় ও সৎভাবে ব্যবসা করে অর্থ উপার্জন করে রাষ্ট্রকে সঠিকভাবে কর দিবেন, গরীব মানুষদের দান খয়রাত করবেন এটাই প্রত্যাশা ও বিধান, ব্যবসায়ীরা ৩য় পদমর্যাদায় থাকুন দয়া করে ২য় ও ১ম মর্যাদায় যাবেন না।

রাষ্ট্রের ৪র্থ শ্রেণী হচ্ছে যারা শারীরিক পরিশ্রম করে কাজ করে তারা, যারা মাথা খাটিয়ে কাজ না করে হাত পা চালিয়ে কাজ করে তারা, যেহেতু এই শ্রেণীর হাত পা চালিয়ে

www.pathagar.com

কাজ করে, কাজেই স্বাভাবিক ভাবে ধরে নেয়া যায় বিচার বুদ্ধি করার ক্ষমতা এদের নেই, এদের দয়ামায়া অনেক কম, পেটের ক্ষুধা নিবৃত্ত করাই এদের একমাত্র চিন্তা। যে মানুষের পেটে ক্ষুধা সে কোন দিন সুস্থ্য চিন্তা করতে পারে না, যে সুস্থ চিন্তা করতে পারে না অসুস্থ চিন্তা করে তার থেকে দূরে থাকতে হয় নিজের ভালোর জন্য, এই শূদ্র বা ৪র্থ শ্রেণী রাষ্ট্রের শারীরিক কাজে যারা নিয়োজিত তাদের যাতে পেটে ক্ষুধা না থাকে, তারা যেন ভালোভাবে খেতে পায়, বস্ত্র পায় চিকিৎসা পায়, মাথা গুজার জায়গা পায়, তা রাষ্ট্রের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর লোকেরা দেখবে। ১ম শ্রেণীর বিধান করবে ২য় শ্রেণী সে বিধান প্রয়োগ করবে, ৩য় শ্রেণী উচিত পারিশ্রমিক ও দানখয়রাত করবে, ৪র্থ শ্রেনীকে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই ৪র্থ শ্রেণী থেকে আজ রাষ্ট্রের ১ম শ্রেণীর আইন প্রণেতা নির্বাচিত হচ্ছে, আর ৪র্থ শ্রেণী থেকে আগত এই সব সংসদ সদস্যরা যেসব কাজ করে চলছে তা ভয়াবহ, অস্ত্রবাজি অন্যের ঘরে অস্ত্র রেখে পুলিশ দিয়ে তাকে গ্রেফতার, রিলিফের দুস্থ মাতাদের কার্ড চুরি, ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সামনে বসে তাদের পা ধরে জুতা ধরে কথা বলা ইত্যাদি।

কাজেই ৪র্থ শ্রেণী থেকে আগত কোন লোক যেন কোন ক্রমেই সংসদ সদস্য হতে না পারে আইন প্রণেতা হতে না পারে তার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র যারা নিয়ন্ত্রণ করে চলছেন কঠোর ভাবে তার প্রতি নজর দিতে হবে। দল যখন ক্ষমতায় থাকে না তখন এই শ্রেণীর লোকদের কোন দেখা পাওয়া যায় না, যখন নিরপেক্ষ দুর্বল সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন এরা বাইরে এসে গায়ের জোরে চাপার জোরে নেতা নেত্রীদের পায়ে ধরে জুতা ধরে দলের ভদ্র ও ভালো লোকদের উৎখাত করে নমিনেশন নিয়ে এমপি হয়ে রাষ্ট্র ও সমাজের সর্বনাশ করে চলেছে।

উপরের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে যা প্রয়োজন তা হচ্ছে কঠোরভাবে শ্রেণী সচেতনা মেনে চলা, যার যা কাজ তাই করতে হবে, একজনের কাজ অন্যজনে করতে পারবে না, যদি করে তবে রাষ্ট্র ও দেশের সর্বনাশ, সবাই নিজেদের শ্রেণীর মধ্যে থাকবে কেউ সীমা অতিক্রম করতে পারবে না, সভ্য ও সুশাসনের জন্য।

মহাভারত নামক মহাগ্রন্থে অনুশাসন পর্বে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সামনে যুধিষ্টিরের উদ্দেশ্যে সরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম আচার্য বলেছেন, ‘যদি নমশুদ্র বা কায়িক শ্রমরত কোন মানুষের হাতে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকে তবে সে অর্থ দ্বারা প্রথমে সে নিজের তারপরে সমাজের, তারপরে দেশের ভয়াবহ সর্বনাশ করবে, কাজেই রাজার পবিত্র কতর্ব্য যারা ৪র্থ শ্রেণী তাদের শুধু খাবার বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা করতে যা প্রয়োজন সেটুকু অর্থ তার কাছে রেখে বাকি টাকা সমাজ ও রাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য কর ধরার মাধ্যমে জোর করে কেড়ে নিতে হবে’। ৪র্থ শ্রেণীর লোকের হাতে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ হবার ফলে আজ বাংলাদেশে আমরা তার খেসারত দিচ্ছি, এই টাইপের লোকেরা পাকিস্তান ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পক্ষে কথা বলে, রাজাকার আলবদরদের পক্ষে কথা বলে, বিএনপি ও জামাত সমর্থন করে মোট কথা এই শ্রেণীর হাতে গত ৪০ বছরে প্রচুর উদ্বৃত্ত অর্থ হবার জন্য এদের মাথা গরম হয়ে গিয়েছে এরাও আজ শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়ার আশে পাশের চাকর বাকরদের

www.pathagar.com

ঘুষ দিয়ে পায়ে ধরে ১ম শ্রেণীর পদমর্যাদার আইন প্রণেতা হচ্ছে যা খুবই দুখজনক।

বর্তমান পৃথিবীতে ইংরেজী ১৪০০ সনের আগে উপরে বর্নিত বিভাগ বা সেপারেশন অব পাওয়ার ছিল না, প্রাচীন কালে ছিল যার জন্য ১৪০০ সনের আগে পৃথিবীর ১০০০ বছরের ইতিহাস মধ্যযুগের বর্বর ইতিহাস, কল্লাকাটা রক্তপাতের ইতিহাস ন্যায়নীতি না থাকার জন্য, সেপারেশন অব পাওয়ার না থাকার জন্য। কাজেই রাষ্ট্রচিন্তাবিদগণ কঠোরভাবে উপরে বর্ণিতভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকদের কাজের শ্রেণীবিণ্যাস করে কঠোরভাবে যার কাজ তার, এই ভাবে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করে কাজের পৃথককিকরণ বা সেপারেশন অব পাওয়ার প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেছেন। ইংল্যাণ্ড, জার্মান, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীক, স্পেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ সমস্ত সভ্য দেশে এই সেপারেশন অব পাওয়ার তত্ত্বকথা মেনে নিয়ে কঠোরভাবে পালন করছেন যার জন্য তাদের আধুনিক সভ্য শাসনের দেশ হিসেবে পরিগণিত করা হয়। যারা এই সেপারেশন অব পাওয়ার তত্ত্ব গ্রহণ করে নাই তাদের অসভ্য বা বর্বর শাসনের দেশ বলা হয়।

আমাদের দেশেও অনেক রাজনীতিক নেতা, নেত্রী, মন্ত্রী সেপারেশন অব পাওয়ারের স্বপক্ষে কথা বলে থাকেন, কিন্তু এরা মুখে বলে অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে বাস্তবে কাজের মাধ্যমে তা প্রতিষ্ঠা করে না, বরং মুখে যা বলে বাস্তব কাজে তার উল্টা করে চলছেন, যার নাম মুনাফেকী। আর আল্লাহ পবিত্র কুরআনে অনেক বার বলেছেন মুনাফেকদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে কঠোর শাস্তি, আর কুরআনের এই কথা এদেশে ঘটে যাওয়া অনেক ঘটনার মাধ্যমে সত্য বলে আমরা প্রমাণ পেয়ে থাকি, তাই বলি আসুন আমরা পবিত্র কুরআনের শিক্ষাগ্রহণ করে মুনাফিকী করা থেকে বিরত থাকি আসুন সভ্য দেশের সভ্য শাসন ব্যবস্থা মেনে চলি, সেপারেশন অব পাওয়ার প্রতিষ্ঠা করি।

এখানে প্রশ্ন আসবে ১ম বর্ণের আইন প্রণেতা কারা হবেন কোন শ্রেণী থেকে আসবে। আধুনিক রাষ্ট্রে তারা অবশ্যই অবাধ স্বাধীন নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন, তবে তারা যে নির্বাচনের প্রার্থী হবেন তার জন্য যে দল তাদের মনোনীত করবেন তারা অবশ্যই শিক্ষিত, দয়ালু, হৃদয়বান, সত্যবাদি, ত্যাগী ব্যক্তি হবেন, আর এসব বৈশিষ্ট্য ১-২ বছরে অজর্ন করা যায় না। বেশ কয়েক বছর পরীক্ষা-নীরিক্ষার ম্যাধ্যমে চলার পরেই ঠিক করা করা যায় কে সত্যবাদী, কে দয়ালু, কে ত্যাগী কে পরোপকারী। সাধারণত রাষ্ট্র বা সমাজে শিক্ষাদানে থাকে যারা, ২য় শ্রেণীর প্রসাশনের প্রশাসন ও বিচারকার্যে সাহার্য্য করে থাকে যারা, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে লেখালেখি করেন, তাদের মধ্যেই উপরে বর্ণিত গুণাবলীর সমাহার পাওয়া যায়। আর সে জন্যেই এরাই দলীয় মনোনয়ন পাবার ১ম শ্রেণীর হকদার।

২৭.০২.২০১০
ভোর পাঁচটা, শনিবার

www.pathagar.com

তাজউদ্দিন আহমদ, ১৯৭৪ সনের আওয়ামীলীগের কাউন্সিল : প্রেক্ষিত ২০১০ এবং ২০১৪ সনের সংসদ নির্বাচন

১৯৭৪ সনের আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন হয়, যে কাউন্সিলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সভাপতির পদ ছেড়ে দেন এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান সভাপতি হন। এই কাউন্সিল অধিবেশনে তদানিন্তন অর্থমন্ত্রী ৩ ঘণ্টা লম্বা বক্তৃতা করেন বঙ্গবন্ধুর শেষ অধিবেশনের সভাপতিত্বে বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত। তাজউদ্দিন সাহেব ওই বক্তৃতায় এক পর্যায়ে বলেন, 'বঙ্গবন্ধু যারা ভালো মা-বাবা বা ভালো মানুষ তাদের ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরে গিয়ে মারামারি করে মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়িতে এলে ভাল মা-বাবা যারা তারা তাদের ছেলেদের আরও মারে বা শাস্তি দেয়, কেন বাইরে গেলি, কেন মারামারি করলি। আর যারা খারাপ মা-বাবা বা খারাপ মানুষ তারা তাদের ছেলেমেয়েরা বাইরে থেকে মার খেয়ে বাড়িতে এলে তারা কোমড়ে কাপড় বেঁধে লাঠি হাতে চিৎকার করে বাইরে বের হয়, বলে আমার সোনার ছেলেমেয়েকে কে মেরেছে তাকে শিক্ষা দিব। কাজেই আপনাকে ঠিক করতে হবে আপনি ভাল মা-বাবা হবেন, না খারাপ মা-বাবা হবেন। যদি ভাল মা-বাবা হতে চান তবে নিজের দল ছাত্রলীগ, যুবলীগ, আওয়ামীলীগ কর্মী যারা মারামারি করে, অস্ত্র রাখে তাদের থামান।' ১৯৭৪ সনে ২০০০ আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী কাউন্সিলার এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বিপুল করতালির মাধ্যমে তাজউদ্দিন সাহেবের এই বক্তব্যকে সমর্থন জানান।

গত কয়েকদিন আগে ছাত্রলীগ-ছাত্রলীগ, শিবির ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে সংঘাত জীবন নিয়ে হানাহানি যেসব ঘটনা ঘটেছে তা দেখে ১৯৭৪ সনের আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে তাজউদ্দিন প্রদত্ত ভাষণ ও বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের সজোরে হাততালির কথা মনে পড়ছে। অল্প বয়সের তাজা প্রাণ, তাজা রক্তের ছাত্রসমাজ বা তরুণ সমাজ এক সাথে অনেকে এক জায়গায় থাকলে মারামারি, সংঘাত ও জীবনহানি হবেই, এটা কেউ বন্ধ করতে পারবে না, তবে অনেকটা দমন করে রাখা যাবে। আর ছেলে ছোকরাদের মারামারিতে বয়স্কদের মাথা গরম করা একেবারেই অনুচিত কাজ। ছাত্রলীগ মারামারি করে কেউ মরেছে, অনেকে মার খেয়েছে, আবার শিবির-ছাত্রলীগ মারামারি করে ছাত্রলীগের একজন মরেছে এবং মার খেয়েছে, এটাকে স্বাভাবিক ঘটনা বলেই নেয়া উচিত। এরজন্য রাষ্ট্র প্রশাসনের বয়স্ক ব্যক্তিদের যুদ্ধে নামা মোটেই ঠিক কাজ নয়। যদি রাষ্ট্র প্রশাসন এমন কাজ করে তবে বর্তমানে রাষ্ট্র প্রশাসনের যারা দায়িত্ব পেয়েছেন তারা জনমত হারাবেন, আর এর প্রভাব পড়বে ২০১৪ সনের নির্বাচনে। আর সে নির্বাচনে যদি শেখ হাসিনা পরাজিত হন আবার যদি খালেদা জিয়ার বিএনপি ক্ষমতায় আসে তবে তা হবে খুবই দুঃখজনক।

www.pathagar.com

২০০৮ সনের ২৯ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে যে কারণে শেখ হাসিনা ব্যাপকভাবে ভোটে জিতেছেন সে কারণগুলো হলো :

১. খালেদা জিয়া, তারেক জিয়া, হাওয়া ভবন, জামায়াত-নিজামীদের অপশাসন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, দুর্নীতি, নিরপেক্ষ প্রশাসনের অভাব, যার জন্য তারা জনমত হারান এবং শেখ হাসিনার পক্ষে জনমত যায়।

২. শেখ হাসিনার রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে সেরা দুইটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের একটি আওয়ামীলীগ থেকে সমাজতন্ত্র বিতাড়ন অপরটি আল্লামা শাইখুল হাদিস আজিজুল হক সাহেবের সমর্থন আদায় ও তার সাথে চুক্তি। ফলে ব্যাপক সাধারণ মুসলমানের ধারণা হয় বিএনপি-জামায়াতের কথা ঠিক নয়, আওয়ামী লীগ ইসলাম ধর্ম বিরোধী দল নয়, যা নির্বাচনে আওয়ামীলীগের পক্ষে বিরাট ভুমিকা রেখেছে।

৩. সাবেক রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদের সাথে জোট বেধে নির্বাচন।

৪. নির্বাচনের আগে জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি বক্তব্য দেশের সাধারণ জনগণ খুবই আগ্রহ ও আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেছিলেন, তা হচ্ছে নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, 'আমি যদি ক্ষমতায় যাই, যদি প্রধানমন্ত্রী হই তবে কয়েক হাজার দলীয় লোকদের প্রধানমন্ত্রী হব না, ১৪ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী হবো। সবার সাথে সমান আচরণ করবো। খালেদা জিয়ার মত শুধুমাত্র ছাত্রদল, যুবদল ও বিএনপি-জামায়াতের প্রধানমন্ত্রী হব না। জননেত্রী শেখ হাসিনার এই কথাটি জনসাধারণ খুব ভালোভাবে নিয়েছিলেন।

গত ২০০৮ সনের সংসদ নির্বাচনে আমি সিরাজগঞ্জ সদর ও কামারখন্দ থানার আমার আত্নীয়া জান্নাত আরা হেনরি এবং আমাদের বেলকুচি-চৌহালী নির্বাচনী এলাকার আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসের নির্বাচনে ১৮টি জনসভায় বক্তৃতা করেছি ১০ দিনে। আমার প্রদত্ত ওইসব বক্তৃতায় আমি অনেক কথা বলেছি শেখ হাসি-না ও আওয়ামীলীগের রাজনীতির পক্ষে, কিন্তু নেত্রী শেখ হাসিনার প্রদত্ত উপরের বক্তব্যটি আমি যখন বক্তৃতায় বলেছি- যে আমাদের নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হলে দেশের সব মানুষের প্রধানমন্ত্রী হবেন, খালেদা জিয়ার মত শুধুমাত্র ছাত্রদল, যুবদল, বিএনপি-জামায়াতের প্রধানমন্ত্রী হবেন না, তিনি ১৪ কোটি মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন। নেত্রী শেখ হাসিনা সব মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করবেন। আমার এ বক্তব্য শুনে জনসভায় সমাগত হাজার হাজার মানুষ স্বতস্ফূর্তভাবে যেভাবে করতালি দিয়ে সমর্থন দিয়েছেন তা বর্ণনা করার ক্ষমতা আমার নেই।

কাজেই আমাদের প্রিয় হাসিনা আপাকে অনুরোধ করব দয়া করে সুবিধাবাদী, চাটুকার স্তাবক ও চাকরদের কথায় প্রভাবিত হবেন না, নির্বাচনের আগে প্রদত্ত আপনার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করুন, সবাই আপনার সন্তান, ছাত্রলীগ, শিবির, ছাত্রদল আপনি এদের সবার মা। দয়া করে চাকরদের (যারা মাসে মাসে বেতন পায়) কথা মত মাথা গরম করে জামায়াত-শিবিরের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার, অবিচার করবেন না। নিরপেক্ষ আইনের মাধ্যমে যা হবার তাই হবে, আইন নিজস্ব গতিতে চলবে। আইনকে

www.pathagar.com

কোনভাবেই প্রভাবিত করা ঠিক হবে না। দুনিয়াতে জোর-জবরদস্তি করে যুদ্ধ করে আক্রমণ করে কোন বিজয় অর্জন করা যায় না, তার প্রমাণ পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তারা যদি ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ রাতে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে হত্যা না করত, বঙ্গবন্ধুকে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার না করত তবে ১৯৭১ সনে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হতো না। প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার মাধ্যমে দুনিয়ার সব কিছু জয় করা যায়, জোর জবরদস্তির মাধ্যমে কিছুই পাওয়া যায় না।

জামায়াত-শিবির দমন করার চাইতে আমাদের বড় বেশি দরকার ২০১৪ সনে শেখ হাসিনার নির্বাচনে বিজয়। এরজন্য জনমত তুষ্ট রাখতে হবে। আওয়ামী লীগের মূল শত্রু বিএনপিকে দুর্বল করতে হবে, বিএনপির ঘাড়ে ভর দিয়েই জামায়াত-শিবির, রাজাকার-আলবদর সাম্প্রদায়িক শক্তি, লুটেরা, কোটি কোটি টাকার মানুষ যত অপকর্ম করে আসছে। কাজেই ২০১৪ সনের নির্বাচনে যদি আর একবার বিএনপিকে পরাজিত করা যায় তবে তা দেশের জন্য খুব মঙ্গল হবে। এরজন্য জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সুশাসনের আশ্রয় নিতে হবে, জনমত পক্ষে রাখতে হবে। ২০০৯ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত যারা আওয়ামীলীগ ও শেখ হাসিনার বিপক্ষে কথা বলতে চাইত তাদের সামনে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বলতাম গত এক বছরে শেখ হাসিনার শাসনে কোন মানুষ মরে নাই, বিএনপি ও ছাত্রদলের কেউ মরে নাই, কোন মায়ের কোল খালি হয় নাই। বিএনপির প্রথম একবছরের শাসনে অনেক মানুষ হয়েছে, আমার এ কথার জবাব দিতে পারে নাই তারা, এ বক্তব্য সমর্থন করেছে। কিন্তু ২০১০ সনের জানুয়ারি মাস থেকে দ্রুত পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে, এটা বন্ধ করতে হবে। এসপি, ডিসিকে বলে দিতে হবে আপনার জেলায় আইন শৃঙ্খলা করে কঠোরভাবে রক্ষা করা আপনাদের দুজনের কাজ, অন্য কারও কাজ নয়। এরজন্য যদি আওয়ামীলীগের কোন এমপিকে গ্রেফতার করতে হয় করবেন। আর যদি সঠিকভাবে এসপি, ডিসি সাহেবরা এসব পারে, আইন শৃঙ্খলা করে প্রতিটি মানুষের জীবন রক্ষা, মান-সম্মান রক্ষা ও সম্পত্তি রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন তবেই ২০১৪ সনের নির্বাচনে আবার আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা অবশ্যই ক্ষমতায় আসতে পারবেন। তারজন্য যোগ্য, দক্ষ, সৎ ও ঈমানদার এসপি, ডিসির দরকার। কোন ভাইয়ের সুপারিশেই এসপি ডিসির দ্বারা এ কাজ সমাধা হবে না, একমাত্র আইজিপির মনোনীত এসপি এবং সংস্থাপন সচিবের মনোনীত ডিসিরা এ কাজ পারবে। কোন ভাইয়ের সুপারিশকৃত এসপি, ডিসির দ্বারা কোন ন্যায় ও ভাল কাজ করা সম্ভব নয়। সরকারি চাকুরিতে যোগদান করার পরেও যারা বলে আমি আওয়ামী লীগ, আমি বিএনপি করি, তারা মিথ্যা বলেন, তারা প্রতারক, এখন প্রশাসনের চেয়ারে বসে কেউ বলে না আমি বিএনপির লোক, সব আওয়ামীলীগ, আবার যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন একজনকেও দেখি নাই কেউ আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলেছেন। যারা আওয়ামী লীগ, আবার যখন বিএনপি ক্ষমতায় ছিল তখন একজনকেও দেখি নাই কেউ আওয়ামী লীগের পক্ষে কথা বলেছেন। যারা আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার লোক বলে পরিচয় দিয়ে প্রশাসনের ভাল ভাল চেয়ারে বসেছে এদের কাছে কোন ছাত্রলীগ,

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার কর্মীর পরিচয়ে কাজে গেলে আইনের মাইরপ্যাঁচের কথা বলে সবচেয়ে বেশি অসহযোগিতা করে, কোন কাজই করে না। যারা নিরপেক্ষ, কোন দল করে না, তারা কোন ভাল চেয়ারে বসলে বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে বিএনপির কর্মীদের এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগ কর্মীদের আইনের মাইরপ্যাঁচের মাধ্যমে কাজ করে দেয়।

আমাদের সবার মনে রাখা দরকার স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র যখন এই ধরাধামে মানবদেহ ধারণ করে রাজা হয়ে দেশ পরিচালনা করেছে তিনিও জনমতকে তুষ্ট রাখার জন্য মা সীতার মত পুন্যময়ী আদর্শ নারীকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই কোনভাবেই জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করা যাবে না। জনমতকে পক্ষে ধরে রাখতে হবে, আর এর একমাত্র উপায় সমদর্শী, ন্যায় বিচার, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সব নাগরিক আমার বাবা, মা, ভাই-বোন কেউ পর নয়, আমি সবার অতি আপনজন, এই বোধে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে অটল থাকতে হবে। ক্ষমতায় থেকে কোন নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি দিলে আল্লাহ তা বরদাস্ত করেন না।

১৬.০২.২০১০ মঙ্গলবার, ভোর ৪টা

www.pathagar.com

আল্লাহর শত্রু সীমান্ত রক্ষী ধ্বংস হোক নিপাত যাক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি লেখায় পড়েছি– 'কোনকালে কোন যুগে কোন দেশের সমাজ ও রাষ্ট্রের কোন মানুষের মৌলিক চাহিদার সুখ ও দুঃখের সামান্যতম পার্থক্য নেই, সব কালের সব দেশের সব মানুষের মৌলিক চাহিদা ও সুখ দুঃখ এক। যারা আধুনিককাল ও প্রাচীনকালের মানুষের মৌলিক সুখ-দুঃখকে আলাদা করে দেখাতে চান তারা সত্য থেকে অনেক দূরে থাকেন'।

এটাই সত্য কথা। সব মানুষ এক, এক বনী আদমের সন্তান। হিন্দু-মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, শিখ সব মানুষ এক, সবাই একে অপরের ভাই। যে কাজ দ্বারা নিজের এবং অপরের ক্ষতি হয় তাহাই অধর্ম, যে কাজ দ্বারা নিজের এবং অপরের ক্ষতি হয় না তাই ধর্ম', এর বাইরে কোন কথা নেই। আল্লাহর দুনিয়ার সব মানুষ এক, ভারত বাংলাদেশ, পাকিস্তান, বার্মা, ইরান, ইরাক, আরব, আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ইউরোপ সব এক আল্লাহর সৃষ্টি। এখানে বসবাসকারী সব মানুষই একই আল্লাহর সৃষ্টি। সবাই একে অপরের ভাই, এক ভাই অপরের সাথে অবাধে চলাফেরা করবে, মেলামেশা করবে এটাই পবিত্র কোরআনের শিক্ষা। দুই-চারজন লোকের ক্ষমতায় যাবার জন্য ভেদাভেদ সৃষ্টি করে বর্ডার দিয়ে, সীমানা দিয়ে তা বন্ধ করা হয়েছে। যা কোরআন, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারতের শিক্ষার প্রচণ্ড বিরোধী কাজ। পৃথিবীর মধ্যে শুধু বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এই তিনটি দেশের সীমানায় সীমান্তরক্ষী থাকে। দুনিয়ার আর কোন দেশে এই আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী ব্যবস্থা বা সীমানায় রক্ষী থাকে না। ১৯৯০ সন পর্যন্ত ভারত সীমান্তে বিএসএফ এবং ১৯৮০ সন পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তে বিডিআর পূর্ণ সময় থাকে নাই, মাঝেমধ্যে টহল দিত। এতে দেশের কোন ক্ষতি হয় নাই। লাখ লাখ গরীব মানুষ অবাধে সীমান্ত পারাপার হয়ে ছোটখাট ব্যবসা করে উপকৃত হয়েছে, আজ তা বন্ধ করা হয়েছে। চোরাচালান কাকে বলে বুঝতে পারি না, একদেশ থেকে অন্যদেশে পণ্যসামগ্রী কেনাবেচাকে চোরাচালান বলা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা বোঝা যায় না, আমাদের প্রিয় নবী নিজ দেশ মক্কা থেকে সিরিয়ায় কাপড় বিক্রি করতে গিয়েছিলেন। যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। এখন উচিৎ বর্ডার তুলে দেওয়া। মানুষ অবাধে এক দেশ থেকে অপর দেশে যাবে, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করবে, আল্লার কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী হালাল পথে তেজারত বা ব্যবসা করার জন্য। বিডিআরে যারা চাকরি করে তারা সরাসরি আল্লাহর নির্দেশ অমান্যকারী আল্লাহর শত্রু, এরা ডাকাত। একদেশ থেকে অন্যদেশে মালামাল নিতে বাধা দেয় এবং এদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত মালামালের অর্ধেকের বেশি কেড়ে নিয়ে নিজেরা আত্মসাত করে। এদের উপরে আল্লাহ গজব দিয়েছে আরও দিবে। যাদের আল্লাহ ও কোরআনের প্রতি আস্থা আছে তাদের বিডিআরে চাকরি করা উচিৎ নয়। যারা করেছেন তারা তওবা পড়েন, উপার্জিত অর্থ গরীবদের মধ্যে দান-খয়রাত করে, যজ্ঞ করে পাপমুক্ত

www.pathagar.com

হন।

পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে বর্ডার বন্ধ করে নাই, অবাধে মানুষ যাতায়াত করে। বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ যারা নিয়মিত নামায পড়ে, নিয়মিত পূজা করে, ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম মানে তাদের শতকরা ৯৯ ভাগের চেয়েও বেশি মানুষ ভাল, কোন নামায পড়া, পূজা করা, দাড়ি রাখা, টুপি পড়া মানুষ ভারতে অস্ত্র নিয়ে গিয়েছে, বা বাংলাদেশে অস্ত্র নিয়ে এসেছে, এমন কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ভারতে অস্ত্র পাচারের জন্য অভিযোগ উঠেছে, সেনাসদস্য রেজ্জাকুল হায়দার ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে। কাজেই শাস্তি দিতে হলে রেজ্জাকুল হায়দার ও তার দোসরদের দিতে হবে, কিন্তু এরজন্য যারা নিয়মিত নামায পড়ে, দাড়ি রাখে, টুপি পড়ে, পূজা করে, ধুতি পড়ে তারা কেন খেসারত দিবে তা বুঝতে পারি না, যারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে (দুইচারজন বাদে), মন্দিরে গিয়ে পূজা করে তাদের মন অনেক ভাল। তারা খুব ভাল মানুষ। কাজেই ভারত সরকারের, পাকিস্তান সরকারের কোনক্রমেই উচিৎ নয় এই নামায পড়া ও পূজা করা লোকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পাকিস্তানে সন্ত্রাস করে মানুষ হত্যা করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী, নিজের দেশের নিরীহ মানুষ নির্মমভাবে বোমা মেরে হত্যা করে আমেরিকা থেকে কোটি কোটি ডলার আনে সন্ত্রাস দমনের নামে। তবে মাথার উপরে আল্লাহ আছে, ভগবান আছে, ঈশ্বর আছে, তিনি সব দেখেন, তিনি সব বুঝতে পারেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে আল্লাহর বিচারের পরিণতি বা শাস্তি ভোগ একদিন করতেই হবে। বাংলাদেশেও যেসব নিরীহ মানুষ হত্যা হয়েছে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এর একুশজনসহ অনেক জায়গায়, তার পিছনেও সেনাসদস্য রেজ্জাকুল হায়দারের নাম এসেছে। পাপ করলে পাপের শাস্তি অবশ্যই আল্লাহর বিচার থেকে পেতেই হবে। তবে তারজন্য কিছু সময় অপেক্ষা করতে হয়।

বর্ডার থেকে সম্পূর্ণ বিডিআর প্রত্যাহার করা হোক, বিডিআর বর্ডারে রাখা কোরআনের শিক্ষার বিরোধী, মানবতা বিরোধী, জাতিসংঘের সনদ বিরোধী। জাতিসংঘের সদস্য হবো, তার সুযোগ-সুবিধা নিবো, ডাব্লিউএফটিএ (ওয়ার্ল্ড ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট)-এ স্বাক্ষর করব, অথচ স্বাক্ষর করা সনদ মানব না। মুসলমান বলে পরিচয় দিব, আল্লাহর দেওয়া আকাশ-বাতাস, রবি-শসি, মাটি, মিঠা পানি, ফল-মূল, ফসল ভোগ করব অথচ আল্লাহর বিধান দুনিয়ার সব মানুষ এক, দুনিয়ার সব জায়গায় মানুষ যাবে, হালাল পথে তেজারত করার জন্য তা মানব না। পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার ১৭৭ নম্বর আয়াতে রয়েছে 'পশ্চিম দিকে মাথা নত করে এবাদত করার চাইতে বিদেশী মুসাফিরকে আদর-যত্ন, সাহায্য করলে তারচেয়ে অনেক বেশি পুণ্য হয়'। অথচ বাংলাদেশে কোন বিদেশী বিনা ভিসায় এলে তাকে হাতকড়া লাগিয়ে গ্রেফতার করে অনাহার অর্ধাহারে রেখে দুই-তিন বছরের জেল পর্যন্ত দেওয়া হয়। পৃথিবীর কোনদেশ এ কাজ করে না। কেউ বিনা ভিসায় কোন দেশে গেলে তাকে শুধু আবার তার নিজ দেশে ফিরিয়ে দেয়, তাও সব দেশ এ কাজ করে না। সরাসরি আল্লাহর কোরআন ও জাতিসংঘ সনদের বিধানের লঙ্ঘন। তা হয় না, মোনাফেকদের শাস্তি আল্লাহ কেয়ামত ও আখেরাতেই দেয়। আমার মনে হয়

www.pathagar.com

সেজন্যই আল্লাহর গজব, শাস্তি, মানুষ হত্যা, মুসলমানদের দেশ এবং বাংলাদেশে যত হয় দুনিয়ার আর কোন দেশে তা হয় না।

কাজেই দয়া করে বিডিআরে যেন কোন মুসলমানের সন্তান চাকরি করতে না যায়, সরকার যেন বিডিআর উঠিয়ে দেয়, যা আছে তাই। সবাই রিটায়ার্ডে যাবে, একজন যেন নতুন রিক্রুট না হয়। মনে রাখা দরকার ১৯৭১ সনের ২৫ মার্চ এদেশে মাত্র ২৫০০ বিডিআর সদস্য ছিল। এতে দেশের কোন ক্ষতি হয় নাই। ১৯৭০ সনে এদেশের ৮০ভাগ লোক না খেয়ে থাকতো, ২০ভাগ লোক নিয়মিত খাবার খেত। ২০১০ সনে ৮০ ভাগ লোক নিয়মিত খাবার পায়, ২০ ভাগ লোক খাবার পা্য় না। এরজন্য বর্ডার বা বিডিআরের চোরাচালানি বন্ধের কোন ভুমিকা নেই। কেন ৮০ভাগ দেশের লোক আজ খাবার পাচ্ছে তা জানার জন্য এ বইয়ের ৪৯৪ পৃষ্ঠার ২০১৫ সনে যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখি শিরোনামের লেখাটি পড়ুন।

আল্লাহর শত্রু সীমান্ত রক্ষী খতম হোক, নিপাত যাক, যারা বিডিআর সৃষ্টি করে তারাও আল্লাহর শত্রু, আমি চাই বা না চাই এদের প্রতিও আল্লাহর গজব আসবেই। বর্ডারমুক্ত বাংলাদেশ-ভারত চাই, বার্মা চাই। বাংলাদেশ রাষ্ট্র থাকবে, নিজস্ব টেরিটরি থকবে, সেনাবাহিনী থাকবে, পুলিশবাহিনী থাকবে, সিভিল প্রশাসন থাকবে, সরকার থাকবে কিন্তু সিমান্তে কোন বিডিআর বিএসএফ থাকবে না, পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের মত।

১৯৪৭ সনের বাংলা ভাগের ভারত ভাগের পাকিস্তান সৃষ্টির সবচেয়ে বড় নায়ক যোগেন মণ্ডল। যে পাকিস্তানের জিন্নাহ সাহেবের প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিল, সে ১৯৫২ সনে পাকিস্তান থেকে চোরের মত পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় এবং পশ্চিম বাংলায় গেলে কোন মানুষের সমাজে তার আশ্রয় হয় না। রানাঘাটের কাছে একটি শূকরের খামারে তার আশ্রয় হয়। সেখানেই শূকরদের সাথে বহু বছর বসবাস করে অনেকদিন অনাহার অর্ধাহারে ও বিনা চিকিৎসায় করুণভাবে মৃত্যুবরণ করে, এসব দেখে মানুষের শিক্ষা নেয়া উচিৎ। যে যোগেন মণ্ডল ছিল বৃটিশ শাসনামলে ভারতে সবচেয়ে ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। গান্ধী, নেহেরু, জিন্নাহ, সরদার প্যাটেল, মওলানা আজাদকে যে নিজের চাকরদের চেয়ে অনেক ছোট মানুষ ও নেতা মনে করতো। নমশুদ্র-মুসলমান ভাই ভাই, বর্ণ হিন্দুর রক্ত চাই, স্লোগান দিয়ে যে ভারতের সবচেয়ে ক্ষমতাবান ব্যক্তি হয়েছিল দেশভাগের পর বর্ডার সৃষ্টির পাকিস্তান সৃষ্টির যে মূল নায়ক, সেই যোগেন মণ্ডলের কি করুণ মৃত্যু। মরার আগে যোগেন মণ্ডল লিখিতভাবে লিফলেট বিলি করেছে, 'আমি ভুল রাজনীতি করেছি, আমি দেশভাগ করে মারাত্মক অন্যায় ও পাপ কাজ করেছি, আমি ক্ষমা চাই, আমার রাজনীতি ছিল ভুল। আল্লাহ মানুষকে শিক্ষা নেবার জন্য এসব দেখান তবুও আমরা শিক্ষা নেই না।

২০০5 সনে কোরবানীর ঈদে একটি ভাল গরুর চামড়া বিক্রি হয়েছে চার হাজার টাকায়, আর ২০০9 সনে দুইশত'র মত ট্যানারির মালিক সিন্ডিকেট করে পুলিশ, র‍্যাব, বিডিআর কয়েকজন নষ্ট সাংবাদিককে তুষ্ট করে চোরাচালান দমনের অজুহাতে এবারের

www.pathagar.com

কোরবানির ঈদে একটি ভাল গরুর চামড়া ক্রয় করল মাত্র চারশত টাকায়। কত গরীব এতিম ও বিধবা মানুষের কত হাজার কোটি টাকার ন্যায্য হক থেকে বঞ্চিত করল, অবাধে বাণিজ্য থাকলে সীমান্তে রক্ষী না থাকলে চোরাচালানের জুজুর ভয় না থাকলে এটা করা সম্ভব হতো না। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, পবিত্র কোরআনের নির্দেশ অমান্য করে ভারত-বার্মা সীমান্তে শক্তিশালী বিডিআর বিএসএফ বা সীমান্তরক্ষী রাখলে কোন প্রধানমন্ত্রী ও তার উপদেষ্টাগণ যত চেষ্টাই করুন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবেন না। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখার একমাত্র উপায় বিডিআর-বিএসএফ এর বিলুপ্তি করে পবিত্র কোরআনের অনুশাসন হালাল পথে দুনিয়াব্যাপী তেজারত বা ব্যবসা করা। হালাল তেজারত মানে কাস্টমস ট্যাক্স নয়, ভাল গুণগতমানের পণ্য ও ওজনে কম না দিয়ে বিক্রি করা। শক্তিশালী সিমান্তে রক্ষী বাহিনী রাখলে দ্রব্যমূল্য অবশ্যই উর্ধ্বমুখী হবে।

৭.৩.২০১০ সকাল ৭টা, রবিবার

www.pathagar.com

আবুল হাশিম, তাজউদ্দিন আহমদ এবং ১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধ ও দালাল আইন

আল্লাম্মা আবুল হাশিম, ১৯০৫ সনের ২৭ জানুয়ারি বর্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন। আবুল হাশিম সাহেবের বাবার নাম আবুল কাশেম। যিনি অবিভক্ত বাংলার আইন পরিষদের স্পিকার ছিলেন। রাজনীতিতে তিনি স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর একনিষ্ঠ সাথী ও ভক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সনের ১০ অক্টোবর আবুল হাশিম সাহেবের বাবা আবুল কাশেম সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। আবুল হাশিম সাহেবের নানা আবদুল জব্বার সাহেব ১৮৫৮ সনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছয়জন গ্র্যাজুয়েটদের একজন সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে একই ব্যাচের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। দাদা আবদুল মজিদও বৃটিশ সরকারের উচ্চ পদে চাকুরি করেছেন। আবুল হাশিম সাহেবের মামা খান বাহাদুর আবদুল মমিন চট্টগ্রাম বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার পদে চাকুরি করে অবসরে যান। অপর মামা আবদুল হাফিজ ইন্ডিয়ান ফাইনান্স সার্ভিসের সদস্য ছিলেন, ভারতীয় রেলের প্রধান হিসাব নিয়ন্ত্রক বা চিফ কন্ট্রোলার হয়ে অবসরে যান। আবুল হাশিম সাহেবের বড় মামা নবাব আবদুল জব্বারের বড় ছেলে মৌলভী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

আল্লাম্মা আবুল হাশিম সাহেব ১৯২৩ সনে বর্ধমান মিউনিসিপ্যাল ইংরেজি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন ছিলেন, ১৯২৫ সনে বর্ধমান রাজ কলেজ থেকে আইএ এবং ১৯২৮ সনে ডিগ্রী পাস করেন। ১৯৩১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএল ডিগ্রী পাস করেন। জনাব আবুল হাশিম সাহেব প্রখ্যাত আলেম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নানা মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ ওবেদীর মেয়ের মেয়েকে ১৯২৮ সনের ৭ সেপ্টেম্বর বিবাহ করেন, স্ত্রীর নাম মাহমুদা আখতার মেহেরবানু।

অসাধারণ জ্ঞানী ও পণ্ডিত মানবতাবাদী মানুষ ছিলেন জনাব আবুল হাশিম সাহেব। ১৯৪০ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত তিনি অবিভক্ত ভারতবর্ষের অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৪০ সন থেকে ১৯৪৭ সনের অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের তিনজন সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন ১. খাজা নাজিমুদ্দিন ২. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৩. আবুল হাশিম। তবে এদের মধ্যে আবুল হাশিম সাহেবই ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত, জনগণের কাছের মানুষ এবং মুসলিমলীগ রাজনীতির প্রাণপুরুষ। ইসলাম ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে অসাধারণ বড় মাপের কয়েকটি বই তিনি লিখেছেন। ১৯৪৭ সনে বাংলা ভাগ হলে তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গ বা ঢাকায় চলে আসেন, থাকতেন ২০নম্বর ওয়ারীর বাসায়। ১৯৭৪ সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমি আবুল হাশিম সাহেবের লাশ নিজ হাতে জুরাইন কবরস্থানে প্রয়াত রাজনীতিবিদ জহিরউদ্দিনের সাথে কবরে নামিয়েছি আরও দুই-তিনজনসহ। বাইতুল মোকাররম

www.pathagar.com

মসজিদে নামাজে জানাজা পড়েছি। মৃত্যুর দুই-একমাস আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নয় নম্বর কেবিন থেকে তিনি যখন হাসপাতাল ত্যাগ করে চলে যান তখন তিনি তার ডান হাত আমার ঘারে আর বাম হাত তার বড়ছেলে বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের ঘারে দিয়ে করিডোর ও সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামেন এবং তাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেই। জনাব আবুল হাশিম সাহেব ১৯৪০ সন থেকে অন্ধ ছিলেন।

পূর্ব পাকিস্তান বা বাংলাদেশের রাজনীতিতে আল্লামা আবুল হাশিম সাহেবের যারা সরাসরি শিষ্য ছিলেন তারা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান খান, তাজউদ্দিন আহমদ, জহিরউদ্দিন, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, খান এ সবুর খান, ফজলুল কাদের চৌধুরী (ফজলুল কাদের চৌধুরীর ছোটভায়ের সাথে তার এক মেয়ের বিয়ে হয়েছে), শাহ আজিজুর রহমানসহ অনেকেই। আবুল হাশিম সাহেবই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের রাজনীতির নেতৃত্ব নবাব বা জমিদারদের ঘর থেকে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সাধারণ ঘরের সন্তানদের কাছে নিয়ে এসেছেন। যারজন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান যারা তারা সবাই তাকে খুবই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করতেন।

১৯৭২ সনে আমি ঢাকা কলেজে আইএ পড়ি। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের একজন নেতা, কর্মী এবং মুক্তিযোদ্ধা। ১৯৭২-১৯৭৪ সন পর্যন্ত যতদিন আবুল হাশিম সাহেব জীবিত ছিলেন আমি প্রায় প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত একবার করে ওয়ারীতে তার বাসায় যেতাম এবং তার মুখে জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে প্রাণ জুড়াতাম। ১৯৭৭ সন থেকে ১৯৮৫ সন পর্যন্ত আমি আবুল হাশিম সাহেবের স্ত্রীকে এবং তার বড় পুত্র বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের স্ত্রীকে মাঝেমধ্যে দুই নম্বর ধানমণ্ডি রোডের ভারতীয় তথ্যকেন্দ্রে ভারতীয় হাইকমিশন প্রদত্ত সিনেমা দেখার পাশ দিয়েছি বেশ কয়েকটি করে। আমাকে অসাধারণ স্নেহ করতেন জনাব আবুল হাশিম সাহেব তার স্ত্রী বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের মা, বদরুদ্দিন ওমর সাহেবের স্ত্রী সুরাইয়া আপাও আমাকে বেশ স্নেহ করেন। তিনি উত্তরা ব্যাংকের একজন অফিসার ছিলেন, এখন স্বাভাবিকভাবেই রিটায়ার্ড। মিরপুরে থাকেন যারজন্য আর দেখা হয় না। মোটকথা আমি জনাব আবুল হাশিম সাহেবের পরিবারের একজন অতি আপন স্নেহভাজন সদস্য হয়ে পড়েছিলাম। ১৯৭২ সন থেকে ১৯৭৪ সন পর্যন্ত খুবই গরীব এবং অর্থনৈতিক টানাটানিতে জনাব আবুল হাশিম সাহেব জীবনযাপন করেছেন, যা দেখে দুঃখে আমার প্রাণ ফেটে যেত। তার এই অবস্থা দেখে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করলাম হুজুর এখন যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, তাজউদ্দিন আহমেদ, খন্দকার মোশতাক আহমেদ এবং কামরুজ্জামান সাহেব যার বাবা আবদুল হামিদ আপনার ছাত্র বা শিষ্য এনারা আপনার কোন খোঁজ নেয় না? জবাবে আল্লামা আবুল হাশিম সাহেব বলেছিলেন– হ্যাঁ বেশ খোঁজ খবর নেয়।

দেশ স্বাধীন হবার কয়েকদিন পরেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন কলকাতা থেকে এসেই পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে দোয়া আশির্বাদ নিয়ে গিয়েছে, এর কয়েকদিন পর অর্থমন্ত্রী হিসেবে আবার এসেছে বেশ হন্তদন্ত হয়ে, এসে কাঁচুমাচু করে তাজউদ্দিন বলল– 'হুজুর বেশ বিপদে আছি, দয়া করে একটু সাহায্য করুন।'

www.pathagar.com

আমি বললাম– সে কি তুমি স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা প্রধানমন্ত্রী, এখন বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী, আর আমি হলাম এদেশের সবচেয়ে দুর্বল একজন অন্ধ অসহায় বৃদ্ধ ও গরীব মানুষ। তুমি আমার কাছে সাহায্য চাও সে কি কথা। তখন তাজউদ্দিন বলল– হুজুর দালাল আইন করা নিয়ে বেশ বিব্রত ও ঝামেলায় আছি, কি করা যায় আমরা বুঝে উঠতে পারছি না, দয়া করে আপনি ১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধ ও দালাল আইনটি করে দিবেন এই আমার অনুরোধ। তখন আমি তাজউদ্দিনকে বললাম আমি কষ্ট করে যা লিখে দিব তা যদি পরিবর্তন না কর তাহলে আমি দালাল আইন লিখে দিতে পারি'। তখন তাজউদ্দিন বলে– 'স্যার কথা দিতে পারি না, যে হুবহু ঠিক থাকবে, তবে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব আপনার লেখা আইন হুবহু ঠিক রাখতে'। তখন আমি বললাম– 'ঠিক আছে, সাতদিন পরে এসে তুমি দালাল আইনের লেখা নিয়ে যেয়ো'। সাতদিন পরে তাজউদ্দিন এসে দালাল আইন আমার কাছ থেকে নিয়ে যায়। বাবলু সাহেব, 'যুদ্ধ করলেন আপনারা আর আপনাদের যুদ্ধের দালাল আইন তৈরি করে দিয়েছি আমি। আমি যে দালাল আইন করে দিয়েছি বর্তমান বাংলাদেশ সরকার তার একটি দাড়িকমা, সেমিকোলণ বদল করে নাই সব ঠিক আছে। দালাল আইন আমার করা'। জনাব আবুল হাশিম বলেছিলেন– 'আমি তিনভাগে ভাগ করেছি দালাল আইন, প্রথম, যারা আদর্শগত কারণে পাকিস্তান সমর্থন করেছে তাদের কোন বিচার হবে না। দ্বিতীয়, যারা ১৯৭১ সনের ২৬ মার্চ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশ জন্মের সক্রিয়ভাবে বিরোধীতা করেছে, পাকিস্তান রাষ্ট্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করেছে, সংঘবদ্ধ হয়েছে জনমত সৃষ্টি করেছে, লেখা লিখেছে, বক্তৃতা করেছে, তাদের বিচার হবে, শাস্তি হবে, সশ্রম কারাদণ্ড হবে, তবে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন নয়। তৃতীয় যারা শুধু সংঘবদ্ধ জনমত সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নাই, মানুষ হত্যা করেছে, মানুষ হত্যার কাজে সহযোগিতা করেছে মানুষের বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, যারা ধর্ষন করেছে নিজ হাতে অস্ত্র ধরেছে তাদের মৃত্যুদণ্ড হবে এবং নানা মেয়াদে জেল হবে যাবজ্জীবন পর্যন্ত।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ১৯৭২ সনের যে যুদ্ধাপরাধ ও দালাল আইন রয়েছে তা আবুল হাশিম সাহেবেরই করা, যা তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমি আজ ১০.০৩.২০১০ তারিখ পর্যন্ত দালাল আইন পড়ে দেখিনি। আমার কথার জবাবে আরও বলেছিলেন জনাব আবুল হাশিম সাহেব সেদিন, এই গেল তাজউদ্দিনের কথা, খোন্দকার মোশতাক আমার বাসায় মাঝেমধ্যে আমাকে দেখতে আসে, আজকাল কম আসছে। একদিন আমি মোশতাককে বললাম, মোশতাক কে বড় নেতা, মওলানা ভাসানী না আমি, উত্তরে মোশতাক বলে স্যার আপনি বড় নেতা। আমি আবার বলি, মোশতাককে তোমার জীবনে বড় উপকার করেছে, আমি না মওলানা ভাসানী। মোশতাক জবাব দেয় স্যার আপনি। তাহলে তুমি সন্তোষে মওলানার বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগ দিয়েছেন আমার সাভারের জায়গায় কেন তুমি বিদ্যুতের সংযোগ দেও নাই? তখন মোশতাক বলে স্যার অবশ্যই দিব, আপনি ঠিকানা লিখে দেন। এর কয়েকদিন পরে খোন্দকার মোশতাক এসে বলে স্যার, যেখান থেকে মওলানা ভাসানী হুজুরকে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া হয়েছে

www.pathagar.com

সেখান থেকে ভাসানি সাহেবের বাড়ি তিনমাইল দূরে, ভাসানী সাহেব তার বাড়িতে বসবাস করেন। কিন্তু স্যার যেখানে বিদ্যুৎ আছে সেখান থেকে আপনার জায়গা পাঁচ মাইল দূরে এবং আপনার জায়গা খালি কোন মানুষ থাকে না, বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়ে কি হবে? তখন আমি খোন্দকার মোশতাককে বললাম, মোশতাক নিজের আত্মার সাথে নিজে বেঈমানী করো না, তুমি মওলানা ভাসানীকে বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছ সে একজন গন্যমান্য নেতা সম্মানিত ব্যক্তি সেজন্য, প্রয়োজন দেখে দাওনি। তুমি মওলানা ভাসানীকে সম্মান করেছ। আর সেদিন তুমি নিজে বলে গেলে আমি মওলানা ভাসানীর চেয়ে বড় নেতা আমাকে আমি মওলানা ভাসানির চেয়ে বেশি সাহায্য করেছি রাজনীতিতে, আর আজ তুমি প্রয়োজনের কথা তুলে আমার জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে চাও না, এটা কি ঠিক হচ্ছে? জনাব আবুল হাশিম বলেছিলেন, এবারে মোশতাক বলল স্যার আমি আপনার জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ দিব, দেখেন বাবলু সাহেব খন্দকার মোশতাক পাঁচ মাইল লম্বা তার টেনে নিয়ে সাভারে আমার খালি জায়গায় ঠিকই বিদ্যুৎ সংযোগ দিয়েছে। আবুল হাশিম সাহেব নিশ্চয়ই কথাগুলো বলার মাধ্যমে তার কোন শিষ্যই যে তাকে অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে নাই একথাও বলে দিয়েছিলেন, আমাকে তা বুঝতে অনেকদিন সময় লেগেছে। আজ দাবি উঠেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা, ১৯৭১ সনের যুদ্ধাপরাধ ও দালাল আইন পুনরুজ্জীবনে যে আইন আল্লামা আবুল হাশিম লিখেছে তাজউদ্দিন আহমেদ এর অনুরোধে, দেখা যাক এখন আবার কি হয়।

১০.০৩.২০১০ রাত ১১টা, বুধবার

www.pathagar.com

যে কারণে মন্দিরে যেতাম

১। মন্দিরে গেলে মনটা অনেক হালকা-পাতলা লাগে মন্দিরের পরিবেশ দেখে।

২। মন্দিরে গেলে অনেক গণ্যমান্য লোক ও অনেক পরিচিতজনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ হয়, যা সাধারণত হয় না। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে প্রাণ খুলে অনেকের সাথে কথা বলা যায়।

৩। মন্দিরে গেলে পূজার সময় অনেক ভালো বই দেখা যায় ও কেনা হয়।

৪। মন্দিরে গেলে অসাধারণ সুন্দরী মেয়ে বা মহিলাদের মাঝে-মধ্যে দেখা যায়, যা দেখে চোখ জুড়ায়।

৫। মন্দিরের প্রসাদ বা খিচুড়ী খুব সুস্বাদু, খেতে খুব মজা লাগে।

উপরের ৫টি কারণে মন্দিরে যেতাম।

তবে মন্দিরে ২/৪ জন খুব খারাপ মানুষও আছে, যাদের ছোবল বিষাক্ত সাপের ছোবলের মতোই বিষাক্ত ও বেদনাদায়ক। মন্দির কর্তৃপক্ষের উচিত এদের কঠোরভাবে দমন করা।

এখন বয়স বাড়ার জন্য গত দুই/এক বছর হতে মন্দিরে আগত সুন্দরী মহিলা দেখার ও খিচুড়ি খাওয়ার প্রতি আর আগ্রহ নেই।

০১.১২.২০০৯

www.pathagar.com

যে কারণে নামায পড়ি

১. যে অনন্ত শক্তি আমাকে সৃষ্টি করেছে, মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব দিয়েছে, সুন্দর মায়বী পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নত্র সৃষ্টি করেছে সেই শক্তি বা স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য নামায পড়তে যাই।

২. মসজিদে গিয়ে ফজরের, মাগরেবের এবং জুমার নামায পড়লে মনটা অনেক হালকা হয়ে যায়, মনে হয় বুকের উপর থেকে একটা ভারি বোঝা নেমে গেল, শরীর অনেক হালকা লাগে।

৩. আমার অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্টের কথা বলে মনটাকে হালকা করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে, মসজিদে গিয়ে নামায পড়ে মুনাজাতের মাধ্যমে অনন্ত শক্তি দয়াময় আল্লাহকে তা জানানো।

৪. মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ার সময় নামাযে আগত পাড়া-প্রতিবেশী অন্য নামাযিদের দেখে খুশিতে মনটা ভরে যায়। মনে হয়, এরা আমার ভাই, এরা আমার সামাজিক শক্তির উৎস, আমার যে কোন আপদ বিপদ থেকে রা করার জন্য যে কোন কাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে। আমি অসহায় নই, একা নই, আমার অনেক ভাই আছে।

৫. ফজর, মাগরিব ও জুমার নামযে ইমাম সাহেবেরা যে মাধুর্যময় সুরেলা কণ্ঠে পবিত্র কুরআনের সূরা সজোরে তেলাওয়াত বা আবৃত্তি করেন তা শুনতে খুব ভাল লাগে, প্রাণে আনন্দের দোলা দেয়।

তাই মাঝে মধ্যে মন যখন চায় মসজিদে ফজর, মাগরিব ও জুমার নামায পড়ার জন্য যাই, যারা নামায পড়েন না তাদের অনুরোধ করি দয়া করে নামায পড়ে দেখবেন, নামায পড়ে কত সুখ কত আনান্দ পাওয়া যায়।

২৩.১২.২০০৯

www.pathagar.com

দ্বিতীয় মুদ্রণে আমার শেষ কথা

মহান স্রষ্টা আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই, তারপরে তার সৃষ্টি দেবী সরস্বতীকে যেভাবে আমাকে ভালবেসেছেন, তার জন্য তাকে। ২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে ২০১০ সনের ১০.০৩.২০১০ পর্যন্ত, প্রায় ১৩ ফর্মা বা ২০৮ পৃষ্ঠার লেখা আমার হাত দিয়ে বের হয়েছে। আমি মনে করি, এটা আমার জীবনের বিরাট এক প্রাপ্তি ও সাফল্য। এরজন্য প্রশংসা পাবেন মহান স্রষ্টা আল্লাহ এবং তার সৃষ্টি দেবী স্বরসতী। লেখার মান কেমন হয়েছে তা আমি জানি না, এ বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণে আমার কিছু কথা নামে লেখায় বলেছি যে, আমি নিজে চিন্তাভাবনা করে কিছুই লিখতে পারি না, আমাকে দিয়ে অন্য একটি শক্তি লেখায়। লেখার সময় আমি জানি না আমি কি লিখছি, লেখা শেষ হওয়ার পড়ে দেখি একটা লেখা হয়েছে। অনেক জ্ঞানী মানুষ দেখি তা আবার ভালোও বলেন, দেখা যাক কি হয়। তবে আমি আল্লাহ ও তার সৃষ্টি দেবী সরস্বতীর প্রতি খুবই তুষ্ট।

'১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' প্রথম মুদ্রণে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৯২। দ্বিতীয় মুদ্রণে ২০৮ পৃষ্ঠার নতুন লেখাসহ হলো প্রায় ৫৮৭ পৃষ্ঠার। বইয়ের আয়তন বা ওজন অনেক বড় হয়ে গেল। কিন্তু এক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রণের স্লোগানকেই বেছে নিতে হলো, ছেলে হোক মেয়ে হোক একটিই যথেষ্ট। লেখকদের বইও তাদের সন্তানের মতই অনেকটা। তবুও আমি মনে করি দ্বিতীয় মুদ্রণে সংযোজিত ২০৮ পৃষ্ঠার লেখা নিয়ে নতুন আরেকটি বই হলে ভাল হতো, কিন্তু এটা আমার সাধ্যের বাহিরে, আমার বই আমিই প্রকাশ করি, কোন পাবলিশার্স করে না, নিজে টাকা দিয়ে পাবলিশার্সকে বই প্রকাশের দায়িত্ব দেওয়া মোটেই ভাল মনে করি না, কাজেই নিজের টাকায় নিজেই বই ছাপছি, এতে টাকা আমার ঘরে আমার হাতে ফিরে আসে লাভসহ, পাবলিশার্সকে দিলে মনে হয় তা হতো না।

আমি জানি আমার লেখার পাঠক কারা, সমাজের ষোল আনা মানুষের মধ্যে যারা উচ্চ পর্যায়ের এক আনা তারা, যারা প্রতিষ্ঠিত, উচ্চশিক্ষিত, যথেষ্ঠ ধনী। প্রয়াত সাবেক সচিব সু-সাহিত্যিক বন্ধু শহিদুল হক ওরফে শহিদুল জহির আমার লেখা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছিলেন, 'বাবলু ভাই আপনি লিখেন তাদের জন্য, যারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালিত করে, দেশ শাসন করেন, সমাজ পরিচালিত করেন, তাদের জন্য, অনেক উঁচু স্তরের মানুষ ও লেখক আপনি।' সাধারণ পাঠক-পাঠিকা যারা সংখ্যায় পনের আনার দলে তারা আমার লেখা এখনই কিনে পড়বেন না। তবে আমি নিশ্চিত অবশ্যই কিনে পড়বেন তবে তা ৫-১০ বছর পর, আমি তখন তা দেখার জন্য বেঁচে থাকবো না। আমার বই আমি ছাপি, আমিই বিক্রয় করি। একটি বড় সন্তান নিয়ে যেমন মানুষের বাড়িতে নিমন্ত্রণে গেলে তেমন দৃষ্টিকটু দেখায় না, কিন্তু দুইটি ছোট বাচ্চা নিয়ে গেলেও দৃষ্টিকটু দেখায়, কাজেই একটি বড় বই নিয়েই মানুষের কাছে যাওয়া সুবিধা, দুইটি বই নিয়ে নয়, তার উপরে

www.pathagar.com

রয়েছে প্রকাশনার বিশাল খরচ দুইটি বই বের করার। যারজন্য দুইটি নয় একটি বই-ই '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বৃহৎ আকারে প্রায় ৫৯৩ পৃষ্ঠার বই বের হলো। এরজন্য পাঠকপাঠিকাদের একটু নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হবে কিন্তু এরজন্য আমার কিছুই করার নেই, আমি শুধু দুঃখ প্রকাশ করতে পারি। ছয়শ পৃষ্ঠার একটি বই আমার হাতের লেখায় আমার মাথার বিদ্যা-বুদ্ধি থেকে বের হয়েছে এরজন্যে অনেক শুকরিয়া, আলহামদুলিল্লাহ, আমি তৃপ্ত।

আবু মুহাম্মদ খান (বাবলু)
১১.০৩.২০১০
এ/১২, প্রিন্স টাওয়ার
১৩৫/এ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৭৫ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে বুড়িগঙ্গা নদীতে মৈত্রীর রায়ের সাথে নৌকা ভ্রমনের সময় নৌকার মাথায় আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। ছবিটি তুলেছেন মৈত্রী রায়।

১৯৭৫ইং সনে শিব নারায়ণ রায় বাংলাদেশে বেড়াতে এলে কবি নির্মলেন্দু গুণ ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) কে সহ শাহজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠি বাড়িতে বেড়াতে যান। ছবিতে ১৯৭৫ইং সনে শাহজাদপুর রবীন্দ্রনাথের কুঠি বাড়িতে শিব নারায়ন রায়, মিসেস গীতা রায়, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), ঐ সময় শাহজাদপুর কলেজের দুই জন অধ্যাপক আওয়ামীলীগ কর্মী গোলাম আযম ও কবি নির্মলেন্দু গুণ কে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি তুলেছে শিব নারায়ণ রায়ের কন্যা মৈত্রী রায় খুকু।

www.pathagar.com

১৯৭৫ইং সনের এপ্রিল কলাবাগানে ঐ সময়ের জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেস্ট হাউজ প্রাঙ্গণে শিব নারায়ণ রায়, এম এন রায়ের ভক্ত আব্দুল মালেক ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। ছবিটি তুলেছিল ঐ সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ছাত্রী আজকে (২৫-০৯-২০০৮ইং) তারিখে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপিকা মেঘনা গুহ ঠাকুরতা।

১৯৮৫ সনে বাংলাদেশ সরকারের তথ্যমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের ঘনিষ্ট বন্ধু জনাব শামসুল হক নাতি তাপসের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে। শামসুল হক সাহেবের পাশে রয়েছেন আবু মোহাম্মদ খান (বাবুল)। শামসুল হব সাহেবের ছোট ছেলে এ্যাডভোকেট তাইফুরের কোলে রয়েছে অপর নাতি তারেক। তাপস ২৬.১০.২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ বিমানের একজন পাইলট, তার বাবা বাংলাদেশ বিমানের সাবেক পাইলট ক্যাপ্টেন সাহাব বীর উত্তম।

www.pathagar.com

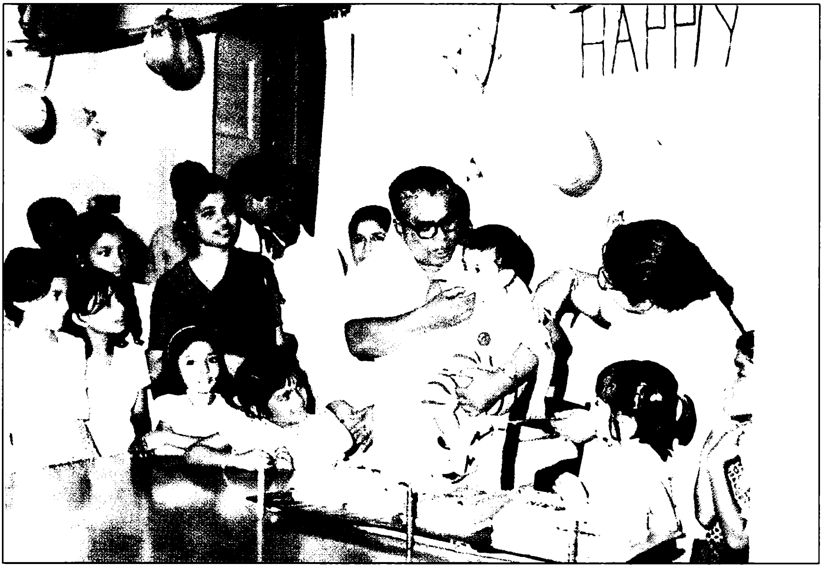

১৯৮৪ সালে নাতি তারেকের জন্মদিনে কেক খাওয়াচ্ছেন তথ্যমন্ত্রী জনাব শামসুল হক। পাশে রয়েছেন তারেকের মা আরজুমান আরা ও তারেকের নানা আতাউল্লাহ সরকার সহ অন্যরা। তারেক ২৬.১০.২০০৮ তারিখে একজন এ্যাডভোকেট।

১৯৮৯ সনে শিব নারায়ণ রায় ঢাকা এলে তার সম্মানে সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ঢাকা ক্লাবে শিব নারায়ণ এর সম্মানে এক সংবর্ধনা ও নৈশভোজের আয়োজন করেন। ছবিতে মিজানুর রহমান শেলী, শিব নারায়ণ রায় ও আলমগীর ফারুক চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে। উল্লেখ্য ১৯৪৮ সনে পাকিস্তান আই সি এস সমিতি এম এন রায়ের সম্মানে ঢাকা ক্লাবে এক বক্তৃতা ও নৈশভোজের আয়োজন করেছিলেন। ১৯৪৮ সনে এম এন রায়ের সম্মানে ঢাকা ক্লাবের ঐ অনুষ্ঠানে শিব নারায়ন এম এন রায়ের সাথে উপস্থিত ছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৮৯ সনে শিব নারায়ণ রায় এর সম্মানে সাপ্তাহিক পরিবর্তনের সম্পাদক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)-র ঢাকা ক্লাবের ঐ অনুষ্ঠানে মিসেস মিজানুর রহমান শেলী, ইশরাত আলমগীর চৌধুরী, মিসেস এম এম রেজা, মিসেস ড. ফারুক আজিজ খান, মিসেস কোওকাব রেজা।

তাজউদ্দিন আহমদ সাহেবের ধানমন্ডির বাসায় ১৯৯৩ সনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), তাজউদ্দিনের ২য় মেয়ে সিমিন হোসেন রিমির স্বামী মোস্তাক হোসেন ও ৩য় মেয়ে মাহজাবীন আহমেদ মিমির স্বামী ফারজিন। ফারজিন আদি রাজা জামসেদ, সম্রাট কায়কাউস, সোহরাব রুস্তম, তাহমিনা, মহাকবি ফেরদৌস, নূরজাহান শিরি ফরহাদের দেশ পারস্য বা ইরান থেকে এসেছে পদ্মা, মেঘনা, যুমনা, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা নদীর দেশে।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সনে তাজউদ্দিন আহমদের ভাগ্নি আনোয়ারা খাতুন এর বাসায় আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)। ২০০৮ সনের আগস্ট মাসে প্রথম সপ্তাহে আনোয়ারা খুতন মৃত্যুরবণ করেছেন। ছাত্রী জীবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ইডেন কলেজের একজন নেত্রী ছিলেন।

তাজউদ্দিন আহমদের ভাগ্নি আনোয়ারা খাতুন এর বাসায় আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), ১৯৯৪।

www.pathagar.com

১৯৯৪ সনে মহলছড়ি থেকে অনেকটা দূরে পাহাড়ের উপরে মেজর ফোরকানের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

১৯৯৪ সনে মহলছড়িতে পুলিশ অফিসার সমশের আলম ও অন্য এক পুলিশ অফিসারের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

www.pathagar.com

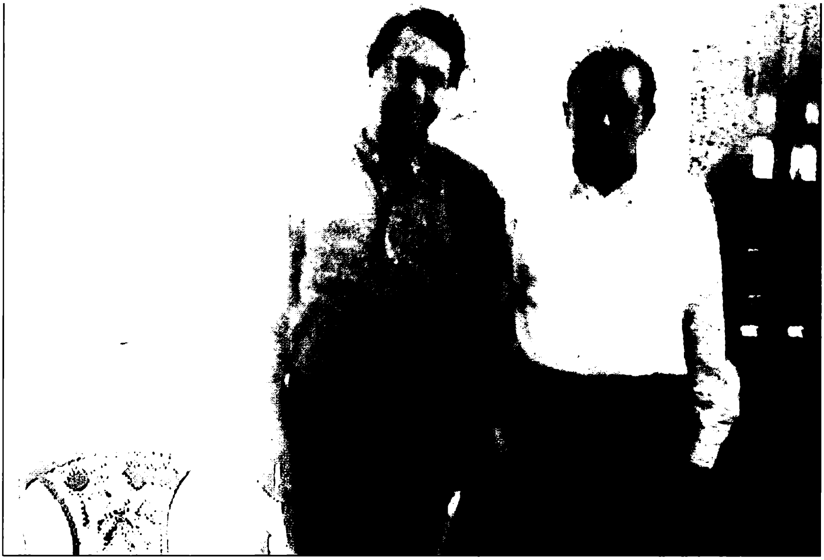

১৯৭৪ সনে থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগে অনার্সে পড়ার সময়ের ক্লাসফ্রেন্ড পার্থ সারথী চট্টোপাধ্যায়ের সাথে ৮.২.২০০৯ তারিখে কলকাতার মারকুইজ স্ট্রীটের একটি হোটেলে আবু মোহাম্মদ খান বাবলু।

শ্রীনগর থানার হাসারা গ্রামে প্রখ্যাত লেখিকা প্রতিভা বসুর বাবার বাড়ির পাছদুয়ারের ঘাট। জীবনের জলছবি বইয়ের ৬০ পৃষ্ঠার ৫ নম্বর লাইনে এই পুকুর বা ঘাটের কথা লেখা রয়েছে। ২৮/১০/২০০১ইং তারিখে ছবিটি তোলা।

www.pathagar.com

২০০২ সনে ১৯৯০ সনের বি.সি.এস প্রশাসন সমিতির বার্ষিক বনভোজন অনুষ্ঠানে গাজীপুরের ডিসি শাহাবউল্লা ও আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

ঘোড়ায় চড়ে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

২০০৬ সালের ২৮ শে জুলাই কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে নজরুল, আব্দুস সামাদ ও বণিকের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)।

www.pathagar.com

কলকাতার বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বিরালা মন্দিরের সামনে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), ২০-০২-২০০৯, শুক্রবার।

আগ্রার তাজমহলের দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ১৭-০২-২০০৯ তারিখে।

দিল্লির সেন্ট্রাল পার্কে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ১৮-০২-২০০৯ তারিখ বুধবার। সেন্ট্রাল পার্কের পশ্চিম-উত্তরে আন্ডারগ্রাউন্ডে বা মাটির নিচে বিশাল পালিকা বাজার মার্কেট।

www.pathagar.com

১৯৭১ সনে পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রী, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী, পাঞ্জাবের সাবেক সফল গভর্নর মানবতাবাদী রাজনীতিবিদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর নাতী, ২৫ কোটি বাঙালির গর্ব ব্যারিস্টার সিদ্ধার্থ শংকর রায়ে সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), বর্ধমান জেলার চুপি গ্রামের শুম্ভু মৈত্র, শুম্ভুর ফুফাত ভাই দূর্গাপুরের বাবাই। সোমবার ০৯-০২-২০০৯ তারিখ কলকাতার বেলতলা রোডের বাসায় তোলা ছবি।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-এর ছেলের মেয়ে মিসেস অদিতি মুখার্জির সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), বর্ধমানের চুপি গ্রামের শুম্ভু ও শুম্ভুর ফুফাত ভাই বাবাই, ০৯-০২-২০০৯ তারিখ সোমবার, কলকাতার নফরকুন্ড রোডের বাসায় তোল ছবি। মিসেস অদিতি মুখার্জির ছেলে ভারতের সাবেক টেনিস তারকা জয়দেব মুখার্জি।

www.pathagar.com

বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী থানার চুপি গ্রামের লেখক, সাংবাদিক, ডাক্তার ও বাংলাদেশের ভক্ত দীপালোক বন্দোপাধ্যায়, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), দীপালোকের একমাত্র ছেলে ঋভু বন্দোপাধ্যায়, চুপিতে তোলা ছবি ২৩-০২-২০০৯।

ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণকন্‌সাসনেস বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন) এর প্রধান কার্যালয় নদীয়া জেলার নবদ্বীপের মায়াপুরে ২৩-০২-২০০৯ তারিখ সোমবারে তোলা ছবি। মায়াপুরের ইসকনের প্রধান কার্যালয়ের তোলা ছবিতে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), চুপির তপন মৈত্রের পুত্র চঞ্চল, চঞ্চলের স্ত্রী মলি, মেয়ে জলি, অপর পুত্র শুভ্র মৈত্র, শুভ্রর স্ত্রী সাগরিকা, শুভ্র ও কাঞ্চনের ফুপু দীলিপ মৈত্রের এক বোনকে দেখা যাচ্ছে।

www.pathagar.com

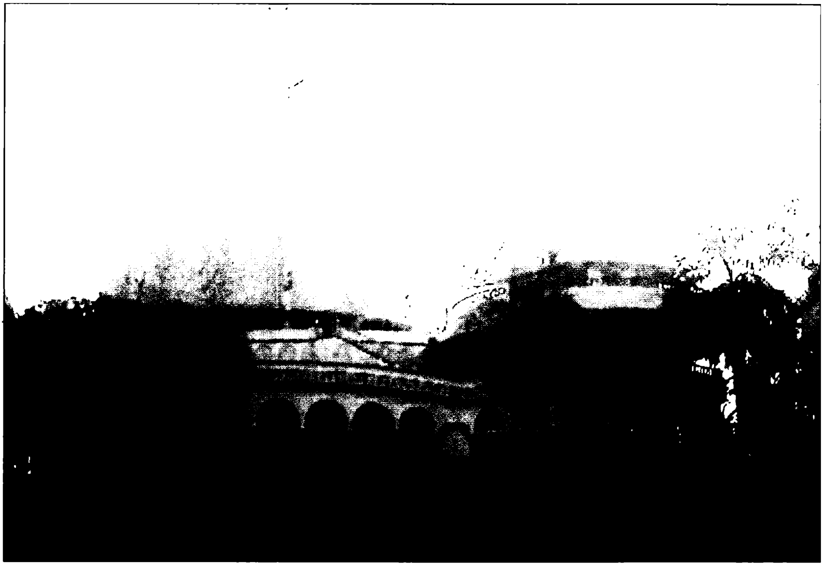

২৩.২.২০০৯ তারিখে মায়াপুরে ইস্কনের সদর দপ্তরে আবু মোহাম্মদ খান বাবলুর ক্যামেরায় তোলা ইস্কনের স্বামী প্রভুপাদ স্মরণে মন্দির।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) সস্ত্রীক সম্রাট হুমায়ুনের সমাধি বা স্মৃতিস্তম্ভে ১২-০২-২০০৯ তারিখ বৃহস্পতিবার।

২০,০৩.২০১০ শনিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ইসলামপুরের কাজী শফিকুল ইসলাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে মঞ্চে বসে রয়েছেন;-ইউ,এন,ও রিপন চাকমা, আবু মোহাম্মদ খান (বাবুল), কাজী শফিকুল ইসলাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর কাজী শফিকুল ইসলাম, রবিউল মোক্তাদির চোধুরী, সাবেক পৌর চেয়ারম্যান হেলাল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনির ১ম প্রতিষ্ঠা ব্যাচের ভারতের মুর্তি ক্যাম্পে ট্রেনিং প্রাপ্ত অফিসার মেজর জহির।

২০.০৩.২০১০ শনিবার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া সদর উপজেলার ইসলামপুরে অবস্থিত কাজী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ, মিলাদ ও ২০১০ সনের উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্র-ছাত্রীদের বিদায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দিচ্ছেন- '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইয়ের লেখক আবু মোহাম্মদ খান (বাবুল)। ছবিতে আরও রয়েছেন, ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা আওয়ামীলীগের নেতা মুক্তিযোদ্ধা মেজর জহির, আওয়মীলীগ নেতা, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক একান্ত সচিব জনাব রবিউল আলম ওবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকতা রিপন চাকমা।

www.pathagar.com

বরিশালের কীর্তিপাশের জমিদার বংশের সন্তান ১৯৪১ সনে বরিশাল জেলা স্কুল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেট্রিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারকারী, ১৯৪৬ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান পাওয়া, ১৯৭৪ সন পর্যন্ত দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ও দিল্লি স্কুল অব ইকোনোমিক্সর ইতিহাসের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান, ১৯৭৪ সন থেকে ১৯৯৪ সন পর্যন্ত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের প্রফেসর, বাংলা ভাষার আলোড়ন সৃষ্টিকারী "বাঙালনামা" বইয়ের লেখক তপন রায় চৌধুরীর সাহেবকে গত ২৪-১১-২০০৯ তারিখে ঢাকার ধানমন্ডি ২৭ রোডে জেনিয়াল চায়নিজ হোটেলে বরিশাল জেলা স্কুলের সাবেক ছাত্র সমিতি প্রদত্ত সংবর্ধনা সভায় লেখক আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) '১৯৭১ ও অনেক অজানা কথা' বইটি উপহার দিচ্ছেন।

বাংলা ভাষার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বই বাঙালনামার লেখক, পৃথিবী বিখ্যাত ইতিহাসবিদ প্রফেসর তপন রায় চৌধুরী সাহেবের সাথে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু) ২৪-১১-২০০৯ তারিখে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে।

www.pathagar.com

কবি-সাহিত্যিক, বাংলাদেশ সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোস্তফা মহিউদ্দিন, আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যনির্বাহী পরিচালক আবুল কাশেম, বীর মুক্তিযোদ্ধা-বেসিক ব্যাংকের ডিএমডি মোনজুর মোর্শেদ, গত ২৬-০৬-২০০৯, শনিবার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে তোলা ছবি।

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)'র নিকট আত্মীয় বাংলাদেশ এস্ট্রোনমি বা মহাকাশ গবেষণা সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক এফ. আর সরকার, মিসেস হাসিনা এফ. আর সরকার, বাংলাদেশী টাকায় নয় হাজার কোটি টাকা নিজের অর্থ ব্যয় করে পনের দিন স্বামীসহ মহাশূন্যে ভ্রমণকারী মেয়ে আনুশেহ্ আনসারী ও এফ. আর সরকারের একজন নিকট আত্মীয় মোঃ ফজলুল হক ছবিতে রয়েছে। ২০০৮ সনের ১৪ মে শুক্রবার আমেরিকার টেক্সাস রাজ্যের ডালাস শহরের কাছে প্যালানো নামক স্থানে আনুশেহ্ আনসারীর অফিসে ছবিটি তোলা হয়েছে। আনুশেহ্ আনসারীর জন্ম ইরানে, বর্তমানে তিনি মার্কিনী স্বামী গ্রহণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।উল্লেখ্য যে এফ. আর সরকার একমাত্র বাংলাদেশের নাগরিক যিনি নাসার সহযোগিতায় ৩০ মিনিট মহাশূন্যে ভ্রমন করেছেন।

www.pathagar.com

A seminar titled "AIR POLLUTION : Perspective Dhaka" was held on 21st November 2009 at Dhaka Sheraton Hotel under the auspices of Franco-Bangladesh Association of Scholars and Trainees (FBAST) & the Embassy of France in Bangladesh. A Photograph taken in the seminar includes (From left to right) Mr. Liaquat Ali Khan, President, FBAST, Commissioner of Taxes, Former Students League Leader and V.P. Dhaka Collage 1974, Mr Karine Le'ger, Deputy Director, AIRPARIF, H E. Mr Charley Causeret, Ambassador of France to Bangladesh, Abu Mohammad Khan Bablu, Freedom Fighter & General Secretary of Students League, Dhaka Collage Unit in 1973, Miss Helene Ringot, Cultural Attache'e, Embassy of France in Dhaka.

২০০৮ সনের ১৫ই জুলাই দিনাজপুরের ঐতিহাসিক রামসাগরের উত্তর পার্শ্বে সস্ত্রীক আবু মোহাম্মদ খান বাবলু

www.pathagar.com

১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০০ সনে টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধুর সমাধিসৌধে আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), মাসুদ সিদ্দিকী টি.এন.ও টুঙ্গীপাড়া এবং গোপালগঞ্জের এ.ডি.সি কে দেখা যাচ্ছে।

২০০৮ সনের ১৫ই জুলাই দিনাজপুরের সার্কিট হাউস প্রাঙ্গণে লাবুর ব্রিলিয়ান্ট ছেলে শুভ্র।

www.pathagar.com

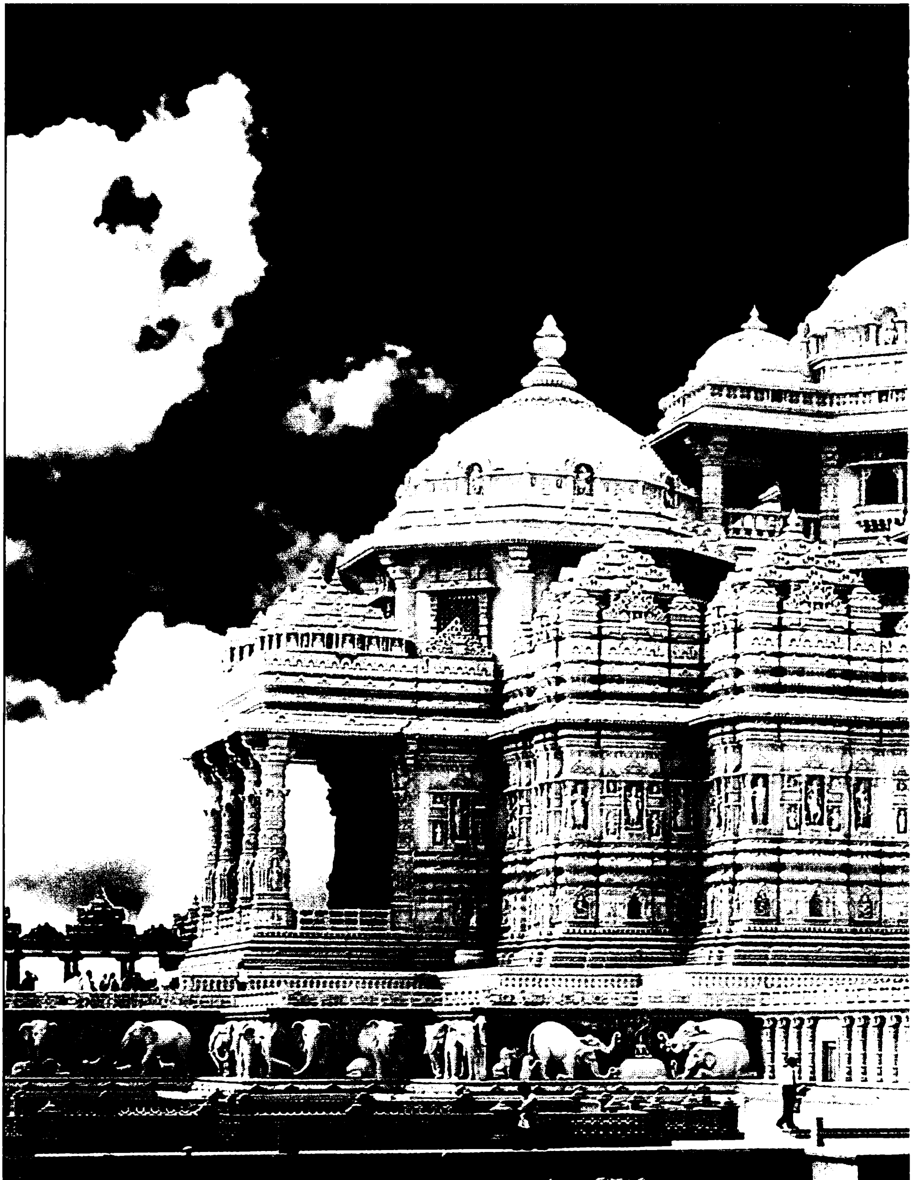

দিল্লী শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে যমুনা নদীর তীরে ২০০০ সনে নির্মাণ কাজ শুরু, ২০০৫ সনে নির্মাণ কাজ শেষ, যে স্বামী নারায়ণ অক্ষয় করা যায় না। এই স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির দেখতে যান আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু), ১৪-০২-২০০৯ তারিখ শনিবার। ১০০ একর বা ৩০ বুচাসানওয়াসী শ্রী অক্ষয় পুরুষোত্তম স্বামী নারায়ণ সংস্থার (বিএপিএস)। ২০০০ সনের ২৬ মে বর্তমান বিএপিএস এর ৫ম কর্ণধার প্রমুখ স্বামী ম একটি মন্দির নির্মাণের জন্য আহবান জানিয়েছিলেন, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবে রূপ দেন তাঁর শিষ্য স্বামী প্রমুখ মহারাজ। ৬ নভেম্বর ২০০৫ সনে ভারতের

www.pathagar.com

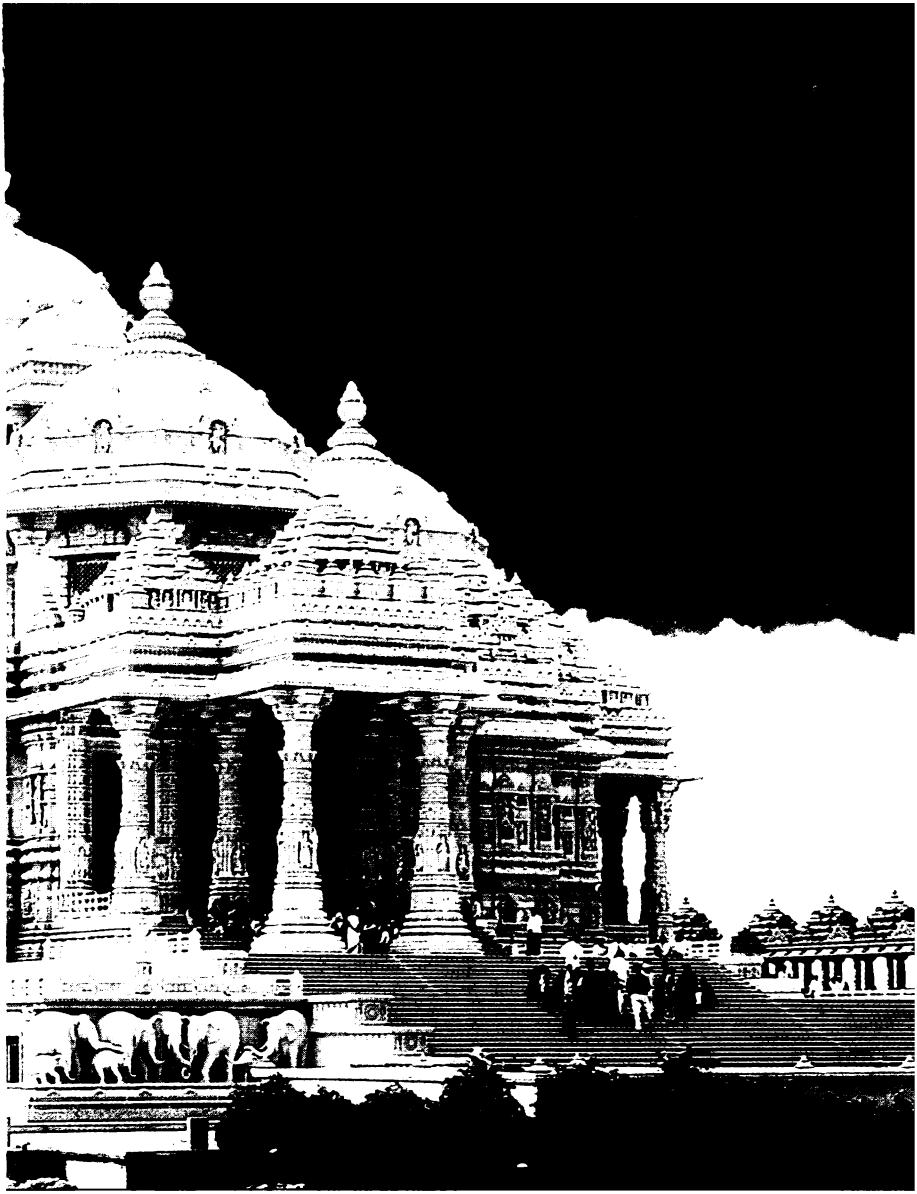

ন্দিরের, তা দেখে বিস্ময়ে হতবিহ্বল হতে হয়, অবিশ্বাস্য সৃষ্টি, মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতা কি বিশাল তা স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির না দেখলে অনুভব
জায়গা জুড়ে স্বামী নারায়ণ অক্ষয়ধাম মন্দির, ১৯৭১ সন থেকে জায়গা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়, ২০০০ সনের ২১ এপ্রিল জায়গা পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে
ন্দিরের জায়গায় আরতি পূজা করেন, নির্মাণ কাজ শুরু ৮ ডিসেম্বর ২০০০ সনে। আর আগে ১৯৬৮ সনে স্বামী যোগী মহারাজ যমুনা নদীর তীরে
এপিজে আব্দুল কালাম এবং প্রধানমন্ত্রী মনোমহন সিং এই মন্দিরের উদ্বোধন করেন

www.pathagar.com

মিসেস খুরশিদা চৌধুরী, নাসির আহমেদ চৌধুরীর সহধর্মিনী।
চট্টগ্রামের মাইজভান্ডার পীর বংশের মেয়ে,
পিতার নাম সৈয়দ আবুল বাশার। ১৯৮২ সন থেকে
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)র সাথে পরিচয়।
মিসেস খুরশীদা চৌধুরী তখন থেকেই
আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)কে নিজের ছোট ভাইয়ের
মতই আপন মানুষ ভেবে স্নেহ করে আসছেন।

২০০৮ সনের ১৬ জুলাই দিনাজপুরের স্বপ্নপুরীর একটি ভিআইপি কক্ষে স্ত্রীসহ আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

১৯৭১
ও অনেক অজানা কথা

আবু মোহাম্মদ খান (বাবলু)